গবেষণা অভিসন্দর্ভের শিরোনাম

# ঔপনিবেশিক বাংলায় পাগল, পাগলাগারদ ও সমাজ

## (১৮০০-১৯৪৭)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা অনুষদের ইতিহাস বিভাগে

পিএইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য পেশকৃত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

মহঃ ইনসান আলি

গবেষণার তত্ত্বধায়ক

ড. সুচেতনা চট্টোপাধ্যায়

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কোলকাতা-৭০০০৩২

রেজিস্ট্রেশন নং – A00HI1402617

**2022**

**Certified that the Thesis entitled**

"ঔপনিবেশিক বাংলায় পাগল, পাগলাগারদ ও সমাজ (১৮০০-১৯৪৭)" submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Dr. Suchetana Chattopadhyay And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere /elsewhere .

**Countersigned by the Supervisor :** Suchetana Chattopadhyay

**Candidate :** Md. Insan Ali

Dated : 28.11.22

Dated : 28.11.22

Professor
Department of History
Jadavpur University
Kolkata - 700 032

# কৃতজ্ঞতা স্বীকার

গবেষণার কার্যের প্রথমেই আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি আমার গবেষণার তত্ত্ববধায়ক অধ্যাপিকা সুচেতনা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়া কে, নানা কর্মব্যস্ততার মধ্যে তিনি আমাকে সুপরামর্শ ও মূল্যবান উপদেশ প্রদান করে গবেষণার কাজকে সমৃদ্ধ করতে ও যথাসময়ে সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করেছেন। এছাড়াও গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন মূল্যবান আকর ও তথ্য প্রদান করে আমাকে সহায়তা করেছেন, সেইজন্য আমি আমার শ্রদ্ধেয় ম্যামের কাছে চিরঋণী। এছাড়াও অভিসন্দর্ভ পরিকল্পনা ও রচনার শুরু থেকে শেষ অবধি যেসব অধ্যাপক মণ্ডলীর উৎসাহ ও নানা পরামর্শে আমি সমৃদ্ধ হয়েছি তারা হলেন, আমার গবেষণা কার্যের উপদেষ্টকমণ্ডলী অধ্যাপক রূপকুমার বর্মণ ও অধ্যাপক রাজেশ্বর সিনহা মহাশয়কে হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি । ধন্যবাদ জানাই ইতিহাস বিভাগের বর্তমান বিভাগীয় প্রধান মেরুনা মুর্মু মহাশয়া কে। এছাড়াও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে যাদের উৎসাহ আমাকে প্রেরনা দিয়েছে তারা হলেন- অধ্যাপিকা সুদেষ্ণা ভট্টাচার্য মহাশয়া , অধ্যাপিকা সুজাতা মুখার্জি, অধ্যাপক সুস্নাত দাস, অধ্যাপক হিতেন্দ্র প্যাটেল ও অধ্যাপক সুভাষচন্দ্র সেন মহাশয় , সকলকেই আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রায় বিগত বছরগুলিতে যে বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও লেখ্যাগার ব্যবহার করেছি তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এছাড়াও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ও রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার আধিকারিক ও অন্যান্য মহাশয়দের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি । আবার ন্যাশন্যাল লাইব্রেরি থেকে বিভিন্ন তথ্য পেয়ে আমি যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়েছি, সেজন্য উক্ত গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ ও আধিকারিককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই । এছাড়াও সেন্টার ফর স্টাডিস ইন সোসাল সায়েন্স, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ , রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অফ কালচার এর গ্রন্থাগার (গোলপার্ক),ওয়েষ্ট বেঙ্গল স্টেট লাইব্রেী, গোবড়ডাঙ্গা নিউ এজ পাঠাগার , গোবড়ডাঙ্গা পাবলিক লাইব্রেরী , বড়দাকান্ত পাঠাগার ও ইছাপুর প্রতুল পাঠাগার- প্রভৃতি গ্রন্থাগার থেকে নানা তথ্য পেয়ে আমি খুব উপকৃত হয়েছি । এক্ষেত্রে উক্ত গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। কলকাতা লিটিল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্রের অধিকর্তা সন্দীপ দত্ত’র কাছে আমি

চিরকৃতজ্ঞ । তিনি বিভিন্ন সময়ে আমাকে অনেক ক্ষুদ্র পত্রিকা দিয়ে সাহায্য করেছেন । ধন্যবাদ জানাই আমার ইতিহাস বিভাগের গ্রন্থাগারিক ও অন্যান্য শিক্ষাবন্ধু কর্মচারীবৃন্দকে । ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি গোবরডাঙ্গা গবেষণা পরিষদ- এর অধিকর্তা দীপক কুমার দাঁ মহাশয়কে । মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান অন্বেষনের ক্ষেত্রে আমি বিশেষ ঋণী পাভলভ ইনিস্টিউট- এর কর্ণধার বাসুদেব মুখোপাধ্যায়ের কাছে , উক্ত প্রতিষ্ঠানের মানব মন পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা আমার মনোবিদ্যা-সংক্রান্ত জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছেন । ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি অমিতরঞ্জন বসু যিনি এই বিষয় নিয়ে বর্তমানে কাজ করছেন। তিনিও আমাকে বৈদ্যুতিন ডাক যোগের মাধ্যমে নানারকম পরামর্শ ও তথ্য প্রদান করে আমাকে সাহায্য করেছেন । সর্বোপরি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি অক্ষর বিন্যাস শিল্পী পীযূষ দত্ত মহাশয়কে তিনি যথা সময়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমার গবেষণা প্রকল্পের কাজটি সম্পূর্ণ করেছেন ।

বিনীত-

মহ. ইনসান আলি

# সূচিপত্র

**ভূমিকা** পৃষ্ঠা ১ - ২০

গ্রন্থ পর্যালোচনা, গবেষণার ক্ষেত্র পরিসর ও সুযোগ , সময়কাল, অধ্যায় বিভাজন, গবেষণামুলক প্রশ্ন, উদ্দেশ্য ও বস্তুনিষ্ঠতা, গবেষণা পরিকল্পনা ও পদ্ধতি- তথ্য সংগ্রহ, ক্ষেত্র সমীক্ষা, সাক্ষাৎকার , তথ্য বিশ্লেষণ , গবেষণার সংক্ষিপ্তসার।

**প্রথম অধ্যায় - ঔপনিবেশিক বাংলায় পাগল : একটি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি**

পৃষ্ঠা ২১ - ৯৭

কে পাগল ? কারা পাগল ? কেন পাগল ? -সামাজিক,ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গী, ওপনিবেশিক আমল ও পাগল , সামাজিক সংঘাত ও পাগল, যুক্তি ও পাগলামি, পাগলদের বৈচিত্র্য, পাগলের চাহিদা, আধ্যাত্ম জগতে পাগল, রাস্তার পাগল বা ভবঘুরে পাগল, অপরিচ্ছন্ন ভবঘুরে, জড়বস্তুর মানুষ, শব্দতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় পাগল, পাগলামীর বিবিধ প্রসঙ্গ,পাগলি, প্রেম ও পাগলামি, পাগলামী ও ফৌজদারী দণ্ডাদেশ, পাগলামীর অজুহাতে নির্দোষ দাবী, ভয়ংঙ্কর পাগল, রণোন্মত্ততা ও উগ্রজাতীয়তাবাদের পাগলামী, ডাইনি প্রথা ও উন্মত্ততা।

**দ্বিতীয় অধ্যায় : ঔপনিবেশিক বাংলার উন্মাদ আশ্রম (১৮০০–১৯০০ খ্রীঃ )**

পৃষ্ঠা ৯৮-২০৮

কেন উন্মাদ আশ্রম ? ঔপনিবেশিক শাসনের যৌক্তিকতা - জনগণের প্রতি ব্রিটিশ উৎকর্ষতা প্রদর্শন, ব্রিটিশদের নৈতিক কর্তব্য, ভিক্টোরীয় যুগে নৈতিক দায়িত্ববোধ। উন্মাদ আশ্রমের ঐতিহাসিক পটভূমি , ঔপনিবেশিক বাংলার উন্মাদ আশ্রম- ঔপৌনিবেশিক বাংলার উন্মাদ আশ্রম - প্রথম পর্যায় : উন্মাদ আশ্রম (১৮০৪ খ্রীঃ ), বিয়ার্ডস্মোরের উন্মাদ আশ্রম (১৮১৭ খ্রীঃ) , রসা উন্মাদ আশ্রম- উত্তর ২৪ পরগনা (১৮০৫ খ্রীঃ), ভবানীপুর ইউরোপিয়ান লুনটিক অ্যাসইলাম (১৮৫৫ খ্রীঃ), পাটনা উন্মাদ আশ্রম (১৮২১ খ্রীঃ), ঢাকা উন্মাদ আশ্রম (১৮১৫ খ্রীঃ ), দুলান্দা উন্মাদ আশ্রম (১৮৪৭ খ্রীঃ) , ময়দাপুর ও বহরমপুর উন্মাদ আশ্রম, হাজারীবাগ অঞ্চলে উন্মাদ আশ্রম (১৮৭৬ খ্রীঃ )। উন্মাদ আশ্রমের ইতিহাস

ও বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি, উন্মাদ আশ্রমের বিনোদন ও খেলাধুলা- লুনাটিক লেবার, মৃত্যুহার , উন্মাদ আশ্রমের খাদ্য বৈচিত্র্য, উন্মাদ আশ্রমের অন্দরে ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন কার্যকলাপ , উন্মাদ আশ্রম থেকে লাভ নিষ্কাশন।

**তৃতীয় অধ্যায়- ঔপনিবেশিক বাংলার মানসিক হাসপাতাল (১৯০০-১৯৪৭ খ্রীঃ)**

পৃষ্ঠা ২০৯ -২৭৬

গোবরা লেপার অ্যাসাইলামের মানসিক চিকিৎসা ( ১৯১৬ খ্রীঃ ), কেন্দ্রীয় উন্মাদ আশ্রম , রাঁচি (১৯১৮ খ্রীঃ), সাধারণ হাসপাতালের মনোরোগ চিকিৎসা (১৯৩৩ খ্রীঃ ), মানকুন্ডু মানসিক হাসপাতাল (১৯৩৩ খ্রীঃ ), বঙ্গীয় উন্মাদ আশ্রম (১৯৩৫ খ্রীঃ ), দত্ত নগর মানসিক হাসপাতাল – লুম্বিনি পার্ক মানসিক হাসপাতাল (১৯৪০ খ্রীঃ )। লুম্বিনির ডায়েরী ,পাগলদের কণ্ঠ। উন্মাদ আশ্রম থেকে মনোচিকিৎসায় উত্তরণ, সাইকো অ্যানালিটিক্যাল সোসাইটি ও গিরিন্দ্র শেখর বসু (১৯২৫), ঔপনিবেশিক ভারতে মনোবিদ্যা ও মনোচিকিৎসা, বাংলায় মনোবিদ্যা চর্চা, মনস্তত্ত্বচর্চা শুরুর নমুনা, মনস্তত্ত্বের জ্ঞানশৃঙ্খলার উদ্ভব , মনোবিদ্যা সংক্রান্ত - বিষয় ও শিক্ষক, সাংস্কৃতিক মনস্তত্ত্বের দিকে ।

**চতুর্থ অধ্যায় - উন্মাদ আইনের ইতিহাস ও সরূপ : ঔপনিবেশিক বাংলায় প্রভাব**

(১৮৫৮ খ্রীঃ- **১৯১২** খ্রীঃ) পৃষ্ঠা ২৭৭- ৩৫২

পাগল আইনের ইতিহাস- পাগলদের জন্য আইন, উন্মাদ আইনের ইতিহাস - ব্রিটিশ পটভূমি , উন্মাদ আইন তৈরির উদ্দেশ্য , পাগল সম্পর্কিত বিল উথ্থাপন ও নির্বাচিত কমিটি, অন্যান্য আইনে পাগল সংক্রান্ত বিষয় । লুনাটিক অ্যাসাইলাম আইন- **১৮৫৮**, আইনের মূল বিষয়, আইনের বিভিন্ন ধারা। মিলিটারি লুনাটিক অ্যাক্ট- **১৮৭৭**, আইনের মূল বিষয়বস্তু। ক্রিমিনাল লুনাটিক অ্যাক্ট- **১৮৯৮** অ্যাক্ট-V, আইনের মূল বিষয়- , লুনাটিক প্রিজনার অ্যাক্ট- **১৯০০** , আইনের মূল বিষয়বস্তু, পাগল আইন ও পাগলের আইনগত অধিকার, পাগল যখন সাক্ষী, অপরাধের দায় থেকে পাগলের অব্যাহতি, পাগলের জামিন পাবার অধিকার, পাগলের চুক্তি করার অধিকার, পাগলের বিবাহ করার অধিকার, দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট – **১৯১২** - ৪নং আইন , লুনাসি অ্যাক্ট সম্পর্কিত সমসাময়িক চিঠিপত্র ,উন্মাদ আইনের প্রভাব, উন্মাদ আইনের তাৎপর্য ও বিশ্লেষণ।

**পঞ্চম অধ্যায় : ঔপনিবেশিক বাংলায় উন্মাদ রোগের চিকিৎসা**
(১৮০০ খ্রীঃ -১৯৪৭ খ্রীঃ) পৃষ্ঠা ৩৫৩- ৪৬৫

পাগল সম্পর্কে ধারনা ও চিকিৎসা, মধ্যযুগীয় সমাজে মানসিক ব্যাধি, বিশ্ব প্রেক্ষাপটে উন্মাদ রোগ চিকিৎসা - আধুনিক যুগ মনোবৈজ্ঞানিক যুগ, বাংলার উন্মাদ আশ্রমে চিকিৎসা- উনিশ শতক, প্রাক-ঔপনিবেশিক আমল , সাইকিয়াট্রি ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া, উন্মাদপীড়ার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা, মেনকা দাসীর উন্মাদ পীড়ার ইতিবৃত্ত, উন্মাদের চিকিৎসা পদ্ধতির উদাহরণ , ব্রোমাইড-জাত নিদ্রা চিকিৎসা, উন্মাদ রোগ চিকিৎসার কেস-স্টাডি, পাগলামি নিরাময়ের-জল চিকিৎসা (হাইড্রোথেরাপি), উদ্মাদ রোগ ও দেশীয় চিকিৎসাবিধি, আয়ুর্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্রে উন্মাদের কারণ , আয়ুর্বেদশাস্ত্রে উন্মাদের শ্রেণী বিভাগ ও লক্ষ্মণ, আয়ুর্বেদ চিকিৎসা মতে উন্মাদরোগর কারন , উন্মাদ রোগের ঔষধ। সম্মোহন চিকিৎসা (হিপনোসিস থেরাপি), বিংশ শতকের পাগল চিকিৎসা ও পদ্ধতিগত রকমভেদ - সামাজিক চিকিৎসা , উন্মাদ চিকিৎসার বিবর্তন।

**সার্বিক মূল্যায়ন** পৃষ্ঠা ৪৬৬-৪৭৯

**পরিভাষা ও শব্দকোষ**

**পরিশিষ্ট** পৃষ্ঠা- I -XXIX

**তথ্যসুত্র ও গ্রন্থপঞ্জী** পৃষ্ঠা- XXX - LVIII

# পরিভাষা, শব্দকোষ ও টীকা-টিপ্পনি

- উপরি দোষ – ভৌতিক বিষয়
- ওঝার বাড়ি  - দেশীয় চিকিৎসক
- কবিরাজ –  আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক
- কুফরি কালাম – কালা যাদু
- ক্ষ্যাপা – পাগল
- ঝাড় ফুঁক – মন্ত্র তন্ত্র
- ফিট লাগা -  অজ্ঞান হওয়া
- মাতন – মত্ত হওয়া / পাগল হওয়া
- মাথার ছিট-  স্বল্প মানসিক রোগী
- মৌলানা –  মুসলিম সমাজে ধর্মবিদ
- জ্বিনে পাওয়া – মুসলিম সমাজে প্রচলিত লোকবিশ্বাস অনুযায়ী পাগল হওয়া
- পানি পরা – ফকির সাধনায় এক বিশের প্রকার জল
- পীর –  বয়োজ্যেষ্ঠ / সূফী গুরু বা আধ্যাত্মিক শিক্ষক
- বাণ মারা – কালা জাদুতে ক্ষতি করা
- বাতাস লাগা – ভৌতিক নজর
- বাতুল – পাগল / মত্ত
- ভুতে ধরা – পাগল হওয়া ( গ্রাম বাংলায় প্রচলিত লোক বিশ্বাস )/ অদৃশ্য আত্মা-বিশেষ
- তাবিজ/ মাদুলি -  প্রতিরক্ষামূলক ধর্মীয় প্রার্থনা /  বাহুর এক প্রকার অলঙ্কার
- তুকতাক-  বশীকরণ ক্রিয়াকলাপ
- চিন্তা দোষ – মনের রোগ / মনের বিকার
- চন্দ্রাহত- পাগল

## সংক্ষেপিকরণ

ILA – Indian Lunacy Act

IOR – India Office Record

WBSA – West Bengal State Archive

NAI – National Archive of India

IJP- Indian Journal of Psychology

# ভূমিকা

কাণ্ডজ্ঞানহীন, বিকৃতমস্তিষ্ক, উন্মাদ- সহজ বাংলা ভাষায় পাগল। যুগ যুগ ধরে ওরা কেমনভাবে আলোচিত বা সমালোচিত। সমাজবিদ্যাচর্চার দুর্ভাগ্য ওরাও লেখেনি ওদের ইতিহাস ! পাগল ! যাদের কথাবার্তা বা নীরবতা সভ্যসমাজের দৃষ্টিতে অসমীচীন, নিরর্থক বা হাস্যকর। আবার বাহ্যিক আচরণ স্বভাবসিদ্ধ নয়। সভ্যসমাজের দৃষ্টিতে বিকৃত মস্তিষ্কের বহিঃপ্রকাশ। সমাজ ও সভ্যতা মনে করে যাদের মনের মধ্যে অন্যরকম এক অবস্থা সৃষ্টি করেছে কিংবা যাদের প্রকৃতিগত প্রবৃত্তি সমাজের কাছে যুক্তিহীন , বা ননসেন্সদের মতো। তাদের এসব আচরণ, আত্মভাব ও অঙ্গস্বভাব সম্পর্কে সভ্য মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি কী হতে পারে , তা আমরা সবাই জানি। কারও দৃষ্টিতে এরা মানসিক রোগী, কারও দৃষ্টিতে এরা উন্মাদ। হয়তো ওরা অপেক্ষাকৃত বেশ ক্ষিপ্ত কিংবা বিনয়ী। তাই তাদের অযৌক্তিক কথোপকথন শুনতে ও নীরব আচরণ বুঝতে রাজী নয় সভ্য মানুষ। তাই এদের স্থান পাগলাগারদে কিংবা কোনো এক মানসিক হাসপাতালে। সুদূর অতীত থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত এরা এভাবেই মানুষের কাছে অবহেলিত হয়ে আসছে বারং বার। যাইহোক, হয়তো ওরা অস্বাভাবিক, উন্মাদ, কাণ্ডজ্ঞানহীন কিংবা ননসেন্স। যা-ই বলা হোক না কেন, আপাতত 'পাগল' শব্দটির উপর ভিত্তি করেই সমাজবিদ্যাচর্চায় ঔপনিবেশিক বাংলায় পাগলদের ইতিহাস আলোকপাত করা অবশ্যই দরকার।

## গ্রন্থ পর্যালোচনা :

গবেষণার প্রাথমিক পর্বে যে সমস্ত গ্রন্থগুলি অধ্যায়ন করার চেষ্টা করেছি সেগুলি হল বিনোদ বিহারী সংকলিত *“পাগল”* নামক গ্রন্থ, অতুল কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের *“পাগলের হাট”* শিবশঙ্কর শ্রেণীর “পাগলের কথা” , শ্রী দীননাথ ভট্টাচার্যের *“পাগলের মনের কথা ”*, আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিচিত্র প্রবন্ধ *“পাগল”* , সোমদত্তের *“পাগলিনী কথা”* গৌতম হালদারের *“না মানার পাগলামি”* শান্তি সম্পাদিত গ্রন্থ *“পাগলী”*, শ্রী নগেশ চন্দ্রের *“উন্মাদ মন”* , চৈতন্য কুমারের *“পাগল ও পাগলামি”* , অরুন ঘোষের *“অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান”* , নিহার রঞ্জন রায়ের *“ অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান ”*, ধীরেন্দ্রাথ গাঙ্গুলি *“ মনের বিকার”* ইত্যাদি গ্রন্থ গুলি সহায়তা পেয়েছি।

সাম্প্রতিক বিশ্ব পেক্ষাপটে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাগলামি ও পাগল চিকিৎসার ইতিহাস নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা হয়েছে। তেমনি দক্ষিণপূর্ব এশিয়া তথা ভারতীয় উপমহাদেশেও পাগলামির ইতিহাস ভারতীয় ও অভারতীয় ঐতিহাসিকরাও করেছেন, নতুন নতুন চিন্তাভাবনার পেক্ষিতে পাগল চিকিৎসার ইতিহাসকে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোকপাত করেছেন। বিদেশের বিভিন্ন গবেষণা কর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আন্ড্রু স্কাল এর ; *"ম্যাডনেস ইন সিভিলাইজেশনঃ অ্যা কালচারাল হিস্ট্রি অফ ইন্সানিটি"* , *"ম্যাডনেসঃ অ্যা ভেরি শর্ট ইন্ট্রোডাকশন"*, (*Madness : A very short introduction)* ও *'Order and mental disorder'*, নাইজেল গিবসন সম্পাদিত একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ডি-কলোনাইজিং ঃ দ্য সাইক্রিয়াট্রি রাইটিং অফ ফ্রানস ফ্যানন *(Decolonizing Madness ঃ The Psychiatric Writings of Frantz Fanon, Palgrave Macmillan, ২০১৯),* আবার ড্যারিয়ান লিডার এর 'হোয়াট ইস ম্যাডনেস? *(What is Madness?),* রয় পোটার এর "ম্যাডনেসঃ অ্যা ব্রিফ হিস্ট্রি" *(Madness: A brief history, Routledge, London),* পেট্টিরি পিয়েটিকাইনেন এর "ম্যাডনেসঃ অ্যা হিস্ট্রি" *(Madness : A History)*, এবং টমাস স্টিফেন শাজজ এর ইনসানিটিঃ দ্য আইডিয়া অ্যান্ড ইডিয়ট কন্সিকয়েন্স *(Isanity : the idea and idiots Consequences)* ইত্যাদি গ্রন্থ গুলি থেকে প্রাথমিক পর্যায়ে সমৃদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করেছি । উক্ত গ্রন্থ গুলি বর্তমান পাগলামি চর্চার ইতিহাস কে একটি নুতুন মাত্রা দিয়েছে । এমনটা নয় যে বর্তমানে পাগলামির ইতিহাসচর্চায় বিবর্তনবাদী , দৃষ্টবাদী এবং সংকোচনবাদী ( রিডাকশনিস্ট ) ইতিহাসচর্চা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে কিংবা পূর্বে যারা পাগলামির ইতিহাস লিখছেন তাদের গবেষণা কর্ম গুলি যে কম গুরুত্বপূর্ণ তেমন নয় , কিন্তু এটাও সত্য ফ্রানস ফ্যানন ও অ্যান্ড্রু স্কাল গবেষণা কর্মের ফলে ফুকোর কাজের যে প্রভাব অনেকটা কমে গেছে এবং পাগলামি ইতিহাসচর্চার ওপর একটি নতুন প্রভাব পড়েছে, তা হল ফ্যানন ও স্কাল এর চিন্তা ভাবনার পর পাগলদের ইতিহাসে একধরনের ছেদ বা ব্রেক সৃষ্টি করেছে পরবর্তী গবেষকদের কাছে। যে ধরনের প্রশ্নগুলি ঘিরে মনোচিকিৎসার ইতিহাসগুলি নির্মিত হয়েছে তা কোন এক 'সত্য' কে বাস্তবসম্মত এবং প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপিত করার জন্য পাগলামি ইতিহাসচর্চার সাবেকি পদ্ধতিকেই প্রশ্ন করেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ফ্রানস ফ্যাননʼএর 'ডি-কলোনাইজিং ম্যাডনেস'ও অ্যান্ড্রু স্কাল এর '*ম্যাডনেস ইন সিভিলাইজেশন*' এর ভাষ্য আগমনের পর একবিংশ শতকে পাগলাগারদ ও পাগলামির ইতিহাসচর্চা পালটে গিয়েছে। ইতিপূর্বে বিভিন্ন গবেষণা কর্মগুলি ছিল একধরনের বিবর্তনবাদী ইতিহাস, যা শুধুই বর্ণনা করে .গেছে অ্যাসাইলাম চর্চাকে সংগঠিত করা ও তার প্রাতিষ্ঠানিক গল্প ,কিন্তু পরবর্তীকালে যা সাইক্রিয়াটির ডিসিপি হিসাবে কিভাবে বিকশিত হয়েছিল তা আলোচনায় একান্ত উপজীব্য বিষয় , অর্থাৎ কীভাবে আমরা পাগল সম্পর্কে ভৌতিক ধারনা (ভূত, প্রেত কিংবা এভিল থট) থেকে সাম্প্রতিক মানসিক স্বাস্থ্যের ধারণায় এসে পৌছেছি এক প্রগতির পথ বেয়ে। ফ্রানস ফ্যানন ও অ্যান্ড্রু স্কাল এই ধরনের ঐতিহাসিক আখ্যানের প্রতি গুরুতর প্রশ্নই তোলেননি, বরং এমন কতগুলি সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছিলেন যার প্রভাবে আজ মানসিক হাসপাতাল ও সাইক্রিয়াটির ইতিহাস রচনায় অনেক নতুন প্রশ্ন উঠে এসেছে।

আবার এইও সত্য উপনিবেশবাদের চরিত্র বোঝার কাজটি অবশ্য অতটা সরল নয় । কারণ ঔপনিবেশিক স্বাস্থ্যের কর্ণধারদের বিভিন্ন বিবরণীগুলিকে কীভাবে পাঠ করতে হবে সে বিষয়টি জটিল। এছাড়াও দেখতে হবে সেইসব যোগাযোগ বা সম্পর্কগুলি যেখানে স্থানীয় প্রতিরোধ প্রতিবাদ সমঝোতা কাহিনি নানাভাবে বিবৃত হয়েছে । সর্বোপরি এসে পড়ে ঔপনিবেশিক উন্মাদ আশ্রম ও মনশ্চিকিৎসার সঙ্গে সম্পর্কের বিবরণীগুলি কোন অবস্থান থেকে বিশ্লেষন করা হচ্ছে। কারণ, ক্ষমতার প্রতিষ্ঠান ও তার বিন্যাসগুলিকে শনাক্ত না করে উপনিবেশবাদের চরিত্র নির্ণয় বোধহয় মুশকিলের কাজ।

ইতিপূর্বে উন্মাদ আশ্রম নিয়ে যে চর্চার কথা অলোচিত হয়েছে তা পাশ্চাত্য মনশ্চিকিৎসার ক্ষমতাকে মেনে নেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিংবা আলোচিত হয়েছে এই নব বিজ্ঞানের সুযোগ থেকে নেটিভ মনঃচিকিৎসক দের বঞ্চিত করে রাখার কথা । পশ্চিমের রচনাগুলির প্রধান উদ্দেশ্য, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে তাদের প্রগতির কাহিনি-বলয় তৈরি করা , তাই শহরের প্রান্তদেশে বা গ্রাম বাংলার মফঃস্বলে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য মনশ্চিকিৎসা ব্যবস্থার ইতিহাসগুলি আমাদের পিছিয়ে থাকা অবস্থার প্রতিনিধিত্বকারী বর্ণনা হিসাবেই রচিত হয়। কিন্তু এই পশ্চিমি বিজ্ঞানকে আমরা যেভাবে গড়েপিটে নিয়েছি ঔপনিবেশিক কালে, তার মধ্যেও রয়েছে ভারতীয় মৌলিক চিন্তার অস্তিত্ব , যা সেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের তত্ত্ব দিয়েই তাকে প্রশ্ন করেছে। আশিস

নন্দী প্রথম ভারতীয় সাইকো-অ্যানালিস্ট ডা. গিরীন্দ্রশেখর বসুর জীবনকে কেন্দ্র করে এই নব বিজ্ঞানচর্চার বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন । তিনি দেখিয়েছেন , কীভাবে গিরীন্দ্রশেখর ফ্রয়েডের সময়কালে , তার প্রথম অনূদিত গ্রন্থ পড়ার আগে থেকেই এ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠেন এবং মনঃসমীক্ষণের তত্ত্বে তার মৌলিক চিন্তার উন্মেষ ঘটান । শ্রী নন্দী দক্ষতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন গিরীন্দ্রশেখরের জীবনী ও কাজকে ; পাশাপাশি আর এক ইউরোপীয় মনঃসমীক্ষক ডা .বার্কলে হিলকে রেখে । ১৯০৭ সালে , অক্সফোর্ড মেডিক্যাল স্কুলের গ্র্যাজুয়েট বার্কলে হিল যখন ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসে যোগ দেন , তার আগেই তিনি ফ্রয়েডের জীবনীকার - শিষ্য আর্নেস্ট জোন্স - এর কাছে সাইকোঅ্যানালিসিস - এর প্রশিক্ষণ শুরু করেছিলেন । সম্ভবত গিরীন্দ্রশেখরের কাছে তিনি এই প্রশিক্ষণ শেষ করেন ।

অধ্যাপক নন্দীর তাঁর *"At the Edge of psychology: essays in political and culture"* (Oxford, ১৯৯০) গ্রন্থে দেখিয়েছেন হিল- এর পাশ্চাত্যধর্মী অ্যাগ্রেসিভ সাইকোঅ্যানালিসিস এর পাশাপাশি গিরীন্দ্রশেখরের মৌলিক জ্ঞানচর্চার উপাদানগুলি । তাই গিরীন্দ্রশেখরকে নন্দী আক্ষেপ্তক ব্যঞ্জনায় বলেছেন ' স্যাভেজ ফ্রয়েড ; মনঃসমীক্ষণের যে মৌলিক তত্ত্ব ঔপনিবেশিক ভারতের মনোবিজ্ঞানচর্চায় রহযড়ঁংব পৎরঃরয়ঁব হিসাবে চর্চিত ছিল তাকে তিনি প্রভুত্বকারী ন্যারেটিভ ' এর এক গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন । নন্দী ছাড়াও অধ্যাপক সুধীর কাকর ওঝা , গুণিন , পীর , জ্যোতিষী ইত্যাদি দের সাথে দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের বিবরণী থেকে **বিশ্লেষন**করেছেন ভারতীয় সাইকোথেরাপির নানান বৈচির্ত্যপূর্ণ অথচ স্বতন্ত্র ধারাগুলির অস্তিত্ব , যা ঔপনিবেশিক চিকিৎসার নিয়ন্ত্রণকে উপেক্ষা করেও আজ টিকে আছে তার কার্যকারিতার গুণে । দেবোরা পুলে ভট্টাচার্য আলোচনা করেছেন বাংলার পটভূমিক্তে পাগলামির প্রত্যয় ( concept ) ও তার সামাজিক - সাংস্কৃতিক অর্থ নিয়ে । এবং তিনিও বলেছেন মনশ্চিকিৎসার ইতিহাসে বাংলায় তার বহুত্ববাদী ( pluralistic ) প্রয়োগের কথা । মনশ্চিকিৎসায় রোগের বর্গ বিভাজন বা ক্যাটাগরি ফরমেশন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সামাজিক মনশ্চিকিৎসাবিদ অজিতা চক্রবর্তী মন্তব্য করেছিলেন যে : নানান সংশোধন সত্ত্বেও মনশ্চিকিৎসার প্রধান ধারাটি দৃঢ় ভাবে প্রোথিত রয়েছে ক্রেপলিনের উনবিংশ শতকের

বিভাগীকরণে সেখানে একটি কেন্দ্রীয় বিন্যাস ( central pattern) - এর মধ্যে পশ্চিমের অসুস্থতাগুলিকে স্ট্যান্ডার্ড ধরা হয় এবং স্থানীয় বিন্যাস ( local pattern ) - গুলিকে তার সামান্য পরিবর্তিত রূপ ( minor variations ) বলে মেনে নেওয়া হয় । তাই আজ , ঔপনিবেশিকতা আর মনশ্চিকিৎসার ইতিহাসচর্চা করতে গেলে , ভারতীয় ঔপনিবেশিক তথা আধুনিক মননে যে বিভিন্ন দ্বন্দ্বগুলি আকীর্ণ হয়েছিল তার খোঁজ করার মতন জটিল কাজগুলিকে এড়িয়ে যাবার কোনো উপায় নেই । এমনকি বর্তমান সময়ে যে বিতর্ক সামাজিক - মনশ্চিকিৎসা ও মনোবিজ্ঞানে উঠেছে এই প্রভুত্বকারী জ্ঞানচর্চার উদ্দেশ্য এবং প্রভাবকে নিয়ে , তার সূত্রগুলিও উপ্ত রয়েছে ঔপনিবেশিক সময়কালে ।

মনশ্চিকিৎসার ইতিহাসে দেখা যায় যে, কীভাবে উনিশ শতকের প্রথন পর্ব থেকে ভয়ানক সব পদ্ধতির মধ্য দিয়ে একটি আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক সম্মত মনোশ্চিকিৎসার জন্ম হয়েছিল । দেখা যায় যে, উনিশ শতক থেকে বিংশ শতকের প্রথম দশক অবধি বীভৎস অবস্থার মধ্যে একের পর এক পরিক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে পাগলদের জীবন কে অতিবাহিত করতে হয়েছিল , এমনকি চিকিৎসার নামে উন্মাদ আশ্রমে পাগলদের কে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখার রেওয়াজ চালু ছিল । প্রথম দিকে মনে করা হতো মানসিক রোগ সারানো যায় না এবং আরও একটি ধারণা যে মানসিক রোগীদের বাহ্যিক আচরণ তাদের ভিতরের দুর্বলতা ও ভিত্তিহীনতার বহিঃপ্রকাশ ।একশো বছর পূর্বে ঔপনিবেশিক বাংলার বিভিন্ন উন্মাদ আশ্রমের নথিপত্রে দেখা যায় যে পাগল্দদের প্রতি চিকিৎসাব্যবস্থার নামে বিভিন্ন রকমের অবজ্ঞা ও বর্বর আচরণ করা হত, আবার দেখছি পাগলামির কারণ ও চরিত্র সম্বন্ধে ভুল ও ধোঁয়াটে ধারণা। মানসিক রোগে আক্রান্তদের প্রতি সংবেদনহীন , খাপছাড়া , এমনকি ক্ষতিকর সব চিকিৎসাপদ্ধতি যা তাদের অবস্থাকে আরও দুর্বিষহ করে তুলেছিল । বাংলায় উন্মাদআশ্রম বা অ্যাসাইলাম গড়ে তোলার বিষয়টি ঔপনিবেশিক সরকারের সঠিক পদক্ষেপ ছিল ঠিক-ই এবং মনশ্চিকিৎসার পেশাকে একটি সঠিক দিকে পরিচালিত করলেও চিকিৎসার নামে শাসন ক্ষমতা কায়েম করার বিষয়টিও কখনই আড়াল করা যায় না।

## গবেষণার ক্ষেত্র পরিসর ও সুযোগ

ঔপনিবেশিক স্বাস্থ্যব্যবস্থায় গড়ে ওঠা বাংলার পাগল ও পাগলাগারদের ইতিহাস নিয়ে খুব বেশি গবেষণা ইতিপূর্বে হয়নি । যদিও এ প্রসঙ্গে দেবযানী দাস'এর *" হাউজেস অফ ম্যাডনেস "* (অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ২০১৫ ) নামক গবেষণা গ্রন্থটি খুবই উলে-খযোগ্য,উক্ত গ্রন্থে তিনি উনিশ শতকের উপর উন্মাদ আশ্রম গুলি স্বল্পপরিসরে উপস্থাপন করেছেন। এছারাও ভারতীয় অ্যাসাইলামগুলি নিয়ে কিছু লেখা ভারতীয় ও অ-ভারতীয় গবেষকরা প্রকাশ করেছেন। যদিও ঐ প্রবন্ধ গুলিতে পাশ্চাত্য মনশ্চিকিৎসার নতুন বিশেষণে ভারতীয় মন কীভাবে ক্যাটেগরিভুক্ত হল সে নিয়ে আলোচনা প্রায় নেই । ছন্দক সেনগুপ্ত অবশ্য মনশ্চিকিৎসার আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা করেছেন কলকাতার প্রেক্ষাপটে, কিংবা ওয়াল্ট্রড আরনস্ট- এর নেটিভ উন্মাদ আশ্রমের প্রবন্ধ মূলক গবেষণা খুবই উল্লেখযোগ্য । কিন্তু উনিশ শতকে বাংলায় উন্মাদ আশ্রমের প্রতিষ্ঠার যে যাত্রাপথ হয়েছিল তার পরিপূর্ণতা বিকশিত হয়েছিল বিংশ শতকের প্রথম অর্ধ-কালীন সময়ে অর্থাৎ উন্মাদ আশ্রম থেকে মানসিক হাসপাতালে যে উত্তরণ তা ঔপনিবেশিক বাংলার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ  ক্ষেত্র। কিন্তু এই বিষয়টি নিয়ে আজ অবধি কোন পূর্ণাঙ্গ কোন গবেষণা হয়নি।

আবার অনুস্কা ভট্টাচার্যের "ইন্ডিয়ান ইনসেন" (হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়,২০১৩) গবেষণায় ভারতীয় পাগলদের নিয়ে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক আলোচনা করেছেন তবে সেক্ষেত্রে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি আলোচনা খুব সামান্য ভাবে তুলে ধরেছেন, আবার সারাহ পিনটো'র "মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির উন্মাদ আশ্রম" ( ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়,২০১৭) নিয়ে গবেষণা করেছেন, ভারতের উন্মাদনা নিয়ে বিভিন্ন গবেষণামূলক কাজগুলি উলে-খযোগ্য ,কিন্তু উক্ত গবেষণা গুলিতে উন্মাদনার ইতিহাস নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা হলেও লুনাসি অ্যাক্ট তথা পাগল আইন নিয়ে কোন ভাবেই সম্পূর্ণ আলোচনা হয়নি , অর্থাৎ উন্মাদ আইনের ইতিহাস ও ঔপনিবেশিক বাংলার জনসমাজে তার প্রভাব নিয়ে এখনো অবধি কোন গবেষণা হয়নি। এই প্রেক্ষিতে বলা যায় ১৮৫৮ খ্রীঃ থেকে ১৯১২ খ্রীঃ পর্যন্ত সময়ে এদেশীয় সমাজে পাগলদের জন্য যে বিভিন্ন আইন তৈরি হয়েছিল সে বিষয়ে একটি বৃহৎ ক্ষেত্র বা গবেষণার জায়গা আছে । কিন্তু আজ অবধি উক্ত বিষয়ে কোনোরূপ পরিপূর্ণ গবেষণা হয়নি । তাই বাংলার পাগল ও পাগলা গারদের ইতিহাসে উন্মাদ আইনের বিষয়েটি আলোচনা খুব-ই প্রাসঙ্গিক।

এইসব গ্রন্থগুলিতে যেসব বক্তব্য বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সেগুলি হলঃ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান ঔপনিবেশিক বাংলায় পাগলদের উপর ক্ষমতা বিস্ত্ড়র করেছিল , পাগল চিকিৎসায় বিজ্ঞান অর্থনৈতিক লক্ষ্য পূরণে কীভাবে ব্যবহৃত হয় , দেশীয় মানুষ বিজ্ঞানকে কীভাবে গ্রহণ করে এবং ইংরেজ শাসনকালে সরকারের বিজ্ঞাননীতি কোন পথে চালিত হয়েছিল ইত্যাদি (ওয়ালট্রড আরনস্ট)। ঔপনিবেশিক চিকিৎসা বিজ্ঞানচর্চাকে দীপক কুমার বর্ণনা করেছেন ‘নির্ভরশীল বিজ্ঞান’ বলে। ভারতবর্ষের সে সময়কার চিকিৎসা বিজ্ঞানচর্চা ছিল সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত , ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে বিজ্ঞানচর্চার উপর চার্লস ফরম্যান গবেষণা বিতর্কের সূচনা করেন (*Science for Empire* , 1940) , তার সূত্র ধরে ডোনাল্ড ফ্রেমিং কানাডা অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস রচনায় আগ্রহী হন। ফ্লেমিং- এর বক্তব্য হল: ইউরোপীয় বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তথ্যসংগ্রহ করতেন ইউরোপে বসে, এবং সংগৃহীত তথ্য থেকে তারা তাদের চিকিৎসা বিজ্ঞান কে সমৃদ্ধ করতেন।

আবার ঔপনিবেশিক চিকিৎসা ব্যবস্থার কৃৎকৌশলে কীভাবে ভারতীয় মন বাঁধা পড়ে ও সুস্থ আচরণ এর বিধি - ব্যবস্থা তৈরি হয় , তা আলোচিত হয়নি । ছন্দক সেনগুপ্তর তাঁর দীর্ঘ আঞ্চলিক ইতিহাসের বিবরণীতে নেই তাদের কথা । কীভাবে এই মানসিক রোগী ও তাদের বাড়ির লোকেরা প্রচলিত পূর্ববর্তী চিকিৎসা পদ্ধতিগুলি থেকে সরে আসছিলেন , আর কেনই বা সরে আসছিলেন ? কীভাবে আমাদের বৈচির্ত্যময় স্থানীয় পদ্ধতিগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা হচ্ছিল এবং সেগুলিকে অ-বৈজ্ঞানিক হিসাবে জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ করা হয়েছিল? কিন্তু অনন্যাও গবেষণার বাংলার উন্মাদ আশ্রম ও ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের চরিত্র ও তাদের লক্ষ্য আসলে কি ছিল এই নিয়ে তেমন কোন পরিপূর্ণ আলোচনা নেই বললেই চলে।

বাংলার সমাজ জীবনের চিকিৎসা ব্যবস্থার বিভিন্ন আঙ্গিক নিয়ে কয়েকটি কাজ খুবই উল্লেখযোগ্য , যে গুলি হল সুব্রত পাহারীর “ *উনিশ শতকের বাংলার সনাতনী চিকিৎসা ব্যবস্থার সরূপ* ” (২০০৩), বিনয় ভূষণ রায়- এর “ চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস” (২০০৫), সাম্প্রিতিক সুজাতা মুখার্জি “জেন্ডার মেডিসিন এন্ড সোসাইটি ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া”(২০১৭) উক্ত গবেষণা মূলক গ্রন্থে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতীয় চিকিৎসা ও ঔপনিবেশিক চিকিৎসা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে। কিন্তু পাগল চিকিৎসার ইতিহাস সম্পর্কে কোনরূপ আলোচনা নেই বললেই চলে। যদিও

দেবযানী দাস এর *হাউজেস অফ ম্যাডনেস* তার গবেষণা কর্মে উনিশ শতকে আশ্রমিক পাগল চিকিৎসা সম্পর্কে স্বল্প পরিসরে বিশ্লেষন করেছেন। আবার বিদেশী ঐতিহাসিক দের মধ্যে ওয়াল্ট্রড আরনস্ট , সারাহ পিন্টো কিংবা দেবোরা ফুলে এর প্রমুখ তাদের ভারতীয় উন্মাদ আশ্রম বিষয়ক গবেষণায় আশ্রমের বিষয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করেছেন।

এতদ সত্ত্বেও ঔপনিবেশিক বাংলার পাগল চিকিৎসার ইতিহাসে কোথাও একটা অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে । শুধুমাত্র ড. দাস এর হাউসেস অফ ম্যাডনেস : ইনস্যানিটি এন্ড অ্যাসাইলাম অফ বেঙ্গল ইন নাইন্টিথ সেঞ্চুরি ইন্ডিয়া (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৫) নামক শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থে তিনি উনিশ শতকে উন্মাদ আশ্রমের পাগল চিকিৎসা ক্ষেত্রে মোরাল থেরাপি , মেডিক্যাল ট্রিটমেন্ট , বাথ-থেরাফি , অকুপেশানল থেরাফি , শিক্ষা ও খেলাধুলা মাধ্যমে চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে স্বল্প পরিসরে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু বাংলায় পাগলের চিকিৎসার যে সার্বিক চিত্র তা শুধুমাত্র উক্ত কয়েকটি চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না , অর্থাৎ উন্মাদ রোগ চিকিৎসার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ড. দাস এর গবেষণায় অপূর্ণ থেকে গেছে । সেগুলি হল উন্মাদ রোগ চিকিৎসার দেশীয় ধারা তথা আয়ুর্বেদ পদ্ধতিতে উন্মাদ চিকিৎসার ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণার একটি সুবিশাল ক্ষেত্র পরিসর আছে। আবার উন্মাদ রোগ নিরাময়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কেমন ছিল সেটিও অনালোচিত । সর্বোপরি কিভাবে উনিশ শতকের পরবর্তী কালে বিশেষ করে বিংশ শতকের প্রথম অর্ধকালীন সময় পর্যন্ত পাগল চিকিৎসার ক্ষেত্রে কি কি পরিবর্তন এসেছিল সেগুলি আলোকপাত করা প্রয়োজন। বাংলায় উনিশ শতকে উন্মাদ আশমের যাত্রা পথের মধ্য দিয়ে বিংশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে পাগল চিকিৎসার পদ্ধতি ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে চালিত হয়েছিল অর্থাৎ এই পর্যায়ে পাগলামি চিকিৎসার ক্রমবিকাশ লাভ করেছিল। অর্থাৎ উনিশ শতকে বাংলায় উন্মাদ আশ্রমের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যে যাত্রাপথ হয়েছিল তার পরিপূর্ণতা বিকশিত হয়েছিল বিংশ শতকের প্রথম অর্ধ-কালীন সময়ে। এক কথায় উন্মাদ আশ্রম থেকে মানসিক হাসপাতালে যে উত্তরণের মাধ্যমে মনোচিকিৎসায় আমূল পরিবর্তন এসেছিল । এই উত্তরণের পর্ব টি ঔপনিবেশিক বাংলার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র, কিন্তু এই বিষয়টি নিয়ে আজ অবধি কোন পূর্ণাঙ্গ কোন গবেষণা হয়নি। তাই উক্ত বিষয়গুলি আলোচ্য গবেষণায় ইতিহাসের প্রেক্ষিতে আলোকপাত করার চেষ্টা করবো।

**সময়কাল**

আলোচ্য গবেষণা কার্যের সময়-কাল হিসাবে ঔপনিবেশিক অধ্যায় কে নির্বাচিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উনিশ শতক থেকে স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত নির্ধারিত করা হয়েছে। অর্থাৎ ১৮০০ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই কাল পর্বের মধ্যে ঔপনিবেশিক বাংলার সমাজ পাগলদের কিভাবে দেখা হতো তা অনুসন্ধান করা ।

**অধ্যায় বিভাজন :**

ঔপনিবেশিক বাংলায় পাগল,পাগলাগারদ ও সমাজ (১৮০০-১৯৪৭ খ্রীঃ) নামক শীর্ষক শিরোনামাঙ্কিত গবেষণা অভিসন্দর্ভটি প্রধানত ৫ টি অধ্যায়ে বিভক্ত। যথা-

**প্রথম অধ্যায়**- ঔপনিবেশিক সমাজে বাংলার পাগল ।

**দ্বিতীয় অধ্যায়**- ঔপনিবেশিক বাংলার উন্মাদ আশ্রম (১৮০০-১৯০০ খ্রীঃ)

**তৃতীয় অধ্যায়**- পাগলাগারদ থকে মানসিক হাসপাতালে উত্তরন (১৯০০-১৯৪৭খ্রীঃ)

**চতুর্থ অধ্যায়**- উন্মাদ আইনের ইতিহাস ও সরূপঃ ঔপনিবেশিক বাংলায় তার প্রভাব (১৮৫৮-১৯১২ খ্রীঃ)

**পঞ্চম অধ্যায়**- উন্মাদ রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি ।

**গবেষণামুলক প্রশ্নঃ**

আলোচ্য গবেষণায় প্রাথমিক ভাবে যে অনুসন্ধান মুলক প্রশ্ন প্রাধান্য আরোপ করার চেষ্টা করেছি সেগুলি হল, যথা-

**প্রথমতঃ** ঔপনিবেশিক সমাজে পাগলদের কে কিভাবে দেখা হতো? বিশেষ করে রাষ্ট্র পাগলদের কেমন ভাবে দেখত ? অর্থাৎ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কে পাগল? কারা পাগল? কেন পাগল ? পাগল সম্পর্কে সমাজ সভ্যতার দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ? বাংলার ইতিহাসে

পাগলরা যুগ যুগ ধরে কিভাবে আলোচিত ? উনিশ শতকে বিশেষ করে নবজাগরণ পর্বে পাগল দের কিভাবে দেখা হত?

**দ্বিতীয়তঃ** ঔপনিবেশিক বাংলায় উন্মাদ আশ্রম প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য কি ছিল ? উন্মাদ আশ্রম প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে ঔপনিবেশিক বাংলায় সর্বাধিক উন্মাদ আশ্রম প্রতিষ্ঠা কেন হয়েছিল? ভিক্টরীয় নীতি, অনুশাসন ও অপর দিকে হিতবাদী দর্শনের যে প্রচার ঔপনিবেশিক শাসককুল করত তাঁর ফলপ্রসু কতটা হয়েছিল? না কি এই নীতি অনুশাসনের পশ্চাতে অন্য কোন দুরাভিসন্ধি কাজ করেছিল?

**তৃতীয়তঃ** উন্মাদ আশ্রম বা মানসিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দেশীয় ঐতিহ্য কতটা ভূমিকা পালন করেছিল? আবার উনিশ শতকে পাগলাগারদ থেকে মানসিক হাসপাতালে উত্তরণ কিভাবে ও কেন হয়েছিল ? তা আনুসন্ধান করা।

**চতুর্থতঃ** ঔপনিবেশিক সরকার বাংলায় পাগলদের নিয়ন্ত্রন করার জন্য কি পদক্ষেপ গ্রহন করেছিল ? সেক্ষত্রে পাগল দের জন্য যে আইন তৈরি করা হয়েছিল সেই আইনের স্বরূপ কি ছিল? এবং পাগলের আইনগত অধিকারের তাৎপর্য কি ছিল ? সর্বোপরি ঔপনিবেশিক বাংলায় লুনাসি অ্যাক্ট বাংলার সামাজিক জীবনে কতটা প্রভাব বিস্ড়্র করেছিল ? তা ঐতিহাসিক পর্যালোচনার মাধ্যমে অনুসন্ধান করা। এছাড়াও আলোচ্য অধ্যায়ে বিশ্লেষনাত্বক  দৃষ্টিভঙ্গি তে যে বিষয়গুলি অনুসন্ধান প্রয়াস করা হয়েছে সে গুলি হল - .কেন এই আইন প্রণয়ন? .উন্মাদ আইন তৈরি করার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ছিল ? ঔপনিবেশিক সরকার উন্মাদ আইনের অন্তরালে কি কোনো শাসন ক্ষমতা চাপিয়ে দেওয়ার কোন দুরভিসন্ধি কাজ করেছিল ?

**পঞ্চমতঃ** ঔপনিবেশিক বাঙ্গালয় বাংলায় পাগলদের চিকিৎসার জন্য কি কি পদ্ধতি প্রচলিত ছিল ? সেক্ষেত্রে উন্মাদ রোগ চিকিৎসায় পশ্চিমী চিকিৎসা , ইউনানী চিকিৎসা ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কতটা ফলপ্রসু ছিল ? এছারাও পাগল চিকিৎসার ক্ষেত্রে কুসংস্কার আচ্ছন্ন যুগ থেকে কিভাবে মন চিকিৎসার যুগে বিবর্তিত হল তা অনুসন্ধান করা। সর্বোপরি

উন্মাদ চিকিৎসায় পশ্চিমীচিকিৎসা থেকে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি যে অধিক উন্নত ছিল তা যুক্তিনিষ্ঠ ভাবে প্রমান করার চেষ্টা ।

**উদ্দেশ্য ও বস্তুনিষ্ঠতা**

বস্তুনিষ্ঠ দর্শনের নিরীখে পাগল দের সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষনকরার প্রচেষ্টা , তবে এক্ষেত্রে পশ্চিমী চিন্তাভাবনা বর্জন করে প্রাচ্য-বাদী ভাবনায় ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন থেকে পাগলদের বাস্তবমুখী ইতিহাস উপস্থাপন করা। বিশেষ করে বাংলার সমাজে পাগল ও পাগলামির বহুত্ব ধারনা কে কেন্দ্র করে সামাজিক ও ক্লিনিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করার প্রয়াস । পশ্চিমী জ্ঞানচর্চার থেকে আলাদা ভাবে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে পাগলদের ইতিহাস কিভাবে আলোকপাত করা যায় তার একান্ত প্রচেষ্টা করা। বিশেষ করে বাংলার সামাজিক জীবনে পাগলদের বহুত্ব ধারনার সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করা, পাশাপাশি উন্মাদ রোগের চিকিৎসায় পশ্চিমের চিকিৎসা পদ্ধতি অপেক্ষা ভারতীয় চিকিৎসা যে অধিক উন্নত ছিল তার যুক্তিনিষ্ঠ প্রমাণ করার চেষ্টা ।

**গবেষণা পরিকল্পনা ও পদ্ধতি**

ঔপনিবেশিক বাংলার পাগল ও পাগলাগারদের ইতিহাস শিরনামাঙ্কিত গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকসম্মত ইতিহাস পদ্ধতি অনুসরণ করে তথ্য সংগ্রহ , তথ্য বিশ্লেষন, ক্ষেত্র সমীক্ষা, মনবিদের সহিত সাক্ষাৎকার, কালানুক্রমিক পদ্ধতিতে সরনী ও দুর্লভ চিত্র ব্যবহারের মাধ্যমে গবেষণার আকার ও অবয়ব রচনা করার চেষ্টা করেছি । গবেষণা অভিসন্দর্ভের প্রস্তুতি ও গবেষণায় তথ্য বিন্যাসে প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এছাড়াও গবেষণার আঞ্চলিক পরিভাষা ও শব্দ কোষ ,তথ্যসুত্রের প্রকার ভেদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও গৌণ উপাদান ইত্যাদি বিষয় সতর্কতার সঙ্গে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি।

**তথ্য সংগ্রহ**

বাংলার পাগল ও পাগলাগারদের ইতিহাস অন্বেষণের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকসম্মত উপায়ে বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের যথাসাধ্য সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন করেছি । পাগল নামাঙ্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রথম বিভিন্ন প্রাথমিক ও গৌণ উপাদানের উপর নির্ভর করতে হয়েছে । পাগল সম্পর্কিত সাহিত্যগত গ্রন্থ , পাগল সংক্রান্ত লোককথা,লোকগান,

সমসাময়িক দৈনন্দিন পত্রিকা , মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্রিকা , উন্মাদনা সংক্রান্ত আকরগ্রন্থ (সাহিত্য), সরকারি দলিল দস্তাবেজ, উন্মাদ আশ্রমের প্রতিবেদন (IOR,NAI,WBSA), মানসিক হাসপাতালের প্রতিবেদন, ক্ষেত্র সমীক্ষা, মনোবিদের সহিত সাক্ষাৎকার, ক্যালকাটা পুলিশ ফাইল , উন্মাদনা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকার লুনাসী অ্যাক্ট , বাক্তিগত চিঠি , পরিসংখ্যানগত তথ্য ও প্রতিবেদন , মানসিক হাসপাতালের দিনলিপি ,পাগল সংক্রান্ত কেস-স্টাডি ও সরকারি চিঠি, ও পত্রপত্রিকার বিভিন্ন বিজ্ঞাপন , সিনেমা , বিভিন্ন প্রকার চিত্র ও মানসিক আশ্রম পরিদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে আলোচ্য গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ।

### ক্ষেত্র সমীক্ষা

সমাজবিদ্যা গবেষণায় ক্ষেত্রসমীক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । এই উদ্দেশ্য কে সামনে রেখে পাগল ও পাগলা গারদ সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ ও বিভিন্ন মানসিক হাসপাতাল প্রতক্ষ্য পর্যবেক্ষনের জন্য যে সমস্ত সাইট গুলি পরিদর্শন করেছি সেগুলি হল- দমদমে অবস্থিত দত্তনগর মেন্টাল হসপিটাল (পূর্বনাম বঙ্গীয় উন্মাদ আশ্রম ) , ইনস্টিটিউট অফ সাইক্রিয়াটি কোলকাতা , পাবলভ ইনস্টিটিউট-কলেজস্ট্রিট , ইন্ডিয়ান সাইকো অ্যানালিক্যাল সোসাইটি- পার্শি বাগান লেন, কোলকাতা, মানকুন্ডু মেন্টাল হাসপাতাল ,হুগলী , ঢাকা উন্মাদ আশ্রম ( বর্তমান বাংলাদেশ) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান থেকে মানসিক রোগ ও তার চিকিৎসা সংক্রান্ত মেডিক্যাল গেজেট , পত্র-পত্রিকা ,বিভিন্ন জার্নাল ও দুর্লভ তথ্য সংগ্রহ করেছি । এছাড়াও বাংলায় সামাজিক জীবনে লোকধারনায় পাগলামি জ্ঞানের অধ্যায়নের জন্য পাগল পীরের দরগাহ- বারাসাত, ভবা পাগলার আশ্রম আগরপাড়া , পাগল চাঁদ সম্প্রদায়ের আশ্রম, গাইঘাটা ইত্যাদি স্থান গুলি থেকে পাগল ধারনা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেছি ।

### সাক্ষাৎকার

বাংলার উন্মাদ আশ্রম ও মানসিক হাসপাতালের ইতিহাস অনুধাবন ও বঙ্গদেশে মানসিক চিকিৎসার সুত্রপাত ও বিবর্তন ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ে অবগত হওয়ার জন্য কয়েকজন মনোবিজ্ঞানীর ব্যক্তিগত সাক্ষাতকারে প্রাপ্ত তথ্যের দ্বারা গবেষণার কাজকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছি। এক্ষেত্রে সর্বপ্রথমে উল্লেখ করা যেতে পারে বর্তমান পাভলভ ইন্সটিটিউশনের কর্ণধার

ও মানব মন পত্রিকার সম্পাদক ডাঃ বাসুদেব মুখোপাধ্যায়ের কথা , তিনি কোলকাতার মানসিক চিকিৎসা সংক্রান্ত ইতিহাসের তথ্য দিয়ে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন। ইনস্টিটিউট অফ সাইক্রিয়াটিক কোলকাতা কার্যনির্বাহী অধিকর্তা অধ্যাপক অমিত কুমার ভট্টাচার্য সহিত সাক্ষাত পর্বের দ্বারা ঔপনিবেশিক বাংলার ভবানীপুর উন্মাদ আশ্রম থেকে বর্তমান ইনস্টিটিউট অফ সাইকিয়াট্রি কিভাবে উত্তরণ হল তার ইতিহাস সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছি। দত্তনগর মানসিক হাসপাতালের কর্ণধার ডঃ অনিল ভূষণ দত্তের সহিত সাক্ষাত পর্ব দ্বারা বঙ্গীয় উন্মাদ আশ্রম সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছি । আবার বৈদ্যুতিন ডাকযোগের মাধ্যমে মনবিদ অমিতরঞ্জন বসু সহিত আলাপচারিতা ও কথোপকথন দ্বারা বাংলার পাগল ধারণা ও ক্লিনিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গিতে সম্পর্কে সমৃদ্ধ হয়ে গবেষণার অবয়ব নির্মাণ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।

## তথ্য বিশ্লেষণ

পাগল ও পাগলাগারদ শিরোনামাঙ্কিত গবেষণা অভিসন্দর্ভটি রূপায়নের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত উৎস ও সংগৃহীত তথ্য গুলি বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিকোণ থেকে ঐতিহাসিক অনুসঙ্গ বজায় রেখে সুক্ষাতিসুক্ষ ভাবে বিশ্লেষন করার চেষ্টা করেছি । বিশেষ করে বাংলার সম্পর্কিত ধারনা কে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মানসিক অসুস্থতার বহুত্ববাদী লোকধারনা মাধ্যমে বিশ্লেষন করা হয়েছে । পাগল ও পাগলামি ধারনা থেকে মানসিক অসুস্থতা কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে অর্থাৎ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ক্লিনিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গির যে যাত্রাপথ সেগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিশ্লেষন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি । আবার সাহিত্যগত উপাদানের উপর নির্ভর করে সেগুলি যৌক্তিকতা বিশে-ষিত হয়েছে। পাগলাগারদের ইতিহাস অনুধাবনের জন্য সংগৃহীত বিভিন্ন প্রাথমিক উপাদান ও সরকারি প্রতিবেদনগুলি সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে । এক্ষেত্রে তথ্যের সঠিক বিন্যাস ও বিশে-ষণের মাধ্যমে গবেষণা অভিসন্দর্ভের অবয়ব ও আকার দেওয়া হয়েছে । আবার কালানুক্রমিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে বাংলার বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত উন্মাদ আশ্রম গুলির প্রতিষ্ঠানভিত্তিক যে ইতিহাস সেগুলি আলোচিত করা হয়েছে । প্রাপ্ত তথ্যগুলি সর্বদা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রেখে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি ।

## গবেষণার সংক্ষিপ্তসার

পৃথিবীর সবদেশের ইতিহাসের মধ্যেই পাগলের উলে-খযোগ্য কাহিনীর বর্ণনা পাওয়া যায় । তখনকার দিনে এই ধরনের আচরণের সুচিকিৎসার কথা দূরের কথা , সেগুলির যথার্থ ব্যাখ্যাও মানুষের জানা ছিল না । ফলে সেই কুসংস্কারপূর্ণ ধারণা , অন্ধবিশ্বাস ও বিকৃত ব্যাখা এই ধরণের আচরণগুলি ঘিরে সাধারণের মনে গড়ে উঠেছিল । বহু ক্ষেত্রেই এগুলিকে শয়তান বা অপদেবতার প্রভাব থেকে সাত ঘটনা বলে মনে করা হত এবং অলৌকিক ক্রিয়া কলাপ , শান্তি প্রত্যায়ন , দেবতার তুষ্টির আয়োজন এবং অমানুষিক চিকিৎসা পদ্ধতির দ্বারা এগুলি দূর করার চেষ্টা করা হত । গবেষণার প্রথম অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে মুলত ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গিতে পাগলের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা অর্থাৎ ঔপনিবেশিক বাংলায় সমাজিক জীবনের পাগলকে কত রকম ভাবে দেখা হতো এবং সমাজের সাথে পাগলের আসল মেলবন্ধন টি কোথায় যেখানে শুধু তত্ত্বের খাতিরে পাগলকে বিশ্লেষন করা নয় বাস্তব পরিস্থিতি ও ঐতিহাসিক পর্যালোচনার মাধ্যমে পাগলকে নানাভাবে বিশ্লেষন করা হয়েছে , পাগলের পাগলামির পিছনে যে সামাজিক সংঘাত তা সংক্ষিপ্ত আকারে আলোকপাত করা । পাশাপাশি যুক্তির সাথে পাগল ও পাগলামির আসল সম্পর্কটা কি অর্থাৎ কে পাগল ? কারা পাগল ? কেন পাগল ? এটা নির্দিষ্ট করে কারা । স্বাভাবিক ভাবেই বলা যায় যে, এক্ষেত্রে কার্য-কারণ সম্পর্কের মাধ্যমে যৌক্তিকতা ও সমাজ জীবনের বন্ধন এর বিষয়টিও স্বল্প পরিসরে ব্যাখ্যা টি আলোচিত হয়েছে । পাগলদের বৈচির্ত্য কি । কত রকমের পাগল সমাজে হতে পারে । এক পাগলের সঙ্গে তাপর পাগলের বৈসাদৃশ্য কি এবং পাগলের চাহিদা কি ? পাগল কি চায় ? পাগলদের ইচ্ছার সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক কিভাবে তৈরী হয়েছে । আবার ভাব জগতে পাগল বা আধ্যা জগতের পাগল সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করা হয়েছে ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল " ঔপনিবেশিক অধ্যায়ে বাংলার উন্মাদ আশ্রম"। সময়কাল হিসাবে এই অধ্যায় ঊনিশ শতকের প্রথম পর্ব থেকে বিংশ শতকের প্রথম অর্ধ পর্যন্ত নির্বাচন করেছি , অর্থাৎ ১৮০০ খ্রীঃ থেকে ১৯৪৭ খ্রীঃ পর্যন্ত সময়কালে বাংলার বিভিন্ন উন্মাদ

আশ্রম ও মানষিক হাসপাতালগুলির ইতিহাস সংক্ষেপে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। বিশেষ করে এই অধ্যায়ে অনুসন্ধানমূলক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পাগলা গারদের ইতিহাসে প্রথম পর্ব তথা উন্মাদ আশ্রমের যুগ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে । এই পর্বে ১৮০০ থেকে ১৯০০ খ্রীঃ পর্যন্ত ঔপেনিবেশিক শাসনের উন্মাদ আশ্রম কেন গড়ে উঠেছিল তা আলোচনা করেছি । এই অংশে উন্মাদ আশ্রমের প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক ইতিহাস ও উন্মাদ আশ্রম কিভাবে বিকশিত হয়েছিল তা উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি । যথা, ডিকের পাগলা গারদ (১৮০৮) , ঢাকা লুনাটিক অ্যাসাইলাম (১৮১৫) , বিয়ার্ডসুরের উন্মাদ আশ্রম (১৮১৭) , রসা পাগলা আশ্রম (১৮২১) , নেটিভ ইনসেন্স অ্যাসাইলাম , দুলান্দা (১৮৩৪) , ভবানীপুর মেন্টাল অ্যাসাইলাম (১৮৯৫) , পাটনা লুনাটিক অ্যাসাইলাম , কটক লুনাটিক অ্যাসাইলাম , ময়দাপুর লুনাটিক অ্যাসাইলাম , তেজপুর লুনাটিক অ্যাসাইলাম (১৮৭৬) , বহরমপুর লুনাটিক অ্যাসাইলাম , (১৮৭৬) ইত্যাদী বিষয়গুলির প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল " উন্মাদ আশ্রম থেকে মানসিক হাসপাতালে উত্তরণ" সময়কাল হিসাবে এই অধ্যায় ঊনিশ শতকের প্রথম পর্ব থেকে বিংশ শতকের প্রথম অর্ধ পর্যন্ত নির্বাচন করেছি , ' অর্থাৎ ১৯০০ খ্রীঃ থেকে ১৯৪৭ খ্রীঃ পর্যন্ত সময়কালে বাংলার বিভিন্ন মানষিক হাসপাতালগুলির ইতিহাস সংক্ষেপে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি । প্রথম পর্বে ১৮০০ থেকে ১৯০০ খ্রীঃ পর্যন্ত ঔপেনিবেশিক শাসনের উন্মাদ আশ্রম এবং দ্বিতীয় পর্বে ১৯০১ থেকে ১৯৪৭ খ্রীঃ পর্যন্ত মানসিক হাসপাতাল কেন গড়ে উঠেছিল তা আলোচনা করেছি । এই পর্বে ( ১৯০১-১৯৪৭ খ্রীঃ ) বঙ্গদেশে উন্মাদ আশ্রমের বদলে যে মানসিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তার ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে । এক্ষেত্রে ইন্ডিয়ান লুনাসি পলিসি -১৮৫৬ , ইন্ডিয়ান লুনাটিক এসাইলাম অ্যাক্ট ১৮৫৮ , দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট - ১৯১২ ইত্যাদি বিষয়গুলি পর্যালোচনার পাশাপাশি উক্ত নীতি ও আইনের সারমর্ম ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য আলোচিত হয়েছে এবং বিভিন্ন উন্মাদ আশ্রমের স্থানাতরনের বিষয় ও নতুন মানসিক হাসপাতাল কোথায় কোথায় স্থাপিত হয়েছিল সেগুলি কালানুক্রমিক অনুসারে পর্যালোচনা করেছি। যেমন- বঙ্গীয় উন্মাদ আশ্রম (১৯১৬), গোবরা লেপার অ্যাসাইলামে মানসিক ওয়ার্ড (১৯১৬), কেন্দ্রীয় মানসিক হাসপাতাল , রাঁচি (১৯২৫), পরবর্তীকালে দত্তনগর মেন্টাল হাসপাতাল ) , মানকুন্ডু মেন্টাল হাসপাতাল

(১৯৩৩) , কোলকাতা মেডিকেল কলেজ - মনচিকিৎসা বিভাগ (১৯৩৯) , লুম্বনী পার্ক মেন্টাল হাসপাতাল (১৯৪০) , ইত্যাদী হাসপাতালগুলির ঐতিহাসিক বিবরণ আলোকিত হয়েছে। সর্বপরী ঔপৌনিবেশিক শাসনতন্ত্রে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও চিকিৎসা পদ্ধতির সঙ্গে লুনাটিক অ্যাসাইলাম ও মেন্টাল হাসপাতালের যে সম্পর্ক তা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছি ।

চতুর্থ অধ্যায়ের মূল বিষয়ে হল "উন্মাদ আইনের ইতিহাস ও সরূপ: ঔপনিবেশিক বাংলায় তার প্রভাব "। এই অধ্যায়ের মুখ্য আলোচনার বিষয় হল ঔপনিবেশিক সমাজে উন্মাদ আইনের মাধ্যমে পাগলের উপর যে নিয়ন্ত্রন শুরু হয়েছিল সেগুলি উপস্থাপন করা চেষ্টা করেছি । এছারও উন্মাদ আইনের স্বরূপ কি ছিল ও পাগলের আইনগত অধিকারের তাৎপর্য ব্যাখ্যা , সর্বোপরি ঔপনিবেশিক বাংলায় লুনাসি অ্যাক্ট বাংলার সামাজিক জীবনে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল তা ঐতিহাসিক পর্যালোচনার মাধ্যমে অনুসন্ধান করা। এছাড়াও এই অধ্যায়ে বিশ্লেষনাত্বক দৃষ্টিভঙ্গিতে যে বিষয়গুলি মুলত আলোকপাত করেছি সে গুলি হল-.কেন এই আইন প্রণয়ন? .উন্মাদ আইন তৈরি করার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ছিল ? ঔপনিবেশিক সরকার উন্মাদ আইনের অন্তরালে কি কোনো শাসন ক্ষমতা চাপিয়ে দেওয়ার কোন দুরভিসন্ধি কাজ করেছিল? আবার কালানুক্রমিক অবস্থার ভিত্তিতে এদেশীয় সমাজে পাগলদের জন্য যে আইন গুলি প্রনয়ন করা হয়েছিল সে গুলি পর্যায়ক্রমে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি, এই আইন গুলি হল যথা লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট (সুপ্রিম কোর্ট) ১৮৫৮,লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট (জেলা কোর্ট), ১৮৫৮ দ্য ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট - ১৮৫৮ অ্যাক্ট , (ছত্রিশ নং আইন), মিলিটারি লুনাটিক অ্যাক্ট(নবম আইন)১৮৭৭ ,ভারতীয় উন্মাদ আশ্রমআইন (সংশোধনী)১৮৮৬ অ্যাক্ট (অষ্টাদশ)১৮৮৬,ভারতীয় উন্মাদ আশ্রয় আইন (সংশোধন) ১৮৮৯ অ্যাক্ট (বিংশত) ১৮৮৯, ক্রিমিন্যাল লুনাটিক অ্যাক্ট , অধ্যায় (চৌত্রিশ নং) ১৮৯৮,কয়েদী পাগল আইন (অ্যাক্ট ১৯০০), ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট (১৮৫৮),অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট ১৮৮৬(সংশোধন), ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট (১৮৫৮),অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট ১৮৮৯(সংশোধন), কোড অফ ক্রিমিনাল প্রোসিডিওর ১৮৯৮, অ্যামেন্ডিং আর্মি অ্যাক্ট ১৮৯৪, অ্যামেন্ডিং আর্মি অ্যাক্ট- ১৯০৯, দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট- ১৯১২। দ্য লুনাসি অ্যাক্ট-গুলি মূলত পাগলদের জন্য প্রণয়ন করা হলেও ,

ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোয় অন্যান্য বেশ কিছু আইনেও পাগল সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়। সেই আইন গুলি হল যথা- ১৮৬০ সালের দন্ডবিধি আইন , ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ সালের চুক্তি আইন, ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধি, দি বেঙ্গল জেলকোড, ১৯০০ সালের কয়েদী সম্পর্কিত আইন ইত্যাদি বিষয় গুলিও এই অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। দ্য লুনাসি অ্যাক্ট-গুলি মূলত পাগলদের জন্য প্রণয়ন করা হলেও , কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোয় অন্যান্য বেশ কিছু আইনেও পাগল সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়। সেই আইন গুলি হল যথা- ১৮৬০ সালের দন্ড বিধি আইন , ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ সালের চুক্তি আইন, ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধি, দি বেঙ্গল জেলকোড, ১৯০০ সালের কয়েদী সম্পর্কিত আইন ইত্যাদি বিষয় গুলিও এই অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

উন্মাদ আশ্রমের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে সর্বপ্রথমে ১৮৫৮ এর লুনাটিক আস্যাইলাম অ্যাক্ট টি সর্বপ্রথম এদেশে প্রচলন করা হয়, এবং সর্বশেষ আইন ছিল ১৯১২ এর আইন । সমগ্র দেশে এই আইন গুলি ফলপ্রসু করার মূল কেন্দ্র ছিল বাংলা। কিন্তু ইতিপূর্বে কোলকাতা মেট্রোপলিটন কমিশনার নিজের মতো পাগলদের ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করতেন। অতঃপর মহারানী ভিক্টোরিয়া অধীনে এদেশে শাসন ভার অর্পিত হলে, ভারত শাসন আইন অনুসারে প্রশাসনিক কাঠামোর অনেক পরিবর্তন সাধন করা হয়। সেক্ষেত্রে এদেশের উন্মাদ আশ্রমের ব্যবস্থাপনা তে নবরূপে পরিবর্তন আসে, পূর্বে সরকারী ও ব্যাক্তিগত উন্মাদ আশ্রম গুলিতে ইংল্যান্ডের কাউন্তি লুনাটিক অ্যাসাইলাম (১৮৫৩) অ্যাক্টের নিয়ম নীতি অনুসরণ করে চলতো ,আবার কখনো কখনো কোলকাতা শহর কমিশনের নিয়ম নীতি চলতে হতো, কিন্তু উন্মাদ আশ্রম কে সঠিক ভাবে পরিচালনা করার জন্য অতঃপর ভারত শাসন আনুসারে উন্মাদ আশ্রমের জন্য ১৮৫৮ খ্রীঃ ১৪ ই সেপ্টেম্বর এই আইন টি পাশ করা হয় ।

ঔপনিবেশিক শাসকগণ শুধুমাত্র সাধারণ উন্মাদদের জন্য আইন পাশ করেনি, সামরিক বাহিনী নিযুক্তিদের মধ্যে যদি কেউ উন্মাদগ্রস্থতা রোগে আক্রান্ত হয় তার জন্য ১৮৭৭ খ্রিঃ আর একটি আইন পাশ করা হয়, যা মিলিটারি লুনাটিক অ্যাক্ট নামে পরিচিত। অর্থাৎ সামরিক লুনাটিকদের উন্মাদ আশ্রমে ভর্তির সুবিধার্থে এই আইন পাশ করা হয়। ঔপনিবেশিক অধ্যায়ে ভারতীয়

উন্মাদদের জন্য যে আইন গুলি পাশ করা হয়েছিল, সেই আইন গুলির মধ্য অন্যতম ছিল ১৮৯৮ খ্রিঃ ক্রিমিনাল লুনাটিক অ্যক্ট। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত রকমের উন্মাদ রোগীদের থেকে যারা তুলনামুলক ভাবে অপরাধী প্রবন, ভয়ঙ্কর, তাদের ক্ষেত্রে আলাদা রকম ভাবে পরিচর্যা করা।১৮৯৮ এর অ্যক্ট ঠ এর ৩৪ নম্বর অধ্যায়ে এই আইন সম্পর্কে সুবিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। ক্রিমিনাল লুনাটিকের আইনের ধারটি মোট ১১ টি অংশে বিভক্ত। ১৯১৩ খ্রিঃ প্রকাশিত ভারতীয় নীতিমালার সারগ্রন্থে মেজর আর.বিয়ারসন ক্রিমিনাল লুনাটিক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। পরবর্তী কালে পি.হিফারনান সংশোধিত আকারে এই পাগলদের জন্য কিছু নীতি মালাও নিয়ম কানুন তৈরি করেন।

ঔপনিবেশিক শাসন আমলে কারাগারে বা জেলখানায় বন্দী কয়েদীদের জন্য ১৯০০ এর তৃতীয় আইনটি পাশ করা হয়। কারাগারে বন্দীদের মধ্যে যদি কেউ উন্মাদ্গ্রস্থ বা মানসিক রগাক্রান্ড় হয়, তাহলে তাদের ক্ষেত্রে কিরূপ ব্যবস্থা নেওয়া হবে , এই উদ্দেশ্য লক্ষ্য রেখে ঔপনিবেশিক শাসকগন উন্মাদ কয়েদীদের এই যে বিধি ব্যবস্থা চালু করেন সেটিই ছিল ১৯০০, অ্যাক্ট-ওওও। ১৯১২ সালের পাগল আইন ছিল পাগল সম্পর্কিত একটি সম্পূর্ণ আইন । সেহেতু পাগলদের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক তাৎপর্যগত দিক থেকে এই আইনটি অন্য আইনগুলোর চেয়ে বেশি গুরুত্ব বহন করে। মূলতঃ পাগলের প্রতি যদি কেউ নির্দয় আচরণ করে কিংবা অবহেলা করে, সেক্ষেত্রে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যেই ১৯১২ সালের ১৬ মার্চ পাগল আইন (এ্যবব খঁহধপু অপঃ-১৯১২ ) প্রণীত হয়। আলোচ্য অধ্যায়ে ঔপনিবেশিক উন্মাদ আইনের পূর্বে এদেশে পাগল দের জন্য কি কোন আইন ছিল কি না ? তা অনুসন্ধান মূলক দৃষ্টি ভঙ্গিতে আলোচিত হয়েছে । আবার ১৮৫৮ থেকে ১৯১২ খ্রীঃ পর্যন্ত সময়ে ঘটনা পরম্পরায় কিভাবে আইন গুলি বিবর্তিত হয়েছে সেগুলি আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি , এবং বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি কে আনুসরন করে তুলনামূলক ভাবে আইনের স্বরূপ আলোচনা করেছি , কারণ ঔপনিবেশিক শাসনের মূল কেন্দ্র ছিল কোলকাতা এবং যাবতীয় শাসন কারজ মূলত পরিচালিত হতো এই কলকাতা কে কেন্দ্র করে , সেক্ষেত্রে বাংলা প্রেসিডেন্সি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় এই আইন গুলির প্রভাব ও ফলপ্রসূ হওয়ার তিব্রতা অনেক বেশী হওয়া স্বাবাভিক ও যুক্তিযুক্ত । আবার বেঙ্গল

প্রেসিডেন্সি তে উন্মাদ আশ্রমের সংখ্যা ছিল বেশী । সেই দিক থেকে বিবেচনা করে বলা যায় বাংলার সমাজ জীবনে এই আইন গুলির প্রভাব ছিল যথেষ্ট ।

আবার বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসন ও উন্মাদ আইনের বিবর্তনের চিত্র আনুধাবন করার মাধ্যমে উন্মাদ আইনে মূল বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্ন ধারা , উপধারা গুলি আলোচনা করার চেষ্টা করেছি , কিভাবে ও কেন আইন গুলি বারংবার সংশোধন করা হয়েছিল সেগুলি পর্যালোচনা করার চেষ্টা করেছি। সর্বোপরি এই আইন গুলিতে কিভাবে পাগলদের জন্য আইনী অধিকার রক্ষা , উন্মাদ আশ্রমের রিসেপশানের জন্য আদেশ এবং শংসাপত্র, পরিদর্শকের দ্বারা মাসিক পরীক্ষণ, পাগলের ব্যয় ভার ও খরচ পরিশোধের জন্য নির্দেশ, অ্যাসাইলেম থেকে মুক্তির আদেশ, পাগল ব্যাক্তির যথাযথ চিকিৎসার , আত্মীয় কর্তৃক দায়িত্ব নেওয়ার আদেশ, মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তিদের এক অ্যাসাইলেম থেকে অন্য অ্যাসাইলেমে স্থানান্ড়র, সর্বোপরি মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তির দখলে থাকা সম্পত্তির দেখভাল ও অধিকার ইত্যাদি বিষয়গুলি সামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতে আলোচোনা করেছি ।

পঞ্চম অধ্যায়ে মুল আলোচ্য বিষয় হল ঔপনিবেশিক সমাজে বাংলায় উন্মাদ রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি । বাংলার ঐতিহ্য আনুসারে *উনিশ শতকে উন্মাদ রোগ ও দেশীয় চিকিৎসা বিধি* র ইতিহাস কি ছিল মুখ্য বিষয় আকারে **বিশ্লেষন**করা। এছাড়াও ঔপনিবেশিক বাংলায় কত রকম ভাবে উন্মাদ রোগীদের চিকিৎসা করা হত সেগুলি আলোচনা করা, বিশেষত বাংলার সামাজিক জীবনে পাগল বা উন্মাদ ধারণার সঙ্গে ভূতে পাওয়া বা অপদেবতার যে সম্পর্ক সেই ধারনা কেমনভাবে ধীরে ধীরে কিভাবে বিলুপ্ত হয়ে মনোচিকিৎসার জগতের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়েছিল তা আলোচ্য অধ্যায়ে অনুসন্ধান করার একমাত্র প্রয়াস। বিশেষ করে রেনেসাঁ যুগে কুসংস্কার বর্জিত হয়ে কিভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের যুগে উত্তরণ হল তা বিস্ড়রিত আলোচনা করার চেষ্টা করেছি এবং বঙ্গদেশে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে কিভাবে উন্মাদদের কিভাবে দেখা হত সেগুলি স্বল্প পরিসরে উপস্থাপন করেছি এবং ঔপনিবেশিক অধ্যায়ে উন্মাদ রোগের চিকিৎসার মধ্যে দিয়ে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র কিভাবে প্রতিযোগিতার সন্মুখিন হয়েছিল সেগুলি আনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছি। বিশেষ করে এই অধ্যায়ের মূল অনুসন্ধানের বিষয় হল, উনিশ শতক থেকে বিংশ শতকের প্রথম

অর্ধ পর্যন্ত সময়ে ঔপনিবেশিক বাংলায় পাগল চিকিৎসা কিভাবে করা হতো তা আলোকপাত করা।

সামাজিক ইতিহাস চর্চার আলোকে উনিশ শতকে বাংলায় পাগলের চিকিৎসা আলোচনা পরিপ্রেক্ষিতে প্রথমে বিশ্ব প্রেক্ষাপটে পাগল চিকিৎসার ক্রমবিকাশ ও প্রাচীনকাল থেকে মধ্য যুগ পর্যন্ত জন মানসে পাগল সম্পর্কে কি ধারনা ছিল তা সংক্ষেপে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। অতঃপর প্রাক-ঔপনিবেশিক আমলে দেশীয় সমাজে পাগল চিকিৎসা কীরূপ ছিল সেগুলি স্বল্প পরিসরে উপস্থাপন করার পর বঙ্গদেশে উন্মাদআশ্রম গুলিতে পাগল চিকিৎসার সরূপ কি ছিল তা মূল আলোচনার পাশাপাশি বিশ্লেষণ করেছি । আবার আধুনিক যুগ বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক যুগ ও ঔপনিবেশিক বাংলায় পাগলের নৈতিক চিকিৎসা, মনোবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা, উনিশ শতকে উন্মাদপীড়ার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা,উন্মাদের চিকিৎসাপদ্ধতির কয়েকটি উদাহরন হিসাবে উন্মাদ রোগ চিকিৎসার কেস-স্টাডি, পাগল চিকিৎসায় সম্মোহন পদ্ধতি , পাগলামি নিরাময়ের জল চিকিৎসা (হাইড্রোথেরাপি) ইত্যাদি বিষয়গুলির ইতিহাস আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। অতঃপর বিংশ শতকে পাগল চিকিৎসা ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি আলোচনা করেছি সেগুলি হল মানসিক রোগের পরিবেশগত চিকিৎসা, মনো-অভিনয় চিকিৎসা, রাসায়নিক চিকিৎসা, বৈদ্যুতিক শক থেরাপি, ইনসুলিন শক থেরাপি, মনোবৈজ্ঞানিক শল্যচিকিতসা, মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে মন:সমীক্ষণ বা মনোবিশ্লেষণ পদ্ধতি, মক্কেলকেন্দ্রিক মনোচিকিৎসা, খেলাভিত্তিক চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়গুলি কালানুক্রমিক অবস্থার ভিত্তিতে এদেশীয় সমাজে পাগলদের চিকিৎসার যে বিবর্তন লক্ষ্য করে গিয়েছিল সেগুলি পর্যায়ক্রমে আলোচ্য অধ্যায়ে উপস্থাপন করেছি। পরিশেষে সার্বিক মূল্যায়নের মাধ্যমে পাঁচটি অধ্যায়ের গবেষণালব্ধ মূল সিদ্ধান্তগুলি আলোচনার মাধ্যমে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছি ।

## প্রথম অধ্যায়

# ঔপনিবেশিক বাংলায় পাগল : একটি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি

কাণ্ডজ্ঞানহীন, বিকৃতমস্তিষ্ক উন্মাদ-সহজ বাংলা ভাষায় পাগল। যুগ যুগ ধরে ওরা কেমনভাবে আলোচিত বা সমালোচিত অথবা যাদের কথাবার্তা বা নীরবতা সভ্যসমাজের দৃষ্টিতে অসমীচীন, নিরর্থক , অযৌক্তিক বা হাস্যকর কিংবা যাদের বাহ্যিক আচরণ স্বভাবসিদ্ধ নয় সমাজের দৃষ্টিতে বিকৃত মস্তিষ্কের বহিঃপ্রকাশ । সমাজ ও সভ্যতা মনেকরে যাদের মনের মধ্যে অন্যরকম এক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে অথবা যাদের প্রকৃতিগত প্রবৃত্তি সমাজের কাছে যুক্তিহীন , বা ননসেন্সদের মতো, তাদের এসব আচরণ, আত্মভাব ও অঙ্গস্বভাব সম্পর্কে সভ্য মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি কী হতে পারে , তা। আমরা সবাই জানি । কারও দৃষ্টিতে এরা মানসিক রোগী , কারও দৃষ্টিতে এরা মানসিক রোগী , কারও দৃষ্টিতে এরা বা উন্মাদ । এরা অপেক্ষাকৃত বেশ বিনয়ী বা ক্ষিপ্ত বলে এদের অযৌক্তিক কথোপকথন বা নীরব আচরণ শুনতে বা বুঝতে কিংবা গ্রহণ করতে রাজী নয় সভ্য মানুষ । তাই এদের স্থান পাগলাগারদে কিংবা কোনো এক মানসিক হাসপাতালে । সুদূর অতীত থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত এরা এভাবেই সভ্য মানুষের কাছে অবাঞ্ছিত হয়ে আসছে বার বার । কিন্তু কেন? সভ্যসমাজ কেনই - বা এদের এভাবে সমালোচনা করে যুগ যুগ ধরে । আবার কেনই বা এদের কথা বিকৃতভাবে উপস্থাপিত হয় ? কারণ সমাজ ও সভ্যতার কাছে এরা পাগল । তবে যাইহোক বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে প্রচলিত পাগল নামক শব্দটির ব্যবহার দ্বারা সমাজ আমাদেরকে এমন একজন মানুষকে চিনতে শিখিয়েছে যার নিকট থেকে দূরে থাকা ভালো ; কারণ সে বদ্ধ উন্মাদ ও অবাঞ্ছিত । তাই সভ্য মানুষের দৃষ্টিতে এই অবাঞ্ছিত , অযৌক্তিক , কাণ্ডজ্ঞানহীন, ননসেন্স , উদাসীন , দিওয়ানা যাই বলা হোক না কেন , আপাতত পাগল শব্দটাকে ভিত্তি করেই সামাজিক ইতিহাস চর্চায় কালের জীবনের কথা আলোকপাত করা অবশ্যই দরকার ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ বস্তুবাদী দর্শনের নিরীখে পাগলদের আর্থ - সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ করার প্রচেষ্টা , তবে এক্ষেত্রে ফুকো কেন্দ্রিক চিন্তা ভাবনা বর্জন কওে প্রাচ্য - বাদী ভাবনায় ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন থেকে পাগলদের ইতিহাস উপস্থাপন করা। বিশেষ করে বাংলায়

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন থেকে পাগলদের ইতিহাস অনুসন্ধান করা , বাংলার সংস্কৃতিতে পাগল ও পাগলামির বহুত্ব ধারনাকে কেন্দ্র করে সামাজিক , সংস্কৃতিক ও ক্লিনিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করার প্রয়াস। পশ্চিমী জ্ঞান চর্চার থেকে আলাদা ভাবে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে পাগলামির ইতিহাস কিভাবে আলোকপাত করা যায় তার একান্ত প্রচেষ্টা করা। বাংলার সামাজিক জীবনে পাগলদের বহুত্ব ধারনার সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করা, পাশাপাশি উন্মাদ রোগের চিকিৎসায় পশ্চিমের চিকিৎসা পদ্ধতি অপেক্ষা ভারতীয় চিকিৎসা যে অধিক উন্নত ছিল তার যুক্তিনিষ্ঠ প্রমাণ করার চেষ্টা।

**অনুসন্ধান মূলক প্রশ্ন**

আলোচ্য অধ্যায়ে গবেষণার মূল বিষয় বস্তু হল উনিশ শতক থেকে বিংশ শতকের প্রথম অর্ধ পর্যন্ত সময়কালে (১৮০০-১৯৪৭খৃষ্টাব্দ) ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গিতে পাগলদের ইতিহাস ভিত্তিক ও সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা অর্থাৎ ঔপনিবেশিক সময় পর্বে বাংলার সামাজিক জীবনে পাগলকে কি রকম ভাবে দেখা হত এবং সমাজের সাথে পাগলের মেলবন্ধন কোথায় তা অনুধাবন করা , যেখানে শুধু তত্ত্বের খাতিরে পাগলকে বিশ্লেষণ করা নয় বাস্তব পরিস্থিতি ও ঐতিহাসিক পর্যালোচনার মাধ্যমে পাগলকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করা , সামাজিক জীবনে বিভিন্ন সংঘাতের মাধ্যমে মানুষের জীবন পরিবর্তিত হয় , এবং পাগলের পাগলামির পিছনে যে সামাজিক সংঘাতকিতা যুক্তিনিষ্ঠভাবে আলোকপাত করা । পাশাপাশি যুক্তির সাথে পাগল ও পাগলামির প্রকৃত সম্পর্কটা কোথায় অর্থাৎ কে পাগল ? কারা পাগল ? কেন পাগল ? আবার এগুলি নির্দিষ্টকরে কারা । প্রসঙ্গত এখানে বলা যাই যে , এক্ষেত্রে কার্যকারণ সম্পর্কের মাধ্যমে যৌক্তিকতা ও সমাজ জীবনের মেলবন্ধন এর বিষয়টিও স্বল্প পরিসরে ব্যাখ্যা করা দরকার । বিশেষ করে উনিশ শতকে প্রাথমিক পর্ব সামাজিক জীবনে একদিকে কুসংস্কার বিরাজ করছে অপরদিকে পশ্চিমী জ্ঞান বিঙ্গান আগমনের ফলে নবজাগরণের যাত্রা শুরু হয়েছিল , এইরকম এক যুগসন্ধিক্ষনে পাগল নামক ধারণাকে কেন্দ্র করে সামাজিক ভাবনায় যুক্তির আলোকে বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও চিকিৎসার আলোকে পাগলদের চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোকিত করা ।

পাগলদের বৈচিত্র্য কি ? পাগল সমাজ কত রকমের হতে পাওে ? এক পাগলের সঙ্গে অপর পাগলের বৈসাদৃশ্য কি এবং পাগলের চাহিদা কি ? পাগল কি চায় ? পাগলদের ইচ্ছার সঙ্গে

সমাজের সম্পর্ক কিভাবে তৈরী হয়েছে । আবার ভাব জগতের পাগল বা আধ্যাত্ম জগতের পাগল সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা একান্তই প্রয়োজন। এছাড়াও বাস্তব জীবনে ভবঘুরে পাগলদের নিয়ে ভাবনা চিন্তা খুবই কম হয়েছে । এমন কি ভবঘুরে পাগলদের অবস্থার উন্নতি তেমন ভাবে লক্ষ্য করা যায় না । দিনে দিনে ভবঘুরে মানুষের সংখ্যা ক্রমশ যদিও এদের চরিত্র সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে । তাই ভবঘুরে বা জড়বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষদের কথা ইতিহাসে আলোচনায় উপস্থাপিত করা একান্ত দরকার। শব্দতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে পাগলের বিভিন্ন স্বরূপ ও সামাজিক ধারণা তা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে এই অধ্যায়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব । আবার সংস্কৃত সাহিত্য থেকে শুরু করে আধুনিক সাহিত্যে পাগল শব্দের অর্থের কিভাবে বিবর্তন হয়েছে , পাগল নামক পূর্বধারণা কিভাবে পরিবর্তিত অপর একটি ধারণার জন্ম দিয়েছে । সেগুলি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন থেকে দেখার চেষ্টা করা । উনিশ শতকের সমাজ ব্যবস্থায় অবহেলিত ও ব্রাত্য জনের কথা তেমনভাবে আলোচিত হয়নি । ঠিক তেমনি , এই ব্রাত্য জনের একটি বিশেষ অংশ পাগল ( বিকৃত মস্তিষ্কের মানুষ ) যাদের কথা খুবই কমই আলোচিত হয়েছে ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ।

কিন্তু ইতিহাসের কাজ কি? খুব স্বাভাবিক ভাবে বলা যায় ইতিহাসের কাজ যদি হিউম্যানিজম চর্চা হয় তাহলে ফুটপাতে পড়ে থাকা অন্যমনস্ক জট - জটায়ু যারা নির্দিধায় পাগল বলে অবিহিত তাদের কথা সমাজবিদ্যায় আলেচনা করা অবশ্যই প্রয়োজন । মানব সমাজ ও সভ্যতায় এই যে ধারাবাহিকতা , সেই ধারাবাহিক অগ্রগতির ঘটনা যদি ইতিহাস হয় তাহলে মানব সমাজে অগ্রগতির ইতিহাসে পাগল মানুষের কথা কেন আলোচিত হবে না ? অপর প্রসঙ্গে বাঙালির জীবনে ও মননে পাগল কথার অর্থ বিবিধ ভাবে প্রচলিত । ঔপনিবেশিক বাংলার সমাজে এই পাগল হয়ে উঠেছে কখনো উন্মত্ত কখনো বিকৃত মস্তিস্ক আবার কখনও ক্ষিপ্ত ব্যক্তি , কখনও বোকাটে , ক্ষ্যাপা , বিকারগ্রস্থ , মাথাখারাপ , মানষিক রোগী , চন্দ্রাহত, আগ্রাহান্বিত সবই পাগলের এক এক রূপের মহিমা প্রকাশ। সংস্কৃতিক জীবনে বাতুল পাগলের আর এক অন্যতম বহিঃপ্রকাশ। সব মিলিয়ে পাগল শব্দটির অর্থ হয়ে উঠেছে বহুবিধ[1] ।

---

[1] শামসুজ্জামান. কে , ( সম্পাদিত ) , ফোকলোর অফ বাংলাদেশ ; ভলিয়ুম – ১ বেঙ্গল একাডেমী, পৃষ্ঠা – ২৫৭

বাংলার পাগল আর পশ্চিমের ম্যাড হয়তো অর্থগত দিক থেকে এক হলেও ব্যবহারিক দিক থেকে পশ্চিমের পাগলের সাথে দুস্তর প্রভেদ আছে , তাই বাঙালি জীবনে পাগল কখনও হয়ে উঠেছে নস্টালজিয়া , কখনও বা রোমান্টিসিজম[2] । কিন্তু পাগলের কি ইতিহাস হয় ? পাগলামীর ইতিহাসই বা কি ? এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, কোন ঘটনাকে যেমন ঐতিহাসিক হতে হয় তেমনি বুঝতে হয় জৈবরাসায়নিক পক্রিয়ার সঙ্গে ঘটনার কি সম্পর্ক[3] । তাহলে বোঝা যাবে ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে মানষিক জীবনের যোগসূত্রটা কোথায় ? প্রতিটি পাগলের যেমন একটি ব্যক্তি জীবন আছে , তেমনি সেই জীবনের সঙ্গে সমাজে কোনও না কোনও ক্ষেত্রে একটি সম্পর্ক লুকিয়ে আছে । অর্থাৎ যে মানুষটি আজ পাগল যে মানুষটি আজ ফুটপাতে , যে মানুষটি আজ জড়বস্তু বা যে মানুষটি অর্ধনগ্ন অবস্থায় রাজপথে পড়ে থাকে , তার এই অবস্থার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখাযাবে ঐ মানুষটির একটি ব্যক্তি জীবনের ইতিহাস[4]। সে কেন পাগল ? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করলে সমাজের সাথে কোনও না কোনও ক্ষেত্রে একটি যোগাযোগ পাওয়া যাবে । তার ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে সামাজিক জীবনের অর্থাৎ সামাজিক সংঘাতের কারণে যে পাগল হওয়া[5]। হতে পারে , রাজনৈতিক বা অন্য কারণ তবুও সমাজের সাথে এই সম্পর্কই হলো পাগল চর্চার স্বার্থকতা।

পাগলামি কি ? এবং আমাদের সমাজে প্রকৃত পাগল কারা ? পাগলের প্রকৃত স্বরূপ কি ? বাংলার সামাজিক জীবনে পাগল রূপের ধারণাটি কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে ? গ্রামীন সমাজে অস্বাভাবিক আচরণ করলে লোকে তাকে বলে হয় তাকে ভূতে ধরেছে বা অপদেবতা কুনজর পড়েছে ,কিন্তু কেন ? যেহেতু আলোচ্য গবেষনার মূল বিষয় উনিশ শতকের বাংলা কেন্দ্রিক , তাই এ প্রসঙ্গে বাংলার সমাজ জীব নে প্রচলিত ধারণাটির প্রেক্ষাপট আলোচনা করা অবশ্যই জরুরি। পাগল এই ধারণাটি কত রকমের হতে পারে ? পাগলের দৃষ্টিভঙ্গী কতরকম ভাবে

---

2 কুমার চৈতন্য ব্রহ্মচারী , পাগল ও পাগলামি ; কলকাতা , ১৯২৬ , পৃ : ২৩ ।

3 অমলেশ ত্রিপাঠী , ইতিহাস ও ঐতিহাসিক ; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক , কলকাতা , ১৯৯৫ , পৃ : VI

4 ক্লাস মন্টন, মাইন্ড ওভার মাইন্ড: দ্য অ্যানথ্রোপলজি অ্যান্ড সাইকোলজি অফ স্প্রিট পোজস সায়ন রোমান্ড অ্যান্ড লিটল ফিল্ড, ২০০৩ , পৃ – ৪৯ .

5 এম. স্মিথ ফ্রেডেরিক, স্বয়ংসম্পূর্ণ: দক্ষিণ এশীয় সাহিত্য ও সভ্যতায় দেবতা এবং আত্মা দখল; কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস।২০০৬ – পৃ ১৪৩ .

ব্যাখ্যা করা যেতে পাওে ? পগল ও পাগলামী সম্পর্কিত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী কী ? সংস্কৃতিক জীবনে পাগলকিভাবে একটি আইডেনটিটি তৈরী করেছে ? ধর্মীয় উন্মাদনার সঙ্গে সামাজিক জীবনের পার্থক্য কী ? আবার পাগল ও পাগলামীর ক্লিনিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গী কী ? এ সব প্রশ্নের উত্তর খোজার চেষ্টা আলোচ্য গবেষনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ।

পাশাপাশি ভারতীয় সমাজে সুপ্রাচীন কাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত পাগলদের চিকিৎসা ব্যবস্থার বিবর্তন হল কিভাবে ? প্রাক আধুনিক পর্বে এবং উনিশ শতক থেকে বিংশ শতকের প্রথম অর্ধ পর্যন্ত সময়ে পাগল (উন্মাদ রোগী) দের কিভাবে চিকিৎসা হতো তা আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। বাংলার ওঝা শ্রেণীর[6] দ্বারা পাগলরা কেমনভাবে চিকিৎসা পেতো ? বাংলার "ওঝার বাড়ি" থেকে "পাগলা গারদ " এবং পাগল গারদ থেকে মানষিক হাসপাতাল - এর উত্তরণের যে কাহিনী তা কিভাবে হলো ? তা সংক্ষেপে আলোকপাত করা আলোচ্য গবেষণার অপর একটি উদ্দেশ্য । যদিও মূল গবেষণাটি প্রধানতঃ ৪ টি দৃষ্টি ভঙ্গীতে আলোকপাত করা হবে (১) সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী (২) ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী (৩) সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং (৪ ) ক্লিনিক্যাল দৃষ্টি ভঙ্গী।

## সামাজিক,ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গী

সামাজিক,ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে পাগল হয়ে উঠেছে মত্ত, উন্মাদ, ক্ষ্যাপা, ক্ষিপ্তগ্রস্থ, আত্মভোলা, বিবাদি, দীওয়ানা, ফানা, কান্ডজ্ঞানহীন, নির্বুদ্ধিতা বা নির্বোধ ইত্যাদি[7]। উনিশ শতকের সময়কালে বাংলার সামাজিক জীবনে বিভিন্ন সাহিত্য ভাবনা , আঞ্চলিক ভাষা, লোকোগান, কিংবা সংস্কৃত সাহিত্যে পাগলনামক ধারণা সঙ্গে লোকায়ত অর্থ ও নান্দনিকতা মিশিয়ে পাগলের ইতিহাস বিভিধমুখী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এই পাগলই আবার উন্মাদরোগে চিহ্নিত হতো। কিন্তু সেই উন্মাদ রোগ বাংলার গ্রামীন সমাজে বিশেষ করে লোক সাধারণের মুখে পাগল নামে তকমা পেত। আবার ক্লিনিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে পাগল বলতে বোঝায় মানষিক রোগী , মনোবিকারগ্রস্ত, বিকৃত মস্তিস্ক , অস্বাভাবিক আচরণ,

---

[6] ম্যাকড্যানিয়েল, জুন, দ্য ম্যাডনেস অফ দ্য সেন্ট: একস্ট্যাটিক রিলিজিয়ন ইন বেঙ্গল, শিকাগো, শিকাগো ইউনিভার্সিটি প্রেস। ১৯৮৯ , পৃ – ৪২ .

[7] স্কল, অ্যান্ড্রু; ম্যাডনেস: অ্যাভেরি শর্ট ইন্ট্রোডাকশন, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১১ অক্সফোর্ড, নিউ ইয়র্ক, পৃ - ৩৪

ইনসেন্স ,ইনস্যানিটি, অ্যাবনরমাল বিহেবিহার , মেনটাল ডিসঅর্ডার[8], লুনাটিক , স্ক্রিজোফ্রেনিয়া, হাইপো কনড্রিয়া , ডিলিউশন , হ্যালুসিয়েশন , ননসেন্স কিংবা বাইপোলার ডিসঅর্ডার ইত্যাদি। এ-সবই পাগলামির এক একটা দিক । বাংলার সমাজে পাগল নামক শব্দটির নানা রূপ , নানা অর্থ ও বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রচলিত । অন্যান্য সভ্যতার মতো ভারতীয় সমাজের ইতিহাসে পাগলদের কমবেশী উল্লেখযোগ্য কাহিনীর পরিচয় আমরা পাই । যেমন মহম্মদ বিনতুঘলক কেন পাগল বলা হতো ? পাগলপন্থীরা কেন বিদ্রোহ করেছিলেন ? ভবা পাগলা কেন সত্যের সন্ধানে বেড়িয়ে ছিলেন ? পাগলচাঁদ কেনই বা সামাজিক বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছিল ? এ সবই আজ বাংলার পাগলামির আলোচনায় এক বিচিত্র রূপের বহিঃপ্রকাশ এবং বাঙালির চিন্তা ভাবনায় বাঙালির সংস্কৃতিতে পাগল বিভিন্ন মাত্রা পেয়েছে[9]। কখনও আমাদের দেবতা মহেশ্বর ভোলানাথ ভক্তর মুখে হয়ে উঠেছে । আবার বামাক্ষ্যাপা আজ শিষ্যদের কাছে কেন ভক্তির আসনে বসেছেন এ প্রশ্নের সদুত্তর কী আজ পাওয়া যাবে ইতিহাসের কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে ? আবার অশালীন রূচিসম্পন্ন , নোংরা বস্ত্র পরিহিত মানুষটিকে যেমন আমরা পাগল বলে ঘৃণা করি , অপরদিকে স্নেহ মমতায় কোনও পিতা তার কন্যাকে ওরে আমার পাগলি রে ( *oh my little pagli*) বলে মমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। এ সবের আসল কারণটা কি ? বাংলা প্রবাদ প্রবোচনে এই পাগল আবার হয়ে উঠেছে সর্বভূক তথা *" পাগলে কি না বলে , ছাগলে কি না খায়"*[10] এই প্রবাদ আজ লোকমুখে কেন এত প্রচলিত । অন্যদিকে বাংলা সাহিত্যে ও লোক কথায় পাগল বিভিন্ন রকমভাবে উপস্থাপিত হয়েছে । লায়লার প্রেমে মজনু কেন পাগল[11]? আবার বিল্লমঙ্গল ও চন্ডী দাস দুজনে কেন প্রেমে পাগল হলেন তার সঠিক উত্তর কোথায় ? নারীর প্রেমে পাগল হওয়া আর ভগবানের ভাব ও ভঙ্গিতে প্রেমে পাগল হওয়া এ সবের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় ? কোনও বাউল সাধক এই ভব সংসার নিয়ে আপন মনে গাইতে গাইতে এই জগতকে পাগলের মেলা বলে[12] কেন অভিহিত করে কিন্তু কেন ? ইত্যাদি । এসব প্রশ্নের উল্টর আজ গোলক ধাঁধাঁ । আবার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ

---

[8] ডলস, মাইকেল; মাজনুন: দি ম্যাড ম্যান ইন মিডিয়েভেল ইসলামিক সোসাইটি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস , পৃ -৫৮

[9] ডলস, মাইকেল; মাজনুন: দি ম্যাড ম্যান ইন মিডিয়েভেল ইসলামিক সোসাইটি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, পৃ - ৫৮

[10] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর , বিচিত্র প্রবন্ধ : পাগল ; বিশ্বভারতী , ১৩১৪ , পৃ : ১০১ ।

[11] বিজয় কবিরাজ , বাংলা বাগধরা প্রয়োগ ও প্রসঙ্গ , পুনশ্চ , কলকাতা , পৃ : -১১১

[12] অতুলকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় , পাগলের হাট , অনাদি প্রিন্টিং , ১৯২১ , কলিকাতা , পৃ : -৯

ঠাকুর  যখন বলে ওঠেন " পাগলা হাওয়ায় বাদল দিনে[13] " , " আবার মোরে পাগল করে দিবে কে[14] রে ? কিংবা "যে তোরে পাগল বলে তারে তুই বলিসনে কিছু [15] " এ সবই পাগলের ভিন্ন ভিন্ন অর্থের প্রয়োগ । অধ্যাত্মিক জীবনে কিংবা সাধন ভজনে পাগল হয়ে উঠেছে ভক্তির এক অন্যতম মাধ্যম, সহজিয়া ভাবাদর্শে তাই বাউল কবি পাগল হয়ে যান মনের মানুষকে খুঁজতে [16]। আবার শ্রীরামকৃষ্ণ পাগল হয়ে যান ভগবানের জন্য। তাই তিনি শিষ্যদের উদ্দেশ্যে বলেছেন " যদি পাগল হতে হয় সংসারে জিনিস লয়ে কেন , আবার যদি পাগল হতে হয় তবে ভগবানের জন্য পাগল হও[17]" । এ প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্য বিবেকানন্দের একটি বিখ্যাত গান উল্লেখ করা অবশ্যই প্রয়োজন।..... একদা রামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হয়ে ছিলেন এবং নরেন গুরদেব বললেন , কোন গানটি গাইবেনু গুরু বলিলেন ওই গানটি , অতঃপর নরেন্দ্র গান গাইলেন -

*আমায় দে মা পাগল করে , আর কাজ নাই জ্ঞান বিচারে ।*
*তোমার প্রেমের সুরা পানে কর মাতোয়ারা*
*ওমা ভক্ত - চিত্ত হারা ডুবাও প্রেম - সাগরে*[18]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এবার ভাবমগ্ন জাগিয়া উঠিলেন[19] , এবং ঈষৎ হাসিতে হাসিতে বলিলেন-" দে মা তাকে পাগল করে, জ্ঞান ও বিচারে" [20]

যাইহোক ভারতীয় ধারণার পাশাপাশি পশ্চিমের পাগলামি বিষয়টি আলোচনা করা অবশ্যই প্রয়োজন। একদা পাগলামি সম্পর্কে সক্রেটিস যে ধারণা দিয়েছেন তা থেকে তৎকালীন গ্রীকদের পাগল সম্পর্কে মনোভাব জানতে পারি। তেমনি বাংলার ইতিহাসে পাগল ও পাগলামি বিষয়ক ধারণাকে বুঝতে হলে গীরিন্দ্র শেখর বসু " নিউ থিওরি অফ মেন্টাল লাইফ" দেবরাহ পুলে

---

[13] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর , রবীন্দ্র সংগীত , কীর্তন রাগ , রচনাকাল — আষাঢ় ১২৯৪ , কলকাতা

[14] তদেব , ( Online Collection -http / tagoreweb.in ) Accession date 18. 05. 2018

[15] তদেব , বাউল রাগ , রচনাকাল -১৩১২

[16] বাংলা সিনেমা : " মানের মানুষ " —গৌতম ঘোষ পরিচালিত , কলিকাতা , রিলিজ- Dec - 2010 .

[17] শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত তৃতীয় পরিচ্ছদ , ১৫ জুন ১৮৮৪ , শ্রীরামকৃষ্ণ ও গৌপীপ্রেম প্রসঙ্গ ।

[18] কথামৃত , ৪ র্থ খণ্ড । ১৪ ই সেপ্টেম্বর , ১৮৮৪ অষ্টম পরিচ্ছেদ , নরেন্দ্রাদির শিক্ষ — বেদ বেদান্ত কেবল আভাস উক্ত অংশে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাবিষ্ট থাকা অবস্থায় — নরেন্দ্রনাথ উক্ত গানটি শোনান । গানটি শোনার পর ঠাকুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের উদ্দেশ্যে বলিলেন ' দে মা তাকে পাগল করে ' — অর্থাৎ রামকৃষ্ণ তাকে জ্ঞানে পাগল হওয়ার কথা বলেছিলেন।

[19] তদেব, অষ্টম পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা- ৯৬

[20] তদেব, অষ্টম পরিচ্ছেদ। পৃষ্ঠা- ৯৭

ভট্টাচার্যের *" Paglami : Enthopsycritic Knowledge in Bengal "* অমিত রঞ্জন বসুর *" New Knowledge in Madness in 19th century Bengal "*ইত্যাদি গবেষণা কর্ম উক্ত বিষয় সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণভাবে আলোকপাত করে । আবার রবীন্দ্র সাহিত্যে পাগল সম্পর্কিত ধারণা পাই তার বিচিত্র প্রবন্ধ পাগলা নামক উপাখ্যানে ।

**পাগল**

পশ্চিমের একটি ছোটো শহর। সম্মুখে বড়ো রাস্তার পরপ্রান্তে খোড়ো চালগুলার উপরে পাঁচ-ছয়টা তালগাছ বোবার ইঙ্গিতের মতো আকাশে উঠিয়াছে, এবং পোড়ো বাড়ির ধারে প্রাচীন তেঁতুলগাছ তাহার লঘুচিক্কণ ঘন পল্লবভার সবুজ মেঘের মতো স্তূপে স্তূপে স্ফীত করিয়া রহিয়াছে। চালশূন্য ভাঙা ভিটার উপরে ছাগল-ছানা চরিতেছে। পশ্চাতে মধ্যাহ্ন-আকাশের দিগন্তরেখা পর্যন্ত বনশ্রেণীর শ্যামলতা।

পাগল শব্দটা আমাদের কাছে ঘৃণার শব্দ নহে। খেপা নিমাইকে আমরা খেপা বলিয়া ভক্তি করি, আমাদের খেপা-দেবতা মহেশ্বর। প্রতিভা খেপামির একপ্রকার বিকাশ কি না এ কথা লইয়া য়ুরোপে বাদানুবাদ চলিতেছে, কিন্তু আমরা এ কথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হই না। প্রতিভা, খেপামি বৈকি, তাহা নিয়মের ব্যতিক্রম, তাহা উলট-পালট করিতেই আসে— তাহা আজিকার এই খাপছাড়া সৃষ্টিছাড়া দিনের মতো হঠাৎ আসিয়া যত কাজের লোকের কাজ নষ্ট করিয়া দিয়া যায়; কেহ বা তাহাকে গালি পাড়িতে থাকে, কেহ বা তাহাকে লইয়া নাচিয়া-কুঁদিয়া অস্থির হইয়া উঠে।

**রবীন্দ্রনাথ রচিত বিচিত্র প্রবন্ধ পাগল[21]**

সক্রেটিস তার সময়ের অস্বাভাবিক বা উন্মাদ আচরণ সম্পর্কে দুটি প্রধান ভাগের ধারণা প্রদান করেন। এর প্রথমটি সম্পূর্ণভাবে জৈবগত সমস্যা থেকে আর দ্বিতীয়টি মূলত সামাজিক রীতিনীতি বর্জিত আচরণের পর্যায়ভুক্ত । দ্বিতীয় ধাপটিতে সক্রেটিস শিল্পী , প্রেমিক , ধর্মান্ধ , ভাববাদী

---

[21] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; বিচিত্র প্রবন্ধ , পাগল , ( ই সোর্স -http / tagoreweb.in ) Accession date 18. 05. 2019

অথবা জিনিয়াসদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন [22]। পরবর্তীতে প্লেটো বললেন , উন্মাদনা যতক্ষণ পর্যন্ত না ধ্বংসাত্মক হিসেবে বিবেচিত হয় তার আগ পর্যন্ত এটি বরং সামাজিক ক্ষমতা বৃদ্ধিতেই সাহায্য করে। অর্থাৎ সেই যুগে উন্মাদনাকে আজকের মতো এতটা খারাপ চোখে দেখা হতো না[23] ।গ্রীক চিকিৎসক হিপোক্রেটাস পাগলদের নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন , হিস্টিরিয়ার ক্ষেত্রে তিনি মনে করতেন বিয়ে হচ্ছে আরোগ্য লাভের সবচাইতে ভালো পদ্ধতি । অর্থাৎ আশ্রম নয় বরং সামাজিক বন্ধন স্থাপনের মাধ্যমে পাগলামি দূর করা সম্ভব[24]।

মধ্যযুগে পশ্চিমের অনেক দেশে পাগলামিকে পবিত্র বলে গণ্য করা হতো । তখন মনে করা হতো পাগলামি সত্যেরই একটি অংশ । অর্থাৎ তখন পর্যন্ত পাগলকে সমাজ থেকে বিতাড়িত ঘোষণা করা হয়নি । ঠিক এ কথাগুলোই ১৯৬১ সাল ফরাসি ভাষায় লেখা তার " ফলি এ দেরজঃ ইসতোয়ার দ্যা লা ফলি আ লাজ" নামক ক্লাসিক গ্রন্থে বলতে চেয়েছিলেন মিশেল ফুকো । গ্রন্থটি পরবর্তীতে ১৯৬৪ সালের দিকে " *Madness and civilization : A History of Insanity in the age of reason* " নামে ইংরেজি অনুবাদ আকারে প্রকাশিত হয়।

উনিশ শতকের সূচনা থেকে বিংশ শতকের প্রাথমিক পর্বে পাগলদের নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু হয়েছে। একটু অন্যরকম ভাবে । কারণ এই সময় যুক্তিবাদ ও নবজাগরণ মানুষকে দারুন ভাবে প্রভাবিত করেছিল। সবকিছুই যুক্তির আলোকে ব্যাখ্যা করার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল।একদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও অন্যদিকে দেশীয় ঐতিহ্যের শিক্ষার মধ্যে এক সমন্বয় সাধনের ফলে মনোবিজ্ঞানের ইতিহাস চর্চায় নতুন দিগন্তের সূচনা হয়েছিল । যার প্রভাব পড়েছিল পাগলদের সনাক্ত করণের মধ্যে। এই সময়য় পাগলামি ও যুক্তি মানবসভ্যতার ইতিহাসে ধীরে ধীরে একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আজ আধুনিকসময়ে এসে শুধু নির্বুদ্ধিতা বা বোকামি রইলো না বরং এটি এখন সাইকো প্যাথলজি বা মানসিক অসুস্থতা যা বৈজ্ঞানিক পন্থায় চিকিৎসার মাধ্যমে

---

[22] লিউডার, ইভান অ্যান্ড টমাস, ফিলিপ, ভয়েসেস অফ রিজন অ্যান্ড ভয়েসেস অফ ইন্সানিটি, স্টুডিস অফ ভারবাল মৌখিক হ্যালুইনেশন, লন্ডন, রাউটলেজ, ২০০০ পৃ – ৭

[23] রয় পোর্টার, ম্যাডনেস: এ ব্রিফ হিস্ট্রি, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, অক্সফোর্ড, ২০০২, পৃ – ১০

[24] ম্যাডনেস ইন গ্রীক থট অ্যান্ড কাস্টম বাই অ্যাগনেস কার ভাওঘান , রিভিউ বাই ডেভিড, এম. রবিনসন, দ্যা ক্লোজিয়াল উইকলি। ভলিউম – ১৪, নং- ১৯, মার্চ - ১৯২১ পিপি – ১৫০ , নভেম্বর - ২০১৩।

উপশম ঘটাতে হয় । যে পাগলামিগুলো ছিল মধ্যযুগীয় ভারতে কেমন " পবিত্র মরমী রহস্য " মানব অভিজ্ঞতার আধ্যাত্মিক অংশ রেনেসাঁর সময় সেই পাগলামিগুলো হয়ে উঠলো যুক্তির উল্টো পিঠ[25] । রেনেসাঁর সময় থেকেই পাগলামো আর শুধু সামাজিক প্রতিবন্ধকতাই রইলো না , সে যেন মহান ঈশ্বরের সুবিন্যস্ত জগতের সুশৃঙ্খল বিন্যাসকে ভাঙার চেষ্টা করছে । ফুকোর বক্তব্য অনুযায়ী মনে হচ্ছে যেন এই প্রি - মডার্ন পাগলেরা ফ্রেডরিক নীৎসের আগেই ঈশ্বরকে মেরে ফেলার দুরভিসন্ধিতে যোগ দিয়েছিল।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর পাগলাগারদ গুলোকে ঠিক মেডিকেল - আশ্রম বলা চলে না , সেগুলো ছিল ' semi - juridical ' প্রতিষ্ঠান । পাগল ছাড়াও , বেকার , নিঃস্ব , ভিক্ষুক , অলস যারা ছিল মেইনস্ট্রিম সমাজ থেকে বাইরে , তাদের আশ্রয় জুটতো সেখানে । ইউরোপের সেকালের অর্থনৈতিক অবস্থার উঠা - নামায় এই দলের মানুষদের দুই রকম অবস্থার সম্মুখীন হতে হতো । এক, অর্থনৈতিক মন্দায় তাদের আশ্রমে ঠেলেঠুলে বিশ্রামে রাখা রাখা হতো । অনুরূপভাবে ভারতীয় সমাজে উনিশ শতকের পূর্ববর্তী সময়ে দুর্ভিক্ষ কবলিত বাংলায় অভাবের তাড়নায় ও খাদ্যাভাবে বেশীরভাগ মানুষের শারিরীক ও মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে । দুর্ভিক্ষের প্রভাব পড়েছিল বাংলার মানুষের মনজগতের মধ্যে। এই সময় বেশীরভাগ মানুষ মানষীক ও দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিল । কিন্তু ঐ ব্যাধিগ্রস্থ মানুষদের সুচিকিৎসা ও পরিকাঠামো সেই সময় ছিল না। তেমনি মানষীক রোগগ্রস্থ ব্যক্তিদেরও চিকিৎসার কোনও সুবন্দোবস্ত গড়েওঠেনি । সাধারণত বাংলার গ্রামীন সমাজে ওঝা বা কবিরাজের বাড়িতে আশ্রমিকভাবে পাগলদের চিকিৎসা করা হতো। অপরদিকে হেকিমি চিকিৎসায় উন্মাদরোগীদের চিকিৎসাধীনে আনা হতো । পরবর্তী পর্যায়ের ইতিহাস কৰমশঃ বদলে গেল । ব্রিটিশ রাজত্বে পশ্চিমী চিকিৎসা বিজ্ঞানের আগমনের ফলে মানষীক রোগীদের চিকিৎসার তত্ত্বাবধানে আনা হয়েছিল । অর্থাৎ পাগল ও পাগলামী (মনোরোগ) সম্পর্কে ঔপনিবেশিক শাসনকালে সুচিকিৎসার প্রচলন থাকলেও ততটা ব্যাপ্তি লাভ করতে পারেনি । বিশেষ করে গ্রামীন সমাজে পাগলদের নিয়ে একটু বিরূপ প্রতিক্রিয়া ছিল। পশ্চিমীজ্ঞান পাগলদেরকে যৌক্তিকতার আলকে ব্যাখ্যা করার ফলে পাগল হয়েউঠল মানুষের এক ধরনের মস্তিষ্কের অবস্থা । অর্থাৎ পাগল নিয়ে জ্ঞানচর্চা ও বিদ্যা চর্চার

---

[25] কালফা. জে , ইন ফুকো.এম হিস্ট্রি অফ ম্যাডনেস, নিউ ইয়োর রাউটলেজ , ২০০০ , ইন্ট্রোডাকশান . পৃ - ১৭

পাশাপাশি মনোবিজ্ঞানের একটি ডিসিপ্লিন তৈরী হল। এভাবে আধুনিকতার যুগে উন্মাদনা ক্রমান্বয়ে পরিণত হলো মনোবিদ্যার একটি সাবজেক্ট হিসেবে । আবেগ অনুভূতির তীব্র বহিঃপ্রকাশের উপর ভিত্তি করে নামকরণ করা হয় ম্যানিয়া , মেলানকোলিয়া , হিস্টিরিয়া , হাইপোকন্ড্রিয়া ইত্যাদি । সর্বপ্রকার ধর্মীয় আর নৈতিকতার লেবাস ছাড়িয়ে এটাকে এখন পুরোপুরি চিকিৎসাবিদ্যার তত্ত্বাবধানে আনা হলো । ফুকোর এই গ্রন্থটির প্রকাশের পর থেকেই এর তথ্যগত অসাড়তা মধ্যযুগীয় উৎস ঘেটে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন পিটার সেডউইক , এরিক মিডফোর্ড সহ অনেকেই । পিটার সেডউইক বলেছিলেন এনলাইটেনমেন্টের পূর্বেও কিছু দেশে পাগলাগারদ ছিল। এরিগ মিডলফোর্ট সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন মধ্যযুগেও নির্যাতনমূলক চিকিৎসা পদ্ধতির অস্তিত্ব ছিল আর মধ্যযুগে কোন কোন অঞ্চলে মানসিক ব্যাধিকে পাপের সাথে সম্পর্কিত বলে মনে করা হত । আর তাদের এ কথাতেই ফুকোর উন্মাদনা বিষয়ক এমন সত্য উপলব্ধিকে ভুল প্রমাণিত করার চাইতে বরং আরো বেশি যৌক্তিক করে তোলে[26] ।

## পাগলদের উপর ক্ষমতা বিস্তার

ইতিহাসের সত্যটা এই যে , আজ পর্যন্তআমরা দেখেছি ইতিহাসে পাগলদের উপর ক্ষমতা বিস্তার করেছে দুটো প্রধান শক্তি এক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং দুই চিকিৎসক । পুরোহিত বলেছে সমাজের প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে যায় এমন আচরণ করা যাবেনা । আর চিকিৎসকরা এসে সুস্থ আচরণের জন্য উন্মাদ ব্যক্তির উপর প্রয়োজনীয় নজরদারীর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শ্রম গড়ে তোলেন । তারা সমাজে নিজেদের একপ্রকার কর্তৃত্ব স্থাপন করতে সচেষ্ট হন । আশ্রমগুলোতে অস্বাভাবিক আচরণের চিকিৎসার নামে রোগীর উপর চলতে থাকে অকথ্য নির্যাতন[27] ।আর স্বাভাবিক আচরণের জন্য মুক্তির যে স্বপ্ন দেখান তারা । এই অলীক মুক্তি খুব কম জনই পায় । পাগল হয়ে যায় আরো পাগল । আমরা দেখি যে , অন্ধকার যুগে ডাইনী যাদুকরদের যখন হত্যা শুরু হয়েছিল তখন এদের একপ্রকার পাগল হিসেবেই ভাবা হত । আর এমন ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণে

---

[26] ফুকো এম, ম্যাডনেস অ্যান্ড সিভিলাইজেশন: এ হিস্টোরি অফ ইনসোনিটি ইন দ্য এজ অফ রিজন, ট্রান্সল্যাটেড বাই জে. খালফা, নিউ ইয়র্ক। রউটলেজ- ১৯৬৪. প্রিফেস অফ দ্যা ১৯৬৪ এডিশান –পৃ - xxviii

[27] জর্জ রোজেন, ম্যাডনেস অ্যান্ড সোসাইটি, রউটলেজ অ্যান্ড কেগান পাওল, লন্ডন, ১৯৬৮ . পৃ - ১৫১

অনেককেই শুধুমাত্র পাগল হওয়ার দায়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল । প্রসঙ্গত এখানে একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে ১৬০৪ সালের ঐ সময়ে ইংল্যান্ডের রাজা ছিলেন প্রথম কিং জেমস । তিনি অশুভ শক্তির ভয় করতেন এবং এ কারণে তিনি বাইবেলের কিছু লাইনও নিজের মনমতো মত বদলে ১৯৭০ , thou *shall not suffer a poisoner to lvie* এর বদলে তিনি লেখেন *thou shalt not suffer a witch* to live । তিনি ' *Witch craft act* প্রণয়ন করেন । এই আইনে ডাইনীদের ফাঁসি দেওয়ার কথা বলা হয়। ফাঁসির কথা বলা হলেও তাদের অনেককে আগুনে পুড়িয়ে মারার নজির পাওয়া যায় । প্রকৃত ডাইনী যাদুকরদের ছাড়াও এক্ষেত্রে অনেক মানুষকে নিতান্ত তাদের অস্বাভাবিক আচরণের জন্য জ্বলন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল । প্রথম কিং জেমসের কারণে বহু নিরপরাধ মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছিল এবং এদের মধ্য পাগলদের সংখ্যাই ছিল বেশি[28] । এসময় ফ্রান্সকে ইংল্যান্ডের হাত থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন জোয়ান অব আর্ক নামক এক বীরকন্যা । তাকেও পুড়িয়ে মারা হয়েছিল । তার সম্পর্কে তৎকালীন চার্চ অভিযোগ করেছিল তিনি নিজেকে স্রষ্টা বলে দাবি করতেন । যাই হোক , পরবর্তীতে স্কট তাঁর " দ্য ডিসকভারি অফ উইচ ক্রাফট " গ্রন্থে দেখান ডাইনি প্রথার সঙ্গে পাগলামির একটা নীরন্তন সম্পর্ক আছে । কিন্তু পরবর্তীকালে ডাইনিপ্রথা নামে পাগলদের প্রতি নির্যাতন থেমে থাকেনি। এবার চিকিৎসকরা পাগলদের উপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে এই ব্যাপার থেকে যেন পুরোহিতদের কিছুটা রেহাই দিলেন । আসলে এর আগেও পাগলাগারদ ছিল আর তাদের প্রতি নির্মম নির্যাতনের প্রাপ্ত এসকল ইতিহাস আরো ভালভাবে প্রমাণ করে যে পাগলদের পুরোদমে সমাজ থেকে আলাদা করার একটা প্রক্রিয়া ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছিল । স্কট যখন প্রমাণের মাধ্যমে ডাইনী হত্যায় বাধ সাধলেন তখন পাগলদের বিলুপ্ত করা অসম্ভবে পরিণত হলো তখন মানসিক চিকিৎসার নাম করে শুরু হল এদের সমাজ থেকে বিতাড়িত করার ষড়যন্ত্র[29] ।

---

[28] বেংট আঙ্কারলু অ্যান্ড স্টুয়ার্ট ক্লার্ক, উইচক্রাফট অ্যান্ড ম্যাজিক ইন ইউরোপ ; বাইবেলইক্যাল অ্যান্ড পাগার সোসাইটি, ইউনিভার্সিটি অফ "ফিলাডেলফিয়া প্রেস , ২০০১ , - পৃ - ১৩

[29] কিথ, থমাস, রিলিজিয়ন অ্যান্ড দ্য ডেক্লাইন অফ ম্যাজিক , অক্সফোর্ড , অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস , পৃ - ৪৬৪

প্রাক আধুনিক পর্বে এসে খুব দ্রুত একসাথে অনেকগুলো উন্মাদনাগার প্রতিষ্ঠিত হওয়া , রেনেসাঁস দৃষ্টিভঙ্গি রপরিবর্তনের দিকে ইঙ্গিত করে । যেমন , হিস্টিরিয়া সম্পর্কে এর আগে ভাবা হতো যে মেয়েদের জরায়ু তার স্বাভাবিক অবস্থান থেকে সরে গিয়ে সারা শরীরে ঘুরে বেড়ানোর কারণেই বুঝি এ সমস্যার সৃষ্টি । এটি ছিল একধরনের অন্ধ বিশ্বাস । পরবর্তিকালে এ ধারণা ক্রমশ বাতিল ঘোষিত হলেও একে নারী ও যৌন সংশ্লিষ্ট সমস্যা হিসেবেই বিবেচনা করা হতো । উনিশ শতকের প্রথমদিকে অনেকেই বলতে শুরু করেন উন্মাদনার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র শারীরিক চিকিৎসা যথেষ্ট নয়। এখানে স্পষ্ট বোঝা যায় শুরুতেই উন্মাদনা মনোবিজ্ঞানের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হতো না বরং দেহ ও আত্মার সম্পর্ক অস্বীকারের চেষ্টা চালানো হয়েছে নানাভাবে। এর আগে ক্রুসেডের পরপরকুষ্ঠরোগীরা আরোগ্য লাভ করতে শুরু করলে তখন সেই জায়গাগুলো পরিণত হয় ভিক্ষুক , অলস আর পাগলদের বসবাসের স্থানে । একটু পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলতে গেলে ব্যাপারটা ঠিক এমন যে , ভালো আর ব্যবহারযোগ্য জিনিসপত্র থেকে অপ্রয়োজনীয় আর অব্যবহার্য জিনিসগুলো আলাদা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় ।

এভাবে পরবর্তীতে অষ্টাদশ শতকের দিকে নজর দিলে আরো দেখতে পাই কিভাবে আবার কিছু ময়লা আবর্জনা থেকে দরকার বুঝে একরকম শ্রেণিবদ্ধভাবে পরিশুদ্ধ করার মাধ্যমে আবার ব্যবহার উপযোগী করার একটা পায়তারা শুরু হয়েছিল । ইতোমধ্যেই ইউরোপের ইতিহাস আলোচনার শুরুতেই দেখেছি যে , বাড়তি শ্রমের আশায় অপরাধী , ভবঘুরে , ভিক্ষুক আর অলসদের কিভাবে খুব সহজে মুক্তি মিলত । আর এক্ষেত্রে উন্মাদদের দুটি রাস্তা খোলা ছিল হয় । নির্মম মৃত্যুকে মেনে নেওয়া অথবা সংশোধনের মাধ্যমে মুক্তি লাভ । অন্যদিকে সংশোধনের প্রক্রিয়াগুলো ছিল আগের চাইতে আরো বেশি নির্মম । এ পর্যায়ে ক্ষমতা রক্ষার প্রয়োজনীয়তার দিকেও তার ঐতিহাসিক ইঙ্গিত প্রদান করতে দ্বিধাবোধ করেননি । উন্মাদনার প্রতি মধ্যসপ্তদশ সমাজের ঐ সকল আচরণকে নিষ্ঠুর বললেও মনে করা হতো , তখনো পাগলামিকে ভয়ংকর রোগ হিসেবে দেখা শুরু হয়নি । তখন একে মনে করা হতো অলস অসুস্থতা , দৈহিক বিকৃতি বা প্রতিবন্ধকতার ফল[30]।

---

[30] স্টিল, আর্থার: ভেলোডি। আরভিং : (এডিটেড) রি রাইটিং দ্যা হিস্ট্রি অফ ম্যাডনেস, মার্ক এরিকসন ; মিশেল ফুকোর ম্যাডনেস অ্যান্ড সিভিলাইজেশন; রউটলেজ , লন্ডন , ২০০৬, পৃ - ২৩৪

উনিশ শতকে ইয়র্কে কোয়েকার , উইলিয়াম টিউক এবং প্যারিসে ফিলিপপিনেলের দৃষ্টান্ত - অনুসরণে মানসিক বিশৃংখলাগ্রস্তদের খুব ভালোভাবেই অপরাধী , ভিক্ষুক, অলসদের থেকে আলাদা করার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। এ দুজন মিথ সৃষ্টিকারী মুক্তিদাতা পাগলদের ঠিক করার জন্য যথারীতি ডাক্তারও নিয়োগ করেছিলেন । আর এভাবে ডাক্তারই কর্তৃত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন। ডাক্তাররা ভাবতে লাগলেন চিকিৎসা একটি কঠিন বিজ্ঞান , আশ্রমে তারা আছেন বিজ্ঞানী হিসেবে , এবং রোগের সুনির্দিষ্ট সুরাহা করতে তারা সক্ষম এবং ডাক্তার এ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক সত্যতা প্রতিষ্ঠা করতে লাগল, কিন্তু ফুকো এতে ভরসা করতে পারলেন না , তিনি এসকল চিকিৎসা ব্যবস্থাকে বরং আরো বেশি নির্মম হিসেবে উল্লেখ করলেন । পিনেলের চিকিৎসা ছিল ব্যাপক বিরক্তিকর , যেমন বরফ ঠান্ডা জলে চুবিয়ে রাখা হতো , স্ট্রেইট জ্যাকেট ব্যবহার । এ সকল নৃশংস বিচার ও শাস্তি অনবরত চলত যতক্ষণ পর্যন্তনা রোগী কাবু হতো[31] । এভাবেই যেন যুক্তিবাদের দৈত্যের উপর ভর করে মানসিক হাসপাতাল গুলো ধীরে ধীরে আশ্রয় নিয়েছে। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার ছত্রছায়ায় । ফুকোর মতে,অযুক্তিতে ক্ষমতার সাহায্যে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রথমেই যেটা অতি আবশ্যকীয় তা হলো অযুক্তিকে অসুস্থতা বা রোগ হিসেবে ঘোষণা করা ফ্রয়েড সম্পর্কে ফুকো মনে করেন , ফ্রয়েড মানসিক রোগীকে আসাইলামে অবরুদ্ধ করে ক্ষমতা খর্ব করলেও শেষ পর্যন্ততাকে মনঃচিকিৎসকের কর্তৃত্বেই ন্যস্ত করেছেন। ফ্রয়েডীয় চিকিৎসা পদ্ধতিতে যারা আরোগ্য লাভ করেছেন তারা বিনা চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করতেন কিনা এ প্রশ্ন অনেক আগেই উঠেছিল ।

## ওপনিবেশিক যুগ ও পাগল

ওপনিবেশিক অধ্যায়ে বাংলায় পাশ্চাত্য চিকিৎসা প্রবেশের ফলে মনোবিজ্ঞানের ইতিহাসে এক আমূল পরিবর্তন এসেছিল। বিভিন্ন রকমের গবেষণা ও পাগলদের নিয়ে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার ফলে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা মনোচিকিৎসার ইতিহাসে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটিয়েছিল । পাশাপাশি

---

[31] মিশেল ফুকো। ম্যাডনেস অ্যান্ড সিভিলাইজেশন , ইংলিশ ট্রান্সলেটেড বাই জে. খালফা , ১৯৬১ রটলেজ, নিউইয়র্ক . পৃ – ১৫৮

পাগলামি সম্পর্কে নতুন ডিসকোর্স তৈরী হয়েছিল । মনোবিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞগনের সহায়তায় । এরা ক্ষ্যাপানির ভূমিকা ও নৈতিকতার মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করেন । ফলে পাগল নামক ধারণাটি হয়ে ওঠে চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি অন্যতম বিদ্যাচর্চার বিষয় । বাংলার নবজাগরণ পর্বে এনলাইটেন্টমেন্ট এর প্রভাব যুক্তিবাদি ব্যাখ্যার ফলে চিকিৎসকরা দেখাতে চেয়েছিল পাগল ধারণাটি এতদিন কুংস্কারের বশবর্তী হয়ে অপব্যাখ্যা হয়েছিল বাংলার সমাজে । কিন্তু পশ্চিমী সংস্কৃতির আগমনের ফলে ক্রমশঃ পাগলদের প্রতি রূঢ় দমনমূলক ও নিপীড়নমুখী ভাবনা চিন্তা বর্জিত হতে দেখা দেয় । এই পর্বে মনোচিকিৎসা নিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পর সাড়া পড়েগিয়েছিল গোটা বুদ্ধিজীবি মহলে । পাগলদের নিয়ে এপিসটোমোলজিকাল তাত্ত্বিক ভাবনা শুরু হয় । মি. সোরেশ তার গবেষণা কর্মে দেখিয়েছেন এই সময়কে আরকিওলজি অফ সাইকিয়াট্রিক বলে চিহ্নিত করেছেন । অনুরূপভাবে ফুকোর প্রধান সমালোচক এন্ডু স্কাল ও লরেন্স স্টোন এই তত্ত্বকে স্বীকার করেছেন ।

সাম্প্রতিককালে জ্ঞানচর্চায় এন্ডু স্কাল এক অনন্য প্রভাব রেখেছেন । পশ্চিমা জ্ঞান ও জ্ঞানচর্চার গন্ডি পেরিয়ে তিনি বুঝতে চেয়েছেন এর অতীত - বর্তমান , খুঁজতে চেয়েছেন এর অন্তঃসারশূন্যতা, আর মাপতে চেয়েছেন এর মেকির পরিমাণ । পাগলামি সম্পর্কিত ধারণা , জ্ঞান বিষয়ক উপলব্ধি, আইন ও শাস্তি বিষয়ক ব্যবহার এ সবকিছুর প্রতি আমাদের মনোভাবের গোড়া নড়বড়ে করে তিনি যাবতীয় চিন্তাভাবনা উপস্থাপন করেছেন প্রচলিত চিন্তাভাবনার প্রায় বিপরীতে দাঁড়িয়ে । তিনি চিহ্নিত করেছেন আমাদের জ্ঞানচর্চার ফাঁক - ফোকর , চুতি - বিচ্যুতি আর নির্মাণ - অনির্মাণের ব্যাপারগুলোকে । অন্যদিকে এসব দৃষ্টিভঙ্গি ও সুগভীর বিশ্লেষণ একালের দর্শন , ইতিহাস , মনোবিজ্ঞান , সমাজবিদ্যা থেকে শুরু করে বহু বিষয়েই প্রভাব ফেলেছে , বদলে দিয়েছে চিন্তার ধরন । তিনি মানব সভ্যতার পুনর্বিচচার করেছেন । তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে , স্কুল - হাসপাতাল - কারাগার পাগলাগারদ হল ক্ষমতারযন্ত্র এবং ক্ষমতার দাসত্ব শেখানোর জায়গা , আর আইন হল ক্ষমতার একটি হাতিয়ার[32] । প্রাচ্য দেশের ভাবনায় ঠিক এই কথাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বলেছেন তার “ প্রচলিত দন্ডরীতি ” ও পাগল নামক প্রবন্ধে । তিনি আমাদের দেখিয়েছেন পাগলামি সম্পর্কিত সভ্যসমাজের দৃষ্টিভঙ্গি এবং এর সংশোধনযোগ্য উপলব্ধি ।

---

[32] ভট্টাচার্য , তপধীর : মিশেল ফুকো : তার তত্ত্ববিশ্ব দেজ পাবলিশিং , কলকাতা ২০১৩ , পৃ : ৭৮

আধুনিক সভ্যততা যখন পাগলকে যৌক্তিক মানুষের বিপরীতে স্থান দিল তখন ফুকো ওদের রক্ষা করতে ক্ষেপে উঠেছিলেন। কিন্তু কেন ? পাশ্চাত্য সভ্যতায় বসে সবার মাঝে আলো জ্বালবার প্রয়াস নিয়ে , যারা আলোকিত নয় ফুকো তাদের বানাতে চেয়েছিলেন অলোকলোক , যে আলো স্ব-অভ্যন্তর হতেবিচ্ছুরিত হয়। ফুকোর মতে , ম্যাডনেস বা পাগলামি হতে পারে যৌক্তিকতার বিপরীত, কিন্তু অযৌক্তিকতায় ঘুরপাক খায় না[33] ।

এন্ড্রু স্কাল অনেককিছুই ভেবেছে পাগলামি নিয়ে । লিখেছেন ঔপনিবেশিক মানসিক স্বাস্থ্য নিয়েও। যদিও পাগলদের নিয়ে এই সৃষ্টিশীলতাকে অনেক সমালোচক এটাকে পাগল রোমান্টিসিজম বলছেন, কিন্তু তার এই পাগলামি তথা ম্যাডনেস ধারণাটি পরবর্তীতে মনোবিজ্ঞানের একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করবে সেটা অনেক সমালোচক বুঝে উঠতে পারেননি। পাগলামি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নানারকমভাবে ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে হয়েছে কিন্তু ৭০-৮০ - এর দশক এর পর থেকে পাগলামি ইতিহাস সম্পূর্ণ বদলে গেছে । অর্থাৎ ফুকো পাগলামি ও সভ্যতাকে যেভাবে দেখেছেন, পরবর্তীকালে এন্ডুস্কাল সময় থেকে অন্যান্য পন্ডিতদের আলোচনায় পাগলামি- ইতিহাসচর্চা এক ভিন্ন রূপ পেয়েছে। প্রসঙ্গত বাংলার সামাজিক - সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে পাগল ও পাগলামির ইতিহাস ফুকো ঘরাণায় দেখলে চলবে না। তর্কের খাতিরে যদি বলা হয় মিশেল ফুকো যদি ভারতীয় সমাজে জন্মগ্রহণ করতেন তাহলে “ম্যাডনেস এ্যাণ্ড সিভিলাইজেসন” লেখা হতো অন্যভাবে । অতএব সার্বিকভাবে বলা যায় , পাগলের ইতিহাস ইউরোপীয় দৃষ্টিকোন থেকে দেখলে চলবে না । দেখতে হবে বাংলার সামাজিক ও এতিহ্যের দৃষ্টিকোন থেকে। পাগলামি আর যৌতিকতা এই দুটি বিষয় মানব সভ্যতার ইতিহাসে ধীরে ধীরে একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে । আর এটা সবচেয়ে বেশী ঘটেছে আধুনিক বিশ্বে তথা বর্তমান সময়ে নির্বুদ্ধিতা, বোকামী, উন্মাদনা বা আতঙ্কিত বা উৎকণ্ঠিত ক্ষিপ্ত অবস্থা যাই বলা হোক না কেন যেটা কিনা বর্তমান সময়ে বৈজ্ঞানিক পন্থায় চিকিৎসা করতে হবে । উপশম ঘটাতে হবে আর এই বিষয়কে ভিত্তিকরে সাইকো প্যাথোলজি বা অসুস্থতার কথা বলে কৃত্তিমভাবে পাগলকে পৃথকীকরণ করা হয়েছে ।

---

[33] বাবু রাই , ' মিশেল ফুকো'র পাগল বন্দনা ' ব্যবচ্ছেদ দ্বিতীয় সংখ্যা - সেপ্টেম্বর -২০১৩ , পৃ : ৩৮

আবার বোকা বা অপ্রকৃতিস্থ ক্ষিপ্ত মানুষদের যাকে ফুকো বলেছেন "act of scission[34] "। এই "act of scission" বিষয়টিকে একটু সহজ ভাবে বোঝার জন্য কয়েকটি দৃশ্যের উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করা হলো ।যেমন-

**ঘটনা-১** বঙ্গপুরে বাস করে ফটিক । সে সবকিছুতেই প্রশ্ন খোঁজে । সভ্যমানুষ থেকে একটু আলাদাভাবে সবকিছু চিন্তা করে । একদিন বঙ্গরাজা সিদ্ধান্ত নিলেন , রঙ্গরাজাকে এক নৈশভোজের নিমন্ত্রণ করবেন । তাই ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রজাদের জানানো হল । কিন্তু ফটিকের মনে প্রশ্ন জাগল, ' কেন বঙ্গরাজা রঙ্গরাজাকে ভোজের নিমন্ত্রণ জানাবে ? যেখানে প্রজারা অনাহারে মরে , সেখানে রাজ্যের এতগুলো অর্থ কেন খরচ করবে ? তাই ফটিক প্রজাদের সচেতন সচেতন করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে । এতে বঙ্গরাজা মুশকিলে পরে । তাই সমাধানের জন্য ফটিককে বিচারে ডাকা হল । বিচারে রায় হল , ফটিক একটা উন্মাদ মানুষ । সে পাগল হয়ে গেছে । তার নাম রাখা হলড় ফটিক পাগলা । তার স্থান হল পাগলাগারদে[35] ।

**ঘটনা-২** একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে এক কন্যা - শিশুর জন্ম হল । শিশুটি বেড়ে ওঠার সাথে সাথে সমাজের পুরুষতান্ত্রিকতা , ধর্মান্ধতা , অধিকার , নিয়মতান্ত্রিকতা , যৌনতা প্রভৃতি বিষয়ে প্রশ্নবিদ্ধ হল । কেন এমন হল নারীদের জীবন ? পুরুষের মত নারীরা কেন এত সুযোগ সুবিধা পেল না ? প্রাপ্তবয়সে তার মনের মধ্যে এক অন্যরকম অবস্থার সৃষ্টি হল । একেটা সময়ে সমাজের প্রচলিত রীতিনীতিকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করলো সে । বাবা - মা ও আত্মীয়রা মেয়েটির এই পরিস্থিতি সমাধানের উপায় হিসেবে তাকে বিয়ে দিল । বিয়ের পর স্বামী বিষয় গুলো মেনে নিতে পারল না। স্বামীর অভিযোগ তার স্ত্রী একজন মানসিক রোগী । স্বামীর অভিযোগে অভিযুক্ত মেয়েটিকে অবশেষে যেতে হল মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে । অবশেষে সেই মেয়েটিকে হারাতে হল সামাজিক মর্যাদা বঞ্চিত হতে হল পৈতৃক সম্পত্তি থেকে , এমনকি পরিত্যক্ত হলেন ঘরসংসার থেকে ।

---

[34] ল্যাক্রিটজ, কেনেথ; সাইকিয়াট্রিক টাইমস মিশেল ফুকোর ম্যাডনেস অ্যান্ড সিভিলাইজেশন এ হিজ স্টোরি অফ ইনসানিটি ইন দ্য এজ অফ রিজন ( রিভিউ ), জুন -৫, ২০০৯। ভলিউম -২৬, পৃ - ৬

[35] বাবু রাই , ' মিশেল ফুকোর পাগল বন্দনা' ব্যবচ্ছেদ দ্বিতীয় সংখ্যা - সেপ্টেম্বর -২০১৩ , পৃ : ৩৯

**ঘটনা-৩** বিদ্যালয়ের একজন বাংলা শিক্ষক । তিনি জ্ঞানচর্চায় অনেক বেশি আবেগী । তার এই আবেগটা এমন এক পর্যায়ে ঠেকেছে যা তার মনের মধ্যে অন্যরকম এক অবস্থা সৃষ্টি করেছে। ফলে তিনি শিক্ষার্থীদের পাঠদানে আগ্রহ হারিয়ে ফেললেন । শ্রেণিকক্ষে সুযোগ পেলে কিংবা অতিরিক্ত সময় পেলে শিক্ষার্থীদের সাথে ভুগোল ও বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। বিষয়টি প্রধান শিক্ষক জ্ঞাত হয়ে ওই শিক্ষককে পাঠদানে মনোযোগী হতে বললে তাকেও ( প্রধান শিক্ষক) ভূগোল ও বিজ্ঞান বিষয়ের গুরুত্ব তুলে ধরেন । একটা পর্যায়ে ওই শিক্ষক সবার মাথাব্যথার কারণ হলেন । আখ্যায়িত হলেন উন্মাদ শিক্ষক হিসেবে । সুতরাং তার চিকিৎসা প্রয়োজন । বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে মানসিক চিকিৎসালয়ে পাঠালেন । চিকিৎসা শেষে তিনি উপলব্ধি করলেন যে , সমাজ - সভ্যতা মানুষকে যেভাবে চলতে বলে সেভাবে চলাই হল সভ্যতা । পরে যখন শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা ওই শিক্ষককে বিজ্ঞান ও ভূগোল বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দিলেন , মানসিক চিকিৎসা নিয়ে আমি - ততা এখন সুস্থ আমি আর ভূগোল - বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করব না , আমি তোমাদের বাংলা পড়াব[36] ।বিষয়গুলোর আলোকে বলতে হয় , সমাজ - সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতায় প্রচলিত ধ্রুববিশ্বাস , আদবকায়দা , অনুশাসন , নৈরাজ্য , ধর্মান্ধতা, ধ্যানজ্ঞান , প্রেম প্রভৃতির বিপরীতে বা প্রায়- বিপরীতে যখন কোন মানুষের মনোজগতে সন্দেহ , উৎকণ্ঠা , দ্বন্দ্ব , আতঙ্ক প্রভৃতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে তখন সে হয় পাগল , বদ্ধউন্মাদ বা দিওয়ানা । এসব মানুষের আত্মদর্শন বা অনুসন্ধিৎসু মন অথবা দ্বিধাগ্রস্ততা অবমূল্যায়ন করে তাদের জন্য গড়ে তোলা হয়েছে উন্মাদ আশ্রম বা মেন্টাল অ্যাসাইলাম তথা পাগলাগারদ। মধ্যযুগে ইউরোপে যে পাগলামিগুলো ছিল মানব অভিজ্ঞততার এক আধ্যাত্মিক অংশ ,রেনেসাঁ পরবর্তী সময়ে তথা সভ্যতা অগ্রগতির সাথে সাথে সেই পাগলামিগুলোই যেন হয়ে উঠলো সভ্য মানুষের ঠিক বিপরীত অবস্থা তথা বিশেষ কারণে এক ধরনের বিদ্রুপিদ্মক অবস্থা । আর তাই উন্মোচন ঘটল এই জগতের ননসেন্স গুলোর , যারা সমাজে প্রয়োজনহীনতার মর্যাদা পেল । কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ননসেন্সরা হয়ে উঠলো ট্র্যাজিক , আবার কখনও - বা কমিক [37] ।

---

[36] তদেব -৪০

[37] তদেব -৪২

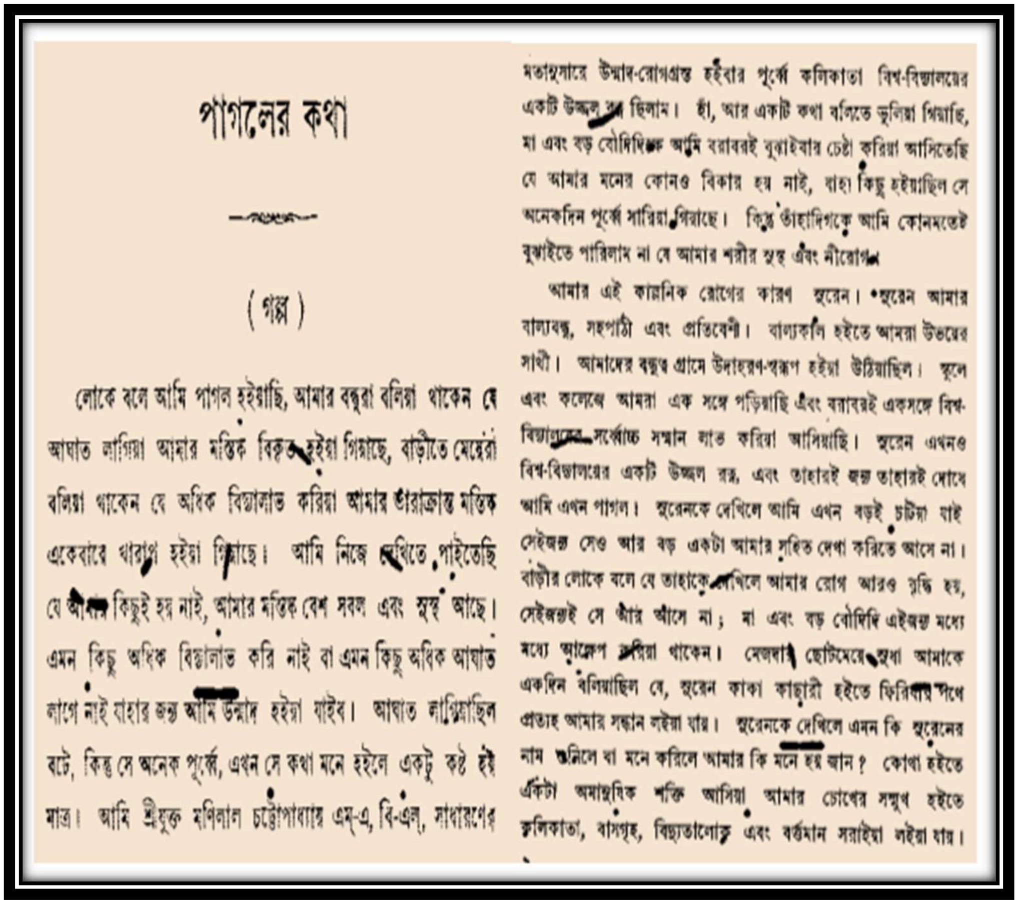

# পাগলের কথা

(গল্প)

লোকে বলে আমি পাগল হইয়াছি, আমার বন্ধুরা বলিয়া থাকেন যে আঘাত লাগিয়া আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে, বাড়ীতে মেয়েরা বলিয়া থাকেন যে অধিক বিদ্যালাভ করিয়া আমার ভারাক্রান্ত মস্তিষ্ক একেবারে খারাপ হইয়া গিয়াছে। আমি নিজে দেখিতে পাইতেছি যে আমার কিছুই হয় নাই, আমার মস্তিষ্ক বেশ সবল এবং সুস্থ আছে। এমন কিছু অধিক বিদ্যালাভ করি নাই বা এমন কিছু অধিক আঘাত লাগে নাই যাহার জন্য আমি উন্মাদ হইয়া যাইব। আঘাত লাগিয়াছিল বটে, কিন্তু সে অনেক পূর্ব্বে, এখন সে কথা মনে হইলে একটু কষ্ট হই মাত্র। আমি শ্রীযুক্ত মণিলাল চট্টোপাধ্যায় এম্‌-এ, বি-এল্‌, সাধারণের মতানুসারে উন্মাদ-রোগগ্রস্ত হইবার পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একটি উজ্জ্বল রত্ন ছিলাম। হাঁ, আর একটি কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, মা এবং বড় বৌদিদিকে আমি বরাবরই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি যে আমার মনের কোনও বিকার হয় নাই, যাহা কিছু হইয়াছিল সে অনেকদিন পূর্ব্বে সারিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদিগকে আমি কোনমতেই বুঝাইতে পারিলাম না যে আমার শরীর সুস্থ এবং নীরোগ।

আমার এই কাল্পনিক রোগের কারণ সুরেন। সুরেন আমার বাল্যবন্ধু, সহপাঠী এবং প্রতিবেশী। বাল্যকাল হইতে আমরা উভয়ের সাথী। আমাদের বন্ধুত্ব গ্রামে উদাহরণ-স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। স্কুলে এবং কলেজে আমরা এক সঙ্গে পড়িয়াছি এবং বরাবরই একসঙ্গে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ সম্মান লাভ করিয়া আসিয়াছি। সুরেন এখনও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একটি উজ্জ্বল রত্ন, এবং তাহারই জন্য তাহারই দোষে আমি এখন পাগল। সুরেনকে দেখিলে আমি এখন বড়ই চটিয়া যাই সেইজন্য সেও আর বড় একটা আমার সহিত দেখা করিতে আসে না। বাড়ীর লোকে বলে যে তাহাকে দেখিলে আমার রোগ আরও বৃদ্ধি হয়, সেইজন্যই সে আর আসে না; মা এবং বড় বৌদিদি এইজন্য মধ্যে মধ্যে আক্ষেপ করিয়া থাকেন। মেজদার ছোটমেয়ে সুধা আমাকে একদিন বলিয়াছিল যে, সুরেন কাকা কাছারী হইতে ফিরিবার পথে প্রত্যহ আমার সন্ধান লইয়া যায়। সুরেনকে দেখিলে এমন কি সুরেনের নাম শুনিলে বা মনে করিলে আমার কি মনে হয় জান? কোথা হইতে একটা অমানুষিক শক্তি আসিয়া আমার চোখের সম্মুখ হইতে কলিকাতা, বাসগৃহ, বিদ্যুতালোক এবং বর্ত্তমান সরাইয়া লইয়া যায়।

গল্পগুচ্ছ , পাগলের কথা, সাউথ এশিয়ান আর্কাইভ থেকে সংগৃহীত, ই- সোর্স।

**ঘটনা-৪** লোকে বলে আমি পাগল হয়েছি , আমার বন্ধুরা বলে থাকেন যে আঘাত লেগে আমার মস্তিস্ক বিকৃত হয়েছে , বাড়িতে মেয়েরা বলে থাকেন যে অধিক বিদ্যালাভ করে আমার মস্তিস্ক একেবারে খারাপ হয়ে গিয়েছে । কিন্তু আমি নিজে বুঝতে পারছি যে আমার কিছু হয়নি । আমার মস্তিস্ক বেশ সবল এবং সুস্থ আছে । এমন কিছু অধিক বিদ্যা লাভ করিনি এমন কিছু আঘাত লাগে নি যার জন্য আমি উন্মাদ হয়ে গেছি । আগাহত লেগেছিলবটে কিন্তু সে অনেক পূর্বে, এখন সে ক্কথা মনে হলে একটু কষ্ট হয়মাত্র । আমি শ্রীযুক্ত মনিলাল চট্টোপাধ্যায় এম.এ, বি.এল, সাধারনের মতানুসারে উন্মাদ রোগ গ্রস্থ হওয়ার পূর্বে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি উজ্জ্বল রত্ন ছিলাম । হাঁ আর একটি কথা বলতে ভুলে গেছি , মা এবং বর বৌদি কে বারং বার বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে আমার কোন মানসিক রোগ হয়নি । যা কিছুকাল ছিল ছিল তা পূর্বে সারিয়া গিয়েছে । কিন্তু আদের কে আমি কোন মতে বঝাইতে পারলাম না যে আমি পুরপুরি সুস্থ ।

আমার এই কাল্পনিক রোগের কারন হল সুরেন। সুরেন আমার বাল্য বন্ধু, সহপাঠী এবং প্রতিবেশী। বাল্যকাল থেকে আমারা উভয়ের সাথী। আমাদের বন্ধুত্ব গ্রামে উদাহরণ সরূপ হয়ে উঠেছিল । স্কুলে এবং কলেজে আমরা এক সঙ্গে পড়েছি এবং বরাবরই এক সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বচ্চো সন্মান লাভ করে এসেছি। সুরেন এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের একই উজ্জ্বল রত্ন এবং তার দোষে আমি এখন পাগল। সুরেন কে দেখলে আমি এখন বড়ই চটে যায় । সেই জন্য সেও আর আমার সঙ্গে আর দেখা করতে আসে না । বারির লোকে বলে যে তাকে দেখলে আমার রাগ বৃদ্ধি হয়, সেই জন্য সে আর আসে না । মা এবং বৌদি এই জন্য মধ্যে মধ্যে আক্ষেপ করে থাকে[38]।

অর্থাৎ যে মানুষগুলো সভ্যসমাজের সাথে শামিল হতে পারে না কিংবা যাদের হতে দেওয়া হয় না, সেই অযৌক্তিক ও সভ্যতা -বঞ্চিত মানুষগুলোর বাতিলীকরণ হয় পাগলামি নামে । আলোকপ্রাপ্ত ইউরোপে যুক্তি, বিজ্ঞান ও সভ্যতার আলোকে পৃথিবীব্যাপী ক্ষমতার মতাদর্শের যখন উৎসব চলে, সেই সময়ে ইউরোপে বড় - বড় পাগলাগারদে পাগলেরা ছাড়াও চোর, ডাকাত, বিপ-বীররাও স্থান পেত । অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এইসব পাগল বিষয়ক ধারণা, ওদের আউটলুক ,ওদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি তথা প্রতিটি ক্ষেত্রে নতুন সমাজ - সভ্যতার স্বভাবসিদ্ধ মানুষের অবস্থার যে পরিবর্তন হয়েছে, তা - যেন এই পাগলদের ট্র্যাজিক কমিক ও উন্মাদ - অবাঞ্ছিত খোলস সমূহে রাখা হয়েছে । সেই সাথে মহাবিশ্বের আইনের সাথে বিরোধিততায় ফেলা হয়েছে। পরবর্তীতে তাদের রাখা হল হাসপাতালের একঘেয়ে বিমর্ষ শয্যায় অথবা উন্মাদ আশ্রমে। বিবর্তনের ধারায় ওরা এখন ' সাইকিয়াট্রিক প্রবলেম খোলসে আবৃত। ফুকো বলছেন, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর পাগলাগারদগুলো ঠিক মেডিকেল - আশ্রম ছিল না, ছিল “semi - juridicial” প্রতিষ্ঠান । পাগল ছাড়াও বেকার, গরীব, নিঃস্ব, ফকির তথা যারা ছিল মেইনস্ট্রিম সমাজ থেকে বাইরে, তাদের আশ্রয় জুটতো সেখানে[39] ।

---

[38] গল্পগুচ্ছ, পাগলের কথা, সাউথ এশিয়ান আর্কাইভ থেকে সংগৃহীত, ই- সোর্স। http://www.southasiaarchive.com/Content/sarf.143173/209684/002

[39] হাফার, লিন; ম্যাড ফর ফুকো : রিথিংকিং দ্যা ফাউন্ড্যাশন অফ কুয়ের থিয়োরি, কলোম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস অস্ট্রেলিয়া . ২০১০, পৃ - ৪

মেইনস্ট্রিম সমাজ থেকে বঞ্চিত হয় না মাতালেরা । এই মাতালরা যদি বদ্ধ উন্মাদের মতো বা তার চেয়ে বেশি উন্মাদনায় মেতে থাকে তারপরও তারা মেইনস্ট্রিম সমাজ থেকে বঞ্চিত হয় না। এক্ষেত্রে সমাজের সভ্যমানুষদের যুক্তি হল , তারা মাতলামি করে,পরদিন সকালে ঘুম থেকে জেগে মেইনস্ট্রিম সমাজের একটা অংশ হয়ে যাবে , তারা অযৌক্তিক মানুষ না। কিন্তু পাগলরা নেশাগ্রস্ত না হয়েই বদ্ধ উন্মাদের মতো আচরণ করে বলেই তাদের অবস্থান যুক্তির ঠিক বিপরীত , তাই তারা সমাজ বহির্ভূত, তাদের আচরণ সভ্যসমাজের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। এটা কোন বিচার[40] ? আমরা যারা সভ্য মানুষ, তারা কী বুঝতে চাই - না যে , নেশাগ্রস্তনা হয়েও কোনো একজন মানুষ রাস্তায় একপাশে দাঁড়িয়ে কিংবা চলতে চলতে বিড়বিড় করে কথা বলছে অথবা রাস্তাই মাঝে চিৎকার করে আবল - তাবল বকছে ? না আমরা তা কখনোই বুঝতে চাই না । কারণ সমাজ তাদের সাধারণ বাংলায় বলে পাগল । আর পাগল যা করে তা নিছক পাগলামি ছাড়া কিছুই না । আবার এই পাগলামি যখন বাড়াবাড়ি পর্যায়ে যায় , তখন পাগলের মাথাখারাপ হয়েছে বলতে একটুও দেরি করি না । কারণ এই সভ্যসমাজ আমাদের এভাবেই শিখিয়েছে । ওরা অযৌক্তিক , ওরা অসম্ভব কল্পনা করে , ওদের কথাবার্তা অর্থহীন ইত্যাদি অভিযোগে অভিযুক্ত এই পাগলেরা এই সমাজ সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে অনেক আগেই । আবার এই সভ্যসমাজে কেউ যদি এই পাগলদের আচরণ বা পাগলামি নিয়ে মাতামাতি করে তাহলে আরও রেহাই নেই । পাগলের খাতায় তারও নাম সংযুক্ত হবে । কিন্তু যে মানুষটি সমাজের অসংগতি বা পরিবার কর্তৃক আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে কিংবা সমাজের নানা অনৈতিক বা আতঙ্কিত বিষয়ের প্রেক্ষিতে মনের মধ্যে যে ' অন্যরকম অবস্থার বহিঃপ্রকাশ ঘটায় তাকে পাগল বলে আখ্যা না দিলে কি সমাজ - সভ্যতার খুব ক্ষতি হয়ে যেত ? নাকি অন্য কিছু বিষয় লুকিয়ে আছে এখানে। যা এই সমাজ বা পরিবারের অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাবানরাতাদেও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য ওনসব আতঙ্কিত , আঘাতপ্রাপ্ত , অতিমাত্রায় যুক্তিশীল , প্রতিবাদী , বিপ্লবী , অনুসন্ধিৎসু মানুষদের পাগল বলে সমাজ বা পরিবার বিচ্ছিন্ন করার একটা ঐতিহাসিক ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার অংশ । আর এই ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার আর একটি অংশ মানসিক চিকিৎসা যা সমাজে বেশ শক্তপোক্ত অবস্থান

[40] তদেব , পৃষ্ঠা- ৪২

করে নিয়েছে । সুতরাং তোমরা যারা পাগল , তারা চিকিৎসা নাও , তারপর যুক্তিবাদী হও । সমাজের যে নোংরা কাজটির কারণে তোমরা যারা আতঙ্কিত হয়ে নির্মূপ সারারাত নির্ঘুম থেকে সারাক্ষণ উদাসীন হয়ে থাকো , তারা ভুলে যাও সমাজের এই নোংরা বিষয়টিকে । আবার যারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে তারাও আঘাতের কারণ ভুলে যাও । যে অসামাজিক কাজটির প্রতিবাদ করতে গিয়ে যারা প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে রাস্তাই মাঝে চিৎকার - চেচামেচি কর , তোমরা সেই অসামাজিক ঘটনাটি ভুলে যাও । এভাবে অতিমাত্রায় যুক্তিশীল যারা , তারা সব প্রশ্ন মন থেকে ভুলে যাও । ঔষধ খাও , চিকিৎসা নাও , তারপর সভ্যসমাজে ফিরে আসো ।

কিন্তু যে পাগলটি রাস্তাই একপাশে দাঁড়িয়ে অদৃশ্য কাউকে উদ্দেশ্য করে কথা বলছে আনমনে , কিংবা রাস্তাই মাঝখানে দাঁড়িয়ে অদৃশ্য কোনোকিছুকে উদ্দেশ্য করে চিৎকার করছে , সে পাগলটির এই অদৃশ্য ব্যক্তি বা বস্তুর রহস্য কী ? যাকে বা যাসভ্যসমাজ দেখতে পারেনা। না - কি সভ্যসমাজের অনেক অসভ্যতা , অসামাজিক গতানুগতিকতার বাইরে প্রতিটি পাগল তাদের মনের মধ্যে স্বতন্ত্রতা বজায় রেখে এক - একটি জগত তৈরি করেছে যা সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়।

তাই উন্মাদ পাগলদের নির্বুদ্ধিতার নীরব ভাষাগুলোর বিজ্ঞান ভিত্তিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক উৎস খোঁজা জরুরি নয় ? সেইকালের অর্থনৈতিক অবস্থার ওঠা - নামায় এই পাগলদের দুই রকম অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। এক অর্থনৈতিক মন্দাবস্থায় তাদের আশ্রমে ঠেলেঠুলে বিশ্রামে রাখা ; এবং দুই কর্মক্ষম প্রোডাক্টিভ সময়ে তাদের কম পয়সায় কাজে লাগানো। সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপে অযৌক্তিক মানুষদের আশ্রমে পুনর্বাসনের এই সময় ছিল ‘The great confinement’ ।

এই ‘*The great confinement*’ এর সময়ই পাগলদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের আরেকটি ধাপ শুরু হয় । শুরু হয় ওদেরকে মানুষ হিসেবে গণ্য না করার পাঁয়তারা । মানবোচিত গুণাবলী হতে বিচ্যুতিঘটানো। মানবোচিত বৈশিষ্ট্য হরণ । আগে যেটা ছিল মানুষের সহজাত - প্রবৃত্তির একটি দিক মাত্র , এখন সেটি যেন হয়ে উঠল নিম্নস্তরের বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন জন্তু বিশেষের প্রকৃতি। পশু - প্রকৃতি । এখান থেকেই শুরু হয় প্রাথমিক মনোবিদ্যার একটি ধারা । শুরু হয় শ্রেণিকরণের সূত্রাবলীর । আবেগ - অনুভূতির তীব্র বহিঃপ্রকাশের উপর ভিত্তি করে নামকরণ করা হয় ম্যানিয়া,

মেলানকোলিয়া , হিস্টিরিয়া , হাইপোকন্ডিয়াইত্যাদি লেবেলিং - ট্যাগিং। আধুনিকতার সূর্য ওঠার সাথে সাথে এই পাগলামি ক্রমান্বয়ে পরিণত হয় মনোবিদ্যার একটি অবজেক্ট হিসেবে। সর্বপ্রকার ধর্মীয় আর নৈতিকতার লেবাস ছাড়িয়ে এটাকে এখন পুরোপুরি চিকিৎসাবিদ্যার তত্ত্বাবধানে আনা হয়। যেখানে পূর্ববর্তী সময়ে অযৌক্তিকতা হয়তো যুক্তিবাদিতা'র একটা বিশেষ রূপ হিসেবেই বিদ্যমান ছিল, আধুনিক মনোবিদ্যা এখন পাগলদের নীরবতার উপর দাঁড়িয়ে তাদের জন্য নিবন্ধ রচনা করছে যেন । মানসিক অসুখের সামাজিক , রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিকটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন , তখন তিনি এটিকে ক্ষমতাসীনদের একটি রাজনৈতিক কৌশল হিসেবেও ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

রেনেসাঁর সময় এই পাগল মানুষরাই যেন জগতের মানব - নাট্যশালা -রঙ্গমঞ্চের দুটো দিক তুলে ধরেছিল , একদিকে ছিল ওরা নিজেরা , আর আরেকদিকে ছিল রঙ্গমঞ্চের দুটো দিক তুলে ধরেছিল,একদিকে ছিল ওরা নিজেরা , আর আরেকদিকে ছিল কাঙ্ক্ষিত সেই যুক্তিবাদ ; কীভাবে কত সহজে বোঝা যেত , দাঁড়িপাল্লার কোন উৎকৃষ্ট দিকটিতে সভ্য - মানুষ আছে ? ফলে সভ্যজগতের মূল অর্থহীনতার একটি রূপ তৈরি হল , আর সেটা হল ড় যারা উন্মাদ তারা অসুস্থ আর আমরা সুস্থ , আমাদের (সভ্যদের) দলে তুমি (উন্মাদ) না , সুতরাং ডাক্তার দেখাও , যুক্তিবাদী হতে শেখো অথবা যুক্তির আলোয় তোমার উন্মাদনা ব্যাখ্যা কর। পাগলামিকে ইতিহাসের যুক্তিতে ফেলা যায় না । কারণ , তখন আর সেটা পাগলামি থাকে না । কারণ তখন পাগলামি হয়ে উঠে অন্য রূপে , যুক্তি সাথে তখন ভাব ও আবেগও মুক্ত হয়ে পরে । এরাই পারবে অযৌক্তিক , অসামাজিক এবং ভাষা - বহির্ভূত বিষয়গুলো ধরতে এবং এতে কিছু উপলব্ধি ও অনুভূতি অবশ্যই পাওয়া যাবে।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করলে সংকীর্ণ অর্থে ভাবনা কথাটির তিনটি স্তর পর্যায়ের বুনোট বা ম্যাট্রিক্স কে বোঝায় যথা , সম্প্রত্যয় বা কনসেপ্ট গঠন , অবধারণ বা জাজমেন্ট

এর পর্যায় এবং যুক্তিবিচার বা রিজনিং - এর পর্যায়[41] । ঠিক এই ভাবে পাগল ধারণা গঠনের ক্ষেত্রে উক্ত তিনটি পর্যায় পরিলক্ষিত হয় ।

মানুষের অস্বাভাবিক আচরণ নানারকম সামাজিক অভিঘাতের ফল । কিন্তু এই অভিঘাত সামাজিক দৃষ্টিকোণ ছাড়াও কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। অর্থাৎ চরম পর্যায়ে পাগলামি কি শুধু সামাজিকঅভিঘাত[42] । মানুষ মনের অবস্থা খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত এক অনুবীক্ষণ অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। আর ঠিক তখন - ই মনে হওয়া স্বাভাবিক , মানুষের সুখ - দুঃখ , আবেগ - অনুভূতি শেষ পর্যন্ত কি তাহলে শুধু- ই জৈব-রসায়ন ? অনুধাবন করা যায় আধুনিক বায়োলোজি মস্তিষ্কের কোটরের ভিতরে আলো জ্বালিয়েছে ঠিকই। কিন্তু বহির্জগতের আলোর সাথে মস্তিষ্কের কোটরের আলোর যোগসূত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি [43] । মস্তিস্কের অনুকোষ স্তরের ছবি তৈরী হচ্ছে। রসায়নের সাথে তার সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে , কিন্তু মস্তিষ্কের মধ্যে বাইরের পৃথিবীর ছবি , তার সমাজ - সংস্কৃতি, মূল্যবোধের অনুলিখনের রহস্য স্পষ্ট হয়ে উঠেনি। উনিশ শতকের শেষার্ধে মনোবিজ্ঞানে আলোচনায় সাইক্রিয়াটিক প্রতিষ্ঠান গুলি মানসিক অসুস্থতার রোগ নির্ণয়বিভাগ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছে , সামাজিক সম্পর্কের সঙ্গে অস্বাভাবিক আচরণের যোগসূত্রকে গুরুত্ব আরোপ করেছেন

> *"A large Proportion of behaviors that are currently regarded as mental illnesses are normal consequences of stressful social arrangements of forms of social deviance . A Congtrary to its general definition of mental disorder , the DSM ( Diagnostic and Statistical ) Manual of Mental Disorders ) and much research that follows from in considers all Symptoms , Whether internal or not, expected or not , deviant or not as signs of disorder"* [44].

---

[41] ধ্রুবজ্যোতি মজুমদার ; " চিন্তাভাবনার গোড়ার কথা " ; মানব মন ৪২ বর্ষ , ৩ সংখ্যা , সম্পাদনা - ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় , ১৯৯৯, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ১০

[42] শিবশঙ্কর শ্রেণী , পাগলের কথা , শ্রী চণ্ডীচরণ বসু কর্তৃক প্রকাশিত । কলকাতা , ১২৯৪ , পৃ . ৫ ।

[43] গৌতম বন্দোপাধ্যায় ; " পাভলভ - মনোরোগ চিকিৎসারী স্তম্ভ উজ্জল পথ , মানবমন , ( সম্পা :) ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় , ৩৮ বর্ষ , ৩৫ সংখ্যা , কলকাতা , অক্টোবর ১৯৯৯ , পৃষ্ঠা -৩৯

[44] হোরো উইটজ, এ. ভি; ক্রিয়েটিং মেন্টাল ইলনেস। ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো প্রেস, শিকাগো ২০০২ , পৃ - ৩৭

সমাজের সাথে মানসিক পরিমণ্ডলের যে সম্পর্ক এবং মানসিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে ব্যক্তি পরিমণ্ডলের যে অদ্ভুত সমন্বয় আর ব্যক্তির কার্যকলাপ বস্তুতান্ত্রিক সমাজের সঙ্গে যে সম্পর্কে আবদ্ধ তা দার্শনিক কার্ল মার্কস সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন । তিনি মানুষের কার্যকলাপ যে বস্তুকে কেন্দ্র করে চালিত হয় আর এই কার্যকলাপের সঙ্গে মস্তিষ্কের ক্রীয়া প্রক্রিয়ার এক অদ্ভুত সমন্বয় তারই ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে পণ্য পৌত্তলিকতামূলক সমাজ । সেই প্রসঙ্গ টি একটু আলোচনা করা জরুরি । কার্ল মার্ক্স মনে করেন "পন্য হল মূল বস্তু এবং এই বস্তু কে কেন্দ্র করে সমাজের নিয়ম পরিচালিত হয় যা সহজেই বোধগম্য । কিন্তু বিশে-ষণের ফলে দেখা গেলো যে তা বহু আধ্যাত্মিক ও অধিবিদ্যকে সুক্ষ তত্ত্বে পরিবৃত্ত একটি অদ্ভুদ ব্যাপার" ।আরমানুষের যত কার্যকলাপ এই পন্যকে কেন্দ্র । একটি[45] মানুষ জীবনে যত কাজ করে তার মুলত বস্তুকে কেন্দ্র করে চালিত হয় । আর বস্তুকেন্দ্রিক এই ক্রিয়া সম্পাদন সঙ্গে শ্রমের সম্পর্ক । " শরীর বৃত্তের ঘটনা এই যে শ্রম তা মানুষের জৈবদেহের মস্তিস্ক ,স্নায়ু , পেশী প্রভৃতির কার্যকলাপ " । পন্য কেন্দ্রিক শ্রম , সহজ ভাষায় মানুষের দৈন্দন্দিন কার্যকলাপ[46] মধ্যে সে আচারণ তা - যদি কখন স্বাভাবিকতাকে অতিক্রম করে তা হলে রক্ষা নেই । হয় সে বিদ্রোহী আরনা । হয় , সে পাগলামি করছে । পণ্যপৌত্তলিকতা যেমন আঋত্তিক সম্পর্কে যুক্ত অর্থাৎ শ্রমের প্রক্রিয়া সঙ্গে মানষিক প্রক্রিয়ার এক অদ্ভুদ মেলবন্ধন আছে । মানুষ সে শ্রম দান করে তা সম্পাদন করার পূর্বে তাকে মানুষিক ভাবে প্রস্তুতি নিতে হয় । আর এই মানুষিক কার্যকলাপ ও তার বহিঃপ্রকাশ যদি কখনো ত্রুটি , বিচ্যুতি হয় বা স্বাভাবিক মাপকাঠি অতিক্রম করে তখন সে অস্বাভাবিক । এবং অস্বাভাবিকত্ব যখন চরম মাত্রায় পৌঁছে যায় তখন সে পাগল । কিন্তু এই স্বাভাবিকতা ও অস্বাভাবিকতা যে মাপকাঠি তা তা ঠিক করে কারা ? তোমার কাছেযেটা স্বাভাবিক আমার কাছে সেটা অস্বাভাবক । আবার তোমার কাছে সেটা অস্বাভাবিক সেটা আমার কাছে স্বাভাবিকও তো হতে পারে।

মানুষ সামাজিক জীব , সমাজবদ্ধভাবে মিলেমিশে বসবাস করে । এজন্য আমাদের সমাজের কিছু নিয়মকানুন ও প্রচলিত রীতিনীতি মেনে চলতে হয় । কিন্তু এই প্রচলিত নিয়মকানুনের যারা

---

[45] কার্ল মার্কস ; ক্যাপিট্যাল প্রথম খণ্ড ; বাংলা অনুবাদ : আখতার হোসেন বাণীপ্রকাশ , ১৯৭৪ , কলকাতা , পৃষ্ঠা -৩৯ ,

[46] তদেব ; ৪০ ।

ব্যতিক্রম , অর্থাৎ ভিন্নধর্মী আচরণে ও কার্যকলাপের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করে তারাই পাগল বলে অবিহিত । কিন্তু পাগলামি তো সুস্থ মানুষের মধ্যে বর্তমান । সহজাতভাবে আমরা সবাই কমবেশী পাগলামি করি , হয়তো পাগলামির বহিঃপ্রকাশটা ভিন্নরকম । তবুও আমরা সমাজের নির্দিষ্ট একাংশকে পাগল বলে অবিহিত করি । এই একাংশ কারা? যারা একেবারে সমাজস্বীকৃত সামাজিক, পারিবারিক ও দৈনন্দিন কাজের নিয়ম মেনে চলে না , তাদেরকে পাগল আখ্যা দেওয়া হয়[47] । বিশেষত যখন এই নিয়ম ভাঙাটা এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছে যায় যেখানে সামাজিক বিধি-নীতি ও ডাক্তারি পরিভাষা দু - তরফ থেকেই সেই ব্যক্তির কোন নিয়ন্ত্রণ দেখা যায় না তখন তাকেই পাগল ডাকা হয়[48] ।

এই হিসাব মেনে চলতে গেলে লালন ফকির , শ্রীচৈতন্য বা সন্ত কবির এদের সকলকেই পাগল বলা চলে। কিন্তু এক্ষেত্রে কিছু তফাৎ আছে । তাদের ক্ষেত্রে যে পাগলামি টা হয়ে যায় , সেটা তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত। তা সে পূর্ব চেতনাতা থেকেই হোক বা অবচেতনাতে হোক । তারা মনে করে নিয়ম কৰেমান করা বা খাওয়া দাওয়া কোন মূল্যবান ব্যাপার নয় । বরং অন্য কোন ভাবনা অন্য কোন দিকে চলা তাদের কাছে জীবনের মূল উদ্দেশ্য । যখন এই অনুভূতি এক গভীর বোধের মধ্যে থেকে তৈরী হয় তখন দেখা যায় যে সব কিছু বুঝে , সব কিছুই জেনে এবং সব কিছুর পিছনে যুক্তি দেখতে পেলেও সেটা মানে না তখন আমরা বলি সে পাগলামি করছে । এই না মানা হচ্ছে পাগলামি। সামাজিক নিয়মের বা বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহের দুটো সম্ভাবনা থাকতে পারে। এক , বিদ্রোহ যদি সফল হয় , তাহলে সেই ব্যক্তি বিদ্রোহী । দুই , বিদ্রোহ যদি বিফল হয় , তখন সমাজ সেই ব্যক্তিকে পাগল রূপে চিহ্নিত করে[49] । যে নতুন পথ সে আবিষ্কার করছে তা সমাজে স্বীকৃত হলে সমস্যা হয় না , কিন্তু তা না হলে তাকে ঘোর বাধার মধ্য দিয়ে

---

[47] কুন্তল বন্দোপাধ্যায় পরিচালিত — একাঙ্ক নাটক “ অমল সিনড্রোম ' প্রথম প্রদর্শন — গিরিশ মঞ্চ , ১২ জুলাই ২০১৩ । একটি সাধারণ অধ্যাপক রাজনৈতিক কুপ্রভাবে ভীতগ্রস্থ হয়ে কিভাবে অস্বাভাবিক আচরণ করে এবং সমাজে লোকেরা ক্রমে ক্রমে পাগল রূপে অভিহিত করে, তা তিনি সুন্দর ভাবে প্রতিফলন ঘটিয়েছেন ।

[48] স্কাল , অ্যান্ড্রু,: ম্যাডনেস ইন সিভিলাইজ্যাশন ; এ কালচার হিস্টোরি অফ ইন্সানিটি ফ্রম দ্যা বাইবেল টু ফ্রয়েড , ফ্রম ম্যাড হাউস টু মডার্ন মেডিসিন , প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, প্রিঙ্কটন অ্যান্ড অক্সফোর্ড, ২০১৫

[49] জেমস এম. উইলস, টু " স্পিক , বিউটিফুল " ইন বাংলাদেশে " সাব্জেক্টিভিটি এস পাগলামী , পৃ - ১৯৭

যেতে হয় । সে তখন সমাজের গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি হয় না । অদ্ভুদ ব্যাপার হচ্ছে এই ব্যক্তি মুহুর্তে নেতা হয়ে উঠতে পারে অথবা সমাজচ্যুত হতে পারে , এবং সমাজচ্যুত হলেই সে পাগল[50] ।

পাগলের সংজ্ঞা নির্ধারণের পদ্ধতির মধ্যেই আছে পাগলকে অপর করে দেবার নিহিত প্রক্রিয়া । পুরানো ভারতীয় সমাজে বা অন্যান্য পশ্চাদপদ সমাজে পাগল আর পিছিয়ে পড়া মানুষদের কিছুটা জায়গা সহজভাবেই ছিল । কিন্তু সভ্যতা যত এগিয়েছে তত আমরা সক্ষমতাবাদী হয়ে উঠেছি । বেমানান মানুষগুলোকে একঘরে করে দেবার এক সুচারু প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল কয়েক শতক আগেই । মানবিক ব্যবহার পাওয়া তো দূরের কথা অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিকিৎসার পরিবর্তে জুটত বর্বোরোচিত শাস্তি [51] অথবা তাদের কয়েদ করো পাগলা গারদে , আর নয় জাহাজে চাপিয়ে পাচার করে দাও। এ প্রসঙ্গে ফুকো তার - এ দেখিয়েছেন এরকম এক জাহাজের কথাড় বোকাদের জাহাজ। আড়াই হাজার বছর আগে স্পার্টায় বিকলাঙ্গ শিশুদের পাহাড় থেকে ফেলে দেওয়া হতো । আমাদের দেশেও এরকম কুপ্রথা প্রচলিত ছিল । যেমন গঙ্গাসাগরে সন্ড়ান বিসর্জন [52] সমাজের বোঝা লাঘব করার জন্য । এখন আমরা অনেক সভ্য । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিছু রাজ্যে একপিঠের টিকিট কিনে ভিন রাজ্যগামী বাসে চাপিয়ে দেয় পাগলদের, যা ওদের শহরে । আমাদের দেশে বাসের বদলে ট্রাক , শহরের বদলে জঙ্গল ।

কর্নাটক সীমান্তবর্তী এক জঙ্গলে পাগল পাচার হয় তিন রাজ্য থেকে [53] । পাগল সরিয়ে দেবার আর একটা কারণ এদের সান্নিধ্যে আমাদের অস্বস্তি। শারীরিকভাবে অসুস্থ মানুষকে করুণা করা যায় , কিন্তু মনোরোগের সামাজিক অভিঘাত অন্যরকম । আর মনের খবর মানুষই একমাত্র রাখতে চায়। এই মনের বিষয় অতি প্রাচীন কাল থেকে মানুষের জিজ্ঞাসা। মানুষ সকলেই জ্ঞাত ও

[50] গৌতম হালদার ; না মানার পাগলামি : জীবনের ‘ বঙ্গ ও মঞ্চ - এ , ঐহিত্যিক , পাগল সংকলন , তমাল রায় ( সম্পাদিত ) , কলকাতা , ২০১৪ , পৃঃ ৩৩৯ ।

[51] ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ; ‘ মনোবিদ্যার ইতিবৃত্ত " মাণব মন , ৪৫ বর্ষ , প্রথম সংখ্যা , ২০০১ , কলকাতা , পৃ : ৮৩

[52] নাসিমা সেলিম ও প্রিয়া সাতলকর পি. ইরপশন অফ মেটাল ইনলেস ইন এ বাংলাদেশি ভিলেজ ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি জার্নাল ভলিউম – ৫ , নং ১, ২০০৮ , পৃ - ৪৭-৫৭

[53] কৌশিক দত্ত , ‘ প্রলাপ ' , ঐহিক , পাগল সংকলন কলকাতা , ২০১৪ , পৃঃ ১১ ।

অজ্ঞাতসারে মনস্তাত্বিক বা একজন মনোবিদ[54] মানুষের সবচেয়ে বড় অহংকার হল তার ধুরন্ধর মগজ যা তাকে দিয়েছে পৃথিবীর সাজানো সংসারে দাপিয়ে বেড়ানোর অধিকার । সেই মগজ অস্ত্রের বুনিয়াদ টলিয়ে দেয় পাগল । মানুষের দল থেকে তাকে বহিষ্কার না করলে প্রশ্নচিহ্ন লেগে যাবে মানুষ বিষয়ে অনেক সাধারণ ধারণার গায়ে । অতএব প্রয়োজন পাগলের আচরণ আর অভিজ্ঞতাকে অস্বাভাবিক বলে চিহ্নিত করে তার বিপ্রতীপ স্বাভাবিকের পুনর্নির্মাণ।

**ঔপনিবেশিক সময়ে** কালে সাধারণ লোকের কাছে পাগল ছিল - যে কেবল যা-তা বকে , রাস্তা ঘাটে ঘুরে বেড়ায় । আবার অনেক সময় হয়তো অন্য লোক কে মারধরও করে । মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে আমরা সাধারণ মানুষ পাগল সম্বন্ধে বিশেষ মাথা ঘামায় না । পাগল সম্বন্ধে এই উদাসীনতা সব দেশেই চিরকালই ছিল । কিন্তু বিগত কয়েক দশক ধরে আমাদের এ ধারনা কিছু কিছু বদলে গেছে । পূর্বে লোকের ধারনা ছিল যে , অনেক পাপ কাজ করলে তবে পাগল হয়। লোকে পাগল কে মতেই ভালো চোখে দেখত না। পাগল কে অনেক সময় উন্মাদ ডাইন বলা হত। এই অভিযোগে পুড়িয়ে মারার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে পাওয়া যায়[55]।

**ঔপনিবেশিক কাল পর্বের** শেষের দিকে অর্থাৎ প্রায় এক শতাব্দি পূর্ব থেকে মনবিদরা পাগলামি কে মনের রোগ প্রমান করেন এই সঙ্গে পূর্বকার সব ভ্রান্ত ধারনা ক্রমশ অবলুপ্তি ঘটে । মনবিদরা বলেন যেমন শারীরিক রোগের বিভিন্ন রকমফের দেখে যায় এবং লক্ষন অনুসারে চিকিৎসকরা বিভিন্নরোগের নাম দেন , ঠিক তেমনি ভাবেই মনবিদরা মানসিক রোগের ক্ষেত্রে নানারকম নামকরন দিয়ে থাকেন। মানসিক রোগ শুধু এক রকমের হয় না। সাধারন লোক, অল্প বিকৃতমস্তিস্ক এবং সম্পূর্ণ বিকৃত মস্তিস্ক ইত্যাদি নানা ধরনের পাগল আমাদের সমাজে দেখতে পাই। মোটামুটি ভাবে পাগলের তিন প্রকারের মানসিক বিকৃতি লক্ষ্য করা যায় বিকৃতের

[54] শ্রীকৃষ্ণ পদ মুখোপাধ্যায় , , “ মনের উত্তেজনা ও তাহার প্রতিকার " আয়ুর্বেদ ভারতী , শ্রী বগলা মজুমদার ( সম্পাদিত ) ,ভলিউম-৭ নং -১, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা -৬৪

[55] ভট্টাচার্য, ঊষা, পাগল , প্রবাসী , অগ্রহায়ন , ১৩৫৬, পৃষ্ঠা- ১৭১

প্রভাব অনুসারে এগুলি হল যথা নিউরোসিস , সাইকো নিউরোসিস ও সাইকোসিস[56] । নিউরোসিস বিকৃত বলতে বোঝায় সামান্য মানসিক বিকার যেগুলি পাগলের ক্ষেত্রে সবসময় লক্ষ্য করা যায় না । কিন্তু এই রোগ মাঝে মাঝে রোগীর যথেষ্ট কষ্টের কারন ঘটায় । নিউরোসিস ঘটিত পাগল আবার দুই প্রকারের যথা- উৎকণ্ঠা ও অ্যানেক্সিটি নিউরোসিস। এক্ষেত্রে পাগলের মনে সবসময় দারুন উদ্বেগ আর অস্থিরতা দেখা যায়। যে কোন সাধারণ ব্যাপার উপলক্ষ্য করে রোগীর মনে অযথা দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের সঞ্চার হয়। যেমন হয়তো রোগী সব সময় মনে মনে যে যদি তার বাবা মা বা কোন প্রিয়জনের মৃত্যু হয় তবে কি হবে । এই ভয় এদের সাধারনের ছেয়ে অনেক বেশী থেকে আর এর জন্য এরা মুহ্যমান হয়ে পড়ে । অপর প্রকারে অ্যানেক্সিটি নিউরোসিস হল স্নায়ুবিক অবসাদ । এই রোগে রোগী সর্বদা অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে থেকে । হাতে পায়ে মোটেই জোর থেকে না । সামান্য পরিশ্রমে রোগী অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করে[57] ।

দ্বিতীয় প্রকারের মানসিক বিকৃতি হল সাইকো নিউরোসিস । এর আবার অনেক প্রকারের ভেদ আছে, যথা বিপরিণামী হিস্টিরিয়া , আবেশিক সাইকোনিউরোসিস , হাইপোকন্ড্রিয়া, উৎকণ্ঠা হিষ্টিরিয়া ইত্যাদি। হিষ্টিরিয়া রোগে রোগীর মূচর্ছা স্বাবাভিক লক্ষন হতে পারে , মনে ইএ সকল রোগ মানসিক কোনটাই শরীরের ক্ষত থেকে সৃষ্টি হয় না যেমন একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি বোঝা যাবে, এক্ষেত্রে বিপরীতধর্মী হিষ্টিরিয়া কথাই ধরা যাক এক্ষেত্রে রোগী কোন মানসিক চিন্তা কে সত্য বলে মনে করে । ধরুন কোন লোকের ঘাড়ে সংসারের খুব চাপ আছে , আর সে কিছুতেই সংসার চালাতে পারছে না সেক্ষেত্রে সে সামনে আর কোন উপায় না দেখে সে যদি রোগের আশ্রয় নিতে পারে তবে হয়তো রেহাই পায়। সুতরাং রোগী এমন ভাবনা চিন্তা এমন ভাবে করতে থাকে যে সে কাধে ব্যথা অনুভব করে। অথচ চিকিৎসক পরীক্ষা করে হয়তো কোন কারন খুজেই পেল না । এসব ই মানসিক । অবশ্য এর কারন মনবিদ রা রোগীর সজ্ঞান মনে

[56] ভট্টাচার্য , শ্রীঊষা ; প্রবাসী ,অগ্রাহয়ন,১৩৫৬ বঙ্গাব্দ পৃষ্ঠা- ১৭২

[57] তদেব- পৃষ্ঠা- ১৭৩

পান না , তবে পাওয়া যায় অবচেতন মনে । মনঃসমীক্ষণের দ্বারা তা খুজে পাওয়া যায়। যার একটি প্রকাশ পায় রোগীর চিন্তাধারা মধ্যে অপরটি পাওয়া যায় কার্যকলাপের ভিতরে[58] । যথা চিত্তভ্রংশী বাতুলতা  এই রোগে মানুষের সাধারণ বুদ্ধি একেবারেই লোপ পেয়ে যায় । রোগী নিজেকে বাইরের জগত থেকে আলাদা করে রাখে। নিজের মনে মনে কল্পনায় সে পৃথক জগত সৃষ্টি করে । আর তার মধ্যে নিজেকে দুবিয়ে রাখতে চায় । তার মনে নানা রকমের অদ্ভুত ধারনা জন্মে, নিজেকে হয়তো পৃথিবীর শ্রেষ্ট বলে মনে করে। কারন কল্প জগতে সবি সম্ভব। বাইরের জগত সম্বন্ধে তার কোন চেতনায় থাকে না । খুব কম কথা বলে অল্প অল্প হাসে। অনেক সময় হয়তো বিড় বিড় করে যা তা বকে ; চুপচাপ বসে থাকে হয়তো খাওয়া দাওয়া ত্যাগ করে।

আর এক ধরনের রোগ আছে তাকে বলে খোদন্মোত্তত বাতুলতা। এই রোগের দুটি ধারা আছে। খেদ অবস্থায় রোগী খুব উত্তেজিত থাকে , এত্ত বেশী ও  দ্রুত চিন্তাধারা মনের মধ্যে আসে যে , যে ও গুলি গুছিয়ে বলতে পারে না। কথা বার্তা অসংলগ্ন হয় । অনেক অকথা কুকথা বলে ও খুব জোরে জোরে গান করতে ও নাচতে থাকে। আবার মাঝে মাঝে মারধোরও করে। কিছুদিন এই অবস্থায় থাকার পর বিষণ্ণ অবস্থা আসে অবস্থায় রোগী খুব মুহ্যমান হয়ে থাকে। একেবারেই কারও সঙ্গে কথাবার্তা বলে না । আত্মহত্যা করার প্রবল ইচ্ছা থাকে । রোগী কিছুই খায় না। মুখে সর্বদা দুঃখের ভাব থাকে। বহুদিন জাবত এরূপ রোগগ্রস্থ হয়ে থাকলে মানুষ বুদ্ধি ভ্রংশ হয়ে যায়। আর একটি প্রধান মানসিক রোগ হচ্ছে “ ভ্রম বাতুলতা” এই রোগে রোগীর কতকগুলি বদ্ধমুল ধারনা থাকে । অন্য সকল বিষয়েই সে সাধারন লোকের মতো ব্যবহার করে, শুধু তার বিশেষ ধারনার ক্ষেত্রে অদ্ভুত রকমের ব্যবহার করে। এই রোগে বুদ্ধি বৃত্তি একেবারে নষ্ট হয় না । ভুল ধারনা এই রকমের হতে পারে , যথা রোগী হয়তো মনে করে যে কেউ তাকে বিষ দিয়ে মারতে চাচ্ছে। অনেক রোগী হয়তো মনে করে  যে তার দেহের কোন একটা অংশ নেই ইত্যাদি । এই রোগ আবাফ্র অনেক  রকমেত্র হয় । এর  রা কেতি নাম  হল  বিভ্রমবাতুলতা । এই

---

58 ভট্টাচার্য , শ্রীঊষা ; প্রবাসী ,অগ্রাহয়ন,১৩৫৬ বঙ্গাব্দ  পৃষ্ঠা- ১৭৩

রোগে সব সময় রোগীর মনে হয় যে সবাই তার দিকে চেয়ে আছে , না হয় তার সম্বন্ধে কোন কথা বলছে।

এতক্ষন যে সব বাতুলতা সম্বন্ধে আলোচনা করেছি সেগুলির কারন সম্পূর্ণ মানসিক । কিন্তু আরও কতকগুলি মানসিক রোগ আমারা দেখতে পাই যেগুলির কারন কিছুতা মানসিক ও কিছুতা শারীরিক। যেম আর কেতি রোগ আছে তার নাম জেনারেল পযারালাইস অফ দ্য ইন্সেন সিফিলিস এই রোগের কারন । এতে মাথার ভিতর কগত দেখা যায় । এতে বুদ্ধি বৃত্তি একেবারে নষ্ট হয়ে যায় । রোগী অনর্গল বকে । একটা কথ বা সঙ্গে আর একটা কথার কোন সামঞ্জস্য থাকে না। তা ছাড়া রোগীর আত্মঃসমযম থাকে না[59] ।

ভ্রমের রোগটি মাথার মধ্যে কোন রকমের ক্ষত থেকেই হয় । এতে রোগীর ফিট লাগা মতো হয়, তবে এর মূচর্ছা হিষ্টিরিয়ার মূচর্ছা থেকে আলাদা, এতে রোগে অসম্ভব হাত-পা খিচুনি হয় ।এর আবার দুটি ভাগ , একটি নাম গ্র্যান্ড ম্যাল অপর টি নাম হল পিটেট ম্যাল। পূর্বোক্ত রোগীর মূচর্ছা হয়। এই মূচর্ছাযেখান সেখানে হতে পারে, কিন্তু হিস্তেরিয়ার মুরছছা নিরাপদ জাইগা ছাড়া হয় না। মূচর্ছা সময় রোগী বিক্ষিপ্ত ভাবে হা পা ছোঁড়ে। এবং মূচর্ছা পড়ে রোগী কিছুক্ষন ঘুমায়। পরে মাথা ধরা ভাব থাকে। শেষোক্ত রোগটি সব সময় হতে পারে, কিন্তু মূচর্ছা হয় না তবে দু-এক সেকেন্ডর জন্য রোগে অন্য মনাহয়ে যায় । হয়তো রোগী বসে কাজ করছে কিছু সময়ের জন্য রোগী আচারন অন্য রকম হয়ে যায় , কিংবা কাজ বন্ধ যায়। এতা রোগী নিজেই বুঝাতে পারে না , তবে সামনে যারা থাকে তাঁরা বুঝতে পারে। তাছাড়া এক রকমের মাথা খারাপ আছে জেতা অনেক স্ত্রী লোকের প্রসবের পর হয়। এর নানা রকমের লক্ষন হতে পারে তবে এত বেশী দিন স্থায়ী হয় না । এর নাম পিউপ্যারাল ইন্সানিটি, এবং বৃদ্ধ বয়সে মতিভ্রম হয়ে থাকে । এটা কে বলে ভীমরতি । উপরে যে সব রোগের বর্ণনা দেওয়া হল সে গুলি খুবই সাধারণ , তবে পাগল বলতে শুধুই আমরা এক রকমের পাগল কে বুঝি না বিজ্ঞান সম্মত ভাবে অনুসন্ধান করলে

---

[59] ভট্টাচার্য , শ্রীঊষা ; প্রবাসী ,অগ্রাহয়ন,১৩৫৬ বঙ্গাব্দ পৃষ্ঠা- ১৭৪

এরমধ্যে নানারকমের ভাগ লক্ষ্য করা যায়। মনবিদরা একে কে রোগের এক কে কারন বের করেছেন এবং চিকিৎসকরা নানা পন্থায় বিভিন্ন রকমের চিকিৎসকের উপায় বের করেছেন।

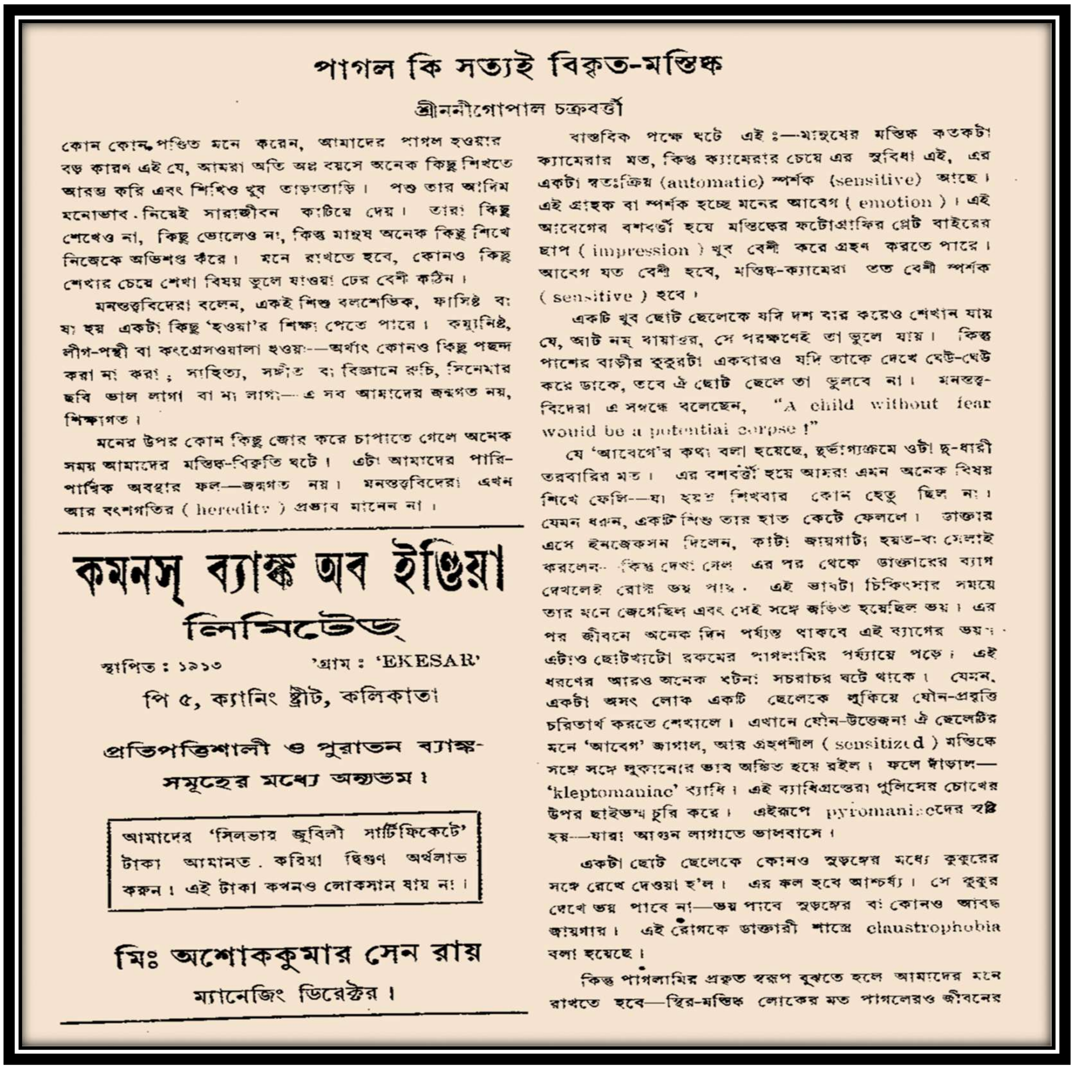

## পাগল কি সত্যই বিকৃত-মস্তিষ্ক

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী

কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, আমাদের পাগল হওয়ার বড় কারণ এই যে, আমরা অতি অল্প বয়সে অনেক কিছু শিখতে আরম্ভ করি এবং শিখিও খুব তাড়াতাড়ি। পশু তার আদিম মনোভাব নিয়েই সারাজীবন কাটিয়ে দেয়। তারা কিছু শেখেও না, কিছু ভোলেও না, কিন্তু মানুষ অনেক কিছু শিখে নিজেকে অভিশপ্ত করে। মনে রাখতে হবে, কোনও কিছু শেখার চেয়ে শেখা বিষয় ভুলে যাওয়া ঢের বেশী কঠিন।

মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন, একই শিশু বলশেভিক, ফাসিষ্ট বা যা হয় একটা কিছু 'হওয়া'র শিক্ষা পেতে পারে। কম্যুনিষ্ট, লীগ-পন্থী বা কংগ্রেসওয়ালা হওয়া—অর্থাৎ কোনও কিছু পছন্দ করা না করা; সাহিত্য, সঙ্গীত বা বিজ্ঞানে রুচি, সিনেমার ছবি ভাল লাগা বা না লাগা—এ সব আমাদের জন্মগত নয়, শিক্ষাগত।

মনের উপর কোন কিছু জোর করে চাপাতে গেলে অনেক সময় আমাদের মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটে। এটা আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফল—জন্মগত নয়। মনস্তত্ত্ববিদেরা এখন আর বংশগতির ( heredity ) প্রভাব মানেন না।


কমনস্ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া
লিমিটেড্
স্থাপিত: ১৯১৩ 'গ্রাম: 'EKESAR'
পি ৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা
প্রতিপত্তিশালী ও পুরাতন ব্যাঙ্ক-সমূহের মধ্যে অন্যতম।
আমাদের 'সিলভার জুবিলী সার্টিফিকেটে' টাকা আমানত করিয়া দ্বিগুণ অর্থলাভ করুন। এই টাকা কখনও লোকসান যায় না।
মিঃ অশোককুমার সেন রায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।


বাস্তবিক পক্ষে ঘটে এই:—মানুষের মস্তিষ্ক কতকটা ক্যামেরার মত, কিন্তু ক্যামেরার চেয়ে এর সুবিধা এই, এর একটা স্বতঃক্রিয় (automatic) স্পর্শক (sensitive) আছে। এই গ্রাহক বা স্পর্শক হচ্ছে মনের আবেগ ( emotion )। এই আবেগের বশবর্ত্তী হয়ে মস্তিষ্কের ফটোগ্রাফির প্লেট বাইরের ছাপ ( impression ) খুব বেশী করে গ্রহণ করতে পারে। আবেগ যত বেশী হবে, মস্তিষ্ক-ক্যামেরা তত বেশী স্পর্শক ( sensitive ) হবে।

একটি খুব ছোট ছেলেকে যদি দশ বার করেও শেখান যায় যে, আট নয় বাহাত্তর, সে পরক্ষণেই তা ভুলে যায়। কিন্তু পাশের বাড়ীর কুকুরটা একবারও যদি তাকে দেখে ঘেউ-ঘেউ করে ডাকে, তবে ঐ ছোট ছেলে তা ভুলবে না। মনস্তত্ত্ববিদেরা এ সম্বন্ধে বলেছেন, "A child without fear would be a potential corpse!"

যে 'আবেগে'র কথা বলা হয়েছে, দুর্ভাগ্যক্রমে ওটা দু-ধারী তরবারির মত। এর বশবর্ত্তী হয়ে আমরা এমন অনেক বিষয় শিখে ফেলি—যা হয়ত শিখবার কোন হেতু ছিল না। যেমন ধরুন, একটি শিশু তার হাত কেটে ফেললে। ডাক্তার এসে ইনজেকসন দিলেন, কাটা জায়গাটা হয়ত-বা সেলাই করলেন—কিন্তু দেখা গেল এর পর থেকে ডাক্তারের ব্যাগ দেখলেই রোগী ভয় পায়। এই ভাবটা চিকিৎসার সময়ে তার মনে জেগেছিল এবং সেই সঙ্গে জড়িত হয়েছিল ভয়। এর পর জীবনে অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকবে এই ব্যাগের ভয়। এটাও ছোটখাটো রকমের পাগলামির পর্য্যায়ে পড়ে। এই ধরণের আরও অনেক ঘটনা সচরাচর ঘটে থাকে। যেমন, একটা অসৎ লোক একটি ছেলেকে লুকিয়ে যৌন-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে শেখালে। এখানে যৌন-উত্তেজনা ঐ ছেলেটির মনে 'আবেগ' জাগাল, আর গ্রহণশীল ( sensitized ) মস্তিষ্কে সঙ্গে সঙ্গে লুকানোর ভাব অঙ্কিত হয়ে রইল। ফলে দাঁড়াল—'kleptomaniac' ব্যাধি। এই ব্যাধিগ্রস্তেরা পুলিসের চোখের উপর ছাইভস্ম চুরি করে। এইরূপে pyromaniacদের সৃষ্টি হয়—যারা আগুন লাগাতে ভালবাসে।

একটা ছোট ছেলেকে কোনও সুড়ঙ্গের মধ্যে কুকুরের সঙ্গে রেখে দেওয়া হ'ল। এর ফল হবে আশ্চর্য্য। সে কুকুর দেখে ভয় পাবে না—ভয় পাবে সুড়ঙ্গের বা কোনও আবদ্ধ জায়গায়। এই রোগকে ডাক্তারী শাস্ত্রে claustrophobia বলা হয়েছে।

কিন্তু পাগলামির প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে হলে আমাদের মনে রাখতে হবে—স্থির-মস্তিষ্ক লোকের মত পাগলেরও জীবনের

পাগল কি সত্যিই বিকৃত মস্তিস্ক , প্রবাসী পত্রিকা, শ্রাবন , ১৩৫৩, পৃষ্ঠা- ৪৪১

## সামাজিক সংঘাত ও পাগল

সমাজের সাথে যতক্ষণ প্রত্যক্ষ সংঘাত না ঘটে , ততক্ষণ পাগলেরা নিশ্চিন্ত। ঠিক যে মুহূর্ত থেকে একজন পাগল হতে শুরু করে সে মুহুর্তটা সমাজ জানে না। সমাজ এ ব্যাপারে যতদিন অজ্ঞ, ততদিন পাগলের সমস্যা নেই। কারণ সে বাধাহীনভাবে চিন্তা করে যেতে পারে। আনন্দের সঙ্গে

ঘুরতে পারে চেতনার সেই বৃত্তে সেখানে চক্র দোষ ঘটে যায় আপন নিয়মে। চিন্তার বৃত্তে পরিধি বরাবর ঘুরতে ঘুরতে সে শেষ করে সেই জায়গায় যা ছিল শুরুর বিন্দু। তারপর কোন এক মুহূর্তে কেউ একজন টের পায়। হয়তো তার আপন মনে কথা বলা লক্ষ্য করে কেউ বিস্মিত হয় অথবা অনুভব করে কৌতুককর। ধরা পড়ে যায় আরও এক পাগলের অস্তিত্ব । শুরু হয় পাগলের সংগ্রাম। এই সমাজের নিয়মের একমত না হয়ে চলার প্রাণান্তকর সংগ্রাম । এই সংগ্রামে সমাজ তার পাশে থাকে না । সমাজের জন্য কিছু সদস্য , যার সাথে নব পাগলের কোন আত্মিক সম্পর্ক নেই , তারা থাকে কিছুদিন । এই সংখ্যা কমতে কমতে যখন শূন্য হয়ে যায় আর পাগল যদি ততদিন বেঁচে থাকে । তাহলেই শুরু হয় প্রকৃত পাগল জীবন[60] ।

আমরা সবাই জানি যে , ' পাগল শব্দে স্নেহ ভালোবাসাও থাকে আবার থাকে বিদ্রুপ আর ঘৃণা । আরও থাকে সহানুভূতি ; কিন্তু রবীন্দ্র সাহিত্যে , শীর্ষেন্দুর কাহিনিতে যে সব পাগলদের পাই , তারা ভাগ্যবান। পাগল হতে হতে কোন একটা বিন্দুতে নিজেদের সামলে নিয়ে তারা সমাজের সাথে সম্পর্ক রেখে দিতে পেরেছে । অথচ এর বাইরে যারা সমাজটাকেও অগ্রাহ্য করে চিন্তার আরও গভীরতর স্তরে নিমজ্জিত , তারা আসলে সমাজের কাছে একটা চাপ । সমাজ এই চাপ নিতে জানেনা , নিতে দেয় না , কেবল এই চাপ বর্জন করতে চায় । সভ্যতার প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বাঁচার মধ্যে সমাজ কোথায় যেন একটি ব্যাধিতে ভুগতে থাকে । অনেকে নানারকমভাবে পাগলকে পথেঘাটে পড়ে থাকতে দেখে কিন্তু কিছুই করতে পারে না , বলতেও পারে না । কিছু করার ইচ্ছা থাকলেও পেরে ওঠে না। আর এটাই হল আমাদের সামাজিক ব্যাধি ।

মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে , প্রতিটি মানুষই অস্বাভাবিক ; তবে একটা সীমা পর্যন্ততাকে স্বাভাবিক বলে গণ্য করা হয় । অস্বাভাবিক মনোবিদ্যার অভিধান খুলে বসলে চোখে পড়ে নানারোগের নাম আর বিবরণ , মনে হয় , ঠিকমতো প্রতিটি মানুষকে বিচার করলে কোন না কোন একটি রোগের আওতায় প্রায় সবাইকে আনা যাবে[61] । যে পাগল হল সে তো তার ভাবনাচিন্তায় অন্যদেও থেকে আলাদা হয়ে গেল , কিন্তু যে থাকল তার সাথে তার কী হয় ? যে

---

[60] শুভ্র চট্টোপাধ্যায় ; " যে তোরে পাগল বলে , তারে তুই বলিস নে কিছু " ঐহিক , পাগল সংকলন , কলকাতা , ২০১৪ , পৃ-৭১

[61] অরুণ ঘোষ , অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান , এডুকেশনাল এন্টর প্রাইস , কলিকাতা , ১৯৬৫ , পৃ : ১১

মানুষ পাগলের বাবা , পাগলের মা , কিংবা ভাই - বোন তাদের কাছে প্রতিনিয়ত কী বার্তা দিয়ে যায় পাগলের আচরণ ? সবাই একে একে মুখ ফিরিয়ে নিলেও যেটা পাগলের বাড়ি , সেই বাড়ির মানুষ অতি সহজে পারে না তার পরিবারের একজনের অস্বাভাবিক জীবন উপেক্ষা করতে । উন্মাদ হলে একটা মানসিক সান্তনা থাকে; অথচ সেই মানুষটা আর সব ব্যাপারে স্বাভাবিক সে যখন একটা বিশেষ কিছুর উল্লেখে রাগে ফেটে পড়ে আর অশ্লীল গালাগালি দেয় তখন সেই মানুটির ঘরে লোকেরা কী করে ? প্রসঙ্গত এখানে ন্যায় দার্শনিকদের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । ন্যায় দার্শনিকরা বলেছিলেন  অমূল প্রত্যক্ষ - এর কথা । প্রতিটি প্রত্যক্ষের একটি মূল বা বাস্তব থাকে । মূল বা বাস্তব নেই অথচ কেউ প্রত্যক্ষ করছে একটা কিছুড় এটাই আমূল প্রত্যক্ষের বৈশিষ্ট্য । জীবনের মধ্যেই মানুষ অনেক রকম অমূলক ভাবনাচিন্তার স্বীকার হয়ে পড়েন । এই রকম অবস্থায় চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে কিংবা নিজের বোধবুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে সবাই সেইসব অমূলক ভাবনার জগৎ থেকে বেরিয়ে আসবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই । এর মূল কারণ মানব মন খুব বিস্ময়কর এবং রহস্যময় । মনকে বশে আনার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম বের করা যায়নি । কারণ বিশ্বের প্রতিটি মানুষ আলাদা । প্রতিটি মন আলাদা । মনের মধ্যে একজন কী পোষণ করে চলেছে , তা জানা প্রায় অসম্ভব । তাই মা হয়েও সন্তানের মানসিক বিচ্যুতি অনুমান করতে দেরি হয় । আবার অতি কাছের মানুষের সাথে অভিনয় চালিয়ে যেতে পারে একজন ভবিষ্যতের পাগল । সব মিলিয়ে এ এক জটিল রসায়ন । এই জটিলতার মাঝে যেটা বোঝা যায় তা হল এই যে , একটি তথাকথিত সুস্থ মন কখনোই একটি তথাকথিত অসুস্থ মনকে বুঝতে পারে না এবং বিপরীতটাও সত্যি । এই ঘনিষ্ঠজনের মধ্যে সে পাগল হবে সে হয়তো তার বিিিছন্নতার দ্বারা চারপাশে একটা বলয় তৈরি করে আত্মমগ্ন  হয়ে থেকে যাবেন , কিন্তু যারা তাকে পাগল ভেবে কষ্ট পাবেন , তাদের অনুভবটা আমরা অনুমান করতে পারি । কিন্তু এ এক বিচিত্র অবস্থা । একজন পাগল এবং তার সুস্থ নিকটজন এমন দুটি জগতের বাসিন্দা যার একটা স্বাভাবিক এবং অপরটা অস্বাভাবিক । এই স্বাভাবিক - অস্বাভাবিক সীমা অবশ্যই মানুষ দ্বারা নির্ধারিত । কিন্তু প্রকৃতি কি পাগল চায় ? সমাজে এমন অনেককে দেখা যায় যারা চারপাশের সাথে তাল মিলিয়ে নিজের মতো করে পাগলামি করেন । মানসিক ভারসাম্য বজায় বৈষম্যজনিত কিছু কারণে জীবনের কোন একটি ক্ষেত্রে এদের আচরণ পাগলের মতো ।

## যুক্তি ও পাগলমি

যুক্তি ও পাগলামির হল সহোদর সম্পর্কের মধ্যে আবদ্ধ । এরা একে অপরের সাথে অপরিহার্যভাবে জুড়ে আছে । কিন্তু একসঙ্গে এরা দুজনেই একই জায়গায় উপস্থিত থাকতে পারে না । যখন যৌক্তিকতা লোপ পায় তখন আমাদের মনে পাগলামো সেই জায়গায় আস্তানা তৈরী করে , আবার যুক্তির আবির্ভাব ঘটলেই পাগলামি অদৃশ্য হয়ে যায় । এবার যুক্তি এবং পাগলামি এই একে অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং ফলস্বরূপ একে অপরের নিজের জায়গা ছেড়ে দেওয়ার বিষয়টি মাথায় রেখে আরও কিছু ভেরিফিকেশন টানা যায় । সেহেতু পাগলামি যুক্তির সাথে ডিরেক্টলি রিলেটেড , অর্থাৎ পাগলামি চিন্তার সাথেও সম্পর্কযুক্ত । কারণ চিন্তার কাজই হচ্ছে যুক্তির জাল বিছানো , যুক্তির খাচা তৈরী করা । যখন বিবিধ চিন্তা একে অপরের সাথে লড়াই করে , যখন কোন একটি নির্দিষ্ট যুক্তি একক গরিষ্ঠতায় জয়লাভ করতে পারে না , যখন অনেক সংখ্যক যুক্তি একে অপরের সাথে জড়িয়ে গিয়ে নানান কার্যকারণ সম্পর্ক তৈরী করে , যখন এই ঘটনার কারণে , এক চরম বিশৃঙ্খলা তৈরী হয় , সেই বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকেই পাগলামি বলা হয় ।

পাগলামি আসলে আমাদের নিজেদের চিন্তাধারার ,চিন্তাশক্তির সারমর্মকেই প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। মানুষ আত্মবিশ্লেষণে বাধ্য হয় । তার মানে আত্মবিশ্লেষণ ও পাগলামির মধ্যে কি কোন গভীর সম্পর্ক আছে ? উত্তরে বলা যায় হা । এই সম্পর্কে হেগেল লিখেছে *“ The capacity of self – reflection is given to man alone , that is why he has , so to speak , the privilege of madness*[62] *”* *হেগেলের থেকে নীৎসে আরো এক ধাপ এগিয়ে যান : “There is one thing that will forever be impossible : to be reason able ! A bit of reason though , a grain of wisdom ... that leaven is mixed in with every thing : for the love of madness wisdom is mixed will things*[63] *”*

---

[62] বি জর্জ , ডব্লিউ , এফ , হেগেল; ফিলোসফি ডি এল'এসপ্রিট ইন এনসাইলোপিডিয়া , প্যারিস, জার্মার বেইলার, ১৮৬৭ পৃ - ৩৮৩

[63] তদেব- পৃ ৩৮৪

তাহলে দেখা যাচ্ছে যেখানে হেগেল পাগলামি চিন্তার ভিতরে স্থাপন করেছেন , নীৎসে আবার উল্টো পথে গিয়ে চিন্তাকে পাগলামোর মধ্যে স্থান দিয়েছেন । তবে এই দুই অবস্থান যতই উপর উপর বিপরীতার্থক মনে হোক না কেন , আসলে উভয় বক্তব্যের মধ্যে সাদৃশ্য আছে , সেটা পাস্কালের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় *"Man are so necessarily mad that not to be mad would only be another form of madness[64]"*

পাগল ও পাগলামি কার ভাগে পড়ে ? দর্শন না সাহিত্য ? উপরের বিভিন্ন দার্শনিকদের বক্তব্য দেখে অনুমান করা যায় যে পাগলামি নিয়ে তার সংজ্ঞা , ব্যাপ্তি , পরিধি ইত্যাদি নিয়ে এহেন দার্শনিক প্রবচন অনেকখানি এবং নানাবিধ। এই বক্তব্যগুলি তাদের ভাষার অতি সূক্ষ্ম ফিলিগ্রওয়ার্ক সমেত, একটি প্রশ্ন তুলতেই পারে : এগুলি কিসের উদাহরণ ? সাহিত্য , না দর্শন ? এগুলি কি শুধু ভাষার মারপ্যাচ , নাকি কোন গভীর তত্ত্বের ধারকও ? এক্ষেত্রে একটি কথা মো টামুটি নিশ্চিতভাবেই বলা যায় ড়এই অ্যাফারিজমগুলিতে ভাষার শৈলী ও উর্ষতা , ভাষার খেলা যে পর্যায়ে পৌঁছেছে । তাতে এগুলি স্বভাবগতভাবে দর্শনের অন্তর্গত হলেও এর ব্যবহারিক প্রয়োগ সাহিত্যগত ও আলংকারিক। অর্থাৎ পাগলদর্শনে ও সাহিত্যে ঢুকে পড়েছে । উল্টোদিকে যদি খাঁটি সাহিত্যে পাগলামির উপস্থিতি বিচার করা হয় তাহলে আবার দেখা যাবে সাহিত্যের পাগলরা আদতে ছদ্মবেশী দার্শনিক । রবীন্দ্রনাথ বা শেক্সপিয়ারের লেখা এই বিষয়ে সর্বোচ্চ উদাহরণ । অতএব সাহিত্য ও দর্শন এবং এদের মাঝে সেতু হিসাবে রয়েছে পাগল ও পাগলামি । পাগলামি একই সাথে যুগপৎ সাহিত্য ও দর্শনের বিষয় । আগে পাগলামি মূলত সাহিত্যের বিষয় ছিল , কিন্তু আধুনিক যুগে পাগলামো হয়ে উঠেছে মেজর ফিলোজফিক প্রি - অকুপেশন । আর পাগল ধারণার মধ্যে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সামগ্রিক ইতিহাসকে বিচার করা যায়[65] ।

শুধু তত্ত্বের খাতিরেই ব্যাখ্যা নয় , বাস্তবমুখী বিশ্লেষণাত্মক ভাবনা নিয়ে পাগলদের জীবন কথা এই লেখার উদ্দেশ্য । এতে আবেগও যে মিশবে তা নয় । পাগলদের ইতিহাস ভাবনা চিন্তায় কার্য

---

[64] তদেব- ৩৮৫

[65] আদ্বয় চৌধুরী ; " হস্পর্শে পাগল : দুটি লেখা তিনটি ফঁদ " , ঐতিহ্য , পাগল সংকলন , কলকাতা , ২০১৪ , পৃঃ ২১ ।

কারণ ও আবেগ - দুটিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । সাহিত্যোক্ত এই ধারারই অন্যতম সাক্ষী । সেই ও এর ধারায় বারেবারেই বিভ্রান্তি ঘটে কিছু কিছু বহু ব্যবহাওে ক্লিশে হয়ে যাওয়া ধারণার অর্থ অনুধাবনে । সেইরকমই একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হল পাগল কে ? যখন কোন পাগলকে উন্মাদাশ্রমে নিয়ে যাওয়া হয় , তার পিছনে কিছু কারণ থাকে , অর্থাৎ যুক্তি দিয়ে এই কারণগুলি খুঁজে তাকে পাগল বলে অভিহিত করা হয় । এই যুক্তি দেয় কারা ? উত্তরে বলা যায় সমাজের একটা অংশ মানুষ , অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষ যখন তাকে সনাক্ত করে যে , সে পাগল হয়েছে । কিন্তু এক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তিটি মতামত নেওয়া হয় কিনা তা সন্দেহজনক । একটা সময় গ্যালিলিওকে পাগল বলা হয়েছিল । কারণ তিনি বলেছিলেন , পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে , তাই রক্ষণশীলপন্থী তাকে মেনে নিতে পারেনি , কারণ চার্চের প্রচলিত । বিশ্বাসকে তিনি আঘাত হেনেছিলেন । কিন্তু পরবর্তীতে গ্যালিলিও হলেন বিজ্ঞানী । ঠিক এইখানেই আবার গণতন্ত্রের প্রশ্ন চলে আসে । কটা লোক তাকে অস্বীকার করছে এবং বলছে এটা ঠিক না , আর কটা লোক তার পক্ষে আছে । এখানেই কিন্তু স্থান - কালড় এই দুটি পারস্পেকটিভ ভীষণ গুরুত্ব ও মূল্যসহ এসে পড়ে । গ্যালিলিওকে পাগল বলা হয়েছিল কারণ তখনকার গণতন্ত্রে তিনি হেরে গেছেন[66] কিন্তু পরবর্তীকালের গণতন্ত্রে তিনি জিতে গেছেন । স্থান - কাল পার্থক্য এসব কিছুর উপর নির্ভর করে পাগল ও পাগলাগারদের সম্পর্কের বিষয়টি ।

ষাটের দশকে ভারতে মানসিক আন্দোলন-এ বলা হয়েছিল কেউ পাগল নয় । রোগের বীজ ছড়িয়ে আছে এই সমাজের আনাচে কানাচে । তাই মানুষ নয় রোগ সারাতে হবে এই সমাজেরই । ১৯৮৭ তে ভারতে প্রণীত মানসিক স্বাস্থ্য আইন-এ বলা হয়েছিল *“ Mentally ill Person ' as a person who is in need of treatment by reason of any mental disorder other than mental retardation[67] ”* ' Mental disorder ' কথাটির দ্বারা ঠিক কি বোঝা যেতে পারে , তা নিয়ে বহু আলোচনা আছে মনোবিজ্ঞানের দর্শন-এর ক্ষেত্রে । এ থেকে কোন একটি সর্বসম্মত সংজ্ঞা

---

[66] কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় ; “ আগল ভাঙা পাগল , অথবা মেঘে ঢাকা তারা ” ঐহিক , পাগল সংকলন কলকাতা , ২০১৪ পৃঃ ৩২৯

[67] মালহোত্রা , সবিতা : ডেভেলোপমেন্ট ইন সাইক্যাট্রি ইন ইন্ডিয়া , স্প্রিংগার , নিউ দিল্লি , ২০১৫ , পৃ - ৫৩

করতে গিয়ে বহু অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে[68] । বারে বারে প্রশ্ন উঠেছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ ইতিহাস তার একমাত্র সাক্ষী । প্রাচীনকালে পাগল বলতে বোঝাত শয়তান বা অপদেবতার প্রভাব থেকে অস্বাভাবিক আচরণ। মধ্যযুগে এই ধারণা চলতে থাকে । আর আমাদের ভারতীয় সমাজে , তথা বাংলার সমাজজীবনে ভূতে পাওয়া বা জিনে পাওয়া[69]( মুসলিম সমাজে ) তেমনি উপজাতি সমাজে ডান বা ডাইনি দ্বারা আক্রান্ত ইত্যাদি লোকেদের পাগল বলা হত। কিন্তু আধুনিক যুগে ধারণার পরিবর্তন হল। পাগলের কার্যকলাপ বা পাগলামি এটা এক ধরনের রোগ তথা মানসিক প্রক্রিয়ার দ্বারা সংগঠিত অস্বাভাবিক কার্যপ্রক্রিয়া বা অযৌক্তিক কথাবার্তা। যেটি Mental illness বা মানসিক অসুস্থতার নামে পরিচিত হতে লাগল।

## পাগলদের বৈচিত্র্য

উনিশ শতকে সামাজিক অবস্থার নিরিখে বাংলার পাগলদের মধ্যে নানা বৈচির্ত্য লক্ষ করা যায় । পাগলেরা কি একজন আর একজনকে অনুসরণ করে ? করা উচিত নয় । কারণ প্রতিটি পাগল স্বতন্ত্র । বস্তুত পাগলদের মধ্যে আছে অপরিসীম বৈচির্ত্য । এই বিচিত্র আয়োজন মানুষের মধ্যেও আছে । কিন্তু সভ্যতার হরেক চাপে সেসব হারিয়ে মানুষ ছাঁচে ঢালা পুতুলের মতো আচরণ করে বলে সেই বৈচির্ত্য তেমন প্রত্যক্ষ করা যায় না । তুলনায় পাগলদের সেই সমস্যা নেই বলে আচরণের দিক থেকে তারা অনেক স্বতঃস্ফুর্ত । অত্যাচার , নিপীড়ন , শোষণ ইত্যাদি কারণে যারা মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন ; তাদের কথা আলাদা। যেমন নবারুণ ভট্টাচার্যের উপন্যাস যুদ্ধপরিস্থিতির ' নায়ক যেমন। এদের ক্ষেত্রে মনোবিদদের হাতে কিছু নির্দিষ্ট সূত্র থাকে। কিন্তু যারা সুস্থ জীবনযাপনকরতে করতে হঠাৎ একদিন প্রবেশ করতে শুরু করে স্বরচিত বৃত্তে , তাদের ক্ষেত্রে এই সুবিধাটুকু

---

68 সোমদত্ত ভট্টাচার্য ; “ পাগলিনী কথা " - ঐহিক , পাগল সংকলন , কলিকাতা , ২০১৪ , পৃ : ৩৬ ।

69 জুন, ম্যাক. ড্যানিয়েল: দ্য ম্যাডনেস অফ সেন্ট: এসিক রিলিজিয়ন ইন বেঙ্গল, শিকাগো ইউনিভার্সিটি প্রেস। শিকাগো, ১৯৮৯, পৃ – ৩১২

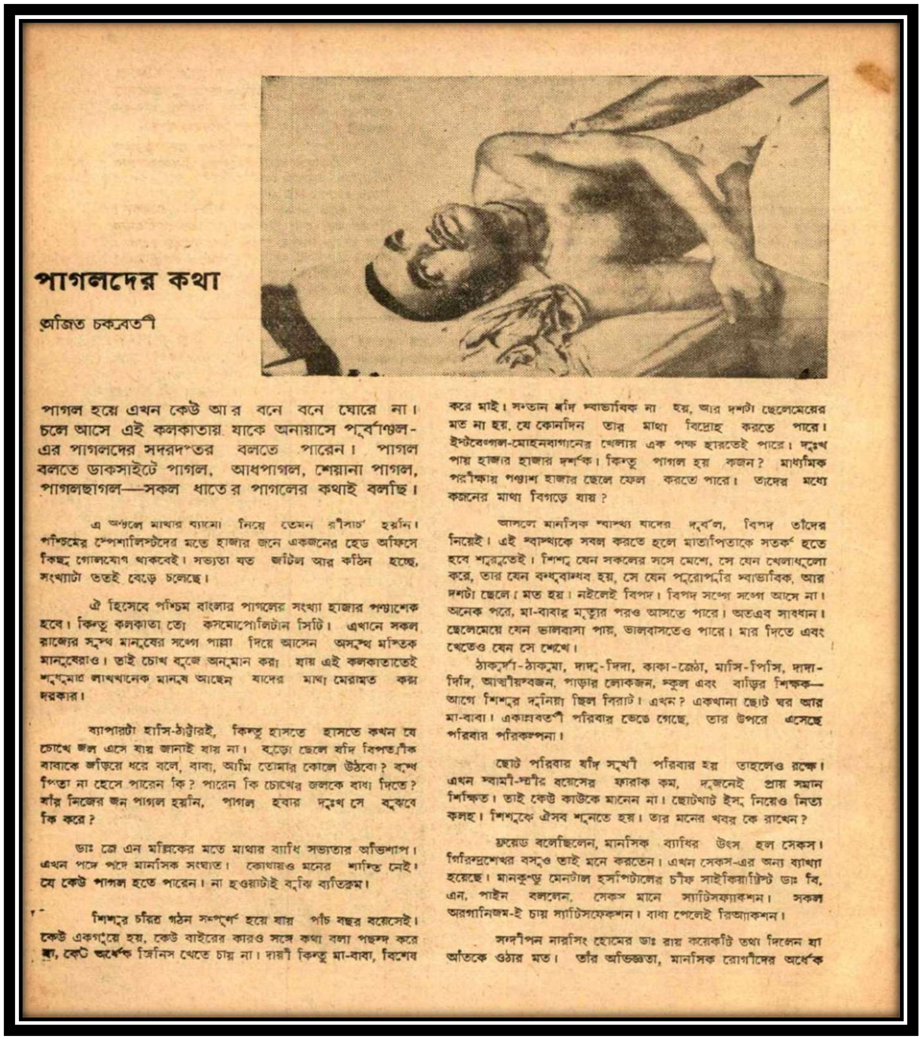

পাগলদের কথা

অজিত চক্রবর্তী

পাগল হয়ে এখন কেউ আর বনে বনে ঘোরে না। চলে আসে এই কলকাতায় যাকে অনায়াসে পূর্বাঞ্চল-এর পাগলদের সদরদপ্তর বলতে পারেন। পাগল বলতে ডাকসাইটে পাগল, আধপাগল, শেয়ানা পাগল, পাগলছাগল—সকল ধাতের পাগলের কথাই বলছি।

এ অঞ্চলে মাথার ব্যামো নিয়ে তেমন রীসার্চ হয়নি। পশ্চিমের স্পেশালিস্টদের মতে হাজার জনে একজনের হেড অফিসে কিছু গোলযোগ থাকবেই। সভ্যতা যত জটিল আর কঠিন হচ্ছে, সংখ্যাটা ততই বেড়ে চলেছে।

ঐ হিসেবে পশ্চিম বাংলার পাগলের সংখ্যা হাজার পঞ্চাশেক হবে। কিন্তু কলকাতা তো কসমোপোলিটান সিটি। এখানে সকল রাজ্যের সুস্থ মানুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আসেন অসুস্থ মস্তিক মানুষেরাও। তাই চোখ বুজে অনুমান করা যায় এই কলকাতাতেই শুধুমাত্র লাখখানেক মানুষ আছেন যাদের মাথা মেরামত করা দরকার।

ব্যাপারটা হাসি-ঠাট্টারই, কিন্তু হাসতে হাসতে কখন যে চোখে জল এসে যায় জানাই যায় না। বুড়ো ছেলে যদি বিপত্নীক বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলে, বাবা, আমি তোমার কোলে উঠবো? বৃদ্ধ পিতা না হেসে পারেন কি? পারেন কি চোখের জলকে বাধা দিতে? যাঁর নিজের জন পাগল হয়নি, পাগল হবার দুঃখ সে বুঝবে কি করে?

ডাঃ জে এন মল্লিকের মতে মাথার ব্যাধি সভ্যতার অভিশাপ। এখন পদে পদে মানসিক সংঘাত। কোথাও মনের শান্তি নেই। যে কেউ পাগল হতে পারেন। না হওয়াটাই বুঝি ব্যতিক্রম।

শিশুর চরিত্র গঠন সম্পূর্ণ হয়ে যায় পাঁচ বছর বয়েসেই। কেউ একগুঁয়ে হয়, কেউ বাইরের কারও সঙ্গে কথা বলা পছন্দ করে না, কেউ অর্ধেক জিনিস খেতে চায় না। দায়ী কিন্তু মা-বাবা, বিশেষ করে মাই। সন্তান যদি স্বাভাবিক না হয়, আর দশটা ছেলেমেয়ের মত না হয়, যে কোনদিন তার মাথা বিদ্রোহ করতে পারে। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের খেলায় এক পক্ষ হারতেই পারে। দুঃখ পায় হাজার হাজার দর্শক। কিন্তু পাগল হয় কজন? মাধ্যমিক পরীক্ষায় পঞ্চাশ হাজার ছেলে ফেল করতে পারে। তাদের মধ্যে কজনের মাথা বিগড়ে যায়?

আসলে মানসিক স্বাস্থ্য যাদের দুর্বল, বিপদ তাঁদের নিয়েই। এই স্বাস্থ্যকে সবল করতে হলে মাতাপিতাকে সতর্ক হতে হবে শুরুতেই। শিশু যেন সকলের সঙ্গে মেশে, সে যেন খেলাধুলো করে, তার যেন বন্ধুবান্ধব হয়, সে যেন পুরোপুরি স্বাভাবিক, আর দশটা ছেলের মত হয়। নইলেই বিপদ। বিপদ সঙ্গে সঙ্গে আসে না। অনেক পরে, মা-বাবার মৃত্যুর পরও আসতে পারে। অতএব সাবধান। ছেলেমেয়ে যেন ভালবাসা পায়, ভালবাসতেও পারে। মার দিতে এবং খেতেও যেন সে শেখে।

ঠাকুর্দা-ঠাকুমা, দাদু-দিদা, কাকা-জেঠা, মাসি-পিসি, দাদা-দিদি, আত্মীয়স্বজন, পাড়ার লোকজন, স্কুল এবং বাড়ির শিক্ষক—আগে শিশুর দুনিয়া ছিল বিরাট। এখন? একখানা ছোট ঘর আর মা-বাবা। একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে গেছে, তার উপরে এসেছে পরিবার পরিকল্পনা।

ছোট পরিবার যদি সুখী পরিবার হয় তাহলেও রক্ষে। এখন স্বামী-স্ত্রীর বয়েসের ফারাক কম, দুজনেই প্রায় সমান শিক্ষিত। তাই কেউ কাউকে মানেন না। ছোটখাট ইস্যু নিয়েও নিত্য কলহ। শিশুকে ঐসব শুনতে হয়। তার মনের খবর কে রাখেন?

ফ্রয়েড বলেছিলেন, মানসিক ব্যাধির উৎস হল সেক্স। গিরিন্দ্রশেখর বসুও তাই মনে করতেন। এখন সেক্স-এর অন্য ব্যাখ্যা হয়েছে। মানকুণ্ডু মেন্টাল হসপিটালের চীফ সাইকিয়াট্রিস্ট ডাঃ বি. এন. পাইন বললেন, সেক্স মানে স্যাটিসফ্যাকশন। সকল অরগানিজম-ই চায় স্যাটিসফেকশন। বাধা পেলেই রিঅ্যাকশন।

সন্দীপন নার্সিং হোমের ডাঃ রায় কয়েকটি তথ্য দিলেন যা আঁতকে ওঠার মত। তাঁর অভিজ্ঞতা, মানসিক রোগীদের অর্ধেক

## পাগলদের কথা - অমৃত পত্রিকা থেকে সংগৃহীত , ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ,বর্ষ - ১৭

পাওয়া যায় না। এই ধরনের পাগলদের মধ্যে থেকে যায় বিচিত্র এক আশ্চর্যসব দৃষ্টান্ত । মনে করুন, আপনার অভিজ্ঞতায় আপনি কত বিচিত্র পাগলামির চেহারা দেখেছেন । সেগুলি সবই যে দুঃখজনক , এমন নয় । কিছু কিছু চেহারা আপনাকে অবাক করেছে , কেউ ঘাবড়ে দিয়েছে। আবার কেউ দিয়ে গেছে নির্মল হাস্যরস । প্রথাগত সামাজিক নিয়মের মধ্যে থেকেও তাদের অনেকে চালিয়ে যায় নানা রকম পাগলামি [70]। এদের কেউ কেউ হয়তো আপনার পরিচিত ।

---

[70] শুভ্র চট্টোপাধ্যায় ; " যে তোরে পাগল বলে , তারে তুই বলিস নে কিছু ঐহ্যিক , পাগল সংকলন , কলকাতা , ২০১৪ , পৃ : ৭৪

প্রতিদিনের দেখার মধ্যে এদের আকস্মিক পাগলামি আচরণ হয়তো আমরা কখনো মেনেও নিই। হয়তো বুঝতে পারেন যে কোন এক জায়গায় সে আপনার প্রতিবাদটা করে দেয়।

উনিশ শতকের পূর্বে পাগলদের নিয়ে এত ভাবনার অবকাশ ছিল না সাধারণ মানুষের মনে। আমাদের সমাজ বহুকাল অবধি পাগলকে মানুষ বলেই গণ্য করেনি । তাই সামাজিক উপেক্ষা , অত্যাচার সহ্য করে বহু যুগের পর যুগ পাগলের নীরব অভিমান নিয়ে চলে গেছে এই পৃথিবী ছেড়ে। এদের মধ্যে রাম - রহিমের মতো অকিঞ্চিৎকর ব্যক্তি যেমন রয়েছেন , তেমনই রয়েছেন কোপার্নিকাস বা গ্যালিলিয়োর মতো প্রতিভা । আজ এই সময়ে দাঁড়িয়ে পাগলদের প্রতি সাধারণ মানুষের ধারণার খুব একটাপরিবর্তন ঘটেছে বলে মনে হয় না । সুকুমার রায়ের লেখা “রাজার অসুখ” গল্পের পাগল কিংবা রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদার চরিত্রের মতো রোম্যান্টিক পাগলরা সাহিত্যের পাতায় ছিলেন বলে পার । পেয়ে গেছেন । বাস্তবে থাকলে হার্ডকোর পাগল হতেন । তুলনায় শীর্ষেন্দুর পাগল চরিত্রগুলির ছায়া একটু হলেও পাওয়া যায় আধা শহর কিংবা গ্রামে । পাগলদের কি কোন নিরাপত্তা আছে নাকি কোন স্বাধীন জীবনযাপন আছে । শুধু পাগলাগারদের অভ্যন্তরে কয়েদীর মত বন্দী থাকা পাগলদের দেখে সার্বিকভাবে পাগলদের মূল্যায়ন করা যাবে কি ? কখনোই নয় । গারদের অভ্যন্তরে তাদের জীবনযাপনের মধ্য থেকে উঠে আসে যে তথ্য , সেই প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে পাগলদের হয়তো আমরা কিছুটা অনুভব করতে পারি । কিন্তু যার ভবঘুরে , ফুটপাতে যাদের নিশিযাপন তাদের পাগলামির মাপকাঠি , তাদের জীবনযাপনের রহস্য এই তথ্য দ্বারা বিশ্লেষণ সম্ভব নয় ।

## পাগলের চাহিদা

পাগলের চাহিদা , বিশেষ করে তার মনোজগতের খবর আমরা কি এখনও বুঝে উঠতে পেরেছি ? যে ব্যক্তি মানসিকভাবে অস্বাভাবিক সে আসলে চারপাশের অবস্থাকে বিশ্বাস করতে চায় না । সেই অবিশ্বাসের কারণ আমরা অনুমান করতে পারি কিন্তু নিশ্চিত করে বলতে পারি কি ? আসলে সে কি ভাবছে বা কি করতে চায় ? কোন সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রেও ঠিক একই কথা বলা যায়। আসলে মানুষের মনের কথা অনুধাবনের এই ব্যর্থতায় মনোবিজ্ঞানের প্রধান সমস্যা । মনোবিদ্যার এই সমস্যা কালানুক্রম ধরে যেভাবে আলোচিত হয়ে আসছে , তারও একটা সুদীর্ঘ ইতিহাস

আছে। আমরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিই । তেমনি পাগল ও পাগলামির প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান কেমনভাবে যুগ যুগ ধরে চর্চা করে আসছে এবং সমাজের সঙ্গে এর মেলবন্ধন কোথায় , এই নিয়েই পাগলচর্চার ইতিহাস । মানব মনকে বোঝা এটা যেমন মনোবিদ্যার একটা প্রধান সমস্যা তেমনি সমাজেরও একটা সমস্যা । তাই পিতামাতা তার সন্তানকে বুঝতে ব্যর্থ হন । বন্ধু ব্যর্থ হয় বন্ধুকে বুঝতে। প্রেমের ক্ষেত্রেও এই না বোঝার পরিমাণটা বিরাট। একটু বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যায় যে , অপরের মনকে বুঝতে পারার এই ব্যর্থতাই সমাজে পাগল হওয়ার কর্মকাকে উদ্দীপনা যোগায়। যে কোন পাগল কম - বেশী সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। যার পাগলামি চরম দশার আগে ভাগ্যক্রমে থেমে গেছে , তিনিও আসলে সমাজের সব স্তরে নিজেকে খুলতে পারেন না। মনের ভাবনা শেয়ার করার সৎ পরামর্শ অহরহ চারিদিকে দেওয়া হচ্ছে ; কিন্তু নিজের একান্ত ভাবনাকে শেয়ার করার মতো পরিবেশ ও সুযোগ পাওয়া যে কতটা কঠিন তা আমরা কম বেশি জানি। যে সমস্যাকে আপনি মনের শক্তিতে কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন এবং যেভাবে পেরেছেন তা আর একজনের সমস্যাকে দূর করার মতো উপযুক্ত নাও হতে পারে । এই অবস্থায় যখন একটি নির্দিষ্ট মানসিক সমস্যা দূর করার জন্য কিছু নিয়ম তৈরী হয় তখন তা স্বাভাবিকভাবেই সর্বত্রগামী হয়ে ওঠে না[71] । সহজ কথায় পাগলামি সারানোর কোন মৌলিক নিয়ম নেই। কোন সার্বিক নিয়মও নেই।

**আধ্যাত্ম জগতে পাগল**

মধ্যযুগের বিখ্যাত বাংলা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রসঙ্গত আলোচনা করা যেতে পারে। শ্রীচৈতন্য তখন নীলাচলে , পুরীধামে। ভক্ত জগদানন্দ পন্ডিত এসেছেন বাংলায়। তার মাধ্যমে বৃদ্ধ অদ্বৈত আচার্য শ্রীচৈতন্যের জন্য এক তরজা। পাঠালেন - *"প্রভুকে কহিও আমার কোটি নমস্কার। এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার / বাউলকে কহিও লোকে হইল আউল। বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল / বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল / বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল"*[72] । পদটির গুঢ় অর্থ যাই হোক, বাউল শব্দটির প্রয়োগ লক্ষ করবার মত । পদকর্তা বৃদ্ধ বৈষ্ণব সাধক অদ্বৈত আচার্য এখানে

---

[71] শুভ্র চট্টোপাধ্যায় ; " যে তোরে পাগল বলে, তারে তুই বলিস নে কিছু ঐহিক, পাগল সংকলন , কলকাতা ২০১৪ , পৃ : ৭৩

[72] দামোদর গোস্বামী , ; " তোরা কেউ যাসনে ও পাগলের কাছে " ঐহিক , পাগল সংকলন , কলকাতা , ২০১৪ পৃ : ৪৭

নিজের পরিচয় দিয়েছেন বাউল হিসাবে আর তার আরাধ্য দেবতা শ্রীচৈতন্যদেবকেও বাউল সম্বোধন করেছেন । বাংলায় এই বাউল শব্দটি এসেছে সংস্কৃত বাতুল ' থেকে যার আভিধানিক অর্থ পাগল। চৈতন্য উত্তর বাংলায় বাউল একটি বিশিষ্ট সামাজিক ও সাধক সম্প্রদায় হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। যাদের সাধন পদ্ধতি রহস্যাবৃত ও লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকলেও যাদের গান , সহজিয়া গান , দেহতত্ত্বের গান ,মেঠে সুরের গান , মনের মানুষকে খুঁজে বেড়ানোর গান আজও বাংলার মানুষের মুখে মুখে ফেরে । লালন ফকিরও তার গানে বিশিষ্ট বৈষ্ণব সাধকদের পাগল বলে স্মরণ করেছেন অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে।"তোরা কেউ শাসনে ও পাগলের কাছে / তিন পাগলে হল মেলা নদে এসে"[73] আবার লালন বার বার করে সাবধান করে দিচ্ছেন " পাগলের সঙ্গে যাবি , পাগল হবি বুঝবি শেষে" । পাগলের কাছে যাওয়ার দরকার নেই , তার নামটিই পাগল করে দেবার জন্যে যথেষ্ট[74] । তাই পাগল কথাটির আভিধানিক অর্থ যাই হোক , সমাজ যাই বলুক , মেডিক্যাল সায়েন্স গবেষণা করে যাই বের করুক না কেন , বাংলার সমাজ পাগলকে কোন একভাবে , কোন এক অর্থে অত্যন্ত আদরের সঙ্গে , ভালোবাসার সঙ্গে প্রেমের সঙ্গে , আবেগের সঙ্গে , শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করে , যেখানে সাধক নিজের পরিচয় দিতে ভালোবাসেন পাগল হিসাবে , তার প্রিয় দেবতাকে , প্রাণের দেবতাকেও পাগল বলেই ডাকতে ভালবাসেন । তাইতো আমাদের দেবতা ভোলা মহেশ্বর , পাগলা শিব। যিনি স্বেচ্ছায় ভিক্ষা করে বেড়ান , সব কিছুতেই খুশি হয়ে যান , আবার সকলকে বাঁচানোর জন্য খুশি মনেই বিষ খেয়ে নেন " শিবের মতো পাগল পাওয়া ভাব সুধা ফেলে গরল যার আহার। বলদ বাহন , চর্ম বসন , সর্প অলংকার অনেক চেষ্টা করেও বোঝা যায় না ... শিব কিসের তরে ভিক্ষা করে , যার ঘরে অন্নপূর্ণ " আবার বামাখ্যাপাকে আমরা খ্যাপা বলি । আদরের সঙ্গে বলি শ্রদ্ধার সঙ্গে বলি , কাছের মানুষ হিসাবে বলি। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে ভালোবেসে ও ভক্তি করে "পাগল ঠাকুর"[75] ।

কয়েকটি উদাহরণ থেকে বুঝলাম যে , ভারতবর্ষের আধ্যাত্ম জগতে পাগল ও পাগলামির একটা বিশেষ স্থান রয়েছে । সেখানে পাগলকে শুধু সস্নেহে , সপ্রেমে , সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে

---

[73] ই-সোর্স , মিউজিক কালেকশন , www.bdmusic.com > ফোক কালেকশ্যান ১২ ই আগস্ট, ২০১৮

[74] রমাকান্ত চক্রবর্তী , বৈষ্ণবইজ ইন বেঙ্গল , কলকাতা , ১৯৮৫ , পৃ : ১১

[75] তদেব পৃ : ৪৮

তা - ই নয় , ব্রহ্মজ্ঞানীর লক্ষণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে পাগল , অর্থাৎ শুধু স্বীকৃতি নয় প্রয়োজনীয়তা , অপরিহার্যতা। সাধনার রাজ্যে পাগল ও পাগলামি এই অনুপ্রবেশ কেন ? এর কারণ, এর ব্যাখ্যা খুব স্পষ্ট করে কোথাও বলা নেই , আমরা দূর থেকে কিছুটা অনুমান করতে পারি মাত্র ।কিন্তু তার আগে আমাদের ভারতীয় দর্শনের দু - একটা একটু আলোচনা করা জরুরি।

মানুষ সর্বদাই চেয়েছে তার পরিবেশকে ব্যাখ্যা করতে নিজেকে বুঝতে , চতুর্দিকে ঘটে চলা ঘটনার স্রোতকে কার্য - কারণ শৃঙ্খলায় বেঁধে ফেলতে । এই বুঝতে চাওয়ার ইতিহাসই মানবসভ্যতার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস। আধুনিক বিজ্ঞান , যা ব্যবহার করে আমরা দৈনন্দিন জীবন চালাই , একরকমভাবে জগৎকে বোঝার চেষ্টা করে ।আর বুঝতে গেলেই দুটি মৌলিক প্রশ্ন এসেই যায় । একটি হল কাকে বুঝতে হবে আর দ্বিতীয়টি হল কি দিয়ে বুঝবো । অর্থাৎ প্রথম প্রশ্ন হল জগতে কী আছে , জগৎ কী দিয়ে তৈরী আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হল তাকে বুঝব কী দিয়ে অর্থাৎ বোঝার পদ্ধতি ও বোঝার নীতি টা কী হবে । এই দুটো বিষয়ই ঠিক করে দেওয়া হবে যাত্রা । শুরুর আগেই । আধুনিক বিজ্ঞান , যাকে আমরা আনুষ্ঠানিক ইউরোপীয় বিজ্ঞান বলে চিনি , মনে করে জগৎটা পদার্থ ( matter ) দিয়ে তৈরী আর এই পদার্থ - এর পারস্পরিক সম্পর্ক এবং interaction দিয়েই জগৎটাকে বুঝতে হবে । পরে ' শক্তি ' বলে আর একটা নতুন ধারণা এলেও আরও পরে জানা গেল পদার্থ - শক্তি দ্বৈততা -এর কথা । পদার্থ ও শক্তি আসলে একই এবং পরস্পর রূপান্তর ও বিনিময়যোগ্য । আর দ্বিতীয় প্রশ্নের উল্টর প্রত্যক্ষ । অর্থাৎ বুঝতে হবে প্রত্যক্ষ করে । চোখ দিয়ে দেখে , কান দিয়ে শুনে , ত্বক দিয়ে স্পর্শ করে । আমাদের যে পাচটি ইন্দ্রিয় জগতের নানারকম খবর এনে দিচ্ছে প্রতিনিয়ত সেগুলির মাধ্যমেই আমরা জানব জগৎকে । ইন্দ্রিয়ের দরজায় যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না , যতই ভালো লাগুক , যতই মনোমুগ্ধকর হোক না কেন তাকে বিদায় জানাতেই হবে । তাকে সত্য বলে মেনে নেওয়া যাবে না কিছুতেই । এটাই বিজ্ঞানের কার কার্য নীতি, এই নিতী ঠিক না ভুল এই প্রশ্ন অবান্তর । প্রত্যেকটি শাস্ত্র তার নিজের স্বতঃসিদ্ধ , নীতি এবং পদ্ধতি ঠিক করে চলতে থাকে আপন গতিতে । এখানে ঠিক ভুল বা সত্য মিথ্যার প্রশ্ন তোলা যায় না । আমি যা হলে সত্য । বলে মানব ঠিক করে নিয়েছি তাকে বরাবর পালন করে চলেছি কিনা সেটাই বড় কথা । আর

সেটাই পরীক্ষা করে দেখা হয় বারবার নানাভাবে, না পদ্ধতিতে । আমার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত থেকে আমি সরে আসিনি । বিচ্যুত হইনি তো নিজের ঠিক করে নেওয়া পছন্দ করে নেওয়া রাস্তা থেকে। নিজের কাছে নিজেরই এই দায়বদ্ধতার প্রমাণ দিতে হয় বার বার। ভারতীয় দর্শন জগৎকে বোঝার চেষ্টা করে অন্যভাবে , এক এক দার্শনিক সম্প্রদায় এক এক রকমভাবে বোঝার চেষ্টা করে । এখানে উদাহরণ হিসাবে সাংখ্য দার্শনিকরা বলেন জগতে দুরকমের মৌলিক সত্তা আছে প্রকৃতি আর পুরুষ । সমাজ ও বিজ্ঞানের ভাষায় বস্তু এবং চেতনা । এই দু - এর মিথষ্ক্রিয়া সাংখ্য দর্শনের মূল ভিত্তি । তাহলে জগৎকে বুঝতে হলে এই দুটিকে বুঝতে হবে , শুধু বস্তু ও জগত - কে বুঝলেই চলবে না । আর কেমন করে বুঝবে ? এঁরা যে পদ্ধতির কথা বলবেন তা একেবারেই অন্যরকম । প্রথম দেখলে বিপরীতমুখী যাত্রা বলেই মনে হবে , মনে হবে অসম্ভব , অবাস্তব বলেও । বিজ্ঞান আমাদের বলবে জ্ঞান আহরণ করতে হলে , খবর জোগাড় করতে হলে ইন্দ্রিয়গুলিকে খোলা রাখতে হবে , সজাগ রাখতে হবে , প্রয়োজনে শান দিয়ে আরও শক্তিশালী , আরও তীক্ষ্ণ করে তুলতে হবে । কারণ এরাই আমাদের মূল যন্ত্র, এরাই আমাদের হাতিয়ার। জানালা খোলা না রাখলে বাইরে থেকে আলো - বাতাস আসবে কী করে ? যোগদর্শন কিন্তু ঠিক এর বিপরীত কথা বলবেন । তারা বলেন জ্ঞান আহরণ করতে হলে , জগতের প্রকৃত স্বরূপ জানতে হলে ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করতে হবে , ইন্দ্রিয় অঙ্গ গুলোকে বন্ধ করতে হবে , আর এই জায়গাটি বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারা বেশ শক্ত । কারণ আমরা দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতায় সর্বদাই দেখেছি যে চোখ দিয়েই দেখতে হয় , কান দিয়েই শুনতে হয়, বড় জোর দূরবীক্ষণ বা অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে চোখের ক্ষমতা, চাক্ষুষ পরিসীমা বাড়ানো যেতে পারে মাত্র । আর একটু এগিয়ে যদি কেউ বলে , জানার জন্য দেখা - শোনা এসবের কোন দরকার নেই , চোখ কান ব্যবহার করার দরকার নেই , তাহলে তাকে সাধারণ মানুষ পাগল বলে অভিহিত করবে ।তবু আমরা আর একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করব।

ধরা যাক আমাকে যদি কেউ এসে জিজ্ঞাসা করেন আপনি কে ? আমি হয়তো প্রথমেই আমার নাম বলব । তারপর আরও কী কী বলব নির্ভর করছে পরিবেশ - পরিস্থিতি এবং প্রশ্নকর্তা কী জানতে চাইছেন , তারপরে অফিসে গিয়ে বলব আমি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার , ছেলের স্কুলে গিয়ে বলব আমি

প্রীতমের বাবা , রাজনৈতিক দলের মিটিং - এ গিয়ে বলব আমি সি.পি.এম , আমি বাঙালি। তেমনি ভারতবর্ষের বাইরে গেলে বলব আমি ভারতবাসী । তেমনি করেই আমি হিন্দু বা মুসলমান, যুবক বা বৃদ্ধ , পুরুষ বানারী । আমার কাছে এই সবগুলিই আমার পরিচয় , সব মিলিয়েই আমি। এই যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে নিজেকে দেখা , ভিন্ন ভিন্ন রূপে নিজের প্রকাশ এগুলির মধ্য দিয়েই আমার সংস্কার , বিশ্বাস , উপলব্ধি , অভিজ্ঞতা প্রকাশিত হয় । আমি বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাস করি বলেই আমি সি.পি.এম বা কংগ্রেস , বিশেষ লোকধর্মে বিশ্বাস করি বলেই আমি হিন্দু বা মুসলমান , বিশেষ আদর্শবাদ বা মতবাদে বিশ্বাস করি বলে আমি গণতন্ত্রবাদী বা মার্কসবাদী। যোগদর্শন বলছেন , এই যে আমার ভিন্ন ভিন্ন রূপ এসব এক একটা মুখোশ যা আজ আমিকে ঢেকে রেখেছে , সরিয়ে রেখেছে আমার দৃষ্টি থেকে।

আমি যখন কোন ঘটনাকে দেখছি , আমার আত্মপরিচয় দিয়ে , আমার চশমা দিয়ে দেখছি তাকে। অবজেক্ট যেমন আছে দেখতে পাচ্ছি যে , বিষয়গত অবদানটা যোগ হয়ে যাচ্ছে তার সাথে। অনেকটা কোয়ান্টাম মেকানিজম - এর বক্তব্যের মতো যেখানে পর্যবেক্ষক, পর্যবেক্ষণযোগ্য কে পরিবর্তন করে ফেলেছে পরিমাপ করতে গিয়ে । চোখের আলো অনুরঞ্জিত করে ফেলেছে চোখে বাহিরের বস্তু , তাই এবহবৎধষ হলে ঝঈ/ঙনপ দের সংরক্ষণের জন্য দুঃখ পাচ্ছি , আবার অন্য মতাদর্শের হলে কোনও রাজনৈতিক দল ভোটে হেরে যাওয়ার আনন্দ পাচ্ছি , আবার general না Sc/Obc । হলে বা সি.পি.এম না হয়ে কংগ্রেস হলে ঠিক উল্টোটি মনে হচ্ছে , কারণ দৃষ্টিকোণ টা বদলে যাচ্ছে। কোন ঘটনাকে শুধুমাত্র ঘটনা হিসাবে , বস্তুকে বস্তু হিসাবে দেখতে পাচ্ছি না কখনো। আমার নিজের পরিচয় আমার কাছে যা তারই আলোয় দেখছি সর্বদা ।

ধরা যাক আমি ভারতবাসী এবং আমি ডাক্তার ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের যুদ্ধ বেঁধেছে। পাকিস্তানের এক সৈনিক আহত হয়ে এল আমার কাছে চিকিৎসার জন্য । আমি কি চিকিৎসা করে তার কষ্ট লাঘব করার চেষ্টা করব , নাকি শত্রুপক্ষের লোক বলে ফিরিয়ে দেব শূন্য হাতে ? যদি ফিরিয়ে দিই তাহলে আমি তখনকার মত আমার ভারতবাসী পরিচয়টিকে গুরুত্ব দিলাম কিন্তু মানুষ পরিচয়টিকে অবহেলা করলাম । একটি মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখতে পারলাম না । খন্ড সত্য , বৃহত্তর সত্য দর্শনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল । একরকমের আত্মপরিচয় আর একরকমের আত্মপরিচয়কে আবৃত করল , এক আমি আর এক আমিকে প্রকাশিত হতে দিল না । যোগদর্শন বলবেন ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান , সংবেদনশীল জ্ঞান আমাদের এই খন্ড সত্যই উপহার দিকে পারে অখন্ড

অবিকৃত পূর্ণ সত্যের সন্ধান দিতে পারে না । সেইজন্য পূর্ণ সত্যের সন্ধান পেতে হলে ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করতে হলে মনের দোলাচল বন্ধ করতে হবে , চিত্তের বৃত্তিময় হয়ে যাওয়াকে আটকাতে হবে , আমার নানা রূপে সাজা , না মুখোশ পরাকে বন্ধ করতে হবে , না হলে সত্য ধরা দেবে বিকৃত হয়ে , আংশিক হয়ে , আমার ভাবনার রঙে রঙিন হয়ে । তাই প্রকৃত সত্যকে জানতে হলে দরকার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, তাৎক্ষণিক উপলব্ধি, যেখানে কোন মধ্যম নেই । আর তা করতে হলে আমার মুখোশগুলোকে খুলে ফেলতে হবে এক এক করে , রুদ্ধ করতে হবে ইন্দ্রিয়ের দ্বার , চিত্তকে করতে হবে বৃত্তিহীন তবে অপরোক্ষ জ্ঞান । আবার প্রত্যক্ষ দিয়ে শুধু হবে না কারণ প্রত্যক্ষের জন্য লাগবে ইন্দ্রিয় , লাগবে মন , লাগবে বুদ্ধি ; লাগবে একাধিক মিডিয়াম , বাউলের ভাষায় সহজ হতে হবে । সহজ মানে কী ? ওই মুখোশগুলোকে খুলে ফেলা । যোগদর্শনের ভাষায় স্বরূপে অবস্থান ।

এই অন্যধরনের ভাবনাতে যিনি বিশ্বাস করেন , শুধু বিশ্বাস করেন তাই নয় , তাকে প্রাত্যহিক জীবনে অনুসরণ করার চেষ্টা করেন , তিনি অন্যদের থেকে কিছুটা আলাদা হবেনই । তার বাহ্যিক আচরণ , আচারব্যবহার , বিশ্বাস - অবিশ্বাস এবং সর্বোপরি জীবনধারা সবার সাথে মিলবে না , হয়তো কোথাও কোথাও বিপরীতমুখী হবে। এরকম লোককে পাগল না বলে উপায় কি ? সোজা কথায় যে অন্যদের মত নয় , সবার থেকে আলাদা তাকেই তো আমরা পাগল ভাবি , পাগল বলি[76]। আর সেই আলাদা হওয়ার ধরনটা যদি এরকম মৌলিক হয় , ভিত্তিস্বরূপ হয় ,গুনাত্নক হয় তাহলে তো তাকে পাগল বলতে আর কোন বাধা নেই । এবার এই পাগল কথাটা শ্রদ্ধার সঙ্গে বলা হবে না অশ্রদ্ধার সঙ্গে বলা হবে , ভালোবাসার সঙ্গে বলা হবে না বিদ্রুপের সঙ্গে বলা হবে সেটা নির্ভর করছে বক্তার সামাজিক পরিমন্ডল , শিক্ষা , ব্যক্তিগত অনুভব , সহনশীলতা ও পরমতসহিষ্ণুতার ওপর[77] ।

## রাস্তার পাগল বা ভবঘুরে পাগল

[76] সুভাশিষ হালদার , পাগল আমি , ছাতনা : শ্রয়ন , ২০০৭ , পৃ : ৩১

[77] তদেব পৃ : ৫৩

একটি পাগল বসিয়া গান করছে । আর বহু লোক তাহাকে ঘিরে সেই গান শুনছে । পাগলের কণ্ঠস্বর বড় মধুর । সে গাইতেছে-

*" তোমায় দেখবো বলে আমি ঘুরে ঘুরে সারা হলুম*

*এ ধারে- ওধারে - সে ধারে , যে ধারে দুচোখ যায়*

*আমি খুঁজি খুঁজি নারি , যে পায় তারি*

*আমি খুঁজে খুজে সারা হলুম*[78] *"*

এই তো তার গান , কিন্তু কণ্ঠস্বরের মাধুর্যে শ্রোতাগণের কর্ণে যেন অমৃত বর্ষণ করিতেছিল । না হলে এত লোক জমবে কেন ? সে পুনঃ পুনঃ ঐ গান গাইছে , মাঝে মাঝে কীৰত্তনীয়াদের মত অখর দিচ্ছে। এই গান এতবার শুনলাম যে আমার মুখস্থ হয়ে গেল । অন্যান্য লোকেরা আসছে , দু - এক মিনিট শুনে যে যার মত চলে যাচছে । কিন্তু আমি আগ্রহ নিয়ে শুনছি । আর যখন একটু ফাক পাচ্ছি অমনি সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছি । পাগলের মুখে বুঝি কি মাধুরী আছে , নহিলে আমার চক্ষু দুটি তার মুখ থেকে অন্য দিকে যায় না কেন ? ক্রমে ক্রমে আমার অজ্ঞাতসারে আমি পাগলের সম্মুখে গিয়ে দাড়ালাম । তাহার দৃষ্টি আমার উপর পড়া মাত্র সে উঠে দাঁড়াল , এবং নিজ দক্ষিণ হস্ত সহসা আমার বাম হস্ত ধারণ পুৰ্ব্বক বলিল বড় খিদে পেয়েছে আমায় কিছু খেতে দিবি- পাগল যেন আমার কে ! তার সে মধুমাখা কথা কটি আমায় বিভোর করিল । আমি বলিলাম " কি খাবে বাবা ? পাগল বলিল " যা দিবি ছাই পাশ , যা তোর ছেদ্দা হয় "[79]|

**অপরিচ্ছন্ন ভবঘুরে**

আমাদের দৈন্দিন জীবনে , আমাদের সমাজে কম - বেশী রাস্তায় বা ফুটপাথে কিছু জড়বস্তুর মানুষ দেখা যায় যাদের আমরা খুব সহজে চিনতে পারি যে , ওরা পাগল , সামাজিক জীবন ওদের জীবন বড়ই দুর্বিষহ , অনেক কষ্টকর , সারা দিন এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াই উদ্দেশ্যহীন ভাবে । তাদের জীবনের কোন লক্ষ্য আছে কিনা তা বোঝা সত্যিই খুব কঠিন । বছরের পর পর তাদের জীবন চলতে থাকে এই ভাবে । কেউ বা পথ ভোলা পথিকের মত আবার কে অজানা স্থানে এসে সেখানে নিজের অস্থায়ী ঠিকানা করে নেই । নাম পরিচয় হীন এরূপ পাগল প্রায়শ : দেখা যায় ।

---

78 শ্রীবিনোদবিহারী হালদার ; পাগল , দি গৃহস্থান পাবলিশিং হাউস এবং দি ইণ্ডিয়ান প্রেস , ক্যালকাটা , ১৩২১ (বাঃ) পৃ : -৩

79 তদেব , পৃ : ৪

সমাজ জীবনে আমরা ওদের দেখে নানা রকম মন্তব্য করি।কিন্তু আসল ব্যাপারটা হল ওদের পোশাক পরিচ্ছদ এতটা অপরিচ্ছন্ন যে মানষিক ভাবে বিকৃত করে । বা ঘৃণা বোধের জন্ম হয় বা। আবার চাক্ষুস পত্যক্ষ করলেও নিজেদেরই খুব খারাপ লাগে । খারাপ লাগাটা স্বাভাবিক ব্যাপার কারণ আমরা সভ্য জাতি ও পরিচ্ছন্নতার পূজারী । নোংরা অপরিচ্ছন্নতা আমাদের মনের পবিত্রতাকে বিঘ্ন করে । তাই বোধ করি ওদের প্রতি আমাদের ভক্তি কোন ভাবে আকর্ষণ করবেনা।

**জড়বস্তুর মানুষ**

ওরা জড়বস্তুর মানুষ । ওরা ভবঘুরে । কাজ কর্ম নেই , তাই ওরা ঘুরে বেড়াই । কিন্তু ওদের উদ্দেশ্য কি ? কিন্তু ওদের আমরা জড় বস্তুর মানুষ বলে মনে করি কেন ? আসলে ওরা মানুষ কিন্তু সামাজিক জীবনে আপরিচ্ছন্ন , উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়ায় । সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে আমাদের সমাজ জীবনে কোন কাজে লাগে না । তাই তো সমাজ ওদের পাগল । বলে আখ্যা দিয়েছে । আমরা সমাজ জীবন , সবাই মিলেমিশে সমাজবদ্ধ জীবন তৈরী করেছি । কিন্তু ও সমাজ বদ্ধ । নয় ড় সামাজিক রীতিনীতি , আইন কানুন ওরা তোয়াক্কা করে না । কিন্তু একটা উদ্দেশ্য ওদের আছে ড় এটা জৈব প্রকৃতির নিয়মে তারা এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ানো ... আর পেটের জ্বালা নিবারণের জন্য এখানে ওখানে হাত পাতা এখান থেকেই হৈতী হয় ওদের একটা জীবিকা । যে জীবিকা শুধুমাত্র নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য । নিজেকে বাঁচানোর জন্য । ভিক্ষা বৃত্তি । বাংলায় একটা প্রবাদ আছে পেটের জ্বালা বড় জ্বালা । এই জ্বালা নিবারণের জন্য কখনো বা উচ্ছিষ্ট ভোজন আবার কখনো বা ভিক্ষাবৃত্তি । কিন্তু ভবঘুরে পেশায় কিন্তু ভিক্ষাগ্রহণ করে না । শুধু যখন খিদে পাই তখন এরূপ আচরণ । এরূপ দৃশ্য সমগ্র দেশে দেখা যায় তেমনী আমাদের দেশেও। কিন্তু আমাদের এরূপ ঘটনার দৃষ্টিভঙ্গি কি ? এরূপ অনেক উদাহরণ জীবনে দেখা যায় । কিন্তু কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় তাদের নীরবতা আবার অযৌক্তিক কথপোকথন ।

যেহেতু আমার আলোচ্য কালপর্ব উনবিংশ ও বিংশ শতক । এই সময়ে পাগল ধারণার বিবর্তনও কিভাবে হয়েছে তা আমি বিভিন্ন সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আলোকিত করার চেষ্টা করব । পাশাপাশি উক্ত সময়ের পাগলামি সংক্রান্ত কার্যকলাপ পরিচয় দেওয়ার জন্য তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

আলোচনা করার জন্য বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন কালপর্বের মধ্য বিভিন্ন ঘটনাগুলির উদাহরণ প্রসঙ্গত আলোচনার করার চেষ্টা করব ।

ভেগরেন্টস হোম । ভবঘুরে আবাস । লোকে বলে পাগল গারদ এখানে যাদের ঠাই হয় তাদের অধিকাংশ মানসিক ভারসাম্যহীনা পরিবারে অবাঞ্ছিত , রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া মানুষজন । পশ্চিমবঙ্গ কিংবা ভিনরাজ্যের। এই গারদে যারা একবার ঢোকে তাদের আর বহির্গমনের কোনও উপায় নেই, যদি না ভবঘুরে নিয়ামক তাদের জন্য ব্যবস্থা করেন পুনর্বাসনের । আর সে সম্ভাবনাও খুবক্ষীণ। কারণ এদের বেশির ভাগই শারীরিক এবং মানসিক ভাবে অসুস্থ । ঢাকুরিয়ায় শরৎ বোস রোডের চারদিকে পাঁচিল তোলা ভবঘুরে আবাস তেমনি এক পাগলা গারদ সেখানে থাকে এক আশ্চর্য পাগলা সূর্য ওঠার আগে ব্রাক্ষমুহূর্তে সে ঝাপ দেয় আবাসের এক গভীর পুষ্করিণীতে এবং গা - হাত- পানা মুছে পদ্মাসনে বসে যায় ধ্যানে তৎকালীন নিয়ামকও সমান পাগল । ১৯৯২-৯৩ সালের এক ভরদুপুরে হাজির হলেন সেই আবাসে । তাকে ডেকে পাঠালেন অফিসঘরে। নিজেতে - নিজে - থাকা পাগলটি আসতে চায় না বড়াে কর্তার সামনে । বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে নিয়ে এলেন আর কে পাগল মহিলা অফিসার । বড়ো কর্তাটি মাঝে মাঝে বলতেন , ভগবান নাকি এই সব অসহায় ভবঘুরেদের সেবা করার জন্য তার বুক - মোচড়ানো কান্না শুনে পাঠিয়ে দিয়েছেন কিছু নিঃস্বার্থ পাগলা পাগলীদের । এই মহিলা অফিসারটি তাদের অন্যতম । কিন্তু কিছুতেই মুখ খুলতে চায় না সেই ভবঘুরে - গৌরবর্ণ সুদর্শন চল্লিশ ছুঁই ছুঁই পাগলা চোখ দুটি আয়তকার । কপাল চওড়া । মাথা প্রায় কামানো । পরনে হাফ প্যান্ট । গায়ে কোচকানো জামা । নিয়ামক জিজ্ঞাসা করলেন , তোমার নাম কি , ভাই ? ঈষৎ মুখ তুলে সে তোতলানো গলায় বলল জ্ঞানোজ্জ্বল । এ নাম কে দিয়েছেন ? উত্তরে বলল গুরু । তিনি ত্রৈলঙ্গস্বামী সম্প্রদায়ের । আসল নাম সীতারাম । তুমি ধ্যান কর ? হ্যা কার ধ্যান ? ওঁকারের । কিছু দর্শন হয় ? হ্যা , আলোর বর্ণ ? জ্ঞানোজ্জ্বল উত্তর দিল - শ্বেত । এবার নিয়ামকের মুখের দিকে সোজাসুজি তাকাল মণিপদ্মে ভ্রমরের মতো বসে থাকা পাগল জ্ঞানোজ্জ্বলা বলল , হিতকর্ম ছাড়া আপনার আর কোনও প্রারাব্ধ নেই । তারপর

বিড়বিড় করে কী এক দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলে চলেছে সে , অপুষ্ট ও সঙ্গতিহীন যেন - বা সেতুরচনার চেষ্টা করছে কোনও এক অলৌকিক জগতের সঙ্গে[৪০] ।

এরূপ অনেক পাগল সমাজের অলিতে ও গলিতে ঘুড়ে বেড়ায় । কেউ বা সামাজিক বঞ্চনার স্বীকার। আবার কেউ বা বিরহে মন ভোলা , কিংবা বিবাগী । বাংলার সামাজিক জীবনে এই পাগলের যেমন ভিন্নরূপ অর্থ আছে তেমনী ভবঘুরে পাগলরা বস্তুত পক্ষে সমাজের আসল পাগল বলে পরিচিত । বাস্তব জীবনে এইরূপ অনেক উদাহরণ জীবনীমূলক গ্রন্থে পাওয়া যায় । যার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ শিবশঙ্কর শ্রেণী পাগলের কথা নামক গ্রন্থটি এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করা প্রয়োজন। লোকে আমায় বলে পাগল , কেন বলে তা আমি তো জানিনা , কি দোষে লোকের কাছে আমি উন্মত্ত , কি অপরাধে স্বদেশের লোক , আপনার লোক আমাকে উপহাস করে তা আমার হৃদয়ঙ্গম হয় না । যখন আমার হৃদয় কাদিয়া উঠে , প্রাণের ভিতর জ্বলিতে থাকে , তখন আমার মনের কথা লোককে জানাই , হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া অন্তরের দন্ধাবশেষ দেখছি , তাদের নিকট কাদি, চক্ষের জল ফেলি । আবার যখন আনন্দে মন উথলিয়া উঠে ; হৃদয় নাচিতে থাকে , তখনও তাদের নিকট হাসি , আমার আনন্দেরভাগ তাদের দিই , তারাও হাসে , হাসির কারণ বলি শোনে, মনের গুপ্ত স্থান উদঘাটন করে দেখাই , দেখে । কিন্তু তারা বলে এসব পাগলামী , এ ভয়ানক রোগ , এ শোচনীয় অবস্থা । শুনে আমার ভয় হয় , মনে আতঙ্ক জন্মায় । কিন্তু আমার তো ইহা রোগ বলে জ্ঞান হয় না , শোচনীয় অবস্থা বলেও বোধ হয় না , মনে হয় , এ স্বাভাবিক অবস্থা । এ প্রকৃতি নির্দিষ্ট পথ । প্রকৃতি দেবী আমাদের কপট হতে শিক্ষা দেয় । শৈশাবস্থা হতে তো আমাদের মুখে এক রকম হৃদয় আর এক রকম থাকে না , বাল্যকালেতো আমরা হৃদয়ের ভাব লুকাতে চাই না , সে সময় তো মধু পেটে বিষ থাকে না । হায় সে সময় কি মধুর সরলতায় , কি অমেয় প্রেমময়, সে সময় অপরের সুখ দুঃখে ; হরিয়ে , বিষাদে হৃদয়তন্ত্রী কেমন কাঁপিয়া উঠে ; সে কাঁপা তো রসনারনহে অন্তরের মর্মস্থলের । সে সময় তো কুটিল পথে প্রবেশ করিনা । সে সময় তো আমরা ছলনা জানিনা । তবে কেমন করে বলব , যে স্বভাব হইতেই আমরা কুটিলতা শিক্ষা পাই , জন্ম থেকে আমরা ঐ পথের পথিক । সুতরাং কেমন করে স্বীকার করব , যে আমার এ অবস্থা অস্বাভাবিক । এ দশা অপ্রকৃতিক , তবে কেমন করেই বা বিশবাসক

---

[৪০] ভবঘুরে জ্ঞানোজ্জল , এইসময় ( দৈনিক পত্রিকা ) , ২ মে ২০১৩

রিব , যে ঈশ্বর কুটিলপথই আমাদের জন্য নির্দিষ্ট কবিতা রেখেছেন[81] । আবার অতুলকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় এই ভব সংসারকে এবং ঈশ্বরের সঙ্গে তার যে আত্মিক মেলবন্ধন এবং ঈশ্বরের প্রতি মানুষের আশক্তি তা থেকে অর্জিত জ্ঞানকেবিচিত্র রূপে বর্ণনা করেছেন । এজগৎ সংসার তার কাছে। পাগলের হাট ।

*" ভবের ধাঁধাঁ তুমি ভগবানে*
*আজ মোরে গিয়াছিল প্রাণ*
*পাগলের হাতে - আমিও*
*পাগল বেশ- এ জ্ঞান... ..[82] "*

পাগলের মনের খবর রাখা যেমন খুবই দূরহ ব্যাপার তেমনি পাগল কি চায় কি তাদের উদ্দেশ্য এই নিয়ে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে ক্লিনিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গীর দুস্তর পার্থক্য আছে । ভবঘুরেদের মনের খবর তাদের ব্যক্তি জীবনের ইতিহাস কি যদি তার কারণ অনুসন্ধান করা যায় বা ফুটপাথে পড়ে থাকা কোনও এক পাগল , তার উক্ত অবস্থার জন্য কে দায়ী বা কারা দায়ী এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে প্রতিটি ভবঘুরে পাগলের ব্যক্তিগত ইতিহাস আমাদের সামনে উঠে আসে । আর এখানে ইতিহাসের সঙ্গে পাগল ভাবনাচিন্তার সার্থকতা । অভিনব ভাবরসে পাগল আজ মত্ত । ভবের বিভিন্ন পাগল বিভিন্ন প্রেমদৃষ্টিতে বিদ্যমান । কখনওবা ভক্তি সাধনা তাদেরকে সম্পূর্ণ সতন্ত্র করে রেখেছে আর এটাই বাংলার সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে পাগল চর্চার স্বতন্ত্রতা। " বর্ষদ্বয় পরে যবে হেরিনু তোমায় অভিনব ভাবরসে মজালে আমায় অজস্র বর্ষণ করি প্রেমদৃষ্টিবান প্রভিন্ন করিলে মোর প্রেমও পরাণ কিছু দিন পরে বিয়ে ! আবার যখন আসনু তোমার পাশে আরাম কারণ , " জানত " সুরূপে ! তুমি কিরূপে তখন পাগল করিলে পুন পাগলের মন"[83] ।

## শব্দতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় পাগল

---

[81] শিবশঙ্কর শ্রেণী , পাগলের কথা , শ্রীচণ্ডীদাশ কতৃক প্রকাশিত ১২৯৪ , পৃ : ৫

[82] অতুলকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় , পাগলের হাট , অনাদি প্রিন্টিং , কলিকাতা , ( ১৯২১ ) পৃষ্ঠা ৫

[83] শ্রদীননাথ ভট্টাচার্য্য ; পাগলের মনের কথা Hare Press , Calcutta , 1906 পৃষ্ঠা ৯

পাগলের সামাজিক ব্যাখ্যা আলোচনা করার পূর্বে এই শব্দটির অর্থগত ও শব্দতাত্তিক ব্যাখ্যা আলোচনা করা অবশ্যই প্রয়োজন। পাগল কি এই শব্দটির কোথা থেকে উৎপত্তি হলো এবং তার অর্থ কিভাবে বিবর্তিত হলো তা পুংখানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা করা অবশ্যই দরকার । শব্দের খেলায় এই তিনটি অক্ষর পা - গ - ল যুগ যুগ ধরে বিবর্তিত হয়েছে নানা রূপের বহিপ্রকাশ ঘটিয়েছে। ভিন্ন অর্থের নির্মাণ ঘটিয়েছে। কখনওবা অর্থের বিনির্মানও ঘটিয়েছে । বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে পাগল বলতে কি বোঝায় । পাগল শব্দটি বিশেষণ । অর্বাচীন সংস্কৃত শব্দ থেকে উৎপত্তি। পাকল > পাগল শব্দটি বিবর্তিত হয়েছে[84] । পাগল শব্দটি অর্থ বিভিন্ন রকমভাবে ব্যবহার কার হয় সেই প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃত ভাষায় পাগল শব্দের মাধ্যমে বহুবিধ অর্থকে বোঝান হত। পরবর্তীকালেও এটি বিবর্তিত হয়েছে সমাজ জীবনে বিভিন্ন অর্থের প্রয়োগের মধ্যে। পাগল বলতে বোঝায় উন্মত্ত আবার কখনো বাতুল অর্থে প্রয়োগ করা হয় যেমন ব্রহ্মবৈবর্তপুরানের প্রকৃতি খন্ডে বলা হয়েছে “পাগলায়ঙ্গহীনায় যঃ স্বকন্যাং দদাতি”[85] । আবার বাঙালীর জীবনে সেই পাগল যে কান্ডজ্ঞানহীন বা বিষয়জ্ঞানহীন কখনো বা না - সমঝ । উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে “ বাসনার বশে মন অবিরত , ধায় দশ দিশে পাগলের মত ” । পাগল বলতে বোঝায় অবোধ , দুরন্ত যা শিশুদের আদরের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি । আবার দৈনন্দিন আচার ব্যবহারে অস্থির বা চঞ্চল , এই অর্থে পাগল বলি “ নয়ন পাগল হল না দেখিয়া তোমা ”[86] । রবীন্দ্রসংগীতে পাগল শব্দের ব্যবহার হয়েছে তবে এক্ষেত্রে পাগল হয়ে উঠেছে অন্যরকম ভাবে , কখনো উচ্ছৃঙ্খল কখনো বা অশান্ত। যেমন রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত গান পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে , আবার “ পাগল নদী উঠে জেগে'[87] । পাগল বিমূঢ় অর্থে । আবার কখনও কখনও মানুষ বিশ্ব জগৎতের দিকে তাকিয়ে বার বার বিস্ময় প্রকাশ করেছে । আর এই বিস্ময় থেকে জেগেছে নানা প্রশ্ন । এ জগতের সৃষ্টি হল কিভাবে ? এই জগতের শেষ কোথায় ? জগতের কি কোন স্রষ্টা আছে ইত্যাদি । এভাবে বিস্ময় আমাদের কাছে কখনো পাগল হয়ে দাড়িয়ে । মানব মন বিস্ময়ে

---

84 হরিচরণ বন্দোপাধ্যায় , -বঙ্গীয় শব্দকোষ , দ্বিতীয় খণ্ড , সাহিত্য একাডেমী ১৯৬৬ , নতুন দিল্লী , পৃঃ ১৩০০

85 বরদাপ্রসাদ বসু , - শব্দকল্পদ্রুম , ১৮০৮ ( শ ) , পৃ : ১৪

86 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর , বিচিত্র প্রবন্ধ - পাগল , বিশ্বভারতী ১৩১৪ , পু : ৯৮

87 শ্রী ধর্ম্মমঙ্গল , মানিক গাঙ্গুলি , বিরচিত , বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ , ১৩১২ , পৃঃ ১৭৩

পাগল [88] । প্রেমবিহ্বল , ভাবে ভোলা বা আত্মহারা - আমার পাগল বাবা , পাগলী আমার মা[89] সমাজে কিছু মানুষ দেখা যায় আত্মভোলা রকমের হয়তো তার বেশী উদাসী বা বিবাগী । এই ধরনের মানুষ প্রেমের ক্ষেত্রে বিরহভাবে নিজেদের প্রতিপন্ন করে ।তারা প্রেমের ক্ষেত্রে খুব বিহ্বল। যদিও প্রেমে পাগলের কোন মাপকাঠি থাকে না । তবু এই ধরনের আত্মহারা মানুষ সর্বদা একটু পাগল প্রকৃতির মনে হবে , যদিও তাদের মায়ার আকর্ষন " খুব - ই প্রবল । হতে পারে তারা খুব - ই বাস্তববাদী বা আদর্শবাদী তবুও তার মধ্যে মাতোয়ারা এ বিষয় মনের মধ্যে বিশেষ ভাবে কাজ করে তাই সমাজ জীবনে ওরাও একধরনের পাগল । এছাড়াও বহুমাত্রিক শব্দের অর্থের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় শোকোন্মত্ততা , কখনো বা শুধু উন্মত্ত আবার কখনো ক্ষেপা । খনার বচনে " পাগলার চৌদ্দ পাগলীর আট , এই নিয়ে কাল কটি"। পাগল মত্তা , জ্ঞানহারা অর্থে " কালী সমর পাগলী "[90] , বা " ধায় উন্মত্ত পাগলী[91] , পেৰমবিরহ " ভালে সে নাগরী পাগল হয়েছে পাগলী "[92] দুরন্তপনা , দৌরাত্ম্য, " পাগলাই না করিহ , না ছড়াইয় ঝুঠ "[93] জ্ঞানহারা অর্থে " কভু কাঁদে , কভু গায় , যেন পাগলীনি প্রায় "[94] ইত্যাদি...

**বাতুল :** যার অর্থ উন্মত্ত বা পাগল , বাংলায় বিশেষণ শব্দ যোগে ব্যবহৃত হয় । তারাকুমার কবিরত্নের হিতোপদেশ বাতুলের অর্থ যেমন পুরোপুরি উন্মত্ততা ছুয়ে যায় না তেমনী কাশীদাসী মহাভারতের বাতুলের অর্থ আবার অন্যরকম । তবুও বাতুল শব্দের মধ্যে কিছু ফনা বা আত্মহারা বিষয় টি বোঝান হয় । যদিও পরবর্তীকালে বাতুল শব্দটি পরিবর্তিত হয়ে বাউলে পরিণত হয়েছে। চৈতন্যচরানামৃতে বাতুল কে দেখানো হয়েছে ভক্তিবাদের মধ্য দিয়ে । " কথায় কথায় বল বাতুল"[95] আবার বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে এই বাতুলতার প্রবণতা সবচেয়ে বেশী দেখা যায় । কখনও কখনও

---

88 বিজিতকুমার দত্ত ও অন্যান্য ( সম্পাঃ ) আকাদেমি বাংলা অভিধান , পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি , ১৯৯৯ , কলিকাতা পৃঃ ৫০৭

89 মাইকেল মধুসূদন দত্ত , মেঘনাথ বধ কাব্য , পৃঃ ৯৬

90 গিরীশচন্দ্র রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড , পৃঃ ১২৭ ।

91 বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থাবলী , দ্বিতীয় খণ্ড , বসুমতী , ১৩১১ , পৃঃ ৫৬

92 কারাম জার্জী প্রকাশিত , সাহিত্য দর্পণ , ১৯০২ , দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ১৬০

93 কথাসরিৎসাগর , দ্বিতীয় সংস্করণ , ১৮২৫ , ১৫ অধ্যায় , ৪৪ অনুচ্ছেদ পৃঃ ১০৫

94 চন্দ্রমোহন তর্করত্ন , অমরকোষ টীকা , সংস্কৃত , ১ : ৮৯৬ ।

95 মালতীমাধব , আর . জি ভাণ্ডারকর সংশোধিত । দ্বিতীয় অধ্যায় , পৃঃ ১০

নারীভাবের বাতুলতা বা ভক্তি সাধন ভজনের বাতুলতা দেখা যায়[96] । যাইহোক আবার ভারতচন্দ্র রচনাবলী বা অমরকোষ -এ বিভিন্ন অর্থে বাতুল শব্দকে ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ পাগল শব্দের সাথে অনেকটা সাযুজ্য আছে । বাতুল - বিরক্ত অর্থে " কহিল বিপ্র হইয়া বাতুল [97], " মানুষী বাতুলী-[98] এক্ষেত্রে বাতুল অর্থে উন্মত্তা বা পাগলী।

**উন্মাদ :** উন্মাদ বলতে কি বোঝায় , কাকে বলে উন্মাদ , উন্মাদের প্রকৃত অর্থ কি ? সমাজে কারা উন্মাদ বলে প্রতিপন্ন করে অপর কোন ব্যক্তিকে । এই প্রশ্নের সমাধান কোথায় ? যদি শব্দতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় উক্ত শব্দটি অর্থ বিশ্লেষন করা হয় তাহলে দেখা যায় উন্মাদ শব্দটি আমরা বিশ্লেষণ রূপেব্যবহার করি । আক্ষরিক অর্থে দেখা যায় এই শব্দটি সংস্কৃত শব্দ থেকে উৎপত্তি *( উন্মাদ = উৎ + মদ+ আ)* যার অর্থ ক্ষিপ্ত বা পাগল "[99] , যেটি স্ত্রীলিঙ্গ অর্থে উন্মাদিনী। উন্মাদ শব্দটি বাংলা ভাষায় বিবিধ অর্থে ব্যবহৃত হয় । অর্থাৎ বাঙালী সমাজজীবনে ভাষা ব্যবহারের তারতম্য , বিচিত্র অর্থের প্রয়োগ একমাত্র বাংলা ভাষায় দেখা যায় । উন্মাদ কখনো মত্ত বা ব্যাক্ষিপ্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়, আবার, হতবুদ্ধি , ভ্রষ্টবুদ্ধি , বা হিতাহিতজ্ঞানহীন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে , " কেহ বা না দিলা ... কামনদে উন্মাদ ভৈরবী"[100] । উন্মাদ ও পাগল এই শব্দ দুটি কখনো একযোগেও ব্যবহৃত হয় । উদাহরণস্বরূপ পাগল কি উন্মাদ দশা তোর[101] ।

শব্দের অর্থের মধ্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পার্থক্য । শব্দের অর্থ কত রকমের হয় , বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর ক্ষেত্রে বা কোন বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে শব্দ দ্বারা চিহ্নিত করা হয় । এখানেই শব্দ ও অর্থের তাৎপর্য। উন্মাদ কখনো হয়ে উঠেছে পাগল , আবার কখনো চিত্তসম্মোহন , চিত্তবিভ্রম , মতিভ্রংশ ইত্যাদি , যেমন "উদ্যান পুষ্পের সৌরভে আকাশ উন্মাদ হয়েছিল"[102] আলঙ্কারিক অর্থে উন্মাদ সঞ্চারি ভাব বিশেষ[103] " উন্মাদো মাতৃদোষেন " চাণক্যনীতিতে ব্যবহৃত হয়েছে । অবিবেকতা

---

[96] মহাবীর রচিত , জীবনানন্দ সম্পাদিত , দ্বিতীয় অধ্যায় , পৃঃ ২২

[97] তুকারাম জাজী প্রকাশিত , সাহিত্যদর্পণ , ১৯০২ পুঃ ২ ।

[98] সুশ্রুত সংহিতা , ৬ অধ্যায় , ৬২ অনুচ্ছেদ

[99] মনুসংহিতা , তৃতীয় অধ্যায় , পৃঃ ১৬১ ।

[100] কাশীনাথ পাণ্ডুবঙ্গ পর্বর , রামায়ণ সংস্কৃত , শক , ১৮১০ , ১.৫৪.১০

[101] মনু , ৮,৬৭ ও মাত্র ২.৩২ বি

[102] দানসাগর , উত্তরচরিত , ( সং, বাংলা ) ১৪১৫ পৃষ্ঠা ১৬

[103] মহাভারত , বঙ্গবাসী , শকাব্দ ১৮২১.৬৪.২২

বা বিচার মূঢ়তা হৃদয় উন্মাদকারী[104]। ভূতান্মাদ বা দেবোন্মাদ অর্থাৎ ভূতাদির আবেশের জন্য অন্যথাভাব , *“গ্রহাবেশলক্ষনৈরুন্মাদেরভিভূতঃ”*[105] , কামাবেশ অর্থে *উন্মাদতরলৈঃ কটাক্ষৈ* [106] উৎসাহবিশেষ *বীররভসান্মাদ* [107] বিকাশ অর্থে উন্মাদৎবীক্ষ্য পদ্মানাম[108] , কামাবেশ মানসিক ব্যাধিবিশেষ- মানসোহয়মতোব্যাধীন্মাদ [109] উন্মাদ থেকে উন্মাদনা , এটি বিশেষণের বিশেষিত করা এরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয় । ( সং , উৎ + মদ + অ + আ ) যার অর্থ উন্মাদের ভাব , উন্মত্তের মত আচরণ , বা প্রবল উদ্দীপনা , সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ভাষায় যখন আমরা ছাত্র ছিলাম তখন মনের মধ্যে একটা উন্মাদনা ছিল । উন্মত্ত এই শব্দবিশেষ্য হিসাবে প্রয়োগ করা হয় , যার অর্থ বায়ুজন্য চিত্ত, বিভ্রমযুক্ত, বাতুল , বা ক্ষিপ্ত [110], অতিমত্ত , বিচারবিমূঢ় , বা অবিবেক অর্থে উন্মত্তশব্দটির ব্যবহার দেখা যায় রামায়ণের বিভিন্ন ছত্রে যেমন “বল্বুন্মত্ত[111], ভূতাবেশাদি হেতু বিভ্রম চিত্ত গস্থহবিষ্ট[১১২], উগ্র , হিংস্রও মারাত্মক অর্থে উন্মত্তচপ্তশ্বাদকুল [113],*সরাপানাদি হেতু বিকৃতবুদ্ধি মদিরান্মত্ত , মহোমদিরোন্মত্ত। ব্যাক্ষিপ্তচিত্ত , নিরাকুল উন্মতাং বিলপন্তীং মাম*[114] ও “ক্ষুভিত , তরঙ্গাকুল অর্থে উন্মত্তগঙ্গং নাম দেশ (সিদ্ধান্ত কৌমুদী )। এছাড়াও উন্মাদ শব্দটি নানারূপ বিভিন্ন সাহিত্য ও সংস্কৃত শোকে প্রতিফলিত হয়ে। শব্দের এই অর্থের বিভিন্ন খেলার মধ্যে আমরা উন্মাদ উন্মত্তের একটা ধারণা পাই , যার সমাজের একটি আত্ম সম্পর্কের পরিচয় মেলে। সমাজ ও সভ্যতার মানুষের গুণাগুণ আচরণ যে বহিঃপ্রকাশ , আর কার্যকলাপের যে ধারণা তৈরী তা উন্মাদ শব্দের বিভিন্ন অর্থের মধ্যে খুঁজে পাই। উন্মত্তক ( পুং ) উন্মত্ত জন উন্মত্তদর্শন , বা উন্মত্তরূপ অর্থাৎ উন্মত্তসদৃশ , উন্মত্তলাপ্তি (ক্লীবলিঙ্গ ) উন্মত্তের প্রলাপ , উন্মত্তবেশ ( পুং ) শিব , উন্মত্তভৈরব (

---

[104] বেণীমাধব দে প্রকাশিত , মেঘনাদ বধ কাব্য ১৩০৬ , পৃঃ ২৬৮ ।

[105] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - গান , দ্বিতীয় সংস্করণ -পৃষ্ঠা ৮১

[106] হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী , হিতবাদী , ১৩০৬ , পৃঃ ১১৬

[107] গিরিশ - গ্রন্থাবলী , দ্বিতীয় ভাগ , বসুমতি , পৃঃ ১০৮

[108] চণ্ডিকা - বিজয় , রংপুর সাহিত্য পরিষ ?, ১৩১৬ , পৃঃ ২৪০

[109] চৈতন্যমঙ্গল - বঙ্গবাসী , ১৩০৮ ( বঙ্গাব্দ ) , পৃঃ ১১০ ,
ভক্তমাল গ্রন্থ , বলাইচাদ গোস্বামী সম্পাদিত , ১৩০৫ ( বাং ) , পৃঃ ৫৩

[110] সরকার - অক্ষয়চন্দ্র ( সম্পাদিত ) , চণ্ডীদাস , ১২৮৫ , পৃঃ ৩

[111] চৈতন্যচরিতামৃত- বঙ্গবাসী , চৈতন্যাব্দ – ৪৮১ , পৃঃ ৮৫

[112] মাইকেল গ্রন্থাবলী - বঙ্গবাসী , ১৩০৭ , পৃঃ ১৬২ ।

[113] দাশরথি রায়ের পাঁচালী , বঙ্গবাসী , ১৩০৯ , পৃঃ - ২১৭

[114] কৃত্তিবাসী রামায়ণ , বঙ্গবাসী । বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ , পৃঃ ১০

পুং ) ভৈরব বিশেষ ইত্যাদি, বিশেষ করে মেঘনাদবধ কাব্যের উন্মত্ততা যার অর্থ ক্ষিপ্ততা বা পাগলামি[115] এই অর্থের সঙ্গে সমাজের একটা আত্ম সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায় ।

## পাগলামীর বিবিধ প্রসঙ্গ

### পাগলি

পাগলী শব্দটি শুনলেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে নানা রূপের প্রতিচ্ছবি, সাধারণত পাগল মেয়েরাই আমাদের সমাজে পাগলী বলে পরিচিত। এই পাগলী জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে অনেক কাহিনি, শৈশবে যে মেয়েটি স্নেহে পিতা মাতার কোলে লালিত পালিত , সেই মেয়েটি আজ হয়তো ফুটপথে ভবঘুরে অবস্থায় বা রেল স্টেশনের সন্নিকটে তাদের দিন যাপন করে। প্রতিদিন এরূপ অনেক পাগলি আমাদের কমবেশি চোখে পড়ে। এদের জীবনের কথা খুবই কম আলোকিত হয়েছে। কিন্তু ওরাও তো মানুষ , ওদের অবস্থা এইরকম কেন ? কেন তারা সংসার পরিজন ছেড়ে আজ পাগলি জীবন বেছে নিয়েছে ? যাকে আমরা পাগলি বলি সে কি নিজে জানে আসলে সে পাগলী কিনা ; সমাজ তাদের কেমন ভাবে দেখে ? এরকম কৌতুহল মানুষের মধ্যে হওয়াটা স্বাভাবিক । মানুষিক রোগী , মন বিকার গ্রস্থ , বিকৃত মস্তিস্ক প্রভৃতি মেয়েরা একটা সময় সমাজের লাঞ্ছনা বঞ্চনা সহ্য করতে করতে তারা বেরিয়ে পড়ে[116] , সামাজিক বন্ধন ছিন্ন করে । তার পর শুরু হয় তার এক নতুন জীবন , পথেপথে ঘুরে বেড়ানো আর জৈবিক চাহিদার কারণে , হাত পেতে কিছু চাওয়া বা উচ্ছিষ্ট ভোজন করে ক্ষুধা নিবারণ ক্রমে ক্রমে ওই মেয়েটি পাগলি রূপে পরিচিতি হয়। সমাজ বিদ্যার বিভিন্ন দৃষ্টিতে পাগলী'কে ব্যাখ্যা হয়েছে। স্নেহে লালিত পালিত হয়েছে , আবার কখোন ঘৃনার চোখে ফুটপথে পড়ে থেকেছে। কোন পিতা যখন তার কন্যাকে আদর করে বলে *"Oh , My little pagli"* বা প্রেমিক যখন তার প্রেমিকাকে বলি " ওরে আমার পাগলিরে ... " এই ধরনের বাক্য প্রয়োগে পাগলি কখনো হয়ে ওঠে মমতাময়। আবার কখোন ভালোবাসার পাত্রী । আর যে সমস্ত পাগলিরা প্রকৃত

[115] কাশীদাসী মহাভারত , বঙ্গবাসী , দ্বিতীয় সংস্করণ , পৃঃ ৪৪৪

[116] অরুণ ঘোষ , মন এক অন্তর , দে বুক স্টোর , কলিকাতা , ১৯৯৩ পৃ : ৫৫

মানুষিকরোগী সমাজ থেকে বহিঃস্কৃত তাদের জীবন খুবিই কঠিন[117] , প্রতিটি মুহর্তে তারা অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম করে । পাগলিদের এই করুন দশার জন্য অনেকেই হয়তো ভাগ্য বা নিয়তিতে দায়ি করে [118] । কিন্তু এই ভাগ্য বা নিয়তি এ জন্য দায়ি কিনা তা আলোচনা করা মুখ্য বিষয় নয় । প্রকৃত পক্ষে বাস্তব জীবনের সমাজচিত্র তুলে ধরাই মূল উদ্দেশ্য । সমাজ থেকে বিতারিত যে পাগলিটি সারাক্ষন পথের দারে বসে থাকে তার সাথে এই সমাজের প্রকৃত সম্পর্কটা কোথায় ? একটা সুন্দর উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে পাগলিদের মনেও ভালোবাসা আছে , পাগলিদের মনেও ইচ্ছা বাসনা থাকে । কিন্তু সে কেন পাগলি এটাই আমাদের মূল রহস্য[119] । শান্তিধর সম্পাদিত একটি ছোট গল্প গ্রন্থ “ পাগলি ” প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাপারটি বোঝা যেতে পারে-

> *“ পঞ্চম শ্রেণির মেয়ে শম্পা দত্ত বিদ্যালয় থেকে ফেরার পথে রোজই একটি পাগলিকে তাদের বাড়ির বাইরে রকে বসে থাকতে দেখে । প্রায় প্রতিদিন পাগলি তাকে ইশারা করে ডাকে। আয় আয় এদিকে দেখবি আমার মেয়েকে । দেখ , আমার মেয়ে ঘুমিয়ে আছে , আয়না একবার । ইশারা করে সুন্দর ভাবে সম্পাকে বোঝায় , সম্পা পায়ে পায়ে তার কাছে যায় । ততক্ষণে পাগলিটি পুটুলি থেকে একটা বড় পুতুল বের করে ফেলেছে , এই দেখ , আমার মেয়ে , মেয়ের জামা ছিড়েগেছে , তুই একটা জামা দিবিরে , সম্পা বলে দেব । পরক্ষণেই সম্পা বলে কিন্তু তুমি এখানে বসে থাকো কেন ? তোমার বাড়ি নেই ? পাগলি তখোনাত অ - অ কোরে কী বলতে বলতে মেয়েকে পুটলিতে ভোরে কোথায় চোলে গেল । সম্পা সেদিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল । এভাবেই চলতে থাকে সম্পা ও পাগলিটির কথোপকথন । কিন্তু হঠাৎ একদিন সম্পা খবর পায় পাগলিটি মারা গেছে , ছুটে যায় সম্পা পগলিকে দেখে হাও - হাও করে কেঁদে ওঠে”[120] ।*

কিন্তু সম্পা পাগলিটির জন্য কাদলো কেন ? আসলে মায়া ভালোবাসা এগুলি হল মনের সঙ্গে আত্মার মিলন। মায়ার বন্ধনে যখন আমরা আবদ্ধ হয় সেখান থেকে বেরিয়ে আসা কিংবা মায়ার জিনিষ হটাৎকরে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়া। এই অনুভূতির বহিঃ প্রকাশ ঘটে অন্য রকমভাবে । যা ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না[121] । এ প্রসঙ্গে কুমারেশ ঘোষের বিখ্যাত কবিতা “ পাগলি ” কবিতাটির বিষয়বস্তু আলোচনা করলে পাগলি জীবনের একটা স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়-

---

117 ধীরেন্দ্রনাথ নন্দী , মনের বিকার , আনন্দ , কলিকাতা , ১৯৯২ পৃ : ৯২

118 দীপক দে , মানুষের ভাগ্য , ভারতী প্রকাশনী , কলিকাতা , ১৯৯৩ পৃ : ১৭

119 নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায় , পাগলকন্যা , ডি , এস , লাইব্রেরী , কলিকাতা পৃ : ২৫

120 শান্তি ধর , ( সম্পাদিত ) ‘ পাগলী ' ; আন্ডার গ্রাউণ্ড গল্প সংকলন , ডাটকো প্রেস , হাওড়া , ১৯৯৬ , পৃ:8

121 শ্রী নগেশচন্দ্র বসু , উন্মাদ মন , দি পিপিলস্ প্রেস , কলিকাতা ১৮-৮৮ পৃ : ১২

*" ফুটপাথের ধারে মেয়েটি বসে । পরণে ময়লা কাপড় । গায়ে ছেড়া সেমিজ । রুক্ষ-সুক্ষ এলোমেলো কেশ। ধুলোয় মলীন তার দেহখানি । মেয়েটি আকাশের দিকে চোখ তুলে হাসছে। আবার চোখ নামিয়ে নিচ্ছে , পরক্ষণেই চাইছে আকাশের দিকে । আর তেমনী হাসি । কোন কারণ নেই তবুও হাসি । বিড় বিড় করে অযৌক্তিক কথাবার্তা । কখনো বা মনে মনে । বুঝলাম ও একখান পাগলী । ঈশ্বর ওর সর্বাঙ্গে রূপের তুলি বুলিয়েছেন ঠিকই , কিন্তু তুলিটা ভালো ধুয়ে নেননি । ওর ঘটে ঢেলে দেননি দু - চামচ বুদ্ধি আর মগজ । হয়তো হাতের কাছে খুজে পাননি তার মগজের পাত্রটা । তাই ঐ অপকর্ম । কিন্তু এজন্য ঐ পাগলীটার মনে কোন দুঃখ নেই । ক্ষোভ নেই । নালিশ নেই । বরং ওর চোখে মুখে বড়ই কৌতুহল । তাই আকাশের দিকে বারেবারে চেয়ে ও যেন বলছে । এই ভগবান , তুমি যে কত বড় আকার ধাড়ি । তারই নমুনা আমি বসে এই ফুটপাথে । লোকের সামনে । আর তুমি আছো লোকলজ্জার ভয়ে ঐ মেঘের আড়ালে লুকিয়ে?*[122]

সাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিনায় পাগলিকে বিভিন্ন রকমভাবে আলোকপাত করা হয়েছে । রবীন্দ্রনাথের লিপিকায় বাণী ছড়ার ছবি যোগিন্দা , চণ্ডালিকানাটকে , সমাপ্তিগল্পগুচ্ছ জীবনস্মৃতিপ্রবন্ধে ও রক্তকরবী নাটক এবং শুভদৃষ্টি ও বৈষ্টমিগল্পে পাগলি হয়ে উঠেছে বিচিত্র অর্থের রূপকথা। আবার এই পাগলিকে রবীন্দ্রনাথ উন্মাদিনী রূপে দেখেছেন সোনারতরী , পূরবী , কল্পনা বর্ষশেষ , রাজা - প্রজা প্রবন্ধে , প্রগতি সংহারগল্পে , ভগ্ন হৃদযও তপতি নাটকে এবং বিহারীলালপ্রবন্ধে বিভিন্ন অর্থে পাগলিকে বহুমাত্রিক রূপ দিয়েছেন । পরিশেষে বলা যায় বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃতির ও ভাবনা চিন্তায় পাগল রূপের যে বহিঃপ্রকাশ তার একটি অন্যতম উদাহরণ পাই নারী জীবনের মধ্যে । এই পাগলি হয়ে উঠেছে আদরে - উল্লাসে , স্নেহ - মমতায় , আবার কখনও ভালোবাসায়। সবমিলে পাগলি হলো একটি বহুমাত্রিক ধারণা ।

## প্রেম ও পাগলামি

প্রেমে পাগলামি মানসিক অসুস্থতারই আরেক নাম । তরুণ বয়সে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি জৈবিক আকর্ষণ স্বাভাবিক। কিন্তু এ আসক্তিকে সংযত করতে না পারলে জীবনের সম্বাবনা বিকাশের পক্ষে তা প্রতিবন্ধকতা হয়ে দেখা দিতে পারে । তবে প্রেম এক প্রকার সাময়িক উন্মাদ রোগ[123] । তথাকথিত প্রেম নামের জৈবিক আসক্তির কবলে পড়ে কত তরুণ - তরুণী যে ভুল সিদ্ধান্ত

[122] কুমারেশ ঘোষ , ( সম্পাদিত ) , ' উন্মাদ ' সংখ্যা , ' অপকর্ম , জ্যোষ্ঠিমধুর পত্রিকা ১৯৮৭ , পৃ : ১১

[123] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ; আরোগ্য নিকেতন , পৃ : ৪৩

নেয় , জীবনের সম্ভাবনাকে নষ্ট করেছে , নিজের এবং পরিবারের জীবনে বিপর্যয় ডেকে এনেছে তার ইয়ত্তা নেই[124]। প্রেমে পাগলামি বা প্রেমরোগ আসলে মানসিক অসুস্থতারই অন্য নাম । সম্প্রতি ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিনের ফেব্রুয়ারি ২০০৬ সংখ্যায় লাভ দা কেমিকেল রি-একশন হবে শিরোনামের এক বিস্তারিত প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয় । ইতালির পিসা ইউনির্সিটির মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপিকা ডেনাটোলা মারাজিতি তার সহকর্মীদের নিয়ে ২৪ জন নারী পুরুষের ওপর কে জরিপ চালান । এদের সবাই গত ৬ মাসের মধ্যে প্রেমে পড়েছে বেং প্রতিদিন অন্তত ৪ ঘন্টা সময় এরা বাস্তবে প্রেমিক-প্রেমিকার সাথে কাটায় নয়তো মনে মনে চিন্তা করে। এদের সাথে তুলনা করার জন্যে মারাজিতি বেছে নেন আরো দুটি গ্রুপ। একটি গ্রুপ অবসেসিভ কমপালসিভ ডিসঅর্ডার (ওসিডি ) নামে এক মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত। আরেকটি গ্রুপ এ দুটো থেকেই মুক্ত , অর্থাৎ তারা প্রেমেও পড়ে নি এবং মানসিকভাবেও অসুস্থ নয় । পরীক্ষায় দেখা গেল , প্রেমে পড়া আর মানসিকভাবে অসুস্থ দুই গ্রুপের মানুষের মস্তিষ্কেই সেরেটনিকের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে শতকরা ৪০ ভাগ কম । সেরেটনিন হলো মস্তিষ্কের এমন কে নিউরোট্রান্সমিটার যার পরিমাণ কমে গেলেই বিষন্নতা , অবসাদ , খিটখিটে মেজাজ এবং ওসিডির মতো মানসিক রোগ দেখা দেয় । সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে , প্রেমে পড়লেও একই অবস্থা হয় । কাজেই যৌক্তিকভাবেই বলা যায়, প্রেমে পড়লে মানুষ আর মানসিকভাবে সুস্থ থাকে না[125] । তার বিচারবুদ্ধি লোপ পায় এবং সে অন্ধ আবেগে ঝাপিয়ে পড়ে ভুল সিদ্ধান্ত নেয়। তবে মনোবিজ্ঞানীরা বলেছেন , এ আবেগের স্থায়িত্ব আবার খবুই কম । আজকে যাকে না পেলে বাঁচবো । ছয় মাস আগেও যে চেহারাটা একনজর দেখার জন্যে অস্থির হতো মন , এখন সে চেহারাটাই হতে পারে সবচেয়ে অসহ্য দৃশ্য । এর কারণ কী ? বিজ্ঞানীরা বলেছেন , এর পেছনে আছে ডোপামাইন নামে এক নিউরোট্রান্সমিটারের ভূমিকা। প্রেমিক বা প্রেমিকাকে দেখলে মস্তিষ্কের একটি বিশেষ অংশ এই ডোপামাইন দ্বারা উদ্দীপ্ত হয় ।এর প্রভাবে শরীরমনে তখন সৃষ্টি হতে পারে বাঁধভাঙা আনন্দ , অসাধারণ প্রাণশক্তি , গভীর মনোযোগ ও সীমাহীন অনুপ্রেরণা । এজন্যেই হয়তো যারা সদ্য প্রেমে পড়ে , হঠাৎ করেই তাদের মধ্যে এক ধরণের বেয়াড়া ,

---

124 অজিত কুমার রায়চৌধুরী , অকাল প্রেম , ন্যাশনাল পাবলিশার্স , কলিকাতা , ১৯৬০ , পৃ : ২৭

125 নগেশচন্দ্র বসু , ' উন্মাদ মন ' , দি পিপিলস্ প্রেস , কলেজস্ট্রীট -১৮৮৮ , পৃ : ১০

একগুঁয়ে , দুঃসাহসী চরিত্র ফুটে ওটে । ঘর ছাড়বে , সিংহাসন ছাড়বে, জীবন দেবে ; তবু প্রেম ছাড়বে না এমনই এক বেয়াড়াপনা দেখা যায় তাদের মধ্যে। বিজ্ঞানী বলেন , মাদকাসক্তির সাথে এ অবস্থাটার খুব মিল রয়েছে। মাদকাসক্তদের কিন্তু মাদক গ্রহণের পরিমাণ দিন দিন বেড়েই চলে। কারণ মাদকের পরিমাণ যা - ই হোক না কেন ব্রেন তাতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে । ফলে পরিমাণ না বাড়ালে তারনেশা হয় না । প্রেমের ক্ষেত্রেও তা - ই । তীব্র আবেগের আতিশয্য খুব বেশি সময় ধরে থাকে না যদি না নতুন নতুন উত্তেজনা দেখা না যায় । কিন্তু বাস্তব জীবনে তো আর তা সম্ভব নয় । পূলে অল্পতেই ঘোলাটে হয়ে যায় আবেগের রঙিন চশমা । আসলে স্বর্গীয় , পবিত্র ইত্যাদি নানারকম বিশেষণ যুকতকরে যে প্রেমকে মহান বানানোর চেষ্টা চলে তা যে স্রেফ বংশধারা রক্ষার জন্যে নারী পুরুষের জৈবিক চাহিদারই নামান্তর[126] তা বিজ্ঞানীদের কথায় স্পষ্ট হয়েছে । গবেষণায় দেখা গেছে , পারস্পরিক আকর্ষণের ক্ষেত্রে একজন পুরুষ বা একজন নারী অবচেতনভাবেই এমন সঙ্গীকে পছন্দ করে , যে তাকে সুস্থ - সবল একটি সন্তান উপহার দিতে পারবে । এক জরিপে দেখা গেছে , মহিলাদের কোমর ও হিপের বিহেষ গড়ন এবং পুরুষদের লম্বাচওড়া শক্ত গড়ন যা তাদের টেস্টোস্টেরন হরমোন উৎপাদন ক্ষমতা বেশি হওয়াকে নির্দেশ করে , তার ওপর নির্ভর করে কে কতটা আকর্ষণীয় হবে । আর নারী ও পুরুষের এ দুটো বৈশিষ্টয়ই তাদের সন্তান জন্মদানের সামর্থ্যকে সরাসরি প্রভাবিত করে । তাই বিজ্ঞানীদের পরামর্শ , প্রেমের পাগলামিকে আবেগের হাওয়া না দিয়ে ব্রেনের জৈব রাসায়নিক কার্যকারণ হিসেবই দেখুন । তাহলেও অন্তন্ত আপনি এ দুর্দশা থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে পারবেন ।

প্রেমে পাগল এরূপ অনেক কাহিনী আজ বাস্তবে ঘটে চলেছে । অতীতেও ছিল । কত কাহিনী , কত ইতিহাস রচিত হয়েছে কৃষ্ণের প্রেমে রাধা পাগল , লায়লা মজনুর প্রেমের মত্ত , এরূপ শত শত গল্প উপন্যাস বাস্তব জীবন নিয়ে রঞ্জিত , কখনো রঙে-রসে সিনেমা রূপে উপস্থাপিত হয়েছে কাছে। ঠিক এরূপ একটি কাহিনী রচনা করেছে কোলের এক বিখ্যাত ঔপন্যাসিক অতীত বন্দ্যোপাধ্যায় পাগলিনী রাধা নাম উপন্যাসে। কাহিনীটা অনেকটা ত্রিকোন প্রেমের মত । তার পাশাপাশী যৌনতার মত্ততা । আর চুম্বকের দুই মেরুর মত আকর্ষণ । সংক্ষিপ্ত আকারে বিষয়

---

126 অচিন্তকুমার সেনগুপ্ত , প্রেমের গল্প , কলিকাতা , আনন্দ পাবলিশার্স , ১৯৫৯ , পৃ : ১১

বস্তুটি  হল সজলকে দেখে রুমালি প্রথম বুঝতে পারে সে বড় হয়ে যাচ্ছে ।তাই সজলকে ঘিরে তৈরীয় হয় তার উদ্দাম ভালবাসা এবং দুরন্ত শরীরী চাহিদা ।পাগলিনী রাধার মতোই তার ঘর বাহির একাকার ।সজল রুমলীর প্রেমে আকৃষ্ট ।কিন্তু তার জীবনে ছায়া ফেলে এক নারীর সলজ্জ প্রেমে নিবেদন। কঠিন জীবন সংগ্রাম এবং দুই নারীর দোলাচলে বিদ্ধ হতে হতে সে তার শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায় ।আর শুরু হয় মানসিক অসুস্থতা ,ও পাগল পনা । তবু কেন যে এক বিষাদ গড়ে উঠেছে সজলের মধ্যে মনোরম বোঝেই না , মানসিকভাবে সুস্থ নয় ।সে শুধু ডিপ্রেশনের শিকার নয় , রিপ্রেসনেও। মানসিক অবসাদ সম্পর্কেও সজলের কিছু পাঠ আছেড় মনোঃসমীক্ষনের গোড়ার কথা যে কিছুটা তার পাঠ্য বিষয় থেকেই জানতে পেরেছে , যেমন মানসিক রোগী যদি দু'দন্ড মন খুলে কথা বলতে পারে , যদি সে বলে তার কী মানসিক কষ্ট , কী তার অসুবিধা তা হলে সে অনেকটা সস্তি পায় ।মন খুলে কথা বললে সব মানসিক রোগীই কিছুটা ভালো বোধ করে ড় এই ভাবে দীর্ঘ কাল রোগী সব কথা যদি বের করে নেওয়া যায় তা হলে বোধ হয় তার রোগ সেরে যায় ।[127]

## পাগলামী ও ফৌজদারী দণ্ডাদেশ

অপরাধীর বিচার ব্যবস্থায় সাইকিয়াট্রিক এবং মনোবিজ্ঞানের বিষয়টি আলোচনা করা অবশ্যই প্রয়োজন ।সেই প্রাচীন যুগের অপরাধী মন সম্পর্কিত ধারনা থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি ধারনা আছে যে, অসৎ উদ্দেশ্য ছাড়া কোন অপরাধ সংঘটিত হয় না এই ধারণাটি ব্রিটেনের আইনে স্বীকৃতি পেতে শুরু করে ।পরবর্তীকালে ভারতীয় আইনে সুতরাং কোন অপরাধীর বিচার করতে হলে যে মানসিক ভাবে সুস্থ না অসুস্থ সেটি অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। কারণ একটি অপরাধের পরিকল্পনা করণ ও তার বাস্তবায়ন করতে গেলে একটি বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন মনের প্রয়োজন ।বিশৃঙ্খলা মন বা যে ব্যক্তির চিন্তা এলো মেলো হয়ে গেছে ( মানসিক রোগী ) তার পক্ষে কোন অপরাধমূলক কাজের পরিকল্পনা করা ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয় ।অন্য কথায় বলা যায় যে , একটি বিশৃঙ্খল মন কখনো অপরাধী হতে পারে না ।শুধু মাত্র একটি অপরাধী মনই শাস্তি যোগ্য কাজ করতে পাওে ।প্রথম দিকে মানসিক

---

[127] অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় , পাগলিনী রাধা , অঞ্জলী প্রকাশনী , কলকাতা- pp - 136-137

অসুস্থতাকে অপরাধীর পক্ষ সমর্থনে যুক্তি হিসাবে ব্যবহার করা হত না , তবে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ কখনো কখনো , খুনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত অপরাধীকে ক্ষমতা ঘোষণা করেন যদি অপরাধী সম্পূর্ণভাবে পাগল বলে বিবেচিত বা প্রমাণিত হয় । প্রথম এডোয়ার্ডের রাজত্ব কালে ( ১২৭২- ১৩০৭ ) অপরাধী অপ্রকৃস্থ অবস্থাকে বিচারালয়ে অপরাধীর পক্ষে ব্যবহার করা শুরু হয় যাতে শাস্তির পরিমান কিছু কমানো যায় । এই আশায় । চতুর্দশ শতাব্দীতে এটি একটি আইনে পরিণত হয় যে , যদি কোন ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে বা অবিরাম ভাবে পাগল বলে প্রমাণিত হয় , তাহলে অপরাধের বিচারের সময় তাকে নির্দোষ বলে দাবী করা যাবে । যে সব অপরাধ অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় বা মানসিক বিকারগ্রস্ত অবস্থায় সংঘটিত হয় , আজকের দিনের আদালত সেগুলির বিচারে সাহায্য করার জন্য বিচারকগন এবং আইনজীবিগন চিকিৎসক মনোবিজ্ঞানীদের সাহায্য চান । এখন প্রশ্ন হল , কেউ যদি অপ্রকৃতিস্থ বা আবেগ তাড়িত অবস্থায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংঘঠিত করে , তাহলে যারা সুস্থ মস্তিষ্কে একই অপরাধ করে তাদের চেয়ে সে কি কম অপরাধী হবে ? এসব ব্যাক্তি কে কি সমাজের আইন অমান্য করার অপরাধে বা মানুষের অধিকার ক্ষুন্ন করার অপরাধে আইনে পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার বিবেচনা করা যাবে না ? কিন্তু এসব ব্যক্তিকে বিচারের মুখোমুখী হতে অক্ষম বিবেচনা করা বা তাদের নির্দোষ দাবী করার পেছনে সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় বিচারের ফলাফলের তুলনায় তাদের উপর আরো বেশীশাস্তি চাপিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে [128] ।

### পাগলামীর অজুহাতে নির্দোষ দাবী

পাগলামীর অজুহাতে একজন অপরাধীকে নির্দোষ দাবী করা হল একটি আইনি যুক্তি - যাতে দাবী করা হয় যে , বিবাদীকে একটি অপরাধ মুলক কাজের জন্য দায়ী করা যাবেনা যদি উক্ত কাজটি মানষিক অসুস্থ অবস্থায় সংগঠিত হয়ে থাকে । কারণ মানসিক অসুস্থতা ব্যাক্তির চিন্তাধারাকে নষ্ট করে ফেলে অথবা ব্যকিত ন্যায়- অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেনা । পাগলামী বা মানসিক অসুস্থতার কারণে একজন অপরাধীকে নিরাপরাধ প্রমান করা বা লঘুদণ্ড কামনা করার প্রমান

---

[128] নীহাররঞ্জন সরকার ; অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান মানসিক ব্যাধির লক্ষণ কারণ ও আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি জ্ঞানকোষ প্রকাশনী , ঢাকা , ২০০৩ , PP- ৮৮৭ , ৮৮৮

নিয়ে প্রচুর পরিমাণ লেখা হয়েছে , এ বিষয়ে আমরা বিভিন্ন সিনেমা গুলিতে তার প্রমাণ পাই। হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ে সাইকিয়াট্রিক এবং আইনের অধ্যাপক *Alan. A. Stone ( 1975 )* ,পাগলামির অজুহাতে অপরাধী কে নির্দোষ দাবী করার পেছনে কিছু কারন আবিস্কার করেছেন । দণ্ডনীয় অপরাধমুলক আইন এই যুক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত যে , প্রত্যেক লোকের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে এবং তারা যদি অপরাধ করে , তাহলে তারা ইচ্ছা করেই তা করেছে । সেই জন্য তাদের দোষ দেওয়া যায় এবং তাদের শাস্তি দেওয়া উচিৎ । স্টোন বলেন অপরাধীকে পাগলামীর অজুহাতে নির্দোষ দাবী করার মাধ্যমে স্বাধীনতার ধারণাটিকে শক্তিশালী করা হয় । কিছু লোককে ব্যতিক্রম হিসাবে গণ্য করা হয় , যাদের ইচ্ছার স্বাধীনতা নেই , যারা পাগল ' বা অপ্রকৃতিস্থত বলে বিবেচিত। এই সব লোকদের মানসিক ক্রটির জন্য অথবা ন্যায় - অন্যায় বা ভালো - মন্দের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার ক্ষমতা না থাকার জন্য , অথবা উভয় করানে তাদের কাজের জন্য তাদের খুব কম পরিমারে দায়ী করা হয় । অপরাধমুলক কাজের জন্য আইনগত ভাবে দায়ী করতে হলে যতটুকু স্বাধীন ইচ্ছা থাকার প্রয়োজন ততটুকু স্বাধীনতা তাদের থাকে না এবং ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত গুলো ছাড়া আর সবারইচ্ছার স্বাধীনতা আছে। সুতরাং পাগলামী অজুহাতে অপরাধীকে নির্দোষ দাবী করার অর্থ হল একটি ব্যতিক্রম , যা নিয়মকে প্রমাণিত করে। সুতরাং অন্য সবারই ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে। সুতরাং পাগলামী অজুহাতে অপরাধীকে নির্দোষ দাবী করার অর্থ হল একটি ব্যতিক্রম , যা নিয়মকে প্রমাণিত করে । সুতরাং অন্য সবারই ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে । এর ফলে আদালত ধরে নিতে পারেন যে , অন্য সব আসামীর ভালোমন্দ বিচার করার ক্ষমতা আছে। কিন্তু মানুসিক বিকৃতগস্থ বা পাগলদের সেই ক্ষমতা থাকে না। অপরাদ এবং অপরাধীকে সার্বিকভাবে বিশে-ষন করতে অপরাধ তত্ত্বকে স্বভাবতই বিজ্ঞানের নানা বিভাগের সাহায্যে নিতে হয়েছে। বিশেষ করে মনস্তত্ত্ব বিভাগের সাহায্যে বর্তমান ক্রিমিনলোজি এগিয়ে গেছে ব্যাপক ভাবে। অপরাধ কার্য অনুষ্ঠিত হওয়ার কোন ধরনের মনস্তাত্ত্বিক কারণ কাজ করেছে তা নির্ণয়ের চেষ্টা করা। অপরাধীর অপরাধ জীবনকে বিশেষভাবে বিশ্লেষন করে তার পর্যালোচনা করাও এই বিভাগের কাজ [129] ।

---

129 ভট্টাচার্য, সদানন্দ , ( সম্পাদিত ) এনসাইক্লোপিডিয়া , ক্যালকাটা পাবলিশিং হাউস , কলকাতা , ১৩১৯ , পৃ

মানুষ কেন অপরাধ করে , তার কারণও নির্নয়ের চেষ্টা করেছেন অপরাধ বিষয়ক মনস্তাত্ত্বিকরা । নানা তত্ত্বও এ সম্বন্ধে দিয়েছেন তারা । কিন্তু পরবর্তী কালে নিজেরাই আবার ঐ সব তত্ত্ব ও যুক্তিকে খণ্ডন করে বলেছেন, যেগুলি আদৌ অপরাধ সংগঠনের প্রাথমিক ব্যাখ্যা নয় । আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকরা অপরাধ সংগঠনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির চেতন এবং অচেতন মনের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। প্রকৃতপক্ষে অপরাধ বিশ্লেষণে এই সর্বাধুনিক তত্ত্বের অধিকাংশ মানুষ কেন অপরাধী হয়ে উঠেনা , তার ব্যাখ্যা একমাত্র এই তত্ত্ব দিতে পারে। অপরাধ বিষয়সমাজতত্ত্ব কোন কোন সামাজিক পরিবেশ অপরাধীর আচার আচরণকে প্রভাবান্বিত করতে পারে তা নির্ণয় করার চেষ্টা কওে। সমাজতাত্ত্বিক নানা সামাজিক দৃষ্টিকোন থেকে অপরাধীকে বিশ্লেষন করার চেষ্টা হয়ে থাকে[130] ।

প্রসঙ্গ ভারতে প্রচলিত উন্মাদ আইনের কয়েকটি ধারা উল্লেখ করা প্রয়োজন ১৯১২ সালে ভারতীয় উন্মাদ আইন নামে একটি আইন প্রণয়ন করা হয় , যাতে ভারতের কেন্দ্রিয় ও প্রাদেশিক সরকার গুলোকে পাগলাগারদ প্রতিষ্ঠা করার লাইসেন্স প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হয় । উক্ত আইনের সংক্ষিপ্ত কয়েকটি ধারা নিম্নরূপ :

- উন্মাদ ব্যক্তি কোন অপরাধ সংঘটিত করে আইনে পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার করা হলে , উন্মাদ ব্যাক্তির আত্মীয় স্বজন কর্তৃক গ্রেপ্তার করা হলে, উন্মাদ ব্যক্তির আত্মীয় স্বজন কর্তৃক পেশকৃত দরখস্ত দরখাস্ত প্রাপ্তির পর আদালত ব্যাক্তির অতীত ইতিহাস সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবে।
- আদালত উক্ত ব্যাক্তি উন্মাদ কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য চিকিৎসকের সার্টিফিকেট গ্রহন করবে ।
- অনুসন্ধান পরিসমাপ্তির পর উক্ত ব্যক্তি উন্মাদ বলে প্রমাণিত হলে চিকিৎসার জন্য তাকে মানসিক হাসপাতালে পাঠানো হবে ।

[130] তদেব - ২৫

- আদালত থেকে হাসপাতালে প্রেরণের সময় যে চিকিৎসক উক্ত ব্যাক্তিকে উন্মাদ বলে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন, তাকে এই সার্টিফিকেট দিতে হবে যে , ভ্রমন বা স্থানান্ড়রের জন্য উন্মাদ ব্যক্তির দৈহিক সামর্থ আছে ।
- হাসপাতালে প্রেরণের সময় আদালতের ম্যাজিস্ট্রেটকে অবশ্যই ভ্রমেণর সময় রোগীর খাদ্যের সুবন্দোবস্ত করতে হবে
- এই আইন অনুযায়ী কোন ব্যক্তি , যেমন আত্মীয়স্বজন বা উকিল , রোগীকে চিকিৎসার জন্য ছেড়ে দেওয়ার জন্য আদালতে দরখস্ত করতে পারেন । এ ধরনের দরখাস্ত করাতে হলে দরখস্ত কারীর নাম সহ নিম্নলিখিত তথ্য পেশ করতে হবে :
- রোগীর নাম , বয়স ঠিকানা , রোগী বিবাহিত কি অবিবাহিত , রোগীর নিকটতম আত্মীয়স্বজন ও তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের নাম ও ঠিকানা , রোগীর সম্পত্তির বিবরর ।
- সরকারী উকিল ছাড়া অন্য কেউ অপরাধীকে চিকিৎসার্থে হাসপাতালে নিতে চাইলে আদালতের মাধ্যমে এফিডেভিট জমা দিতে হবে । কোন সরকারী উকিল দরখাস্ত করলে এফিডেভিট ( হলফনামা ) -র প্রয়োজন নেই । কিন্তু যে কোন দরখাস্তের সঙ্গে যেকোন দুজন রেজিস্টার চিকিৎসকের সার্টিফিকেট দিতে হবে ।
- দরখাস্ত গ্রহনের পর আদালতের অনুসন্ধানে রোগী সত্যি সত্যি উন্মাদ বলে পরিগণিত হলে পূর্বোক্ত নিয়মে তার চিকিৎসার জন্য তাকে মানসিক হাসপাতালে পাঠানো হবে[131] ।

মানসিক ব্যাধিগ্রস্থদের আইনের আশ্রয় দেওয়ার জন্য উকিল অদম্য চিত্তাবেগ ধারণাটি প্রবর্তন করে মক্কেলকে কঠোর শাস্তি থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে । এই ধারণা অনুযায়ী যদি একটি বিকৃত বা অস্বাভাবিক চিত্তাবেগ বা তাড়না যা ব্যক্তি নিয়ন্ত্রন করতে পারেনি , ব্যাক্তিকে অপরাধ সংগটনে বাধ্য করে , তাহলে উন্মত্ততা বা পাগলামীর জন্য তাকে শাস্তি দেওয়া উচিত হবে না । অপ্রতিরোধ্য চিত্তাবেগের ঘটনা এরূপ অনেক মামলা আমরা এই সমাজে দেখতে পাই ।[132]

উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে উল্লেখিত ন্যায়-অন্যায় এই পরীক্ষা নিউ হ্যাম্পশায়ার বাদে অন্য সব রাষ্ট্রের মত ভারতবর্ষেও ব্যবহৃত হতে থাকে । ১৯৮০ সালের আঠোরোটি রাষ্ট্র ন্যায়-অন্যায়

131 সরকার , নীহাররঞ্জন , অস্বাভাবিক মন বিজ্ঞান , জ্ঞানকোষ প্রকাশনী , ঢাকা , পৃ : ১-৮৮

132 তদেব -৮৮৯

পরীক্ষা এবং অপতিরোধ্য চিত্তাবেগের ধারণাটি একত্রে ব্যাবহার করা হয় । যাইহোক ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সাইক্রিয়াট্রিক বিভাগের একটি সমিতি ঘোষনা করেন যে , কোন ব্যক্তি ন্যায় - অন্যায় এর পার্থক্য বুঝতে পারে কিনা তার মাধ্যমে আধুনিক কালে উন্মত্ততা বা মানষিক বৈকল্যের পরীক্ষা করা যায় না । অন্য কথায় উন্মত্ততার আধুনিক বৈকল্যের পরীক্ষা করা যায় না । অন্য কথায় উন্মত্ততার আধুনিক ধ্যান ধারনায় ন্যায় - অন্যায় সম্পর্কিত বোধের কোন স্থান নেই । অর্থাৎ মানষিক ব্যাধিগ্রস্থ ব্যাক্তির ক্ষেত্রে বিবাদী তার কাজের জন্য আইনগতভাবে অপরাধী সাব্যস্ত হবে না । যদি তার অপরাধটি মানসিক ব্যাধি বা মানসিক ত্রুটির ফলে সৃষ্টি হয়ে থাকে ।[133]

যখন কোন ব্যক্তিকে অপরাধে দোষী কিন্তু মানুষিক ভাবে অসুস্থ বা উন্মত্ত ( *guilty but Mentally ill* ) হিসাবে বিচারে সাব্যস্ত করা হয় , তখন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার দরুণ একটি অপরাধের জন্য স্বাভাবিক ভাবে যেশাস্তি পাওয়ার কথা তাই দেওয়া হয় । কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডভোগ করার সময় মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা করারও ব্যবস্থা রয়েছে । এই ব্যবস্থার সুপারিশ মেনে দেখা যায় পাগলামী অজুহাতে অপরাধীকে কঠোর দন্ডাদেশ মুক্ত করার প্রয়াস পাশাপাশি guilty but Mentaly ill আইনের মাধ্যমে মানষিক চিকিৎসা করার ব্যবস্থা করা হয় । সাধারন ভাবে উন্মত্ততার জন্য অপরাধীকে মুক্ত করতে হলে , যাকে বলা হয় ইনস্যানিটি ডিফেন্স ( *Insanity defense* ) একটি বিমূর্ত নীতিকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হয়। যে কোন মামলার মতই এক্ষেত্রে আইনের বিভিন্ন শব্দের বিভিন্ন অর্থ করা হয় । একই শব্দকে আসামী , আসামী পক্ষের উকিল , পাবলিক প্রসিকিউটর ,বিচারক এবং জুরী ( যদি থাকে ) প্রত্যেকেই Insanity defense আইনের শব্দগুলোর পৃথক অর্থ করে । তাছাড়া বিচারে সাক্ষ্য প্রদান ও বিভিন্ন হতে পারে । এগুলো নির্ভর করে সাওয়াল বা প্রশ্নকারীর বুদ্ধিমত্তা ও বিবাদীর এবং বিবাদী পক্ষের উকিলের উপস্থিত বুদ্ধির উপরে । তদুপরি , যেহেতু শুধুমাত্র অপরাধ সংঘটিত করারসময় বিবাদীর মানসিক অবস্থা বিবেচনা করা হয় , সেহেতু অনেক সময় তা এটর্ণী , বিচারক বা জুরীদের অথবা সইক্রিয়াট্রিষ্টদের অতীতের স্মৃতিচারণমূলক বিবরণ অথবা আন্দাজের উপরে ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয় । সেই জন্য বিবাদীর সাইক্রিয়াট্রিষ্টদের সঙ্গে সরকারি সাইক্রিয়াট্রিষ্ট

---

133 তদেব -৮৯০

বা মনোবিজ্ঞানীদের মতানৈক্য দেখা দেয়। আরেকটি বিষয় মনে রাখা দরকার। সেটি হল এই যে, উন্মত্তা ও মানসিক ব্যাধি বা মানসিক ক্রটির মধ্যে পার্থক্য আছে । একজন মানসিক ব্যধিগ্রস্ত হলেও তার অপরাধের জন্য তাকে দায়ী করা যেতে পারে। যদিও উন্মত্ততা বা উন্মাদ হওয়া শব্দটি একটি আইনি শব্দ , এটি মনোবিজ্ঞানিক শব্দ নয়। অতএব দেখা যায় কোন মামলায় বিবাদী পক্ষ যে কোন প্রকারে নিজের মাক্কেলকে উন্মাদ বলে প্রমান করার চেষ্টা করে। এই উন্মাদনা কিভাবে হয় , না মানুষিক ক্রটির। আর মানসিক বিকারগ্রস্ত বা অস্বাভাবিক মনবিকৃত গ্রস্ত মানে ইনসেন্স ।এইভাবে সুকৌশলে অপরাধীকে নিয়ে বিচার ব্যবস্থায় নানা খেলা চলে। বিচারের প্রধান উপজীব্য বিষয় হয়ে উঠে সে উন্মাদ কিনা তা প্রমাণের চেষ্টা এবং বিপক্ষ দাবী করে সে উন্মাদ নয় ইত্যাদি [134]।

## ভয়ংঙ্কর পাগল

পাগলদের মধ্যে একটা অংশ আছে যারা সম্পূর্ণ আলাদা ঈৎরসব Deperatment সবসময় তাদের ভয়ঙ্কর বলে মনে করে। এই ধরনের ঘটনা আমাদের দেশে আইনের পরিভাষায় তাদের Insane Criminals বলে। আসলে কোন অপরাধী যখন ভয়ঙ্কর অপরাধ করে তখন তাদের কি বলা হবে।ভারতীয় আইনশাস্ত্র অনুযায়ী তাদের Criminal Lunatic’ বা ‘Insane Criminal’ বলে আখ্যা দিয়ে থাকে । আসলে ইতিপূর্বে এই সব ভয়ঙ্কর অপরাধী কি বলা হবে এই নিয়ে নানা বিতর্ক ছিল ! অপরাধের মাপকাটি যখন মাত্রাতিরিক্ত ভাবে ছাড়িয়ে যায় বা কোন অপরাধের কার্যকলা বা যে ঘটনাটির জন্য সে অপরাধী হয়ে সেই ঘটনা টি ভয়ঙ্কর ( dangers ) হয়। তাহলে উন্মত্ত এর আওতায় পরে । অর্থাৎ সে অপরাধী এবং পাগল কিন্তু এক্ষেত্রে সাধারণ পাগলের মাপকাঠি তারও কার্যকলাপের এতটা ভয়ঙ্কর যে তাই সে উন্মত্ত বা 'Criminal Lunatic'। সামাজিক জীবনে সুস্থ মানুষের কার্যকলাপ সব সময় স্বাভাবিক বলে স্বীকৃত । কিন্তু কোন মানুষ যদি এই সমাজের অতি বিপদ আশঙ্ক হয়ে পরে তাহলে তাকে সমাজ কি বলবে ? ধরা যাক একজন মানুষ , সে দিন দুপুরে দু - চার মানুষকে কুপিয়ে খুন করলো। সেই খুনীকে আমরা কী বলব ? বাংলায় একটা প্রবাদ আছে । রাগের কোন ধর্ম নেই তর্কের খাতিরে মানছি

---

[134] তদেব -৮৯০

কথা ঠিক। কিন্তু একটা মানুষ কতটা পরিমান রাগতে পারে যে এক সাথে কয়েকজন মানুষকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করতে পারে । যদি বলেন ঐ সব খুনী টি স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না বা মাত্রাতিরিক্ত ভাবে অস্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল সেই কারণে এমন ঘটনা করে ফেলেছে। এরূপ অনেক ঘটনা আমরা পত্র - পত্রিকায় দেখতে পাই। ( এই কারণেই আইন কানুন বা অনুশাসন শাস্তি কিন্তু লোক যদি পরবর্তী আবার এরূপ আচারণ করে তাহলে তার ভয়ঙ্কর অস্বাভাবিকত্ব তাকে আমরা কী বলব। Crime Department এরূপ অনেক উদাহরণ আছে কেউ জীবনে ২০ টি খুন করে কেউ বা ৫০ টি কেউ বা শতাধিক । অর্থাৎ তার যে এই ভয়ঙ্কর অস্বাভাবিকত্ব বা খুনের নেশা এটা কোন সুস্থ মানষিক

অবস্থার লক্ষন নয় । যদি সে সুস্থ মানষিক না হয় তাহলে কি ? অবশ্যই বিকৃত মানষিক রোগের মানুষ । অর্থাৎ তার এক ধরনের ভয়ঙ্কর রোগ যেটা মাঝে কোন কোন কারণ বশত করে ফেলে এরূপ ভয়ঙ্কর কার্যকলাপ। অর্থাৎ যে উন্মাদ । বিচার ব্যবস্থায় বা আইনের পরিভাষায় তাকে ভয়ঙ্কর উন্মত্ত বলে অভিহিত করে [135]।

এই ভয়ঙ্কর উন্মত্ত আবার দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে এশটি পাগল অপরাধী এবং অপরটি উন্মত্ত অপরাধী। প্রসঙ্গত এই দুটি বিষয় একটু আলোচনা করা দরকার । অপরাধীর শ্রেণী ও তাদের অস্বাভিক স্বরূপ নিয়ে ক্রিমিনোলজিস্ট বিভিন্ন মতামত দিয়ে থাকে । যদিও ক্রিমিট্যাল ও উন্মাদ দুটি সম্পূর্ণ আলাদা বিষয় তবুও সামাজিক জীবনে তাদের এমন কিছু কার্যকলাপ যা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সমাজের কাছে গ্রহনীয়তা নয় ড় তাই ' insane criminal ও ' criminal insane ' -এর জটিল ব্যাখ্যায় না গিয়ে খুব স্বাভাবিক ভাবে বলা যায় যদিও উভয় পৃথক পৃথক ভাবে এক ধরনের পাগল । এক্ষেত্রে অ্যামেরিকান ক্লাসিক স্কুলের ক্রিমিনোলজিস্টরা মতামত ব্যক্ত করেছেন তাদের অপরাধ যেহেতু এমন সব কার্যকলাপ দ্বারা হয় সেটা স্বাভাবিক মানুষের কাছে অসম্বভাব্য। সুস্থ ও স্বাভাবিক ভাবে এই ধরনের কার্য যেহেতু হয় না যদিও এক্ষেত্রে প্রতিশাশোধ স্পীহা তাদের মনের মধ্যে কাজ । আর সেখান জন্ম তীব্র ও বিকৃত মনোভাব । অতএব পাগল অপরাধীদের ক্ষেত্রে কিছুটা অপরাধের মাত্র কম হয় কিন্তু উন্মত্ত অপরাধী অপরাধের মাপকাঠি সীমাহীন যেটা আমাদের কাছে খুব - ই ভয়ঙ্কর ।

---

[135] 1991 পল ই. বোয়ার্স, "দ্য ডেঞ্জারাস ইনসান" জার্নাল অফ আমেরিকান ইনস্টিটিউট অফ ক্রিমিনাল ল অ্যান্ড ক্রিমিনোলজি", ভলিউম ১২, নং ৩ নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি। নভেম্বর-১৯২১ পৃ – ৩৭০

ক্রিমিনোলজিস্ট পাগল অপরাধী ক্ষেত্রে যে মতামত ব্যক্ত করেছেন তা হল- *The insane criminal is an individual who has become insane or whose insanity was discovered after he was sent to prison , or an individual who becomes insane while serving Serintence in Prison.*[136] কিন্তু যে সব অপরাধী একেবারে উন্মত্ত , যারা চরম ও নৃশংস ভাবে কোন অপরাধ সংগঠন করে তাদের এই ভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন - *The Criminal insane individual is a person whom the court has found to be insane at the time of trail or insane at the time he committed a criminal or dangerous act . He is an individual who is postively dangerous*

*to the welfare of society because he is unable to control his conduct hy reason of mental discase or Lack of mental development .* [137]

## রণোন্মত্ততা ও উগ্রজাতীয়তাবাদের পাগলামী

পাগলামি বা উন্মত্ততা এরূপ অনেক উদাহরণ বিশ্ব ইতিহাসে লক্ষ্য করা যায় । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কুখ্যাত অধিনায়কদের অনেকেই অস্বাভাবিক আচারণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ রূপে পরিগণিত হতে পারে। তার মধ্যে রোনান্মত্ত হিটলারের সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও মুসোলিনী, গোয়েরিং, গোয়েলস প্রভৃতি রণ নায়কদের অনেকের আচরণই অস্বাভাবিক আচরণের পর্যায়ে পড়ে [138] । বিংশ শতাব্দীতে সব থেকে ভয়ঙ্কর অমানবিক ও প্রতিক্রিয়াশীল ভাবাদর্শ রূপে ফ্যাসীবাদের আত্মপ্রকাশ সমগ্র মানব সভ্যতার সামনে এক কালান্তক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছিল । বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে এরকম প্রলয়ঙ্কর ভাবাদর্শ ইতিপূর্বে আর দেখা যায়নি। সব থেকে বিস্ময়ের বিষয় হল , যে ইউরোপে ছিল সাম্য - মৈত্রী - স্বাধীনতা ; উদারনৈতিকতা ও সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শের ধারক ও বাহক সেই ইউরোপেই হয়ে উঠল এই নিকৃষ্ট মতাদর্শের সূতিকাগার । বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ-বের বিজয়ের অবশ্যম্ভাবী ফল ছিল মানব সমাজের হিতকারী শক্তিরূপে কমিউনিজমের উত্থান । সমাজ বিকাশের ঐতিহাসিক দ্বান্দিক নিয়মে কমিউনিজম - ই হতে

---

136 Ibid . pp - 371 .

137 অরুণ ঘোষ ; অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান , এডুকেশনাল এন্টারপ্রাইজ , কলিকাতা , ১৯৬৫ , P - ২৪

138 সুস্নাত দাশ ; ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামে অবিভক্ত বাংলা , প্রাইমা পাবলিকেশনস্ , কলকাতা , P.P , - ৯

চলেছিল আগামী দিনের মানব সভ্যতার প্রধান চালিকা শক্তি [139] । আর এই চালিকা শক্তি বা সমাজ বিকাশের এই অনিবার্য ধারটিকে অবদমন করার উদ্দেশ্যে হিটলারী ভাবাদর্শের কার্যকলাপ মানব সমাজ এর উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে পন্থা অবলম্বন করেছিল , তার মধ্যে এক ধরণের উন্মাদনা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে বাঙালী মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক অরুণ ঘোষ রণ-উন্মত্ত হিটলার রূপে অবিহিত করেছেন । এমনকি তিনি মনোবিজ্ঞানের ভাষায় হিটলারকে অস্বাভাবিক আচারণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ রূপে গণ্য করেছেন ।

ফ্যাসিবাদী কার্যকলাপের উন্মাদনা ও হিংস্ররূপ সাধারণ মানুষও মেনে নিতে পারেনি । এপ্রসঙ্গে চিন্মোহন সোহানবীশ লিখেছেন , ... ইহা চাষীদের মাঝে বিপুল উন্মদনারসৃষ্টি করল ”[140] কিন্তু এক্ষেত্রে উন্মাদনার অর্থ একটু অন্যরকম হিটলারের কুৎসিৎ ও নৃশস নরহত্যা ও ফাসীবাদী কার্যকলাপে সেদিন সারা বাংলার মানুষ এই আদর্শের বিরুদ্ধে পথের নেমেছিল , তৈরী হয়েছিল গনজাগরণ । কিন্তু কেন এই গণ আন্দোলন ? কেন এই গণজোয়ার ? এমনকি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্যে তৈরী হয়ে ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে । কারণ এক সুস্থ মননশীল মানুষ কখনোই এরূপনারকীয় হত্যা দেখে চুপ - চাপ বসে থাকতে পারেনা । সেই অর্থে সেদিন বাংলার মানুষ সেদিন পথে নেমেছিল, বুদ্ধিজীবি থেকে শুরু করে কৃষকসমাজও মেতে উঠেছিল , হিটলারের উন্মত্ত কার্যকলাপের বিরুদ্ধে । হিটলারের কার্যকলাপ ও উগৰজাতীয়তাবাদ কখনোই সমগ্র পক্ষে শুভ নয়। এটা উপলব্ধি করেছিল প্রথমে বামপন্থী দলের সংগঠনরা , এমনকি হিটলার নিজে তার আত্মজীবনি উল্লেখও করেছেন “ আমি জানতাম বামপন্থী দলের লোকেরা আমাদের বাঁধা দেবে”[141] । কারন বামপন্থী জানত ফ্যাসীবাদী আদর্শ কখনোই সমাজেরমঙ্গলসাধক হতে পারেনা। ঠিক তেমনী বাংলার বিভিন্ন বামপন্থী সংগঠনরা এটা গভীরভাবে অনুধাবন করেছিল । তাই সেদিন কসলে রাজপথে নেমেছিল যেমন করেই হোক বন্ধ করতে হবে এই উন্মত্ত কর্মকান্ডকে । হিটলার সত্যিই মানষিক ব্যাধিগ্রস্থ ।

---

139 সুস্নাত দাশ ; সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসীবাদ বিরোধী সংগ্রামে বাংলা ; সমাজ সমীক্ষা ; প্রসঙ্গ গণতন্ত্র , উনবিংশ বর্ষ , প্রথম - দ্বিতীয় বর্ষ , উন্ডিয়ান স্কুল অব সোসাল সায়েন্সেস , ( ed ) পার্থরাখা কলকাতা , ২০১৩ P. ৫৯

140 অ্যাডলফ হিটলার , ( ভাষান্তর : পরিতোষ মজুমদার ) ; মাইন ক্যাম্ফ , বেঙ্গল পাবলিশার্স , কলকাতা , ১৯২৪ , পৃ : ৩৪২

141 তদেব , PP , -২

ফ্যাসীবাদ কেন , কখন ও কিভাবে আত্ম প্রকাশ ঘটেছিল সে সম্পর্কে নানা ধরণের তাত্তিক ব্যাখ্যা রয়েছে । কিন্তু বক্তব্যের বিষয় তা নয় । মুলত ফ্যাসীবাদী কার্যকলাপের মধ্যে হিংস্র উন্মত্ততা কিভাবে ফুটে উঠেছিল সেটি আলোকপাত করা । আবার ফ্যাসীবাদী কার্যকলাপ সে এই সভ্যতার সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষ কোন ভাবেই মান্যতা দেয়নি তার অনেক উদাহরণ আমরা ইতিহাসের পাতায় দেখতে পাই । এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ইতিহাস বিদ অধ্যাপক সুস্নাত দাশ এর একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ “ ফ্যাসিবাদী বিরোধী সংগ্রামে অবিভক্ত বাংলা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । ফ্যাসিবাদী চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আর.পি. দত্ত বলেছেন যে, এর কোনও সুসংবদ্ধ সংজ্ঞা নির্দেশ করা যায় না। তবে একথা অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ভাবে বলা যায় যে , ফ্যাসীবাদী রাষ্ট্র হলো ফিন্যান্স ক্যাপিটলের

মালিকদের নিষ্ঠুরতম সন্ত্রাসবাদী একনায়কতন্ত্র । এছাড়াও পার্লান্টোরী গণতান্ত্রিক অধিকার বাতিল করা পরিশেষে ও সামরিক একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা , যা ধনতান্ত্রিক স্বৈরশাসনের তীব্রতার একটি রূপ [142] । আবার ফ্যাসীবাদী আদর্শের নিকৃষ্টতম জীবন দর্শনের আরো পরিচয় পাওয়ায় হিটলারের আত্মজীবনী মেইন ক্যাম্ফ এবং রোজেনবার্গ রচিত মাইথাস নামেক নাৎসী দর্শন থেকে । এই ভয়ঙ্কর গ্রন্থ দুটি থেকে ফ্যাসীজমের আদর্শ ও কর্মপন্থা যে কয়টি মূল নীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

### ডাইনি প্রথা ও উন্মত্ততা

সাঁওতাল সমাজে ডাইনি প্রথার নেপথ্যে একধরণের উন্মত্ততার পরিচয় মেলে । মুলত সাঁওতাল সমাজে উন্মত্ত নারীদের ডাইনী নামে অভিযুক্ত । যদিও প্রচলিত হিন্দু সমাজে যদি কোন নারী অস্বাভাবিক আচারণ করে বা অপ্রকৃতস্থ অবস্থা এমন কোন কার্যকলাপ করে যার বহি : প্রকাশ ঘটে ভয়ঙ্কর কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে তাহলে সমাজ তাকে পাগলী ' বলে অবিহিত করে । আবার কখনো কখনো নারীদের মধ্যে দেখা যায় ভর করেছে এবং এর ফলে নানা অযৌক্তিক কথাবার্তা বলছে তাহলে আমাদের সমাজে তাকে বলা হল ভূতে পেয়েছে । এই ভূতে পাওয়ার কারণে সমাজে তাকে বলে “ পাগলী । অর্থাৎ সনাতন হিন্দু সমাজে ডাইনি প্রথায় বিশ্বাস নেই বরং সেটি লোক সমাজে পাগল হয়ে যাওয়া ' বা ভূতে পাওয়া ইত্যাদি নামে প্রচলিত । যা কিনা

---

[142] তদেব , PP , -২

ওঝার বাড়ি গিয়ে ঝাড় - ফুক ইত্যাদি করা হয় । তেমনি আবার মুসলিম সমাজে ডাইনি প্রথায় বিশ্বাসী নেই কোন ব্যক্তি বিশেষের মানষিক ভারসাম্যের বিচ্যুতি ঘটলে বা অস্বাভাবিক কার্যকলাপ , বা উন্মত্তের মত আচারণ করলে , লোক বিশ্বাস অনুযায়ী বলা হয়ড় " জিনে পেয়েছে । যাই হোক , ডাইনি , ভূতে পাওয়া বা জিনে পাওয়া ইত্যাদি শব্দগুলি কে একটি সমাজের এক এক রকম ভাবে প্রচলিত। আসল ব্যাপার হল মানুষিক ত্রুটি বিচ্যুতি । আর এরই ফলে অদ্ভুদ আচারণ , অস্বাভাবিক কার্যকলাপ যেটা সভ্য সমাজের ভাষায় পাগলামী । আবার এই পাগলামী যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছায় তখন উন্মত্ততা। যেটা সাঁওতাল সমাজে ডাইনি বা ডান নামে অভিযুক্ত করে ।

ডাইনি প্রথা সাঁওতাল সমাজে এক বিশেষ সমস্যায় পরিণত হয়েছে । সাধারণত তাদের সমাজে কোন নারীর অস্বাভাবিক , ভয়ঙ্কর বা অদ্ভুদ কার্যকলাপে সমাজ যখন ক্ষতিগ্রস্থ হয় তখন তাকে ডাইনি নামে অভিযুক্ত করা হয়। আর পুরুষদের ক্ষেত্রে ডদান বলে অবিহিত করা হয় । তবে এই প্রথা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নারীর ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। সাঁওতালদের প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী যাবতীয় ক্ষতি , রোগ শোক ইত্যাদির পশ্চাতে অতিপ্রাকৃতের অনিষ্ট - স্পীহা রয়েছে। এই স্পীহা ফলবতী হবে সমাজস্থিত কোন ব্যক্তির মাধ্যমে । অতিপ্রাকৃত শক্তি সম্পন্ন কোন ব্যক্তি ইর্ষাদ্বেষবশে কখনও বা আধিভৌতিক আত্মাকে নিকট প্রতিবেশী বা আত্মীয়ের ক্ষতিকর কর্ম করাতে প্রবৃত্ত করাতে পাবে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি সমাজ নেতৃত্বের কাছে আবেদন করতে পারে বা কোন কোন সময় নিজেই প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করে [143]।

আবার ডাইনি অভিযোগে বিচার , নানা ধরণের অত্যাচার বা অবশেষে হত্যা ; পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতাল অধ্যুষিত প্রতিটি জেলায় এই প্রথা প্রচলিত আছে । সমস্যাটি বিহার ও উড়িষ্যায়ও আছে। যেখানে আদিবাসীদের মধ্যে রীতিবদ্ধ প্রবল কার্যক্রম ও রাজশক্তির সঙ্গে যোগাযোগ অপেক্ষাকৃতবেশী; সেখানে এই ধরনের হত্যার ঘটনা সেই অনুপাতে কম । তার অর্থ এই নয় যে, সেসব জায়গায় ডাইনি অভিযোগ একেবারে নেই । ডাইনি অভিযোগ অবশ্যই আছে সেটা সামাজিক নিয়ন্ত্রনের একটা রূপ কিন্তু বিচারের কঠোরতা অপেক্ষাকৃত কম । পশ্চিমবঙ্গে

143 অসিতবরণ চৌধুরি ; সাঁওতাল সমাজ , ডাইনি ও বর্তমান সংকট , প্রকাশক , এ . মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং প্রা : লি : ১৯৮৫ pp - ১০৩

বিভিন্ন জেলায় ডাইনি - বিচার ও হত্যা সম্বন্ধে শ্রী সোমনাথ চক্রবর্তীর সুলিখিত প্রবন্ধে বাকুরা , মেদিনীপুর , বীরভূম , বর্ধমান , পুরুলিয়া ও মালদহের এর প বেশ কিছু ঘটনা উল্লেখযোগ্য । শৰী সোমনাথ চক্রবর্তী প্রায় তিন বছরে পশ্চিমবঙ্গে দশটি এই সম্পর্কিত ৩৬ টি ঘটনা পেয়েছেন । উক্ত সময়ের মধ্যে বিভিন্ন বয়সের ছাব্বিশজন ব্যাক্তি পঁচিশ ঘন্টায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে । ডাইনি সম্পর্কিত একচলি-শটি ঘটনার মধ্যে একত্রিশটি উপজাতিদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল যার মধ্যে ত্রিশটি সাঁওতালদের ।[144]

## উপসংহার

উনিশ শতকের সূচনা থেকে বিংশ শতকের প্রাথমিক পর্বে পাগলদের নিয়ে ভাবনা চিন্তার আমূল পরিবর্তন হয়েছিল, কারণ এই সময় যুক্তিবাদ ও নবজাগরণ মানুষকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল। সবকিছুই যুক্তির আলোকে ব্যাখ্যা করার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল । বাংলার সামাজিক জীবনে একদিকে কুসংস্কার ও অন্য দিকে ধর্মীয় ভাবাবেগ বিরাজ করতো, কিন্তু পশ্চিমী জ্ঞান-বিজ্ঞান আগমনের ফলে নবজাগরণের যাত্রা শুরু হয়েছিল , এইরকম এক যুগসন্ধিক্ষনে পাগল নামক ধারণাকে কেন্দ্র করে সামাজিক ভাবনায় যুক্তির আলোকে বিভিন্ন চিন্তা ও চিকিৎসার আলোকে পাগলদের নিয়ে বিভিন্ন ব্যাখ্যা শুরু হল ।

পূর্বে মনে করা হতো পাগল ও পাগলামির বিষয়টি ভৌতিক ও অতীন্দ্রিয় শক্তির দ্বারা পরিচালিত, কিন্তু রেনেসাঁর আলোকে তা প্রমাণিত হল মানুষের পাগলামির জীবন হল নানারকম সামাজিক অভিঘাতের ফল। পাগলামি কারন হিসাবে সামাজিক অভিঘাতের ব্যাখ্যায় মানুষ মনের অবস্থা খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত এক অনুবীক্ষণ অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। আর ঠিক তখন - ই মনোবিজ্ঞানের বিশ্লেষণে মানুষের সুখ - দুঃখ,কামনা, বাসনা , ইচ্ছা , ভ্রম, আবেগ অনুভূতি, স্মৃতি ইত্যাদিকে গুরুত্ব শুধু- ই জৈব-রসায়নের মধ্যে সীমায়িত হল।

বিগত শতকগুলি তে পাগলের অযথা কর্মকান্ডের জন্য তাদের কে সমাজ থেকে আলাদা করে দেওয়া হতো , অর্থাৎ তাকে পাগলা গারদে ভর্তি করে আটকে রাখা হতো । বেমানান মানুষ

[144] তদেব , p -১০২

হিসাবে তাকে একঘরে করে দেবার এক সুচারু প্রক্রিয়া ছিল উনিশ শতকে প্রথম দিকে , শুধু তাই নয় মানবিক ব্যবহার পাওয়া তো দূরের কথা অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিকিৎসার পরিবর্তে জুটত বর্বোরোচিত শাস্তি। এইভাবে পাগলের সংজ্ঞা নির্ধারণের পদ্ধতির মধ্যেই আছে পাগলকে অপর করে দেবার নিহিত প্রক্রিয়া টি ক্রমশঃ বদলে গিয়েছিল , কিন্তু মনোচিকিৎসা ও মানসিক হাসপাতালে উত্তরনের পর পুরাতন সমস্তপদ্ধতি পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল ।

ওপনিবেশিক অধ্যায়ে বাংলায় পাশ্চাত্য চিকিৎসা প্রবেশের ফলে মনোবিজ্ঞানের ইতিহাসে এক পরিবর্তন সূচিত ছিল ।বিভিন্ন রকমের গবেষণা ও পাগলদের নিয়ে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার ফলে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা পাগল চিকিৎসার ইতিহাসে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন হয়েছিল। পাশাপাশি পাগলামি

সম্পর্কে নতুন ডিসকোর্স তৈরী হয়েছিল । মনোবিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞগনের সহায়তায় । এরা ক্ষ্যাপামির ভূমিকা ও নৈতিকতার মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করেন । ফলে পাগল নামক ধারণাটি হয়ে ওঠে চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি অন্যতম বিদ্যাচর্চার বিষয়। বাংলার নবজাগরণ পর্বে এনলাইটেন্টমেন্ট এর প্রভাব যুক্তিবাদি ব্যাখ্যার ফলে চিকিৎসকরা দেখাতে চেয়েছিল পাগল ধারণাটি এতদিন কুংস্কারের বশবর্তী হয়ে অপব্যাখ্যা হয়েছিল বাংলার সমাজে । কিন্তু পশ্চিমী সংস্কৃতির আগমনের ফলে ক্রমশঃ পাগলদের প্রতি রূঢ় দমনমূলক ও নিপীড়নমুখী ভাবনা চিন্তা বর্জিত হতে দেখা দেয় । এই পর্বে মনোচিকিৎসা নিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর সাড়া পড়ে গিয়েছিল গোটা বুদ্ধিজীবি মহলে । পাগলদের নিয়ে এপিসটোমোলজিকাল ও তাত্ত্বিক ভাবনা শুরু হয় ।

ইতিপূর্বে বাংলার গ্রামীন সমাজে ওঝা বা কবিরাজের বাড়িতে আশ্রমিকভাবে পাগলদের চিকিৎসা করা হতো। অপরদিকে হেকিমি চিকিৎসায় উন্মাদরোগীদের চিকিৎসাধীনে আনা হতো। ঔপনিবেশিক পর্যায়ের ইতিহাস ক্রমশঃ বদলে গেল । ব্রিটিশ রাজত্বে পশ্চিমী চিকিৎসা বিজ্ঞানের আগমনের ফলে পাগলদের আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে চিকিৎসার তত্ত্বাবধানে আনা হয়েছিল । অর্থাৎ পাগল ও পাগলামী (মনোরোগ) সম্পর্কে ঔপনিবেশিক শাসনকালে সুচিকিৎসার প্রচলন তা ক্রমশ ব্যাপ্তি লাভ করতে শুরু করে । পশ্চিমীজ্ঞান পাগলদেরকে যৌক্তিকতার আলোকে ব্যাখ্যা করার ফলে পাগল হয়ে উঠল মানুষের এক ধরনের বিকৃত- মস্তিষ্কের অবস্থা । অর্থাৎ পাগল নিয়ে জ্ঞানচর্চা ও বিদ্যা চর্চার পাশাপাশি মনোবিজ্ঞানের একটি ডিসিপ্লিন তৈরী হল। এভাবে আধুনিকতার

যুগে উন্মাদনা ক্রমান্বয়ে পরিণত হলো মনোবিদ্যার একটি সাবজেক্ট হিসেবে । আবেগ অনুভূতির তীব্র বহিঃপ্রকাশের উপর ভিত্তি করে নামকরণ করা হয় ম্যানিয়া , মেলানকোলিয়া , হিস্টিরিয়া , হাইপোকন্ড্রিয়া ইত্যাদি । সর্বপ্রকার ধর্মীয় আর নৈতিকতার লেবাস ছাড়িয়ে এটাকে এখন পুরোপুরি চিকিৎসাবিদ্যার তত্ত্বাবধানে আনা হলো ।

ঔপনিবেশিক কাল পর্বের শেষের দিকে অর্থাৎ প্রায় এক শতাব্দি পূর্ব থেকে মনবিদরা পাগলামি কে মনের রোগ প্রমান করেন এই সঙ্গে পূর্বকার সব ভ্রান্ত ধারনা ক্রমশ অবলুপ্তি ঘটে । মনবিদরা বলেন যেমন শারীরিক রোগের বিভিন্ন রকম-ফের দেখা যায় এবং লক্ষন অনুসারে চিকিৎসকরা বিভিন্ন রোগের নাম দেন , ঠিক তেমনি ভাবেই মনবিদরা মানসিক রোগের ক্ষেত্রে নানারকম নামকরন দিয়ে থাকেন, মনোবিদদের মতে মানসিক রোগ শুধু এক রকমের হয় না । সাধারন মনোবিকার, অল্প বিকৃতমস্তিস্ক এবং সম্পূর্ণ বিকৃত মস্তিস্ক ইত্যাদি । মোটামুটি ভাবে মানসিক বিকৃতি ও বিকৃতের প্রভাব অনুসারে পাগলের তিন প্রকারের শ্রেনিতে বিভাজন করা হয় , যথা নিউরোসিস , সাইকো নিউরোসিস ও সাইকোসিস ।

প্রাক ঔপনিবেশিক সময়কালে বাংলার সমাজ জীবনে পাগলদের উপর ক্ষমতা বিস্তার করতো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠার তথা, পুরোহিত সম্প্রদায় তথা ওঝা বা তান্ত্রিক কিংবা মৌলভি । কিন্তু ঔপনিবেশিক কালপর্বে পশ্চিমী চিকিৎসক পাগলদের উপর একপ্রকার কর্তৃত্ব স্থাপন করতে সচেষ্ট হন। ঔপনিবেশিক চিকিৎসকরা সুস্থ আচরণের জন্য উন্মাদ ব্যক্তির উপর প্রয়োজনীয় নজরদারীর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আশ্রম গড়ে তোলেন ।

পাগল - শব্দটি বহুত্ব অর্থে ব্যবহৃত হয় । সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোন থেকে পাগল ধারণাটি বাংলার ধর্মীয় জীবনের সঙ্গে ওতোপ্রতো ভাবে জড়িয়ে আছে । বিশেষ করে লোক সাংস্কৃতিতে বাউল মতাদর্শে ; বৈষ্ণব মতবাদের সাধন ভজন পদ্ধতিতে পাগল রূপের বহিপ্রকাশ অন্যমাত্রা পেয়েছে । ধর্মীয় ভাবাবেগ ও ভক্তিবাদের সাধনায় সাধক কবিরা পাগল হয়ে উঠতেন আসল সত্যের সন্ধানে । আসলে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে পাগল ধারণাটি ভক্তি ভালবাসা , কামনা , বাসন - ইচ্ছা , আসক্তি আর ঈশ্বরের সান্নিধ্য - এই ভাবাবেগের সঙ্গে মিলে মিশে উদ্ভব হয়ে এক নতুন সাংস্কৃতি । বৈষ্ণব ধর্মে যেমন পাগল হয়ে গেছে বিবাগী সাধনায় আবার একলা পাগল

সারা জীবন একাকীত্ব হয়ে জীবন কাটায় পথে ঘাটে। এ ক্ষেত্রে বৈষ্ণব ভক্তির সঙ্গে একলা পাগলের দুস্তর পার্থক্য । আবার পাগল কত রকম ভাবে পাগলামি করে যা হতে পারে জ্ঞানে , মনেও ধনে। প্রেমিক তার মনের মানুষের জন্য বিরহে মন উতলা সর্বসময় পাগল পাগল মনভাব। রাধা যেমন কৃষ্ণের প্রথম দর্শনে প্রবল পূর্বরাগের জন্ম তা ক্রমেই অনুরাগ হয়ে প্রেমে মত্ত হয়ে গিয়েছিল । সেই পাগলামির সঙ্গে বাস্তবের জড় বস্তু পাগলের পাগলামি দুস্তর প্রভেদ আছে।

আলোচ্য অধ্যায়ের শেষ অংশে বলা যায় সামাজিক দৃষ্টিতে পাগলামি হলো বহুত্ব ধারণা বিষয়, যার রহস্য আমাদের কাছে বহুচর্চিত বিষয় । কিন্তু ঔপনিবেশিক সময়কালে মনোবিজ্ঞানের গবেষনার পাগল ধারণা নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে প্রকাশিত হতে শুরু করে । উনিশ শতকের এনলাইটেড পর্বে বা রেনেসা উত্তোরনের সময় পাগলামি নামক ধারণার সঙ্গে যে ভৌতিক কর্মকান্ড ও অতিন্দ্রীয় শক্তির যে প্রভাব বলে মনে করা হতো, সেই অবজেকটিভ ধারণা থেকেই আধুনিকতার উত্তোরনের সঙ্গে সঙ্গে পাগল ও পাগলামি সাবজেকটিভ বিষয় আকারে আমাদের কাছে উপস্থাপিত হয়েছিল। বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলশ্রুতি হিসাবে জৈবিক যুগে পাগলামিকে রোগের উপসর্গ হিসাবে চিহ্নিত করা হল । কিন্তু বাংলার সমাজ জীবনে পাগল যেভাবে আলোচিত পশ্চিমী সভ্যতায় ম্যাড বা ক্রেজি সেই দৃষ্টিকোন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা । বাংলার পাগল ধারণাটি একটি বহু মাত্রিক অর্থের ওপর প্রতিষ্ঠিত । যে অর্থগুলিকে কেন্দ্র করে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে কোনও না কোনও অংশে কী সামাজিক প্রতিষ্ঠা বা কী ধর্মিয় আচরণ , রাজনৈতিক ক্ষেত্র , চিন্তা ভাবনা , মনন জগত, আশা ভালোবাসা ইত্যাদির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হয়ে আছে । বঙ্গদেশে পাগল শব্দটি অর্থ বিভিন্ন রকমভাবে ব্যবহার করা হয় সেই প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃত ভাষায় পাগল শব্দের মাধ্যমে বহুবিধ অর্থকে বোঝান হত। পরবর্তীকালেও এটি বিবর্তিত হয়েছে সমাজ জীবনে বিভিন্ন অর্থের প্রয়োগের মধ্যে। শব্দের অর্থের মধ্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পার্থক্য । পাগল শব্দের অর্থ কত রকমের হয় , বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর ক্ষেত্রে বা কোন বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে শব্দ দ্বারা চিহ্নিত করা হয় । এখানেই শব্দ ও অর্থের তাৎপর্য। উন্মাদ কখনো হয়ে উঠেছে পাগল , আবার কখনো চিত্তসম্মোহন, চিত্তবিভ্রম, মতিভ্রংশ ইত্যাদি , বাংলার পাগল আর পশ্চিমের ম্যাড হয়তো অর্থগত দিক থেকে এক হলেও ব্যবহারিক দিক থেকে পশ্চিমের পাগলের সাথে দুস্তর প্রভেদ আছে , তাই বাঙালি জীবনে পাগল কখনও হয়ে

উঠেছে নস্টালজিয়া , কখনও বা রোমান্টিসিজম। সামাজিক,ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে পাগল হয়ে উঠেছে মত্ত, উন্মাদ, ক্ষ্যাপা, ক্ষিপ্তগ্রস্থ, আত্মভোলা, বিবাদি, দীওয়ানা, ফানা, কান্ডজ্ঞানহীন, নির্বুদ্ধিতা বা নির্বোধ ইত্যাদি। উনিশ শতকের সময়কালে বাংলার সামাজিক জীবনে বিভিন্ন সাহিত্য ভাবনা , আঞ্চলিক ভাষা , লোকোগান , কিম্বা সংস্কৃত সাহিত্যে পাগলনামক ধারণা সঙ্গে লোকায়ত অর্থ ও নান্দনিকতা মিশিয়ে পাগলের ইতিহাস বিবিধ-মুখী হয়ে উঠেছে। আবার ক্লিনিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে পাগল বলতে বোঝায় মানষিক রোগী, মনোবিকারগ্রস্থ , বিকৃত মস্তিষ্ক , অস্বাভাবিক আচরণ , ইনসেন্স , ইনস্যানিটি , অ্যাবনরমাল বিহেবিহার , মেনটাল ডিসঅর্ডার, লুনাটিক ,স্ক্রিজোফ্রেনিয়া , হাইপো কনড্রিয়া , ডিলিউশন , হ্যালুসিয়েশন , ননসেন্স কিংবা বাইপোলার ডিসঅর্ডার ইত্যাদি । এ-সবই পাগলামির এক একটা দিক । বাংলার সমাজে পাগল নামক শব্দটির নানা রূপ , নানা অর্থ ও বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রচলিত ।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

# ঔপনিবেশিক বাংলার উন্মাদ আশ্রম

## ( ১৮০০ - ১৯০০ খ্রীঃ )

ঔপনিবেশিক বাংলার উন্মাদ আশ্রম ও মনশ্চিকিৎসার অবস্থা আধুনিক ইতিহাস চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসের পাঠে আমরা এতদিন প্রশ্নাতীতভাবে বিজ্ঞানের বিজয়ের যে কাহিনি বা ন্যারেটিভ এর সঙ্গে পরিচিত , সেটি ইতিহাসের অনুসন্ধানে একটি বিশেষ প্রেক্ষিত মাত্র। যদিও ঔপনিবেশিক স্বাস্থ্যনীতির ইতিহাসটি ছিল একটি প্রভূত্বকারী প্রেক্ষিত বা ডমিন্যান্ট পারসপেকটিভ। এই প্রভুত্বকারী ভাবনা শুরু হয়েছিল ঔপনিবেশিক শাসন ও শৃঙ্খলায় যেটি পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের চিন্তা ও কৃৎকৌশলের প্রতি এক ধরনের সহজাত উৎকর্ষের ধারণা থেকে। ঔপনিবেশিক সময়ে রচিত স্বাস্থ্যনীতিগুলির এই প্রভূত্বকারী অবস্থানের চেহারা বাংলায় বেশ পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। ঔপনিবেশিক চিকিৎসার দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল একচেটিয়া (monopolistic) , বহুত্ববাদী (pluralistic) নয়। আলোচ্য অধ্যায়ে গভীর ও সূক্ষ্ম বিশে-ষণের মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক বাংলায় উন্মাদ আশ্রমের ইতিহাস যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি অনুসন্ধান করেছি সেগুলি নিয়ে আলোচনা করব।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, মস্তিষ্ক বিকৃতি-র কারণ আনুসন্ধান সংক্রান্ত বিষয়টি চিকিৎসাবিদ্যার বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল। যাঁরা এই প্রকার ত্রুটি অধ্যয়ন করতেন, তাঁরা চেষ্টা করছিলেন যাতে মানসিক স্বাস্থ্যকে চিকিৎসাশাস্ত্রের একটি অংশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়। এই কারণে ব্রিটিশরা কেবলমাত্র নেটিভ-দের জন্য উন্মাদাশ্রম প্রতিষ্ঠা করছিল সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে, বিশেষ করে তাদের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে। এই উন্মাদাশ্রমের উদ্দেশ্য ছিল সেই সমাজে মানসিক অসুখে অক্রান্ত ব্যক্তিদেরকে উপশম করা। কিন্তু দেখা যায় ব্রিটিশদেও তত্ত্বাবধানে থাকা উন্মাদাশ্রমগুলির রিপোর্ট পরীক্ষা অধ্যায়ন করে দেখলে দেখা যায় যে , উন্মাদাশ্রম গুলি মূলত জোর কওে শ্রম নিষ্কাশন করার স্থান ছিল যেখানে

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জন্য পণ্য উৎপন্ন করা হতো। বাস্তবে উন্মাদাশ্রমগুলিতে মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তিদের প্রায় কোনো পুনর্বাসনই প্রদান করা হতো না।

ভিক্টোরীয় যুগের নীতিনিষ্ঠায় জারিত উন্মাদাশ্রমের বার্ষিক রিপোর্টগুলি নিয়ে গবেষণা করলে এটি লক্ষ্য করা যায় যে চিকিৎসার রিপোর্ট গুলির তথ্য ছিল  লাভের অংশে পরিপূর্ণ। সেই উন্মাদাশ্রমে থাকা রোগীদের অধিকাংশরাই ছিল ভারতের প্রথাগত ভাবে ভবঘুরে , যাদের কোনো হিসাব ছিল না এবং যাদের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ছিল না। জনসাধারণের স্বাস্থ্য, বিশেষ করে মানসিক স্বাস্থ্যের উপরে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাজত্বের ফলাফল  নিয়ে ইতিপূর্বে  কোনো গবেষণা হয় নি, তাই  এই বিষয়টি উন্মাদ আশ্রমের ইতিহাসে আলোকপাত করা একান্ত প্রয়োজন।

ঔপনিবেশিক চিকিৎসা ব্যবস্থা তার কর্তৃত্ব কায়েম করছিল ভারতীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা আর ভারতীয় শরীরের ওপর, সেইসময় চিকিৎসাবিদ্যার পেশাদারি নিয়মবিধি চালু হচ্ছিল তার ভারতীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের বেআইনি ঘোষণা করেই। শরীর ও আধুনিক রাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্কগুলি গভীরভাবে জটিল। যেভাবে বুর্জোয়া সভ্যতা এই শরীর প্রত্যয়টির (concept) ওপর গুরুত্ব দেয়, তা প্রাধনতান্ত্রিক সামাজিক ব্যবস্থার থেকে আলাদা। এই বুর্জোয়া সভ্যতায় কৃষক-শরীর , আদিবাসী-শরীরকে ভেঙে-চুরে , নতুন অভ্যাসের ফাদে ফেলে দেয়  , কিন্তু  এই পরিবর্তন একদিনে হয় না  । পুরোপুরি ঘটেও না কোন সময়  । পরিবর্তনের পথটিও মসৃণ নয়। স্থান - কালভেদে জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সরকারের সংঘর্ষ দেখা যায় .  এই অসম ও বন্ধুর পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রের হাতে অস্ত্র থাকে নানা ধরনেরআইন ব্যবস্থা , সেনাবাহিনী, অর্থনীতিকব্যবস্থা।   কিন্তু একটি বিরাট অস্ত্র আধুনিক শরীরবিদ্যা ও চিকিৎসাবিজ্ঞানভিত্তিক স্বাস্থ্যনীতি[1]  । দীপক কুমারও তার সাম্প্রতিক গবেষণায় বলেছেন যে , ঔপনিবেশিক চিকিৎসা ব্যবস্থাটি শাঁখের করাত  এর মতো  । দুই ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত পার্থক্যগুলির ওপর জোর দিলেও শেষ অবধি ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা একটি বৈজ্ঞানিক আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যেই কাজ করেছে । ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যার

---

[1] আর্নল্ড,ডেভিড ;  কলোনাইজিং টি বডি: স্টেট মেডিসিন অ্যান্ড এপিডেমিক ডিজিজ ইন নিন্টেন্ডো: সেঞ্চুরি ইন্ডিয়া, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউ দিল্লি ১৯৯৩, পৃ. ১০৮.

প্রতিনিধিদের সঙ্গে ঔপনিবেশিক চিকিতসা ব্যবস্থার বিরোধের দিকটি[2]। ভিন্ন প্রেক্ষিত থেকে রচিত অনুসন্ধানগুলি থেকে একটা বিষয় বেরিয়ে আসে যে , ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থার স্বাস্থ্যনীতি গড়ে উঠেছিল আধুনিক রাষ্ট ও তার রক্ষাকারী শরীরগুলিকে সুস্বাস্থ্যেরাখার উদ্দেশ্য নিয়েই। সেনাবাহিনী আর আমলাদের স্বাস্থ্যরক্ষাই ছিল তাদের গোড়ার দিকের কাজ।

ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে এই ঔপনিবেশিক চিকিৎসাবিদ্যাকে যেভাবে জ্ঞান উন্মোচনের দিশারী হিসাবে দেখানো হয়ে থাকে , তা যথার্থ নয় । ঔপনিবেশিক সমাজে উন্মাদ আশ্রমের যে চিকিৎসা ব্যবস্থা , আধুনিক রাষ্ট্রের অন্যান্য যন্ত্রগুলির মতোই নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে অসংখ্য স্থানীয় ও দেশজ প্রতিরোধগুলিকে হিংসা আর কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে নীরব করার প্রচেষ্টায় । এই প্রতিরোধের পাশাপাশি কিন্তু ছিল সমঝোতা আর অবধাবস্থান। ছিল নিজেদের মতো করে এই পশ্চিমি যুক্তিকাঠামোরর স্বাস্থ্যচর্চাকে বদলে নেওয়া ও উন্মাদ আশ্রম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শাসন প্রভুত্ব কায়েম করা[3]।

ঔপনিবেশিক স্বাস্থ্যব্যবস্থায় গড়ে ওঠা বাংলার পাগল ও পাগলাগারদের ইতিহাস নিয়ে খুব বেশি গবেষণা ইতিপূর্বে হয়নি । যদিও এ প্রসঙ্গে দেবযানী দাস এর “ Houses of Madness” (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৫) নামক গবেষণা গ্রন্থটি খুবই উলে-খযোগ্য,উক্ত গ্রন্থে তিনি উনিশ শতকের উপর উন্মাদ আশ্রম গুলি স্বল্পপরিসরে উপস্থাপন করেছেন। এছারাও ভারতীয় অ্যাসাইলামগুলি নিয়ে কিছু লেখা ভারতীয় ও অ-ভারতীয় গবেষকরা প্রকাশ করেছেন। যদিও ঐ প্রবন্ধ গুলিতে পাশ্চাত্য মনশ্চিকিৎসার নতুন বিশেষণে ভারতীয় মন কীভাবে ক্যাটেগরিভুক্ত হল সে নিয়ে আলোচনা প্রায় নেই । ছন্দক সেনগুপ্ত অবশ্য মনশ্চিকিৎসার আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা করেছেন কলকাতার প্রেক্ষাপটে। কিংবা ওয়াল্ট্রড আরনস্ট- এর বাংলার নেটিভ উন্মাদ আশ্রমের প্রবন্ধ মূলক গবেষণা খুবই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু উনিশ শতকে বাংলায় উন্মাদ আশ্রমের প্রতিষ্ঠার যে যাত্রাপথ হয়েছিল তার পরিপূর্ণতা বিকশিত হয়েছিল বিংশ শতকের প্রথম অর্ধ-কালীন সময়ে

[2] কুমার,দীপক সাইন্স অ্যান্ড দ্যা রাজ : এ স্টাডি অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া , অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস,২০০৬ .

[3] আর্নল্ড,ডেভিড ; কলোনাইজিং টি বডি: স্টেট মেডিসিন অ্যান্ড এপিডেমিক ডিজিজ ইন নিন্টেন্ডো: সেঞ্চুরি ইন্ডিয়া, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউ দিল্লি ১৯৯৩, পৃ. ১০৯.

অর্থাৎ উন্মাদ আশ্রম থেকে মানসিক হাসপাতালে যে উত্তরণ তা ঔপনিবেশিক বাংলার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। কিন্তু এই বিষয়টি নিয়ে আজ অবধি কোন পূর্ণাঙ্গ কোন গবেষণা হয়নি। আবার ঔপনিবেশিক চিকিৎসা ব্যবস্থার কৃৎকৌশলে কীভাবে ভারতীয় মন বাঁধা পড়ে ও সুস্থ আচরণ এর বিধি- ব্যবস্থা তৈরি হয় , তা আলোচিত হয়নি । ছন্দক সেনগুপ্তর তাঁর দীর্ঘ আঞ্চলিক ইতিহাসের বিবরণীতে নেই তাদের কথা , যারা এই চিকিৎসা ব্যবস্থার লক্ষ্য ছিলেন। কীভাবে এই মানসিক রোগী ও তাদের বাড়ির লোকেরা প্রচলিত চিকিৎসাপদ্ধতিগুলি থেকে সরে আসছিলেন , আর কেনই বা সরে আসছিলেন ? কীভাবে আমাদের বৈচিত্র্যময় স্থানীয় পদ্ধতিগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা হচ্ছিল এবং সেগুলিকে অ-বৈজ্ঞানিক হিসাবে জন সাধারণের মধ্যে প্রকাশ করা হয়েছিল ? কিন্তু অনন্যাও গবেষণার বাংলার উন্মাদ আশ্রম ও ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের চরিত্র ও তাদের লক্ষ্য আসলে কি ছিল এই নিয়ে তেমন কোন পরিপূর্ণ আলোচনা নেই বললেই চলে।

এইও সত্য উন্মাদ আশ্রম সঙ্গে উপনিবেশবাদের চরিত্র বোঝার কাজটি অবশ্য অতটা সরল নয় । কারণ ঔপনিবেশিক স্বাস্থ্যের কর্ণধারদের বিভিন্ন বিবরণীগুলিকে কীভাবে পাঠ করতে হবে সে বিষয়টি জটিল । এছাড়াও দেখতে হবে সেইসব যোগাযোগ বা সম্পর্কগুলি যেখানে স্থানীয় প্রতিরোধ প্রতিবাদুসমঝোতা কাহিনি নানাভাবে বিবৃত হয়েছে । সর্বোপরি এসে পড়ে ঔপনিবেশিক উন্মাদ আশ্রম ও মনশ্চিকিৎসার সঙ্গে সম্পর্কের বিবরণীগুলি কোন অবস্থান থেকে বিশে-ষণ করা হচ্ছে । কারণ , ক্ষমতার প্রতিষ্ঠান ও তার বিন্যাসগুলিকে শনাক্ত না করে উপনিবেশবাদের চরিত্র নির্ণয় বোধহয় মুশকিলের কাজ ।

ইতিপূর্বে উন্মাদ আশ্রম নিয়ে যে চর্চার কথা অলোচিত হয়েছে তা পাশ্চাত্য মনশ্চিকিৎসার ক্ষমতাকে মেনে নেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ । কিংবা আলোচিত হয়েছে এই নব বিজ্ঞানের সুযোগ থেকে নেটিভ মনঃচিকিৎসক দের বঞ্চিত করে রাখার কথা । পশ্চিমের রচনাগুলির প্রধান উদ্দেশ্য, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে তাদের প্রগতির কাহিনি বলয় তৈরি করা , তাই শহরের প্রত্যন্তদেশে বা গ্রাম মফঃস্বলে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য মনশ্চিকিৎসা ব্যবস্থার ইতিহাসগুলি আমাদের পিছিয়ে থাকা অবস্থার প্রতিনিধিত্বকারী বর্ণনা হিসাবেই রচিত হয় । কিন্তু এই পশ্চিমি বিজ্ঞানকে আমরা যেভাবে গড়েপিটে নিয়েছি ঔপনিবেশিক কালে , তার মধ্যেও রয়েছে ভারতীয়

মৌলিক চিন্তার অস্তিত্ব , যা সেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের তত্ত্ব দিয়েই তাকে প্রশ্ন করেছে । আশিস নন্দী প্রথম ভারতীয় সাইকো-অ্যানালিস্ট ডা. গিরীন্দ্রশেখর বসুর জীবনকে কেন্দ্র করে এই নব বিজ্ঞানচর্চার বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন । তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে গিরীন্দ্রশেখর ফ্রয়েডের সময়কালে , তার প্রথম অনূদিত গ্রন্থ পড়ার আগে থেকেই এ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠেন এবং মনঃসমীক্ষণের তত্ত্বে তার মৌলিক চিন্তার উন্মেষ ঘটান । শ্রী নন্দী দক্ষতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন গিরীন্দ্রশেখরের জীবনী ও কাজকে ; পাশাপাশি আর এক ইউরোপীয় মনঃসমীক্ষক ডা .বার্কলে হিলকে রেখে । ১৯০৭ সালে , অক্সফোর্ড মেডিক্যাল স্কুলের গ্র্যাজুয়েট বার্কলে হিল যখন ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসে যোগ দেন , তার আগেই তিনি ফ্রয়েডের জীবনীকার - শিষ্য আর্নেস্ট জোন্স - এর কাছে সাইকোঅ্যানালিসিস- এর প্রশিক্ষণ শুরু করেছিলেন ।

অধ্যাপক নন্দীর তাঁর “At the Edge of psychology: essays in political and culture” (Oxford,১৯৯০) গ্রন্থে দেখিয়েছেন হিল- এর পাশ্চাত্যধর্মী অ্যাগ্রেসিভ সাইকোঅ্যানালিসিস এর পাশাপাশি গিরীন্দ্রশেখরের মৌলিক জ্ঞানচর্চার উপাদানগুলি । তাই গিরীন্দ্রশেখরকে নন্দী আক্ষেপাত্মক ব্যঞ্জনায় বলেছেন স্যাভেজ ফ্রয়েড ; মনঃসমীক্ষণের যে মৌলিক তত্ত্ব ঔপনিবেশিক ভারতের মনোবিজ্ঞানচর্চায় inhouse critique হিসাবে চর্চিত ছিল তাকে তিনি প্রভুত্বকারী ন্যারেটিভ 'এর এক গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন[4] । নন্দী ছাড়াও , সুধীর কাক্কার ওঝা , গুণিন ,পীর, জ্যোতিষী ইত্যাদিদের সাথে দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের বিবরণী থেকে বিশ্লেষণ করেছেন ভারতীয় সাইকোথেরাপির নানান বৈচির্ত্যপূর্ণ অথচ স্বতন্ত্র ধারাগুলির অস্তিত্ব , যা ঔপনিবেশিক চিকিৎসার নিয়ন্ত্রণকে উপেক্ষা করেও আজ টিকে আছে তার কার্যকারিতার গুণে। দেবোরা পুলে ভট্টাচার্য আলোচনা করেছেন বাংলার পটভূমিতে পাগলামির প্রত্যয় ও তার সামাজিক - সাংস্কৃতিক অর্থ নিয়ে। এবং তিনিও বলেছেন মনশ্চিকিৎসার ইতিহাসে বাংলায় তার বহুত্ববাদী প্রয়োগের কথা । মনশ্চিকিৎসায় রোগের বর্গ বিভাজন বা ক্যাটাগরি ফরমেশন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সামাজিক মনশ্চিকিৎসাবিদ অজিতা চক্রবর্তী

---

4 নন্দী, আশিস; এট দ্যা এজ অফ সাইকোলজি : এসেস ইন পলিটিক্যাল অ্যান্ড কালচার , অক্সফোর্ড ইউনিভার্সি প্রেস, ১৯৯০ । ভূমিকা প্রসঙ্গ ।

মন্তব্য করেছিলেন যে : নানান সংশোধন সত্ত্বেও মনশ্চিকিৎসার প্রধান ধারাটি দৃঢ় ভাবে প্রোথিত রয়েছে ক্রেপলিনের উনবিংশ শতকের বিভাগীকরণে সেখানে একটি কেন্দ্রীয় বিন্যাস (central pattern) - এর মধ্যে পশ্চিমের অসুস্থতাগুলিকে স্ট্যান্ডার্ড ধরা হয় এবং স্থানীয় বিন্যাস (local pattern) - গুলিকে তার সামান্য পরিবর্তিত রূপ (minor variations) বলে মেনে নেওয়া হয় । তাই আজ , ঔপনিবেশিকতা আর মনশ্চিকিৎসার ইতিহাসচর্চা করতে গেলে , ভারতীয় ঔপনিবেশিক তথা আধুনিক মননে যে বিভিন্ন দ্বন্দ্বগুলি আকীর্ণ হয়েছিল তার খোঁজ করার মতন জটিল কাজগুলিকে এড়িয়ে যাবার কোনো উপায় নেই । এমনকি বর্তমান সময়ে যে বিতর্ক সামাজিক - মনশ্চিকিৎসা ও মনোবিজ্ঞানে উঠেছে এই প্রভুত্বকারী জ্ঞানচর্চার উদ্দেশ্য এবং প্রভাবকে নিয়ে , তার সূত্রগুলিও উপ্ত রয়েছে ঔপনিবেশিক সময়কালে ।

## অনুসন্ধান মূলক প্রশ্ন :

আলোকপ্রাপ্তি বা এনলাইটেনমেন্ট পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ উপনিবেশ গুলিতে মানসিক রোগের চিকিৎসা বিষয়ে যে সব আধুনিক পরিবর্তন ঘটছিল সে সবই চালু করার ব্যাপারে ঔপনিবেশিক কর্তাদের একাংশও বিরোধী ছিল এবং পাগলাগারদের পরিসরে যে আধুনিক মনশ্চিকিৎসার জ্ঞান-উৎপাদন শুরু হল, তার বিশেষ আদলটি তৈরি হয়েছে আশ্রম প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে, মূলত এই অধ্যায়ে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিকে আনুসরন করে কিছু উদাহরন দিয়ে আনুসন্ধান করব পাগলাগারদের ইতিহাস থেকে কিভাবে মানসিক হাসপাতালের আবির্ভাব হল। কারণ এখানেই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক চিকিৎসাবিদ্যা তার উৎকর্ষের নমুনাগুলিকে নির্মাণ করেছিল । এরপর আলোচ্য অধ্যায়ে সরকারি মুখপত্র ' ইন্ডিয়ান মেডিকেল গেজেট ' ও বিভিন্ন প্রতিবেদনের সূত্রের মাধ্যমে অ্যাসাইলাম পাগলদের কে কিভাবে দেখা হতো সেগুলি আলোকপাত করবো । এই অধ্যায়ে অনুসন্ধানের কেন্দ্রে থাকবে উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক বাংলায় উন্মাদ আশ্রম কে কেন্দ্র করে পাগলদের রোগ নিরাময়ের আধুনিক জ্ঞান গড়ে তোলার প্রশ্নটি। এছারাও আলোচ্য অধ্যায়ে অন্যান্য যে প্রশ্নগুলি অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছি সেগুলিহল।

ঔপনিবেশিক বাংলায় উন্মাদ আশ্রম প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য কি ছিল। উন্মাদ আশ্রম প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে ঔপনিবেশিক বাংলায় সর্বাধিক উন্মাদ আশ্রম প্রতিষ্ঠা কেন হয়েছিল ? ভিক্টরিয় নীতি,

অনুশাসন ও অপর দিকে হিতবাদী দর্শনের যে প্রচার ঔপনিবেশিক শাসককুল করত তাঁর ফলপ্রসু কতটা হয়েছিল? না কি এই নীতি অনুশাসনের পশ্চাতে অন্য কোন দুরাভিসন্ধি কাজ করেছিল? উন্মাদ আশ্রম বা মানসিক আশ্রম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দেশীয় ঐতিহ্য কতটা ভূমিকা পালন করেছিল।

বিজ্ঞান ও তার কৃৎকৌশলের বিবর্তনবাদী ইতিহাস রচনার এই প্রাধান্যকে প্রশ্ন করতে গেলে আমাদের এই আপর্যবেক্ষণ দরকার যে কীভাবে , কোন মতামত বা কনসেন্ট দিয়ে আমরা এই কর্তৃত্বকে স্বীকৃতি দিই বা অনুমোদন করি । আর যখন করি না , তখন কীভাবে তার বিরোধিতা করি । আমার এও মনে হয়েছে যে , ঔপনিবেশিক মনশ্চিকিৎসার ইতিহাসচর্চায় আজ খুঁটিয়ে দেখা দরকার সেইসব প্রাতিষ্ঠানিক জায়গাগুলি যেখানে চাপা পড়ে গেছে অগণিত রোগী আর তার বাড়ির লোকেদের কাহিনিগুলি । এই প্রতিষ্ঠানগুলির বিবরণীতেই ভারতীয় শরীরের আর মনের নতুন চেহারা গড়ে তোলা হচ্ছিল আধুনিক রাষ্ট্রের উপযোগী ব্যক্তি হিসাবে । সে ব্যক্তি , বিজ্ঞানের মাপে আর আধুনিকতার দাবিতে একটি একক, যাকে মানসিক রোগের ম্যানুয়ালে ছাপা যে কোনো কোডে মাপা যায় ।

এই নীরবতার অঞ্চলগুলিকে সরব করার ইচ্ছে যে ইতিহাসবিদ রাখতে চান তাকে প্রশ্নবোধক মনে অনুসন্ধান করতে হবে কীভাবে সুপারস্টিশন বাইগটরি ( bigotory) , ডেসপটিজম (despotism) এইসব বিশেষণ ব্যবহার করা হচ্ছিল স্থানীয় পদ্ধতিগুলির প্রতি এবং ঔপনিবেশিক মনশ্চিকিৎসাকে ভূষিত করা হচ্ছিল মানবিক এবং জ্ঞানের একমাত্র দিশারী হিসাবে। আমাদের দেখতে হবে এই নব বিজ্ঞানের প্রসারের ক্ষমতার স্তর , বিন্যাস ও তার ক্রিয়াকৌশলগুলি , সেখানেই ধরা পড়তে পারে তার প্রতিরোধী বিন্যাসগুলি এবং ইতিহাসচর্চার এই বিবর্তনবাদী প্রভুত্বকারী ধারাটির সামনে উপস্থিত হবে একাধিক প্রশ্ন । শুধু বোধহয় আধুনিক রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের বিশে-ষণে নয় , আজকের সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ বোধহয় আধুনিক ভারতীয় মননের গঠনকাঠামোর নির্মাণে ঔপনিবেশিক প্রত্যয়ের উপাদানগুলিকে চিহ্নিত করা , বা এও ভাবতে থাকা যে , ভারতীয় মন বলে কোনো একক গঠনের প্রয়োজনীয়তা কোনো প্রভুত্বকারী তত্ত্বকে জোরদার করে । তাই প্রভুত্বকারী ন্যারেটিভ - এর প্রতি প্রশ্নসূচক দৃষ্টি কে লক্ষ্য রেখে ব্রিটিশ উন্মাদ আশ্রম উদ্ভব ও বিকাশ কিভাবে হল তা আলোচ্য অধ্যায়ের একটি মূল অনুসন্ধান ।

# কেন উন্মাদ আশ্রম ?

# ঔপনিবেশিক শাসনের যৌক্তিকতা

ইংল্যান্ডে ব্রিটিশরা উন্মাদদের নিয়ন্ত্রণ করেছিল আটকে রেখে, ভারতে তাদের প্রবেশের শতবর্ষের আগে। ভারতীয়দের বিপরীত দিকে, পাশ্চাত্য চিকিৎসা ঐতিহ্য অনুসরণকারী ব্রিটিশরা বেছে নিয়েছিল সেইসব আইন তৈরি করতে , যা সংজ্ঞায়িত করতো , কাদের উন্মাদ বলা যাবে এবং তাদের সাথে কীরকম ব্যবহার করা উচিত হবে। ব্রিটিশদের উন্মাদাবস্থা সম্পর্কে ধারণা উদ্ভূত হয়েছিল সম্পূর্ণ অন্য প্রকারের সাংস্কৃতিক প্রভাবে; আর এই প্রভাবগুলি ভারতের সাথে প্রায় মেলেই না, বিশেষ করে তাদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের সাথে। উন্মাদ সম্পর্কে ব্রিটিশদের সংজ্ঞার একটি উদাহারণ দেখা যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি গ্রন্থে, কমেন্টারিজ অন দ্য ল-জ অফ ইংল্যান্ডএ: উন্মাদ অথবা মস্তিষ্ক বিকৃতির শিকার হলেন সেই ব্যক্তি যিনি কোনো অসুখ, দুঃখ অথবা অন্য কোনো দুর্ঘটনার কারণে তাঁর বোধশক্তি ও তাঁর যুক্তি ব্যবহারের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন। একজন উন্মাদ হলেন সেই ব্যক্তি যাঁর মনের মধ্যে চক্রাকারে চলতে থাকে, মাঝে মাঝে তিনি তাঁর বোধশক্তি ব্যবহার করতে পারেন, এবং মাঝে মাঝে তিনি তা ব্যবহার করতে পারেন না, আর এটি ঘন ঘন নির্ভর করে তার মনের অবস্থার উপরে।

উন্মাদাবস্থার শব্দাবলী এমন নমনীয়ভাবে করা হয়েছিল যাতে বিভিন্ন প্রকারের সমস্যা এবং সামাজিকভাবে সমস্যাজনিত আচরণ তাতে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ভিক্টোরীয় নীতিবোধ, শ্রেণী-বিভাগ এবং কর্ম-সংস্কৃতির সাথে ব্রিটিশরা তাদের উপনিবেশে প্রদান করেছিল তাদের নিজস্ব উন্মাদাবস্থার ব্যাখ্যাটিও। পূর্বে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আধিপত্য বিস্তার করার সাথে সাথে, তারা ভারতে ব্রিটিশ আদর্শের উন্মাদাশ্রম শুরু করেছিল এবং বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে তারা প্রথম উন্মাদাশ্রম স্থাপণ করেছিল ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে; কিন্তু এই উন্মাদাশ্রম নির্দিষ্টভ ছিল "উন্মাদ সিপাই " দের জন্য।

উনবিংশ শতাব্দী যত এগিয়েছিল, তত চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি নতুন ধারা সূচনা হয়েছিল, নতুন নতুন চিকিৎসাপদ্ধতি এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে, মানসিক অসুস্থতার কারণ কী, সেই বিষয়ে নানাপ্রকার ভাবনা-চিন্তা হয়েছিল, বিশেষ করে পাশ্চাত্যের চিকিৎসকদের ভিতরে,

কারণ মানসিক অসুস্থতা নির্ণয় ও চিকিৎসার প্রশিক্ষণ সেই সময়ের চিকিৎসা-শিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত ছিল না । পাশ্চাত্যে সাধারণত উন্মাদদের আটকে রাখা ছিল পরিচর্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক; এই প্রথা বন্ধ হতে শুরু করেছিল মধ্য-উনবিংশ শতাব্দীতে । সেই সময়ের বিভিন্ন মেডিকাল জার্নাল এবং বার্ষিক রিপোর্ট খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে মানসিক অসুস্থতার বিষয়ে তৎকালীন মানুষদের বোঝার একান্ত অভাব ছিল। এই ধরনের একটি প্রবন্ধ, যেটি লিখেছিলেন ছিলেন ভারতীয় এক উন্মাদাশ্রমের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডঃ টি. এ. ওয়াইজ, ১৮৫২-র মান্থলি জার্নাল অফ মেডিকাল সায়েন্স-এ প্রকাশিত হয়েছিল। ওয়াইজ অনুমান করেছিলেন যে উন্মত্ততা ও ভারতীয় পরিবেশ ভারতে "উন্মাদগ্রস্ততার মরশুম" তৈরি করেছিল , যেটি লক্ষ্য করা গেছিল উনিশ শতকের মধ্যবর্তী দশক গুলিতে [5] (ওয়াইজ, ১৮৫২)। ১৮৫৩-র সাইকোলজিকাল মেডিসিন অ্যান্ড মেন্টাল প্যাথোলজি নামক ব্রিটিশ জার্নালে, ওইয়াজের সহকর্মীরা তাঁর প্রবন্ধের সমালোচনায় লেখেন যে তাঁর অনুমান অনেকটা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ।[6]

## জনগণের প্রতি ব্রিটিশ উৎকর্ষতা প্রদর্শন:

ব্রিটিশরা অতি উৎসাহিত ছিল ভারতীয় জনগণকে ব্রিটিশ উৎকর্ষতা প্রদর্শন করতে । ১৮৪৪ সালে ব্রিটিশদের দ্বারা সংগৃহীত পরিসংখ্যান থেকে এটি জানা যায় যে, তৎকালীন ইংল্যান্ডের তুলনায় ভারতে উন্মাদগ্রস্ততার হার কম ছিল। ব্রিটিশ উৎকর্ষতার ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হওয়ার একটি উদাহরণ দেখা যায় ডঃ ম্যাকফার্সনের লেখায়- আমরা নিজেরাই এই ধন্দে আছি যে উন্মাদগ্রস্ততা কি সভ্য দেশের তুলনায় অসভ্য দেশে কম হয় কি না এটি নিঃসন্দেহে ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে থাকে একজন উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তি হয়ত একই ভাবে প্রভাবিত হবেন না যেমন একজন অশিক্ষিত, এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তি হন কিন্তু এটি সম্ভব নয় যে সভ্য সমাজে উন্মাদগ্রস্ততায় ব্যক্তিদের বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, এবং তাই জনসংখ্যায় উচ্চ সংখ্যায় উন্মাদদের দেখা মিলবে ( ম্যাকফার্সন, ১৮৫৬ )। এই উদাহরণে, ডঃ ম্যাকফার্সন ভিক্টোরীয় নৈতিকতার সাথে উন্মাদদের

---

[5] জে. ওয়াইজ, 'জেনারেল প্যারালাইসিস অফ দ্য ইনসেন ', ইন্ডিয়ান মেডিকেল গেজেটে, ৪ নং , ১৮৫২।

[6] বি, কিম্বার্লি সি., লুনাসি ফর প্রফিট : দ্য ইকোনমিক গেইনস অফ 'নেটিভ-অনলি' লুনাটিক অ্যাসাইলাম ইন দ্য বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, ১৮৫০-১৮৭০ , জার্নাল অফ সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ। ০২ (০১) ২০১৪. ০১-১০

পরিচর্যা সংশ্লিষ্ট করে দিয়েছিলেন; ব্রিটিশরা মনে করতে তাদের উচ্চ নৈতিক আদর্শ ছিল, এবং তাই তারা বাধ্য হতো উন্মাদদের গুরুত্ব দিতে [7]।

## ব্রিটিশদের নৈতিক কর্তব্য:

ব্রিটিশরা মনে করতো যে ভারতীয় উন্মাদদের সাহায্য করা তাদেও নৈতিক কর্তব্য, কিন্তু কিছু সীমাবদ্ধতা ও শর্তসহ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, উন্মাদাশ্রমগুলিকে শ্রেণীবিভক্ত করা হবে ইউরোপীয় এবং কেবলমাত্র নেটিভদের জন্য । চিকিৎসার প্রধান পন্থা ছিল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ভিক্টোরীয় নৈতিকতা এবং কর্ম-সংস্কৃতি [8]। বার বার ব্রিটিশরা বলেছেন যে তাঁরা বলপ্রয়োগের বিরোধী; এর বদলে তাঁরা মনে করতে যে সম-স্তরের মানুষজনের থেকে চাপ উন্মাদদের দৃঢ় নৈতিক ভিত্তি তৈরি করবে এবং তার ফলে শক্তিশালী কর্ম-সংস্কৃতি গঠিত হবে ( ম্যাক কেলেন্ড এবং পাইন, ১৮৬৩ )। কিন্তু দেখা যায় যে, এই নৈতিকতাকে ব্যবহার করা হয়েছিল মুখোশ হিসাবে, যাতে এক স্থানে স্থিত নয় এমন ভারতীয়দের প্রতি ব্রিটিশদের ভয় ঢাকা যায় এবং তাদের সমাজ থেকে অপসারণের একটি যুক্তি দেওয়া যায়। এটি এয়াড়াও সেইসব যাযাবর ও ভবঘুরেদের সমস্যার সমাধা ন করবে, যা ব্রিটিশদের মতে, ভারতের রাস্তায় ভিড় বাড়ায় এবং ব্রিটিশদের নিয়ম-শৃঙ্খলা ও সভ্যতাকে নষ্ট করে।

১৮৫৭ সালটি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ভারতের ক্ষেত্রে মহাপ্রলয়ের বছর হয়ে উঠেছিল, যেখানে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লব, ব্রিটিশদের বিপর্যস্ত করেছিল। মিলস যুক্তি দিয়েছিলেন যে ১৮৫৭ সালের বিপ্লব ভারতীয়দের প্রতি ব্রিটিশদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করেছিল, যার ফলে ব্রিটিশরা তাদের দেখতে শুরু করেছিল খুব বিপজ্জনক জাতি হিসাবে যাদের আরো বেশি করে অধীনস্ত করা প্রয়োজন; এই অনিরাপত্তা-বোধদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল ভবঘুওে গণ। ব্রিটিশরা প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে তৈরি ছিল যা তাদের ভবিষ্যতের আক্রমণ থেকে

---

[7] মিলস, জেমস এইচ, ম্যাডনেস, ক্যানাবিস অ্যান্ড কলোনিলিয়ালিসম। দ্যা "নেটিভ-অনলি" লুনাটিক অ্যাসাইলাম অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া , ১৮৫৭-১৯০০, ম্যাকমিলান প্রেস, লন্ডন, ২০০০, পৃ-১১

[৪] আর্নল্ড, ডেভিড; (এড.), ইম্পেরিয়াল মেডিসিন অ্যান্ড ইনডিজেনাস সোসাইটিস (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস নিউ দিল্লি ১৯৮৮), পৃ – ১৭ .

সুরক্ষিত করতে পারবে, যাতে অন্তর্ভুক্ত হবে “যা কিছু করা, ভারতীয়দের কাছে থেকে অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেওয়া থেকে শুরু করে সম্ভাব্য বিপজ্জনক ও অনিশ্চিত ব্যক্তিবর্গকে সমাজ থেকে সরিয়ে ফেলা [9] । পরবর্তী বছরে দ্য ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলামস অ্যাক্ট ১৮৫৮ পাস করা হয়, যার প্রভাব ভারতীয় জনগণের উপর নানাভাবে পড়েছিল। প্রথমত, এই আইনের দ্বারা ভারতীয় শাসন ব্যবস্থা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে ব্রিটিশ সরকারের কাথে হস্তান্তরিত হয়েছিল। এখানে এটি মনে রাখা জরুরি যে, এর মধ্যে উন্মাদাশ্রমের পরিচালনার ভারও অন্তর্ভুক্ত ছিল । এই আইনের ধারা ৪ এবং ৫ বিশেষ করে বর্ণনা করেছে উন্মাদ যাযাবর এবং ভবঘুরেদের সংগ্রহ করার প্রক্রিয়া, এবং সে ক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের যিনি তাঁদের আইনত উন্মাদ ঘোষণা করবেন, যার পরে তাদের একটি কেবলমাত্র নেটিভদের জন্য উন্মাদাশ্রমে কারাদন্ডিত করা হবে । এর ফলে এই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার কোনো কারণ নেই যে সেই ব্যক্তিগণ চিকিৎসাগত দিক দিয়ে সত্যি সত্যিই উন্মাদ হবেন [10]।

## ভিক্টোরীয় যুগে নৈতিক দায়িত্ববোধ

ভিক্টোরীয় যুগে নৈতিক দায়িত্ববোধ ছিল একটি মৌলিক মূল্যবোধ। সেইসব উন্মাদরা, যারা তাদের নিজেদেও রক্ষা করতে পারে না, তাদের রক্ষা করা ছিল চিকিৎসক সমাজের মূল দুশ্চিন্তা, বিশেষ করে সেই উন্মাদদের যদি ভবঘুরে বা যাযাবর হিসাবে শ্রেণীবিভক্ত করা হয়। ভবঘুরেদের বিষয়টি বারবার আলোচিত হচ্ছিল। প্রথম ভবঘুরেদের আইন, যা বিশেষ করে ভবঘুরেদের মধ্য উন্মাদগ্রস্ততার সমস্যার বিষয়টি দেখেছিল, সেটি লিপিবদ্ধ হয়েছিল ১৭১৪ খ্রিস্টাব্দে (ডনেলি, ১৮৯৩)। ব্রিটিশরা এই বিষয়টিও লক্ষ্য করেছিল যে ইংল্যান্ডে কপর্দকশূণ্য (পপার) মানুষেরাও তাদের দারির্দ্য থেকে পালাতে চেষ্টা করছিলেন; সৎ কপর্দকশূণ্যদের কাছেও উন্মাদাশ্রমের একটি আকর্ষণ ছিল, ঠিক যেমন একজন অলস চোরের কাছে লক্ষ্যের আকর্ষণ থাকে (লুনাটিক অ্যাসাইলাম রিপোর্ট, ১৮৮৩)। ভারতে , দেশীয় সাংস্কৃতিক দর্শন

---

[9] মিলস, জেমস এইচ, ম্যাডনেস, ক্যানাবিস অ্যান্ড কলোনিলিয়ালিজম। দ্যা "নেটিভ-অনলি" লুনাটিক অ্যাসাইলাম অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া , ১৮৫৭-১৯০০, ম্যাকমিলান প্রেস, লন্ডন, ২০০০, পৃ-৭০

[10] তদেব ,পৃষ্ঠা- ৬

ব্রিটিশদের সাথে মিলত না। ভারতীয় ইতিহাসে যাযাবরদের দৃঢ় শিকড় ছিল, বিশেষ করে ধর্মীয় তপস্যার ক্ষেত্রে। দুর্ভাগ্যবশত, ১৮৫৭ সালের ঘটনার জন্য আংশিকভাবে, যাযাবর এবং ভবঘুরেরা তাদের নিজস্ব জীবনযাত্রা চালিয়ে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়েছিল, কারণ ব্রিটিশরা তাদের নিজেদের সুরক্ষা বিষয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগছিল।

বাংলায় উন্মাদ আশ্রমের ইতিহাস মূলত সমগ্র ভারতের মনোরোগ চিকিৎসার ইতিহাসের এক প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে, কারন মানসিক চিকিৎসার সুত্রপাতের ক্ষেত্রে বাংলা ছিল ঔপনিবেশিক শক্তির প্রধান কেন্দ্র । তৎকালীন আমলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জন্য বাংলা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান, অর্থাৎ বৃহৎ পরিসরে কাঠামোগত উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে এই অঞ্চল, এবং উন্মাদ আশ্রম স্থাপিত হয় সেখানে প্রথম। উনিশ শতকের প্রথমদিকে ভারতের গোয়াতে সর্বপ্রথম পর্তুগীজরা “ইউরোপিয়ান” চিকিৎসা পদ্ধতি সূচনা করে, তবে উন্মাদ রোগীদের জন্য একটি পৃথক পাগলাগারদ স্থাপনের সম্পূর্ণ ধারণাটি ছিল ব্রিটিশদের। সুতরাং, বাংলায় উন্মাদ আশ্রমের ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা যায় আসলে মানসিক আশ্রম প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে এই চিকিৎসার আরম্ভ হয় , তার আগে নয়। বাংলায় উন্মাদ আশ্রম চিকিৎসা প্রতিষ্ঠার ইতিহাস এবং লোকহিত-ব্রতের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে প্রায় এক শতাব্দী কিংবা তারও বেশি সময় জুড়ে এর যে ক্রমবিকাশ ঘটেছিল।

## উন্মাদ আশ্রমের ঐতিহাসিক পটভূমি

ভারতে মানসিক রোগীদের আশ্রয়স্থল বা পাগলাগারদ সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় বোম্বেতে (১৭৪৬),তবে ১৭৮০ সালের পূর্বে বাংলায় এ ধরণের কোন স্থাপনার প্রচেষ্টার বিষয়ে তেমন কিছু জানা যায় না। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে সরকারি ভাবে প্রথম উন্মাদ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে ইনসেন অ্যাসাইলাম নামে। বক্সারের যুদ্ধের (১৭৬৪) পর পর বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে দেওয়া হয় এবং ব্রিটিশ ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু তখন মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। ক্ষমতা, রাজস্ব ও কূটনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে বাংলা তৎকালীন সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ শাসন

আমলের প্রথমদিকে, পাগলাগারদ স্থাপন করা হয় সমাজের প্রতিরক্ষার্থে, মানসিক রোগীদের রোগ নিরাময়ের স্বার্থে নয়; এবং মূলত তা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ইউরোপিয়ান সৈন্য এবং কিছু দেশী সিপাহীদের (ভারতীয় সৈন্য) পৃথক করে রাখার জন্য যারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে চাকরিরত ছিল। ভারতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশ এবং এখানকার উষ্ণ আবহাওয়ায় ইংরেজদেরকে খাপ খাইয়ে ব্রিটিশ শাসন আমলের প্রথমদিকে, পাগলাগারদ স্থাপন করা হয় সমাজের প্রতিরক্ষার্থে, মানসিক রোগীদের রোগ নিরাময়ের স্বার্থে নয়; এবং মূলত তা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ইউরোপিয়ান সৈন্য এবং কিছু দেশী সিপাহীদের (ভারতীয় সৈন্য) পৃথক করে রাখার জন্য যারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে চাকরিরত ছিল। নিতে হয়েছিল, কিংবা বলা চলে তারা এখানে মানিয়ে নিতে বাধ্য ছিল। তাছাড়া, তৎকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে তাদের জান-মানের নিরাপত্তা খুব একটা ছিল না, এ সকল বিষয় স্বভাবতই তাদের মানসিক পীড়ার কারণ হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ সময় ও পরিস্থিতিতে পাগলা বা মানসিক রোগীদের জন্য একটি পৃথক আশ্রয়স্থলের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়,

ওয়ারেন হেস্টিং থাকাকালীন সময়ে (১৭৭৩-১৭৮৫), দ্য পিটস ইন্ডিয়া অ্যাক্ট (১৭৮৪) এর সূচনা করা হয় এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সকল কার্যক্রম একটি বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন করা হয়। এই আইন অনুসারে, কোম্পানির সকল কার্যক্রম ও ভারতে এর আধিপত্যের ওপর চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ দেওয়া হয় ব্রিটিশ সরকারকে। কাঠামোবদ্ধ পুনর্গঠন ও পদক্ষেপসমূহ নেওয়া হয় লর্ড কর্নওয়ালিসের আমলে (১৭৮৬-১৭৯৩)। এই আমলেই কলকাতা মেডিকেল বোর্ডের কার্যবিবরণীতে কলকাতার প্রথম প্রতিষ্ঠিত পাগলাগারদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

কোলকাতা মেডিকেল বোর্ডের ১৭৮৭ সালের ৩রা এপ্রিলের কার্যবিবরণীতে শল্যচিকিৎসক জি এম কেন্ডারডাইনের একটি আবেদন পত্র পাওয়া যায়, যিনি ছিলেন পাগলাগারদের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক। সেই একই কার্যবিবরণীতে ১৭৮৭ সালের ২৪শে মে তারিখে উল্লেখ করা রয়েছে এই শল্যচিকিৎসকের প্রয়াণের কথা, তিনি মে মাসের ১৯ তারিখে পরলোক গমন করেন এবং সেখানে তাঁর নাম উল্লেখ করা রয়েছে অপ্রকৃতিস্থ ইউরোপিয়ানদের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক হিসেবে। এই প্রতিবেদন গুলি থেকে জানা যায় যে, নিশ্চয়ই ঐ সময়ে একটি পাগলাগারদের অস্তিত্ব ছিল যা ইউরোপিয়ান রোগীদেরকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করত। পূর্ববর্তী কার্যবিবরণীগুলোয় আরও উল্লেখ

করা আছে যে মিঃ কেন্ডারডাইন মানসিক রোগীদের জন্য আরেকটি ভবন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। মেডিকেল বোর্ড পাগলাগারদের জন্য একটি সাধারণ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সুপারিশ দেয় এবং জনৈক সহকারী শল্যচিকিৎসক উইলিয়াম ডিককে সেই ভবনের দায়িত্ব দেয়, এই তথ্যটি ১৭৮৭ সালের ৭ই মে তারিখের একটি চিঠিতে উল্লিখিত রয়েছে। মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার এটির অনুমোদন দেয়। মিঃ ডিককে প্রতি মাসে ২০০ টাকার পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে, মিঃ ডিক তাঁর নিজের খরচে একটি পাগলাগারদ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবনা দেন। কোম্পানি এর জন্য প্রতি মাসে ৪০০ টাকার ভাড়া দিতে রাজি হয়। মহিলা রোগীদের জন্য আরেকটি ভবন প্রতিষ্ঠা করা হয় যার ভাড়া ছিল প্রতি মাসে ২০০ টাকা। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনে বাংলায় পাগলাগারদপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এদেশীয় প্রজা বা নেটিভদের কথা বিবেচনা করে নয়। প্রধানত ইউরোপীয় শাসক কুলের শরিক , সরকারি কর্মচারী কিংবা ভদ্রবংশীয় সাহেবদের জন্যই পাগলাগারদ।

পলাশির যুদ্ধ , কোম্পানির দেওয়ানি লাভ , পিটের ভারত আইন এবং নানা প্রশাসনিক সংস্কার বাংলায় কোম্পানির । কর্তৃত্বকে সুদৃঢ় করেছিল । কর্ণওয়ালিশের সময় থেকে রাজস্ব আদায়ের সুস্থির কৃৎকৌশল উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে , বিচার ব্যবস্থা , পুলিশী প্রশাসন ও সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পও গৃহীত হয় । যে বঙ্গদেশের অধিবাসীরা এতদিন কোম্পানির বিজনেস পার্টনার বলে পরিচিত ছিল , তারা এখন সম্পূর্ণ ঔপনিবেশিক শাসনে স্রেফ প্রজা বলে গণ্য হলো । এই নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল হিংসার মধ্য দিয়ে । এই নবজাতকের পিতৃত্বের সমূহ গৌরব যে সরকার দাবী করেন তার ক্ষমতার অন্যতম স্তম্ভ হলো এক শৃঙ্খলাবদ্ধ , নিয়ম - নিরঙ্কুশ , অনুগত , বাধ্য সেনাবাহিনী । এই সেনাবাহিনী যত সুশৃঙ্খল হবে , ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব তাতো হবে নিচ্ছিদ্র। বস্তুত সে - কারণেই প্রশাসনিক কঠোরতার দ্বারা ঔপনিবেশিক প্রজাবৃন্দের উপর কঠিন নজরদারির মাধ্যমে গণশান্তি এবং গণশক্তি বজায় রাখা বাংলার কোম্পানির বাণিজ্যস্বার্থের অন্যতম প্রাথমিক পূর্বশর্ত হয়ে দাঁড়ায় ।

কিন্তু যেসব ইউরোপীয় ভারত শাসন করতে এসেছিল, যারা পুলিশী প্রশাসনে খবরদারি করত,যারা সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে কোম্পানির কিংবা মহারাণীর সাম্রাজ্য বিস্তারে সাহায্য করত,

তাদের অধিকাংশই ছিল নিম্ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সাহেব। বিলেতের এইসব তৃতীয় শ্রেণীর সাহেবরাই বাংলায় এসে , স্যুটেড-বুটেড এলিট সেজে নেটিভদের উপর ছড়ি ঘুরিয়েছিল। যারা সত্যিকারের পাক্কা সাহেব, লর্ড পরিবারের ছেলে কিংবা অভিজাত সাহেবদের স্বজনবন্ধু তাদের সঙ্গে এই অজ্ঞাত কুলশীল সেনা পুলিশদের সামাজিক - সাংস্কৃতিক ব্যবধান ছিল দুস্তর। এরা অভিজাত সাহেবদের বরাবরই করুণা ও অবজ্ঞার পাত্র। এদের আচার - আচরণ, রীতিনীতি, সভ্যতা অভিজাত সাহেবদের লজ্জায় অবনত করত[11] । এই সাহেবরা যদি আবার পাগল হয়ে যায় , রাস্তায় রাস্তায় ছেড়া পান্তালন পরে , উস্কোখুস্কো চুলে ঘুরে বেড়ায় , তাহলে নেটিভদের কাছেও এলিট সাহেবদের ইজ্জত থাকে না। কারণ , এরাও নেটিভদের কাছে। বিশুদ্ধ আগমার্কা সাহেবদেরই জাতভাই বলে বিবেচিত হতো।তাই ওদের গর্হিত আচরণ , পাগলামী , ইউরোপীয়দের জাতিগত গৌরব ধারণায় টোল খাইয়ে দেবে। প্রধানত নিম্ন শ্রেণীর ইতর ইউরোপীয় পাগল সেনা পুলিশ বা সাধারণ সরকারি কর্মচারীদের আটক করে রাখতেই তৈরি হয়েছিল বাংলার পাগলাগারদ[12] ।

গোটা উনবিংশ শতক জুড়ে লুনাটিক অ্যাসাইলামের বাৎসরিক প্রতিবেদনগুলিতে মরাল ট্রিটমেন্ট বা নৈতিক চিকিৎসা নিয়ে প্রচুর লেখা পাওয়া যায়। ঔপনিবেশিক কর্তারা মানবিক মূল্যবোধের কথা প্রায়ই লিখতেন [13] , যদিও সে সব প্রয়োগ কমই করতেন । লুনাটিক অ্যাসাইলামগুলিতে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতক জুড়ে এই নতুন চিকিৎসাব্যবস্থা নানাভাবে মানসিক রোগ বিষয়ক ভারতীয় ধারণা (কনসেপ্ট) গুলিকে নানান চাপের মধ্য । দিয়ে ব্রাত্য প্রমাণিত করার

---

[11] ডেভিড আর্নল্ড, ইউরোপিয়ান অরফান্স অ্যান্ড ভ্যাগ্রান্টস ইন ইন্ডিয়া ইন দ্য নাইনটিনথ সেঞ্চুরি ', জার্নাল অফ ইম্পেরিয়াল অ্যান্ড কমনওয়েলথ হিস্ট্রি , VII, ১৯৭৯, পৃ- ১০৬ –১৪ ।

[12] সামন্ত, অরবিন্দ, রোগ রোগী রাষ্ট্র ; উনিশ শতকের বাংলা প্রগ্রেসিভ প্রকাশনী , কলাকাতা , ২০০৪ পৃষ্ঠা – ৪৩- ৪৪

[13] মিলিনজেন, জে,জি; মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট, লন্ডন অ্যাফোরিজমস অন দ্য ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অব দ্য ইনসেন উইথ কনসিডারেশন অন পাবলিক অ্যান্ড প্রাইভেট লুনাটিক অ্যাসাইলাম. উক্ত ম্যানুয়াল টি আনুসরন করে ঔপনিবেশিক শাসকগন ভারতের উন্মাদ আশ্রমের ব্যবস্থাপনা ও চিকিৎসা বিষয়ক নিতী নির্ধারণ করতেন। ম্যানুয়াল টি প্রথম ভারতের ইনস্পেক্টর জেনারেল অফ আর্মি হসপিটাল এর অধিকর্তা আনুসরন করে লুনাটিক আসায়লামে প্রয়োগ করেন।

চেষ্টা করছিল। পঞ্চাশ বছর আগে , এক ভারতীয় মনশ্চিকিৎসক এদেশের মনশ্চিকিৎসার ইতিহাসকে দেখেছিলেন মানসিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ইতিহাস হিসাবে [14] ।

কিন্তু শতক ঘুরতে না ঘুরতেই , ১৮২০ - র মধ্যে ঔপনিবেশিক সরকার বাংলা , মাদ্রাজ আর বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে অনেকগুলি অ্যাসাইলাম তৈরি করে ফেলে। রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো পাগল ও অপরাধীদের এবং নিম্ন বর্গের ইউরেশিয়ানদের জন্য যে , ' লুনাটিক অ্যাসাইলাম ' বা পাগলাগারদ থেকে মেন্টাল হসপিটাল বা মানসিক হাসপাতালের যে যাত্রাপথটি ঔপনিবেশিক শাসন তৈরি করেছিল , তার জ্ঞানচর্চা সংগঠিত হয়েছিল ভিন্নভাবে। ঐ জ্ঞানচর্চার সূত্রপাত যেখানে , অর্থাৎ পশ্চিমে , তার থেকে ভিন্নভাবে ।এই শিফট বা সরে আসার ব্যাপারটা ঘটছে এমন একটা ক্ষেত্রে , যেখানে একটি বিশ্বজনীন জ্ঞানচর্চাকে দাবি করা হচ্ছে উন্নত হিসাবে। কিন্তু সেই স্বঘোষিত উন্নত জ্ঞানচর্চার দাবিকে বোঝাপড়া করতে হয়েছে বিভিন্ন প্রতিরোধের সঙ্গে। এধরনের প্রতিরোধ আসছিল নেটিভ পাগল পুরুষ নারী , এবং সেই সমাজের অনুসৃত নানা সংস্কৃতি থেকে। আর একধরনের প্রতিরোধ ছিল খোদ ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির মধ্যেই।

## ঔপনিবেশিক বাংলার উন্মাদ আশ্রম

প্রাপ্ত প্রাথমিক তথ্য ও বিভিন্ন গৌন উপাদানের ভিত্তিতে আলোচ্য অধ্যায়ের মূল প্রতিপাদ্য ঔপৌনিবেশিক অধ্যায়ে বাংলার উন্মাদ আশ্রম ও মানসিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ইতিহাস আলোকপাত করা ।১৮০০ খ্রীঃ থেকে ১৯৪৭ খ্রঃ পর্যন্ত সময়কালে বাংলার বিভিন্ন উন্মাদ আশ্রম ও মানসিক হাসপাতালগুলির ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি । বিশেষ করে এই অধ্যায়ে অনুসন্ধানমূলক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে উন্মাদ আশ্রমের ইতিহাসকে দুটি পর্বে বিভিক্ত করা হয়েছে । প্রথম পর্বে ১৮০০ থেকে ১৯০০ খ্রীঃ পর্যন্ত ঔপৌনিবেশিক শাসনের উন্মাদ আশ্রম (লুনাটিক অ্যাসাইলাম / ইনসেন অ্যাসাইলাম) এবং দ্বিতীয় পর্বে ১৯০১ থেকে ১৯৫০ খ্রীঃ পর্যন্ত

[14] ভট্টাচার্য, জয়ন্ত সম্পাদিত, ভারতের পটভুমিতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস, অমিত রঞ্জন বসু, পাগলামি বিষায়ক নতুন জ্ঞান' উনিশ শতকের বাংলায় পাগলাগারদের মন চিকিৎসা চর্চা, অবভাস, কোলকাতা ,২০০৯ পৃষ্ঠা - ২০২

মানসিক হাসপাতাল ( মেন্টাল অ্যাসাইলাম/ মেন্টাল হসপিটাল ) কেন গড়ে উঠেছিল তা আলোচনা করেছি ।

প্রথম পর্বে (১৮০০-১৯০০ খ্রীঃ) ডিকের পাগলা গারদ ( ১৮০৪ ), বিয়ার্ডস্মোরের উন্মাদ আশ্রম ( ১৮১৭), রসা উন্মাদ আশ্রম (১৮০৫) দুলান্দা নেটিভ ইনসেন্স অ্যাসাইলাম (১৮৪৭) , ভবানীপুর মেন্টাল অ্যাসাইলাম ( ১৮৫৫ ), ঢাকা লুনাটিক অ্যাসাইলাম (১৮১৫ ) , পাটনা লুনাটিক অ্যাসাইলাম (১৮২১) , মেসমারিক হাসপাতাল (১৮৪৫), হাজারিবাগ উন্মাদ আশ্রম (১৮৭৬ ) ময়দাপুর লুনাটিক অ্যাসাইলাম (১৮৭৬) ও বহরমপুর লুনাটিক অ্যাসাইলাম (১৮৮৬) , ইত্যাদী বিষয়গুলির প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে ।

দ্বিতীয় পর্ব[১৫] ( ১৯০১-১৯৫০ খ্রীঃ ) বঙ্গ দেশে উন্মাদ আশ্রমের বদলে যে মানসিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তার ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে । এক্ষেত্রে *Indian Lunacy Policy-*1856 , *I Indian Lunacy Act-* ১৮৫৮ এবং *Indian Lunacy Act-* ১৯১২ ইত্যাদি বিষয়গুলি  পরিপেক্ষিতে উন্মাদ আশ্রম ও মানসিক হাসপাতালের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং বিভিন্ন উন্মাদ আশ্রমের স্থানান্তরনের বিষয় ও নতুন মানসিক হাসপাতাল কোথায় কোথায় স্থাপিত হয়েছিল সেগুলি কালানুক্রমিক অনুসারে পর্যালোচনা করেছি । যেমন - কেন্দ্রীয় মানসিক হাসপাতাল , রাঁচি ( ১৯১৮) , গোবরা লেপার হাসপাতালের  মানসিক ওয়ার্ড (১৯১৬) বঙ্গীয় উনাদ আশ্রম ( ১৯৩৫) , পরবর্তীকালে দত্তনগর মেন্টাল হাসপাতাল) , কোলকাতা মেডিকেল কলেজ - মনচিকিৎসা বিভাগ ( ১৯৩৩ ) , মানকুন্ডু মেন্টাল হাসপাতাল ( ১৯৩৩ ) , গোবরা লেপার অ্যাসাইলামে মানসিক ওয়ার্ড (১৯১৬ ) , লুম্বনী পার্ক মেন্টাল হাসপাতাল (১৯৪০) , ইত্যাদী হাসপাতালগুলির ঐতিহাসিক বিবরণ আলোকিত করেছি। সর্বপরী ঔপৌনিবেশিক শাসনতন্ত্রে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও চিকিৎসা পদ্ধতির সঙ্গে লুনাটিক অ্যাসাইলাম ও মেন্টাল হাসপাতালের যে সম্পর্ক তা উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি ।

---

[15] তৃতীয় অধ্যায়ে পূর্ণ ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে ( দ্বিতীয় পর্বে) , আলোচনার সুবিধার্থে এখানে স্বল্প পরিসরে আলোকিত করা হয়েছে।

## ঔপৌনিবেশিক বাংলার উন্মাদ আশ্রমপ্রথম পর্যায়

## ডিকের উন্মাদ আশ্রম (১৮০৪ খ্রীঃ )

উন্মাদ আশ্রমের ইতিহাসে, ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে ডিকের উন্মাদ আশ্রম টি সর্বপ্রথমে উল্লেখ করা যেতে পারে। ডিক সাহেব একজন জেনারেল ফিজিসিয়ান, পাশাপাশি মানসিক চিকিৎসা বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন, ঔপনিবেশিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের আগমনের সুত্রে চিকিৎসা সেবা দানের জন্য ভারতে আসেন। তবে ইংরেজ সৈন্যদের চিকিৎসার জন্য তিনি মুলত নিয়োজিত ছিলেন [16]। উনিশ শতকের পূর্ববর্তী সময়ে, বঙ্গদেশে যেসব ইউরোপীয় ব্যক্তিদের ঔপনিবেশিক শাসকগণ পাগল বলে মনে করত তাদের মিঃ কেন্ডারাইন এর বেসরকারী উন্মাদাশ্রমে পাঠানো হতো। উনিশ শতকের প্রথম দশক থেকে কেন্ডারাইন এর বেসরকারী আশ্রমের মতো ডিকের উন্মাদ আশ্রমটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। মানসিকভাবে অসুস্থ অধিকাংশ ব্যক্তিদের, বিশেষ করে যদি কেউ অ-ইউরোপীয় অথবা নিম্ন -শ্রেণীর হতেন, তাদের সমাজ থেকে আলাদা করে রেখে দেওয়া হতো, অথবা তাদের জেলে বা সামরিক রেজিমেন্টের হাসপাতালে রাখা হতো। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে, অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জেন উইলিয়াম ডিক, যিনি পরবর্তীকালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক্সামিনিং ফিজিশিয়ান (মূখ্য পরীক্ষক চিকিৎসক) হয়েছিলেন, তিনিই প্রথম এই মানসিক রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করতে এগিয়ে আসেন এবং ব্যক্তিগত ভাবে ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে একটি প্রাইভেট উন্মাদ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ডিক সাহেব অ্যাসাইলাম প্রতিষ্ঠা করার জন্য বাড়ি ভাড়া নেয়, যার মাসিক ভাড়া ২০০ টাকা [17]। পরবর্তী কালে তিনি নিজেই একটি বাড়ি তৈরি করেন এবং কম্পানির কাছে থেকে ওই উন্মাদ আশ্রমের জন্য ৪০০ টাকা বাড়ি ভাড়া নিতেন[18], এবং তাঁর এই বেসরকারী উন্মাদাশ্রমটির ইজারা প্রদান করতে সম্মত হন বাংলার

---

[16] বন্দ্যোপাধ্যায় গৌতম কুমার, মলয় ঘোষাল, গৌতম সাহা, এবং ওম প্রকাশ সিং, হিস্টোরি অফ সাইকিয়াট্রি ইন বেঙ্গল , ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ সাইকিয়াট্রি। ২০১৮ ফেব্রুয়ারী; ৬০(Suppl ২), S১৯২-S১৯৭

[17] বসু ,আমিতরঞ্জন ; ভুঁই ফোরের মনো বিদ্যা চর্চা , চর্যাপদ , কোলকাতা , পৃষ্ঠা -১৩৩

[18] ভট্টাচার্য, জয়ন্ত সম্পাদিত , ভারতের পটভুমিতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস, অমিত রঞ্জন বসু, পাগলামি বিষায়ক নতুন জ্ঞান' উনিশ শতকের বাংলায় পাগলাগারদের মন চিকিৎসা চর্চা ,অবভাস, কোলকাতা ,২০০৯ পৃষ্ঠা নং ২১১

সরকারকে। এর ফলে, কোম্পানির মানসিকভাবে অসুস্থ কর্মীদের ডিক-এর উন্মাদাশ্রমে পাঠানো কিছু কালের জন্য একটি প্রথা হয়ে উঠেছিল[19]।

১৮১৮ সাল অবধি ডিক তাঁর প্রতিষ্ঠিত পাগলাগারদে কর্মরত ছিলেন এবং ১৮২১ সালে তাঁর প্রয়াণের পর, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট অফ ডিরেক্টরস এই পাগলাগারদ বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। আজ ডিকের পাগলাগারদের সঠিক অবস্থান খুঁজে পাওয়া বেশ মুশকিল, সম্ভবত এটি কলকাতায় বর্তমান শেঠ সুখলাল করনানি মেমোরিয়াল হাসপাতালের দক্ষিণ-পশ্চিমের কোন একটি স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল [20]। কোর্ট অফ ডিরেক্টরের পাগলাগারদ বন্ধ করে দেওয়ার মাধ্যমে এই চিকিৎসা সেবার পথ বন্ধ করে দেওয়ার অভিপ্রায় হয়ে উঠে এবং ইউরোপিয়ান রোগীদেরকে তাদের শীতল আবহাওয়ার মাতৃভূমিতে ফিরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও, মেডিকেল বোর্ড তাৎক্ষণিকভাবে তাদেরকে অন্য হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করতেন।

## বিয়ার্ডস্মোরের উন্মাদ আশ্রম (১৮১৭ খ্রীঃ )

মিঃ আই. বিয়ার্ডস্মোর নামক একজন চিকিৎসক যিনি, ডিকের পাগলাগারদে প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন,এবং তিনি ভবানীপুরে প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে ১৮১৭ সালে একটি প্রাইভেট পাগলাগারদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৮১৭ সালে , শুধু ইউরোপিয়ানদের জন্য আর একটি পাগলাগারদ গড়ে তোলা হয় কলকাতায় । এর অস্তিত্ব আজও রয়েছে , পি জি হাসপাতালের পিছনে “ইনস্টিটিউট অফ সাইকিয়াট্রি” নামে আজ থেকে বছর পঞ্চাশ আগে এক ভারতীয় মনশ্চিকিৎসক এই পাগলাগারদটি সম্পর্কে লিখেছিলেন, ১৮১৭ সালে সার্জেন্ট বিয়ার্ডস্মোর কলকাতায় একটি লুনাটিক অ্যাসাইলাম প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেন । বিয়ার্ডস্মোর সরকারি লুনাটিক অ্যাসাইলামের সুপারিন্টেডেন্ট ছিলেন কিন্তু কলকাতার যে নতুন পাগলাগারদটি

---

19 ওয়াল্ট্রাউড আর্নস্ট, মেডিক্যাল/কোলোনিয়াল পাওয়ার - লুনাটিক অ্যাসাইলামস ইন বেঙ্গল, c . ১৮০০-১৯০০ জার্নাল অফ এশিয়ান হিস্টোরি, ভলিউম- ৪০, নঃ - 1 (২০০৬) হ্যারাসোভিটজ ভার্লাগ, পৃ- ৫০

20 বন্দ্যোপাধ্যায় গৌতম কুমার, ঘোষাল মলয়, সাহা গৌতম অ্যান্ড সিং ওম প্রকাশ, হিস্টোরি অফ সাইকিয়াট্রি ইন বেঙ্গল ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ সাইকিয়াট্রি । ২০১৮ ফেব্রুয়ারী; ৬০(*Suppl ২*): S১৯২-S১৯৭, *Medknow* পাবলিকেশন। পৃ- ২

ছিল তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এটা পুরোপুরি ইউরোপিয়ানদের জন্য ছিল[21]। সরকার এর ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ খরচ বহন করত আর ছয়ভাগের একভাগ, খরচ আসত প্রাইভেট রোগীদের কাছ থেকে। বিয়ার্ডস্মোর ৬ জন রোগী নিয়ে শুরু করে, দ্রুত ৫০- ৬০ জন রোগীর ব্যবস্থা করে ফেলেন। পাগলাগারদটির মূল বাড়িটা ছিল মাঝখানে যার চারধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল ব্যারাকগুলি ; কারণ পরিকল্পনা ছাড়াই এগুলো একটার পর একটা যোগ করা হয়েছিল জনসাধারণের প্রয়োজনের জন্য । পরিদর্শকরা এর পরিচ্ছন্নতা এবং আলো - হাওয়া চলাচল ব্যবস্থার প্রশংসা করতেন। সুন্দর বাগানসহ ছিল এক তাজা পরিবেশ[22]। রোগীরা স্বাচ্ছন্দ্যে থাকত এবং বেশ হাসিখুশি দেখাত। পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন একজন ইউরোপিয়ান সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং একজন স্টুয়ার্ড। পুরুষ রোগীদের দেখাশোনা করত একজন অ্যাপোথেকারি আর মেয়েদের জন্য একজন মেট্রন। বাঁধনের ব্যবস্থা থাকলেও সেগুলি তত ভয়ানক ছিল না। উত্তেজিত রোগীদের মরফিয়া , আফিং আর উষঃ-স্নান দিয়ে চিকিৎসা করা হত। কখনো কখনো শক-থেরাপি দিয়েও চিকিৎসা করা হত , তবে কোন সারজিক্যাল পদ্ধতিতে রক্ত বার করার কোন চিকিৎসা করা হত না । ক্রনিক রোগীদের মাঝে মধ্যে উত্তেজনাহলে তাদের গায়ে ফোসকা- তৈরি করে। চিকিৎসা করে এই উত্তেজনার সময় সীমা কমানো হত[23]।

কলকাতার ইউরোপীয় উন্মাদাশ্রম ও নেটিভ উন্মাদাশ্রম ছাড়াও, কিছু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ছিল, যেখানে মূলত ইউরোপীয়রা যেতেন, যাঁদের কোম্পানির সাথে সম্পর্ক ছিল না অথবা যাঁরা নিম্নশ্রেণীর সৈনিক বা নাবিকদের সাথে একই সাথে থাকা পছন্দ করতেন না। বিয়ার্ডসমোর, ১৮২১ থেকে ১৮৪০ যিনি কলকাতার ইউরোপীয়ান উন্মাদাশ্রমের মালিক ছিলেন, তিনি "সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ শ্রেণীর" উন্মাদ রোগীদের নিয়ে নিজস্ব উন্মাদাশ্রম শুরু করেছিলেন, সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার আগে। এছাড়াও সরকারি আশ্রম গুলিতে অনেক সংখ্যক মানসিকভাবে অসুস্থ রোগী থাকতেন ফলে রোগী রা তেমন ভালো পরিষেবা পেতেন না । সাধারণ উন্মাদাশ্রমে তাদের রোগীর পরিজন ও আত্মীয়রা রাখার জন্য অনীহা প্রকাশ করতেন।

---

[21] বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌতম। হিস্টোরি অফ সাইকিয়াট্রি ইন বেঙ্গল, ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ সাইকিয়াট্রি, ২০১৮;(supple-২): ১৯২,

[22] আর্নস্ট, ওয়াল্ট্রাউড; ম্যাড টেলস ফ্রম দ্য রাজ: কলোনিয়াল সাইকিয়াট্রি ইন সাউথ এশিয়া, ১৮০০-৫৮, রটলেজ, লন্ডন, পৃ-54

[23] ভট্টাচার্য, জয়ন্ত সম্পাদিত , ভারতের পটভুমিতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস, অমিত রঞ্জন বসু, পাগলামি বিষায়ক নতুন জ্ঞান' উনিশ শতকের বাংলায় পাগলাগারদের মন চিকিৎসা চর্চা ,অবভাস, কোলকাতা ,২০০৯ পৃষ্ঠা নং ২১১

উনবিংশ শতাব্দী ধরে চেষ্টা চলেছিল ইউরোপীয় উন্মাদাশ্রমের বাসিন্দাদের অবস্থা যাতে উন্নতি করা যায়। ১৮১৭ সালে কলকাতা থেকে দুই মাইল দূরে একটি নতুন বাড়ি তৈরি করার সুপারিশ করা হয়েছিল[24] । এই প্রস্তাব নির্ভর করেছিল একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জেনকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়োগ, যা সরকারের খরচ কমাতে হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবে বেসরকারী উন্মাদাশ্রম মালিকের স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করেছিল। ইউরোপীয় যে সব মানুষেরা মানসিকভাবে অসুস্থ ছিল তাদের ইংল্যান্ডে পাঠানোর জন্য বলা হয়েছিল এবং একটি ছোটো আকারের "হাউজ অফ রিসেপশন" রাখা হয়েছিল যাতে মধ্যবর্তী সময়ে রোগীদের পরিচর্যা করা যায় [25]। এই বেসরকারী উন্মাদাশ্রমে, যাকে পরবর্তীকালে " "বিয়ার্ডসমোরস বেডলাম " বলা হতো, সেখানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৮২১ সাল থেকে উন্মাদদের পাঠাতো। মিঃ আই. বিয়ার্ডসমোর, একজন প্রাক্তন সৈনিক এবং পরবর্তী কালে প্রাথমিকভাবে সরকারী উন্মাদাশ্রম কর্তা, এই প্রতিষ্ঠানটিকে চালাতেন তাঁর একমাত্র আয়ের উৎস হিসাবে। তিনি ১৩ টি ঘর সরকারের প্রেরিত উন্মাদদের জন্য সংরক্ষিত রেখেছিলেন এবং সেগুলির জন্য তিনি সরকারী উন্মাদাশ্রমে প্রচলিত হারের চেয়েকম অর্থ নিতেন, কিন্তু তবুও সেই অর্থ ইংল্যান্ডে প্রচলিত গড় হারের চেয়ে বেশি ছিল [26]। আসলে তিনি যে অর্থ নিতেন তা তৎকালীন কলকাতার উৎকৃষ্ট হোটেল, স্পেন্স এর মতো ছিল কিন্তু এটিও বলা হয়েছিল যে সেই খানেই, দুর্ভাগ্যবশত, তুলনাটি শেষ হয়ে যায় [27]।

বিয়ার্ডস্মোর একটি মেডিকেল বোর্ডে প্রস্তাব রাখেন যে কোম্পানির অধীনে উচ্চবিত্ত রোগীদের জন্য প্রতি মাসে ১০০ ভারতীয় রুপি ও নিম্নবিত্ত রোগীদের জন্য প্রতি মাসে ৫০ ভারতীয় রুপির বিনিময়ে সেবা দেওয়া হোক। বোর্ড এই প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করে যেহেতু তাদের আনুমানিক হিসেবের চেয়ে এর খরচ অনেক কম ছিল। ১৮২১ সালের ১৫ই জুন, পাঁচ জন ইউরোপিয়ান রোগীকে বিয়ার্ডস্মোর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় । এই উন্মাদ আশ্রম শুধুমাত্র ইউরোপিয়ান

---

[24] ওয়াল্ট্রাউড আর্নস্ট, মেডিক্যাল / কলোনিয়াল পাওয়ার- লুনাটিক অ্যাসাইলামস ইন বেঙ্গল, সি. ১৮০০-১৯০০, জার্নাল অফ এশিয়ান হিস্ট্রি, ভলিউম- ৪০, নং- 1 (২০০৬), পৃ- ৫৪

[25] তদেব, পৃষ্ঠা – ৫৫

[26] মিলস, এইচ. জেমস, ম্যাডনেস, ক্যানাবিস অ্যান্ড কলোনিলিয়ালিজম। দ্যা ন্যাটিভ-অনলি লুনাটিক এসাইলাম অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া ১৮৫৭-১৯০০, ম্যাকমিলান প্রেস, লন্ডন

[27] ওয়াল্ট্রাউড আর্নস্ট, মেডিক্যাল / কলোনিয়াল পাওয়ার- লুনাটিক অ্যাসাইলামস ইন বেঙ্গল, সি. ১৮০০-১৯০০, জার্নাল অফ এশিয়ান হিস্ট্রি, ভলিউম- ৪০, নং- 1 (২০০৬), পৃ- ৫৪

রোগীদের জন্যই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। নিম্নবিত্ত গরীব রোগীদের সাথে সাথে সেখানে কিছু প্রাইভেট রোগীও ছিল। প্রাথমিকভাবে, রোগীদের সংখ্যা ১২ জনেরও কম ছিল তবে খুব শীঘ্রই তা ৫০-৬০ ছাড়িয়ে যায়[28]। সেই হাসপাতাল একটি কেন্দ্রীয় ভবন এবং মনোমুগ্ধকর বাগান দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। রোগীরা তাদের সেবা নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল; কর্মীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন একজন সুপারইন্টেন্ডেন্ট, ওষুধ প্রস্তুতকারী, মহিলা তত্ত্বাবধানকারী প্রভৃতি। এই সেবা নিয়ে সকলে সন্তুষ্ট থাকলেও মিঃ বিয়ার্ডস্মোর মোটেও খুশি ছিলেন না, কেননা এ ধরণের সেবা এতোটাই ব্যয়বহুল ছিল যে তাঁর একার পক্ষে তা বহন করা সম্ভব হচ্ছিল না। জানা যায়, এরপর আগামী ৩০ বছর বা তারও বেশি সময়ে এই হাসপাতাল নিয়ে প্রচুর বাদানুবাদ হয়েছে এবং বিয়ার্ডস্মোরের তরফ থেকে পাগলাগারদের জন্য অনুমোদিত অর্থ উত্তোলনের জন্য বার বার আবেদন করা হয়েছে।

যদিও কর্তৃপক্ষ আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল সেই প্রতিষ্ঠান ও তার খরচকে অল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে, কিন্তু রোগীদের সংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাওয়ায় ও সাথে দীর্ঘকালীন উন্মাদদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সেই খরচ ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। অপর দিকে সেই উন্মাদাশ্রমের অধিকাংশ রোগীরা ছিল "ইউরোপীয় অভ্যাস"-এর, ফলে ব্যয় ভার চালানো নিয়ে নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়। ১৮৫২ সালে বিয়ার্ডসমোরের উন্মাদাশ্রমে সরকারী তদন্তের ফলে দেখা যায় যে সেটির নৈতিক পরিচালনা ও আরোগ্যের দক্ষতাগুলি সম্পূর্ণ অচল। এই প্রসঙ্গে সুপারিশ করা হয়েছিল যে একটি সরকারী উন্মাদাশ্রম স্থাপণ করা উচিত, যার তত্ত্বাবধান করবেন ইংল্যান্ড থেকে আগত একজন বিশেষজ্ঞ, যিনি "এই সব হতভাগ্যদের সুবিধার্থে সেই স্থানে বেশ কিছু সময় ধরে প্রচলিত থাকা উৎকৃষ্ট পরিচালনা ও পরিচর্যার পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবেন"[29]। উন্মাদাশ্রমের বাড়িটি বিয়ার্ডসমোরের বিধবার কাছ থেকে কেনা হয়েছিল এবং সেখানে স্থিত রোগীদের রাখা হয়েছিল একজন নতুন সার্জেনের চিকিৎসা-পরিচর্যায় ও বিয়ার্ডসমোরের বিধবার সেবা-যত্নে[30]। নতুন

---

[28] রয়, পোর্টার, উইলাম এফ.বাইনাম, মাইকেল শেফার্ড, দ্য অ্যানাটমি অফ ম্যাডনেস: ইজি ইন দ্য হিস্ট্রি অফ সাইকিয়াট্রি, ভলিউম-১, রটলেজ, ১৯৮৮, পৃ- ৫৪

[29] জি . এ. বেরিয়াস, হিউ লিওনেল ফ্রিম্যান, গ্যাসকেল, ৫০ এয়ারস অফ ব্রিটিশ সাইকিয়াট্রি, ১৮৪১-১৯৯১ মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্ট ১৯৯১, পৃ - ১৫৫

[30] ক্রিশ্চিয়ান হার্টাক, শেঠ অ্যান্ড মহাজন, সাইকোয়ানালাইসিস ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০১ – পৃ- ২৬

সুপারিন্টেন্ডেন্ট এই প্রকার একটি উন্মাদাশ্রম প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, যখন তিনি পেনাংয়ে ১৮৪০-এর দশকে একটি উন্মাদাশ্রমের দায়িত্বে ছিলেন এবং তিনি ফ্রান্সের বিসেত্রে-তে অনুসৃত চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন[31] ।

বিয়ার্ডসমোর, ১৮২১ থেকে ১৮৪০ যিনি কলকাতার ইউরোপীয়ান উন্মাদাশ্রমের মালিক ছিলেন, তিনি "সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর" বেসরকারী রোগীদের নিয়ে নিজস্ব উন্মাদাশ্রম শুরু করেছিলেন, সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার আগে। এছাড়াও অনেক সংখ্যক মানসিকভাবে অসুস্থ মানুষ তাদের বন্ধু ও আত্মীয়দের সাথে থাকতেন। যেমন মেডিকাল বোর্ড ব্যাখ্যা করেছিল, "স্বাভাবিক স্নেহবশত এবং সাধারণ উন্মাদাশ্রমে তাদের আত্মীয়দের রাখতে অনীহা, তা সে যত ভালোভাবেই পরিচালিত হোক না কেন, এই কারণেই রোগীদের তাঁরা নিজেদের পরিবারে রাখতেন।

## রসা উন্মাদ আশ্রম- উত্তর ২৪ পরগনা (১৮০৫ খ্রীঃ)

ঔপনিবেশিক বাংলার নেটিভ উন্মাদ আশ্রমের ইতিহাসে সর্বপ্রথম যে আশ্রমের নাম উচ্চারিত হয় সেটি হলো রসা উন্মাদআশ্রম। এটি ১৮০৫ খ্রিঃ ২৪ পরগনার সেন্ট্রাল জেলের নিকটবর্তী ও রসা নামক রোডের  পার্শ্ববর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল[32]। রসা উন্মাদ আশ্রমটি প্রথম দিকে ব্যাক্তিগতমালিকানার ভিত্তিতে গড়ে ওঠেছিল এবং স্থানীয় ধনী ব্যাক্তিরা এই উন্মাদ আশ্রমে গৃহনির্মাণের জন্য অর্থ দিয়ে সাহায্যে করেন [33]। ১৮১৫ খ্রিঃ এই হসপিটালে সংস্কারের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হয়। পুরোনো বিল্ডিং এর পাশাপাশি উন্মাদ রোগীদের জন্য কয়েকটি কক্ষ নির্মাণ করা হয় [34]। কিন্তু এই স্থান টি মানসিক রোগীদের জন্য ততোটা সুবিধা জনক ছিল না , কারন অস্বাস্থকর পরিবেশ ও জন সঙ্কুলান এর উপযুক্ততা নিয়ে সকারী কর্মচারীদের মধ্যে সংশয় দেখা দেয় , তাই

---

[31] রয় পোর্টার, উইলিয়াম এফ. বাইনাম, মাইকেল শেফার্ড, দ্য অ্যানাটমি অফ ম্যাডনেস: এসেস ইন দ্য হিস্ট্রি অফ সাইকিয়াট্রি, ভলিউম - ১ । রটলেজ,১৯৮৮, পৃ- ৫৪

[32] ডাব্লু.বি.এস.এ জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্ট, ক্রিমিনাল ব্রাঞ্চ  প্রসিডিংস, নম্বর ১৭ - ২০,১৮০৪,লেটার সেন্ট বাই জর্জ ডাউডেসওয়েল, সেক্রেটারি টু দ্যা গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল, ক্যালকাটা পুলিশ অফিস, আগস্ট ১৮০৪

[33] অণুবীক্ষণ পত্রিকা,১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, অগ্রাহায়ন, ১২৮২ বঙ্গাব্দ , পৃষ্ঠা -১৬৬

[34] ডাব্লু.বি.এস.এ জুডিশিয়াল প্রসিডিংস, ক্রিমিনাল ব্রাঞ্চ, ফেব্রুয়ারি ১৮১৫, লেটার ফ্রম এইচ. ইয়াং, সার্জেন টু দ্য ইনসেন হসপিটাল টু জন ইলিয়ট, ম্যাজিস্ট্রেট অফ দ্যা সাবারবস অফ কলকাতা, ডেট ১১ জুলাই ১৮১৫, ডাব্লু বি.এস.এ।

রসা উন্মাদ আশ্রম স্থাপনের কয়েক বছরের মধ্যেই মেডিকেল বোর্ডদের অধিকর্তারা উন্মাদ আশ্রমটির পরিবেশ নিয়ে বিভিন্ন ভাবনা ছিন্তা শুরু করে[35]। রসা উন্মাদ আশ্রমটি দীর্ঘ ২৫বছরের তথ্য রয়াল স্টাটিসটিক্যাল ইন্সটিটিউট প্রদান করেছেন, পরিসংখ্যান তথ্যের ভিত্তিতে (১৮১৬-১৮৪০)। কিন্তু ১৮১৬ সালের পূর্ববর্তী সময়ে এই উন্মদ আশ্রমে রোগীদের আনাগোনা ছিল। পরবর্তী কালে ক্রমশ স্থান সংকুলান ও অন্যান্য পরিচর্যার সুবিধার জন্য এই আশ্রমটি ১৮৪৭ খ্রিঃ ফোর্ট উইলিয়াম নিকটবর্তী নাগাদ দুলান্দাতে নামক স্থানে স্থানান্তরন করা হয় [36]।

১৮৪০ সালে, ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যান্ড বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির চারটি উন্মাদ আশ্রম যথা ২৪ পরগনার রসা উন্মাদ আশ্রম, মুর্শিদাবাদ,ঢাকা এবং পাটনার উন্মাদ আশ্রমের অবস্থা ও পরিচালনা সম্পর্কে রিপোর্ট চেয়েছিলেন। বিজ্ঞপ্তিযুক্ত একটি চিঠি জারি করা হয়েছিল যার দ্বারা জানতে চাওয়া হয় রোগীদের সংখ্যা, হাসপাতালগুলির নির্মাণ, সংগঠন ও পরিচালনা, রোগীদের বিনোদন ও পেশার জন্য নিযুক্ত পদ্ধতি এবং নিরাময়ের হার এবং মৃত্যুর হারের বিষয়টি । জমা দেওয়া প্রতিবেদনে হাসপাতালের অবস্থা এবং রোগীদের চিকিতসা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ১৮৪৪ সালের ১ ই জানুয়ারী রসা পাগলা গারদে প্রতিবেদনে, ২৪ পরগনার সিভিল সার্জন এফ.পি.স্ট্রং মানসিক রোগে আক্রান্ত রোগীদের চিকিতসা ও সহায়তা করার জন্য একটি পদ্ধতিহিসাবে বিনোদন এবং কর্মসংস্থান প্রদানের মাধ্যমে বোটানিকাল ক্রিয়াকলাপগুলির যুক্ত হওয়ার বিবরণ দিয়েছেন। বাগানে কাজ করা ও বিভিন্ন অনুশীলন পাগলদের মানসিক পরিবর্তন ঘটাবে, এই উদ্দেশ্যে রসা উন্মাদ আশ্রমে বিশাল আকারের বাগিচার তৈরির কার্যকলাপ সম্পন্ন করা হয়।

---

[35] মেডিক্যাল বোর্ড প্রসিডিংস, জানুয়ারী ১৮১১, লেটার সেন্ট টু মিস্টার টাকার, সেক্রেটারি টু গভর্নমেন্ট, পাবলিক ডিপার্টমেন্ট বাই আই. ফ্লেমিং, ফাস্ট মেম্বার, মেডিক্যাল বোর্ড, ডেট ১ জানুয়ারী ১৮১১, এন এ আই ,

[36] এনুয়াল রিপোর্টস অ্যান্ড রিটার্ন অফ ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল ফর দ্যা ইয়ার অফ ১৮১১, হোম-মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্ট।

# রসা উন্মাদ আশ্রমের সাইট প্লান -১৮৪১

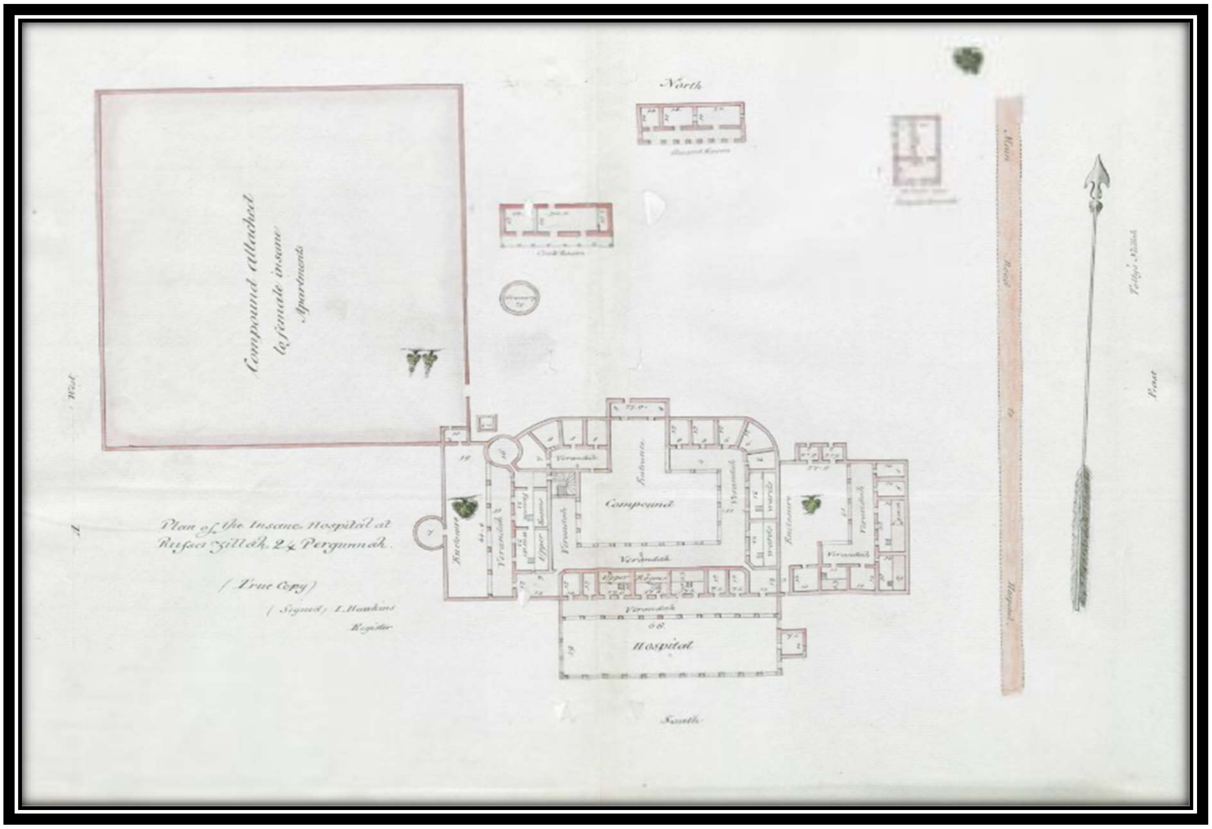


**রসা উন্মাদ আশ্রমের সাইট পরিকল্পনার নকশা**

পাগলদের জন্য স্থানীয় হাসপাতালের পরিদর্শক ডব্লিউ রাসেল কর্তৃক প্রতিবেদন, ২৪ পরগণা, সেশন জর্জ , জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্ট , গভর্নমেন্টঅফ ইন্ডিয়া, বোটানিক্যাল গার্ডেনের প্রতিবেদন-পাগল দের জন্য বাগান তৈরির নথি থেকে সংগৃহীত [37].

[37] আই ও আর/এফ/৪/২০৪২/৯২৯৫৭, ডিজিটালাইজড ম্যানুক্রিপ্টস ফাইল ।

উন্মাদ আশ্রমে স্বেচ্ছাসেবী ভিত্তিতে পাগলদের জন্য কিছু বিনোদন বা কর্মসংস্থান রোগীদের নিযুক্ত করা হতো। তবে রসা উন্মাদ আশ্রমে চাষ করা বোটানিকাল পণ্যের বিভিন্ন নমুনাগুলি এবং বীজগুলির ইংল্যান্ডে পাঠানো হয়েছিল এবং এছারাও সমগ্র ভারতজুড়ে অন্যান্য কৃষকদের কাছে বিতরণ করা হয়েছিল বিশেষ করে চাষের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সফল হয়েছিল। হাসপাতালের উদ্যানগুলিতে রোগীদের চাষ করা বা পরীক্ষিত পণ্যগুলির মধ্যে ছিল কফি, বিভিন্ন জাতের তুলা, আখ, তুঁত, অ্যালোভেরা ইত্যাদির মতো কিছু কৃষিজ ফলন । ডাঃ স্ট্রং জানিয়েছেন যে রোগীরা সাফল্যের সাথে চাষ করেছেন এবং এর বীজ কৃষি সোসাইটিতে প্রেরণ করা হয়েছিল, এবং ভারত জুড়ে বিতরণ। এছারাও তিনি বিদেশেও প্রচুর পরিমাণে বীজ প্রেরণ করেছিলেন [38]।

## রসা উন্মাদ আশ্রমের রোগীদের পরিসংখ্যা

১৮৪৪ খ্রি. বাংলার উন্মাদ চিকিৎসালয়ের পরিসংখান তথ্য এর প্রতিবেদন অনুযায়ী সমগ্র বাংলাতে মোট ৪ টি উন্মাদ আশ্রমের উল্লেখ পাওয়া যায় [39] রসা উন্মাদ আশ্রম টি এর মধ্যে সর্বধিক উল্লেখযোগ্য। লেফটেন্যান্ট কর্নেল ড.ঐ. ঝুশবং। তিনি ২৫ বছরের ( ১৮১৬ু১৮৪০) তথ্যভিত্তিক ভিত্তিতে এক পরি সংখ্যান হিসাব করেন। তিনি রসা পাগলা আশ্রমের মোট ৩১৪৩ টি উন্মাদের পরিসংখ্যা দিয়েছেন [40]। উক্ত পরিসংখ্যান থেকে আমার তৎকালীন বাংলার রসা উন্মাদ আশ্রমের যে কত সংখ্যক পাগল কে আটক করে রাখা হতো তার সুস্পষ্ট পরিচয় পায়।

---

[38] আই ও আর/এফ /৪/২০৪২/৯২৯৫৭, ডিজিটালাইজড ম্যানুক্রিপ্টস ফাইল, ইনসেন হসপিটাল, রসা, জিলাহ ২৪ পরগনাস, দ্যা করেস্পন্ডেন্স রিপোর্টিং অন দ্যা কন্ডিশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অফ দিজ হসপিটাল ক্যান বি ফাউন্ড ইন দ্যা ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস , দ্যা রিপোর্টিং বাই ডক্টর স্ট্রং- অন দ্যা গার্ডেন এট রুষা হ্যাজ বিন ডিজিটালাইজড অ্যাজ পার্ট অফ দ্যা বটানি ইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া প্রোজেক্ট

[39] স্ট্যাটিস্টিকস রিপোর্ট অফ দ্যা হসপিটাল ফর দ্যা ইনসেন আন্ডার দ্যা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, ডব্লিউ এইচ সাইকস, রয়্যাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল সোসাইটি, লন্ডন, ১৮৪৪

[40] স্ট্যাটিস্টিকস রিপোর্ট অফ দ্যা হসপিটাল ফর দ্যা ইনসেন আন্ডার দ্যা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, ডব্লিউ এইচ সাইকস, রয়্যাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল সোসাইটি, লন্ডন, ১৮৪৪

## রসা উন্মাদ আশ্রমের দীর্ঘ ২৫ বছরের (১৮১৬-১৮৪০ খ্রীঃ) রোগীদের পরিসংখ্যা[41]

| Years. | Number of patients at the end of each year | Number of Admission | Annual Expense | Remark by Medical Officer in Charge |
|---|---|---|---|---|
| | | | Rupees | *Sometime after I had been in charge of the establishment, I found the drainage behind the southern apartments so bad, and the room so damp, that, after consulting the builders, Messrs. Goss and Shadwell, who made a plan of the asylum, which has been lost in some of the public offices, I reported upon it. The result was the making a compound south of the building, and changing the doors from the north side to the opposite, which was a considerable improvement ns fur as airiness and dryness were concerned; but the drainage is still very bad, and the water not running off readily, it is difficult to keep the ground-floor clean. Join Master, the magistrate, and myself, in 1832, to get the entire floors repaired, finding a difficulty in getting it done, with the consent of that gentle- man I procured bamboos, and the insane them- selves made their own mutchans of them, being split and tied together for that purpose. Those answered tolerably well, certainly better than letting the insane lie on a damp pucka broken floor. But an insect the natives call "**Ghoon,**" peculiar to the bamboo, after about two years, was so destructive that the bamboo mutchans were removed, and the present wooden ones made by Government, and fixed in their place. Still great dampness prevailed from the bad state of the ground-floors; and ventilators were about two years ago made in the ceilings; but the present establishment never can be fit for its inmates until the entire ground-floors and verandas undergo the repair recommended by **The Superintending surgeon, Dr. Swears, in 1836.*** |
| 1816 | 186 | 122 | 10,100 | |
| 1817 | 170 | 115 | 17,346 | |
| 1818 | 168 | 85 | 15,929 | |
| 1819 | 155 | 80 | 12,724 | |
| 1820 | 174 | 109 | 13,370 | |
| Total | **853** | **511** | **7,7472** | |
| 1821 | 155 | 99 | 11,912 | |
| 1822 | 135 | 108 | 10,640 | |
| 1823 | 112 | 88 | 7,530 | |
| 1824 | 102 | 127 | 7,935 | |
| 1825 | 106 | 97 | 6,929 | |
| Total | **610** | **516** | **44,990** | |
| 1826 | 105 | 99 | 8,734 | |
| 1627 | 109 | 100 | 7,042 | |
| 1828 | 109 | 132 | 8,064 | |
| 1829 | 149 | 134 | 8,011 | |
| 1830 | 143 | 129 | 7,586 | |
| Total | **615** | **594** | **39,437** | |
| 1831 | 120 | 143 | 8,734 | |
| 1832 | 121 | 116 | 7,042 | |
| 1833 | 121 | 158 | 8,064 | |
| 1834 | 125 | 146 | 8,011 | |
| 1835 | 137 | 126 | 7,586 | |
| Total | 624 | 689 | 39,437 | |
| 1836 | 116 | 144 | 7,929 | |
| 1837 | 144 | 116 | 8,057 | |
| 1838 | 133 | 132 | 8,554 | |
| 1839 | 133 | 130 | 8,183 | |
| 1840 | 150 | 125 | 8,902 | |
| ***Total*** | 676 | 647 | 41,625 | |

41 স্ট্যাটিস্টিকস রিপোর্ট অফ দ্যা হসপিটাল ফর দ্যা ইনসেন আন্ডার দ্যা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, ডব্লিউ এইচ সাইকস, রয়্যাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল সোসাইটি, লন্ডন, ১৮৪৪

# ভবানীপুর ইউরোপিয়ান লুনটিক অ্যাসইলাম (১৮৫৫ খ্রীঃ)

ভবানীপুর ইউরোপিয়ান লুনটিক অ্যাসইলাম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৫ খ্রিঃ ৩১ ডিসেম্বর। এটি ফোর্ড উইলিয়াম থেকে প্রায় ১ মাইল দূরে দক্ষিণে এবং প্রেসিডেন্সি জেনারেল হসপিটালের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত[42]। এই হসপিটাল টির পরিকাঠামো ছিল অন্যান্য হসপিটালের থেকে অনেক উন্নত, নির্জন স্থান। এবং কলকাতার সাধারণ তাপমাত্রা থেকে এই অঞ্চল টি ২ ডিগ্রি নীচে থাকে [43]। যেটি উন্মাদ রোগীদের পক্ষে তুলোনামূলক ভাবে উপযুক্ত। ইতিপূর্বে ১৮১৭ খ্রিঃ থেকে ইউরোপিয়ান অ্যাসইলামটি পরিচালন করা হত। কিন্তু তা সুপরিকল্পনার অভাব, যদিও পরবর্তীকালে মেডিকাল বোর্ডের নীতি অনুসরন করে চলত।

## বাংলায় উন্মাদ আশ্রম সম্পর্কিত নীতিমালা

ভারতে ১৮৫০ সালের দিকে, অন্তত পক্ষে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ফলে উন্মাদাগার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে সংশোধন আসে। প্রথমত, লর্ড ডালহৌসি বাংলায় উন্মাদাগার সম্পর্কিত নীতিমালা বা লুনাসি পলিসি (Lunacy Policy) পাশ করান (১৮৫৬), দ্বিতীয়ত, ১৮৫৮ সালে ভারতীয় পাগলাগারদ আইন (Indian Lunatic Asylum Act) পাশ করা হয়, এবং তৃতীয়ত, প্রাইভেট মানসিক হাসপাতালগুলোতে দিনকে দিন রোগীর সংখ্যা অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়া , ব্যবস্থাপনায় গোলযোগ, অভ্যন্তরীণ ক্রটিযুক্ত পরিস্থিতি, চিকিৎসা সেবায় অবহেলা এবং সবশেষে জনগণের ভর্তুকির অপব্যবহার ইত্যাদি বিষয়াদি সরকারকে ভাবিয়ে তোলে এবং এর ফলে উন্মাদ আশ্রম গুলি জাতীয়করণের জন্য পরবর্তীতে সরকারিভাবে কাজ শুরু হয় । সুতরাং , ভবানীপুরের ইউরোপিয়ান মানসিক হাসপাতাল বিয়ার্ডস্মোর পরিবারের প্রাইভেট ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রণাধীন থাকার প্রায় ৪০ বছর পর, ১৮৫৬ সালে তা সরকারের হস্তগত হয় এবং এর দায়িত্বপ্রাপ্ত হন ডঃ জে. ক্যান্টর।

কলকাতার ভবানীপুরের পাগলাগারদটি তৈরি হয়েছিল প্রথমে ব্যক্তিগত উদ্যোগে , ১৮১৭ সালে। সরকার এটি অধিগ্রহণ করে ১৮৫৫ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর। এটি ছিল প্রধানত সাহেব

---

[42] রিপোর্ট অন দ্যা অ্যাসাইলামস ফর ইউরোপীয়ান অ্যান্ড নেটিভ ইনসেন পেসেন্স এট ভবানীপুর অ্যান্ড দুলুন্ডা ফর ১৮৫৭,

[43] রিপোর্ট অন ইন্সানিটি অ্যামং ইন্ডিয়ান অ্যানালস অফ মেডিক্যাল সায়েন্স, নং-৬৯২

পাগলদের জন্য , যদিও নেটিভ পাগলরাও মাঝে - মধ্যে এখানে ঠাই পেত । ফোর্ট উইলিয়মের দক্ষিণদিকে মাইলখানেকের মধ্যে, প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালের ধারে ছিল এই পাগলাগারদ । পাগলদের পৃথকীকৃত আবাসন হিসেবে। স্থানটির নির্বাচন অতি উত্তম। কারণ এখানে জল জমে না , হাওয়া-বাতাস খেলে ভাল , গ্রীষ্মকালেও আরামপ্রদ , । পাগলাগারদের সংলগ্ন জমি ছিল দু একরেরও বেশি । বিভাগ ছিল দু টি :একটি মেয়েদের , অন্যটি পুরুষদের জন্য । ওয়ার্ডের সেল ছিল মোট ৬২টি । প্রত্যেকটি সিঙ্গল অ্যাকোমোডেশন প্রত্যেক সেলে একটা করে জানালা , বেশ উঁচুতে , পাগলের নাগালের বাইরে । আধখানা প্যানেল - লাগানো দরজা ; দরজায় নজরদারির জন্য ইন্সপেকস প্লেট লাগানো ।প্রয়োজন হলে , জানলায় ক্যানভাসের পর্দা ঝুলিয়ে ঘর অন্ধকার করা যেত। প্রত্যেক পাগলের জন্য গরমকালে বরাদ্দ ছিল একটা করে তালপাতার পাখা। দরজাগুলো বাইরের দিকে খোলা যেত , দরজা খুললেই লাম্ব বারান্দা। বারান্দায় ক্যানভাসের পর্দা ঝুলিয়ে রৌদ্র - বৃষ্টি আটকানো হতো [44]।

১৮৫৬ খ্রিঃ পর রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়ে ছিল ৪১ জন। ফলে থাকার জন্য অসুবিধা দেখা দেয়। পরবতীর্কালে এই আশ্রমে ক্রমশ রোগী বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্ধিত গৃহ নির্মাণ করা হয়। পুরুষদের জন্য ২৪০০ বর্গফুটের ৪২ টি গৃহ এবং মহিলাদের ১৫৭৫ বর্গফুট জায়গা বিশিষ্ট ২০ টি গৃহ নির্মাণ কর হয় [45]। ইউরোপের উন্মাদ আশ্রমটি সুপরিকল্পিত ভাবে ও উপযুক্ত স্বাস্থবিধি অবলম্বন করে তৈরী করা হয়েছিল। প্রতিটি ঘরে একটি করে জানালা ও দরজা ছিল। দরজা গুলিতে আবার অর্ধপ্যানেল যুক্ত ছিল। যাতে মুক্তবাতাস চলাচল কর্তে পারে। আবার জানালাগুলি ক্যানভাসের পদ্মাযুক্ত ছিল, এবং কক্ষ গুলির সামনে ছিল দীর্ঘ বারান্দা। রোগীদের ক্ষেত্রে একটি সাধারন নিয়ম ছিল রোগীদের বিছানা ও সরঞ্জাম গুলি তাদের ঘরে রাখতে হত। স্নানের জন্য আলাদা করে ঠান্ডা জল ও ঝরনা জলের সুববস্থা ছিল। ভয়ঙ্কর উন্মাদ রোগীদের আলাদা কক্ষে রাখা হত [46]। এবং

---

[44] রিপোর্ট অন দ্যা অ্যাসাইলামস ফর ইউরোপীয়ান অ্যান্ড নেটিভ ইনসেন পেসেন্ট অফ ভবানিপুর অ্যান্ড দুলুন্দা ১৮৫৬ – ১৮৫৭” ইন সিলেকশান ফ্রম দ্যা রেকর্ড অফ দ্যা গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল , নং XXVIII, পৃ - ৬।

[45] দ্যা রেকর্ড অফ গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল,এন: XXVIII। রিপোর্ট অফ দ্যা অ্যাসাইলামস ফর ইউরোপীয়ান অ্যান্ড নেটিভ ইনসেন পেসেন্টস, এট ভবানিপুর অ্যান্ড দুলুন্দা, ফর ১৮৫৬ অ্যান্ড ১৮৫৭। প্রসেডিং নং- ২৭০, জন গ্রে, ক্যালকাটা গেজেট অফিস, ১৮৫৮

[46] অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইউরপিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাট ভবানিপুর ফর দ্যা ইয়ার ১৮৬৭, এ.পাইন, সার্জন সুপারিনটেন্ডেড।

সেই কক্ষের মধ্যে আলাদা ভাবে চিকিৎসা করা হত। উন্মাদ রোগীদের সুরক্ষার জন্য আশ্রমটি পচিল বেষ্টিত ছিল, যাতে রোগীরা বাইরে বেরোতে না পারে। এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানির বোটানিক্যাল গার্ডেনের তত্ত্বাবধানে এই আশ্রমের ভিতর সুসজ্জিত বাগিচা তৈরী করা হয়েছিল। এই উন্মাদ আশ্রমে সেন্ট্রাল বিল্ডিং এ ছিল ১১ টি কক্ষ ( ২৮,৮৬৯ ঘনফুট) এবং ইস্টার্ন ওয়ার্ডে ছিল ৭ টি কক্ষ, ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ডে ছিল ৭ টি কক্ষ, সাউথ ওয়ার্ডে ছিল ১৪ টি কক্ষ এবং পৃথকভাবে ছিল ৩ টি কক্ষ। মোট (৭২,২৮৫ ঘনফুট)। পুরুষ ওয়ার্ডে ৪২ টি কক্ষ মোট (১,০১১৫৪ ঘনফুট) জায়গা নিয়ে তৈরী হয়েছিল [47]। আবার নারী বিভাগে ইস্টার্ন ওয়ার্ডে ১৪ টি কক্ষ,ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ডে ৬ টি কক্ষ ছিল। এই ২০ টি কক্ষ মোট ( ৩১,৫১৩ ঘনফুট) জায়গার মধ্যে তৈরী হয়েছিল। ইউরোপিয়ান লুনাটিক আশ্রমের সুপারিনটেনডেন্ট থিওডর কান্টর এর প্রতিবেদনে রোগীদের খাদ্য তালিকার উল্লেখ পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণীর খাবার বন্টনের প্রমান পাওয়া যায়।

মেডিক্যাল বোর্ডের নিয়ম আনুয়ায়ি ইউরোপিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলামে ২হফ ঈষধং উন্মাদ রোগী খাদ্য তালিকায় ছিল বীফ,মটন,মাখন,চা,ভাত,দুধ,চিনি,বার্লি,শাক-সব্জি,ফল, টোস্ট ও বার্লি-জল, এই খাদ্য তালিকা টি ছিল সাপ্তাহিক ও বিভিন্ন দিন আনুয়ায়ি ফুল-ডায়েট নিয়ম আনুসরন করে চলত। এছারাও খাদ্য তালিকায় অতিরিক্ত পরিষেবা নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে প্রদান করা হতো। সেগুলি ছিল হাঁসের মাংস, কেক, ওইয়াই-বিয়ার ,কফি ও আইস্ক্রিম[48] ।

## ভবানীপুর ইউরোপিয়ান লুনটিক অ্যাসইলাম উন্মাদ রোগীদের কয়েকটি কেস-হিস্ট্রি

*কেস নং - ১ A.W ****,বয়স ৩৫ ,ভারতে জন্মগ্রহণকারী ইউরোপীয়, দ্বিতীয়বার ভবানীপুর ইউরোপিয়ান উন্মাদ আশ্রমে ভর্তি হয়েছিলেন , ৩ রা নভেম্বর, ১৮৫৫। তিনি ছিলেন ব্রোকার ম্যানিয়া অর্থাৎ তিনি ছিলেন অধিক আবেগপ্রবণ, খেয়ালী , অবাস্তব ও দূরকল্পনাশ্রয়ী কিন্তু বুদ্ধিমান। রোগীটির পাগলামির কারণ ছিল ব্যবসায় ব্যর্থতার ফলে আর্থিক শুন্যতা। পাগলামির কারন বশতঃ ক্রমাগত অত্যধিক হিংস্র হয়ে ওঠে, নানা রকমের বিকৃত ধারণা তার মনে তৈরি হয় ফলস্বরূপ , অসংলগ্ন কথা বার্তা ও আপন মনে ফিস*

---

[47] দ্যা রেকর্ড অফ গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল,এন: XXVIII। রিপোর্ট অফ দ্যা অ্যাসাইলামস ফর ইউরোপীয়ান অ্যান্ড নেটিভ ইনসেন পেসেন্টস, এট ভবানিপুর অ্যান্ড দুলুন্দা, ফর ১৮৫৭, প্রসেডিং নং- ২৭০, জন গ্রে, ক্যালকাটা গেজেট অফিস,

[48] দ্যা রেকর্ড অফ গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল,এন: XXVIII, রিপোর্ট অফ দ্যা অ্যাসাইলামস ফর ইউরোপীয়ান অ্যান্ড নেটিভ ইনসেন পেসেন্টস, এট ভবানিপুর অ্যান্ড দুলুন্দা, ফর ১৮৫৮, প্রসেডিং নং- ২৭০, জন গ্রে, ক্যালকাটা গেজেট অফিস,

*ফিস করতেন এবং দৈনন্দিন জীবন অত্যধিক নোংরা অভ্যাস পরিনত হয়। মাঝে মাঝে উন্মাদ আশ্রম থেকে পালানোর জন্য বিভিন্ন কৌশলে করতেন কখনো দারুণ ধূর্ততা প্রকাশ করতেন। উন্মাদ রোগীটি ১৮৫৬ সালের ২শে আগস্ট থেকে ১১ই আগস্ট অবধি পর্যন্ত তাকে আশ্রমে বন্দী করে রাখা হয়েছিল । অবশেষে সেই রোগীকে জাহাজে করে তাকে ইউরোপে ফেরত পাঠানো হয়েছিল কিন্তু তার মধ্যে তখনও খুব ক্ষিপ্ত, হিংস্র অবস্থায় লক্ষন ছিল। এই উন্মাদ আশ্রমে উন্মাদনার হেমোরেজিক ডিসেন্ট্রির লক্ষণ দেখা দিয়েছিল*[49] *।*

***কেস নং - ২*** *W.C **** , বয়স- ৩৬, পেশা- ইংরেজ নাবিক। ১৮৫৭ সালের ২৩ শে আগস্ট স্মৃতিভ্রংশ ও মতিভ্রম লক্ষনের নামক পাগলামির অবস্থা দেখা। উন্মাদ আশ্রমে ভর্তি করা হয়। তাকে স্থানান্তরিত হয় প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতাল থেকে, যেখানে তাকে মৃগী প্রকৃতির রোগী বলে মনে করা হয়েছিল । প্রথমে তাকে হেমিপে-জিয়া নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। রোগীর আশ্রমে স্থানান্তরের সময় মাথার বাম দিকের হেমিপে-জিয়ার লক্ষণগুলি প্রদর্শন করেছিলেন। পরবরতীকালে ক্রমশ উন্মাদনা বৃদ্ধি পেতে থাকে । শরীর উপরের এবং নীচের প্রান্ত সংবেদন হারানো হারিয়ে ফেলেছিল। তার কণ্ঠস্বর অনেকটা লোপ পেতে থাকে , ফিসফিস করে শব্দ করতেন , মাঝে মাঝে অনিচ্ছাকৃত মুখ মোচড় দিয়ে উঠতেন, প্রথম দিকে মানসিক বিকার অবস্থায় থাকতেন নানারকম পাগলামি লক্ষন প্রকাশ করতেন। চিকিৎসা শুরু হওয়ার পর ক্রমশঃ স্বাভাবিক হতে থাকে , শরীরের তাপমাত্রা এবং ধমনীর পালস ছিল গড় ১০৫, জিহ্বা পরিষ্কার; ক্ষুধা এবং অন্ত্র স্বাভাবিক। কয়েকদিন পর নিখুঁতভাবে সুসংগত ছিলেন। আশ্রমে থাকাকালীন তার প্রতিবন্ধী বুদ্ধির কোনো লক্ষণ প্রকাশ করেননি। ১৮৫৭ সালের ২৮ শে আগস্ট পর্যন্ত তাকে চিকিৎসা করা , অতঃপর সুস্থ হয়ে উঠেছিল*[50] *।*

***কেস নং - ৩*** *রেভারেন্ড ড. জে. এন ****, বয়স-৩৫ , ভর্তি হয়েছিলেন দ্বিতীয়বার, ২৪ ফেব্রুয়ারী ১৮৫৭। পেশা - রোমের ডিভাইনিটির ডাক্তার, পরে শিক্ষকতা , জাতিগত পরিচয় - আইরিশ; কর্মসূত্রে ভারতে ১৫ বছর অবস্থানরত ছিলেন ; মূলত স্পষ্ট বুদ্ধি এবং মহান শিক্ষার একজন মানুষ, ২৯শে মে তিনি হঠাৎ করেই অজ্ঞান হয়ে পড়েন। শারীরিক অদম্যতা ও অস্বাবাভিক আচরণে বোঝা যায় তিনি পূর্বের বুদ্ধিমত্তার সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে করে, তিনি অতীত, এমনকি বর্তমানের স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেন । ক্রমশ তার উন্মাদনা প্রকোপ বাড়তে থাকে । সংক্ষেপে বলা যেতে পারে তিনি বোধ বুদ্ধি হীন মানুশে পরিণত করা হয়েছিল। প্রায়শই ইংরেজি, গ্রীক, ল্যাটিন এবং ইতালীয় বাক্যাংশের মিশ্রণে অসংলগ্ন বাক্যালাপ করতেন ; ইতিপূর্বে তিনি প্রায় ৫ বছর আগে তিনি প্রাইভেট লুনাটিক অ্যাসাইলামে চিকিৎসাধীন ছিলেন এবং আরোগ্য লাভের পর আবার এই স্মৃতিবিভ্রম রোগ দেখা দেয়। এই অবস্থায় তিনি ৩রা জুন ১৮৫৭ পর্যন্ত আশ্রমে চিকিৎসাধীন ছিলেন*[51] *।*

---

[49] দ্যা রেকর্ড অফ গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল,এন: XXVIII। রিপোর্ট অফ দ্যা অ্যাসাইলামস ফর ইউরোপীয়ান অ্যান্ড নেটিভ ইনসেন পেসেন্টস, এট ভবানিপুর অ্যান্ড দুলুন্দা, ফর ১৮৫৬ অ্যান্ড ১৮৫৭। প্রসেডিং নং- ২৭০, জন গ্রে, ক্যালকাটা গেজেট অফিস, ১৮৫৮

[50] দ্যা রেকর্ড অফ গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল,এন: XXVIII। রিপোর্ট অফ দ্যা অ্যাসাইলামস ফর ইউরোপীয়ান অ্যান্ড নেটিভ ইনসেন পেসেন্টস, এট ভবানিপুর অ্যান্ড দুলুন্দা, ফর ১৮৫৬ অ্যান্ড ১৮৫৭। প্রসেডিং নং- ২৭০, জন গ্রে, ক্যালকাটা গেজেট অফিস,

[51] দ্যা রেকর্ড অফ গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল,এন: XXVIII। রিপোর্ট অফ দ্যা অ্যাসাইলামস ফর ইউরোপীয়ান অ্যান্ড নেটিভ ইনসেন পেসেন্টস, এট ভবানিপুর অ্যান্ড দুলুন্দা, ফর ১৮৫৬ প্রসেডিং নং- ২৭০, জন গ্রে, ক্যালকাটা গেজেট অফিস,

*কেস নং -4 মিসেস এন. ভি ** *,বয়স-২৩, । ৯ ই ডিসেম্বর ১৮৫৬-এ জেনারেল হাসপাতাল থেকে স্থানান্তরিত হয়ে উন্মাদ আশ্রমে ভর্তি হয়েছিল। জাতিগত পরিচয় - নিগ্রেস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টনের বাসিন্দা , শারীরিক গঠন লম্বা , সাধারণ স্বাস্থ্য , প্রায় ২ মাস আগে যখন , হঠাৎ আতঙ্কের কারণে তার*

ক্যাটামেনিয়া রোগ দেখা দেয় , *কিন্তু সাময়িকভাবে দমন করা হয়, বাতজনিত ব্যথা সহ। ১৮৫৬ সালের ২৬ শে নভেম্বর ভীষণ অসুস্থতার জন্য জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি, করা হয় কিন্তু ম্যানিয়া আক্রান্ত এই রোগী কে সাধারন্মানের চিকিৎসা করে উন্মাদ আশ্রমে পাঠানো হয় । নানা রকম শারীরিক অসুবিধার সাথে ক্যাটামেনিয়া, হিস্টেরিক্যাল ম্যানিয়ার রোগে আক্রান্ত হয় । ফলে অস্বাভাবিক আচরণ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে ১ লা ডিসেম্বর উন্নতির জন্য উপস্থিত ছিলেন এবং তাকে লুনাটিক অ্যাসাইলামে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। ভর্তির সময়, তিনি শান্ত ছিলেন, এবং মৃগীরোগযুক্ত ফিট লাগা মতো অবস্থা ছিল, মুখ বন্ধ হয়ে ছিল। মাঝে মাঝে অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতেন কখনো ভয়ে সংকুচিত হয়ে পরতেন। চিকিৎসা শুরুর পর রোগের প্রকোপ কমতে থাকে তিনি ২০ ই ডিসেম্বর ১৮৫৬ পর্যন্ত এই রোগস্থায়ী ছিল*[52] ।

১৮৫৬ সালের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে মোট ইংরেজ রোগীর সংখ্যা ছিল ২৪ জন, স্কটিশ রোগীর সংখ্যা ৮ জন, আইরিশ রোগীর সংখ্যা ৩৩ জন, ফরাসী রোগীর সংখ্যা ১ জন, সুইশ রোগীর সংখ্যা ১ জন, অ্যামেরিকান রোগীর সংখ্যা ১ জন, ইস্টইন্ডিয়া রোগীর সংখ্যা ছিল ৫৬ জন, আর্মেনিয়ান রোগীর সংখ্যা ৪ জন,এবং আফ্রিকান রোগীর সংখ্যা ছিল ৪ জন। এই বছরে আশ্রমে মোট রোগীর সংখ্যা ছিল ১৩২ জন, যার মধ্যে পুরুষ রোগীর সংখ্যা ছিল ৮৭ জন এবং নারী রোগীর সংখ্যা ৪৫ জন। ১৮৫৭ সালের প্রতিবেদনে দেখা যায় ইংরেজ রোগীর সংখ্যা ছিল ১৪ জন, স্কটিশ রোগীর সংখ্যা ছিল ৬ জন, আইরিশ রোগীর সংখ্যা ছিল ২৩ জন, ডবষপয রোগীর সংখ্যা ১ জন, স্পানিশ রোগীর সংখ্যা ২ জন, সুইডিশ রোগীর সংখ্যা ১ জন, রোগী ছিল ১ জন, ঊধংঃ ওহফরধ রোগীর সংখ্যা ছিল ৪৪ জন, অৎসবহরধহ রোগীর সংখ্যা ছিল ১ জন, এই বছরে আশ্রমে মোট রোগীর সংখ্যা ছিল ৯৫ জন। যার মধ্যে পুরুষ রোগীর সংখ্যা ছিল ৬৮ জন, এবং নারী রোগীর সংখ্যা ২৭ জন [53] ।

১৮৫৬ ও ১৮৫৭ সালের প্রতিবেদনে উন্মাদ রোগীদের যে পেশাগত অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়, সেগুলি হল - Surveyors এর সংখ্যা ছিল ৬ জন, Attorney এর সংখ্যা ১ জন , Medical

---

[52] দ্যা রেকর্ড অফ গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল,এন: XXVIII। রিপোর্ট অফ দ্যা অ্যাসাইলামস ফর ইউরোপীয়ান অ্যান্ড নেটিভ ইনসেন পেসেন্টস, এট ভবানিপুর অ্যান্ড দুলুন্দা, ফর ১৮৫৭। প্রসেডিং নং- ২৭০, জন গ্রে, ক্যালকাটা গেজেট অফিস,

[53] রিপোর্ট অন দ্যা অ্যাসাইলামস ফর ইউরোপীয়ান অ্যান্ড নেটিভ ইনসেন পেসেন্টস এট ভবানিপুর অ্যান্ড দুলুন্দা, ফর ১৮৫৭।

Subordinates এর সংখ্যা ১১ জন, Soldiers ছিল ৫৬ জন, Seafaring Men ২০ জন, Tradesmen ১১ জন, Writers এর সংখ্যা ছিল ১৮ জন, এবং অন্যানরা ছিল ১২ জন । এবং নারী উন্মাদ রোগীদের মধ্যে Gentle women ছিলেন ৮ জন, Soldiers রিভব ২১ জন, Tradesmen wife ৪৩ জন, এই দুই বছরে উন্মাদ আশ্রমে রোগীদের মানষীক অসুস্থতার যে কারণ গুলি খুজে পাওয়া গিয়েছিল সেগুলি ছিল ম্যানিয়া রোগাক্রান্ত (প্রচন্ড ক্ষিপ্ততা) ৯১ জন , ডিমেনশিয়া (স্মৃতিভ্রম) রোগীর সংখ্যা ছিল ৮৬ জন, ইডিয়োসি (নির্বুদ্ধিতা) ও জ্বরত্ব রোগীর সংখ্যা ছিল ১৬ জন , অ্যামেনশিয়া বা জড়বুদ্ধি সংক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ছিল ৪ জন , মেলানকোলিয়া বা অবসাদগ্রস্থ রোগী ছিল ৩৫ জন, মনমানিয়া বা বাতিক রোগগ্রস্থ রোগীর সংখ্যা ৬ জন, মোরাল ইনসানিটি বা স্বভাবগত উন্মত্ত রোগীর সংখ্যা ছিল ৫ জন, এছাড়াও অন্যান্য রোগীর সংখ্যা ছিল ৪ জন[54]।

মেডিক্যাল বোর্ডের সদস্য ও কলকাতা পুলিশ কমিশণের অধিকর্তা এই আশ্রমের প্রতি মাসের প্রথম দিন উন্মাদ আশ্রমের অবস্থা পরিকাঠামো ও রোগীদের পরিষেবা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করতেন। পরিদর্শকরা রোগীদের খাদ্য পোশাক, আশ্রমের অভ্যন্তরে পরিস্কার - পরিচ্ছন্ন , চিকিৎসা ব্যবস্থা, রোগীদের প্রতি যত্নশীলতা ইত্যাদি বিষয় গুলি প্রত্যক্ষ করতেন[55] প্রথম শ্রেণীর রোগীদের ( First Class) জন্য প্রতি মাসে ১০০ টাকা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর রোগীদের কাছ থেকে ৩০ টাকা করে নেওয়া হত। রোগীর নিকট আীত্মীয়স্বজন প্রতিমাসে এই টাকা দিতে বাধ্য থাকত[56] ।

১৮৯০ সালের বাংলার পাগলাগারদের বাৎসরিক রিপোর্ট বলছে, ঐ সময় বাংলায় সর্বসাকুল্যে ১,০১৯ জন পাগলের বসবাসের সংস্থান ছিল সরকারি পাগলাগারদগুলিতে । পাগলের সংখ্যা এবং পাগলাগারদে অধিকৃত স্পেস হিসেব করে জানানো হয়েছে , প্রত্যেক পাগলের জন্য গড়ে ৫০ বর্গফুট আবাসভূমি বরাদ্দ ছিল । মনে হয় , রিপোর্টের হিসেবে গরমিল আছে । সম্ভবত মাথাপিছু স্থান বরাদ্দের হিসেবের মধ্যে গারদের গুদামঘর , অফিসারদের কোয়ার্টার , বাগান সবকিছুই ধরা

---

[54] রিপোর্ট অন দ্যা অ্যাসাইলামস ফর ইউরোপীয়ান অ্যান্ড নেটিভ ইনসেন পেসেন্টস এট ভবানিপুর অ্যান্ড দুলুন্দা, ফর ১৮৫৮।

[55] রিপোর্ট অন অ্যাসাইলাম এট ভবানিপুর ফর ইউরোপীয়ান অ্যান্ড কান্ট্রি ব্রন ইনসেন পারসন, ১৮৫৬।

[56] রিপোর্ট অফ কন্ট্রল অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অফ দ্যা অ্যাসাইলাম ভবানিপুর ফর ইউরোপীয়ান অ্যান্ড কান্ট্রি ব্রন পারসন, পাবলিসড বাই অর্ডার, দ্যা গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল ১৮৫৭।

হয়েছিল । আসলে , পাগলাগারদে সবসময়ই স্থানাভাব ছিল । ঐ রিপোর্টেই অন্যত্র জানানো হয়েছে , দুলুন্দার পাগলাগারদে মেয়ে - পাগলদের ঘরের অভাব । বহরমপুরের গারদে মেয়েদের ঘরের অভাব নেই , কিন্তু সব পুরুষ - পাগলদের স্থান সংকুলান করা যাচ্ছে না[57] । এমনিতেই ১৮৮০ সাল থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত সরকারি হিসেবে দেখা যাচ্ছে , বাংলার পাগলাগারদে পাগল - ভর্তির সংখ্যা বাড়ছে । ১৮৮০ সালে , শুধুমাত্র ক্রিমিনাল লুনাটিকের সংখ্যা ছিল ২৭৬ । ১৮৯০ সালেএদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৪০ জনে । ১৯১০ সাল নাগাদ সরকার আইন করে পাগলাদের আঞ্চলিক বিভাজন । করে দেয় । স্থির হয় , ভবানীপুর- পাগলাগারদে বাংলার সমস্ত সাহেব পাগলরা থাকবে । পাটনার পাগলাগারদ , ছোটনাগপুর , পাটনা ডিভিসন , মুঙ্গের, সাঁওতাল পরগণা জেলার নেটিভ পাগলদের জন্য নির্দিষ্ট হয় । আর বহরমপুর পাগলাগারদে থাকবে এদেশের অন্য সব জেলার নেটিভ পাগলরা [58]।

১৮৬৮ সালে, তৎকালীন ভারত সাম্রাজ্যের সচিবের নির্দেশে স্যার জেমস ক্লার্ক ভারতে মানসিক হাসপাতালের পরিস্থিতি নিয়ে একটি প্রশ্নমালা প্রস্তুত করেন। বাংলা প্রদেশ থেকে প্রাপ্ত প্রতিক্রিয়ায় জানা যায় যে, হাসপাতালগুলো জনাকীর্ণ এবং তথ্য সংরক্ষণের বেহাল অবস্থা। ১৮৬৩ থেকে ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত বাংলায় অবস্থিত পাগলাগারদে ভর্তি হওয়া মোট ২২৭৪ জন রোগীর মধ্যে ৫১৪ জন মৃত্যুবরণ করে এবং ৮৫৮ জন আরোগ্যলাভ লাভ করে বলে জানা যায়। চিকিৎসার সাধারণ পদ্ধতির মধ্যে ব্যবহৃত হতো মর্ফিয়া, টিংচার ডিজিটালিস, পটাশিয়াম ব্রোমাইড, অ্যানোডাইন ইত্যাদি, এর সাথে যুক্ত হতো অকুপেশনাল থেরাপি, বাগান করা, আনন্দ-ফূর্তি করা, শৌচাগারের সুব্যবস্থা, শারীরিক অনুশীলন, ঠান্ডা জলে স্নান প্রভৃতি। আর্থার পেইন (১৮৬২), তৎকালীন আমলে অ্যাসাইলাম অফ প্রেসিডেন্সির সুপারিন্টেন্ডেন্ট মতামত দেন, কর্মহীন পুরুষদের মধ্যে মৃত্যুহার অন্য সব জনগোষ্ঠীকে ছাড়িয়ে যায়, এমনকি তা কর্মজীবী শ্রেণীর থেকেও বেশি।

---

57 সামন্ত,অরবিন্দ, রোগ রোগী রাষ্ট্র ; উনিশ শতকের বাংলা প্রগ্রেসিভ প্রকাশনী , কলাকাতা , ২০০৪ পৃষ্ঠা ৪৮

58 বেঙ্গল লুনাটিক অ্যাসাইলাম, ১৯১০। ক্যালকাটা মেডিক্যাল গেজেট, পৃ – ৩৭।

১৮৫৮ সালের ১লা নভেম্বর রাণীর ঘোষণা অনুসারে দেশের শাসনভার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে রাণীর অধীনে হস্তান্তরিত হয়। ১৮৫৮ সালের ৩৬ নং আইন সরকারের আওতাধীন যথাযথ স্থানে মানসিক রোগীদের গ্রহণ এবং আশ্রয় প্রদানের জন্য মানসিক হাসপাতাল বা পাগলাগারদ প্রতিষ্ঠার অনুমোদন প্রদান করে। ১৮৫৮ এর নির্দেশিত আইন কে লক্ষ করে ভবানীপুর উন্মাদ আশ্রমটির উন্নতির বিধানের জন্য সরকারের তরফ থেকে সুব্যাবস্থা নেওয়া হয়,যার দায়িত্বে ছিলেন ডঃ জে.ক্যান্টর, তিনি তখন ভবানীপুর ও দুলান্দা পাগলাগারদ উভয়ের জন্যই পূর্ণকালীন সুপারইন্টেন্ডেন্ট হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন, যেহেতু ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার মূল কেন্দ্রে মানসিক রোগীদের জন্য চিকিৎসার চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। মানসিক রোগীদের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা প্রদানের বিষয়ে ডঃ ক্যান্টরের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল এবং তা পরিচালনার সাথে সাথে ভবানীপুর ইউরোপিয়ান অ্যাসাইলামের সকল পরিসরে শৃঙ্খলা,অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ এবং অর্থনৈতিক সুপরিচালনার অনুপ্রবেশ ঘটে। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, চিকিৎসা বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরই মানসিক হাসপাতাল পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া উচিত এবং তাঁর মতামত ছিল যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের মূল প্রতিস্থাপক হলো মানবিক উদারতা।

ভবানীপুর পাগলাগারদের প্রতিষ্ঠা হওয়ার ঠিক কাছাকাছি সময়ে আরেকটি পাগলাগারদ স্থাপন করা হয়, যেটি অবস্থিত ছিল কলকাতা থেকে প্রায় ৪০০-৫০০ মাইল উত্তরে বিহারের মাজ্ঘির এলাকায়। এই হাসপাতালের রোগীরা ছিল মূলত মানসিক বিকারগ্রস্ত সৈনিকরা। হাসপাতালটি গঙ্গা নদীর তীরে মজ্ঘির কেল্লার দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। গাঠনিকভাবে, এই ভবনটি দেখতে সেনানিবাসের মতো ছিল এবং ১৮৩১ সালের ১লা নভেম্বরে এটি বন্ধ হয়ে যায়। কারণ ইতিপূর্বে ১৮২১ সালে পাটনায় বাঙ্কিপুরে আরেকটি পাগলাগারদ স্থাপিত হয়। ফলে মাজ্ঘি আশ্রম উন্মাদ আশ্রমটি পাটনাতে বাঙ্কিপুরে স্থানান্তরন করা হয় , নতুন বিল্ডিং করা হয়। ১৮২৩ খ্রিঃ নাগাদ এই আশ্রমে পুনরায় সংস্কার সাধন করে উন্নত পরিকাঠামো ব্যাবস্থা করা হয়। আশ্রমের চারিদিক ছিল পাঁচিল বেষ্টিত ( ৮ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট) করে সুরক্ষিত করা হয় ।

# ভবানীপুর ইউরোপিয়ান ইউরোপীয়ান

# লুণাটিক অ্যাসাইলামের বিভিন্ন বিল্ডিং ও ওয়ার্ডের পরিমাপ[59]

**WARDS FOR MALES.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Centre-Building ... ... ... | 11 Rooms | ... | 28,869 c. feet. |
| Eastern Ward ... ... ... | 7 | | |
| Western „ ... .. ... | 7 | ... ... | 72,285 „ 9½ inch. |
| Southern „ ... ... ... | 14 | | |
| Separate „ ... ... ... | 3 | | |
| | 42 Rooms | ... | 101,154 c. feet 9½ inch. |

(Eastern, Western, Southern and Separate wards bracketed together: 72,285 „ 9½ inch.)

**WARDS FOR FEMALES.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Eastern Wards ... ... ... | 14 | | |
| Western „ ... ... ... | 6 | | |
| | 20 Rooms | ... | 31,513 c. feet 6¾ inch. |

[59] রিপোর্টস অফ দ্যা অ্যাসাইলামস ফর ইউরোপীয়ান অ্যান্ড নেটিভ ইনসেন পেসেন্টস, এট ভবানিপুর ফর ১৮৫৬ অ্যান্ড ১৮৫৭।

# Lunatic asylum Bhowanipur in plan of the town map of calcutta[60]

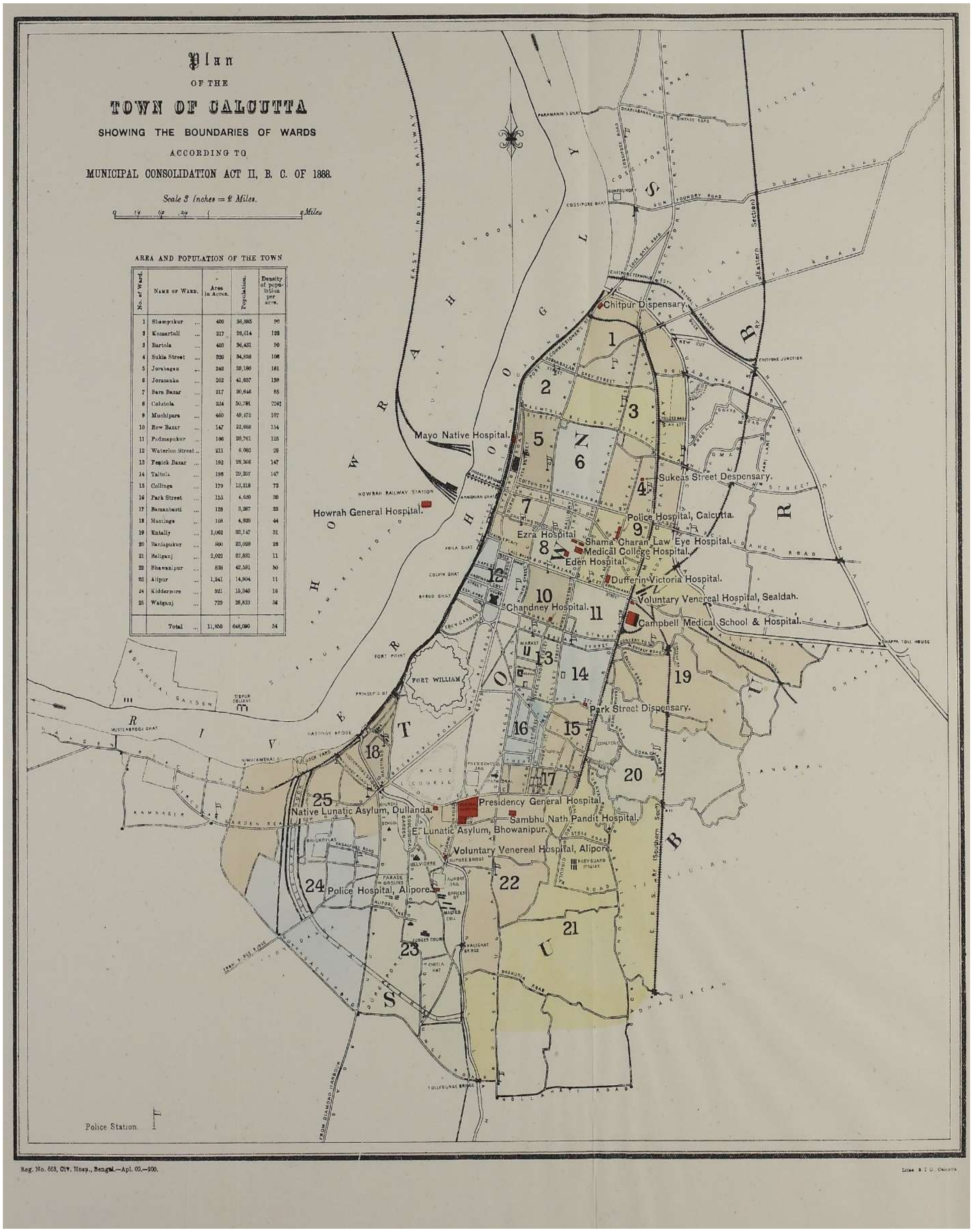


[60] রিপোর্ট অন দ্যা কলকাতা মেডিক্যাল ইনস্টিটিউশন ফর দ্যা ইয়ার ১৮৯৯। বাই কর্নেল টি. এইচ. হেন্ডলি, ছি.আই.ই., আই.এম.এস., ইন্সপেক্টর-জেনারেল অফ সিভিল হসপিটাল, বেঙ্গল। ক্যালকাটা: বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস। ১৯০০ পৃ -৪৬৮।

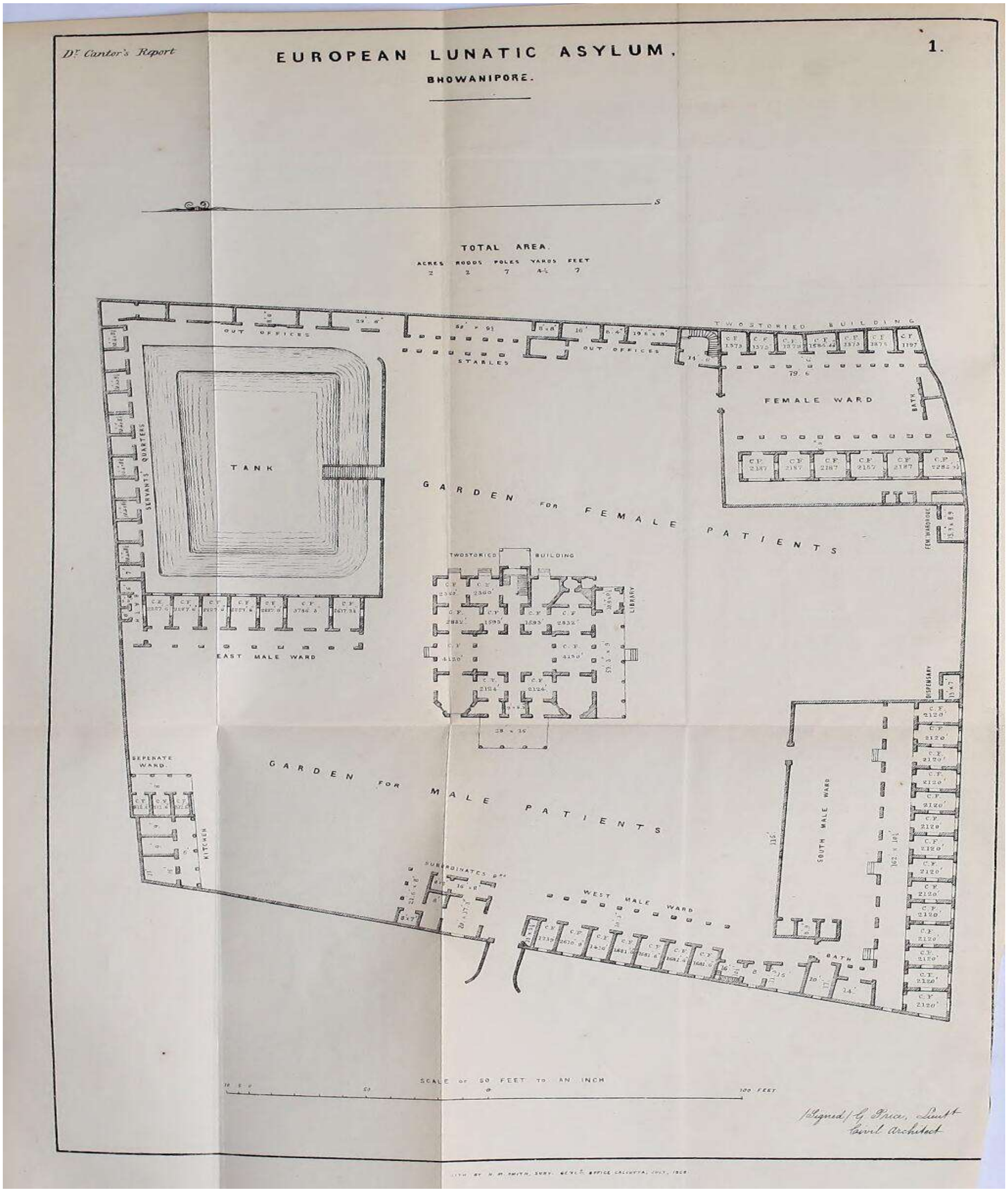


ইউরোপীয়ান লুণাটিক অ্যাসাইলামের বিল্ডিং পরিকল্পনার চিত্র[61]

---

[61] দ্যা রেকর্ড অফ গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল,এন: XXVIII। রিপোর্ট অফ দ্যা অ্যাসাইলামস ফর ইউরোপীয়ান অ্যান্ড নেটিভ ইনসেন পেসেন্টস, এট ভবানিপুর অ্যান্ড দুলুন্দা, ফর ১৮৫৬ অ্যান্ড ১৮৫৭। প্রসেডিং নং- ২৭০, জন গ্রে, ক্যালকাটা গেজেট অফিস, ১৮৫৮

# পাটনা উন্মাদ আশ্রম (১৮২১ খ্রীঃ)

পাটনা উন্মাদ আশ্রমটির বারংবার একস্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবর্তন হওয়ার দৃষ্টান্ত আমরা পায়, ১৮৬৩ খ্রিঃ নাগাদ এই উন্মাদ আশ্রমটি গঙ্গা নদীর তীরে নবরূপে গঠন করা হয়। এই আশ্রমটি মিশনারি, রাজ্যসরকার ও কয়েকটি চ্যাঁরিটেবিল গোষ্ঠীর অর্থ দিয়ে তৈরি করা হয়। এই ভবনটি সম্পূর্ণ সিভিল সার্জেন হ্যাঁচিসনের তত্ত্বাবধানে তৈরি করা হয়। যার বিস্তারিত রিপোর্ট স্যানিটারি কমিশনে উল্লেখ আছে। বিল্ডিং টি নির্মাণ করার ক্ষেত্রে হ্যাঁচিসন নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যবিধি অবলম্বন করেছিলেন। উন্মাদ আশ্রমে জানালা বায়ু চলাচলের অবস্থান, কয়েদিদের জীবন নির্বাহ ও দৈনন্দিন পেশা নজর রেখে, এই উন্মাদ আশ্রম টি তৈরি করা হয়েছিল। হ্যাঁচিসন আশ্রমটির নির্মাণের ক্ষেত্রে আমেরিকান মনোবিদ থমাস ক্রিকব্রাইড এর নকসাকে অনুসরন করেছিলেন। ক্রিকব্রাইড এর লুনাটিক আশ্রম তৈরির যে নকশা সেটি মূলত ট্রিটমেন্ট দর্শনের ওপর ভিত্তি করে হয়েছিল । সেক্ষেত্রে প্রতিটি রোগী যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দে মুক্ত বাতাস, পর্যাপ্ত আলো ও নির্দিষ্ট জায়গায় মধ্যে চিকিৎসা পরিষেবা করত । ফলে উন্মাদ আশ্রমের সুন্দর পরিকাঠামো ও স্বস্থি মূলক পরিবেশ রোগীদের নিরাময়ের ক্ষেত্রে সুবিধা হত। আর এই ধারণা টি জেনারেল সার্জেন হ্যাঁচিসন পাটনা উন্মাদ আশ্রমের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন । এককথায় হ্যাঁচিসনেরে এই পরিকল্পনা পাটনা উন্মাদ আশ্রমকে বদলে দিয়েছে, এবং বাংলা প্রেসিডেন্সি অন্যান্য উন্মাদ আশ্রম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গিয়েছিল।

১৮৮০ খ্রিঃ নাগাদ প্রবল বৃষ্টির কারনে পাটনার নীচু এলাকা গুলি বন্যায় প্লাবিত হয়ে গিয়েছিল। পাটনা উন্মাদা আশ্রম সুরক্ষার জন্য গঙ্গার পাশদিয়ে একটি সুবিশাল পাঁচিল দেওয়া হয়েছিল। ফলে গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ আত্মরক্ষার জন্য আশ্রমটিতে জমা হতে থাকে। রাতারাতি পাগলদের আশ্রম হয়ে ওঠে সাধারন মানুশদের আশ্রয় কেন্দ্র। স্থানীয় বাসীরা বন্যা থাকাকালীন অনেকদিন জাবত এই স্থানে বসবাস করেছিলেন। আশ্রমের প্রধান খোলা মাঠটি হয়ে উঠেছিল সাধারন মানুষের সমাগম । ওই অঞ্চলের গ্রামবাসিরা মিলে বাজার, অফিস ও ব্রিটিশ কর্মীদের আবাস পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ফলে এই সিমিত সময়ে আশ্রমের আশেপাশে বিভিন্ন মানুষের

আগমনের ফলে কিছুটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিলেও অসুবিধা হয়নি[62] । পাটনা লুনাটিক আস্যাইলাম এর অধিনে ছিল মানভূমি, হাজারিবাগ , লোহাডাঙা , সাওতাল পরগনা ,কারৌলি রাজপুর, সাহাবাগ, হুগলি, গয়া, সিংভূম, লাহোড়ি, মুজাফফারপুর, ভাগলপুর, দারভাঙ্গা, পূর্ণিয়া, বীরভূম, এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে উন্মাদ রোগীদের পাটনা উন্মাদ আশ্রমে নিয়ে আসা হত[63] ।

## পাটনা উন্মাদ আশ্রমের সাইট প্লান[64]

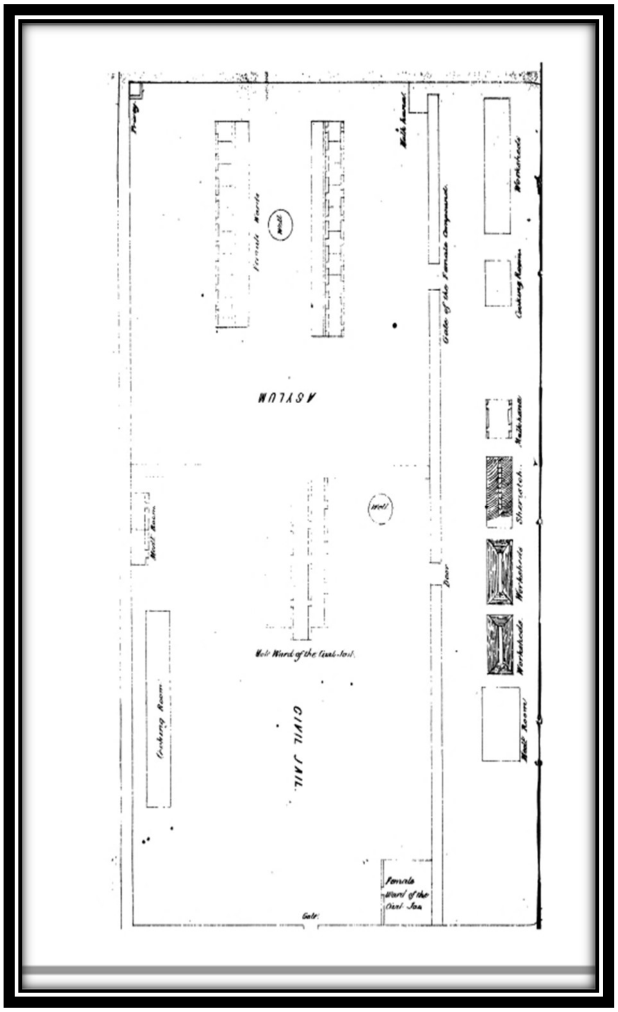


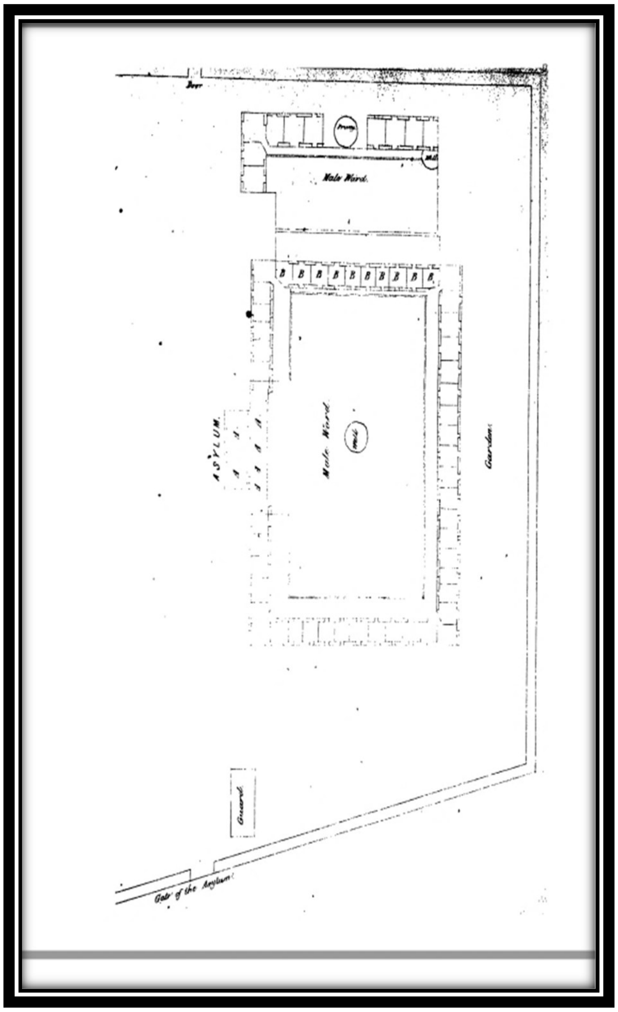


---

[62] আনা উইন্টারবটম অ্যান্ড ফেসিল টেসফায়, এডিটেড হিস্টোরিস অফ ম্যাডিসিন অ্যান্ড হিলিং ইন দ্যা ইন্ডিয়া অসেন ওয়ান্ড দ্যা ম্যাডিয়েভেল অ্যান্ড আর্লি মডার্ন পিরিওড, ভলিউম ওয়ান, প্যালগ্রেভ ম্যাকমিলান, পৃ-১০২, ২০১৬

[63] অ্যানুয়াল রিপোর্ট অন দ্যা লুনাটিক অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৯৯ , জে.এইচ.নিউম্যান ইনস্পেক্টর - জেনারেল সিভিল হসপিটাল অফ বেঙ্গল, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস। ১৯০০

[64] অ্যানুয়াল রিপোর্ট অ্যান্ড রিটার্নস অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৬৩। জে. ম্যাক. ক্লেল্ড, পৃ- ২৭ ও ২৮

# পাটনা উন্মাদ আশ্রমের সাইট প্লান[65]

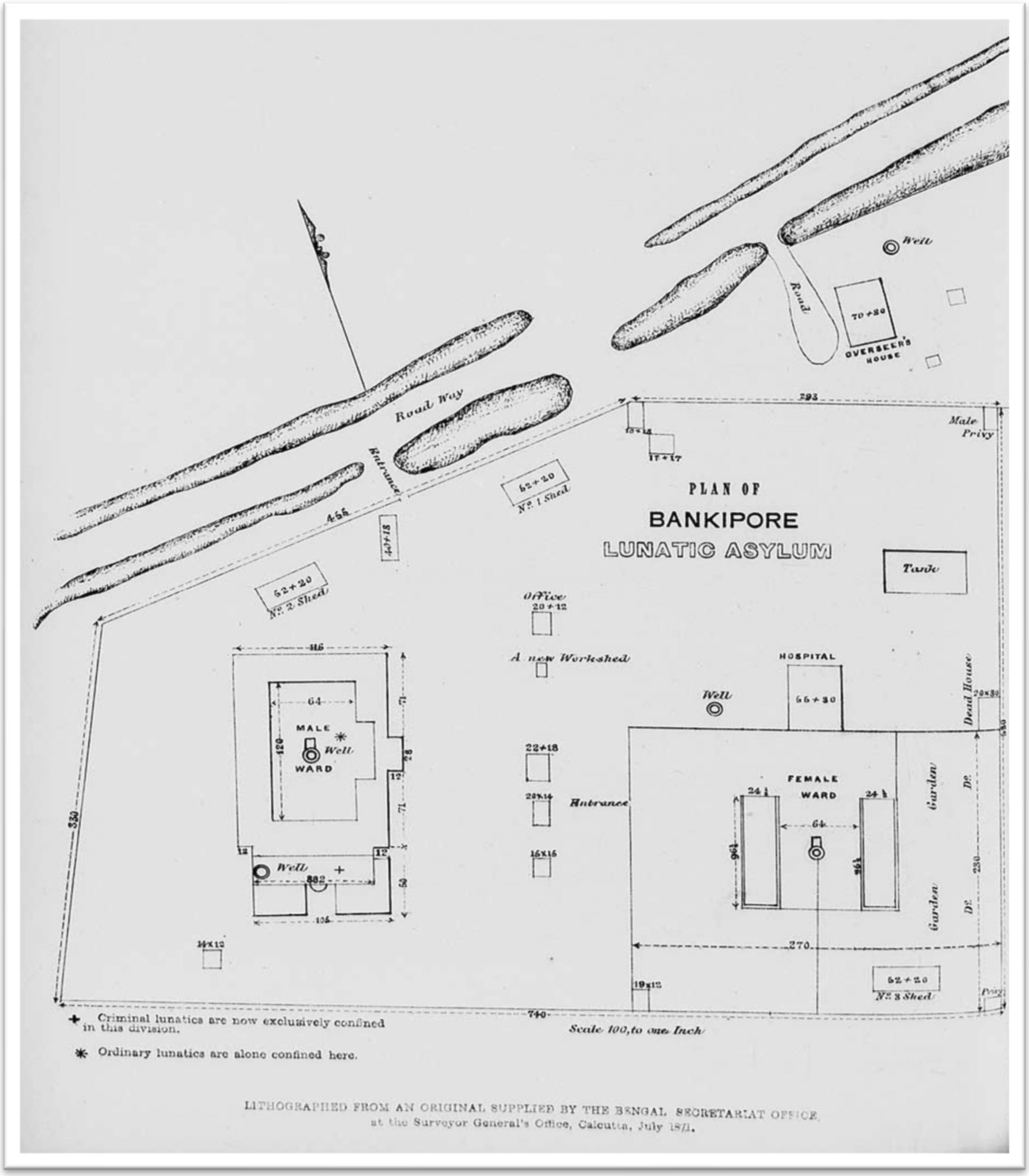


65 অ্যানুয়াল রিপোর্ট অন দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল, ফর দ্যা ইয়ার - ১৮৭০,জে. ক্যাম্পবেল ব্রাউন, ইন্সপেক্টর – জেনারেল অফ হসপিটাল , ইন্ডিয়া মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্ট, ক্যালকাটা।

# ঢাকা উন্মাদ আশ্রম (১৮১৫ খ্রীঃ )

১৮১৫ সালে ঢাকায় একটি নতুন পাগলাগারদ প্রতিষ্ঠিত হয় (বর্তমানে ঢাকা, বাংলাদেশ)। এটি মুরলীবাজারে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের নিকটে অবস্থিত ছিল। জানা যায়, এই পাগলাগারদ সমন্বিত ছিল তিনটি একতলা ভবন এবং দুটি টালির ছাউনি দেওয়া ঘর নিয়ে। এখানে ২৭৮ জন পুরুষ ও ৪৫ জন মহিলা থাকার বন্দোবস্ত ছিল, সুতরাং সর্বমোট ৩২৩ জন মানসিক রোগী থাকার ব্যবস্থা ছিল। ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগসহ রংপুর ও পাবনা জেলার মানসিক রোগীদেরকে ঢাকা পাগলাগারদে নিয়ে আসা হতো[66]। ১৮৭৪ সালে যখন আসাম রাজ্যের অধীনে থাকা জেলাসমূহ বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন হলো, এরপর ১৮৭৬ সালে তেজপুর পাগলাগারদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৭৪ সালে বাংলার প্রদেশে অন্তত পক্ষে ছয়টি পাগলাগারদ ছিল, যেগুলো যথাক্রমে অবস্থিত ছিল ভবানীপুর, ঢাকা, পাটনা, ময়দাপুর, কটক এবং দুলান্দায়[67]। তবে ১৮৭৯ সালে বাংলায় চিকিৎসা খাতে ব্যয় বিষয়ক তদন্ত কমিটির গবেষণা *"লুনাটিক অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল"* নামক প্রতিবেদনে উঠে আসে যে উপরোক্ত পাগলাগারদ ছাড়াও আরও অন্তত দুটি পাগলাগারদ সে সময়ে ছিল। সেগুলো যথাক্রমে বহরমপুর ও হাজারিবাগে অবস্থিত ছিল [68]। এগুলোর প্রায় প্রত্যেকটি পাগলাগারদই জীর্ণ অবস্থায় ছিল এবং এখানকার সেবাপ্রাপ্ত বেশিরভাগ রোগী ছিল ভারতীয়।

বঙ্গদেশে ব্রিটিশদের আগমণের সময় থেকেই মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তিদের, সাধারণ মানুষ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য দুলান্দা , ইউরপিয়ান অ্যাসাইলামের মতো ঢাকাতে ও পাগলা গারদের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু সেই সময়ে রোগীর হাত-পা বেধে চিকিৎসা করা হত ও প্রয়োজন সাপেক্ষে উন্মাদদের সেলে বন্দী করে রাখা হত। ১৯২২ সালে চিকিৎসা প্রণালী উন্নত করা হয় ও পাগলা গারদ নাম পরিবর্তন করে মানসিক চিকিৎসালয় নামে নামকরণ করা হয়।

---

66 বসু ,আমিতরঞ্জন ; ভুঁই ফোরের মনো বিদ্যা চর্চা , চর্যাপদ , কোলকাতা , পৃষ্ঠা -১৩৫

67 অ্যানুয়াল রিপোর্ট অন দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল, ফর দ্যা ইয়ার -১৮৭৪ , আর. ককবার্ন সার্জেন – জেনারেল,অফ জে . এম. ডিপার্টমেন্ট, ইনচার্জ অফ সার্জেন - জেনারেল, ক্যালকাটা।

68 অ্যানুয়াল রিপোর্ট অন দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল ফর দ্যা ইয়ার ১৮৭৯ , এ. জে. পেইন সার্জেন জেনারেল ফর বেঙ্গল, প্রিন্টেড এট দ্যা বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস। ক্যালকাটা প্রেস। ১৮৮০

১৯৩২ সালে নতুন করে অধীক্ষক নিয়োগ করে চিকিৎসালয়ের কাজ-কর্মের ভার অধীক্ষকের হাতে ন্যস্ত করা হয়। ১৮৭৬ সালে ব্রিটিশরা ঢাকা পাগলা গারদ থেকে মানসিকভাবে অসুস্থ রোগীদের স্থানান্তর করে আসামের তেজপুরে পাগলা গারদ স্থাপন করেন।

এই উন্মাদ আশ্রয়টি সেন্ট্রাল জেলের দক্ষিণে, যা একটি সুবিশাল প্রাচীর দ্বারা পৃথক করা হয়। ১৯০৯ সালের সরকারি প্রতিবেদনে দেখা যায় এই বছর কারাগারে কোনো মামলা না থাকলেও আসলামের ১৫৫ টি মত বিচ্ছন্ন ঘটনা ঘটেছে। আশ্রমটির দক্ষিণ, পশ্চিম ও পূর্ব দিক থেকে একটি করে দীর্ঘ নর্দমা বৃহৎ নর্দমার সঙ্গে যুক্ত ছিল , আশ্রম সংলগ্ন এলাকার তাপমাত্রা সাধারনত তাপমাত্রা স্বাভাবিকের একটু বেশী থাকত[69]। প্রবল বেগে বাতাস বয়ে যায় দক্ষিণ ও দক্ষিণপশ্চিম থেকে বয়ে যেত। বৃষ্টিপাত খুবই স্ক্যাল্টি ছিল, ঢাকা উন্মাদ আশ্রমে প্রধানত দুটি বিভাগ, পুরুষ ও মহিলা, একটি লম্বা রাস্তা এবং দুই দেয়াল দ্বারা পৃথক পুরুষ ও মহিলা বিভাগ আলাদা ছিল . পুরুষ দের জন্য ঘুমানোর জায়গা ছিল মোট ৬টি এবং মহিলা ২ টি। পুরুষ পাশে থাকার বাসস্থান টিউবারলে ওয়ার্ডে ২১৮+২০ এবং মহিলা ৪৫। প্রাদুর্ভাবের সময় জনসংখ্যা ছিল পুরুষ ২২৮ , মহিলা ৪২, তাই কার্যত সেখানে ভিড় ছিল না[70]।

উপরোক্ত পরিসংখ্যানগুলি থেকে দেখা যায় যে দু-একটি ওয়ার্ড ব্যতীত সমস্ত ব্যারাক গুলিতে হাসপাতালের ডায়েট হিসাবে ব্যবহৃত হয়, দুধ, গুড়,সুজি, এবং ফ্যানভাত অসুস্থ, আক্রান্ত উন্মাদ রোগী দের দেওয়া হতো, আবার টিউবার্কাল ওয়ার্ড এবং মহিলা ওয়ার্ড গুলিতে আংশিকভাবে এই খাদ্য গুলি দেওয়া হতো[71]।আশ্রমে ভেন্টীলেশন ও আলো চলাচল এর ব্যবস্থা টি ছিল একটি গুররুত্বপূর্ণ বিষয়,উপযুক্ত বায়ু চলাচল ও বেশী আলোকিত ওয়ার্ড গুলিতে বেশী করে উন্মাদ দের রাখা হতো, বিশেষ করে পুরুষ দের ১১/8 নম্বর কক্ষটি বৃহৎ আকারের হওয়ায় বেশী সংখ্যক রোগী দের রাখা হত।

---

[69] অ্যানুয়াল রিটার্ন ফর দ্যা লুনাটিক অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল উইথ ব্রিফ নোটস ফর দ্যা ইয়ার ১৯০৯. কর্নেল আর . ম্যাক্রে, ইন্সপেক্টর - জেনারেল অফ সিভিল হসপিটাল, দ্যা বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট ১৯১০। ক্যালকাটা

[70] দ্যা. ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেট, ক্যাম্পবেল, আউটব্রেক অফ এপিডেমিক ড্রপসি ইন দ্যা লুনাটিক অ্যাসাইলাম, ঢাকা, মার্চ ১৯০৮, সেপ্টেম্বর; ৪৩ (৯): পৃ – ৩২৭

[71] দ্যা. ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেট, ক্যাম্পবেল, আউটব্রেক অফ এপিডেমিক ড্রপসি ইন দ্যা লুনাটিক অ্যাসাইলাম, ঢাকা, ১৯০৯, সেপ্টেম্বর; পৃ-৩২

সিভিল সারীজেন্ট *R.Neil Campbell*, এর প্রতিবেদনে দেখা যায় জন সঙ্কুলানের অভাবে অধিক সংখ্যক রোগী কে এক সাথে আটকে রাখার ফলে সবাই কাঠের বেড-এ ঘুমানোর সুযোগ পেত না ফলে কিছু রোগী দের মেঝেতে ঘুমাতে হতো। আবার একই ঘটনা মহিলা ওয়ার্ড ১১/৪ নম্বরে ঘটতে দেখা যায়। এরূপ পরিস্থিতিতে মেঝেতে ঘুমানো বেশিরভাগ রোগী মানসিক রোগ ছারাও অন্যান্য শারীরিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে উঠে। এর মূল কারণ ছিল উন্মাদ আশ্রমের রোগী দের ঘুমানোর ক্ষত্রে খুব কষ্ট ভোগ করতে হতো, এক দল রোগী কাঠের বিছানা আর অপর এক দল রগী মেঝতে ঘুমানোর ফলে এরূপ ঘটনা দেখা যায়[72]। ১৯০৫ এর প্রতিবেদনে উঠে আসে ঢাকার আশ্রমে পাগল দের বেশির ভাগ ব্যাধি গ্রস্থ হয়ে ওঠার ফলে কত্রিপক্স উক্ত বিষয় টি তদন্ত করে খুব শিঘ্র সমাধানের চেষ্টা করে ।

এই উন্মাদ আশ্রমটি সেন্ট্রাল জেলের দক্ষিণে, যা একটি সুবিশাল প্রাচীর দ্বারা পৃথক করা ছিল। ১৯০৯ সালের সরকারি প্রতিবেদনে দেখা যায় এই বছর কারাগারে কোনো অসুস্থ রোগী ভর্তি না হলেও এই অ্যাসাইলামে ১৫৫ টির মত বিচ্ছিন্ন ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায় যেমন , কলেরা আক্রান্ত , টাইফয়েড জ্বরের মত ঘটনা । আশ্রমটির দক্ষিণ, পশ্চিম ও পূর্ব দিক থেকে একটি করে দীর্ঘ নর্দমা বৃহৎ নর্দমার সঙ্গে যুক্ত ছিল, আশ্রমটির সংলগ্ন এলাকার তাপমাত্রা সাধারনত স্বাভাবিকের থেকে একটু বেশী থাকত। প্রবল বেগে বাতাস দক্ষিণ ও দক্ষিণপশ্চিম দিক থেকে বয়ে যেত[73] ।

ঢাকা উন্মাদ আশ্রমের একটি বিশেস্বত্ত পাগলদের যে ঘরে রাখা হত, সেই ঘরের মধ্যে লোকপ্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটানো। যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল মাটির তৈরি খাট। এই উন্মাদ রোগীদের দিনের বেলাতে একটি ঘরে এবং রাতে শোয়ার জন্য আরেকটি ঘরে নিয়ে যাওয়া হত, যা স্লিপিং ব্যারাক নামে খ্যাত। সমগ্র আশরেম মোট ১১ টি ব্যারাক ছিল। প্রধান ব্যারাক টি (১১/১) ছিল

---

[72] দ্যা. ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেট, ক্যাম্পবেল, আউটব্রেক অফ এপিডেমিক ড্রপসি ইন দ্যা লুনাটিক অ্যাসাইলাম, ঢাকা, ইন মার্চ ১৯০৮, ১ সেপ্টেম্বর; ৪৩ (৯): পৃ – ৩২৮

[73] দ্যা ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেট, ক্যাম্পবেল, আউটব্রেক অফ এপিডেমিক ড্রপসি ইন দ্যা লুনাটিক অ্যাসাইলাম, ঢাকা,ইন মার্চ ১৯০৮, ১৯০৮ সেপ্টেম্বর ৪৩ (৯): পৃ – ৩২৯

সর্ব সাধারণের উন্মুক্ত ,ব্যারাক ১১/২ ব্যারাক দুটি অংশে বিভক্ত ছিল, প্রতিটি ব্যারাক ছিল মেঝে যুক্ত, আবার কয়েকটি জায়গায় মাটির উচ্চ থান করে খাটের মতো শোয়ার স্থান করা হয়েছিল ।যা বিগত ২০ বছর ধরে, এই পদ্ধতিতে মাটির শয্যায় প্রচলিত ছিল। ব্যারাক ১১/৩ এটি মূল ভবন বা পুরনো বিল্ডিংটি ছিল পিচ ও সিমেন্টের মেঝে যুক্ত, কিন্তু সেখানে কোনো শোয়ার জায়গা ছিলনা। ব্যারাক ১১/8 এটি ছিল সাধারণ মানের কক্ষ , পরবতীর্কালে এখানে মাটির তৈরি বিছানা পরিবর্তন করে, কাঠের তক্তার তৈরি বিছানা ( Bed ) আনা হয় । ব্যারাক ১১/৫, ১১/৬ এবং ১১/৭ আবার মাটির মেঝে পরিবর্তন করে সিমেন্টের মেঝে তৈরি করা হয়। ব্যারাক ১১/৮ এটি ছিল উচ্চ ভীতির উপর তৈরি হয়েছিল। উন্মাদ রোগীদের আটকে রাখার জন্য ৩ টি সেল ( ছোটো ঘর ) তৈরি করা হয়েছিল। সেখানে কোনো শোয়ার জায়গা বা বিছানা ছিলনা। টিউবার ওয়ার্ড ( সরু প্রকষ্ঠ ) এটি উচ্চ ভীতির উপর তৈরি বিল্ডিং, যেটি খুব সম্প্রীতি করা হয়েছিল,এবং মেঝে ছিল পাকা এবং কাঠের বিছানা যুক্ত। ফিমেল মেন ব্লক মহিলাদের প্রধান ওয়ার্ডে ছিল পাকা এবং কাঠের তক্তা যুক্ত বিছানা সজ্জিত। এটি ১৯০৭সালে আধুনিকরনের ববস্থা করা হয়। ফিমেল সেল ( মহিলা প্রকষ্ঠ ) এটি ছিল সুরক্ষিত, পাকা, মেঝে যুক্ত। শয্যা ও বিছানার ব্যবস্থা ছিল [74]।

ঢাকার পাগলা গারদে ২১৭ জন পুরুষ পাগল আর ৪৫ জন নারী পাগলের থাকার ব্যবস্থা ছিল। ১৮৫৭ থেকে ১৮৬৬ সাল পর্যন্ত গড়ে ৯৫ জন করে রোগী এই পাগলা গারদে থেকেছে। যেই অঞ্চল থেকে পাগলেরা এখানে আসতো তা হচ্ছে, ময়মনসিংহ, সিলেট, কাছার, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, পাবনা, বগুড়া, কুচবিহার, এবং আসাম। এদের বেশীরভাগই ছিল অতিরিক্ত গাঁজা পানের ফলে সাইকোসিসের রোগী। বছরে এই পাগলা গারদের জন্য খরচ হতো সেই সময়ের ২৬ হাজার টাকা মানে এক একটি রোগীর জন্য খরচ হত পৌনে তিনশো

[74] দ্যা ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেট, ক্যাম্পবেল, আউটব্রেক অফ এপিডেমিক ড্রপসি ইন দ্যা লুনাটিক অ্যাসাইলাম, ঢাকা,ইন মার্চ ১৯০৮, ৪৩ (৯): পৃ - ৩২৯

টাকা [75] ।সার্জন জে ওয়াইস, এম ডি, সারা বছর ধরে দায়িত্বে ছিলেন এবং একটি পূর্ণ এবং খুব আকর্ষণীয় প্রতিবেদন পেশ করেছেন ।

*১৩ নং বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে,এই উন্মাদ আশ্রমে পরিসংখ্যানগত দিক থেকে পাগলরোগীদের শারীরিক স্বক্ষমতা স্বাভাবিক রয়েছে। বিগত পাঁচ বছরেও তা ঠিকঠাক ছিল। প্রকৃতপক্ষে, এই বছরের উন্মাদ আশ্রমে পরিসংখ্যানগত দিকটি পূর্ববর্তী দশ বছরের গড় থেকে শুধুমাত্র ১.৪২ মাত্রায় (হ্রাস) এর পার্থক্য দেখা যায়, তবে গড় শারীরিক স্বক্ষমতা ভর্তির শতাংশে একটি খুব উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে এক বছরের মধ্যে ১৯.৮ শতাংশ পার্থক্য দেখা গেছে। মৃত্যুর হার এবং আরোগ্য নিরাময়ের শতাংশের হার বেশ উন্নতি হয়েছে[76] ।*

## ঢাকা উন্মাদ আশ্রমের রোগীদের চিত্র সরনী – ১৮৬৭ থেকে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত[77]

STATEMENT No. XIII.

| Years. | Daily average number. | PER CENT. OF AVERAGE STRENGTH. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Admitted. | Discharged. | | | Deaths. | Total discharges and deaths. |
| | | | Cured. | Improved. | Otherwise. | | |
| 1867 ... | 210 | 36·6 | 16·2 | 3·3 | 3·8 | 16·6 | 39·9 |
| 1868 ... | 200 | 56· | 20·5 | 7· | ·4 | 22·5 | 54· |
| 1869 ... | 232 | 42·6 | 12·5 | 2·5 | 3·01 | 17·6 | 35·6 |
| 1870 ... | 222 | 34·7 | 15·3 | 4·5 | 5· | 18·5 | 43·3 |
| 1871 ... | 213 | 37·5 | 13·6 | 5·1 | 1·9 | 19·7 | 40·3 |
| Average ... | 215·4 | 41·5 | 15·6 | 4·5 | 3·5 | 18·9 | 42·6 |
| 1872 .. | 218 | 57·3 | 17·4 | 6·4 | 1·8 | 18·4 | 44· |

---

[75] অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলামস ইন বেঙ্গল ফর দ্যা ইয়ার ১৮৬৭, ডাব্লু , এ , গ্রীন, ইন্সপেক্টর - জেনারেল অফ হসপিটাল, লয়ার প্রভিন্সেস । ক্যালকাটা

[76] দ্যা জেনারেল রিপোর্ট অন দ্যা লুনাটিক অ্যাসাইলাম, ভ্যাক্সিনেশন অ্যান্ড ডিসপেনসারি অফ দ্যা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, ১৮৭২, সার্জন ই.এ.ব্রিচ , ঢাকা লুনাটিক অ্যাসাইলাম ক্যালকাটা, অফিস সুপারিন্টেনডেন্ট অফ গভর্নমেন্ট, পৃ – ১৫।

[77] দ্যা জেনারেল রিপোর্ট অন দ্যা লুনাটিক অ্যাসাইলাম, ভ্যাক্সিনেশন অ্যান্ড ডিসপেনসারি অফ দ্যা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, ১৮৭২, সার্জন ই.এ.ব্রিচ , ক্যালকাটা, অফিস অফ সুপারিন্টেনডেন্ট অফ গভর্নমেন্ট।

ডঃ ওয়াইস উল্লেখ করেছেন পূর্ববর্তী দশক গুলির তুলনায়এই আশ্রমে রগীরা শারীরিক অসুস্থতা,(যেমন জ্বর, সর্দি কাশি , কিংবা কলেরা মত রোগ ) ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে, রোগী মনসিক সমস্যা ছাড়া শারীরিক ব্যাধিতে এখন কমে গেছে। তবে দু একটি ক্ষত্রে পার্থক্য জনিত ও দুর্ঘটনা বশতঃ পাগল রা বিভিন্ন রোগে আক্রন্ত কম বেশী আক্রান্ত হতে দেখা গেছে। ডঃ ওয়াইস এই পার্থক্যগুলি কী দুর্ঘটনাজনিত পরিস্থিতিতে নির্ভর করে তা উল্লেখ করে। তিনি আশ্রমে পাগলদের ভর্তি সংক্রান্ত বিষয়ে লিখেছেন ...

> *যে জেলার ভবঘুরে পাগলদের সংখ্যা খুব বেশী, সেই জেলায় পুলিশের সহযোগিতায় কিছু পদক্ষেপ নিলে উন্মাদ রোগীর সংখ্যা আপাত হ্রাস করা যেতে পেতে পারে, এক্ষেত্রে একজন ম্যাজিস্ট্রেট যদি পুলিশকে নির্দেশ দেন যে, সমস্ত গৃহহীন বা ভবঘুরে পাগলদের উন্মাদ আশ্রমে পাঠাতে হবে এবং তাদের চিকিৎসা করে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে। কিন্তু এই ধরনের কোন আদেশ ঢাকা বা তার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির জন্য দেওয়া হয়নি* [78] ।

উন্মাদ আশ্রমের যে সমস্ত পাগল রা ভর্তি হয়েছিল তাদের বেশীরভাগ পূর্ববর্তী জীবনের পেশা ছিল কৃষি শ্রমিক । তবে ডঃ ওয়াইজ কৌতূহলীয় সত্যের মন্তব্য করেছেন যে পূর্ববাংলার সর্বাধিক সংখ্যক হিন্দু কৃষিক্ষেত্র এবং বেশির ভাগ নিঃসন্দেহে নিম্নবর্ণের চন্ডাল[79] । রোগীদের স্বাস্থ্য প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যায় ভর্তির প্রায় অর্ধেকই রুগ্ন ও হীনমন্য কিংবা ("উদাসীন" এবং "খারাপ" হিসাবে শ্রেণির) ছিল এবং যারা "খারাপ" স্বাস্থ্যে ভর্তি হয়েছিল , তাদের উপযুক্ত চিকিৎসা করা স্বত্তেয় ঠিক তার অর্ধেকটি বছরের শেষের আগে মারা গিয়েছিল। মৃত্যুর প্রায় অর্ধেক (৪০ জনের মধ্যে ১৯) যা ঘটেছিল তা ফুসফুসের রোগের কারণে হয়েছিল এবং এর বেশিরভাগই নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত। এই আশ্রয়কেন্দ্রটির কার্যকলাপ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যতে, হাসপাতালের মহাপরিদর্শক Dr. Wise লিখেছেন-

> *আমি (ড. ওয়াইজ) অনুমান করেছি যে, নেশাগ্রস্থ উন্মাদ রোগীদের অত্যধিক মৃত্যুর অন্যতম কারন কঠিন ফুসফুস পীরায় আক্রান্ত , যারফলে আশ্রমে পাগলদের স্বাবাভিক*

---

[78] দ্যা জেনারেল রিপোর্ট অন দ্যা লুনাটিক অ্যাসাইলাম, ভ্যাক্সিনেশন অ্যান্ড ডিসপেনসারি অফ দ্যা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, ১৮৭২, সার্জন ই.এ.ব্রিচ , ক্যালকাটা, অফিস অফ সুপারিন্টেনডেন্ট অফ গভর্নমেন্ট, ১৮৭৫, পৃ – ১৫।

[79] তদেব, পৃ -16

*অবস্থা হারিয়ে গিয়েছিল, আবার আশ্রমে অত্যধিক ভিড়ের কারণে, তা প্রতিহত করা যাচ্ছিল না । কারন চলতি বছরের তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছিল*[80] ।

আবার দেখা যায় , অতিরিক্ত উষ্ণ পোশাকে পরিধারনের ফলে আগে রোগীরা প্রায়শঃ পেটের রোগে ভুগতো, ফলে সেই বিষয়টি নজরে আনার পর রোগীদের পোশাক পরিচ্ছদ পরিবর্তন করে সহিষ্ণু পশাকের ব্যবহারের  ফলে মৃত্যুহার উন্মাদ রোগীদের পেটের রোগ বা অন্ত্রজনিত সমস্যা অনেক টা কমিয়ে আনা হয় । এই বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করে আশ্রমের পাগলদের অবস্থার উন্নতি ঘটানো হয়। Dr. wise তার প্রতিবেদনে উল্লেখ্য করেছে উন্মাদ আশ্রমে ভর্তি বেশীর ভাগ রোগীর পাগল হওয়ার কারণ হিসাবে গাঁজা সেবন কে দায়ী করেছেন, কারণ পূর্ব বাংলায় গাঁজা চাষের প্রাদুর্ভাব বেশী ছিল । ফলে দীর্ঘ দিন ধরে গাঁজা নেশাগ্রস্থ মানুষ ও মনো বিকৃতি সমস্যা যুক্ত মানুষদের এই অ্যাসাইলামে ভর্তি করা হয়েছিল। তিনি আবার এও উল্লেখ করেছেন যে বঙ্গ প্রদেশে এক বিশেষ সম্প্রদায়, ফকিরি, *Bairaois. The Ramawats and Brahmacharies,* যেমন যারা নিয়মিত গঞ্জিকা সেবন করেও সমাজের মধ্যে বসবাস করে, কিন্তু তারা পাগল হয় না এবং লুনাটিক অ্যাসাইলামেও ভর্তি হয় না।

> Wise's interesting observations upon effect of the various preparations of hemp in producing insanity have been already given in full, but he adds……. It is a noteworthy fact that in this table there is no religious mendicant returned but from among the Bairaois. The Ramawats and Brahmacharies, who live doing little else but smoking ganjah, are never admitted into this asylum. And this seems to bear out a remark made in another part of the report, viz., that ganjah is less deleterious than is generally supposed, and that although it is to some extent an undoubted cause of insanity, it is generally even then an indirect cause by leading to poverty and physical degeneration, which operate as the direct causes of psychical degeneration or aberration. Ganjah-smoking he does not consider to be an incentive to crime .[81]

---

[80] দ্যা জেনারেল রিপোর্ট অন দ্যা লুনাটিক অ্যাসাইলাম, ভ্যাক্সিনেশন অ্যান্ড ডিসপেনসারি অফ দ্যা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, ১৮৭২, সার্জন ই.এ.ব্রিচ , ঢাকা লুনাটিক অ্যাসাইলাম ক্যালকাটা, অফিস সুপারিন্টেনডেন্ট অফ গভর্নমেন্ট, পৃ – ১৬।

[81] দ্যা জেনারেল রিপোর্ট অন দ্যা লুনাটিক অ্যাসাইলাম, ভ্যাক্সিনেশন অ্যান্ড ডিসপেনসারি অফ দ্যা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, ১৮৭২, সার্জন ই.এ.ব্রিচ , ঢাকা লুনাটিক অ্যাসাইলাম ক্যালকাটা, অফিস সুপারিন্টেনডেন্ট অফ গভর্নমেন্ট, ১৮৭৫, পৃ – ১৬ ।

## পাগলের ঘটনা-১

ধর্মীয় উন্মদনা ও কুসংস্কার বাংলার স্থানীয় দের মধ্যে ভীষণ ভাবে লক্ষ্য করা গিয়েছিল । ১৯০৯ খ্রীঃ ডঃ ওয়াইসের দেওয়া বিভিন্ন ঘটনা গুলি এ ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সনাতন চন্দ অসাবধান বশত নিজের গরু কে এমন ভাবে বেঁধে রাখেন যে প্রাণীটি গলায় দড়ির ফাঁস লেগে মারা যায়। নিজের এই গুরুতর অপরাধ বোধের পরিবর্তে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ একমাস তিনি নিরব হয়ে গেছিলেন এবং দরজায় দরজায় ভিক্ষা করে স্বাভাবিক অভ্যাস অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু এইরুপ কাজের গ্রামবাসীরা তা কে ঘৃণা করতে শুরু করেন এমন কি সমাজ তাকে পাপিষ্ঠ বলে মনে করতে থাকে। ফলে গভীর দুর্দশা ও হতাশার শিকার হয়েছিলেন , ফলে এই ঘৃণিত কাজের জন্য তার মন দুর্বল হয়ে গিয়েছিল এবং ক্ষমার প্রতি আশা হারিয়ে ফেলেন। ক্রমশঃ সনাতন ছন্দ মনবিকারগ্রস্থ রোগী তে পরিণত হয়ে যায়। ডঃ ওয়াইসের এর মতে একমাত্র ধর্মীয় নৈরাশ্য ও কুসংস্কারের কারনে এই রুপ উন্মাদনা যা খুবই কৌতূহলজনক [৮২]। এই রুপ আর একটি ঘটনার হল--

## পাগলের ঘটনা-২

আর একটি অদ্ভুত ঘটনা, যেটি তীব্র উন্মাদনার পরিচয় বহন করে। এই ঘটনা টি আতঙ্ক গ্রস্থতার ফলে এই উন্মাদনা তৈরি হয়েছিল। যে ঘটনাটি ঠিক এক বছরের মধ্যে সংগঠিত হয়েছিল যা নেটিভদের কুসংস্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বিবেচিত হয়েছিল। গোলাম আলি,বয়স ছিল ১৩ , যে তার বাড়িতে বাবা মা, ঠাকুরমা সঙ্গে থাকত। একদিন সে জঙ্গলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল হটাৎ একটি বানর দৌড়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল। সে এতটায় আতঙ্কিত হয়ে গেছিল যে ভয়ে প্রায় আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল ।ইতি পূর্বে গোলাম আলি বানরের কথা শুনেছে কিন্তু কখন এতো কাছে থেকে দেখেনি, কিন্তু বানর টির মুখ ছিল তার ঠাকুরমার মতো। কিছুক্ষণ পর বানর টি তাকে ছেরে দায় , সে ভয় পেয়ে নির্বাক হয়ে বাড়ি ফিরেছিল, এবং ঠাকুরমার কাছে গিয়ে উত্তেজিত হয়ে জানতে চাইলো, কেন

---

82 দ্যা জেনারেল রিপোর্ট অন দ্যা লুনাটিক অ্যাসাইলাম, ভ্যাক্সিনেশন অ্যান্ড ডিসপেনসারি অফ দ্যা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, ১৮৭২, সার্জন ই.এ.ব্রিচ , ঢাকা লুনাটিক অ্যাসাইলাম ক্যালকাটা, অফিস সুপারিন্টেনডেন্ট অফ গভর্নমেন্ট, Note

*Religious insanity is exceedingly rare amongst the natives of India. The following case given by Dr. Wise is therefore worthy of record :Sonatan Chongo having inadvertently tied his cow in such a manner that the animal strangled herself, he, instead of expiating this grave offence by wearing a rope round his neck, remaining silent for a month, and begging from door to door, followed his usual avocations. The coldness and abhorrence of such impiety displayed by his fellow villagers worked upon a mind naturally weak. He became a prey to deep melancholy and despair, deploring his wretched fate and the hopelessness of being forgiven.*

সে বানরের রুপ ধারন করে তাকে জড়িয়ে ধরেছিল? ঠাকুরমা তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন কিন্তু ব্যর্থ হয়। এই ঘটনার পর ছেলেটি নির্বাক অবস্থায় মতো পরিণত হয়, কখনও কথা বলতো না , সারাদিন চিন্তিত অবস্থায় নিজের গন্ডীর মধ্যে বসে থাকত, এমন কি প্রকৃতির ডাকে ও সারা দিত না , ক্রমশঃ ছেলেটি পাগল হয়ে যায় , অতপর উন্মাদ আশ্রমে ভর্তি হওয়ার পর এই অবস্থা ১০ দিন স্থায়ী ছিল এবং পরবর্তী কালে কিছুটা উন্নতির লক্ষণ দেখা যায়[83] ।

জলপাইগুড়ি থেকে আগত পাগলদের মৃত্যু সরকারি প্রতিবেদনে উল্লেখিত বেঙ্গল প্রতিবেশীর হার অন্য যে কোন অঞ্চলের তুলনায় বেশী ছিল। একারনে স্পস্টতায় তাদের অতঃপর চিকিৎসা পরিসেবা দেওয়ার জন্য তাদেরকে পাঠানো হয়েছিল অন্য আশ্রমে । কিছু অজ্ঞাত কারণ ছিল - সাহিবগগঞ্জ থেকে কলকাতা এবং সেখান থেকে স্টিমারে করে ঢাকার উদ্দেশ্য যাত্রা শুরু করে, তাদের মধ্য বেশিরভাগেই শারীরিক আবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ে। যাত্রার ক্ষেত্রে পুরোপুরি অযোগ্য হয়ে পড়ে, নৌকায় করে যাত্রা করে ধুরবি থেকে বাংলা সরকারের আদেশ অনুসারে পরবর্তী পথটি অতঃপর অদ্যবধি অনুসরণ করে। বিগতবছর প্রতিবেদনে ডঃ ওয়াইস দেখিয়েছেন যে মৃত্যুহার ভ্রমনকারীদের আনুপাতের তুলনায় সীমানা অতিক্রান্ত করেছে, এবং তিনি পূর্ববাংলা ভ্রমনের আসুবিধা তুলে ধরেছিলেন। আটক নিয়ন্ত্রণ, রক্ষকদের ক্লাস, যান্ত্রিক ভাবে কোন আটককে বছরের জন্য নিযুক্ত করা হয়নি। গড়ে ১৮৯ জন পাগলকে কার্যকর পেশায় নিযুক্ত করা হয়েছিল। উন্মুক্ত এবং অবাধ্য পাগলগুলিত তেল- কলগুলি ও আগাছা মুক্ত করার জন্য বাগান ও রাস্তার কাজে লাগান হয়। যখন বাগান করা সুরকি- পাউন্ডিং এর মত বাকি কাজ গুলিতেও

---

[83] দ্যা জেনারেল রিপোর্ট অন দ্যা লুনাটিক অ্যাসাইলাম, ভ্যাক্সিনেশন অ্যান্ড ডিসপেনসারি অফ দ্যা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, ১৮৭২, সার্জন ই.এ.ব্রিচ , ঢাকা লুনাটিক অ্যাসাইলাম ক্যালকাটা, অফিস সুপারিন্টেনডেন্ট অফ গভর্নমেন্ট,. <u>*Note :*</u>
*This is the only case within my recollection of a Hindu affected with religious melancholia. A curious case of insanity due to superstition is also recorded and may be repeated—Another very singular case, which is returned as acute dementia, but which properly should have been classed under melancholia (attonita), was admitted during the year. It is important, as showing another phase of native superstition. Ghulam Ali, aged 13, lived at his home with his parents and his grandmother. One day passing through a patch of jungle, a monkey ran up and embraced him. Its face wore the likeness of his grandmother. He was so terrified that he does not recollect what he heard the animal say. It quitted him, and he ran home scared and almost speechless. He went to his grandmother and asked her why she had assumed the form of a monkey. She tried to pacify him, but failed, and the poor boy became perfectly mad. Since his admission he has regularly, at intervals of a month, fallen into a state of lethargy, never speaking, but sitting with vacant looks, staring on the around, and paying no attention to the calls of nature. his lasts for ten days, when he suddenly becomes excited and very talkative. After a few days be improves; but his mind is feeble and child-like.*

তাদের নিযুক্ত করা হত। একটি বড় মুনাকার ফলস্বরূপ সরকারী রক্ষকদের দেওয়া বেতন ভালোশ্রেণির কর্মীদের পক্ষে যথেষ্ট না হলেও তাদের মজুরি বৃদ্ধিতে কিছুটা সহায়তা করেছে [84]।

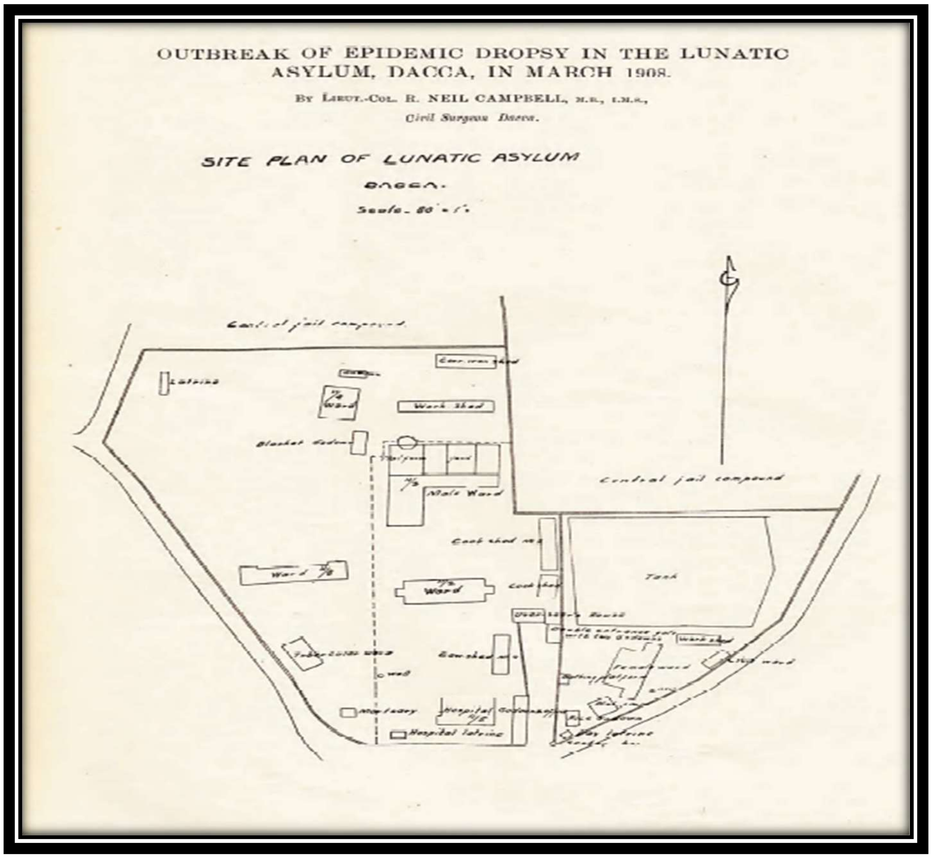


***Site Plan of The Lunatic Asylum, Dacca*[85]**

The Lunatic Asylums Of Bengal [86]. *Out of the five asylums which Bengal possesses for its native lunatics two of the largest show a marked decrease in 1898 in the number of patients admitted. This diminution is sup- posed to be due to the fact that the population suffered far less from famine than in the previous year, consequently not only was there less mental aberration owing to want of food, but those lunatics usually maintained privately by relatives were not, as in 1897, driven into the asylums by the general distress prevailing. A satisfactory sign of the efficacy of the treatment given is afforded by the fact that at Dullunda, one of the largest asylums in Bengal, there were fewer readmissions, and the number of recoveries showed a marked increase. The admissions to hospitals and the daily average sick had decreased by 122, which is attributable to improvement in sanitation, to the issue*

---

[84] দ্যা জেনারেল রিপোর্ট অন দ্যা লুনাটিক অ্যাসাইলাম, ভ্যাক্সিনেশন অ্যান্ড ডিসপেনসারি অফ দ্যা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, ১৮৭২, সার্জন ই.এ.ব্রিচ , ঢাকা লুনাটিক অ্যাসাইলাম ক্যালকাটা, অফিস সুপারিন্টেনডেন্ট অফ গভর্নমেন্ট,

[85] দ্যা ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেট, ক্যাম্পবেল, আউটব্রেক অফ এপিডেমিক ড্রপসি ইন দ্যা লুনাটিক অ্যাসাইলাম, ঢাকা,ইন মার্চ ১৯০৮, ১৯০৮ সেপ্টেম্বর; ৪৩ (৯): পৃ – ৩২৭

[86] দ্যা হসপিটাল , নভেম্বের ১৮, ১৮৯৯, পৃ- ১১৯-১২০।

*of prophylactics, and to the maintenance of the "infirm gang," which facilitates the early recognition and care of those losing in health. The desirability of the maintenance of an " infirm gang " in lunatic asylums is a matter at present under discussion. It is objected to by some superintendents on the ground that it gives a false idea of the health of the asylum, and because all deviations from normal condition, whether fits, excitement, paralysis, or other ailments, should, it is maintained, be closely observed by the civil hospital assistant, and when necessary relegated to the hospital or cells. But after inspecting the two asylums Dullunda and Dacca, where this system is at work, the Inspector-General of Civil Hospitals has come to the determination that it should be maintained in all the lunatic asylums at the discretion of the super-intendents. The " infirm gang " simply means that weakly- looking persons are more frequently weighed, receive some extra diet, and are given tonics and drugs. By thus keeping the weakly and aged under closer observation serious disease is often warded off. It is therefore desirable as a part of general management in an institution in which all the inmates are really diseased; and at Berhampore the 'superintendent has been asked to introduce the system and report the result after six months. The management of the European lunatic asylum at Bhawanipur, where there is accommodation for 42 inmates, appears to have been perfectly satisfactory, and a lawn tennis ground has lately been added for the benefit of the patient.*

## ঢাকা উন্মাদআশ্রমে রোগীদের একটি পরিসংখ্যান ১৮৫৫ খ্রীঃ১৮৬২ খ্রীঃ পর্যন্ত[87]

**Shewing the sickness and mortality in the Ducca Lunatic Asylum for the last eight years.**

| Years. | Daily average strength of Lunatics. | Deaths. | | | | Ratio per cent. of deaths to Daily average strength. | | | | Remarks. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | By ordinary diseases. | By cholera. | By suicide (hanging) | Total. | By ordinary diseases. | By cholera. | By suicide (hanging) | Total. | |
| 1855 | 213 | 39 | 21 | 0 | 60 | 18·30 | 9·85 | 0 | 28·16 | Old dietary. Defective Conservancy. Sleeping on ground. |
| 1856 | 196 | 42 | 2 | 1 | 45 | 21·42 | 1·02 | 51 | 22·95 | Ditto ditto. |
| 1857 | 183 | 59 | 8 | 0 | 67 | 32·24 | 4·37 | 0 | 36·61 | Ditto ditto. |
| 1858 | 172 | 31 | 3 | 0 | 34 | 18·02 | 1·74 | 0 | 19·76 | Ditto ditto. |
| 1859 | 193 | 12 | 2 | 0 | 14 | 6·21 | 1·03 | 0 | 7·25 | Improved dietary and Conservancy. Sleeping on wood. |
| 1860 | 212 | 18 | 2 | 0 | 20 | 8·59 | 0·94 | 0 | 9·53 | Ditto ditto. |
| 1861 | 217 | 11 | 2 | 0 | 13 | 5·06 | 0·92 | 0 | 5·98 | Ditto ditto. |
| 1862 | 208 | 13 | 1 | 0 | 14 | 6·25 | 0·48 | 0 | 6·73 | Ditto ditto. |

[87] অ্যানুয়াল রিপোর্ট অ্যান্ড রিটার্ন অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৬২, জে ম্যাক.ক্লেল্ড, অফিসিয়াটিং প্রিন্সিপাল ইন্সপেক্টর- জেনারেল, মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট।

# দুলান্দা উন্মাদ আশ্রম (১৮৪৭ খ্রীঃ)

## নেটিভ লুনাটিক অ্যাসাইআলাম

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে, কোম্পানির পরিচালকগণ সিদ্ধান্ত নেন যে ভারতীয় মানসিক রোগী যাদের অপরাধমূলক রেকর্ড রয়েছে এবং ভবঘুরে উন্মাদ দুই ধরণের রোগীদের জন্য পৃথক আশ্রয়স্থল তৈরি করা হবে। প্রাথমিক প্রচেষ্টায় ১৮১৬ সালে ভারতীয় মানসিক রোগীদের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয় "বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি নেটিভ ইনসেন হসপিটাল" যা ২৪ পরগণার রাস্যপাগলা নামক অঞ্চলে (বর্তমানে কলকাতার টালিগঞ্জ নামে পরিচিত) জেলা কারাগারের কাছেই অবস্থিত ছিল। খুবই কম বাজেটে একজন ভারতীয় ডাক্তার, একজন জমাদার, আটজন কেরানী, দুইজন রাঁধুনি, দুইজন মেথর ও দুইজন ভিস্তিওয়ালাকে নিয়োগ দেওয়া হয় । প্রায় ৫০-৬০ জন রোগীর ধারণ ক্ষমতা নিয়ে এই উন্মাদ আশ্রম শুরু হয় , কিন্তু পরবর্তী বছর গুলিতে ক্রমশ উন্মাদ রোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকে, ১৮৩৪ সালের একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে যে সেখানে অন্তত পক্ষে ২৬৭ জন রোগী ভর্তি ছিল কিন্তু ওই বছর কয়েক মাসের মধ্যে আরও রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি জায়গা সংকুলান এবং আশ্রমের পরিকাঠামো সমস্যা দেখা দেয় [৪৪]।

১৮৪২ সালের আরেকটি প্রতিবেদন উল্লেখ করে যে, হাসপাতাল ভবনের (রসা উন্মাদ আশ্রম) পরিস্থিতি ছিল "নোংরা, জনাকীর্ণ, ভাঙ্গা-চোরা এবং অপরিচ্ছন্ন"। ভারতীয় পাগলাগারদের জীর্ণ দশার কথা চিন্তা করে, ভারতীয় মানসিক রোগীদের জন্য নতুন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা করা হয়। এই নতুন হাসপাতালটি ছিল দুলান্দা লুনাটিক অ্যাসাইলাম ( Native Lunatic Asylum, Dullunada)। এই হাসপাতালটি অবস্থিত ছিল আজকের এস.এস.কে.এম হাসপাতালের কাছে, লোয়ার সার্কুলার রোডে বর্তমানে যেখানে পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে ঠিক সে স্থানে। ১৮৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, রসাপাগলা নামক স্থানে পাগলাগারদ স্থানান্তরিত করে দুলান্দার নব প্রতিষ্ঠিত উন্মাদ আশ্রমে আনা হয়। অতি সুখ্যাতিমান মনোবিজ্ঞানী,

---

[৪৪] স্ট্যাটিসটিকস রিপোর্ট অফ দ্যা হসপিটাল ফর দ্যা ইনসেন আন্ডার দ্যা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, ইনসেন হসপিটাল ( রুসা ) ২৪ পরগানা ডাব্লু, এইচ, সাইকস , রয়্যাল স্ট্যাটিসটিক্যাল সোসাইটি, লন্ডন, ১৮৪৪।

ডঃ এল. পি. ভার্মার ভাষ্যতে উঠে আসে সে হাসপাতালের চিত্র, সেটি ছিল একটি বৃত্তাকার ভবন যার মধ্যিখানে ছিল ছিমছাম উঠোন। আর উঠোন ঘিরে ছিল ছোট ছোট কক্ষ, সবকটিই মানসিক রোগীদের জন্য। ভবনটির প্রবেশদ্বার ছিল শুধুমাত্র একটি বিরাট লোহার দরজা, তাতে সবসময় একজন দারোয়ান পাহারায় থাকতো। এই ভারতীয় রোগীদের জন্য নির্মিত পাগলাগারদটির ধারণ ক্ষমতা ছিল ১৫০ জন রোগী, তবে এর দ্বিগুণ পরিমাণ রোগী ভর্তি হতো সেখানে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত এটি জেলার সিভিল সার্জন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে থাকা অবস্থায় মানসিক হাসপাতাল সম্পর্কিত সকল বিষয়ের তদারকি করতেন। সিভিল সার্জনের জন্য এটি বেশ কঠিন কাজ ছিল, কেননা তাঁকে এর সাথে সে জেলার হাসপাতালের প্রাশাসনিক আরও অনেক সমস্যা নিয়েও কাজ করতে হতো।

২৪ পরগণা জেলার সিভিল সার্জন, ডঃ ফ্রান্সিন পেম্বল স্ট্রং দুলান্দা উন্মাদ আশ্রমের জন্য যথেষ্ট কাজ করার চেষ্টা করেছেন, তবে তাঁর পক্ষেও একটি মানসিক আশ্রম পরিচালনার পুরো দায়িত্ব পালন করার যথেষ্ট সময় পাওয়া দুঃসাধ্য ছিল। ১৮৫৫ সালে মেডিকেল বোর্ড পরামর্শ দেয় সকল পাগলাগারদের জন্য একটি পূর্ণকালীন মেডিকেল সুপারইন্টেন্ডেন্ট নিয়োগ দিতে। তবে সরকার শুধুমাত্র ভবানীপুর ও দুলান্দা পাগলাগারদে পূর্ণকালীন কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়ার অনুমতি দেয় পরীক্ষামূলক তদন্ত হিসেবে। ডঃ জে. ক্যান্টর এই পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। এই আমলে (১৮৫৭) আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ছিল ৮০ জন মহিলা রোগীদের জন্য দুলান্দা পাগলাগারদের প্রাঙ্গণে একটি পৃথক ভবন প্রতিষ্ঠা করা [89]।

নেটিভ দের জন্য এই উন্মাদ আশ্রম যেটি বহু বছর আগে কলকাতার দক্ষিণ শহরতলিতে ছিল, ১৯৪৭ সালে বিল্ডিং নির্মাণের জন্য এই প্রতিষ্ঠানটিকে দুলুন্দাতে সরিয়ে আনার ফলে পরিকাঠামোগত দিক থেকে আমুল পরিবর্তন হয় [90]। দুলুন্দায় এই উন্মাদ আশ্রমটি ফোর্ট উইলিয়ামের দক্ষিনে আলিপুর ও ভবানীপুর মধ্যবত্তি শহরের সান্নিধ্যে অবস্থিত ছিল।স্থানটি ক্ষিন

---

[89] দ্যা রেকর্ড অফ গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল, এন; XXVIII । রিপোর্টস অফ দ্যা নেটিভ ইনসেন পেসেন্টস, এট দুলুন্দা, ফর ১৮৫৬ অ্যান্ড ১৮৫৭। জন গ্রে, ক্যালকাটা গেজেট অফিস।

[90] ডাব্লু.বি.এস.এ , দ্যা রেকর্ড অফ গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল, এন; XXVIII । রিপোর্টস অফ দ্যা অ্যাসাইলাম ফর ইউরোপিয়ান অ্যান্ড নেটিভ ইনসেন পেসেন্টস, এট দুলুন্দা, ফর ১৮৫৬। জন গ্রে, ক্যালকাটা গেজেট অফিস।

শীতল, উত্তর দিকের ফোর্ট উইলিয়ামের চারপাশে উন্মুক্ত সমতল ভূমি, দক্ষিণ দিকটি উন্মাদদের জন্য খোলা রাখা হয়। সমভূমি পরিকল্পনা অনুসারে সম্পূর্ণ অঞ্চল টি ৯ একর এর বেশী জমি নিয়ে গঠিত[91]। এবং এর চারিধার দীর্ঘ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল পুরুষদের জন্য উন্মাদ আশ্রমটি চারটি ভাগে বিভাগে বিভক্ত ছিল, যেটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের মুখোমুখি, সুন্দর বাগান ও দক্ষিণ দিকের খোলা মাঠের মাঝখানে অবস্থিত। প্রত্যেকটি বিভাগই নিদিষ্ট সীমানায় সীমাবদ্ধ । ওয়ার্ড গুলি অনেক জনের আবাসের সমন্বয়ে গঠিত, প্রত্যেকটির পরিমাপ ৫,১২০ থেকে ১১,৫২০ ঘনফুট [92]। এখানে বায়ুচলাচল ও আকাশের আলোর জন্য জানলার অর্ধেক প্যানেলযুক্ত দরজার ব্যবস্থা করা ছিল । দিনের বেলা বায়ুসেবনের জন্য মাঠের মধ্যে বাঁশের মাঁচা নির্মাণ করা হয় ।আবাস এবং বারান্দার মেঝে গুলিতে পিচের প্রলেপ দেওয়া হত। প্রতিটি আশ্রমের ঝাড়ুর দায়িত্ব ও শৌচাগারের পরিষ্কার দায়িত্ব একটি কর্মচারী যুক্ত করা হয়। শৌচাগার দুর্গন্ধমুক্ত করার জন্য সুব্যবস্থা থাকত । দরজা গুলি সুন্দর খোলা বারান্দ সাথে যুক্ত, সূর্যের আলো ও বৃষ্টির জল থেকে সুরক্ষিত এবং রাতে আলোকিত। হসপিটালের পঞ্চম ওয়ার্ডকে ইউরোপিয়ান হসপিটাল এর আদলে উপযুক্ত করবার জন্য কাঠের খাঁটের পরিবর্তে লোহার খাঁট ব্যবহার করা হয়। হসপিটাল আবশ্য নিরপেক্ষ, এখানে সব রকম মানুষ যাওয়া আসা করতে পারত। প্রতিষ্ঠানের উত্তরদিকটা ইউরোপিয়ান দ্বারা আধিকৃত, সেখানে অফিস, স্থাণীয় প্রতিষ্ঠানের কিছু অংশ চিকিৎসালয় ছিল। হিন্দু-মুসলমানদের জন্য প্রত্যেক পৃথক পৃথক রান্নাঘরের ব্যবস্থা করা হয়,এবং বিভাগের অতিরিক্ত কক্ষ নির্মাণ করা হয়। প্রচন্ড পীড়ার আধিক্য দেখা গেলে রোগী কে আলাদা কক্ষে নিয়ে নিয়ে চিকিৎসা করা হতো । প্রত্যেক কক্ষটি অর্ধপ্যানেল যুক্ত দরজা দিয়ে সংযোগ রক্ষা করা হত। প্রচীন গাত্র ছিদ্র যুক্ত এই নির্মাণটি জানালার অনুপুস্থিতিতে সাধারণ আস্থানা গুলি থেকে ভিন্ন , যা বায়ু চলাচল কে বাধাগ্রস্থ না করে স্থায়ী ক্ষীণ আলো প্রদান করত। ঘর গুলির মধ্যে বাতাস ও

---

[91] ডাব্লু.বি.এস.এ , দ্যা রেকর্ড অফ গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল, এন; XXVIII । রিপোর্টস অফ দ্যা অ্যাসাইলাম ফর ইউরোপিয়ান অ্যান্ড নেটিভ ইনসেন পেসেন্টস, এট দুলুন্দা, ফর ১৮৫৭। জন গ্রে, ক্যালকাটা গেজেট অফিস।

[92] এন এ আই , রিপোর্ট অন নেটিভ ইনসেন অ্যাসাইলাম অফ দুলুন্দা, ১৮৭৫ হোম মেডিক্যাল, প্রসেডিং, নং – ৩০ অ্যান্ড ৩১, পার্ট – বি

আলো দরজার মাধ্যমে প্রবেশ করে। নির্জনতার মাধ্যম হিসাবে তারা আরও কার্যকর হতে পারত, তারা যদি এই ওয়ার্ড গুলিকে সাথে নির্মাণ করতো অন্য ওয়ার্ড গুলি থেকে দূরে অবস্থিত হত। তবে উত্তেজনার আওয়াজ শোনা থেকে শান্ত রোগীদের আরও ভালোভাবে রক্ষা করা যেত। যথাযথ মরশুমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সদস্য বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত থাকতেন, ফলস্বরূপ বর্ষাকালে কক্ষ গুলিতে বাইরে থেকে জলের ছটা এসে রোগীদের আসুবিধা তৈরি করতো,কিন্তু পরিবর্তনের জন্য কক্ষগুলি সম্পর্কে করতিপক্ষ কোন পদক্ষেপ না নিলে আদ্র আবহাওয়ায় দুঃখ কষ্টের কবলে পরে, সাধারন ভাবে রোগী দের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠত। এই জাতীয় ঘটনা কৌতূহলজনক কেননা আবহাওয়া কোন অভ্যাস পাগলদের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। দীর্ঘ আদ্রতা যখন তাদের কে অলস ও বেকার করে রাখে তখন অনেকে মানসিক অবসাদ গ্রস্থ হয়ে পরে। তখন মানসিক অবসাদ গুলি কাটানোর জন্য উত্তর দক্ষিণে উপযুক্ত বিস্তৃত বাগান এবং মাঠ গুলি রোগীদের মনের অনুশীলন সুস্থতা ও বেশ কিছু কাজের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভুমিকা পালন করে। মাঠের দক্ষিণ পূর্ব কোণে খনন করা একটি বিশাল জলাশয় আছে সেখান থেকে স্থানীয়দের প্রয়োজনীয় জল খাওয়া ও স্নান করার দুই-ই কাজে ব্যবহৃত হত। নারী ও পুরুষ উভয় এই জল ব্যাবহার করতে পারত। নারীদের উন্মাদআশ্রম অন্যান্য প্রতিষ্ঠান নির্মাণের অনেক পরে চালু হয়, ১০ ই এপ্রিল ১৮৫৭ সালের আগে এটি চালু করা হয়নি । বাগানের চারিদিকে প্রবেশদ্বার সহ সীমানা বরাবর কার্যকর ভাবে প্রাচীর দেওয়া হয়, যেটি পুরুষদের সংযুক্ত বিল্ডিং থেকে পৃথক।

নারী দের উন্মাদ আশ্রমটি উত্তর দক্ষিণ মুখী, এটি বায়ু চলাচলের জন্য দুটি প্রাসাদের মধ্যবর্তী স্থানে তৈরি করা করা হয়। কক্ষ গুলি অন্যান্য আশ্রমের তুলনায় আরও বড় করে নির্মাণ করা হয়। ওয়ার্ড ও বারান্দা গুলির তিনটি দিক প্রাচীর বেষ্টিত ছিল। বায়ু সরবরাহের জন্য দক্ষিণ দিক টিকে উন্মুক্ত রাখা হয়েছিল,৮ টি আবাস যে গুলি উন্মাদ আশ্রমের পুরুষদের হাসপাতাল হিসাবে ব্যাবহারের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এই হাসপাতালের মেঝেতে পিচ প্রলেপের বদলে মেঝে প্লাস্টার করা ছিল, প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রান্নার জায়গা তৈরি করা হয় যেটি বারান্দার কাছাকাছি। এছারাও সময় অনুসারে এই জায়গাটি পেশাগত কাজ অনুশীলনের ক্ষেত্রে ব্যাবহার করা হত।

প্রতিষ্ঠানের মূল পরিকল্পনা উন্মাদ আশ্রমের গুরুত্বপূর্ণ অংশে উন্নতি সাধন করা।এক্ষেত্রে ব্যাবহারের অযোগ্য ওয়ার্ড গুলি কে সংশোধন করে ব্যাবহারের উপযোগী করে তোলার ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমান সময়ে প্রচন্ড পীড়া যুক্ত নারী রোগীকে নির্জনে রাখা যায় না, তাদের কে আবাসের মধ্যে আটকে রাখা হতো [93] , মেডিক্যাল বোর্ডের মতানুসারে, দুলান্দায় উন্মাদ আশ্রমটি মূলত নারী পুরুষ উভয়ে ১৫০ রোগী জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়। যদিও ১৮৫৫ সালে এখানে মানসিক রোগী দিগুন হারে বৃদ্ধি পায় [94] , লক্ষ্য করা যায় যে বোর্ডের রিপোর্ট অনুসারে রসা উন্মাদ আশ্রমের নাম ও স্থান পরিবর্তন করে নেটিভ উন্মাদ আশ্রমে দুলান্দা নামে পরিচিতি পায়। মূল প্রতিষ্ঠান যেটি পরে পুরুষ দের জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল। সেটির মাপ ১০৪,৯৬০ ঘনফুট, ১৫০ রোগীর প্রত্যেককে প্রায় ৭০০ ঘনফুট জায়গা জুড়ে অবস্থান করতো [95] ।

নারীদের জন্য নির্মিত নতুন বিল্ডিং-এ ৮০ জন থাকার ব্যবস্থা করা হয়, যেটি ৪৪,২৫১ ঘনফুট জায়গা জুড়ে বেষ্টিত ।প্রতি রোগী মাথা পিছু ৫৫০ ঘন ফুট এর মত জায়গা বরাদ্দ ছিল। ১৮৫৭ সালে নারী পুরুষ উভয় লিঙ্গের রোগের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে সর্বাধিক রোগীর সংখ্যা হয় ৩২৬ জন , ১৮৫৬ সালে নারী পুরুষ উভয় লিঙ্গের রোগের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে সবাধিক রোগীর সংখ্যা হয় ২৮২ জন , ১৮৫৭ সালে ২৮৮ জন। রোগী বাঁড়ার সাথে সাথে আবাসের জায়গার অভাব দেখা দেয়, এই কারনে প্রতিটি পুরুষ আবাসে রোগী রাখা হয় ৮-১০ জন এবং মহিলা ওয়ার্ডে ৫-৬ জন রাখা হয়। এভাবে যখন রোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকে তখন উন্মাদ আশ্রমটি পরিবর্ধনের প্রয়োজন দেখা দেয়। ইতি মধ্যে মেডিক্যাল বোর্ডের দ্বারা আশ্রমের স্থান বৃদ্ধি ও রোগীদের রোগের শ্রেণীবিন্যাস ইতিবাচক হিসাবে অনুমোদিত হয়। লিঙ্গ ও ধর্মের ক্ষেত্রে রোগী প্রভেদ সৃষ্টি হতো এই কারনে মেডিক্যাল বোর্ড উচ্চ বিত্তদের উন্নত আবাসন নির্মাণের পরামর্শ দিয়েছিল যাতে তাদের বন্ধু , বান্ধব , পিতা-মাতা

[93] ডাব্লু.বি.এস.এ , দ্যা রেকর্ড অফ গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল, এন; XXVIII । রিপোর্টস অফ দ্যা অ্যাসাইলাম ফর ইউরোপিয়ান অ্যান্ড নেটিভ ইনসেন পেসেন্টস, এট ভবানিপুর অ্যান্ড দুলুন্দা, ফর ১৮৫৬ অ্যান্ড ১৮৫৭। জন গ্রে, ক্যালকাটা গেজেট অফিস।

[94] ডাব্লু.বি.এস. রিপোর্ট অন লুনাটিক অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, ক্যালকাটা ১৮৫৫

[95] দ্যা রেকর্ড অফ গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল, এন; XXVIII । রিপোর্টস অফ দ্যা অ্যাসাইলাম ফর ইউরোপিয়ান অ্যান্ড নেটিভ ইনসেন পেসেন্টস, এট দুলুন্দা, ফর ১৮৫৬, জন গ্রে, ক্যালকাটা গেজেট অফিস।

রোগীকে রক্ষনাবেক্ষণ দায়িত্বে থাকতে পারে। স্থানিয় ভদ্র লোকের প্রবেশ এখানে বিরল হলেও মাঝে মাঝে ঘটে থাকে, এখানের লক্ষনীয় বিষয় হল- এখানে বন্দী পাগলদের প্রয়োজনে হসপিটালের বাইরে ও আভ্যন্তরে পাগলদের সাথে আবাধে মিশতে দেওয়া হত। উন্মাদ আশ্রমের প্রতিটি বন্দীই অবশ্যই মানসিক রোগী, এবং যাদের সাধারনত "ক্রিমিনাল লুনেটিক" নামে আখ্যা দিয়েছেন, তাদের কোন অস্তিত্ব এখানে নেই। রোগীর ভর্তির সময় বেড়ি বা শিকল খুলে নেওয়া হত। যাতে কারাবাসে অন্তর্গত রোগীরা দ্রুত আগের অবস্থায় ফিরে আসতে পারে। ১৮৫৬ এবং ১৮৫৭ সালের মধ্যে দেখা যায় নারী পুরুষ উভয় লিঙ্গের ৪৫-৪৭ জন বন্দী রোগী চিকিৎসার জন্য দুলুন্দাতে রাখা হয়েছিল। এই রোগীদের পৃথকভাবে রাখার জন্য প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ে স্বতন্ত্র আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। সমসাময়িক সময়ে এখানে রোগীদের সম্বন্ধে কোন নেতিবাচক দিকের অভিযোগ ঘটেনি। ভর্তি রোগীদের দায়িত্বে ২৪ পরগনার ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে অর্পণ করা হয়।

১৮৫৬ সালের দিকে রাজ্য কতৃপক্ষ উন্মাদ আশ্রমের উন্নতি দিকে আকৃষ্ঠ হন। যার ফলস্বরূপ ব্যবহারে অনুপযোগী শৌচালয় গুলিকে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলার সিধান্ত নেওয়া হয়। যখন সেগুলি বর্ষার জলে নিমজ্জিত হত তখন শৌচালয় পরিষ্কার করা আরও সমস্যা হয়ে পরত যদিও এ জাতীয় সমস্যার গোপনীয়তা অবাস্তব নয়। ২৪ পরগণার ম্যাজিস্ট্রেট ফারগুনস সাহেব এর দ্রুত কর্মসুচীর মাধ্যমে এ জাতীয় বিপজ্জনক অবস্থার প্রতিকার করেন। শৌচালয় স্থান্তরন করা হয় প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক ঝাড়ুদারে উপর শৌচালায় সংরক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হতো। ১৮৬২ সালের প্রতিবেদনে দেখা যায় বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি সুপারিটেনডেন্ট আরথুর পাইন একটি দীর্ঘ উন্মাদদের তালিকা প্রকাশ করেছেন। এদের মধ্য বেশিরভাগ পাগল ছিলেন মানিয়া ক্রনিক রোগে আক্রান্ত, আবার বেশ কিছু ছিল মনমানিয়া গ্রস্থ[96]। ১৮৬৩ সালের প্রতিবেদনে দেখা যায় ওই সমস্ত রোগীদের বেশকয়েক জন কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরন করেছেন[97]। নৈতিক চিকিৎসা, সেবা শুশ্রূষা

---

[96] এন,এ,আই, অ্যানুয়াল রিপোর্ট অন রিটার্নস অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৬২, জে ম্যাক.ক্লেল্ড, অফিসিয়াটিং প্রিন্সিপাল ইন্সপেক্টর জেনারেল, মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট।

[97] এন,এ,আই, অ্যানুয়াল রিপোর্ট অ্যান্ড রিটার্নস অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৬৩, জে ম্যাক.ক্লেল্ড, অফিসিয়াটিং প্রিন্সিপাল ইন্সপেক্টর জেনারেল, মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট।

কিংবারোগীর মানসিক অবস্থার উন্নতি বিধান ইত্যাদি বিষয় গুলি উন্মাদ আশ্রমের বার্ষিক প্রতিবেদনে বারং বার উঠে এসেছে, কিন্তু উক্ত বিষয় গুলি ছাড়া নেটিভ আশ্রমে পাগলদের মৃত্যু সংখ্যা নেহাত কম ছিল না ১৮৬৭ খ্রীঃ এক প্রতিবেদনে দেখা যায় এই বছরে মোট ৫১ জন উন্মাদ বিভিন্ন রোগে মৃত্যু হয়েছে। সেগুলি হল দুর্বলতা ও বৈকল্য তে মৃত্যু ঘটেছে মোট ২৬ জনের, শ্বাস কষ্ট জনিত যন্ত্রণায় ১ জন, তীব্র আমাশয় জনিত রোগে ৭ জন, কলেরায় ৪ জন, মৃগী রোগে ১ জন, অবসাদ গ্রস্থে ৭ জন, স্ববিরাম জ্বরে ১ জন যক্ষ্মা রোগে ১ জন, রক্ত বিষণ রোগে ১ জন, ফুসফুস জনিত রোগে ২ জন [98]।

Causes of Morality and duration of confinement at period of death, Dullunda Asylum[99]

| **Diseases** | **No of Death** | **Duration of confinement** |
|---|---|---|
| Asthenia | 26 | |
| Pleurisy | 1 | |
| Dysentery, acute | 2 | |
| Dysentery, chronic | 5 | |
| Diarrhoea | 4 | *A man duration only can be given in this place. The detailed morality return will give the period in each case* |
| Epilepsy | 1 | |
| Exhaustions of mania | 7 | |
| Fever, remittent | 1 | |
| Old age | 3 | |
| Phthisis | 1 | |
| Pyaemia | 1 | |
| Pneumonia | 1 | |
| Pulmonary abscess | 1 | |
| **Total** | **51** | |

*........Since the year 1876 there has been continuous decrease in the number of lunatic confinements in Bengal. This decrease is the result of the orders of the government of India issued in that year, pointing out that persons suffering from the temporary result of sickness in temperance, or debauchery and those whom there friends ought to support, are not proper object of public charity; and that decided criminal lunatic, only those patients should be received in state asylum who are absolutely dangerous, or who, having no friends or resources, are in the acute stage of mental disease in which there is most hope of recovery under medical treatment. This strict application of this very reasonable rule has not only reduced the permanent asylum population but has served*

[98] অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৬৭ , ডবলু.এ গ্রীন, ইনস্পেক্টর জেনারেল অফ হসপিটাল, লোয়ার প্রভিন্সেস, ক্যালকাটা

[99] অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৬৮ জে. ম্যারে ইন্সপেক্টর – জেনারেল অফ হসপিটাল ,বেঙ্গল মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট, ক্যালকাটা।

*to lower the number of new admissions. Thus, the number of lunatics in confinement on the first January of each of the last five years, and the admission of those years stood thus*[100]

.

| Years | Remained on1st January | Admitted During Year |
|---|---|---|
| 1876.................. | 1147 | 329 |
| 1877................ | 1131 | 247 |
| 1878.................. | 1077 | 196 |
| 1879................. | 991 | 173 |
| 1880................. | 888 | .... |

## নেটিভ উন্মাদ আশ্রমের নিয়মাবলী

ইউরোপীয় অধ্যক্ষ, নেটিভ চিকিতসক এবং সার্ভেন্টসগন , পুরুষ ও মহিলা উন্মাদ রোগীদের প্রতি যথেষ্ট সহনশীল সহকারে চিকিতসা প্রদানে বাধ্য থাকবেন;সেক্ষেত্রে কোনোরকম  কঠোর ভাষা, হুমকি, অপব্যবহার, সমস্ত নিপীড়ন, আঘাত, বা অন্য কোনও সহিংসা কর্ম থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয় । যখন কোনও রোগীর আচরণ নিজের এবং অন্যদের জন্য হিংস্র এবং বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, তখন হাসপাতালের কর্মীরা সুপারিন্টেন্ডেন্টের অনুপস্থিতিতে পরিস্থিতিটি অধ্যক্ষকে জানিয়ে দেবেন, যিনি ততক্ষণাত এই ধরনের রোগীর সাথে দেখা করবেন। অধ্যক্ষ যদি রোগীর নিজের বা অন্যের সুরক্ষার জন্য সংযমকে একেবারে প্রয়োজনীয় মনে করে তবে সেই অনুযায়ী অস্থায়ী নির্জনতা প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে এই ক্ষেত্রে, অধ্যক্ষ সুপারিন্টেন্ডেন্টকে পরিস্থিতিটি রিপোর্ট করবেন। লাঠি, অস্ত্র, তীক্ষ্ণ-ও ধারালো  সরঞ্জাম অ্যাসইলামের মধ্যে রাখা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ । হিংস্র উন্মাদ রোগীদের রান্নাঘর এবং বাগানে সহায়তা করার অনুমতি

100 এন,এ,আই, অ্যানুয়াল রিপোর্ট অন দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলামস ইন বেঙ্গল ফর দ্যা ইয়ার ১৮৭৫,১৮৭৬,১৮৭৭,১৮৭৮,১৮৮৯, অ্যান্ড ১৮৮০

এন.এ.আই, হোম-মেড১-মার্চ ১৮৭৭ প্রসেডিং নং ১৯-২১, পার্ট -এ

এন.এ.আই, হোম-মেড১-জানুয়ারি ১৮৭৮ প্রসেডিং নং ১৫-১৬ পার্ট -বি

এন.এ.আই, হোম-মেড১-আগস্ট ১৮৭৮ প্রসেডিং নং ৬৭-৬৮ পার্ট -বি

এন.এ.আই, হোম-মেড১-জুন ১৮৭৯ প্রসেডিং নং ২৩-২৫ পার্ট -বি

এন.এ.আই, হোম-মেড১-জুন ১৮৮০ প্রসেডিং নং ৫১-৫৪ পার্ট -বি

এন.এ.আই, হোম-মেড১-জুলাই ১৮৮০ প্রসেডিং নং ৫৭ পার্ট -বি

এন.এ.আই, হোম-মেড১-মার্চ ১৮৮০ প্রসেডিং নং ১৬-১৭ পার্ট -বি

দেওয়া যাবে না,ছুরি বা কারণ ধারালো সরঞ্জামের সাহায্যে তারা বিশ্বাস করতে পেরে যে কোন মুহূর্তে তারা আঘাত করতে পারে।

রোগীদের দর্শনার্থীদের ২৪-পারগনার ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি বা সুপারিন্টেন্ডেন্টের দ্বারা অনুমুতি নিতে হবে।উন্মাদ রোগী সম্পর্কে হাসপাতালের কর্মীরা সমস্ত অভিযোগ তাতক্ষণিকভাবে নজরে রাখবে,এবং সেগুলি সুপারিন্টেন্ডেন্টকে প্রতিটি মুহূর্তে রিপোর্ট করবেন [101]। দুলুন্দা হসপিটালের রোগীদের জন্য সকালের খাদ্য তালিকাতে ছিল গম ও যবের দুটি মণ্ড দেওয়া হত। মধ্যাহ্ন ভোজনে ভাত, মটরডাল, সবজি, এবং রাতের খাবার দেওয়া হত ভাত, মাছ, মাংস পরিবেশন করা হত [102]।

১৮৭৬ সাল থেকে দুলান্দা উন্মাদ আশ্রমে পাগলদের সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে। এই সংখ্যা হ্রাসের ফলে আশ্রমের কতৃপক্ষ ক্রমশ চিন্তিত হয়ে উঠে, কারণ আশ্রম থেকে উপার্জিত অর্থ ক্রমশ কমতে থাকে। এবং লুনাটিক শ্রম দ্বারা উৎপাদন কমে যেতে থাকে। উপরুক্ত সরকারি কর্মচারীদের বেতন ও অন্যান্য ব্যয়ভারের জন্য অধিক পরিমান অর্থ খরচ হতে থাকে, ফলে দুলান্দা আশ্রমটির বিকল্প ভাবনা চিন্তা শুরু হয়। ইতিমধ্যে বহরমপুর মানসিক হাসপাতালে পাগলদের সংখ্যা নিয়ে কোন তারতম্য না হওয়ার সরকার এর লক্ষ হয় বহরমপুর উন্মাদ আশ্রমের উপর। তুলনামূলক ভাবে দুলান্দা উন্মাদ আশ্রমে রোগীদের থেকে (Payment of Patient Relative ) আদায়কৃত অর্থ ও তাদের শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত অর্থ থেকে তেমন আশানুরূপ লাভ হচ্ছিলনা। বরং প্রতিবছর লোকসানের খাতার অর্থ গুনতে হচ্ছিল । ফলে এমতন অবস্থায় দুলান্দা

---

[101] দ্যা রেকর্ড অফ দ্যা গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল, নং; XXVII, রুলস ফর দ্যা গাইডেন্স অফ সাবরডিনেট এস্টাব্লিস্মেন্ট অফ দ্যা অ্যাসাইলাম এট দুলুন্দা, প্রসেডিং নং – ৯৫৭ *From the Magistrate of the 24 pargunnahs,H.D,H.Fergusson The European Overseer, the Native Doctor, and Servants, male and female, are strictly enjoined invariably to treat the Patients with the greatest kindness; to abstain from harsh language, threats, abuse, all acts of oppression, blows or any other acts of violence. They are to remember that the unfortunate Patients are of unsound mind, and not responsible agents. When the conduct of a Patient becomes violent and dangerous to himself and others, the Hospital Servants will, in the absence of the Superintendent, report the circumstance to the Overseer, who will immediately visit such Patient. Should the Overseer consider restraint to be absolutely necessary for the safety of the Patient himself or others, temporary seclusion may accordingly be applied. But in such case, the Overseer will report the circumstance to the Superintendent. Clubs, sticks, weapons, sharp-edged or pointed tools are strictly prohibited from being introduced in the Asylum. Such Patients as may be permitted to assist in the kitchen and garden, are not to be trusted with knives or tools with which they may commit injury. Visitors to the Patients are to be admitted by permission of the Magistrate of the 24-Pergunnahs or of the Superintendent. All complaints relating to the Patients or to the Hospital Servants are immediately to be brought to the notice of the Overseer, who will take the earliest opportunity to report to the Superintendent.*

[102] দ্যা রেকর্ড অফ গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল, এন; XXVIII। রিপোর্টস অফ দ্যা অ্যাসাইলাম ফর নেটিভ ইনসেন পেসেন্টস, এট দুলুন্দা,ফর ১৮৫৬ অ্যান্ড ১৮৫৭, জন গ্রে, ক্যালকাটা গেজেট অফিস।

থেকে সমস্ত পাগলদের কে স্থানন্তিরত করে বহরমপুর মানসিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অপর দিকে মেডিকেল বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বহরমপুর কে কেন্দ্রীয় উন্মাদ আশ্রম হিসাবে প্রতিষ্ঠা করলে ক্রমশ দুলান্দা উৎকর্ষতা হ্রাস পায়, এবং উন্মাদ আশ্রমটি সরকার বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন।

## Plan Map of Native Lunatic Asylum, Dullunda[103]

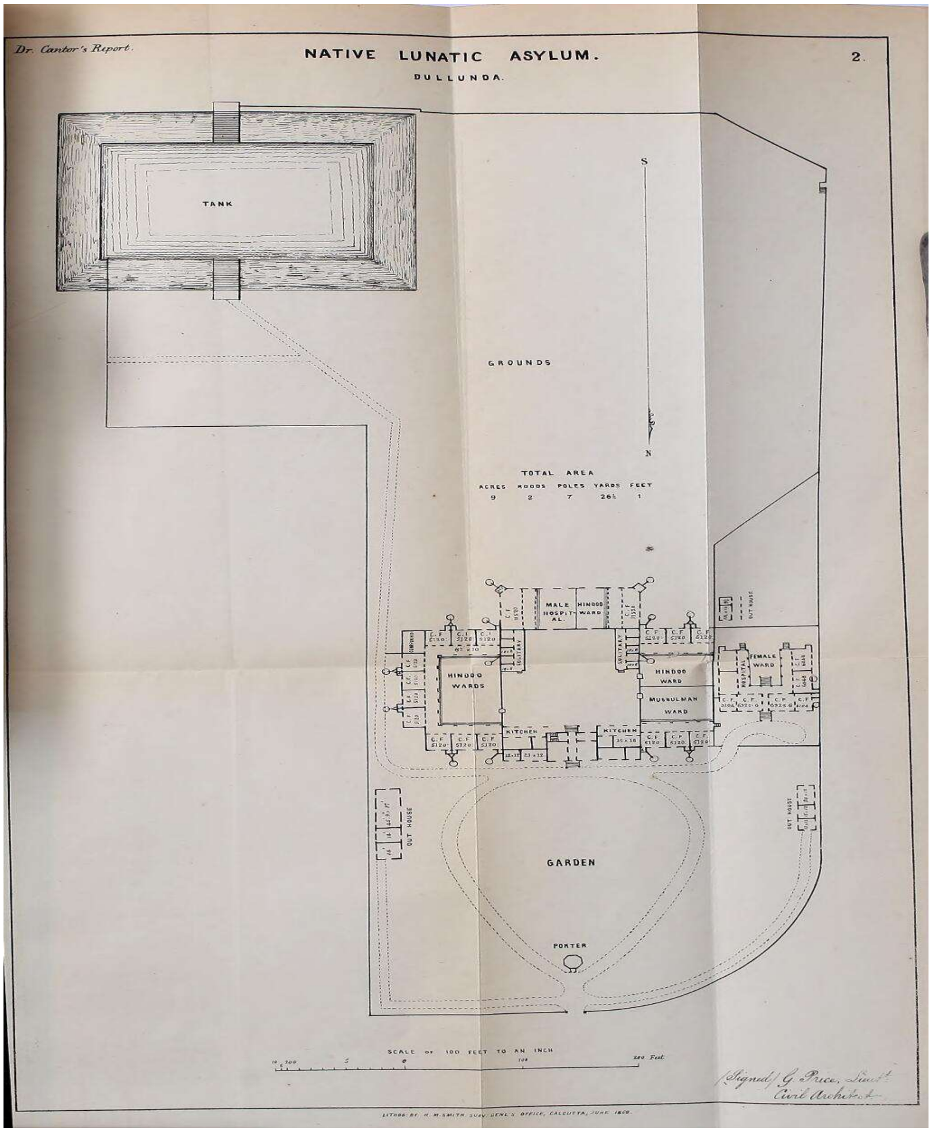


103 দ্যা রেকর্ড অফ গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল, এন; XXVIII। রিপোর্টস অফ দ্যা অ্যাসাইলাম ফর নেটিভ ইনসেন পেসেন্টস, এট দুলুন্দা,ফর ১৮৫৬ অ্যান্ড ১৮৫৭, জন গ্রে, ক্যালকাটা গেজেট অফিস।

# Dullunda,Native lunatic asylum, in plan of the town map of calcutta[104]

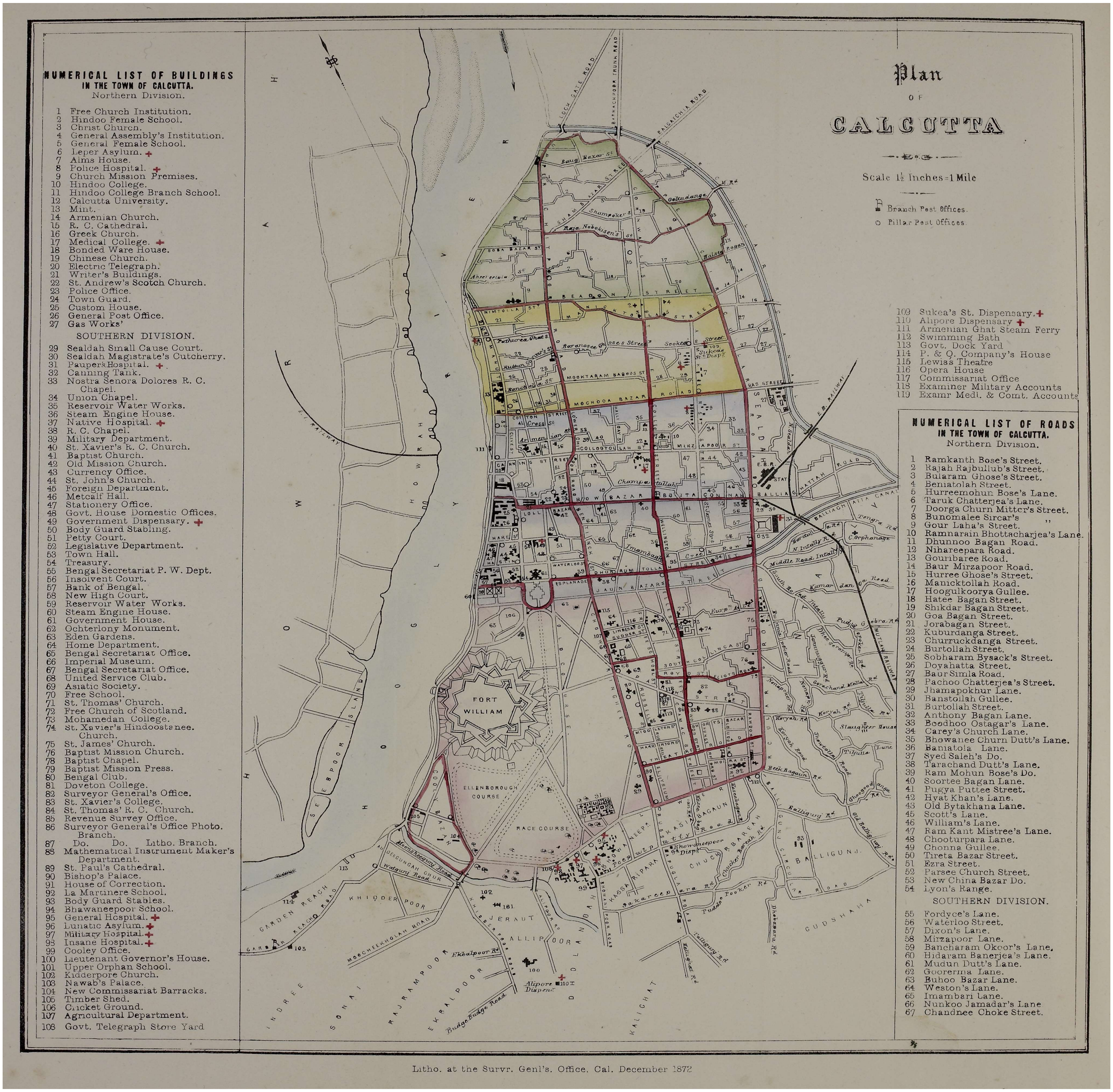


---

104 ১৮৯৯ সালের জন্য কলকাতা মেডিকেল ইনস্টিটিউশনের রিপোর্ট। কর্নেল টি. এইচ. হেন্ডলি,C.I.E., I.M.S., সিভিল হসপিটালসের ইন্সপেক্টর-জেনারেল, বেঙ্গল। কলকাতা: বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস। ১৯০০ . পৃ- ৪৬৮

# দুলান্দা উন্মাদ আশ্রমের কয়েকটি সরনী

## উন্মাদ আশ্রমের দৈনিক খাদ্য তালিকা

| Time | Daite |
|---|---|
| At 6 AM or 7 AM | Wheat ……………………...2 oz<br>Porridge…………………..2 oz |
| At 10AM to 11 AM | Rice………………………. 10 oz<br>Pease………………………. 4 oz<br>Vegetable………………….. 4 oz<br>Salt……………………….. 1/2 oz<br>Spice………………………...2 oz<br>Butter……………………..2 drams<br>Sugar……………………...2 drams<br>Betelnut……………………..¼ oz<br>Paun - leaf …………………..1 oz<br>Hookah Tobacco……………… 2 oz |
| At 5 PM to 7 PM | Rice……………………….. 80 oz<br>Beef or Mutton………………4 oz<br>Fish…………………………..4 oz<br>Vegetable……………….….4 oz |

Subordinate officers and servants of Native Insane Asylum,Dullunda[105]

SUBORDINATE OFFICERS.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | European Overseer ... ... | Rs. | 100 | 0 | 0 |
| 1 | Native Doctor ... ... ... | ,, | 16 | 0 | 0 |

SERVANTS.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Naib Jemadars ... ... | Rs. | 35 | 0 | 0 |
| 2 | Ditto (Female) ... ... | ,, | 11 | 0 | 0 |
| 5 | Cooks ... ... ... ... | ,, | 25 | 0 | 0 |
| 1 | Female Cook ... ... ... | ,, | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Water-carriers ... ... ... | ,, | 36 | 0 | 0 |
| 4 | Washermen ... ... ... | ,, | 20 | 3 | 2 |
| 1 | Washerwoman ... ... ... | ,, | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Barbers ... ... ... | ,, | 15 | 0 | 0 |
| 2 | Gardeners . . ... ... | ,, | 8 | 0 | 0 |
| 1 | Hurkarrah ... ... ... | ,, | 4 | 0 | 0 |
| 26 | Male Servants ... ... ... | ,, | 104 | 0 | 0 |
| 6 | Female Servants .. ... | ,, | 24 | 0 | 0 |
| 1 | Lamplighter ... ... ... | ,, | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Sweepers ... ... ... | ,, | 61 | 0 | 0 |
| 3 | Ditto (Female) ... ... ... | ,, | 12 | 2 | 10 |
| | Total ... | | 485 | 6 | 0 |

The Subordinate Establishment is a modification of the scale laid down in the Code of Medical Regulations. The European and the Native Medical Subordinates and Conservancy

105 দ্যা রেকর্ড অফ গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল, এন; XXVIII। রিপোর্টস অফ দ্যা অ্যাসাইলাম ফর ইউরোপিয়ান অ্যান্ড নেটিভ ইনসেন পেসেন্টস, এট ভবানিপুর অ্যান্ড দুলুন্দা,ফর ১৮৫৬ অ্যান্ড ১৮৫৭, জন গ্রে, ক্যালকাটা গেজেট অফিস।

Establishment are permanently appointed; the strength of the rest of the native attendants is increase or reduced according to the daily number of Patients. Among a number of improvements suggested by the Medical Board (Report 1855 p.14) is the appointment of aEuropean Subordinate Officer to each Asylum for native Insane. The actual appointment of such Officer is one of the benefits which the Asylum at Dullunda has derived from the active exertions of Mr. Fergusson, the Magistrate of the 24-Pergunnahs, in promoting its interests. The strength and monthly pay of the Establishment is as follows .[106]

## Annual Expenditure incurred on account of the Lunatic Asylum Dullunda[107] .

| Lunatic Asylum Dullunda, for the year 1867. | Rs. | A. | P. |
|---|---|---|---|
| Establishment ... ... ... ... ... ... | 6,665 | 14 | 5 |
| Dieting ... ... ... ... ... ... ... | 10,665 | 3 | 6 |
| Contingencies ... ... ... ... ... ... | 1,249 | 15 | 9 |
| Bazar medicines ... ... ... ... ... | 32 | 12 | 6 |
| Clothing, bedding ... ... ... ... ... | 811 | 8 | 0 |
| TOTAL ... | 19,425 | 6 | 2 |

| | |
|---|---|
| Daily average number of persons ... | 220 |
| Average yearly cost per man ... ... | 88 |

A.-anna, P.-paysa

## উন্মাদ আশ্রমে বয়স ভিত্তিক রোগীর পরিসংখ্যা[108]

*Of the admissions of the year 1870, the ages have been as follows:*

| SEXES. | From 10 to 20. | From 20 to 30. | From 30 to 40. | From 40 to 50. | From 50 to 60. | Total.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Males ... ... ... ... ... ... | 19 | 71 | 29 | 9 | 7 | 135 |
| Females ... ... ... ... ... ... | 3 | 19 | 14 | 13 | 0 | 49 |
| Total ... ... | 22 | 90 | 43 | 22 | 7 | 184 |

106 দ্যা রেকর্ড অফ গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল, এন; XXVIII । রিপোর্টস অফ দ্যা অ্যাসাইলাম ফর ইউরোপিয়ান অ্যান্ড নেটিভ ইনসেন পেসেন্টস, এট ভবানিপুর অ্যান্ড দুলুন্দা, ফর ১৮৫৬, জন গ্রে, ক্যালকাটা গেজেট

107 অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৬৭ , ডবলু.এ গ্রীন, ইনস্পেক্টর জেনারেল অফ হসপিটাল, লোয়ার প্রভিন্সেস, ক্যালকাটা

108 অ্যানুয়াল রিপোর্ট অন দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল, অফ দ্যা ইয়ার - ১৮৭০,জে. ক্যাম্পবেল ব্রাউন, ইন্সপেক্টর – জেনারেল অফ হসপিটাল ,বেঙ্গল মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট, ক্যালকাটা।

Annual Expenditure incurred on account of the lunatic asylum,Dundulla[109]

Annual Expenditure incurred on account of the Lunatic Asylum, Dullunda, for the year 1870.

| | Rs. | As. | P. | Remarks. |
|---|---|---|---|---|
| Establishment ... ... ... | 8,867 | 8 | 0 | |
| Dieting ... ... ... | 15,816 | 6 | 3 | Exclusive of Rs. 973-9-3 paid by friends of paying patients into the treasury. |
| Contingencies ... ... ... | 2,135 | 10 | 9 | |
| Bazar medicines ... ... ... | 49 | 8 | 10 | |
| Clothing, bedding, &c. ... ... ... | 1,533 | 6 | 6 | |
| Total ... | 28,402 | 8 | 4 | |
| Daily average number of persons .... | 309.16 | | | |
| Average yearly cost per man ........ | Rs. 91-14-8 | | | |
| Average yearly cost of dieting per man ... | ... „ 51-2-11¾ | | | |

The Committee have gone very fully into the question of diet inconnection with Dullunda. The report as follows

The following table shows the component parts of the full diet which has been in useat different times since 1856. Various minor changes have been made from time to time[110] :

| ARTICLES. | In 1856. | | From 1866 to 31st August 1869. | | From August 1869 to August 1872. | | From 1st Sept.1872 to 14th March 1879. | Present scale. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat flour | 1 | chittack | Nil | | Nil. | | 5 chittacks ... | 5chittacks. |
| Bice ... ... | 9 | chittacks | 10 chittacks | | 10 chittacks ... | | 4 „ ... | 4 „ |
| Pulses ... | 2 | „ ... | 2 „ | * ... | 1 chittack ... | | 1 chittack ... | 2 „ |
| Meat ... ... | 4 | „ ... | 2 „ | | 2chittacks | * | 2 chittacks | Nil. |
| Fish ... ... | 2 | „ ... | 2 „ ... | | Nil | | Nil ... | Nil. |
| Oil ... ... | Nil ... | | ¼ chittack | | ¼ chittack ... | | ½ chittack ... | ½ chittack. |
| Ghee ... | Nil ... | | Nil | | ½ „ ... | | ½ „ † ... | Nil. |
| Salt ... ... | ½ | chittack | ¼ kutcha | | ¼ kutcha ... | | ⅛ „ ... | ¾ kutcha. |
| Onions ... | Nil ... | | Nil ... | | Nil ... | | ½ „ ... | ½ chittack. |
| Spices ... | ⅛ | chittack | ¼ kutcha | | ¼ kutcha ... | | ⅛ „ ... | ¼ kutcha. |
| Vegetables | 4 | chittacks | 2 chittacks | | 2 chittacks ... | | 2 chittacks ... | 2 chittacks. |
| Firewood. | Not stated | | 1 seer | | 1 seer per patient. | | 1 md. & 5srs. | 1md.&5srs. |
| Coal or cok | ...... | | Nil ... | | Nil ... | | 1md. &15 srs | 1md. &15srs. |
| Butter ... | ¼ | ounce | „ ... | | „ ... | | Nil ... | Nil. |
| Tobacco | ¼ | „ ... | „ ... | | „ ... | | ¼ ounce ... | ¼ ounce. |
| Betel and pân | | | | | | | | |

* On alternate days. †Discontinued in 1875.

[109] অ্যানুয়াল রিপোর্ট অন দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল, অফ দ্যা ইয়ার - ১৮৭০,জে. ক্যাম্পবেল ব্রাউন, ইন্সপেক্টর – জেনারেল অফ হসপিটাল ,বেঙ্গল মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট, ক্যালকাটা।

[110] অ্যানুয়াল রিপোর্ট অন দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৭৯। এ. জে. পেইন সার্জেন জেনারেল অফ বেঙ্গল। প্রিন্টেড এট দ্যা বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস। ১৮৮০

## Number Of Staff And Subordinate Officers And Payable Ammount[111]

| No. of Staff | Subordinate Staff | Payable Ammoun Rs. |
|---|---|---|
| 1 | Matron at ... ... | 100 |
| 1 | Apothecary and Steward .... | 200 |
| 1 | Overseer ... ... | 70 |
| 3 | Overseers at Rs. 50 each .... Servants. | 150 |
| 1 | Writer ... ... | 25 |
| 1 | Compounder ... ... | 10 |
| 1 | Head-keeper ... ... | 16 |
| 3 | Assistant keepers at Rs. 7 each ... | 21 |
| 15 | Keepers at Rs. 6 each ... ... | 90 |
| 1 | Butler ... ... | 9 |
| 3 | Table servants at Rs. 6 each | 18 |
| 1 | Sculling man ... ... | 4 |
| 3 | Cooks at Rs. 6 each ... ... | 18 |
| 3 | Bearers at Rs. 6 each ... ... | 18 |
| 3 | Tailors at Rs. 6 each ... ... | 18 |
| 1 | Barber ... ... | 6 |
| 1 | Head-gardener ... ... | 6 |
| 2 | Assistant gardeners at Rs. 5 each ... | 10 |
| 3 | Garden coolies at Rs. 4 each | 12 |
| 1 | Carpenter ... ... | 10 |
| 3 | Coolies, 2 at Rs. 5 and 1 at Rs. 4 | 14 |
| 5 | Water-carriers at Rs. 5 each. | 25 |
| 6 | Sweepers at Rs. 5 each ... ... | 30 |
| 2 | Head-female keepers at Rs. 7 each ... | 14 |
| 4 | Female keepers at Rs.6 each | 24 |
| 5 | Ditto sweepers at Rs. 6 each | 30 |
| 1 | Corner sweeper ... ... | 2 |
| 1 | Head door-keeper ... ... | 7 |
| 3 | Assistant door-keepers at Rs. 6 each ... | 18 |
| 1 | Washer man ... ... | 50 |
| 80 | Grand total ... | 1,025 |

---

[111] দ্যা রেকর্ড অফ গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল, এন; XXVIII। রিপোর্টস অফ দ্যা অ্যাসাইলাম ফর ইউরোপিয়ান অ্যান্ড নেটিভ ইনসেন পেসেন্টস, এট ভবানিপুর অ্যান্ড দুলুন্দা,ফর ১৮৫৬, জন গ্রে, ক্যালকাটা গেজেট অফিস *The Superintendent drew a staff salary of Rs. 1,000 (for Bhowanipore and Dullunda) in addition to the pay of his rank. The subordinate establishment was as noted in the margin, the first six being Europeans, the rest natives. The system of treatment was that of non-restraint, but during the early part of 1856, in consequence of the full establishment not being available, mechanical restraint could not be entirely avoided. It was, however, confined to gloves and strait waistcoats and reserved for cases of extreme violence. "Coercion chairs," "manacles," and such instruments of torture transferred with the asylum were consign- ed to the lumber room, and as the establishment was completed and the overseers and keepers became accustomed to manage the lunatics, coercion was gradually abolished as far as possible. The need of the comparatively large number of European overseers is insisted on because of the irritating effect on European patients of attempting to control them by native agency.*

## *Statement of Dullunda Asylum.*

This asylum was under the charge of Surgeon Major Payne, M. D., during the first four months of the year. Surgeon J. M. Shircore officiated for Dr.Payne during the remainder of the year. The annual report is written by Surgeon R. Bird, m. d., who succeeded Dr. Shircore as Officiating Superintendent. A steady increase of population continues, as will be seen from the accompanying statement. Unlike the two years immediately preceding, the admissions have increased. Dr. Bird writes—Ò The admissions reached 191 and the re-admissions 28,—49 women and 170 men. The joint number is greater than the combined number of admissions and re-admissions of any year since the . asylum was established, by 22. In 1 867 the number was 197 and in 1866, 196.Ó So also with the total treated, increase is to be observed,—544 were treated, being an excess of 51 over any preceding year. The ratio of cures has been very low, below the average of the last 10 years, but Dr. Bird explains the very small proportion by the fact that there has been an unusual number of transfers[112] .

STATEMENT No. XII.

| Years. | | | Daily average number. | PER CENT. OF AVERAGE STRENGTH. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Admitted. | Discharged | | | Deaths. | Total discharges and deaths. |
| | | | | | Cured. | Improved. | Otherwise. | | |
| 1867 | ... | ... | 220 | 89·5 | 35 9 | 7·2 | ... | 23·18 | 66·3 |
| 1868 | ... | ... | 268 | 73·1 | 38·1 | 10·1 | ... | 17·9 | 66·1 |
| 1869 | ... | ... | 279 | 63·8 | 27·2 | 11·4 | ... | 16·4 | 55·0 |
| 1870 | ... | ... | 309 | 59·5 | 28·8 | 9·7 | ... | 12·6 | 51·1 |
| 1871 | ... | ... | 335 | 52·5 | 27·4 | 6·2 | 3·5 | 12·8 | 49·9 |
| Average | ... | ... | 282 | 67·7 | 31·5 | 8·9 | ·7 | 16·6 | 57·7 |
| 1872 | ... | ... | 354 | 61·9 | 19·8 | 11·6 | 3·4 | 12·4 | 47·2 |

D

The percentage of deaths to average strength has maintained a very even proportion during the last three years, but is slightly less this year, and considerably below the average of the previous five years,12.4 against 166. The percentage of deaths amongst females which had hitherto, with the exception of the previous year, been high, having reached 29.2 in 1866, has this year been only 4.8. Dr. Bird attributes the general satisfactory result to recent improvements in the hygienic and sanitary conditions of the asylum ; but it is difficult to account for the specially marked diminution in the female mortality, for the percentage of male deaths was a little more than double that of female deaths, whilst, as Dr. Bird remarks, when he notes the difficulty, the men are less crowded, and better housed than the women. Indeed, the crowding of the latter is excessive[113] .

---

112 দ্যা জেনারেল রিপোর্ট অন দ্যা লুনাটিক অ্যাসাইলাম, ভ্যাক্সিনেশন অ্যান্ড ডিসপেনসারিস অফ দ্যা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, ১৮৭২, সার্জন ই.এ.ব্রিচ , ক্যালকাটা, অফিস অফ সুপারিন্টেনডেন্ট অফ গভর্নমেন্ট, ১৮৭৫, পৃ- ১৩

113 Ibid pp-14

## ক্যালকাটা মেসমেরিক হাসপাতালে পাগলামির চিকিৎসা (১৮৪৫ খ্রীঃ )

হিপ্নোটিজম জাদুবিদ্যার অংশ একথা সবারই জানা। আবার চিকিৎসা শাস্ত্রে, বিশেষত মনস্তত্ত্বে এখন তার ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এই বিষয়কে চিকিৎসার অন্তর্ভুক্তির ধারণা আজকের ঘটনা নয়। সর্বাগ্রে এই সম্মোহন বা হিপ্নোটিজম ব্যবহার করা হয় শল্য চিকিৎসার কাজে। অবাক লাগলেও এটাই সত্যি। সম্মোহনকে যে মূলত শল্য চিকিৎসায় প্রয়োগ করা যেতে পারে তা ছিল কল্পনাতীত। আর যে সময়ে এই সম্মোহন বিদ্যা কার্যকরী হয় তখন ক্লোরোফার্ম আবিষ্কার হয় নি, তাই রোগীর যন্ত্রনা মুক্তির এই প্রক্রিয়া বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আর সেই উদ্দেশ্যেই কলকাতায় এমন সম্মোহন চিকিৎসার হাসপাতাল তৈরী হয়।

সময়টা ১৮৪৫ সালের এপ্রিল মাসে, হুগলির ইমামবাড়া হাসপাতালে শল্যচিকিৎসার পাশাপাশি পাগলদের চিকিৎসা করার এক নতুন উদ্ভবনি পন্থা শুরু হয়। ডাঃ জেমস ইসডেল সম্মহনি বিদ্যার মধ্য দিয়ে প্রায় কিছু সময়ের মধ্যে রোগীকে অজ্ঞান করে ঘুম পাড়িয়ে রাখতেন। ফলে উন্মাদ রোগীর মনের চাঞ্চল্য দূর হয়ে মানসিক স্থিরতা উপলব্ধি করতেন। ডাঃ জেমস ইসডেল মূলত রোগীদের অস্ত্র প্রচারের ক্ষেত্রে এই সম্মোহন কৌশল প্রয়োগ করতেন। কিন্তু উন্মাদ রোগীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার পর দেখা যেত পাগলদের ভয়ানক পরিস্থিতি ও উদ্ভট আচরণ থেকে নিঃকৃতি লাভ করা যেত। পাগল রোগী যখন খুব উত্তেজিত হয়ে যেত ও চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করত, তখন রোগীকে সম্মোহনী শাস্ত্রে তাঁরা তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতেন [114]।

এক্কেবারে নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি। আর তার জনপ্রিয়তার কারণেই প্রথমে ক্যালকাটা নেটিভ হাসপাতালের একটি ঘরে পৃথকভাবে শুরু হয় সম্মোহন হাসপাতালের কাজ। প্রথম দশজন রোগীর মধ্যে সাত জনকে সম্পূর্ণ সুস্থ করা হয় এখানে। পরে এখানকার কাজের অগ্রগতি দেখে ১৮৪৬ সালে কলকাতার মট লেনে সম্পূর্ণ পৃথক একটি হাসপাতাল খোলার অনুমতি দেয় তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার। নাম হয় ক্যালকাটা মেসমেরিক হাসপাতাল। হাসপাতালের দায়িত্ব নেন ডাঃ জেমস ইসডেল। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই চিকিৎসা পদ্ধতি সর্বসাধারণের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে

[114] সেকেন্ড হাফ – ইয়ারলি রিপোর্টস, ক্যালকাটা মেসমেরিজম হসপিটাল ১৮৪৯, মেসমেরিজম ইন ইন্ডিয়া, ফরমিড্যাবল অ্যান্ড নিউমেরাস পেইনলেস সার্জিক্যাল অপেরেশনস, ডাঃ এলিয়টসন, লন্ডন।

কারণ  বেদনাহীন চিকিৎসা পদ্ধতি ওই একটিই, সম্মোহন!  প্রাথমিকভাবে এক বছরের জন্য শুরু করা হয়েছিল এই হাসপাতাল। কিন্তু মেডিক্যাল তীব্র সমালোচনা ও অন্যান্য আসুবিধা জনিত কারনে ১৮৪৮ সালের ৩রা জানুয়ারি ক্যালকাটা মেসমেরিক হাসপাতাল চিরতরের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। যদিও ব্যক্তিগত ভাবে সম্মোহন চিকিৎসা চালিয়ে গিয়েছিলেন ডাঃ ইসডেল।

## মেসমারিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত লর্ড ডালহৌসীর চিঠি [115]

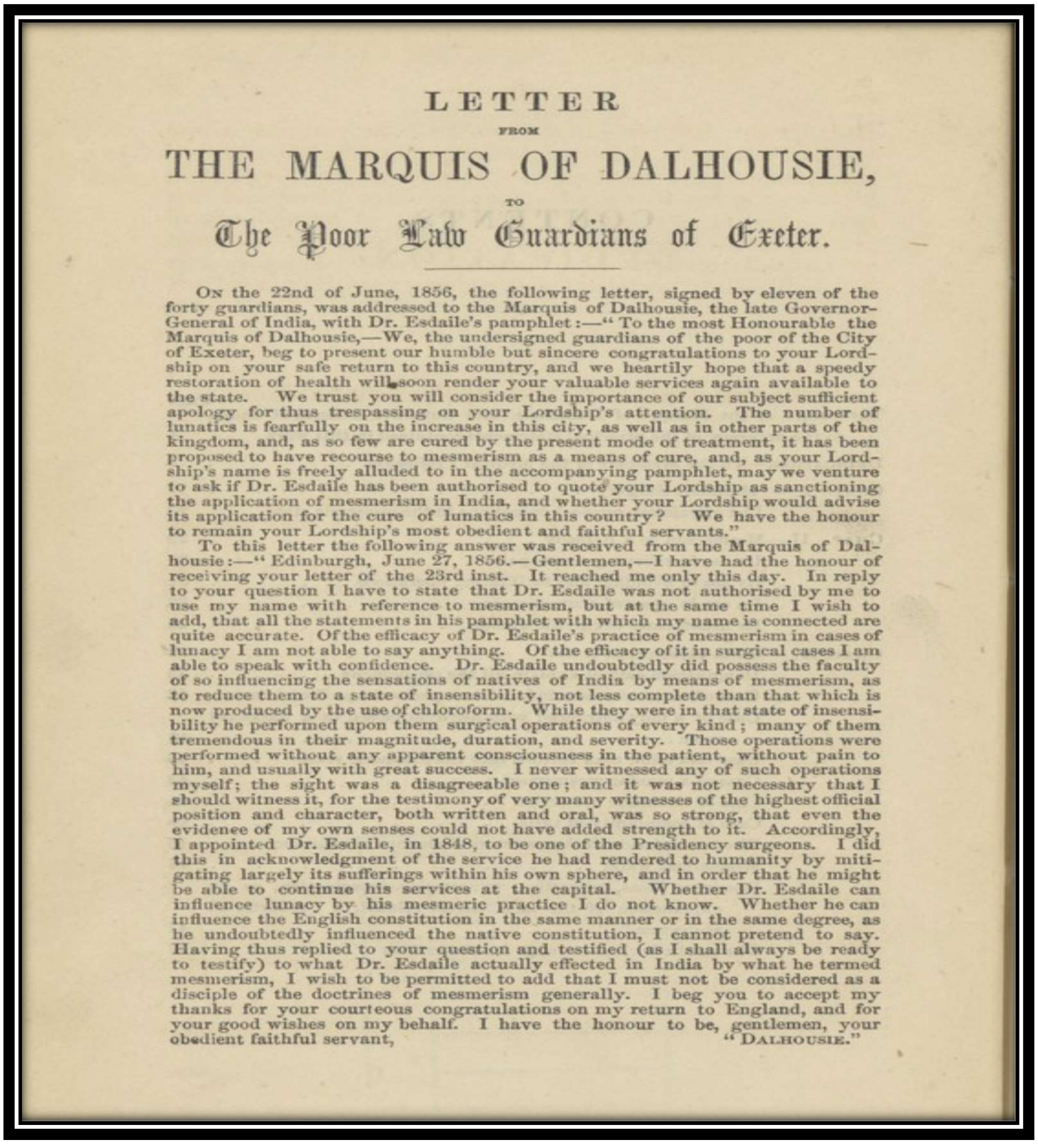

LETTER
FROM
THE MARQUIS OF DALHOUSIE,
TO
The Poor Law Guardians of Exeter.

On the 22nd of June, 1856, the following letter, signed by eleven of the forty guardians, was addressed to the Marquis of Dalhousie, the late Governor-General of India, with Dr. Esdaile's pamphlet:—"To the most Honourable the Marquis of Dalhousie,—We, the undersigned guardians of the poor of the City of Exeter, beg to present our humble but sincere congratulations to your Lordship on your safe return to this country, and we heartily hope that a speedy restoration of health will soon render your valuable services again available to the state. We trust you will consider the importance of our subject sufficient apology for thus trespassing on your Lordship's attention. The number of lunatics is fearfully on the increase in this city, as well as in other parts of the kingdom, and, as so few are cured by the present mode of treatment, it has been proposed to have recourse to mesmerism as a means of cure, and, as your Lordship's name is freely alluded to in the accompanying pamphlet, may we venture to ask if Dr. Esdaile has been authorised to quote your Lordship as sanctioning the application of mesmerism in India, and whether your Lordship would advise its application for the cure of lunatics in this country? We have the honour to remain your Lordship's most obedient and faithful servants."

To this letter the following answer was received from the Marquis of Dalhousie:—"Edinburgh, June 27, 1856.—Gentlemen,—I have had the honour of receiving your letter of the 23rd inst. It reached me only this day. In reply to your question I have to state that Dr. Esdaile was not authorised by me to use my name with reference to mesmerism, but at the same time I wish to add, that all the statements in his pamphlet with which my name is connected are quite accurate. Of the efficacy of Dr. Esdaile's practice of mesmerism in cases of lunacy I am not able to say anything. Of the efficacy of it in surgical cases I am able to speak with confidence. Dr. Esdaile undoubtedly did possess the faculty of so influencing the sensations of natives of India by means of mesmerism, as to reduce them to a state of insensibility, not less complete than that which is now produced by the use of chloroform. While they were in that state of insensibility he performed upon them surgical operations of every kind; many of them tremendous in their magnitude, duration, and severity. Those operations were performed without any apparent consciousness in the patient, without pain to him, and usually with great success. I never witnessed any of such operations myself; the sight was a disagreeable one; and it was not necessary that I should witness it, for the testimony of very many witnesses of the highest official position and character, both written and oral, was so strong, that even the evidenee of my own senses could not have added strength to it. Accordingly, I appointed Dr. Esdaile, in 1848, to be one of the Presidency surgeons. I did this in acknowledgment of the service he had rendered to humanity by mitigating largely its sufferings within his own sphere, and in order that he might be able to continue his services at the capital. Whether Dr. Esdaile can influence lunacy by his mesmeric practice I do not know. Whether he can influence the English constitution in the same manner or in the same degree, as he undoubtedly influenced the native constitution, I cannot pretend to say. Having thus replied to your question and testified (as I shall always be ready to testify) to what Dr. Esdaile actually effected in India by what he termed mesmerism, I wish to be permitted to add that I must not be considered as a disciple of the doctrines of mesmerism generally. I beg you to accept my thanks for your courteous congratulations on my return to England, and for your good wishes on my behalf. I have the honour to be, gentlemen, your obedient faithful servant, "DALHOUSIE."

---

[115] দ্যা ইন্ট্রোডাকশন মেসমেরিজম , দ্যা পাবলিক হসপিটাল অফ ইন্ডিয়া ১৮৫৬, জেমস এসডেইল, ডেডিকেটেড টু দ্যা মেডিকেল প্রফেশন, লন্ডন। পৃ - ৪

# ময়দাপুর ও  বহরমপুর উন্মাদ আশ্রম

উপনিবেশিক অধ্যায়ে বঙ্গদেশে অন্যান্য উন্মাদ আশ্রমের মতো ময়দাপুর পাগলাগারদটি ছিল অন্যতম,ময়দাপুরের পাগলাগারদে ৭৫ জন রোগীদের থাকার ব্যবস্থা ছিল। এটি স্থাপিত হয়েছিল বহরমপুর থেকে ৩ মাইল দূরে এবং তা যথাক্রমে জেলা সিভিল সার্জন, একজন হাসপাতাল সহকারী ডাক্তার এবং অন্যান্য কর্মচারীসহ একজন দারোগার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতো । ময়দাপুরপাগলাগারদ ১৮৭৬ সালে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ময়দাপুরের কর্মচারীসহ সকল রোগীকে তখন বহরমপুরে স্থানান্তরিত করা হয়। বাংলার সরকার ১৮৮৬ সালের ৮ই জুনে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে, যাতে ভিন্ন ভিন্ন পাগলাগারদের জন্য পৃথক অঞ্চল বরাদ্দ করা হয়। বহরমপুরে নবপ্রতিষ্ঠিত পাগলাগারদে যথাক্রমে মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী, নদীয়া, যশোর, খুলনা, ভাগলপুর, মালদা, পূর্ণিয়া, বর্ধমান, বীরভূম এবং বালেশ্বর থেকে আগত রোগীদেরকে স্থান দিতে হয়। পরে ১৯০৫ সালে, বহরমপুর পাগলাগারদ পরিবর্ধিত করা হয় ৩ লাখ ভারতীয় রুপি ব্যয় করে এবং এর নামকরণ করা হয় কেন্দ্রীয় পাগলাগারদ, বহরমপুর[116]। দুলান্দা পাগলাগারদ ও কটক পাগলাগারদের সকল রোগীকে বহরমপুর পাগলাগারদে স্থানান্তরিত করা হয়। প্রথমবারের মতো বাংলার বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে প্রতিবাদ শোনা যায় এ বিষয়ে,কেননা সে সময় বহরমপুর খুব একটা স্বাস্থ্যকর অঞ্চল ছিল না। মূলত এই এলাকাতে ম্যালেরিয়ার প্রচুর প্রকোপ ছিল এবং এই প্রতিবাদের পর ঠিক করা হয় যে রাঁচিতে কেন্দ্রীয় পাগলাগারদ প্রতিষ্ঠা করার পর দুলান্দার সকল রোগীকে সেখানে স্থানান্তর করা হবে, যেহেতু বহরমপুরের তুলনায় রাঁচি স্বাস্থ্যকর এলাকা ছিল। এছাড়া বলা হয় যে বহরমপুরে রোগীদেরকে রাখা হবে শুধুমাত্র সাময়িক কালের জন্য।দুলান্দা মানসিক হাসপাতাল অপরাধী মানসিক রোগী এবং সর্বসাধারণ মানসিক রোগী উভয়ের জন্যই  উন্মুক্ত ছিল। ডঃ ক্যান্টর এবং ডঃ পেইন দুজন সুপারন্টেন্ডেন্টই উপলব্ধি করেন যে এই ধরণের রোগী একসাথে রাখলে সমস্যার উদ্রেগ করবে, এবং তা দীর্ঘদিন যাবৎ অবস্থানকালীন রোগীদের জন্য আরও অসুবিধাজনক। সুতরাং, কর্মচারীর সংখ্যা বাড়ানো এবং দুই ধরণের রোগীদের পৃথকীকরণের প্রশ্ন উঠলো। দীর্ঘমেয়াদী সমাধান হিসেবে প্রস্তাবিত হলো যে, প্রত্যেক কারাগারের মধ্যে অপরাধী মানসিক

[116] ভি.এল. ভার্মা হিস্টোরি অফ সাইকায়াট্রি ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান, ইন্ডিয়ান মেডিকেল গেজেট

রোগীদের জন্য পৃথক কারাকক্ষ নির্মাণ করা হোক। তবে এর সমাধান হিসেবে লেফটেনেন্ট গভর্নর সিদ্ধান্ত নিলেন একটি নতুন হাসপাতাল স্থাপন করার এবং তা বহরমপুরেই প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পলাশীর যুদ্ধের কিছুদিন পর, বিদ্রোহ দমন করার জন্য এই বহরমপুরকেই সৈনবাহিনীর স্টেশন হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর, ইউরোপিয়ান সৈন্যরা পুনরায় সেখানে অবস্থান করে তবে ১৮৭০ সালে তাদেরকে অবশেষে অপসারন করা হয় এবং সেই  সেনানিবাসগুলো তখন শূন্য অবস্থায় পড়ে থাকে। সেনানিবাসকে কেন্দ্র করে একটি ভবন নির্মাণ করা এবং সেটিকে মানসিক হাসপাতালে রূপান্তরিত করা বেশ সহজ হয়েছিল।

১৮৯০ সালের বাংলার পাগলাগারদের বাৎসরিক রিপোর্ট বলছে, ঐ সময় বাংলায় সর্বসাকুল্যে ১,০১৯ জন পাগলের বসবাসের সংস্থান ছিল সরকারি পাগলাগারদগুলিতে । পাগলের সংখ্যা এবং পাগলাগারদে অধিকৃত স্পেস হিসেব করে জানানো  হচ্ছে, প্রত্যেক পাগলের জন্য গড়ে ৫০ বর্গফুট আবাসভূমি বরাদ্দ ছিল । সম্ভবত মাথাপিছু স্থান বরাদ্দের হিসেবের মধ্যে গারদের গুদামঘর , অফিসারদের কোয়ার্টার , বাগান সবকিছুই ধরা হয়েছিল । আসলে, পাগলাগারদে সবসময়ই স্থানাভাব ছিল । ঐ রিপোর্টেই অন্যত্র জানানো  হয়েছে , দুলুন্দার কিংবা অন্যান্য পাগলাগারদে পাগলদের আবাসের যথেষ্ট  অভাব ।  কিন্তু বহরমপুর গারদে সেই সময় পরিকাঠামো অনেক ভালো  এবং মহিলা রোগীদের  ঘরের কোন অভাব নেই , কিন্তু সব পুরুষ পাগলদের স্থান সংকুলান করা যাচ্ছে না । এমনিতেই ১৮৮০ সাল থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত সরকারি হিসেবে দেখা যাচ্ছে , বাংলার পাগলাগারদে পাগল ভর্তির সংখ্যা বাড়ছে । ১৮৮০ সালে, এই উন্মাদ আশ্রমে শুধুমাত্র  ক্রিমিনাল লুনাটিকের সংখ্যা ছিল ২৭৬ । ১৮৯০ সালে এদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৪০ জনে । ১৯১০ সাল নাগাদ সরকার আইন করে পাগলাদের আঞ্চলিক বিভাজন করে দেয় । স্থির হয় , ভবানীপুর পাগলাগারদে বাংলার সমস্ত সাহেব পাগলরা থাকবে। পাটনার পাগলাগারদ , ছোটনাগপুর , পাটনা ডিভিসন, মুঙ্গের , সাঁওতাল পরগণা জেলার নেটিভ পাগলদের  বহরমপুরে স্তানাতরন স্থানান্তরন করে বহরমপুরে আনা হয়। নির্দিষ্ট হয়  বহরমপুর পাগলাগারদ  বাংলার  অন্য  সব জেলার নেটিভ  নেটিভ পাগল দের  জন্য[117]।

---

[117] অ্যানুয়াল রিটার্ন অফ দ্যা লুনাটিক অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল উইথ ব্রিফ নোটস ১৯১২, জি,এফ,এ, হ্যারিস

বিংশ শতকের প্রথম দিকে  বহরমপুর উন্মাদ আশ্রমে আগত রোগীদের চিকিৎসাসেবার জন্য বহির্বিভাগীয় ও অভ্যন্তরীণ বিভাগীয় রোগীদের জন্য রয়েছে পৃথক বিভাগের ব্যবস্থা করা হয়। আশ্রমে রোগী ভর্তির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয় বহির্বিভাগ। সাধারণত এছাড়া পুরোপুরি ভাবে মানসিক প্রতিবন্ধী ও মৃগীরোগীকেও ভর্তি করা থেকে বিরত করা হত। এই আশ্রমে বিশেষ করে মাদকাসক্তদের বা গঞ্জিকা সেবনের কারনে উন্মাদ রোগীর আধিক্য দেখা যায় । ঔষধের মাধ্যমে চিকিৎসা এক্ষেত্রে প্রধান কৌশল হলেও রোগীরা দলগত চিকিৎসা এবং পেশাগত চিকিৎসাও পায় সেজন্য  বাহিরে ও ঘরে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয় । এছারাও উন্মাদের শ্রম এটি কৃষিখামারসহ ঘানী, ছুতোরকাজ পরিচালনা করা হতো। এসব কার্যক্রম থেকে অর্জিত অর্থ রোগীদের কল্যাণে কতোটা  ব্যবহার করা  হতো টা নিয়ে সংশয় ছিল  ।

ক্রিমিনাল লুনটিক ছারাও বহরম্পুর উন্মাদ আশ্রমে ৮০ ও ৯০ সে দশকে যত রোগী ভর্তি হয়েছিল তার মধ্যে  গঞ্জিকা সেবনের ফলে উন্মাদ রোগীর আধিক্য বেশী দেখা যায় , Indian Hemp & Drugs Commission এর প্রতিবেদনে কয়েকটি ঘটনা নিম্নে উপস্থাপন করা হল-

**কারানু শাবা- কেস নং- ৩**  উন্ময়াদনার কারন অনুসন্ধানে দ্বিতীয়বার তদন্তে প্রমাণিত হয় যে লোকটি গাঁজা খেত না . সে এগারো বছর বয়সে হঠাৎ পাগল হয়ে যায়।  তার উন্মদনার জন্য গাঁজাকে দায়ী করা হয়নি। ১৮৯৪ সালের মার্চ মাসে ডাঃ মিডোজ কাছে এই লোকটি সম্পর্কে গাঁজা ধূমপান করেছিল বলে অভিযোগ  হয়েছিল। এই স্বীকারোক্তি রেকর্ড করার জন্য এরপর থেকে ছেলেটির ওপর বেশ কয়েকটি বল প্রয়োগ করা  হয়েছিল । স্বীকারোক্তি না দেওয়া পর্যন্ত তার উপর আক্রমন কর হয়েছিল । কিন্তু তার পূর্বের ইতিহাস সংগ্রহ করার  ডাঃ মিডোস তার মতামত প্রত্যাহার করে নেন যে,  ঘটনাটি গাঁজার কারণে হতে পারে না[118] .

**বিহারী জোলাহা- কেস নং-৪**  - এই ব্যক্তিকে ১৮ই মার্চ ১৮৯১ সালে কারাগারে পাঠানো হয়েছিল এবং এক বছর অবধি তিনি পাগল হননি। কারাগারে ভর্তির পরবর্তী সময়কালে  তিনি স্বল্প মানসিক  রোগে অসুস্থ হয়ে পরেছিলেন। যদিও আরও অনুসন্ধানে দেখা যায় যে তিনি একজন মাঝারি ধরনের গঞ্জিকা নেশাগ্রস্থ তে আক্রান্ত ছিলেন, তবে মানসিক বিকৃতি ঘটেছিল তার জেলে, ভর্তি হওয়ার এক

---

ইন্সপেক্টর জেনারেল অগ সিভিল হসপিটাল, দ্যা বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট ১৯১৩, ক্যালকাটা

118 রিপোর্ট অফ দ্যা ইন্ডিয়ান হেম্প ড্রাগস কমিশন ১৮৯৩-৯৪, বহরমপুর লুনাটিক অ্যাসাইলাম, কেস নং ৩, ভলিউম- ২, এঙ্কুয়ারি এস টু দ্যা কানেকশন বিটুইন হেম্প ড্রাগস অ্যান্ড ইন্সেনিটি।.

বছরের বেশি সময় পরে, এজন্য তিনি গাঁজাকে সেবন না করতে পারায় তার উন্মাদ রোগ দেখা দিয়েছিল[119]।

**কানাই লাল দুবে, কেস নং- ৫** - এই লোকটির সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি, সে একজন নেটিভ পাগল ছিল এবং উন্মাদ অবস্থায় ভর্তি হওয়ার কিছুদিন আগে জেলে বন্দী ছিল। 'দীর্ঘদিন ধরে' তার নেশাগ্রস্থতা ও অভ্যাস জানার জন্য পুলিশ কীভাবে তাকে উন্মাদ রোগের জন্য আশ্রমে পাঠিয়েছিলেন তা ব্যাখ্যা করা হয়নি। এমন কেউ ছিল না যে তার ইতিহাস সম্পর্কে কোনো তথ্য দিতে পারত; কিন্তু লোকটি একজন বদ্ধ পাগল ছিল[120]।.

**রামনারায়ণ কেস নং- ৬** - এই পাগলটি সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি , ম্যাজিস্ট্রেট স্পষ্টভাবে বলেছেন কোন রকম বিবৃতি ছাড়ায় বলা যেতে পারে যে, তার উন্মদনার জন্য মূল দায়ী হল গঞ্জিকা সেবন। কারন তিনি পাগল অবস্থাতে বিভিন্ন সময়ে ধুমপান করতেন। ম্যাজিস্ট্রেট স্পষ্টভাবে বলেছেন যে লোকটির মুখাশ্রিত বয়ান থেকে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি , কারন তিনি কথা বলার মতো নেই কোন তথ্য দেওয়ার কোন অবস্থা নেই, এবং তার সম্পর্কে কেওও কোন কিছু জানে না[121]।

**কান্তা দুবে মামলা নং ৮-** অধিকতর তদন্তে দেখা যায় এই পাগল সম্পর্কে কিছুই নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তার পূর্ব ইতিহাস সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি , যখন তার সম্পর্কে বর্ণনামূলক রোলটি তৈরি করা হয়েছিল; এবং পুলিশ লিপিবদ্ধ করেছিলেন যে তিনি পূর্বে গাঁজা ব্যবহার করতেন তা সম্ভবত, (যদিও এটি নিছক অনুমান নয় ) এই বিবৃতির উপর ভিত্তি করে তাকে উন্মাদ আশ্রমে দিয়েছিলেন। অন্যদিকে , আশ্রমে তার উপদংশ রোগের একটি পরিষ্কার ইতিহাস রয়েছে[122]।

---

[119] রিপোর্ট অফ দ্যা ইন্ডিয়ান হেম্প ড্রাগস কমিশন ১৮৯৩-৯৪, বহরমপুর লুনাটিক অ্যাসাইলাম, কেস নং ৪, ভলিউম- ২, এঙ্কুয়ারি এস টু দ্যা কানেকশন বিটুইন হেম্প ড্রাগস অ্যান্ড ইন্সেনিটি।

[120] রিপোর্ট অফ দ্যা ইন্ডিয়ান হেম্প ড্রাগস কমিশন ১৮৯৩-৯৪, বহরমপুর লুনাটিক অ্যাসাইলাম, কেস নং ৫, ভলিউম- ২, এঙ্কুয়ারি এস টু দ্যা কানেকশন বিটুইন হেম্প ড্রাগস অ্যান্ড ইন্সেনিটি।

[121] রিপোর্ট অফ দ্যা ইন্ডিয়ান হেম্প ড্রাগস কমিশন ১৮৯৩-৯৪, বহরমপুর লুনাটিক অ্যাসাইলাম, কেস নং ৬, ভলিউম- ২, এঙ্কুয়ারি এস টু দ্যা কানেকশন বিটুইন হেম্প ড্রাগস অ্যান্ড ইন্সেনিটি।

[122] রিপোর্ট অফ দ্যা ইন্ডিয়ান হেম্প ড্রাগস কমিশন ১৮৯৩-৯৪, বহরমপুর লুনাটিক অ্যাসাইলাম, কেস নং ৮, ভলিউম- ২, এঙ্কুয়ারি এস টু দ্যা কানেকশন বিটুইন হেম্প ড্রাগস অ্যান্ড ইন্সেনিটি

**অর্জুন উপাধ্যায় ,কেস নং-৯** এই ক্ষেত্রে পরবর্তী তদন্তে নথিভুক্ত প্রমাণগুলি চূড়ান্তভাবে দেখায় যে লোকটি কোনও পাগল হওয়ার জন্য মুলত দায়ী ছিল বিগত বছর গুলিতে তিনি বিভিন্ন মাদক দ্রব্য গ্রহন করতেন , বিশেষ করে গাঁজাতে আসক্তি ছিলেন।এসাইলাম সুপারিনটেনডেন্টের রেকর্ড থেকে বোঝা যায় তিনি ক্রমশঃ বদ্ধ উন্মাদ পরিণত হয়েছিলেন। কিন্তু তার পাগল হওয়ার পিছনে আনুষঙ্গিক অনেকগুলি কারন ছিল যেগুলি , এবং তার পূর্ব জীবনের ইতিহাস সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি[123] ।

Sir Andrew Fraser ছিলেন বাংলার উন্মাদ আশ্রমের লেফটানান্ট গভর্নর। বিংশ শতকের গোঁড়ার দিকে উন্মাদ আশ্রমের পরিকাঠামোর দিক থেকে এক অমূল সাধন হয়। এই সময় অস্থায়ী ভাবে সমস্ত উন্মাদ আশ্রমের কেন্দ্রবিন্দু ধরা হয় বহরমপুরকে। এবং লেফটানান্ট গভর্নরের নির্দেশে সমগ্র বাংলা তে মোট ৩টি উন্মাদ আশ্রম চালু হয়েছিল। ইফরপিয়ান (অভারতীয়)দের জন্য ছিল ভবানিপুর উন্মাদ আশ্রম। এবং ভারতীয় দের জন্য ছিল বহরমপুর উন্মাদ আশ্রম। বহরমপুর উন্মাদ আস্রমকে অস্থায়ী ভাবে কেন্দ্রীয় উন্মাদ আশ্রমে পরিণত করার পর কোলকাতা, হাওড়া, ২৪ পরগনা, খুলনা, যশোহর, মুরশিদাবাদ, বর্ধমান, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, নদীয়া, হুগলী, কটক, বালাসর, পুরি, সম্বলপুর, ভাগলপুর, বিহার, দার্জিলিং ও কোচবিহার,ইত্যাদি জেলাগুলি এই উন্মাদ আশ্রমের অধীনে রাখা হয়।

**হাজারীবাগ অঞ্চলে উন্মাদ আশ্রম (১৮৭৬ খ্রীঃ )**

অতিরিক্ত জায়গা সঙ্কুলানের জন্য ১৮৭৬ খ্রি মিলিটারি ব্যারাকের স্থানটি উন্মাদ আশ্রমে পরিনত করা হয়। কিন্তু সেই সময় এই আশ্রমে ১৪৭ জন পুরুষ ৫৫ জন মহিলা রাখার ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তীকালে এর সংখ্যাটি আরও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু দেখা যায় এই আশ্রমে রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮৭৬ খ্রি বাংলার ঔপনিবেশিক সরকার, উন্মাদ রোগীর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেলে হাজারীবাগ অঞ্চলে আরেকটি উন্মাদ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। অল্প সংখ্যক রোগী নিয়ে এই আশ্রম শুরু হলে ও প্রশাশনীক ও ব্যবস্থাপনার আসুবিধার জন্য এই আশ্রমটি বন্ধ হয়ে যায় ।

---

[123] রিপোর্ট অফ দ্যা ইন্ডিয়ান হেম্প ড্রাগস কমিশন ১৮৯৩-৯৪, বহরমপুর লুনাটিক অ্যাসাইলাম, কেস নং ৯, ভলিউম- ২, এঙ্কুয়ারি এস টু দ্যা কানেকশন বিটুইন হেম্প ড্রাগস অ্যান্ড ইন্সেনিটি।

# উন্মাদ আশ্রমের ইতিহাস ও বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি

**উন্মাদ** আশ্রমের কর্তারা যে শুধুমাত্র রোগীদের খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন তা নয়, তাঁদের মানসিক অসুস্থতার ক্ষেত্র আরও গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করতেন সেক্ষেত্রে বাংলার উন্মাদ গুলি কে তাঁরা ব্যাবহার করেছিলেন।ফোর্বস উইনস্লো (১৮৪৪-১৯১৩) ছিলেন অগ্রণী ব্রিটিশ মনোরোগবিদ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ও গবেষণা করছিলেন মানসিক অসুস্থতার প্রকৃতি কে বোঝার জন্য , ১৮৫৬ সালের ক্যালকাটা রিভিউ-এ, উন্মাদগ্রস্ততা বিষয়ে লেটসোমিয়ান লেকচারে দেওয়া তার বক্তৃতার অংশবিশেষ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল (MacPherson, ১৮৫৬)। বক্তৃতায় উইনস্লো বলেছিলেন যে মানসিক অসুস্থতার সাথে মস্তিষ্কের যোগাযোগ আছে, যা সেই সময়ে এক বৈপ্লবিক ধারণা ছিল, যার সাথে তুলনীয় ছিল জনপ্রিয় কুসংস্কার যে মানসিক অসুস্থতা ভূত এর কারণে ঘটে (MacPherson, ১৮৫৬)। উইনস্লো এছাড়াও নির্দিষ্টভাবে বলেছিলেন যে মানসিক সমস্যাগুলি দ্রুত নির্ণিত হলে সেটির নিরাময় সম্ভব। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে মানসিক সমস্যা সম্পর্কে বোধটি কতটা প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল এবং ব্রিটিশরা কীভাবে ভারতে তাদের চিকিৎসার সিদ্ধান্তকে ব্যাখ্যা করেছিল মস্তিষ্ক সম্পর্কে নতুন আবিষ্কারের আলোকে, উন্মাদগ্রস্ততা হল মস্তিষ্কের একটা অসুখ, এবং ভুত - এর কারসাজি নয়, এবং যদি সেটি দ্রুত পরিচর্যা ও উপযুক্ত চিকিৎসা দ্বারা নিরাময় হয়, (MacPherson, ১৮৫৬)। এই বিশ্বাসের কারণে ব্রিটিশরা যুক্তি খুঁজে পেয়েছিল ভবঘুরে ভারতীয়দের সমাজজীবন থেকে সরিয়ে নেওয়া যাতে তাদের তথাকথিত মানসিক অসুস্থতা নিরাময় করা যায়।

ভারতে উন্মাদাশ্রমগুলি শ্রেণীবিভক্ত ছিল। হাসপাতালের বিধি একাধিকবার সংশোধন করে ভারতে থাকা মানসিকভাবে অসুস্থ ইউরোপীয়দের সুবিধা করে দেওয়া হয়েছিল। ইউরোপীয়দের জন্য উন্মাদাশ্রম ও হাসপাতালের পরিবেশ, ভারতীয়দের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে ভালো ছিল। সেই মতো, ইউরোপীয়দের চিকিৎসা করছে এমন চিকিৎসা পেশাদারেরা, কেবলমাত্র নেটিভদের জন্য উন্মাদাশ্রমে কাজ করছে এমন চিকিৎসা পেশাদারদের তুলনায় বেশি ও উন্নতভাবে প্রশিক্ষিত হতো।

বাংলার  বিভিন্ন উন্মাদ আশ্রম গুলিতে এমন কিছু নিয়ম কার্যকরী করা হয়েছিল যা নিশ্চিত করা হয়েছিল ব্রিটিশদের উৎকৃষ্টতা যেন বজায় থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ব্রিটিশ মেডিকাল জার্নালের

২৫শে জুলাই ১৮৬৮ তারিখের সংস্করণে, বিধির পরিবর্তন ঘোষণা করা হয়েছিল, যা ভারতে চিকিৎসা পরিচর্যাকে প্রভাবিত করে (“Subordinate Medical Care in India,১৮৬৮)। যে অ্যাপোথেক্যারিগণ বেশি প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন, তারা শুধুমাত্র ইউরোপীয় রোগীদের চিকিৎসা করে অনেক বেশি বেতন পেতেন। হসপিটাল অ্যাসিস্টেন্টগণ, যাঁদের প্রশিক্ষণ অ্যাপোথেক্যারিগণের তুলনায় কম ছিল, তাঁরা কম বেতন পেতেন এবং তাঁরা কেবলমাত্র ভারতীয় রোগীদের চিকিৎসা করতেন। ভিক্টোরীয় নীতিবোধ এবং হতভাগ্যদের প্রয়োজনীয়তা “চিহ্নিত” করার দাবী এই সব সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে দেখা যায় নি। “অসভ্য” ভারতীয়দের প্রতি দাক্ষিণ্য প্রদর্শনের যে দাবী ব্রিটিশরা করেছিল তার ফলে সমান স্তরের চিকিৎসা পরিচর্যা কিন্তু প্রদান করা হয় নি।

ভারতে ব্রিটিশদের দ্বারা উন্মাদ -এর সংজ্ঞা কিন্তু স্বচ্ছ ছিল না, এবং এটি বিভিন্ন প্রকারের অসুখ ও সামাজিক অনুপযুক্ততাকে অন্তর্ভুক্ত করতো। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির উন্মাদাশ্রমগুলির সুপরিন্টেন্ডেন্ট, আর্থার পেন, রোগীদের সম্পর্কে বিষয়ে সুসংবদ্ধ রিপোর্ট রাখতেন এবং তার সাথে উন্মাদাশ্রমের উৎপাদনশীলতাকে যথাযোগ্য ভাবে তুলে ধরতেন। বাংলায় উন্মাদাশ্রমের ক্ষেত্রে ১৮৬২ সালের অ্যানুয়াল রিপোর্ট এবং রিটার্ন-এ বর্ণিত ফলাফলে এটি দেখা যায় যে, সেটি মদ ও মাদকাসক্তদের কর্মস্থানে পরিণিত হয়েছে, কারণ সেখানে মানসিক রোগীর বদলে নেশা গ্রস্থ মানুষ কে আটকে রাখা হয়েছিল । দুলুন্ডা উন্মাদাশ্রমের ১১১ জন রোগীদের মধ্যে ৮৯ জনকে আটকে রাখা হয়েছিল মদ/মাদক সেবনের জন্য, ৮ জনকে মৃগী রোগের জন্য, ৩ জনকে বিষাদের জন্য, ৫ জনকে জন্মগত অসুখের জন্য, ২ জনকে বৃদ্ধ হওয়ার জন্য এবং ২ জনকে আফিম সেবনের জন্য (McClelland and Payne, ১৮৬৩)। এই প্রকারের ফলাফল সেই সব দাবীকে নস্যাৎ করে যে ব্রিটিশরা অর্জন করেছিল, সংশ্লিষ্ট সাফল্যের হার এবং চিকিৎসা এবং তার সাথে নির্দিষ্ট চিকিৎসাগত আচরণ অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য রোগ নির্ণয়। পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৯১ জনকে আটকে রাখা হয়েছিল আসক্তির কারণে, হয়ত জনসমক্ষে নেশা করার কারণে। একবার নেশা থেকে সেই ব্যক্তি বেরিয়ে এলে, সেই ব্যক্তি তখন সাধারণ ব্যক্তিদের মতো স্বাভাবিক হয়ে যায়, কিন্তু রেকর্ড অনুযায়ী তবুও তাদেরকে আটকে রাখা হয়েছিল। এছাড়াও মৃগী রোগীদের আটকে রাখার প্রধান কারণ তাদের খিঁচুনিকে কিন্তু সেই সময়ে কোনো অ্যান্টি-কনভালসিভ ওষুধ দিয়ে প্রতিরোধ করা হয় নি।

বাংলার উন্মাদাশ্রমে আটকে রাখা অধিকাংশ রোগীরা আসলে কিন্তু উন্মাদ হওয়ার পরিবর্তে সাধারণের কাছে উপদ্রব স্বরূপ ছিল। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের ফলে ব্রিটিশরা সামগ্রিকভাবে ভারতীয় জনসাধারণের সম্পর্কে আতঙ্কে ভুগতে শুর করেছিল এবং সেই কারণেই দ্রুত সামাজিক বিধি প্রণয়ন করা হয়েছিল।"Disciplining Populations: British Admissions to 'Native Only' Lunatic Asylums" গ্রন্থে, মিলস বর্ণনা করেছেন ঠিক কী ভাষা ব্রিটিশরা ব্যবহার করতো উন্মাদাশ্রমে ভর্তির প্রক্রিয়ার সময়। মিলস দ্বারা পর্যালোচনা করা কেস নোটগুলির মধ্যে খুব অল্প কয়েকটিতেই কেবলমাত্র সঠিক উন্মাদগ্রস্ততার প্রমাণ পাওয়া গেছে: "এটি মনে হয় যে, যে ব্যক্তিগণ সেইসব রোগীদের কেস নোটস লিখেছিলেন তাঁরা বেশি চিন্তিত ছিলেন নতুন ভর্তি হওয়া ব্যক্তিদের ভবঘুরে অবস্থা নিয়ে, তাদের মানসিক রোগগ্রস্ততার বিষয়ে নয়"(Mills, ২০০০)। তিনি কিন্তু উন্মাদাশ্রমের ডাক্তারদের পক্ষ সমর্থন করে বলে ছিলেন যে, সবাই উন্মাদাশ্রমকে ভবঘুরে জনদের থিতু করার জন্য সামাজ সংস্কারের মাধ্যম হিসাবে দেখতেন না। এটি হল সেই আপাত-বৈপরীত্য যা বাংলার উন্মাদশ্রমে দেখা যেতো: কিছু চিকিৎসকেরা রোগীদের চিকিৎসা করতেন অন্য দিকে কিছু চিকিৎসকের লক্ষ্য ছিল বাংলার রাস্তা থেকে যাযাবর ও ভবঘুরেদের সরিয়ে ফেলা।

বার্ষিক প্রতিবেদন গুলিতে  রোগীদের আসল মানসিক সমস্যা সম্পর্কে খুব অল্পই বলা হয়েছে, ভর্তির হিসাব-নিকেশ ছাড়া। রোগীর তালিকায় প্রতিটি রোগীর রোগের সারাংশ এবং তার কারণ নির্দেশ করা হয়েছে মাত্র একটি শব্দে; এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা লেখা হয়েছিল অজানা হিসাবে। যে সব রোগীদের ক্ষেত্রে রোগের নাম লেখা হয়েছিল, তাদের মধ্যে সাধারণত যে অসুখ দেখা গিয়েছিল তা হল দীর্ঘকালীন ম্যানিয়া (বাতিকগ্রস্থতা) এবং স্মৃতিভ্রংশ (ডিমেনশিয়া), যার কারণ হিসাবে লেখা হয়েছিল "গাঁজা সেবন" এবং মদ সেবনে আধিক্য (McClelland and Payne, ১৮৬)। যে সব রোগীদের মদ বা মারিজুয়ানা সেবনের জন্য আটক হয়েছিল তাদের দীর্ঘদিন ধরে রেখে দেওয়া হতো [124]।

---

[124] অ্যানুয়াল রিপোর্ট অ্যান্ড রিটার্ন অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৬২, জে ম্যাক.ক্লেল্ড, অফিসিয়াটিং প্রিন্সিপাল ইন্সপেক্টর- জেনারেল, মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট*একটি উদাহরণ হল রভাকৃস্ট ডেন্নোস্থ, একজন পুরুষ রোগী যাকে*

১৮৭০ সাল আসতে আসতে, গাঁজা সেবনকারীদের আটক রাখার স্থিতিকাল সম্পর্কে বিধি উন্মাদাশ্রমগুলি পরিবর্তন করেছিল। ডঃ জেমস ওয়াইজ, ঢাকা উন্মাদাশ্রমের সুপারিন্টেন্ডেন্ট, তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন তাদের নিরাময় করে ছেড়ে দেওয়ার পরও গাঁজায় আসক্ত ব্যক্তিগণ যে সময় অতিবাহিত করে পুনরায় ভর্তি হতে চায়, তাতে এটি প্রমাণিত যে সাম্প্রতিককালে সুপারিন্টেন্ডেন্টগণ দীর্ঘকাল ধরে অভ্যাসগত গাঁজা সেবনকারীদের আটকে রাখেন, এই আশায় যে তারা তাদের এই কু-অভ্যাস থেকে বেরিয়ে আসবে। আমার বিশ্বাস যে পরের বছরগুলিতে পুনরায় ভর্তি হওয়ার হারে হ্রাস হওয়ার পিছনে এই কারণটি আছে[125] ।

এই রোগীদের ক্ষেত্রে সামাজিক সংস্কার একটি স্বাভাবিক চিন্তার বিষয় ছিল; আর ভারতীয় জনগণের উপর মদ্যপান বর্জন এবং সংযম চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল উন্মাদগ্রস্থতার নিরাময়ের ছদ্মবেশে (McClelland and Payne, ১৮৬৪)। ব্রিটিশ দ্বারা প্রকাশিত উন্মাদাশ্রম রিপোর্ট এবং প্রবন্ধ জুড়ে উন্মাদাশ্রম ও তার কর্মীদের উৎকৃষ্ট কার্যসম্পাদনার একাধিক দাবী ছিল। এই বিবৃতিগুলি করা হয়ছিল, ইউরোপ জুড়ে উন্মাদাশ্রমের অবস্থার তীব্র নিন্দা করার পর পরই। ১৮৫৬ সালের ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায়, ডঃ জন ম্যাকফর্সন তাঁর প্রবন্ধ শুরু করেছিলেন এই স্বীকারোক্তি দিয়ে যে আগে ইংল্যান্ডে ডাক্তারেরা উন্মাদদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছিলেন (MacPherson, ১৮৫৬)। তিনি ইংল্যান্ডের ইয়র্ক উন্মাদাশ্রমের খারাপ অবস্থার কথা উদাহরণস্বূপ তুলে ধরেছিলেন, যেটিকে ২০ বছর ধরে সংস্কার করার পরই সেটি উন্মাদদের দ্বারা বাসযোগ্য হয়েছিল (MacPherson, ১৮৫৬)। ইংল্যান্ডের উন্মাদাশ্রমগুলির শোচনীয় অবস্থার কথা বিবৃত করে ম্যাকফার্সন তারপরে প্রশংসা করেছিলেন ভারতীয় উন্মাদাশ্রমগুলির সঠিক পরিচালনার। দুর্ভাগ্যবশত ম্যাকফার্সনের দাবীতে একাধিক স্ববিরোধীতা ছিল। প্রথমত, ম্যাকফার্সন লিখেছিলেন, “আমরা অনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনাগত সমস্যার একটি অভিযোগও করতে পারছি না, উন্মাদদের প্রতি কোনো হৃদয়-বিদারক নিষ্ঠুরতার রেকর্ড নেই, অথবা এমন কোনো অত্যাচারের অভিযোগ করতে পারছি না , যার কারণে ইংল্যান্ডে গভীর ক্রোধের জন্ম হয়েছিল” (MacPherson, ১৮৫৬) । ম্যাকফার্সনের দাবী

*দালুন্ডা উন্মাদাশ্রমে আটকে রাখা হয়েছিল ৯ই অক্টোবর ১৮৬১ থেকে, তার রোগের বর্ণনায় লেখা ছিল গাঁজা সেবন। তাকে নিরাময় হয়েছে বলে শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল ১৯শে মে ১৮৬২ । দ্বিতীয় রোগী ছিলেন গোপাল বুস্তোমি, আরেকজন পুরুষ রোগী যাঁকে গাঁজা সেবনের জন্য আটকে রাখা হয়েছিল ৩০শে জুলাই ১৮৬১ থেকে ২৬শে মে ১৮৬২ ।*

125 অ্যানুয়াল রিপোর্ট অন দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার - ১৮৭০,জে. ক্যাম্পবেল ব্রাউন, ইন্সপেক্টর – জেনারেল অফ হসপিটাল ,ইন্ডিয়া মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট, ক্যালকাটা।

কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না; কারণ তিনি তারপরই ভারতে উন্মাদাশ্রমের বিষয়ে গভীরে ডুব দেন, আর ঠিক তখনই তিনি নিজেই নিজের সঠিক পরিচালনার দাবীগুলিকে নস্যাৎ করেছেন। ম্যাকফার্সন বলেছেন তিনি সঠিক জানেন না কতগুলি উন্মাদাশ্রম বাংলায় আছে, তিনি মনে করেন সেখানে সাত থেকে আটটি কেবলমাত্র নেটিভদের জন্য উন্মাদাশ্রম থাকতে পারে (MacPherson,১৮৫৬)। যদি উন্মাদাশ্রমের পরিচালনা সঠিকভাবেই হয়ে থাকবে, তাহলে ম্যাকফার্সনের অবশ্যই সঠিক সংখ্যাটি জানা উচিত ছিল। তাঁর সমগ্র লেখা ধরে তিনি বারবার পুনরাবৃত্তি করেছেন যে রোগীদের আটকে রাখা হয়েছিল তাদের নিজস্ব সুরক্ষার জন্য এবং যাতে তারা আরও ভালো জীবন কাটাতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত ম্যাকফার্সন এটিও বলেছেন যে উন্মাদাশ্রমগুলিতে ৭৫০ জন রোগী থাকতে পারে, কিন্তু সেগুলিতে অতিরিক্ত সংখ্যায় রোগী রাখা হয়েছিল ১০৪১ জনকে স্থান দিতে গিয়ে। ম্যাকফার্সন স্বীকার করেছেন যে এই অবস্থা গ্রহণযোগ্য নয় এবং রোগীদের জন্য আদর্শ পরিস্থিতিও নয়। এই ক্ষেত্রে ম্যাকফার্সন প্রদর্শন করেছেন যে ভারতীয় উন্মাদাশ্রমের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ কর্মকুশলতার দাবী সবসময় বাস্তবে পরিণত হতো না। বাংলার উন্মাদাশ্রমের সুপারিন্টেন্ডেন্টদের জন্য অতিরিক্ত ভিড় একটি বড় সমস্যা ছিল। ১৮৬২ এবং ১৮৭০ সালের বার্ষিক উন্মাদাশ্রমের রিপোর্টে এই অতিরিক্ত ভিড়ের কথা বলা হয়েছিল (McClelland and Payne, ১৮৬৩; Campbell ১৮৭০)।

সমসাময়িক সরকারি চিঠিপত্র বা রিপোর্ট পড়লে মনে হবে সাহেবরা এদেশে পাগল হতো দুটি কারণে। এক এদেশের গ্রীষ্মমন্ডলীয় আবহাওয়া সাহেবদের সহ্য হতো না। শীতের দেশের শ্বেতকায় মানুষ এ - দেশের মে- জুনের উষ্ণ আবহাওয়ায় শারীরিক ভাবে অসুস্থ হয়ে যেত এবং এই শারীরিক অসুস্থতা ক্রমশ মানসিক অবস্থার উপর প্রভাব ফেলে । পদস্থ সাহেবরা গ্রীষ্মকালে সিমলা কিংবা দার্জিলিং - এ পালিয়ে বাঁচতেন । কিন্তু অধঃস্তন ছাপোষা কেরানি সাহেবরা এতটা শৌখিন আহাদ দেখাতে পারতেন না । গ্রীষ্মের তাপে পুড়ে তারা দেহে অবসন্ন আর মনে। ভারসামাহীন হয়ে পড়ত । দুই , নেটিভদের বিজাতীয় সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে সাহেবদের মানসিক স্বাস্থ্য ভয়ানক ব্যাহত হতো। বিলেতে থাকতে তাদের চিত্ত বিনোদনের জন্য একটি বিশুদ্ধ সাংস্কৃতিক জগৎ ছিল। এদেশে এসে , বিরুদ্ধ সংস্কৃতির বাধ্যতামূলক সংস্পর্শে , তাদের মানসিক বিপর্যয় ঘটে। দীর্ঘকালীন সাংস্কৃতিক বোধের অতৃপ্তিতে তারা পাগল হয়ে যেত। এগুলি সাহেবদের পাগল হবার সরকারি ধারণা । নেটিভদের পাগল হবার কারণ হিসেবে প্রতিবেদন বলছে অন্যকথা নেটিভরা গাঁজা খেত , মদ্যপান

করত , আফিম সেবন করত মাত্রাছাড়া । দীর্ঘদিন গাঁজা , মদ আর আফিম সেবনে নেটিভরা পাগল হয়ে যেত [126] ।

এগুলি সরকারি অভিমত । আসলে , এর দ্বারা সরকার আমাদের দুটি দরকারি কথা বোঝাতে চেয়েছে। এক, দেশের আবহাওয়া সাহেবদের মতো ভদ্রলোকের উপযোগী । নয় । নেটিভরাই এই চরম উষ্ণ আবহাওয়ায় কায়ক্লেশে থাকতে পারে । দুই , বঙ্গদেশের সংস্কৃতি ভদ্রজনের নয়। এই সংস্কৃতিতে কুসংস্কারই বেশি । বঙ্গবাসীরা গঙ্গাসাগরে সন্তান । বিসর্জন দেয় , বিধবাদের পুড়িয়ে মারে , অল্পবয়সী ছেলে - মেয়েদের তড়িঘড়ি বিয়েসাদি দেয় । এইসব ইুরতা আর পাগলামীর মধ্যে দিন গুজরান করতে করতে সাহেব কর্মচারিরা পাগল হয়ে যেত । অর্থাৎ প্রাচ্যদেশীয় স্বৈরাচার ও বর্বরতার যে প্রিয় তত্ত্বটি সাহেবদের খুব মনপসন্দ ছিল এবং যেটি প্রচার করতে সাহেব প্রশাসন এমনকি সাহেব ঐতিহাসিকেরাও বেশ আহ্লাদ বোধ করতেন , পাগল এবং পাগলাগারদ সম্পর্কিত । রিপোর্টেও দেখা যাচ্ছে , সেটি বেশ জোরদার।

কিন্তু সরকারি রিপোর্টে যা উচ্চারিত হয়েছে আর যা নিরুচ্চারিত থেকে গেছে , তাতে যুগপৎ অভিনিবেশ করলে , পাগল হবার কারণ হিসেবে এই সাহেবি সিদ্ধান্তটি যে অত্যন্ত কাচা , সে কথা বোঝা যায়। ১৮১৮ সাল থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত বাংলার পাগল এবং পাগলাগারদ সম্পর্কিত বাৎসরিক রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, যারা প্রতি বছর পাগলাগারদে ভর্তি হচ্ছে , তারা অধিকাংশই সেনাবাহিনী কিংবা নৌবাহিনীর লোক। এখন প্রশ্ন হলো : নৌ বাহিনীতে সাহেবরা পাগল হচ্ছে কেন ? পাগল হতো মূলত সেনাবাহিনীর অমানবিক শৃঙ্খলায় , অমানুষিক শাস্তিদানে। ভারতে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য অটুট রাখতে , জাতি ও বর্ণ - শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব অক্ষুন্ন রাখতে এবং নেটিভদের আপাত শান্তিকল্যাণে শাসন করতে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে কঠিন কঠোর শৃঙ্খলা আরোপ করা হতো [১২৭] । সেনাজীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল প্যারেড । দুপুরের খাবারের জন্য প্যারেড , ডাক্তার দেখাতে যাবে , প্যারেড ; রেশন তুলতে প্যারেড , স্টোর - এ যেতে প্যারেড ; গালোবারুদ আনতে

---

126 রিপোর্ট অন দ্যা লুনাটিক অ্যাসাইলাম অফ বেঙ্গল ফর দ্যা ইয়ার – ১৮৯০, এ.হিলসন, প্রসেডিং অফ দ্যা গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল, মিউনিসিপল ডিপার্টমেন্ট, জুন ১৮৯১, পৃ– ১৮৯-২০১, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট আর্চিভস।

127 ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক চিকিৎসা সম্পর্কিত মূল্যবান গবেষণা , বিশ্বময় পতি ও মার্ক হারিসন সম্পাদিত , *Introduction: Health, Medicine and Empire: Perspectives on Colonial India, in Health, Medicine and Empire: Perspectives on Colonial India, ed. Pati and Harrison (New Delhi: Orient Longman, 2001), particularly , Margaret Jones, "British Colonial Health Policy 1900-1940: Ceylon and the Asian Colonies", Bistrol university ইত্যাদি* /

প্যারেড ; রবিবারের চার্চে যেতে প্যারেড। বছরে তিনশ ' পঁয়ষট্টি দিন প্যারেড । বাকি সময় , যখন যুদ্ধবিগ্রহ নেই , বিছানায় । মিলিটারি ব্যারাকের সৈনিকের মাথাপিছু বরাদ্দ একশো ঘনফুটের বাসস্থানে জীবনের নব্বই ভাগই কেটে যেত[128] ।

এই নিরানন্দ গতানুগতিকতায় যেদিন সাগরপারের চিঠি আসত , সেদিন উৎসবের আনন্দ । মিলিটারি করপোরাল হাতে চিঠির বান্ডিল নিয়ে হাঁক দিতেন : ' Come on , Mails up , boys ! ' তিনি রোল - কলের ভঙ্গিতে ডাকতেন : ' Davies , Smith , Jones , Brown ! যে যুবক সেনার ডাক পড়ত না , সহযোদ্ধা বন্ধুরা উৎসাহ দিতেন : Cheer up ! better luck ! next time . কিন্তু ওদের cheer up করা সহজ কাজ ছিল না । ব্যারাকে পেটভরে খাবারই জুটত না । অনেককেই পেট ভরাতে বাইরে থেকে খাবার কিনতে হতো। বেতনের অনেকটাই বেরিয়ে যেত তাতে । ব্যারাকে ব্যারাকে আসত উনুন আর কড়াই নিয়ে ডিমওয়ালা , অমলেট বিক্রি করত । আসত দুধওয়ালা দুধ আর মাখন নিয়ে । হ্যামওয়ালা বিরাট হ্যামের রোল নিয়ে। আর আসত মিঠাইওয়ালা , ডাক দিত : Jimmy Kelly , good for belly Take and try , before you buy , Sweetie ! Sweetie. নিরানন্দ. উপবাসী শরীরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সৈনিক জীবনে যৌন বুভুক্ষা। দীর্ঘকাল পত্নীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে তাদের মানসিক চাঞ্চল্য ও যৌন লালসা বৃদ্ধি পেত । Edward Brown তার স্মৃতিকথায় বলেছে , the remoteness of women was perhaps the most frustrating aspect of a soldier' s life in India . Brown ব্যারাকের ব্যান্ডমাস্টারের স্ত্রী ছাড়ান বছরে কোনো মহিলার মুখদর্শন করেনি। E S Humphries বলেছে , তার কুচিন্তা দূর করতে চার্চের ফাদার তাকে নিরন্তর যিশুর ধ্যান করতে বলতেন [129] ।

কিন্তু ধর্ম কিংবা বিজ্ঞান কোন কিছুই ব্রিটিশ সেনাদের সামাল দিতে পারেনি । অনেক সেনাই গোপনে পতিতালয়ে যেত । ব্যারাকে টাউট আসত লুকিয়ে , রাতে মেয়ে সাপ্লাই করত । ফলে সৈনিকদের মধ্যে যৌনব্যাধি ছিল আকছার । ব্রহ্মযুদ্ধ কিংবা মারাঠা যুদ্ধে আহত যেসব সেনা কলকাতার আর্মি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল , রিপার্টে বলছে , তাদের অধিকাংশই ছিল " সিফিলিটিক পেশেন্ট । এই দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগে , মানসিক যন্ত্রণায় ও গ্লানিতে অনেকে আত্মহত্যা করত , অনেকে পাগল হয়ে যেত [130] ।

---

[128] ম্যাড টেলস ফ্রম দ্য রাজ, চার্লস অ্যালেন (এডিট), লন্ডন ১৯৮৮, পৃ- ১৮৪ – ৮৫।

[129] প্রাগুক্ত গ্রন্থ , পৃ – ১৮৬।

[130] প্রাগুক্ত গ্রন্থ , পৃ - ১৯১।

নৌবাহিনীর নাবিক কিংবা নৌসেনাদের গল্প আরো চিত্তাকর্ষক । বন্দরে জাহাজ ভিড়লে ব্রিটিশ নৌসেনাদের গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখা হতো। কারণ । এদেরও দারিদ্র্য , মালিন্য আর ক্লেশকর ক্লান্তিকরতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল লাগামছাড়া। বন্দরের পতিতালয়ে নৌসেনাদের হুল্লোড় রীতিমতো ভীতিজনক। ধরা পড়লে , মানসিক ভারসাম্যহীন এই বদনামে তাদের পাগলাগারদে ভরা হতো। এ ব্যাপারেও ঔপনিবেশিক সরকারের বর্ণবিশেষত্ব ও জাতিগর্ব পুরোমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। বলা হতো , সাহেব - সেনা মানসিক সুস্থ থাকলে নেটিভ - ললনাকে শয্যাসঙ্গিনী । করতে পারত না , রুচিতে বাধতো। নিতান্ত মানসিক ভারসাম্যহীন বলেই এমনটি করে ফেলেছে।

সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলাভঙ্গের শাস্তি ছিল মাত্রাতিরিক্ত কঠোর ও অমানুষিক। ছোটখাটো শৃঙ্খলাভঙ্গের শাস্তি ছিল লাগাতার ড্রিল কিংবা ছুটি ছাঁটাই। আর বড় রকমের শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্যে হতো কোর্ট মার্শাল । অপরাধী সাব্যস্ত হলে হাতে পড়ত হাতকড়া , দিনকতক হাজতবাস, বেত্রাঘাত , অবশেষে গুলি করে হত্যা। বড়রকমের শৃঙ্খলাভঙ্গ মানে রাজদ্রোহ কিংবা বিদ্রোহ - বিক্ষোভ নয় । সেনাবাহিনীর শীর্ষস্থানে আসীন আর্মি অফিসারের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তেমন তেমন খুব মোঃলায়েম কিংবা হাত কচলাতে না পারলেই রাজরোষে পড়তে হতো । এই রাজরোষ এড়াতে অনেকেই ব্যারাক ছেড়ে পালাত [131]। এমনিতেই সেনাবাহিনীর সাহেবরা, বিলেত ছেড়ে , আত্মীয় - স্বজন - বন্ধু ত্যাগ করে , বিদেশ - বিভূই - এ এসেছিল স্রেফ রুটির ধান্দায় । রুটিও জুটত না তেমন করে ; উপরন্তু চোখের সামনে বেত্রাঘাত বা অভিযুক্ত সেনাকে অন্য সেনা দিয়ে গুলি করে হত্যা , অনেক নিম্নবিত্ত ছাপোষা ঘরের সেনারই মানসিক ভারসাম্য বিপর্যস্ত করে দিত । শেষপর্যন্ত এরা অনেকেই পাগল হয়ে যেত [132] ।

## উন্মাদ আশ্রমের বিনোদন ও খেলাধুলা

---

131 দ্যা ইউরোপিয়ান ইনসেন ইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, ১৮০০-১৮৫৮; এ কেস স্টাডি ইন সাইকিয়াট্রি অ্যান্ড কলোনিয়াল রুল ” ওয়াল্ট্রাউড আর্নস্ট ইন ইম্পেরিয়াল মেডিসিন অ্যান্ড ইন্ডিজেনাস সোসাইটিস, ডেভিড আর্নল্ড (এডিট), অক্সফোর্ড। ১৯৮৯, পৃ-২৯

132 সামন্ত,অরবিন্দ, *রোগ রোগী রাষ্ট্র ; উনিশ শতকের বাংলা,* প্রগ্রেসিভ প্রকাশনী , কলাকাতা , ২০০৪ পৃষ্ঠা – ৪৭

পাগলের পাগলামিসারানোর প্রচলিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ছাড়াও তাদের বিনোদনের জন্য খেলাধুলা, পড়াশুনার ব্যবস্থা ছিল পাগলাগারদে। কোনো পাগলের জন্য বিনোদন সামগ্রির প্রাচুর্য কিংবা অপ্রতুলতা তার প্রাক্ উন্মাদ জীবনের সামাজিক অবস্থান অনুসারে নির্ধারিত হতো। বিনোদন ব্যবস্থা এদেশীয় ও বিদেশীয়, দু রকমই ছিল। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে , প্রথম শ্রেণীর পাগলরা যখন সময় কাটাত নানা পত্র-পত্রিকা পড়ে , সাহেবি ইনডর গেমস খেলে, সাধারণ ওয়ার্ডের সাধারণ পাগলরা তখন দুপুর কাটাত বারান্দায় বসে গল্পগুজব করে। পাগলাগারদের লাইব্রেরি রুম শুধু মাত্র প্রথম শ্রেণীর পাগলদের জন্যই খোলা থাকত। বাংলার ইউরোপীয় পাগলরা পড়ত Punch কিংবা illustrated News, খেলত তাস অথবা দাবা। আর দেশি পাগলরা সময় কাটাত অসল গল্পগাথায় , কুকুর , বিড়াল , ছাগল , বাদর কিংবা পাখি পুষে। স্বেচ্ছামূলক শ্রম কলকাতার পাগলাগারদে ছিল। কারণ সুপারের মনে হয়েছিল , বাংলার ট্রপিক্যাল আবহাওয়া সাহেব পাগলদের স্বাস্থ্যহানি ঘটাবে [133] ।

## লুনাটিক লেবার

হাসপাতালে উন্মাদ রোগীদের কাজ করতে বাধ্য করা হতো, কিন্তু তাদের কাজগুলোকে বলা হতো ঐচ্ছিক! এই প্রকারের শ্রমকে বলা হতো "অপ্রকৃতিস্থদের শ্রম" বা "লুনাটিক লেবার" যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল বাগান করা, ক্যাস্টর তেল উৎপাদন, সরষের তেল উৎপাদন, সুরকি উৎপাদন, চটের থলে বোনা, নারকেলের ছিবড়ে উৎপাদন, গম মাড়াই, রাস্তা নির্মাণ, নির্মাণ সামগ্রী তৈরি ইত্যাদি উৎপাদনশীল ব্যবসায় শ্রম দেওয়া যার মাধ্যমে মানসিক হাসপাতালের জন্য প্রচুর লাভ হতো।

## মৃত্যুহার

১৮৫৬ সাল থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত এই পনেরো বছরে পাগলাগারদে পাগলের মৃত্যুহার সবচেয়ে বেশি ছিল ১৮৬০ সালে, মোট ২৯৫ জন। মৃত্যুহার বেশি ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীর ইউরোপীয় পাগলদের মধ্যে। কলকাতার পাগলাগারদে প্রথম শ্রেণীর পাগলদের মধ্যে মৃত্যুহারের গড় ছিল, ৪.১ শতাংশ। আর ঐ সময়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর ৭.৭ শতাংশ। অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর পাগলদের মৃত্যুহার প্রথম

---

[133] নেটিভ লুনাটিক অ্যাসাইলাম ইন আর্লি নাইনটিনথ সেঞ্চুরি ব্রিটিশ ইন্ডিয়া , ডাবলু. আর্নস্ট ইন জি.যে মিউলেনবেল্ড অ্যান্ড ডি উজাস্টেক ( eds ), স্টাডিস ইন ইন্ডিয়া মেডিকেল হিস্টোরি, ক্রনিনগিউ, ১৯৮৭।

শ্রেণীর প্রায় দ্বিগুণ। রিপোর্ট থেকে মোটামুটি ধারণা হয়, দ্বিতীয় শ্রেণীর পাগলদের মৃত্যুহার বৃদ্ধির কারণ হলো খাদ্যাভাব, অপুষ্টি ও রোগভোগ[134]।

**১৮৫৬-১৮৭০ খ্রীঃ বাংলার উন্মাদ আশ্রমের রোগীদের মৃত্যুর হার[135]**

| Deaths per cent. | Deaths per cent. |
|---|---|
| 1856………………………………. 18.49 | 1864………………………………. 13.0 |
| 1857………………………………. 17.86 | 1865………………………………. 15.0 |
| 1858………………………………. 15.29 | 1866……………………………. 18.0 |
| 1859………………………………. 17.44 | 1867………………………………. 13.0 |
| 1860………………………………. 19.15 | 1868……..……………………… 10.81 |
| 1861………………………………. 16.53 | 1869………………………………. 10.3 |
| 1862………………………………. 18.68 | 1870…..…………………………. 8.2 |
| 1863………………………………. 12.5 | |

## উন্মাদ আশ্রমের খাদ্য বৈচিত্র্য

খাদ্যের ব্যাপারেও পাগলদের মধ্যে শ্রেণী বৈষম্য ছিল। আর এই বৈষম্য ব্যবস্থা নির্ধারিত হয়েছিল একসরকারি ডাক্তারের পরামর্শক্রমে। পাগলদের দুটি শ্রেণীতে ভাগ করে এবং সেইমত দুটি খাদ্যতালিকা প্রস্তুত করা হয়েছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ঔপনিবেশিক সরকারের বৈষম্যমূলক প্রশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনে সরকারি ডাক্তারদেরও অন্যতম ভূমিকা ছিল। ডাক্তার কনোলীর সুপারিশক্রমে প্রথম শ্রেণীর পাগলদের ব্রেকফাস্টে ছিল ডিম, মাছ কিংবা মাংস, ভাত, ফলমূল, আচার, চা কিংবা কফি। মধ্যাহ্ন আহারে থাকতো সুপ, মাংসের টুকরো, সবজি, প্যাষ্ট্রি, ফল, চাটনি, শেরী কিংবা বীয়ার, কিংবা লেবু বা বেলের সরবত। এছাড়া সকাল - সন্ধে চা আর টোস্ট দেওয়া হতো[১৩৬]। দ্বিতীয় শ্রেণীর পাগলদের খাদ্যতালিকা তৈরি হয়েছিল Code of Bengal Medical Regulation - এর শর্ত মেনে। এতে পাগলদের খাদ্যতালিকায় ছটাকের হিসেব ছিল। নিখুঁত তালিকায় উত্তম আহারের প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু সরকারি তালিকাই সত্যি সত্যিই তা জুটত না দ্বিতীয় শ্রেণীর পাগলদের। সরকারি ব্যবস্থাপনায় পাগলদের দরকারি খাদ্য তালিকায় ছিল মটন বা বীফ ১ পাউন্ড, রুটি ১ পাউন্ড, মাখন ১ আউন্স, পেঁয়াজ ১ আউন্স, লবণ আধ আউন্স, সবজি ১ পাউন্ড। তাছাড়া, ফলমূল, সরবত, বালি এবং টোস্ট প্রয়োজন মত। এটি একজন পূর্ণবয়স্ক

---

[134] অ্যাসাইলাম রিপোর্ট, ১৪ জুন ১৮৫৬, বেঙ্গল পাবলিক প্রসেডিং, ২৪ জুন, ১৮৫৬, ৫২।

[135] অ্যানুয়াল রিপোর্ট অন দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার - ১৮৭০,জে. ক্যাম্পবেল ব্রাউন, ইন্সপেক্টর – জেনারেল অফ হসপিটাল ,বেঙ্গল মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট, ক্যালকাটা।

[136] সামন্ত,অরবিন্দ, রোগ রোগী রাষ্ট্র ; উনিশ শতকের বাংলা প্রগ্রেসিভ প্রকাশনী , কলাকাতা , ২০০৪ পৃষ্ঠা –৫০

পাগলের দৈনিক বরাদ্দ হওয়া উচিত বলে ডাক্তারি নির্দেশনাদেওয়া হয়। কিন্তু ডাক্তারের ডাক্তারি বিবেকের সঙ্গে উপনিবেশিক সরকারের বাণিজ্যবুদ্ধির দুস্তর ব্যবধান-ছিল । তাই অভুক্ত আধ -পেটা কিছু নাছোড়বান্দা দ্বিতীয় শ্রেণীর পাগলের জন্য Extra dish এর ব্যবস্থা রাখা হতো , আর তার জন্য পাগলকে অতিরিক্ত পয়সাও গুনতে হতো[137] ।

## উন্মাদ আশ্রমের অন্দরে ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন কার্যকলাপ

১৮০০ থেকে ১৯২৪ খ্রীঃ দীর্ঘ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বলা যায় উন্মাদ আশ্রমে চিকিৎসক ছাড়া যে সমস্ত কর্মীরা আশ্রমের ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন কার্য পরিচালক হিসাবে থাকতেন তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন সুপারিনটেনডেন্ট, কখনো কখনো দেখা যায় আশ্রমের কাজের চাপ অধিক হলে ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট নিয়োগ করা হতো। রোগীদের দেখাশুনা ও ওয়ার্ড গুলির দেখভালের জন্য থাকতেন পর্যবেক্ষক[138] । মহিলা উন্মাদ রোগীদের দেখা শোনার জন্য মেট্রন সুপারভাইজার, আশ্রমের হিসাব-নিকাশ ও দৈনিক অফিশিয়াল কাজ লিপিবদ্ধ করার জন্য থাকতেন ক্লার্ক ও সিভিল হসপিটাল অ্যাসিস্ট্যান্ট। চিকিৎসক কে সহযোগিতা করার জন্য থাকত কম্পাউনডার, বিবিধ কাজ পরিচালনা করতেন জমাদার তিনি ছিলেন শ্রমিক দের সর্দার, কারাগার রক্ষনাবেক্ষন করার জন্য একজন পুরুষ ও একজন মহিলা কিপার নিয়োজিত ছিল । রোগীদের প্রতিদিনের খাবার তৈরি করার জন্য একজন প্রধান রন্ধক ও সহকারী রন্ধক নিযুক্ত ছিল , খাবার পরিবেশনের জন্য একজন খিত্মৎগার বা পরিবেশক ও অন্যান্য কাজ দৈনিক জিনিসপত্র একস্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য একজন কুলী , রোগীদের পোশাক পরিচ্ছদ পরিষ্কার করার জন্য একজন ধোপা, চুল দাড়ি কর্তনের জন্য একজন নাপিত । রোগী দের প্রতিদিন দুগ্ধ পরিবেশন করতো গোয়ালা । নিত্য দিনের জল আনার জন্য থাকত একজন ভিস্তিওয়ালা , হাসপাতাল পরিস্কার পরিচ্ছন্নের জন্য ঝাড়ুদার এবং

---

137 রিপোর্ট অফ দ্য এসাইলাম ফর দ্যা ইউরোপীয়ান এন্ড নেটিভ ইনসেন পেসেন্টস, অ্যাট ভবানিপুর এন্ড দুলান্দা ফর ১৮৫৬ এন্ড ১৮৫৭ , ক্যালকাটা, ১৮৫৮। পৃ - ১১-১২।

138 দ্যা ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলামস অ্যাক্ট, ১৮৫৮। অ্যাক্ট xxxvi অফ ১৮৫৮-চ্যাপ্টার XI পাশ অন দ্যা ১৪ ই অফ সেপ্টেম্বার, ১৮৫৮, অ্যান অ্যাক্ট রিলেটিং টু লুনাটিক অ্যাসাইলাম

পাহারাদার হিসাবে দারোয়ান নিয়োজিত থাকত। আশ্রমের অভ্যন্তরে বাগান পরিচর্যার মালী নিযুক্ত ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে এটি পরিষ্কারভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, ইউরোপীয় বা ভারতীয়, যাদের জন্যই উন্মাদাশ্রম হোক না কেন , সেটির তত্ত্বাবধানের ভার থাকতে হতো একজন ইউরোপীয় সার্জেন অথবা অ্যাসিস্টেন্ট সার্জেনের হাতে। কিন্তু ইউরোপীয় উন্মাদাশ্রমের সুপারিন্টেন্ডেন্টগণ তাদের কর্ম সময়ের অধিকাংশ উন্মাদাশ্রমে অতিবাহিত করতেন না। সত্যি বলতে কি, কয়েকজন আগ্রহী ও নিবেদিত ডাক্তার ছাড়া, বাকিরা সময় দিতে পারতেন না, কারণ তাদের অন্যান্য সরকারী দায়িত্ব থাকত এবং কিছু সময়ে তাদের একটি বড়সড় ব্যক্তিগত প্র্যাক্টিসও থাকত। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত , যখন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নিয়োগ করা হয়েছিল পূর্ণ সময়ের উন্মাদাশ্রম সুপারিন্টেন্ডেন্ট হিসাবে, তাদের মধ্যে প্রায় সবাই কোন না কোন উন্মাদাশ্রমই সিভিল সার্জেনের জন্য অতিরিক্ত চার্জছিল। এর দ্বারা এটি ব্যাখ্যা করা যায় যে, তাদের ভূমিকা আসলে আনুষ্ঠানিক ছিল এবং তারা ছিল ঔপনিবেশিক শক্তির প্রতিভূ। আসলে উন্মাদাশ্রমের দৈনন্দিন পরিচালনা এবং সুপারন্টেন্ডেন্টের বিধি কার্যকরীকরণ সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত ছিল ভারতীয় সাব-অ্যাসিস্টেন্টদের উপর। কিন্তু কীভাবে এই অধিকর্তারা সেখানে থাকা রোগীদের সাথে ব্যবহার করতেন এবং কী প্রকার চিকিৎসা ও পরিচর্যা তাদের দেওয়া হত তা প্রায় অধিকাংশ সময়েই উন্মাদাশ্রম সংক্রান্ত রিপোর্টে থাকতো না, কিন্তু সেই ভারতীয় সাব-অ্যাসিস্ট্যান্টদের অজ্ঞতা ও অনির্ভরযোগ্যতা কিন্তু লিপিবদ্ধ ছিল [139]।

যদিও সুপারিন্টেন্ডেন্টের ভূমিকা ছিল মূলত ঔপনিবেশিক ক্ষমতার পরিকাঠামো রক্ষা করা, তারাই কিন্তু তাদের অধীনে থাকা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের প্রধান কর্তা ছিল। তারা নির্ধারণ করত কতটা আরাম ও পরিচর্যা সেই উন্মাদাশ্রমের রোগীরা পাবে, যদিও সেই উপাদানের কিছুটা অংশ পুনরায় বিক্রয় করে ভারতীয় কর্মীরা অতিরিক্ত আয় করত। গুরুত্বপূর্ণভাবে, ইউরোপীয় সুপারিন্টেন্ডেন্টের দায়িত্ব ছিল বিভিন্ন শ্রেণীর আটক রোগীদের জন্য খাদ্যতালিকা তৈরি করা, তাই তাদের হাতে এই ক্ষমতা ছিল যে তারা নির্ধারণ করতে পারত কোনো আটক রোগী বাঁচবে না মরবে,

---

139 ওয়াল্ট্রাউড আর্নস্ট, মেডিকেল/ কলোনিয়াল পাওয়ার - লুনাটিক অ্যাসাইলামস ইন বেঙ্গল, সি. ১৮০০-১৯০০, জার্নাল অফ এশিয়ান হিস্ট্রি, ভলিউম-৪০, নং ১ (২০০৬), পৃ. ৫৪

যা খুবই পরিষ্কার ছিল পরিবর্তনশীল মৃত্যু হার থেকে যা নির্ভর করত খাদ্যতালিকা পরিবর্তনের উপর[140]।

উন্মাদাশ্রমের নতুন সুপারিন্টেন্ডেন্ট হয়ে, সিভিল সার্জেন Mc.clelland এর ১৮৬২ সালের প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ১৮৬০-এর দশকে গড় মৃত্যুর হার ছিল ১৯.১৫ শতাংশ। এই মৃত্যুগুলি শারীরিক অসুখের জন্য ঘটেছে, যাতে শুধুমাত্র যে উন্মাদাশ্রমে আটক রোগীরা আক্রান্ত হয় তাই নয়, ভারতে যে কোনো সরকারী প্রতিষ্ঠানে থাকা রোগীরাও আক্রান্ত হতে পারে, বিশেষত ডিসেন্ট্রি (আমাশা) ও ডায়রিয়া (উদরাময়) [141]। কিন্তু তিনি এটিও দেখেছিলেন যে মৃত্যুর হারটি খুব বেশি বর্ধিত হয়, আগের বছরগুলির তুলনায়। সেই উন্মাদাশ্রমের খাদ্য হিসাবে যা বরাদ্দ ছিল (৮% হিসাবে আটার বরাদ্দ), সেটি কমিয়ে আগের বরাদ্দের অর্ধেক করা হয়, যেমন ১৮৪৪ সালে সার্জেন এই খাদ্যে প্রবল কাটছাঁট করেছিলেন, তিনি মনে করেছিলেন সেটি যথেষ্ট ছিল[142], এবং তিনি এই বরাদ্দ কমানোটি পাঁচবছর চালিয়ে গিয়েছিলেন। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়েছিল যে উন্মাদাশ্রমের বেশি মৃত্যুর হার অন্য কারণে বেশি হয়েছিল, কারণ খাদ্যের তফাত ছিল এটি ঢাকা, দুলান্দা ও পাটনা উন্মাদাশ্রমের রোগীরা সেই কারণে অসুখে বেশি কাবু হয়েছিল এবং সেই অসুখের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে পারেনি[143]। এটি বলাই বাহুল্য যে নতুন সুপারিন্টেন্ডেন্ট যখন খাদ্য তালিকাকে অন্য উন্মাদাশ্রমের সাথে একই লাইনে এনে ফেলেছিলেন, তখন সেখানে থাকা রোগীদের মধ্যে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছিলে যার ফলে মৃত্যুর সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য হ্রাস হয়েছিল[144]। কিন্তু এই সব জানা সত্ত্বেও মেডিকেল বোর্ড বিভিন্ন নেটিভ উন্মাদাশ্রমে ন্যূনতম খাদ্য বস্তুর পরিমাণ বাধ্যতামূলক করেনি।

যদিও ভবানিপুর ইউরোপীয় উন্মাদাশ্রমে থাকা রোগীদের খাদ্য ততটা কমানো হয়নি, যতটা বাংলার নেটিভ উন্মাদাশ্রমে থাকা রোগীদের করা হয়েছিল, তবুও তাদের ক্ষেত্রেও সুপারিন্টেন্ডেন্টের পরিচালনার প্রকারের উপর অনেকটাই নির্ভর করতে হতো। উদাহরণস্বরূপ ১৮৫৬ সালে যখন সার্জেন থিওডোর. ক্যান্টর, ইউরোপীয় উন্মাদাশ্রমের সুপারিন্টেন্ডেন্ট হন, তার সবচেয়ে প্রথম সুপারিশ

---

140 মিলস, এইচ জেমস, ম্যাডনেস, ক্যানাবিস অ্যান্ড কলোনিয়ালিসম, দ্যা নেটিভ-অনলি , লুনাটিক অ্যাসাইলাম অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া ১৮৫৭-১৯০০, ম্যাকমিলান প্রেস, লন্ডন, পৃ – ১০৫

141 অ্যানুয়াল রিপোর্ট অ্যান্ড রিটার্ন অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৬২, জে ম্যাক.ক্লেল্ড, অফিসিয়াটিং প্রিন্সিপাল ইন্সপেক্টর জেনারেল, মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট।

142 Ibid – pp-56

143 Ibid – pp-57

144 তদেব - পৃ -৫৮

ছিল, ব্যয় সংকোচন করতে দ্বিতীয় শ্রেণীর রোগীদের খাদ্য বস্তু হ্রাস করা একই সময়ে তিনি খাদ্য তালিকা সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, প্রথম শ্রেণীর ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহোদয়া-দের জন্য নিখুঁত ছিল[145] ।যেহেতু উন্মাদাশ্রমে  থাকা রোগীদের দিনের অধিকাংশ সময় আবর্তিত হতো খাওয়া ও ব্যায়ামের উপর, তাই খাদ্য-বস্তুতে পরিবর্তন তাদের উপর গুরুতর প্রভাব ফেলেছিল। সুপারিন্টেন্ডেন্ট এই সত্যটি স্বীকার করেছিলেন, যখন তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, মানসিক নিরাময়ের চেয়ে অভ্যন্তশারীরিক আরামে গুরুত্ব দেওয়ার কারণে উন্মাদাশ্রমের খাদ্য তালিকাকে হাসপাতালের তুলনায় অনেকটা দামী করে তুলেছে। অনন্যা উন্মাদ আশ্রমের কর্তারা ঠিক একইভাবে রোগীদের খাদ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, খাবার কমানোকে শাস্তির উপায় হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন, এবং বলেছিন যে, তিনি মনে করেন সেটি, একটি সহজ ও অনাপত্তিকর উপায় যার দ্বারা রোগীদের মধ্যে শৃঙ্খলা আনা যাবে [146]।

উন্মাদাশ্রমের নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে, কিপার ও চাকরদেরও প্রয়োজনীয় হিসাবে দেখা হয়েছিল, এমনকি তারা “সেলগুলির থেকে কম নয়”[147] । তবুও অনেক ক্ষেত্রে উভয়ই না থাকার দরুন সমস্যার সম্মুখিন হয়েছিল। পুরানো সরকারী উন্মাদাশ্রমের সময় (১৮২১ সালের আগে), পঙ্গু ইউরোপীয় সৈনিকদের নিয়োগ করা হতো স্টিওয়ার্ড এবং কিপার হিসাবে, আর তার সাথে থাকত ভারতীয় চাকর ও ক্লিনারগণ। ইউরোপীয় কর্মীরা যা পরিচর্যার উদ্যোগ দেখিয়েছিল তা সবসময় সন্তোষজনক ছিল না, যা মেডিকাল বোর্ডের অভিযোগ থেকে প্রমাণিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ১৮২১ সালে এটি চাওয়া হয়েছিল যে, “যে ব্যক্তিরা এই পদে ছিলেন অর্থাৎ অ্যাসিস্টেন্ট স্টিওয়ার্ড ও অ্যাপোথেকারি তারা বৃদ্ধ, স্থিতিশীল এবং রোগীদের সাথে থাকার বিষয়ে রাজি ছিলেন”[148] । ১৮৩৬ সালে আরেকটি বড়সড় অভিযোগ আনা হয়েছিল। এই সময়ে ইউরোপীয় কর্মীদের প্রবল অভাবের কারণে এই শ্রেণীর (অর্থাৎ ইউরোপীয়রা) সাহায্য ব্যতীত, যে নৈতিক চিকিৎসা শুরু  হয়েছিল, তা

---

[145] থিওডোর ক্যান্টর, রিপোর্টস অন দ্যা অ্যাসাইলাম ফর ইউরোপীয়ান অ্যান্ড নেটিভ ইনসেন পেসেন্টস অ্যাট ভাবানিপুর অ্যান্ড দুলুন্দা ফর ১৮৫৬

[146] আর্নস্ট, ওয়াল্ট্রাউড; ম্যাড টেলস ফ্রম দ্য রাজ: কলোনিয়াল সাইকিয়াট্রি ইন সাউথ এশিয়া, ১৮০০-৫৮, রউটলেজ, লন্ডন, পৃ-৫৮

[147] ওয়াল্ট্রাউড আর্নস্ট, মেডিকেল/ কলোনিয়াল পাওয়ার  -  লুনাটিক অ্যাসাইলামস ইন বেঙ্গল, সি. ১৮০০-১৯০০, জার্নাল অফ এশিয়ান হিস্ট্রি, ভলিউম-৪০, নং ১ (২০০৬), পৃ. ৬৬

[148] *তদেব* -67

আর চেষ্টা করাও যায় না [149]। প্রভূত পরিমাণে ভারতীয় সুইপার, মালি, ভিস্তি, চাকর এবং সেই প্রকারের কর্মীরা থাকা সত্ত্বেও, ইউরোপীয় উন্মাদাশ্রমে গড় ৫ জন রোগী পিছু সাধারণত চার জন কর্মী ছিল: তিনজন ইউরোপীয় (একজন অ্যাপোথেকারি, দুই জন কিপার), একজন পূর্ব ভারতীয়[150]। কিন্তু অ-ইউরোপীয় অধস্তন কর্মীদের সংখ্যা ও দক্ষতা বিষয়ে অভিযোগ সারা উনবিংশ শতাব্দী ধরে ছিল, সেই অভিযোগের সংখ্যা ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে হওয়া অভিযোগের সমান ছিল। উভয় ক্ষেত্রেই মূল যুক্তি ছিল "যথেষ্ঠ সংখ্যক পুরুষ ও মহিলা কিপার, যাদের সাধারণ শ্রমিকদের মতন দৈনিক অথবা সপ্তাহ ভিত্তিকভাবে বহাল করা হবে না, তার পরিবর্তে তাদের স্থায়ীভাবে নিয়োগ করা হবে এবং তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা, যাতে তারা বিভিন্ন প্রকার মানসিক সমস্যায় ভোগা রোগীদের পরিচর্যা করতে পারে,আমাদের মতে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় চলা একটি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সেটি একটিঅবিচ্ছেদ্য অঙ্গ[151]।

যেহেতু উভয়েই, ইউরোপীয় কর্মীরা, সুপারিন্টেন্ডেট থেকে কিপার পর্যন্ত , এবং ভারতীয় কর্মীদের দিকে ঘন ঘন দুর্নীতি, অকর্মণ্যতা, অবহেলা এবং মাঝে মাঝে নিষ্ঠুরতার অভিযোগ উঠত, তাই ভারতীয়দের ঔপনিবেশিক ও চিকিৎসা শক্তিকেপ্রতিরোধ ও তাকেপরাজিত করার স্পৃহাকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দেয় ।এটি জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন যে, প্রথমত কোন যুক্তিতে আমরা আশা করব যে উপনিবেশে থাকা মানুষজন কম স্বার্থপরতা প্রদর্শন করে ইউরোপীয়দের মতো কাজ করবে, এবং দ্বিতীয়ত, কী সাক্ষ্য সেখানে আছে যা সমর্থন করবে "প্রতিরোধ ও পরাজয়" যুক্তির মধ্যে থাকা অনুমানকে যে, উপনিবেশে থাকা মানুষজন কোনো কাজ করলে তা কেবলমাত্র এই কারণে হয় যে তারা ঔপনিবেশিকতা বিরোধী ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে চিকিৎসা শক্তি কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ জানাবে অথবা তার পরাজয় ঘটাবে। স্থানীয় মানুষজনের কার্যকলাপকে ঔপনিবেশিক চিকিৎসা প্রতিরোধ হিসাবে দেখা কিছুটা হলেও অ-কর্তৃত্ব মূলক ইতিহাস যা অর্জন করতে চায় তার উল্টো কাজ করে থাকে: অর্থাৎ তারা ঔপনিবেশিক ও চিকিৎসা শক্তিকে সর্ব কর্তৃত্বময় হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে।

---

149 *তদেব* 68

150 *তদেব* -69

151 ওয়াল্ট্রাউড আর্নস্ট, মেডিকেল/ কলোনিয়াল পাওয়ার - লুনাটিক অ্যাসাইলামস ইন বেঙ্গল, সি. ১৮০০-১৯০০, জার্নাল অফ এশিয়ান হিস্ট্রি, ভলিউম-৪০, নং ১ (২০০৬), হ্যারাসোভিৎস ভারলাগ, পৃ- ৫০

আমাদের এটিও মাথায় রাখতে হবে যে, প্রাতিষ্ঠানিক রেকর্ডে শুধুমাত্র সেই ঘটনার প্রমাণ পাব যাকে দুর্নীতি অথবা প্রতিরোধের আচরণের হিসাবে চিহ্নিত করা যাবে। অনেক ক্ষেত্রেই ইউরোপীয় ও এমনকি তাদের অধঃস্তন ভারতীয় সহকর্মীদের নিষ্ঠা ও পেশাদারীত্ব সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে এবং কিছু ক্ষেত্রে তাদের নিষ্ঠা ও পেশাদারীত্বকে প্রশংসা করা হয়েছে ও তাদের আর্থিকভাবে পুরস্কৃত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ মুর্শিদাবাদ উন্মাদাশ্রমের সুপারিন্টেন্ডেন্ট তার উন্মাদাশ্রম সম্পর্কে ১৮৬৬ সালের রিপোর্টে Inspector W.A. Green মন্তব্য করেছিলেন "ইউরোপীয় ওভারসিয়ার, সার্জেন্ট ট্রলি-র ভালো আচরণ সম্পর্কে। তিনি তাঁকে বর্ণনা করেছেন একজন "স্থিতধী, প্রশান্ত, দক্ষ অফিসার, এবং তাঁর বর্তমান পদাধীকারে তিনি নেটিভদের চরিত্র সম্পর্কে তাঁর মনোবৃত্তি ও জ্ঞানের সঠিক প্রয়োগ করেছেন"[152] । এমনকি তিনি এও বলেছিলেন যে যদি মুর্শিদাবাদ উন্মাদাশ্রম বন্ধ হয়ে যায়, সে ক্ষেত্রে যেন ট্রলির জন্য যথোপোযুক্ত ব্যবস্থা করা হয় [153]। কয়েক বছর আগে সুপারিন্টেন্ডেন্ট রিপোর্ট করেছিলেন যে, নেটিভ ডাক্তার, যদিও তিনি ডাক্তারি পাস করেন নি (অর্থাৎ কোনো চিকিৎসা সার্টিফিকেট নেই) এবং একজন ভালো নেটিভ ডাক্তারের যে যে যোগ্যতা থাকা উচিত তাতে তার ঘাটতি আছে, তবুও তিনি এত দিন যে উন্মাদাশ্রমে আছেন ও উন্মাদদের পরিচর্যার ক্ষেত্রে যে তিনি অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, তিনি তাঁদের প্রতি খুবই সদয়, আর তাই তিনি খুবই উপকারী একজন ব্যক্তি"[154] । ডঃ ফ্লেমিং সুপারিশ করেছিলেন যে তার বেতন ২০ টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হয়, তার দীর্ঘ চাকরি জীবনকে , এবং উন্মাদাশ্রমে তিনি যে প্রায় বন্দী জীবন অতিবাহিত করেন তার কথা মাথায় রেখে[155]।

এছাড়াও নেটিভ কর্মীদের যোগ্যাতে সম্পর্কে ইউরোপীয় ডাক্তারদের পরস্পর-বিরোধী মতামত ছিল। উদাহরণস্বরূপ, ডঃ পেন,, কলকাতার ইউরোপীয় উন্মাদাশ্রমের সাথে সাথে দুলুন্ডার নেটিভ উন্মাদাশ্রমের দায়িত্ব সামলাতেন, আর তিনি একাধিকবার প্রদর্শন করেছেন যে তিনি বাংলার

---

[152] অ্যানুয়াল রিপোর্ট অ্যান্ড রিটার্নস অফ ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৬৬ , ইনস্পেক্টর ডবলু.অ্যা,গ্রীন, অফিসিয়াটিং প্রিন্সিপাল ইন্সপেক্টর জেনারেল, মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট।

[153] *তদেব*

[154] অ্যানুয়াল রিপোর্ট অ্যান্ড রিটার্ন অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৬২, জে ম্যাক.ক্লেল্ড, অফিসিয়াটিং প্রিন্সিপাল ইন্সপেক্টর জেনারেল, মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট।.

[155] অ্যানুয়াল রিপোর্ট অ্যান্ড রিটার্ন অফ ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৬৩, জে ম্যাক.ক্লেল্ড, ইন্সপেক্টর জেনারেল, মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট।

মেডিকাল অফিসারদের মধ্যে অন্যতম পক্ষপাতদুষ্ট ছিলেন, আর তিনি নিম্নশ্রেণীর ইউরোপীয়, ইউরোশীয় এবং ভারতীয় রোগীদের কঠিনভাবে এবং ঘৃণা ভরে দমন করতেন। ১৮৭০ সালে তার রিপোর্টে তিনি তাঁর অসন্তোষ জ্ঞাপণ করে নালিশ করেছিলেন "নেটিভ ডাক্তার শেখ বাহাদুর এর আচরণ" বিষয়ে[156]। ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ হসপিটালস কঠিন সমালোচনা করেছিলেন "অপুষ্টির চিহ্ন দেখা যায় স্কার্ভি রোগাক্রান্ত মাড়িতে ঘা এর মাধ্যমে" দুলুন্ডাতে এবং ডঃ পেন দ্বারা অপর্যাপ্ত খাদ্য প্রদানকে, তিনি সেই নেটিভ অ্যাসিস্ট্যান্টের প্রতি সুপারিন্টেন্ডেন্টের বিচারের বিরোধীতা পরিষ্কারভাবে করেছিলেন যে, "... সে চমৎকার ব্যক্তি, এবং তাকে আমি নিজে বেছে নিয়েছিলাম তার অসাধারণ ভালো আচরণ ও চরিত্রের জন্য"[157]। তিনি অভিজ্ঞ এবং নতুন নিয়োজিত নেটিভ ডাক্তারের সমর্থনে সুপারিন্টেন্ডেন্টের ব্যক্তি পরিচালনার দক্ষতাকে সমালোচনা করে বলেছিলেন: "দায়িত্বটি অপেক্ষাকৃত নতুন, এবং সেটি কোনো নেটিভ অধঃস্তনের পক্ষে পূরণ করা কঠিন, যদি তিনি ডঃ পেন যেমনভাবে সেটিকে একজন নেটিভ ডাক্তারের কর্তব্য হিসাবে বলছেন, তা পালন করতে যান, কোনো নির্দিষ্ট নির্দেশ ছাড়াই। এই প্রকার নির্দেশ প্রদান করতেও কিন্তু বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয়"[158] ।

ইউরোপীয় উন্মাদাশ্রমে যে ইউরোপীয় কর্মীরা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে নিয়োজিত হয়েছিলেন তাঁরা ইংল্যান্ডের বেসরকারী উন্মাদাশ্রমের কর্মীদের থেকে ধারাবাহিকভাবে কম সংখ্যায় ছিলেন যেখানে তিনজন রোগী পিছু একজন কর্মী ছিল; কিন্তু সেই সংখ্যা সরকারী উন্মাদাশ্রমের সাথে সম সংখ্যায় ছিল, যেখানে প্রতি ১২ থেকে ১৭ জন রোগী পিছু একজন কর্মী থাকত [159]। এখানে এটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে ভারতে, ইউরোপীয় অথবা ভারতীয়, যে কোনো উন্মাদাশ্রমের ক্ষেত্রেই প্রচুর পরিমাণে চাকর নিয়োজিত হত, যা ইউরোপের সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে সাধারণত নিয়োজিত হত তার চেয়ে অনেক বেশি হতো। এই চাকরগুলি ভারতীয় হতো, এবং তারা বিভিন্ন

---

[156] অ্যানুয়াল রিপোর্ট অ্যান্ড রিটার্ন অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৬৫, ডবলু.এ গ্রীন, অফিসিয়াটিং প্রিন্সিপাল ইন্সপেক্টর জেনারেল, মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট।

[157] অ্যানুয়াল রিপোর্ট অ্যান্ড রিটার্ন অফ ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল ফর দ্যা ইয়ার ১৮৬৬ , ইন্সপেক্টর ডবলু.এ গ্রীন, অফিসিয়াটিং প্রিন্সিপাল ইন্সপেক্টর জেনারেল, মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট।

[158] *তদেব*

[159] দ্যা রেকর্ড অফ গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল,এন: XXVIII। রিপোর্ট অফ দ্যা অ্যাসাইলামস ফর ইউরোপীয়ান অ্যান্ড নেটিভ ইনসেন পেসেন্টস, এট ভবানিপুর অ্যান্ড দুলুন্দা, ফর ১৮৫৬, জন গ্রে, ক্যালকাটা গেজেট অফিস,

প্রকারের কায়িক শ্রমের কাজ ও পরিসেবা প্রদান করত এবং তারা উন্মাদাশ্রমের রোগীদের সুখ-স্বাচ্ছান্দ্য নিশ্চিত করতো।

১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে, যখন সরকারী (ইউরোপীয়) উন্মাদাশ্রম স্থাপিত হয়েছিল সার্জেন টি. ক্যান্টরকে সুপারিন্টেন্ডেন্ট করে, তখন অধস্তন চিকিৎসা এবং "নেটিভ" কর্মী, উভয়ের জন্য নিয়মাবলী নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। ক্যান্টর উন্মাদাশ্রম পরিচালনা বিষয়ে কিছুটা অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন যখন তিনি উন্মাদেশ্রমের সুপারিন্টেন্ডেন্ট হিসাবে কাজ করতেন। তিনি দুই সেট নিয়ম জারি করেছিলেন পাঁচজন ইউরোপীয় অধস্তন কর্মচারী এবং ভারতীয় কর্মীদের জন্য[160]। প্রথম সাধারণ নিয়মটি ছিল মেট্রন, অ্যাপোথেকারি, স্টুয়ার্ড এবং দুজন ওভারসিয়ারের জন্য নির্দেশ যে, রোগীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, রোগীদের স্বার্থে চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ করা সংক্রান্ত অন্তর্নিহিত টেনশন পরিচালনা করা- যেটিকে বর্তমানে"চিকিৎসা নীতি"-র অধীনে মনে করা হয়, অর্থাৎ হিংস্রদের শাস্তি প্রদান করে, সাহায্যকারীদের পুরষ্কার প্রদান করে চিকিৎসা করা। অন্তর্নিহিত করুনা যেন সমস্ত পরিস্থিতিতেই রোগীদের চিকিৎসায় থাকে, এবং এটির উপর বিশেষ নজর রাখতে হবে যেন কোনো চিকিৎসার পদ্ধতি যেন কোনো ভাবেই প্রতিশোধ বা গুরুতর শাস্তির আকার না নেয়[161] । এই সাধারণ নীতিটি ভারতীয়দের জন্য অনুবাদ করা হয়েছিল আরও নির্দিষ্ট ও বাস্তবিক নির্দেশনামায়, অর্থাৎ তাদের নিরুৎসাহিত করা হয়েছিল যাতে তারা "কঠিন ভাষা, হুমকি, গালাগালি, মার এবং অন্য সমস্ত অত্যাচার ও হিংসার কার্যকলাপ" থেকে বিরত থাকে[162]।

একই পন্থায়, অধস্তন ইউরোপীয় অফিসারদের প্রদর্শন করতে হতো বিচক্ষণতা এবং তাদের দ্বারা জ্ঞাত হওয়া প্রতিষ্ঠানের ভিতরের খবরাখবর অনাবশ্যকভাবে প্রকাশ না করা[163]" অথবা যাকে এখন "গোপনীয়তা" বলা হয়ে থাকে। ভারতীয় অধস্তন কর্মচারীদের নিষিদ্ধ করা হয়েছিল যাতে তারা রোগীদের বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগের প্রচেষ্টায় কোনো সক্রিয় ভূমিকা পালন না করে,

---

160 *তদেব*

161 দ্যা রেকর্ড অফ গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল,এন: XXVIII। রিপোর্ট অফ দ্যা অ্যাসাইলামস ফর ইউরোপীয়ান অ্যান্ড নেটিভ ইনসেন পেসেন্টস, এট ভবানিপুর অ্যান্ড দুলুন্দা, ফর ১৮৫৬, জন গ্রে, ক্যালকাটা গেজেট অফিস

162 ওয়াল্ট্রাউড আর্নস্ট, মেডিকেল/ কলোনিয়াল পাওয়ার - লুনাটিক অ্যাসাইলামস ইন বেঙ্গল, সি. ১৮০০-১৯০০, জার্নাল অফ এশিয়ান হিস্ট্রি, ভলিউম-৪০, নং ১ (২০০৬), হ্যারাসোভিৎস ভারলাগ, পৃ- ৫০

163 অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৬৪, জে ম্যাক.ক্লেল্ড, অফিসিয়াটিং প্রিন্সিপাল ইন্সপেক্টর জেনারেল, মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস।

যেমন চিঠি, বার্তা অথবা জিনিসপত্র রোগীদেরকে দেওয়া এবং তাদের থেকে সেগুলি সংবাহন করা[164]।

ভারতীয় কর্মচারীদের কর্তব্য সীমিত ছিল কায়িক শ্রম ও নিরাপত্তার কাজকর্মে। বিভিন্ন কীপারকেওয়ার্ডগুলিতে ও চৌহদ্দিতে ঘুরে ঘুরে দেখতে হতো[165] , চাকরদের পরিষ্কার করতে, রান্না-বান্না করতে এবং বাগানে কাজ করতে হতো নীরব ভাবে এবং জোরে কথা না বলে, এবং কীপার ও চাকর, উভয়কেই কোনো কিছু ঘটলে বা জরুরি পরিস্থিতি হলে সেই সম্পর্কে তাদের উর্ধতন কর্মীদের জানাতে হতো [166]। একইভাবে উর্ধতন কর্মীদের কোনো জরুরি অবস্থার রিপোর্ট পাঠাতে হতো সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাছে, এবং নিশ্চিত করতে হতো যে ভারতীয় কর্মীরা যেন তাদের কাজ সুষ্ঠভাবে করে থাকে।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধে, কর্মীদের কর্তব্যের বর্ণনা এবং নিয়ম-বিধি, বাইরের কোনো পর্যবেক্ষকের কাছে আগের দশকগুলির মতোই একই প্রকার অস্বচ্ছ ছিল। এছাড়াও এটি অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, যেভাবে নিয়মগুলি প্রয়োগ করা হতো সেট এক উন্মাদাশ্রম থেকে অন্য উন্মাদাশ্রমে যথেষ্টই আলাদা ছিল। উদাহরণস্বরূপ, যথেষ্ট প্রমাণ ছিল যে ডঃ পেন নিজের ক্ষেত্রে এমন একটি সুনাম/দুর্নাম তৈরি করেছিলেন যা রোগীরা ও কর্মীরা তার ক্ষেত্রে যেমন অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি দায়িত্বে থাকার সময় দুলুন্ডায় অতি উচ্চ মৃত্যুর হার, তাঁকে অন্যান্য মেডিকাল অফিসারদের কঠোর সমালোচনার মধ্যে ফেলেছিল, বিশেষ করে তার অপর্যাপ্ত খাবার প্রদান এবং অতিরিক্ত কঠোর কাজ করানো প্রক্রিয়াকে। প্রসঙ্গক্রমে এর কারণে দীর্ঘ বিতর্ক শুরু হয়েছিল খাদ্য, স্কার্ভি এবং মৃত্যুর হার বিষয়ে [167]।

ডঃ পেনের মনোভাব ও পরিচালনা কৌশল, যা তাঁর দায়িত্বে থাকা উন্মাদাশ্রমের বহু রোগীদের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল, তার ঠিক বিপরীতে এমন বহু উন্মাদাশ্রম সুপারিন্টেন্ডেন্টরা ছিলেন, যাঁরা রোগীদের প্রতি আরও দয়া প্রদর্শন করতেন। উদাহরণস্বরূপ পাটনা উন্মাদাশ্রমের ডঃ জে. সাদারল্যান্ড ১৮৬৩

---

164 দ্যা রেকর্ড অফ গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল,এন: XXVIII। রিপোর্ট অফ দ্যা অ্যাসাইলামস ফর ইউরোপীয়ান অ্যান্ড নেটিভ ইনসেন পেসেন্টস, এট ভবানিপুর অ্যান্ড দুলুন্দা, ফর ১৮৫৭, নং-২৭০, জন গ্রে, ক্যালকাটা গেজেট অফিস,

165 *তদেব.*

166 *তদেব.*

167 অ্যানুয়াল রিপোর্ট অ্যান্ড রিটার্ন অফ ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল ফর দ্যা ইয়ার ১৮৬৫ , ইন্সপেক্টর ডবলু.এ গ্রীন, অফিসিয়াটিং প্রিন্সিপাল ইন্সপেক্টর জেনারেল, মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট।

সালে তাঁর রিপোর্টে দেখা যায় যে, ইঁট ভাঙা ও সুরকি তৈরি যার দ্বারা অন্যান্য উন্মাদাশ্রমে যথেষ্ট লাভ পাওয়া যাচ্ছে, সেটি মানসিক রোগীদের পক্ষে অনুপযুক্ত, এবং সেটিকে প্রায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মতো দেখতে হয়[168] । তাঁর প্রতিষ্ঠানে খাদ্য ছিল উন্মুক্ত এবং বিভিন্ন, এবং স্কার্ভি রোগাক্রান্ত (অপর্যাপ্ত খাদ্যের কারণে অপুষ্টি) কোনো ব্যক্তি সেই উন্মাদাশ্রমে কখনই ছিল না [169] ।যদি এটিকে ভিক্টোরীয় যুগের অত্যুক্তি বলে সরিয়ে রাখি, তবুও এর পরে বিবৃতি, য়া একটি সরকারী উন্মাদাশ্রম রিপোর্টে স্থান করে নিয়েছিল, তার থেকে এটি প্রতীয়মান হয় য়ে ডঃ পেনের মতো নেটিভ উন্মাদদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট ও কঠোর মনোভাব তিনি গ্রহণ করেননি, উদাহরণস্বরূপ পরিদর্শনকারীদের কাছে সেখানে থাকা রোগীদের খুশি ও পরিতৃপ্ত মুখ খুশীর কারণ হতো; আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার দায়িত্বে থাকা ভাগ্যহীন মানুষগুলির প্রতি করুণা অনুভব করে থাকি , ডঃ পেনঅভিজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন যে, তিনি অধিকাংশের নাম জানেন, এবং তাদের কী কী পছন্দ, তাদের সমস্যা ও তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা তাও কিছুটা জানি। এদেও মধ্যে কয়েকজন তাদের স্বভাব ও অন্যান্য মনোভাবের দিক থেকে খুবই বিনয়ী ও সহনশীল। এদের মধ্যে একজন, যাকে উন্মাদাশ্রমের সবাই চেনে, হায়দার নাম, ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে অসম্ভব সব শব্দ ব্যবহার করে কথা বলে আর এই সময়ে তার মুখ খুব উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে যার সাথে কথা বলে তার সরাসরি মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে, এবং সে সাধারণত তার দীর্ঘ ভাষণ শেষ কওে go to hell you black fellow’ (তুই জাহান্নামে যা, কালা আদমী), এবং তারপর অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে [170] ।

ঢাকা উন্মাদাশ্রমের সুপারিন্টেন্ডেন্ট বাধ্যতামূলক কাজের ক্ষেত্রে ডঃ সাদারল্যান্ডের দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থক ছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে, যেসব উন্মাদরা বিশ্বাস করে যে তারা মহান ব্যক্তি, তাদেরকে দিয়ে কাজ করানো খুব কঠিন। কোনো প্রকারে তাদেরকে বাধ্য করানো প্রয়োজন হয়, এবং যেহেতু তাদের বিভ্রম থাকেই , তাই কাজের যে প্রভাব মস্তিষ্কের উপর পড়ে তা কখনই উপকারী

---

168 অ্যানুয়াল রিপোর্ট অ্যান্ড রিটার্ন অফ ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৬২, জে ম্যাক.ক্লেল্ড, ইন্সপেক্টর জেনারেল, মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট।

169 অ্যানুয়াল রিপোর্ট অ্যান্ড রিটার্ন অফ ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল ফর দ্যা ইয়ার ১৮৬৩, জে ম্যাক.ক্লেল্ড, ইন্সপেক্টর জেনারেল, মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট।

170 অ্যানুয়াল রিপোর্ট অ্যান্ড রিটার্ন অফ ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল ফর দ্যা ইয়ার ১৮৬৩, জে ম্যাক.ক্লেল্ড, ইন্সপেক্টর জেনারেল, মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস ক্যালকাটা।

হয় না। এই প্রকারের ব্যক্তিদের কাছে থেকে কাজে পাওয়ার জন্য কোনো চাপ প্রদান করা হতো না [171]।

পাটনা উন্মাদাশ্রমে সাদারল্যান্ডের উত্তরসূরী, ডঃ আর. এফ. হাচিনসন, একইভাবে তাঁর উন্মাদাশ্রমের রোগীদের আনন্দে থাকার বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন। তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করার পরেপরেই এমন এক প্রথা শুরু করেছিলেন যাতে "সবচেয়ে আনন্দজনক ফল হয়েছিল"[172]। তিনি সমস্ত উন্মাদদের দীর্ঘ পদযাত্রায় নিয়ে যেতেন,

সকাল ও বিকাল বেলায় দেখা যেতে উন্মাদেরা লাইন করে চলেছে, পুরুষরা আগে আগে এ মহিলারা পিছে পিছে। যদি কোনো পুরানো উন্মাদের পালা হতো, তাহলে সে দলের নেতৃত্ব দেওয়ার কাজ করতো, ভীষণ চেঁচিয়ে গান গেয়ে এবং তালে তালে হাততালি দিয়ে রোগীদের মনের উতসাহ দিতেন [173]।

সব মেডিকাল অফিসাররা ডঃ হাচিনসনের পদ্ধতি অনুসরণ করতে রাজি ছিলেন না। তাঁর অন্য একটি প্রক্রিয়া, যেখানে তিনি "নাচ" (ভারতীয় নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশন) শুরু করেছিলেন [174]। মেডিকাল অফিসার তার অন্যান্য সহকর্মীদের মতো ভারতীয় সঙ্গীত ও নৃত্য সম্পর্কে খারাপ মনোভাব পোষণ করতেন না, এবং তিনি ডঃ পেনের মতো শাস্তিতে বিশ্বাস করেন না। হাচিনসন-এর দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থন করেছিলেন ডঃ স্টুয়ার্ট (কটকে) এবং ডঃ ওয়াইজ (ঢাকাতে)। তারাও কিন্তু রোগীদের জন্য মনোরঞ্জনকে অনুমোদন করতেন এবং সম্মত হয়েছিলেন যে, সেগুলি রোগীদের ক্ষেত্রে উপকারী হয়েছিল"[175]

---

[171] অ্যানুয়াল রিপোর্ট অ্যান্ড রিটার্ন অফ ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল ফর দ্যা ইয়ার ১৮৬২, জে ম্যাক.ক্লেল্ড, ইন্সপেক্টর জেনারেল, মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট

[172] অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৬৫, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস ক্যালকাটা ১৮৬৬। অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৬৫।

[173] অ্যানুয়াল রিপোর্ট অ্যান্ড রিটার্ন অফ ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল ফর দ্যা ইয়ার ১৮৬৩ , জে ম্যাক.ক্লেল্ড, অফিসিয়াটিং প্রিন্সিপাল ইন্সপেক্টর জেনারেল, মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট।

[174] অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল ফর দ্যা ইয়ার ১৮৬৫, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস ক্যালকাটা ১৮৬৬

[175] অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল ফর দ্যা ইয়ার ১৮৬৭, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস ক্যালকাটা ১৮৬৮

এই প্রকারের প্রমাণ, যেগুলি পাওয়া যায় পক্ষপাতদুষ্ট বিবৃতি ও দমনমূলক আচরণের সাথে-সাথে, আমাদের উদ্বুদ্ধ করে সার্বিকও সাধারণ দাবী যে, "চিকিৎসা শক্তি" এবং "ঔপনিবেশিক শক্তি" হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করে থেকেআরও সম্পূর্ণ বিবৃতি তৈরি করতে। চিকিৎসা ও ঔপনিবেশিক ভাষণে যাই বলা হোক না কেন, বাস্তবে চিকিৎসার প্রক্রিয়া আরও "কঠিন" এবং বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত, এবং হয়ত অন্তর্নিহিতভাবে  দমনমূলক ও শোষণকারী নয়, যেহেতু সেটিকে একটি উপনিবেশে প্রয়োগ করা হয়েছিল।

## উন্মাদ আশ্রম থেকে লাভ নিষ্কাশন

ব্রিটিশরা জোর দিয়ে বলেছিল যে উন্মাদদের আটকে রাখা তাদের নৈতিক ও চিকিৎসাগত দায়। ভিক্টোরীয় যুগের দর্শন অনুযায়ী নৈতিকতা সমস্ত কিছু নিরাময় করে দিতে পারে। এর ফলে নৈতিকতা এবং উন্মাদগ্রস্ততার সাথে তার সম্পর্কের ব্রিটিশ চিকিৎসার মূল্যায়ন ঘটেছিল, এক শতাব্দীর সার্বিক নৈতিকতার বুলি নিয়ে এদেশে জেলখানা উন্মাদাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিল। তাদের আশা ছিল যে, নৈতিক দায়িত্ব ভারতের জীবন-যাপনের মানোন্নয়ন ঘটাবে। এছাড়াও ব্রিটিশরা বিশ্বাস করতো যে স্থায়ী কাজকর্মের ফলে উন্মাদাশ্রমের রোগীদের মধ্যে দীর্ঘকালীন নিরাময় সূচিত হবে। আবার এটাও উন্মাদাশ্রমের রেকর্ডে রোগীদের শারীরিক শ্রমের বিস্তারিত বিবরণ আছে। এই শারীরিক শ্রমে অন্তর্ভুক্ত হতো দড়ি তৈরি করা, তাঁত চালানো, টিনের সামগ্রি তৈরি করা, বাগানে কাজ করা, রান্না করা, জল তোলা, রাজমিস্ত্রির কাজ করা এবং অন্য যে কোনো কাজ যার দ্বারা উন্মাদাশ্রমের রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব হতো[176]। ব্রিটিশরা এইসব কাজগুলিকে "অ্যাসাইলাম ইন্ডাস্ট্রি হিসাবে"  শ্রেণীবিভক্ত করতো। চিকিৎসাকর্মীদের লক্ষ্যগুলি বিবৃত হয়েছিল ঢাকা উন্মাদাশ্রমের  ১৮৬২ সালের রিপোর্টে[177]।  ম্যাকল্যান্ড তাঁর প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন উন্মাদদেও   চিকিৎসায় পেশা থাকাটা খুবই জরুরি , তাই  চেষ্টা করেছিল তাদের একটি করে পেশা দিতে তাদের শারীরিক  শক্তির  উপর চাপ না  দিয়ে, এবং ভীতি   প্রদর্শন না কওে , যেখানে সবচেয়ে বড় লক্ষ্য ছিল স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে পেশাকে সহায়ক করা [178]। কাজগুলি

---

176 অ্যানুয়াল রিপোর্ট অ্যান্ড রিটার্ন অফ ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৬৩ , জে ম্যাক.ক্লেল্ড, অফিসিয়াটিং প্রিন্সিপাল ইন্সপেক্টর জেনারেল, মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট।

177 অ্যানুয়াল রিপোর্ট অ্যান্ড রিটার্ন অফ ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৬২ , জে ম্যাক.ক্লেল্ড, অফিসিয়াটিং প্রিন্সিপাল ইন্সপেক্টর জেনারেল, মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট।

178 অ্যানুয়াল রিপোর্ট অ্যান্ড রিটার্ন অফ ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৬৩ , জে ম্যাক.ক্লেল্ড, অফিসিয়াটিং প্রিন্সিপাল ইন্সপেক্টর জেনারেল, মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট।

ভীতি-প্রদর্শন করে করা হয় না, এই কথাটি সুপারিন্টেন্ডেন্টগণ বার বার করে বলেছেন, যেন তাঁরা এই আচরণের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক আদেশের কথা জানতেন[179]। ব্রিটিশরা বিশ্বাস করতো সৎভাবে কাজ করা হল একমাত্র নিরাময়ের পন্থা। ভীতি-প্রদর্শন করে কাজ করানোকে মনে করা হতো অকার্যকরী, কারণ সেটি অভ্যাস গঠনকারী দক্ষতা তৈরি করতো না যা প্রয়োজন হত নিরাময় হতে। ১৮৭০ সালের রিপোর্ট প্রকাশ করার সময়, অ্যাসাইলাম ইন্ডাস্ট্রি বিস্তৃত হয়েছিল সেইসব কাজকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় যা তাদের জন্য শারীরিকভাবে কোনো ক্ষতি হবে না এবং যারা কাজের জন্য সমস্ত শক্তি এবং উদ্যম হারিয়ে ফেলেছিল তাদের কে পৃথক করে রাখা হয়েছিল, এবং এদের কে লুনাটিক লেবার (lunatic labour) হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। রোগীদের ক্ষেত্রে লাভজনক কাজকর্ম এছাড়াও উন্মাদাশ্রমগুলি এবং ব্রিটিশদের জন্য লাভের একটি নতুন রাস্তা খুলে দিয়েছিল, যা ভারতে বিশেষ করে ঔপনিবেশিক বাংলায় ব্রিটিশদের রাজত্বের আসল উদ্দেশ্যের সাথে একা ছিল।

*Statement of profit of labour the lunatic in lunatic asylum Dacca*[180]

*For the year of 1863*

| Name of the occupation | Amount of Profit | | | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| | Rs | Ana | Paysa | |
| Rope and String-making………. | 54 | 10 | 3 | |
| Bamboo and Cane work………. | 41 | 8 | 9 | |
| Gardening Vegetables, &c. …. | 45 | 4 | 9 | |
| Soorki-pounding……. | 329 | 14 | 6 | |
| Carpentering ……. | 291 | 11 | 9 | |
| Coleen' labor for Road work…. | 245 | 6 | 6 | |
| Domestic duties………… | 660 | 7 | 6 | |
| Grinding wheat…………… | 17 | 10 | 0 | |
| Tinsmith's' work ………… | 14 | 10 | 6 | |
| White-washing of Asylum ……. | 31 | 1 | 3 | |
| Add estimated labour, as per Statement No. 11, for which cash is not received … | | | | |
| Total Rupees ... | 1080 | 13 | 0 | |
| | 2913 | 2 | 9 | |
| Daily Average no of Lunatics in Confinement…………………. | 220<br>166 | | | |

---

179 অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইউরপিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাট ভবানিপুর ফর দ্যা ইয়ার ১৮৬৭, এ.পাইন, সার্জন সুপারিন্টেন্ডেন্ট ।

180 অ্যানুয়াল রিপোর্ট অ্যান্ড রিটার্ন অফ ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৬৩ , জে ম্যাক.ক্লেল্ড, অফিসিয়াটিং প্রিন্সিপাল ইন্সপেক্টর জেনারেল, মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট

দুলান্দা উন্মাদ আশ্রমের আর্থার পেন এক চিঠিতে ম্যাক ফারসনকে লেখেন - ১৮৬১ খ্রি উৎপাদন থেকে লাভাংশ হয়েছিল ১,৯৪৬ টাকা ৫ আনা। রোগীদের কাছ থেকে প্রেমেণ্ট[181] বাবদ ১০৭ টাকা ২৫ আনা ৯ পয়সা। মোট লাভ হয়েছিল ২,০৫৫ টাকা ৪ আনা ৯ পয়সা, আবার ১৯৬২ খ্রীঃ উৎপাদন থেকে মোট আয় ২,০৫৫ টাকা ১০ আনা ১১ পয়সা। রোগীদের থেকে ৬৫১ টাকা ৪ আনা ৯ পয়সা। মোট ২,৭০৫ টাকা ১৪ আনা ৮ পয়সা।

১৮৬১ ও ১৮৬২ খ্রীঃ উন্মাদ আশ্রম থেকে লভ্যাংশ[182]

| Year | Average Population | Average Number Employed | Proceeds of Industry | | | Payments of Patients | | | Total | | | Average Profit Per employed and Unemployed | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rs. | As. | P. | Rs. | As. | P. | Rs. | As. | P. | Rs. | As. | P. |
| 1861 | 209 | 174 | 1946 | 5 | 0 | 107 | 15 | 9 | 2054 | 4 | 9 | 9 | 13 | 3 |
| 1862 | 187 | 165 | 2054 | 10 | 11 | 651 | 3 | 9 | 2705 | 14 | 8 | 14 | 7 | 5 |

১৮৬৩ এবং ১৮৭০ এর রিপোর্টে বিবৃত ছিল অ্যাসাইলাম ইন্ডাস্ট্রির এশাধিক লাভের বিভাগগুলি[183]। এই ইন্ডাস্ট্রি কিছু অংশ, যেমন উন্মাদাশ্রমের বাগান সত্যি সত্যিই রোগীদের সাহায্য করেছিল । ১৮৬২ রিপোর্টে বিবৃত ছিল lunatic labour দ্বারা শব্জিবাগান যা উৎপাদন হতো সেটি কেবলমাত্র নেটিভদেও জন্য এবং ইউরোপীয়দের জন্য উন্মাদাশ্রমগুলির এবং কিছু স্থানীয় জেলখানার খাদ্যের চাহিদা মেটাচ্ছিল[184]। ব্রিটিশরা যে শুধু এই বাগানকে রোগীদের চিকিৎসার অঙ্গ হিসাবে কাজ করার সুযোগ হিসাবে দেখতো তাই নয়, তাদের আশা ছিল যে তারা এই বাগানের অতিরিক্ত উৎপাদনকে লাভজনকভাবে বিক্রি করতে পারবে। ১৮৬৩ খ্রীঃ বাগান থেকে অল্প ২ ই লাভ পাওয়া গিয়েছিল , যা-

---

181 অ্যানুয়াল রিপোর্ট অ্যান্ড রিটার্ন অফ ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল ফর দ্যা ইয়ার ১৮৬৩, আর্থার পেইন, ই,এস,কিউ, সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, হোম মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট, Payments by Patients and their Relatives,- In my last Report I draw attention to at the same time, the abuse of the Institution by persons having means of paying for the maintenance of their insane relatives, who nevertheless were in the habit of sending them here to be supported gratuitously by the State, and I mentioned some instances in which, after duo enquiry into their circumstances, I had made demands from certain persons thus situated, and had realised and placed to the credit of Government a small sum on this account. as this summary practice was novel and not provided for in the Regulations, I thought it necessary to apply for the sanction of Government to its continuance; and I proposed, in case of increased payments, to set apart for the use of paying patients separate accommodation, &c

182 অ্যানুয়াল রিপোর্ট অ্যান্ড রিটার্ন অফ ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৬২ , জে ম্যাক.ক্লেল্ড

183 অ্যানুয়াল রিপোর্ট অ্যান্ড রিটার্ন অফ ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৬৩ , জে ম্যাক.ক্লেল্ড, অফিসিয়াটিং প্রিন্সিপাল ইন্সপেক্টর জেনারেল, মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট।

184 অ্যানুয়াল রিপোর্ট অ্যান্ড রিটার্ন অফ ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৬৩ , জে ম্যাক.ক্লেল্ড, অফিসিয়াটিং প্রিন্সিপাল ইন্সপেক্টর জেনারেল, মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট।

ডঃ পেনকে চিন্তায় ফেলেছিল। এটি মনে করা হয় যে চিকিৎসা যাই হোক না কেন, লাভ করার প্রচেষ্টা হল এমন এক নীতি যা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে পাওয়া হয়েছিল, এবং এই উদ্দেশ্য কিন্তু ঔপনিবেশিক মূল লক্ষ্যের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ রেখে উন্মাদ আশ্রমের কর্তারা তাদের কার্যকলাপ পরিচালিত করতো [185]।

কিন্তু পরের বছর পেনের রিপোর্টে, এটি পরিষ্কার ছিল যে, তিনি মাত্রাতিরিক্ত চিন্তিত ছিলেন, কারণ বাগান থেকে সন্তোষজনক লাভ হচ্ছিল না এবং সেই কারণে এই বিষয়ে সরকারী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আবেদন করেন, কিন্তু রোগীরা বাগানের টাটকা ফল ও শাকসব্জী খেতে পাচ্ছিল কিনা সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ছিল না; অর্থাৎ উন্মাদাশ্রমের কর্তৃপক্ষ এবং ঔপনিবেশিক প্রশাসকেরা স্বাস্থ্য উন্নতির ততটা চিন্তিত ছিল না চিন্তিত ছিল লাভের অংশ বিষয়ে[186]।

১৮৭০-৭১ সালের রিপোর্টে লাভের খতিয়ান আরও নির্দিষ্ট হয়েছিল এবং তাদের পরিষ্কার ভাগ করা ছিল উন্মাদাশ্রম অনুযায়ী। উন্মাদাশ্রমগুলির সুপারিন্টেন্ডেটগণ বারবার এই কথা বলেছিলো, ঠিক যেমন পেন বলেছিলেন, স্বাস্থ্যের ক্ষত্রে শৃঙ্খলা এবং নিরাময় উপর কাজের প্রভাবকে খুঁটিয়ে পরিদর্শন করা হয়ে থাকে। কোনোভাবেই সেটি শুরু করার মহান উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে লাভকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না [187]। কিন্তু বিস্তারিত লাভের বিশ্লেষণ এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে যে ব্রিটিশরা সত্যিই লাভ -লোকসান নিয়ে বেশি চিন্তিত ছিল। ১৮৭০ সাল নাগাদ , বাংলার উন্মাদাশ্রমগুলির বাগানগুলি সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছিল। দুলান্দা উন্মাদাশ্রম একটি জলা-জীর্ণ স্থানকে সুন্দর ও উৎপাদনশীল বাগানে পরিণত করে, যার থেকে প্রচুর পরিমাণে সব্জি উৎপাদন হত [188] , এবং সেখানে উন্নত মানের ফল উৎপাদিত হতো , সেটি খাওয়া ও বিক্রি উভয় কাজে ব্যবহার করা হয়। উন্মাদাশ্রমের রিপোর্টে প্রায় প্রতি পৃষ্ঠাতেই লাভ-লোকসানের খতিয়ান ছিল। বাগানগুলি বর্ণনা করতে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়েছিল, সেটিও বেশি কৌতুহলোদ্দীপক ছিল। ঢাকা উন্মাদশ্রমের তথ্যের দিকে নজর দিলে দেখা যাবে, সুপারিন্টেন্ডেন্ট

---

185 ব্রুমলিক, কিম্বার্লি সি, লুনাসি ফর প্রফিট : দ্যা ইকোনমিক গেইনস অফ 'নেটিভ-অনলি' লুনাটিক অ্যাসাইলাম ইন দ্যা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, ১৮৫০-১৮৭০, জার্নাল অফ সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ। ০২ (০১) ২০১৪, ০১-১০।

186 অ্যানুয়াল রিপোর্ট অ্যান্ড রিটার্ন অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৬৪ , জে ম্যাক.ক্লেন্ড, অফিসিয়াটিং প্রিন্সিপাল ইন্সপেক্টর জেনারেল, মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট।

187 অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল ফর দ্যা ইয়ার ১৮৭০, জে. ক্যাম্পবেল ব্রাউন, ইন্সপেক্টর – জেনারেল অফ হসপিটাল, ইন্ডিয়া মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট, ক্যালকাটা।

188 এন, অ্যা, আই, রিপোর্ট অন দুলুন্দা লুনাটিক অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল, ১৮৭০,হোম মেডিকেল প্রসেডিং নং- ১৭৫-১৭৬

কাটক্লিফ বিস্তারিত বর্ণনা করেছিলেন কী কী সংস্কার প্রয়োজনীয় হবে ভিক্টোরীয় যুগের একটি সাধারণ সুপরিচর্যিত ইংলিশ বাগান করতে। তিনি বর্ণনা করেছিলেন কী কী খনন কার্য করতে হবে যাতে মাটিকে উপযুক্ত করা যায় গাছ পোঁতার জন্য এবং কীভাবে গাছের ছাঁটাই করতে হবে, যাতে সেই স্থানের ব্যারাকের মতো অবয়ব”-কে ঢেকে দেওয়া যায়, । উভয় রিপোর্টের সবচেয়ে দীর্ঘ অংশ ছিল আলঙ্কারিক বাগান বিষয়ে বিবরণ, যেখানে বলা ছিল কী কী সংযোজন করতে হবে, যেমন নতুন পিচ-রাস্তা এবং ফুলগাছ সাজানো। রোগীরা জলা-জমি খনন করেছিল এবং সেখান থেকে জল বার করেছিল[189]। কখনই এটি ব্যাখ্যা করা হতো না যে কেন এবং কতটা শারীরিক শ্রম বাগান করায় অতিবাহিত করলে রোগীদের নিরাময়ে সাহায্য হবে; রিপোর্টেও সেই বিষয়ে খুব একটা চিন্তা ব্যক্ত করা হয় নি। সুপারিন্টেন্ডেন্টগণ অবশ্য কথাচ্ছলে বলেছিলেন যে রোগীদের বাগানে কাজ করানো হতো চিকিৎসার অঙ্গ হিসাবে, কিন্তু সেই বিষয়ে রোগীর ইতিহাস ও রোগ নির্ণয় সম্পর্কে কোনো বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয় নি, যেমন করা হয়েছিল লাভ-লোকসানের খতিয়ান নিয়ে[190]।

এটি সত্যিই অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ছিল যে, এমন এক চিকিৎসা পদ্ধতি তৈরি করা হবে , যা ব্রিটিশদেরও আর্থিক লাভ এনে দেবে। ভিক্টোরীয় যুগের ব্রিটিশরা মানুষের কার্যকলাপে দুটি ভাগে ভাগ করেছিল , নৈতিক অথবা অনৈতিক; তারা নিশ্চয়ই অ্যাসাইলাম ইন্ডাস্ট্রি থেকে পাওয়া লাভকে নৈতিক হিসাবে শ্রেণীবিভক্ত করেছিল কারণ সেটিকে তারা চিকিৎসার অঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করত । উদাহরণ স্বরূপ, ১৮৬২-র রিপোর্টে জেনারেল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড মরাল ট্রিটমেন্ট (সাধারণ পরিচালনা ও নৈতিক চিকিৎসা পদ্ধতি)-র শিরোনামে , পাটনা অ্যাসাইলামের সুপারিন্টেন্ডেন্ট জে. সাদারল্যান্ড পরিষ্কারভাবে উন্মাদদের কাজ করার বিষয়টি বিবৃত করেছিলেন[191]। তিনি বলেছিলেন , গত বছরের মতোই , এটি দেখা গিয়েছিল যে , শারীরিক শ্রম স্নায়ুতন্ত্রকে শান্ত করা , সাধারণ স্বাস্থ্যকে উন্নত করার এবং একটি নিরাময়ের জন্য একটি কার্যকরী উপায় , কিন্তু মানসিক ভাবে দুর্বলদের কাজ

---

[189] অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল ফর দ্যা ইয়ার - ১৮৭১, জে. ক্যাম্পবেল ব্রাউন, ইন্সপেক্টর – জেনারেল অফ হসপিটাল ,বেঙ্গল মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট, ক্যালকাটা।

[190] অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল ফর দ্যা ইয়ার - ১৮৭১, জে. ক্যাম্পবেল ব্রাউন, ইন্সপেক্টর – জেনারেল অফ হসপিটাল ,বেঙ্গল মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট, ক্যালকাটা।

[191] অ্যানুয়াল রিপোর্ট অ্যান্ড রিটার্ন অফ ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৬২ , জে ম্যাক.ক্লেল্ড, অফিসিয়াটিং প্রিন্সিপাল ইন্সপেক্টর জেনারেল, মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট।

করতে হবে, ভীতি-প্রদর্শন না করে, তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে। কিন্তু ঠিক তার পরের বিভাগেই আছে পাটনার উন্মাদাশ্রমের লাভ-লোকসানের খতিয়ান, এমনকি কীভাবে লাভের সূচককে বৃদ্ধি করা যায় সেই বিষয়ে বিবরণও। এটি বিশ্বাস করা সত্যিই কঠিন যে, এই রিপোর্টগুলির মূল উদ্দেশ্য ছিল লাভ করা ছিল না, তার বদলে দেশীয় উন্মাদ মানুষদেও চিকিৎসা করা, যদি সত্যিই তারা উন্মাদ হয়। আসলে উন্মাদাশ্রমগুলি ছিল ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, নৈতিক চিকিৎসা প্রদানকারী চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের ছদ্মবেশে।

যখন ১৮৬০-৬৫ নাগাদ বাগানগুলি থেকে আশানুরূপ লাভ হয়নি, সেই সময় উন্মাদাশ্রমের সুপারিন্টেন্ডেন্টগণ মনে করতেন যে কাঠের (ছুতোর) কাজ আয়ের একটি উপায় হতে পারে, আর তাই এটিকে আর্থিক পরিকল্পনার অংশ করা হয়েছিল, চিকিৎসা পদ্ধতি হিসাবে নয়। ঢাকা উন্মাদাশ্রমের সুপারিন্টেন্ডেন্ট, ডঃ এ. সিম্পসন কাঠের কাজকে চিকিৎসার পদ্ধতি করার ক্ষেত্রে একটি লক্ষ্য নির্বাচন করার বিষয়ে একটি দীর্ঘ বর্ণনা লিখেছিলেন, আমার গত রিপোর্টে, আমি উল্লেখ করেছিলাম, একজন ওস্তাদ ছুতোরের অধীনে কাঠের কাজকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করার কথা। গত বছরে এই পেশাটি লাভজনকভাবে করা হয়েছিল। আমি উন্মাদাশ্রমের গেট তৈরির কাজটির দায়িত্ব এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (নির্বাহী প্রকৌশলী)-র কাছ থেকে নিয়েছিলাম , এবং কাজটি সন্তোষজনকভবে করা হয়েছিল এবং তার লাভ থেকে সবার বেতনই উঠে এসেছিল। আমি এখন প্রয়োজনীয় যে কোনো কাঠের কাজ করতে তৈরি, এবং আমার কাছে বর্তমানে কিছু কাজ আছে, শুধুমাত্র উন্মাদাশ্রমের জন্যই নয় , মিটফোর্ড হাসপাতাল এবং কিছু বেসরকারী ব্যক্তির জন্যেও[192]। ডিপার্টমেন্ট অফ পাবলিক ওয়ার্কসের কাজ করার ক্ষেত্রে আমি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের করা এস্টিমেট মতোই কাজ নির্বাহ করে থাকি। সমস্ত প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এখন এর লাভ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, এবং আমি ধীরে ধীরে চেষ্টা করছি লোক সংখ্যা বৃদ্ধি করতেঃ বর্তমানে সাতজন লুনাটিক লেবার এই কাজ করে, আর তাদের সাথে থাকে যতজন সম্ভব লোক যাদের অন্যান্য কাজের অবকাশ থেকে পাওয়া যায়, যাদের আমি ছুতোরের কাজ শিখিয়ে নিতে পারব। যতটা কাজ আমার কাছে আছে, তাতে যতজন পারব ততজনকে কাজে লাগানো যাবে। একজন ভালো ছুতোর মিস্ত্রি এখানে

---

[192] অ্যানুয়াল রিপোর্ট অ্যান্ড রিটার্ন অফ ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৬২ , জে ম্যাক.ক্লেল্ড, লেটার ফ্রম সুপারিন্টেন্ডেন্ট, দ্যা লুনাটিক অ্যাসাইলাম অফ ঢাকা টু ইন্সপেক্টর – জেনারেল

মাসিক ১০ টাকায় অনায়াসে ১৫ থেকে ২০ টাকা রোজগার করতে পারবে। একজন ছুতোর মিস্ত্রিকে মাত্র পাঁচ ঘন্টা কাজ করতে হবে, আর সে বাকি দিনের জন্য অন্য কাজও নিতে পারবে [193]। আবার বিল্ডিং নির্মাণের জন্য  সুরকি পাউন্ডিং[194] ও টিন স্মিথ[195]  এর কাজে Lunatic labour দের দিয়ে করা হতো।

এখানে মনে রাখতে হবে যে, এই লেখায় রোগীদের পরিচর্যা ও চিকিৎসার কোনো উল্লেখই করা নেই। এটি কোনো ব্যক্তির জন্য  বেশ কঠিন যে এটি কোনো উন্মাদাশ্রমের রিপোর্ট নাকি একটি ব্যবসায়িক আর্থিক পরিকল্পনা , যেখানে শুধুমাত্র একবার উন্মাদ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। ব্রিটিশদের জন্য দুর্ভাগ্যক্রমে ১৮৬৩ সালের রিপোর্টে ঘোষিত হয়েছিল যে কাঠের কাজ, যতটা লাভজনক মনে করা হয়েছিল ততটা নয়, কিন্তু তবুও সেটি একটি পেশা হিসাবে আশ্রমে চালিয়ে  যাওয়া  হয়েছিল । অন্যান্য লাভজনক অ্যাসাইলাম ইন্ডাস্ট্রিকে শ্রেণী বিভক্ত করা হয়েছিল ম্যানুফ্যাকচারস বা উৎপাদন হিসাবে, যেখানে কল ও মেশিন ব্যবহার করা  হয়েছিল যেমন তাঁত এবং সুতো- কাটার মেশিন। প্রধান উৎপাদন গঠিত হয় কর্পাস সুতো এবং শনের তন্তু  তৈরি  করা , কাপড়  বয়ন এবং তাঁত আর বাঁশের মোড়া ও চেয়ার তৈরি করা। এটি যুক্তি সঙ্গত  মনে হয়  না যে  মানসিকভাবে অক্ষম রোগীরা একটি তাঁত চালাতে পারবে , কাপড়  ও দড়ি  তৈর  করতে পারবে , অথবা  তাদের  ছুরি নিয়ে কাজ করতে দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকা যাবে। এখানে এটি আবার বলা উচিত , রোগীদেও  জনতত্ত্ব অনুযায়ী  উন্মাদাশ্রমে মূলত  যাযাবর এবং  ভবঘুরেরা  থাকতো, যাদের জনসমক্ষে নেশা করার অপরাধে সেখানে আটকে রাখা হয়েছিল। আসলে  এনসব  লোকজন ছিল সুস্থ, স্বাভাবিক যারা এই উৎপাদনে কাজ করতো। সিম্পসন এই  কাজগুলিকে এইভাবে  বর্ণনা করেছেন : “তাদের  অধিকাংশ  কাজ খুব ভালোভাবে করা, এবং তাদের উৎপাদনের সেই  কারণে  খুব চাহিদা  আছে। এখনও  পর্যন্ত

---

193 অ্যানুয়াল রিপোর্ট অ্যান্ড রিটার্ন অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৬৩, জে ম্যাক.ক্লেল্ড, অফিসিয়াটিং প্রিন্সিপাল ইন্সপেক্টর জেনারেল, মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট।

194 রিপোর্ট অফ অ্যা, সিম্পসন, সুপারিন্টেন্ডেন্ট , ইনসেন অ্যাসাইলাম ঢাকা , মার্চ ১৮৬৩, *Simpsons mentioned in the reporte - Soorkie pounding is a suitable work, easily taught, and ruminative. In pounding soorkie they sit on the ground with a stone before them and use a small iron breaker of the from here delineated; it weighs two and a quarter seer; more work could be done by using the dhinkee.*

195 রিপোর্ট অফ অ্যা, সিম্পসন, সুপারিন্টেন্ডেন্ট , ইনসেন অ্যাসাইলাম ঢাকা , মার্চ ১৮৬৩, *Tin-smith's work. --During the past year one of the criminal Lunatics has been taught tin-smiths' work. He was apprenticed for three months to a tin man in the bazar, going to his shop for the day. He can now do common work, and has been able to make up new tin plates, repair old ones, and latterly he has been able to make tin splints, &c., for the Hospitals. A non-criminal Lunatic, who took a fancy to the work, has been taught by him since he has carried on work in the Asylum. This criminal Lunatic, when not employed in tin man's work, works as a carpenter.*

তাদের সবচেয়ে লাভজনক উৎপাদন হল বাঁশের মোড়া, এবং এই কথা বলতে গিয়ে আমি দেখেছি যে, যদিও তাদের লোহার দা (ছুরি) দিয়ে কাজ করতে দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা বাঁশ চিড়াতে ও পরিষ্কার করতে পারে (উন্মাদাশ্রমের দায়িত্ব নিয়ে আমার মনে হয়েছিল যে এটি হল সবচেয়ে বিপজ্জনক অস্ত্র যা উন্মাদদের হাতে দেওয়া যেতে পারে), তবুও একজনও রোগী সেই দাকে ব্যবহার করেনি তাদের নিজেদের বা তাদের সহরোগীদের আহত করতে অথবা তাদের রক্ষকদের বিরুদ্ধে ।

যে যুগে মনোরোগ বিষয়ে জ্ঞান জনপ্রিয় হচ্ছিল এবং যখন নতুন নতুন চিকিৎসা বিকশিত হচ্ছিল, তখন কেবলমাত্র নেটিভদের জন্য উন্মাদাশ্রমে জোর দেওয়া হতো কাজ এবং লাভের উপর।এই বার্ষিক রিপোর্টগুলিতে চিকিৎসা কখনই অগ্রাধিকার তালিকায় ছিল না। অ্যাসাইলাইমের উৎপাদন দ্বারা অর্থ উপার্জন এর বিষয়ে ১৮৬৩, ১৮৬৪ এবং ১৮৭০ সালের রিপোর্টগুলি অনেক বেশি সংগঠিত ছিল ১৮৬২ সালের রিপোর্টের তুলনায় । প্রতিটি উন্মাদাশ্রমের পরিচয়ের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় "কাজ ও পেশা"-র বিভাগটিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। চিকিৎসার গুরুত্ব সম্পূর্ণরূপে লোপ পেয়েছিল, যা দেখা গিয়েছিল ১৮৬৪ সালের "জেনারেল ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট"-এর উপ-শিরোনামে। পেন লিখেছেন, এই শিরোনামের অধীনে বিশেষভাবে রিপোর্ট করার জন্য কিছুই ছিল না গত বছরগুলিতে যা হয়ে এসেছে তার থেকে কোনো পরিবর্তন ছিল না । তা হলেও রোগীদের নাম এবং পেশার রেজিস্টার ছিল, কিন্তু রিপোর্টে আরও বেশি করে লাভের সারণি বিবৃত ছিল, উন্মাদাশ্রমের অন্যান্য বিষয়গুলির তুলনায়। প্রতিটি উন্মাদাশ্রম তাদের তথ্য আলাদা আলাদা সারণিতে লিপিবদ্ধ করেছিল, যেগুলির শিরোনাম ছিল উন্মাদদের শ্রমের ফলে লাভের বিবৃতি যে উন্মাদাশ্রমের ক্ষেত্রে সেটি প্রযোজ্য ছিল। এই প্রকার সারণিতে ছিল কাজের মূল্য-মান, পণ্যের বাজারের মূল্য-মান এবং সেই বছরের ক্ষেত্রে কতটা লাভ হয়েছে। যদি ব্রিটিশরা সত্যিই মনে করত যে উন্মাদগ্রস্ততার চিকিৎসা হিসাবে কাজ কার্যকরী হয়, তবে সেই উন্মাদদের চিকিৎসাতে লাভের সারণিগুলি ঠিক কী উদ্দেশ্য সাধিত করতো?

ইংল্যান্ডে কপর্দকহীন এবং ভবঘুরেদের নিয়ে ধারাবাহিক বিবাদ ব্রিটিশরা যেভাবে ভারত শাসন করত তাকে প্রভাবিত করেছিল। এই সমস্যার সাথে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহজাত আতঙ্ক,

ব্রিটিশদের বাধ্য করেছিল ভারতের বাংলা অঞ্চলের যাযাবর এবং ভবঘুরেদের প্রতি আক্রমণ উপেক্ষা করতে। ব্রিটিশরা ভারতের ভাবঘুরে ও তপস্যার আধ্যাত্মিক ধারণা বুঝতে বা গস্থহণ করতে পারে নি। বস্তুতান্ত্রিক জগতকে প্রত্যাখ্যান করে দারিদ্র্য বরণ করা এক আধ্যাত্মিক প্রথা ছিল যার অস্তিত্ব ছিল ৫০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের আগে থেকে [196]। বিদ্রোহের পর, ব্রিটিশরা নিজেদের অসুরক্ষিত মনে করতে থাকে, যার কারণে তারা নিরাপত্তা আঁটোসাটো করতে থাকে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় ভবঘুরেদের প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা। অস্থায়ী দলের প্রতি বিরাজমান অবিশ্বাস নেতিবাচকভাবে সারা ভারতে সাংস্কৃতিক প্রথার উপর প্রভাব ফেলেছিল। যাযাবর উপজাতি ও বর্ণের প্রথা ব্রিটিশদের আদর্শ দায়িত্বান জীবনযাপন থেকে অনেকটাই আলাদা ছিল। ভারতীয় সংস্কৃতি না বোঝার কারণে তারা জোর কওে  যাযাবর উপজাতি-দের স্থায়ী বসবাস করাতে চেয়েছিল, যার ফলে দেশীয় মানুষদের উপর নেমে এসেছিল সংস্কৃতিগত এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়, যার ফলে আরও বিদ্রোহ এবং আইন হয়েছিল; এই চক্রাকার সমস্যা যাযাবরদের চলাচলে আরও বাধা সৃষ্টি করেছিল। বিভিন্ন আইনগুলি, যেমন ১৮৬৯ সালের হ্যাবিচুয়াল ক্রিমিনালস অ্যাক্ট (Habitual Criminals Act) এবং ১৮৭১ সালের ক্রিমিনাল ট্রাইবস অ্যাক্ট (Criminal Tribes Act), এমন শব্দবন্ধ ব্যবহার করা হয়েছিল যা সম্পূর্ণ একটি জাতিকে অপরাধপ্রবণ হিসাবে তকমা দিয়ে দিয়েছিল, যার ফলে তাদের চিহ্নিত করা হয়েছিল সামাজিক উপদ্রবকারী হিসাবে, কোনো আদালতের রায় পাশ না করিয়েই। এই দুটি আইনের দ্বারা ব্রিটিশরা ১.৩ কোটি মানুষকে  অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করে দিয়েছিল। এটি দেখায় যে ব্রিটিশরা ভারতের স্থায়ী হিসাবে বসবাস করে না এমন মানুষদের কতটা ভয় পেত, এবং উন্মাদাশ্রম হচ্ছে সেই অগনিত পন্থার একটি ক্ষুদ্র উদাহরণ যার দ্বারা ব্রিটিশরা ভারতের জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল।

ব্রিটিশরা যেহেতু যাযাবরও ভবঘুরেদের বিশেষ করে সীমাবদ্ধ করতে চেষ্টা করছিল,তাই উন্মাদাশ্রমে ভর্তি হওয়ার সময়ে সবচেয়ে সাধারণ প্রশ্ন হতো, তোমার নাম কী আর তোমারপেশা

---

[196] দ্যা রেকর্ড অফ গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল,এন: XXVIII। রিপোর্ট অফ দ্যা অ্যাসাইলামস ফর নেটিভ ইনসেন পেসেন্টস, এট দুলুন্দা, ফর ১৮৫৭ , জন গ্রে, ক্যালকাটা গেজেট অফিস,

কী ? এটির প্রমাণ উন্মাদাশ্রমের বার্ষিক রিপোর্টগুলিতে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যদি দালুন্ডা উন্মাদাশ্রমেররেজিস্টার পরীক্ষা করে দেখা হয়, তবে ১৮৬২ সালের রিপোর্টে দেখা যাবে ২১৪ জন পুরুষের মধ্যে ১৪৩ জন, এবং ৫৯ জন মহিলার মধ্যে ৫৮ জনের ক্ষেত্রে লেখা হয়েছিল পেশা জানা নেই অথবা ভিখারি। ১৮৬৩ সালের রিপোর্টে ১৮১ জন পুরুষের মধ্যে ১৫৩ জনের ক্ষেত্রে লেখা হয়েছিল পেশা জানা নেই/ভিখারি, এবং ৪৮ জন মহিলার মধ্যে সবার পেশা লেখা হয়েছিল গৃহবধূ। ১৮৬৪ সালের রিপোর্টে ২৩৮ জন পুরুষের মধ্যে ২০৪ জনের ক্ষেত্রে লেখা হয়েছিল পেশা জানা নেই/ভিখারি, এবং ৫৯ জন মহিলার মধ্যে সবার পেশা লেখা হয়েছিল গৃহবধূ। এই পরিসংখ্যান পরিদর্শন করে যে ব্রিটিশরা নির্দিষ্টভাবে তাদের লক্ষ্য করেছিল সেই মানুষদের যারা ব্যাখ্যা করতে পারেনি কেন তারা লাভজনকভাবে নিয়োজিত নয় অথবা কেন তারা বাংলা যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। আটক করে, ব্রিটিশরা তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করেছিল, যাদের তারা মনে করেছিল ভারতীয় সমাজের অনিশ্চিত সদস্য এবং ব্রিটিশদের ক্ষেত্রে একটি সম্ভাব্য ঝুঁকি হতে পারে। বাংলার উন্মাদাশ্রমে উন্মাদদের আসল চিকিৎসার প্রমাণ যথেষ্ঠ সন্দেহজনক। এই সময়ে সরকারী নীতি ছিল রোগীকে দয়া দেখিয়ে ও বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ন্ত্রণ করার ইউরোপীয় ধারণা অনুসরণ করা”[197]। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যকর খাবার-দাবার রোগীদের চিকিৎসার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এবং এতে কোনো আপোষ করা সম্ভব ছিল না। রিপোর্টে বিস্তারিত লেখা ছিল কীভাবে সব রোগীরা দৈনিক স্নান করতো এবং যাদের নিয়ন্ত্রণ করা যেতে না বা যারা অপারগ কীভাবে তাদের জন্য সরষের খুলি (সরষে বাটা) প্রয়োগ করা হতো। এয়াড়াও সুপারিন্টেন্ডেন্টরা রেকর্ড করেছিলেন কীভাবে কয়েকবার শারীরিক চিকিৎসা ব্যবহার করা হয়েছিল, কিন্তু সেই বর্ণনা খুব সংক্ষিপ্ত ছিল এবং সহজেই তাদের নাকচ করা যায়। পেন বলেছেন যে ,“ফোস্কা দেওয়া, প্ররোচনা দেওয়া এবং অন্যান্য অস্ত্রোপচারের পদ্ধতি মাঝেমাঝে প্রয়োগ করা হলেও সেটি স্ট্রেট ওয়েস্টকোটের মতোই অপ্রয়োজনীয় ছিল”। মিলস চিকিৎসা বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন যেমন জোর করে খাওয়ানো এবং

---

[197] মিলস, জেমস এইচ, ম্যাডনেস, ক্যান্নাবিস অ্যান্ড কলোনিয়ালিসম, দ্যা 'নেটিভ-অনলি' লুনাটিক অ্যাসাইলাম অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, ১৮৫৭-১৯০০, ম্যাকমিলান প্রেস, লন্ডন, ২০০০, পৃ- ৭১

হাইড্রোথেরাপি, কিন্তু এই বিষয়ে তাঁর ব্যাখ্যাও যথেষ্ঠ সংক্ষিপ্ত (Mills, ২০০০)। মনোরোগের ক্ষেত্রে যে সীমিত জ্ঞান লভ্য ছিল তা নথিপত্র থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু রোগীদের বিষয়ে চিকিৎসাগত কোনো চিন্তা থাকতো না, তাও কিন্তু পরিষ্কার বোঝা যায়। এই সব স্থানের লক্ষ্য রোগীদেও নিরাময় করা ছিল না, সেইসব রোগীদের কাজ থেকে লাভ করাই ছিল তাদের আসল উদ্দেশ্য।

*Statement of profit of the Labour of the Lunatic Asylum at Dacca for the year 1867*[198]

| Nature of Occupation. | Amount Profit Rs. | As. | P. | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Carpentering………………… ……………………… ……… | 2 | 12 | 1 0 | Daily average number of lunatic confinements …… 210 Daily average number of lunatics employed168.60 |
| Gardening ………………… ………………………. …………. | 78 | 8 | 1 | |
| Lunatic labour ………………. ………………….. ………… | 128 | 11 | 4 | |
| Extracting oil ……………………… ………… ……………….. | 61 | 14 | 11 | |
| Soorkee Pounding …………… ………………… ……….. | 191 | 5 | 6 | |
| Basket and morah making …………………... ………………. | 1 | 4 | 9 | |
| Rope and net making ……………... ……………….. … | 0 | 9 | 0 | |
| Estimated value of stores……………… …………… ….. | 160 | 0 | 0 | |
| Add estimated labour, as per Statement No.10, for which case is not received ……… | 3,792 | 15 | 0 | |
| Total Rs. | 4415 | 15 | | |

অ্যাসাইলাম বা উন্মাদ আশ্রম বিষয়ক জ্ঞানচর্চা ঔপনিবেশিক ভারতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। ১৮৫৮ সালে নতুন লুনাসী অ্যাক্ট তৈরি বুঝিয়ে দেয় যে সরকার মানসিক রুগীদের নিয়ে পরিকল্পিতভাবে কাজ করতে চায়। সেই প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে ঔপনিবেশিক সরকার গড়ে তোলে এক বিশেষ নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্র। যা উনবিংশ শতকে লেখা পাগলা গারদ বিষয়ক নানাবিধ রিপোর্ট এর মাধ্যমে যেখানে গড়ে তোলা হয় এক বিশেষ ধরনের জ্ঞানচর্চা, যার কেন্দ্রে রয়েছে নেটিভ পাগল। কারণ বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে এখানেই আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠালাভ হয়েছিল ঔপনিবেশিক শাসনে[199]। বাংলা , বিহার ,অসম আর ওড়িশা

198 অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল ফর দ্যা ইয়ার ১৮৬৭ , ডবলু.এ গ্রীন, ইনস্পেক্টর জেনারেল অফ হসপিটাল, লোয়ার প্রভিন্সেস, ক্যালকাটা

199 ভট্টাচার্য, জয়ন্ত সম্পাদিত , ভারতের পটভুমিতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস, অমিত রঞ্জন বসু, পাগলামি বিষায়ক নতুন জ্ঞান’ উনিশ শতকের বাংলায় পাগলাগারদের মন চিকিৎসা চর্চা ,অবঘাস, কল্কাতা,২০০৯ পৃষ্ঠা নং ২১০

নিয়ে গড়া এই প্রেসিডেন্সিতে পাগলাগারদের সংখ্যা খুব একটা কম ছিল না । তাছাড়া রাজধানী হবার সূত্রে মানসিক চিকিৎসা বিষয়ে নানাবিধ নীতিগত সিদ্ধান্তও এখানে নেওয়া হত।

## উপসংহার

ইউরোপের উপযোগবাদ, হিতবাদী দর্শন, খ্রিস্টীয় মানবিকতা ব্রিটিশ ভারতের শাসককুলকে জনকল্যাণকর আদর্শ ও কর্মে প্রণদিত করেছিল এই ডিসকোর্স ইতিহাস মহলে প্রচলিত। বলা হয় বেন্টিঙ্ক , রিপন প্রমুখ শাসকের প্রশাসনিক সংস্কার উনবিংশ শতাব্দীর এই জনপ্রিয় দর্শনকেই পুষ্ট করেছিল । ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরাও জনকল্যাণমূলক সংস্কার কর্মের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শাসকরা এদেশে প্রাচ্যদেশীয় স্বৈরাচারের জায়গায় জ্ঞানদীপ্ত উদার মানবিকতার তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। কথাটি কতদূর সত্যি , কিংবা আদৌ সত্যি কিনা , সে-নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে বিতর্ক আছে । যারা প্রচলিত এবং প্রতিষ্ঠিত নিয়মবিধিকে ভঙ্গ করে , সমাজে যাদের ভাবনা এবং কর্মসম্পাদনা সামাজিক শৃঙ্খলার পক্ষে বিপজ্জনক , ঔপনিবেশিক শাসক তাদেরকে সমাজ জীবনের সীমান্তে রাখার চেষ্টা করেছিল । আর যারা সামরিক, বেসামরিক বা নাগরিক আইন ভঙ্গ করতো , তাদের জন্য বানিয়েছিল জেলখানার মতো প্রতিষ্ঠান। কিংবা স্বাস্থ্যহীনতা এবং শরীর সমাজে ব্যাধিসংক্রমণের সম্ভাবনা সৃষ্টি করত , সরকার তাদের জন্য তৈরি করেছিল হাসপাতাল । একইভাবে , যাদের আচার, আচরণ , কথাবার্তা সমাজের প্রচলিত ঔপনিবেশিক বিধিব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন কিংবা অসংলগ্ন মনে হতো , সরকার তাদের জন্য তৈরি করেছিল উন্মাদ আশ্রম।

সুতরাং এর মধ্যে ঔপনিবেশিক সরকারের শুভেচ্ছা এবং হিতাকাঙক্ষা যতটা প্রবল ছিল , তার চেয়ে প্রবলতর ছিল সমাজ এবং রাষ্ট্রকাঠামোকে সুস্থির এবং সংযত রাখার প্রচেষ্টা । ফলে শরীর, যা নিতান্তই ব্যক্তি সংস্থান, তাকে ব্যক্তিগত আয়ত্ত থেকে বৃহত্তম সামাজিক প্রয়োজনের আওতায় আনা হয়েছিল। শরীরের এই সামগ্রিক সামাজিকীকরণ বাংলায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদের একটি বিশিষ্ট দিক । পাগলাগারদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে ঔপনিবেশিক সরকারের এই স্বরূপটি ধরা পড়ে। নামে পৃথককৃত সামাজিক নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা হলেও, এই নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টার মধ্যেও বৃহত্তর

রাজনৈতিক ও আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটটি সরকার আড়াল করতে পারেনি। জেল, হাসপাতাল ও উন্মাদ আশ্রমের বাইরে, ব্রিটিশ সরকার ঔপনিবেশিক নীতির যে কেন্দ্রীয় সত্যটি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল তা হলো উত্তরোত্তর অর্থসংস্থান ও রাজস্ববৃদ্ধি , যার দ্বারা ব্রিটিশ বাণিজ্য-ব্যবস্থার সুস্থির উন্নয়ন ঘটানো যায়। উন্মাদ আশ্রম প্রতিষ্ঠানের মতো স্বতন্ত্রকারী সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টাতেও এই ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছিল ।

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় এসেছিল অর্থ লিপ্সার সন্ধানে । এই সহজ সত্যটি পাগলাগারদের গল্পেও প্রতিষ্ঠিত । তারপর ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে শ্রেণী বিভাজন , বর্ণবিদ্বেষ , স্বজাতিগর্ব এই সূত্রেই সে কায়েম করেছিল । রাষ্ট্রকাঠামোয় সরকার যেমন পদমর্যাদার ক্রমবিন্যাস করেছিল , পাগলাগারদেও সেই পদক্রম বজায় ছিল । পাগলাগারদের কর্মী সংগঠনে জাতি , বর্ণ , শ্রেণী অগ্রাধিকার পেত । সুতরাং দেখা যাচ্ছে , ঔপনিবেশিক বাংলায় পাগলাগারদ প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে সরকারের মানবিক সদিচ্ছা যতটা না প্রকাশিত , তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি উচ্চকিত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বর্ণগরিমার ভূমিকাটি। পাগলাগারদেও সুস্থ সরকারের জাতিগৌরব ও সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা রীতিমতো বিচ্ছুরিত ।

জ্ঞানের অহমিকা , মানবিকতার দোহাই এবং নিজেদের বেশি শিক্ষিত প্রমাণ করার চেষ্টা রয়েছে , তাদের লিখিত বয়ানের ছত্রেছত্রে । রিপোর্টগুলিতে দেখা যায় বর্ণ , জাতি ও শ্রেণি , সবরকমের বৈষম্যের নিরিখে যারা তলায় , তাঁদের অশেষ দুর্ভোগ পোহাতে হত । পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে যে বেশিরভাগ রুগীরই মৃত্যু হত ভিতরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে ডায়ারিয়া আর অন্যান্য সংক্রমণে । চিকিৎসা বলতে আটক রাখা , মাঝে মধ্যে মরফিয়া জাতীয় ওষুধ দেওয়া , আর বিনা পয়সায় খাটানো । এই খাটুনি থেকে কর্তৃপক্ষ ভালোই মুনাফা করত।

উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক কাঠামোয় বাংলায় পাগলাগারদের মনশ্চিকিৎসাবিদ্যার যে ভাষ্যগুলি উপস্থাপন করলাম তার প্রধান দিক ছিল পাগলকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য নানারকম নিয়মাবলি তৈরিতে। আর চিকিৎসার ব্যাপারটা বেশ আরবিট্রারি বা আন্দাজি ছিল। পাগলা গারদগুলি গড়ে

তোলা হয়েছিল ইউরোপের বাঁধন-হীন চিকিৎসার ধারণায় এবং আইন শুধু তাদেরই আটকে রাখতে চেয়েছিল যারা আদালত ও ডাক্তারের দ্বারা চিহ্নিত হবে  পাগল  বলে। কিন্তু বিংশ শতকের প্রথম অর্ধে  পাগলদের নিয়ে দেশীয় উদ্যোগে  যে চিকিৎসা সুরু হয়ে তা ছিল সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ।

যে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসন খুতা ক্ষমতা লাভ করার লক্ষ্য নিয়ে চলেছিল, এর  প্রয়োগ হয়েছিল জনসাধারণের স্বাস্থ্য পরিচালনা মাধ্যমে, যার একটি  বিশেষ ক্ষেত্র উন্মাদাশ্রম। দেশীয় জনগণের উত্থান ঘটানোর ভিক্টোরীয় নীতি ব্যবহার করা হয়েছিল যাতে সত্যিকারের মানসিকভাবে অসুস্থ নয় তাদের জন্য যুক্তি তৈরি করা যায়। কিন্তু উন্মাদাশ্রমের পণ্য থেকে যে অর্থ পাওয়া গিয়েছিল, তা সেই উন্মাদাশ্রমের ভালোর জন্য পুনর্বিনিয়োগ করা হয় নি।

পরিশেষে বলা যায় ভারতে কেবলমাত্র নেটিভদের জন্য উন্মাদাশ্রমে এমন কোনো নিস্তার ছিল না। ব্রিটিশদের লক্ষ্য কখনই রোগমুক্তি ছিল না; যেকোন প্রকারে লাভ করাই ছিল তথাকথিত উন্মাদ -দের আটক রাখার মূল উদ্দেশ্য। উন্মাদাশ্রমে, যাযাবর এবং ভবঘুরেদের হিসাব রাখা যাবে, যা আতঙ্কিত ব্রিটিশদের নিরাপত্তার ঝুঁকিকে কমাতে পারবে। ভিক্টোরীয় নীতি ব্রিটিশদের যুক্তিকে পুষ্ট করেছিল যে কাজ জগতের সমস্ত কুপ্রভাব কাটিয়ে দিতে পারবে। আর এর পরিবর্তে ব্রিটিশরা সেই চিকিৎসা  থেকে লাভ করতে পারবে। ব্রিটিশরা দাবী করেছিল যে আটক রাখার তাদের ব্যবস্থা ছিল তাদের নৈতিক দায়বদ্ধতা ও তাদের চিকিৎসার পদ্ধতির অংশ, কিন্তু শেষ হয়ছিল তাদের লাভ দিয়ে, মনোরোগের উন্নতিসাধন দিয়ে নয়।

গোটা উনবিংশ শতক জুড়ে আলোকপ্রাপ্তি আর প্রগতির দোহাই দিয়ে নেটিভ পাগল নিয়ন্ত্রণের জন্য এক নতুন ব্যবস্থা আর জ্ঞানচর্চা শুরু হল তার ভিত্তি এদেশে ততটা সুসংবদ্ধ বা দৃঢ় ছিল না। তার একটা বড় কারণ এক ভিন্ন সংস্কৃতির সাথে এই ব্যবস্থার যে সু-সম্পর্ক তৈরি করে নিজেদের লিপ্সা কে পরিপুরন করা , কারণ সেই সংস্কৃতির নানা স্তরে তৈরি হচ্ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ । একদিকে উন্নত ও সভ্য হবার দাবি প্রমাণের জন্য এখানকার প্রায় সবকিছুই কুসংস্কার , অযৌক্তিক ও অবিকশিত বিষয় হিসাবে চিহ্নিত এবং ঘোষিত হতে লাগল।  অপরদিকে এই যে

উপনিবেশায়িত শিশুসুলভ ভারতীয় কে সাবালক করার লক্ষ্যে যে কার্যক্রম তৈরি করা হয়েছিল তার পশ্চাতে গভীর দুরাভিসন্ধি কে কাজে লাগিয়েছিল উন্মাদ আশ্রম প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ।

ঔপনিবেশিক শাসকদের সৃষ্টি করা জ্ঞানে যাকে পাগল বলে মনে হতো সেটা সর্বদা বাংলার স্থানীয় জ্ঞানচর্চার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। পাগল সাব্যস্ত করতে যে সব লক্ষণগুলিকে তারা নথিভুক্ত করত স্থানীয় মানুষদের জ্ঞানচর্চার সঙ্গে সেগুলো যথাযথ ছিল না। কিন্তু সেই অসঙ্গতি পরিপূর্ণ হয়েছিল বিংশ শতকের প্রথম অর্ধে, যখন দেশীয় উদ্যোগে মানসিক রোগ চিকিৎসার যাত্রা পথ সূচনা হয়েছিল। যার প্রধান রুপকার ছিলেন গিরিন্দ্র শেখর কিংবা কবিরাজ অতুল বিহারী দত্তের মতো চিকিৎসকরা। প্রকৃত পক্ষে ঔপনিবেশিক বাংলায় মানসিক রোগ চিকিৎসার উন্নতি বিধানের ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ান সাইকো অ্যানালিক্যাল সোসাইটি, লুম্বিনী পার্ক মানসিক হাসপাতাল কিংবা বঙ্গীয় উন্মাদ আশ্রমের মতো প্রতিষ্ঠানগুলি যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল ।

# তৃতীয় অধ্যায়

# ঔপনিবেশিক বাংলার মানসিক হাসপাতাল

## ( ১৯০০ ১৯৪৭ খ্রীঃ )

বঙ্গদেশে মানসিক হাসপাতালের উদ্ভব ও বিকাশ কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না। একটি দীর্ঘ যাত্রার মধ্য দিয়ে উন্মাদ আশ্রম থেকে মানসিক হাসপাতালে উত্তরণ হয়েছিল। এদেশে উনবিংশ প্রথম দিকে মানসিক হাপাতাল নামে স্বতন্ত্র কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না , পাগলাগারদেই সাধারণ চিকিৎসার মাধ্যমে উন্মাদ রোগীদের কে চিকিৎসা করা হত। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে মানসিক হাসপাতালের ইতিহাস কে অন্বেষণ করতে গেলে উনবিংশ শতকের চিকিৎসা সংক্রান্ত বিভিন্ন চিন্তা ধারার মধ্যে তার ভিত্তি নিহিত ছিল। ঔপনিবেশিক আমলে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মনোরোগের চিকিৎসার জন্য আলাদা বিভাগ চালু হয়। যার ফলশ্রুতিতে বিংশ শতকের প্রথম দিকে এদেশে চিকিৎসা বিজ্ঞানের শাখা হিসাবে মনোচিকিৎসার সূচনা হয়।

প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রে উন্মাদ রোগের বর্ণনা পাওয়া যায় দুটি সুপরিচিত আকর গ্রন্থে, যথা চরক সংহিতা এবং সুশ্রুত সংহিতা , এই দুটি গ্রন্থ দেশীয় পদ্ধতিতে উন্মাদ চিকিৎসার মূল ভিত্তি স্থাপন করেছে। এছাড়াও অথর্ব-বেদ মানসিক অসুস্থতার কথা উল্লেখিত হয়েছে। সিজোফ্রেনিয়া এবং বাইপোলার ডিসঅর্ডারের মতো অবস্থার বর্ণনা বৈদিক গ্রন্থে পাওয়া যায়। অথর্ব- বেদেও সিজোফ্রেনিয়ার একটি প্রাণবন্ত বর্ণনা পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারতে ঐতিহ্যগত চিকিৎসা ব্যবস্থা সিদ্ধ পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরণের মানসিক ব্যাধিকে চিকিৎসা করা হতো , আবার মধ্যযুগে নাজাবুদ্দিন-উন-হাম্মাদ (১২২২ খ্রিস্টাব্দ) নামক একজন ভারতীয় চিকিৎসক ইউনানী চিকিৎসা পদ্ধতিতে দরবারী শিফাখানা তে পাগল চিকিৎসা করতেন। কারণ তিনি সাত ধরনের মানসিক ব্যাধি বর্ণনা করেছেন; *সওদা-আ-তাবী* ( সিজোফ্রেনিয়া ); *মুরী-সওদা* ( বিষণ্ন পাগল ); ইশক (প্রেমে পাগল ) ; নিস্যান ( জৈব মানসিক ব্যাধি) ; হাজিয়ান (প্যারানয়েড স্টেট) এবং মালিখোলিয়া-আ-মারাকি ( প্রলাপ)। উন্মাদনা চিকিৎসা ইউনানী

পদ্ধতিতে ইলাজ-ই-নফসানি নামে  পরিচিত ছিল। কিন্তু প্রাক  ঔপনিবেশিক  সমাজে পাগলদের পৃথকীকরণ বা তাদেও জন্য আলাদা কোন চিকিৎসালয় ছিল না। মানসিক হাসপাতালের ধারণা টি এসেছিল ঔপনিবেশিক সময়কালে, বিংশ শতকের প্রথমঅর্ধে এর যাত্রাপথ শুরু হয়েছিল। ঔপনিবেশিক অধ্যায়ে পাগল চিকিৎসার একটি মূলকেন্দ্র ছিল বাংলা প্রেসিডেন্সী। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে রাঁচির মানসিক হাপাতালের কথা ।

## অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন

বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীতে বেশিরভাগ মানসিক হাসপাতাল ঔপনিবেশিক  যুগে নির্মিত হয়েছিল। সেই সময়ে ব্রিটিশ উপনিবেশ গুলিতে  মানসিক রোগের চিকিৎসা বিষয়ে যেসব  পরিবর্তন ঘটছিল সে সবই চালু করার ব্যাপারে ঔপনিবেশিক কর্তাদের একাংশও বিরোধী ছিল  এবং পাগলাগারদ কে কেন্দ্র করে  যে আধুনিক মনশ্চিকিৎসার জ্ঞান-উৎপাদন শুরু হল , তার বিশেষ আদলটি তৈরি হয়েছে আশ্রম প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে, মূলত এই অধ্যায়ে উদাহরন দিয়ে আনুসন্ধান করেছি  পাগলাগারদের ইতিহাস থেকে কিভাবে মানসিক হাসপাতালের উত্তরণ হল। কারণ এখানেই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক চিকিৎসাবিদ্যা তার উৎকর্ষের নমুনাগুলিকে নির্মাণ করেছিল। এরপর  আলোচ্য অধ্যায়ে সরকারি মুখপত্র  ইন্ডিয়ান মেডিকেল গেজেট  ও ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ সাইকোলজির  প্রতিবেদনের সূত্রের মাধ্যমে মানসিক হাসপাতালে রোগীদের কে কিভাবে দেখা হতো সেগুলি আলোকপাত করেছি। অনুসন্ধানের কেন্দ্রে থাকবে উনিশ শতকের  থেকে বিংশ শতকের মধ্যবর্তী কালীন সময় পর্যন্ত (১৯০০-১৯৪৭ খ্রীঃ)  ঔপনিবেশিক বাংলায় মানসিক আশ্রম কে কেন্দ্র করে রোগ নিরাময়েরমনোচিকিৎসা সংক্রান্ত বিভিন্ন কিভাবে জ্ঞানের গড়ে উঠেছিল সেই প্রশ্নটি।  এছারাও আলোচ্য অধ্যায়ে অন্যান্য যে প্রশ্নগুলি অনুসন্ধান করার চেষ্টা করবো সেগুলি হল - মানসিক হাসপাতালের উদ্ভব ও বিকাশের কিভাবে হয়েছিল? দেশীয় প্রচেষ্টায় মানসিক হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা কিভাবে হয়েছিল ? মানসিক হাসপাতালগুলির পরিকাঠামো গুলি কেমন ছিল? এছাড়াও ঔপনিবেশিক শাসকরা  মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি কি ভূমিকা পালন করেছিল ?

আলোচ্য অধ্যায়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল“ উন্মাদ আশ্রম থেকে মানসিক হাসপাতালে উত্তরণ” সময়কাল হিসাবে এই অধ্যায় ঊনিশ শতকের প্রথম পর্ব থেকে বিংশ শতকের প্রথম অর্ধ পর্যন্ত নির্বাচন করেছি , অর্থাৎ ১৯০০ খ্রীঃ থেকে ১৯৪৭ খ্রীঃ পর্যন্ত সময়কালে বাংলার বিভিন্ন মানষিক হাসপাতালগুলির ইতিহাস সংক্ষেপে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি । দ্বিতীয় পর্বে ১৯০১ থেকে ১৯৪৭ খ্রীঃ পর্যন্ত মানসিক হাসপাতাল কেন গড়ে উঠেছিল তা আলোচনা করেছি । এই পর্বে বঙ্গদেশে উন্মাদ আশ্রমের বদলে যে মানসিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তার ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে । এক্ষেত্রে ইন্ডিয়ান লুনাসি পলিসি -১৮৫৬ , ইন্ডিয়ান লুনাটিক এসাইলাম অ্যাক্ট ১৮৫৮ , দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট - ১৯১২ ইত্যাদি বিষয়গুলি পর্যালোচনার পাশাপাশি উক্ত নীতি ও আইনের সারমর্ম ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য আলোচিত হয়েছে এবং বিভিন্ন উন্মাদ আশ্রমের স্থানান্তরনের বিষয় ও নতুন মানসিক হাসপাতাল কোথায় কোথায় স্থাপিত হয়েছিল সেগুলি কালানুক্রমিক অনুসারে পর্যালোচনা করেছি । যেমন -, গাবরা লেপার অ্যাসাইলামে মানসিক ওয়ার্ড (১৯১৬) , কেন্দ্রীয় মানসিক হাসপাতাল, রাঁচি (১৯২৫) , মানকুন্ডু মেন্টাল হাসপাতাল (১৯৩৩) বঙ্গীয় উন্মাদ আশ্রম (১৯৩৫) পরবর্তীকালে দত্তনগর মেন্টাল হাসপাতাল ) , কোলকাতা মেডিকেল কলেজ - মনচিকিৎসা বিভাগ (১৯৩৯) , লুম্বনী পার্ক মেন্টাল হাসপাতাল (১৯৪০) , ইত্যাদী হাসপাতালগুলির ঐতিহাসিক বিবরণ আলোকিত হয়েছে। সর্বপরী ঔপৌনিবেশিক শাসনতন্ত্রে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও চিকিৎসা পদ্ধতির সঙ্গে লুনাটিক অ্যাসাইলাম ও মেন্টাল হাসপাতালের যে সম্পর্ক তা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছি ।

## যুগে যুগে মানসিক চিকিৎসার ইতিহাস

আদিম মানুষের কাছে মৃত্যু যেমন ছিল রহস্যজনক , ঠিক তেমনিই বিস্ময়কর ছিল মানুষের অবাস্তব আর অস্বাভাবিক আচরণ। বিচিত্র ঘটনাগুলো তাদেরকে আশ্চর্য করেছে, ভয়ও পাইয়েছে। উৎস সন্ধানে ব্যস্ত হয়েছে পরিত্রাণের পথ খুঁজেছে । আদিম যুগের অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ জেনেছিল , মানুষকে খায় মানুষের চাইতেও শক্তিশালী হিংস্র জন্তু । ভয়ানক সেই দৃশ্যগুলো দেখেছে চোখের সামনেই। মানুষ যখন মরেছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের বলি হয়ে,

তখনও ভেবেছে নিশ্চয় মানুষের চাইতেও শক্তিশালী কোনো জীবন নিজেদের অদৃশ্য রেখে এইভাবে মানুষ হত্যা করে চলেছে । অদৃশ্য এই শক্তিগুলিই কখনো ভূমিকম্প , কখনো প্লাবন, কখনো ঝঞ্ঝা হয়ে তাদের বিনাশ করেছে। মহামারীর প্রকোপে কাতারে কাতারে মানুষকে মরতে দেখেছে একই রকমের দৈহিক কষ্টে কল্পনা করে নিয়েছে নিশ্চয় এর পেছনেও রয়েছে অতি ভয়াবহ প্রবল কোনো হিংস্র শক্তি। চোখে দেখা হিংস্র জন্তু বা হিংস্র মানুষের আক্রমণে মৃত্যুর মতন করেই মানুষের সবকিছু দুঃখকষ্ট আর মৃত্যুর কারণকে বুঝতে চেয়েছে। নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই কল্পনা করে নিয়েছে , নিশ্চয়ই কোনো অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে মানুষের শরীর বা মনের বিকার ঘটছে । আর এই অশুভ শক্তির খোঁজ করতে গিয়েই ভূত , প্রেত , ডাইনি , পিশাচ , ডেভিল , ডেমন , জিন , পরী ইত্যাদির কথা ভেবে নিয়েছে। এইসব অশুভ শক্তিকে দেখা যায় না ; তবে এদের প্রকৃতি যে দুষ্ট , হিংস্র পশু বা মানুষের মতড় সেটা বোঝা যায়। এরা কখনো কখনো মানুষের দেহে প্রবেশ করে দেহ - মনের নানা বৈকল্য ঘটায়। এইসব অশুভ শক্তির মধ্যে যারা অতি-প্রবল , অতি-পরাক্রান্ত , রূপকথা বা পুরাণের দানবের মত, তারাই বৃহৎ প্রাকৃতিক দুর্যোগ , ভয়াবহ মহামারী ইত্যাদি ঘটায় । এদেরকে অপদেবতা আখ্যাও দেওয়া হয়[1] ।

## ভূত, প্রেত ও অপদেবতার ধারণা

মানুষের মনের মধ্যে কিভাবে এল এইসব ভূত - প্রেতের কল্পনা ? কল্পনায় ভূত , প্রেত , আত্মা সব এক হয়ে গেছে। আজও মানুষ বিশ্বাস করে আত্মার অস্তিত্বে। এখানে ধর্মীয় বা দার্শনিক তত্ত্বে যাচ্ছি না। সাধারণ মানুষ আত্মা বলতে কি বোঝে , সেটাই দেখছি। জীবিত প্রাণীর মধ্যে দেহ ছাড়া আরও একটা কিছু থাকে , যাকে দেখা যায় না, যা মৃত্যুর সময়ে দেহ ছেড়ে চলে যায় এবং যার মৃত্যু নেই এই রকম একটা কিছুকেই আত্মা বলে মনে করা হয়। আদিম যুগের মানুষ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের মানুষ পর্যন্ত , অনেকেই বিশ্বাস করে অদেখা আত্মার অস্তিত্বে। কিন্তু কেন ? কারণটা এই : আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের হাতে এমন কিছু তথ্য আছে , যা দিয়ে প্রমাণ করা যায় আত্মার অস্তিত্বে। তথ্যগুলি হচ্ছে : মানুষ মৃত

---

[1] নন্দী, ধীরেন্দ্রনাথ ; মনের বিকার ও প্রতিকার , আনন্দ পাবলিশার্স , কোলকাতা , ১৩৯৯, পৃষ্ঠা – ১৮৭

ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখতে পায় , তার কথা শুনতে পায় , সেই কথা হয় কখনো শাসানি , কখনো অভয়বাণী। গুরুতর রোগীর প্রলাপের মধ্যে মৃত ব্যক্তির , বিশেষ করে মৃত আত্মীয় স্বজনের উপস্থিতি ঘটে। ভর হওয়া মানুষের মধ্যেও মৃত ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটছে , এমনটাও দেখা যায়। দুই ক্ষেত্রেই শুধু মৃতব্যক্তিই আবির্ভূত হয় না , কখনো কখনো দেবদেবীরও আবির্ভাব ঘটে। মানুষের ধারন অনুযায়ী এসব আত্মা অথবা দেবদেবী কখনো হিতকারী , কখনো ক্ষতিকারক।

আবার যখন কোনো মানসিক রোগীর **অবাস্তব** কথাবার্তা আর আচার - আচরণের মধ্যে ধর্মীয় ভাবের লক্ষণ থাকে , লোকে তাদের শ্রদ্ধা করে , তাদের সঙ্গ চায় । আবার যদি কোনো মানসিক রোগী অশালীন , ধর্মবিরোধী আচরণ চালিয়ে যায় , মানুষ তাদের ভয় করে , তাদের কাছ থেকে দূরে থাকতে চায় । পাগলা বাবা , পাগলা ঠাকুর , অথবা ঠাকুর - দেবতার ভর পাওয়া ব্যক্তিরা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে তাই পায় শ্রদ্ধা, ভক্তি ও পূজা । ধর্মবিরোধী আর অসামাজিক আচরণকারী ব্যক্তিদের ধরে বেঁধে রেখে , ওঝা ডেকে তার ভেতরের ভূতকে তাড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়[2] ।

অতীত কাল থেকে মানুষ মনে করতো রোগ , দুঃখ , অশান্তির মূলে রয়েছে ভৌতিক কারণ, এ বিশ্বাস শুধু যে আদিমকালেই ছিল , তা নয় । আজও এইসব ধারণা অপেক্ষাকৃত অল্প শিক্ষিত ও গ্রাম্য সমাজে লক্ষণ বিদ্যমান , এমন কি শিক্ষিত সমাজেও স্ত্রী -পুরুষ নির্বিশেষে অনেকেই এই ভ্রান্ত ধারণার অধীন । সহজেই বোঝা যায় , এইসব ধারণার ভিত কতখানি মজবুত। প্রকৃতির অনেক রহস্য বিজ্ঞানের সাহায্যে আজকের মানষ যেমন উদঘাটন করেছে, তেমনই বুঝেছে , ভূত - প্রেত - অপদেবতা মানুষেরই অবাস্তব কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। প্রাকৃতিক কারণেই মানুষের অসুখ - বিসুখ হয় বিজ্ঞানের বিচারে তা প্রমাণিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও , আদিম কুসংস্কার আর ভ্রান্ত ধারণা রুদ্ধ করে রেখেছে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার পথ।

একটা সময় মনে করা হতো ভূত , প্রেত , অপদেবতা , ইত্যাদি এরা তো সব অশুভ শক্তি। সুতরাং এদেও প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার জন্যে মানুষ শক্তিমান শুভশক্তিকে কল্পনা করে

---

[2] নন্দী, ধীরেন্দ্রনাথ ; মনের বিকার ও প্রতিকার , আনন্দ পাবলিশার্স , কোলকাতা, ১৩৯৯, পৃষ্ঠা – ১৮৮

নিয়েছে। সর্বশক্তিমান সেই শক্তি হিতকারী শক্তি অবশ্যই। অদৃশ্য সেই সর্বশক্তিমানের কাছে নানাভাবে পূজা আর প্রার্থনা জানিয়েছে যাতে তিনি রক্ষা করেন মানুষকে। যে ধারণাটা মানুষকে আনতে হতে বাধ্য করেছে সর্বশক্তিমানের কাছে , মানুষ যদি সর্বশক্তিমানকে পূজা- প্রার্থনা জানিয়ে মেনে চলে, তাহলে তিনি তাদের রক্ষা করবেন; আর মানুষ যদি তাঁর অনুশাসন না মানে, তাহলে তিনি আর মানুষকে রক্ষা করবেন না; ফলে মানুষ ওই সব প্রেতাত্মাদের কবলে পড়বে, তাদের দৌরাত্ম্যের শিকার হবে[3]। ব্যক্তিগতভাবে কেউ যদি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে না মানে , তাহলে শুধুসেই ব্যক্তিই ভুগবে আর মরবে ; আর যদি সমষ্টিগতভাবে অমান্য তাচ্ছিল্য করা হয় ঈশ্বরও তাহলে সমষ্টিগতভাবেই দেশব্যাপী মহামারী আর প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাদের অবিশ্বাস উপেক্ষার মহা সাজা দিয়ে যাবে । এখন দেখা যাক, এই তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে কিভাবে মানসিক রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছিল সেকালে। দেবতার স্থানে নিয়ে যাওয়া হত রোগীদের। পুরোহিত রোগীর নিরাময়ের জন্যে প্রার্থনা জানাত ঈশ্বরের কাছে । এতেও কাজ না হলে , এই ধরনের মানসিক রোগীদের দেহের ভেতর থেকে প্রেতাত্মা কে তাড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হত । প্রেত বিতাড়নের পন্থা ছিল অনেক রকমের । রোগীদের ওপর দৈহিক নির্যাতন করা হত নানাভাবে । যেমন, *চাবুক দিয়ে মারা, গরম লোহার ছাঁকা* দিয়ে দেহে ক্ষত সৃষ্টি করা , শিরা কেটে শরীরের রক্ত বের করে দেওয়া, খাদ্যে কটু দুঃর্গন্ধযুক্ত বস্তু মিশিয়ে খাওয়ানো। কিংবা মাথার খুলিতে ফুটো করে দিয়ে ভূতের বেরিয়ে যাওয়ার পথ করে দেওয়া। এর পরেও ছিল , রোগীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা যাতে ভেতরকার প্রেতাত্মা চিরতরে বিনষ্ট হয়ে যায়[4]। আবার এই হতভাগ্যদের কাউকেই কিন্তু রোগী বলে মনে করা হত না । সুতরাং ভূত-বিতাড়ন পদ্ধতিগুলোও ভূত-প্রেত - পিশাচদের মতই পৈশাচিক । এখন দেখা যাক , মানসিক রোগ চিকিৎসার ইতিহাসে চিকিৎসার কি কি নজির পাওয়া যায়। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ যখন প্রস্তর যুগে গুহায় প্রার্থনা জানাত ঈশ্বরের কাছে ।

মানুষ যখন গুহায় বাস করত , তখনকার দিনের মানুষের মাথার খুলিতে গোলাকার ছিদ্র পাওয়া গেছে। এখনকার দিনে যাকে বলা হয় ট্রেফাইনিং ( trephining ) , এটা সেই শল্যচিকিৎসার

---

[3] নন্দী, ধীরেন্দ্রনাথ ; মনের বিকার ও প্রতিকার , আনন্দ পাবলিশার্স , কোলকাতা, ১৩৯৯, পৃষ্ঠা – ১৯০

[4] তদেব- পৃষ্ঠা- ১৯১

চিহ্ন। ছিদ্রের চারপাশ ঘিরে , নতুন হাড় গজানোর প্রমাণ থাকায় মনে করা যেতে পারে যে সেই ব্যক্তি খুলিতে ফুটো হওয়ার পরেও বেঁচেছিল । ছিদ্র করা হয়েছিল কি কারণে, সেটা অবশ্য অনুমান সাপেক্ষ। তবে ওই ধরনের শল্য চিকিৎসার উপযুক্ত অস্ত্র সে সময়ে ছিল নিশ্চয় এবং সে অস্ত্র পাথর দিয়ে তৈরি । সেই সঙ্গে ছিল এই ধরনের শল্য চিকিৎসার নৈপুণ্য। হয়তো মাথার অসহ্য যন্ত্রণার উপশমের জন্যেই খুলি ফুটো করা হয়েছিল পাথরের যন্ত্র দিয়ে সে যন্ত্রণা মস্তিষ্কের টিউমারের জন্যেও হতে পারে , অথবা মানসিক ব্যাধির জন্যেও হতে পারে। অথবা হয়তো মনোবিকারের কারণ হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছিল , নিশ্চয় অসৎ প্রেতাত্মা ঢুকে বসে আছে মাথার মধ্যে , খুলি ফুটো করে দিয়ে তার বেরবার পথ করে দেওয়া হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের ফুটোওয়ালা খুলি বলেই এত সব অনুমানের মধ্যে যেতে হচ্ছে আমাদের মধ্যযুগে মানুষের মাথায় কেন ছিদ্র করা হত শল্য চিকিৎসার মাধ্যমে ইস্পাতের ট্রেফাইন যন্ত্র দিয়ে , তার প্রমাণযোগ্য তথ্য পাওয়া গেছে । নির্দেশ দিত দেবালয়ের পুরোহিতরা মাথা ফুটো করে প্রেতাত্মাকে টেনে বের করে দেওয়া হোক । মানসিক রোগীদের করোটি ছিদ্র করতে ট্রেফাইনিং যন্ত্র তুলে নিত শল্য চিকিৎসকরা । ভূত , প্রেত , পিশাচ অপদেবতারা মানুষের দেহে প্রবেশ করে মনোবিকার ঘটায় অর্থাৎ আক্রান্ড়ব্যক্তির আচার - আচরণ , অশালীন আর ধর্মবিরোধী হয়ে যায় এই ধারণা প্রাচীন চৈনিক , মিশরীয় , গ্রীক , ভারতীয় আর হিব্রুদের মধ্যে প্রচলিত ছিল । সর্বত্রই ভূত বিতাড়নই ছিল এই রোগের চিকিৎসা। দু - ভাবে করা হত এই ভূত বিতাড়ন ক্রিয়া : দেবতার কাছে পূজা - প্রার্থনা , যাতে দেবতা তুষ্ট হয়ে ভূতকে বিদায় করেন। রোগীর ওপর কিছু দৈহিক নির্যাতন করা ; যাতে ভূতের পক্ষে ওই দেহের আস্তানা অসহ্য হয়ে ওঠে । এই চিকিৎসা হত দেবতার স্থানে , পুরোহিতরা ধর্মীয় ব্যাপারে পৌরোহিত্য করা ছাড়াও চিকিৎসকের কাজও করতেন । অনেক জায়গাতেই চিকিৎসা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত পুরোহিতদের। কোথাও দেবস্থান সংলগ্ন জায়গায় মানসিক রোগীদের রেখে সেইখানেই চিকিৎসা করা হত । কোনো কোনো জায়গায় রোগীদের প্রতি যথেষ্ট মানবিক ব্যবহার করতেন পুরোহিতরা । যেমন, রোগীদের মনোরঞ্জনের জন্যে নানা রকম ব্যবস্থার আয়োজন ।

প্রাচীন গ্রীসের যখন সুবর্ণযুগ, তখনি আবির্ভাব ঘটেছে হিপোক্র্যাটিসের ( খ্রী : পৃ ৪৬০-৩৭৭) । এই হিপোক্র্যাটিসকেই বলা হয় আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক। ইনিও চিকিৎসা বিষয়ে শিক্ষালাভ করেছিলেন মন্দিরের পুরোহিতদের কাছে। মানসিক রোগ বিষয়ে তিনি যা যা বলেছিলেন তা এই মানুষের অসুখ - বিসুখের সঙ্গে দেব - দেবীর অথবা ভূত - প্রেতের কোনো সম্পর্ক নেই। প্রাকৃতিক কারণেই মানসিক রোগ হয় এবং তার চিকিৎসা অন্যান্য রোগের চিকিৎসার মতই হওয়া দরকার ।গ্রীক দার্শনিক পাইথ্যাগোরাসের যেমন ধারণা ছিল মস্তিষ্কই বুদ্ধিবৃত্তির কেন্দ্র এবং মস্তিষ্কের বিকারের ফলেই মানসিক রোগের উৎপত্তি হয়। হিপোর্ক্যাটিসও যথেষ্ট জোর দিয়ে তার পুনরুল্লেখ করেছিলেন । হিস্টিরিয়া রোগ কেবলমাত্র স্ত্রীলোকদেরই হয় এবং এই রোগে যৌন বিক্ষোভ ঘটে, যার ফলে ইউরেটাস শরীরের সর্বত্র বিচরণ করতে থাকে। শরীরের ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত চার রকম শরীরজাত দ্রব্যের কথা তিনি উল্লেখ করেছিলেন । এগুলির মাত্রার তারতম্যের ফলে মস্তিস্কের ক্রিয়া নির্ধারিত হয় সুসম মাত্রায় থাকলে মস্তিস্কের ক্রিয়া স্বাভাবিক থাকে। এদের মাত্রার অসামঞ্জস্য ঘটলে মানুষের শারীরিক ও মানসিক রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এই চার প্রকার দ্রব্যগুলি হচ্ছে : ক) শোনিত ( blood ), খ ) কৃষ্ণপিত্ত ( black bile ), গ ) পীত পিত্ত ( yellow bile ), এবং ঘ ) কফ ( phlegm ) । চরক- সংহিতায় যে বায়ু - পিত্ত - কফের উল্লেখ আছে , তার সঙ্গে বেশ মিল রয়েছে এই গ্রীক তত্ত্বে। হিপোক্র্যাটিসের চিকিৎসা পদ্ধতি যথেষ্ট প্রগতিশীল ছিল এবং তাঁর সময়ে যে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার সূচনা ঘটেছিল, তার ধারা অব্যাহত থাকে গ্রীক - রোম্যান ইতিহাসে গ্যালেন ( ১৩০-২০০) পর্যন্ত। গ্যালেনের মৃত্যুর পরেই ডাকিনীতত্ত্বের ( demonology) পুনরুত্থান হতে থাকে। সেই সঙ্গে ঘোর দুর্দিন শুরু হয়েছিল চিকিৎসার ক্ষেত্রে এবং সেই দুরবস্থা চলেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় শেষ সীমা শবন্ত। মধ্যযুগের শুরু যদি ধরা যায় পঞ্চদশ শতাব্দীতে, তাহলে দেখা যাবে তার আগেই শুরু হয়েছে মানসিক রোগ চিকিৎসার অন্ধকারের যুগ। প্রাচীন গ্রীসের মানসিক রোগ চিকিৎসার বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ইউরোপ থেকে লুপ্ত হলেও আরব দেশে কিন্তু থেকে গিয়েছিল।

# বিশ্বের প্রথম মানসিক হাসপাতাল

বিশ্বের সর্বপ্রথম মানসিক হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছিল ৭৯২ খৃষ্টাব্দে বাগদাদ শহরে । তার অল্প কিছুদিন পরেই দামাসকাস , অ্যালেপ্পো , ইত্যাদি জায়গায়। রোগীদের প্রতি যথেষ্ট মানবিক আচরণ করা হত ওপরের সব কটি চিকিৎসা কেন্দ্রে। মার্কিন ঐতিহাসিক ব্রাউনের লেখা ' আরবীয় চিকিৎসা ' নামক গ্রন্থ থেকে আরব দেশের একজন বিখ্যাত মুসলমান চিকিৎসকের কথা জানা যায় নাম ইবনে- আবু-সিনা ( ৯৮০-১০৩৭ )। আবু-সিনা নিজের ধর্মভাবকে অক্ষুণ্ণ রেখে প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রকে আরবী ভাষায় লেখেন এবং প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতির সঙ্গে তৎকালীন প্রচলিত চিকিৎসার সমন্বয় সাধন করেন । তাঁর লেখা চিকিৎসা শাস্ত্রের একখানি গ্রন্থ সেকালে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিল । নানা দেশে সকল ধর্মাবলম্বী চিকিৎসকের কাছে সমাদৃত হয়েছিল। নানা মানসিক ব্যাধির বিবরণ পাওয়া যায় তার লেখায়। বিশেষ করে একটি জিনিস তিনি লক্ষ্য করেছিলেন : মানসিক বিপর্যয়ে শারীরিক ব্যাধি হতে পারে । এবং মনোচিকিৎসার ( psychotherapy ) প্রয়োগে সেগুলি নিরাময়ও হতে পারে। এই আভিসেনার চিকিৎসক হিসাবেও বিস্তর খ্যাতি ছিল । তাঁর মানসিক রোগ চিকিৎসা প্রয়োগের অপূর্ব কৌশলের প্রয়োগ করতেন[5] ।

---

[5] *উদাহরণ - মানসিক রোগী ছিলেন একজন রাজপুত্র । বিষণ্ণতা রোগে আক্রান্ত । এই রোগের ফলেই মনে জন্মেছে বদ্ধমূল ভ্রান্ত ধারণা — সে যেন একটা পশু । এই ভ্রান্ত ধারণার বশে সে যাকে সামনে পেত , তাকেই ধরে জ্বালাতন করতো আর চিৎকার করে বলত—" আমাকে জবাই করে আমার মাংস রান্না করে তোমরা খাও, শেষে এমন হল যে , খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিল রোগী । এই অবস্থায় আভিসেনাকে বলে রাজী করানো হল বিশেষ এই রোগীর চিকিৎসা করানোর জন্যে । ইবনে-আবু সিনা প্রথমে রোগীর কাছে খবর পাঠালেন— " তুমি নিশ্চিন্ত থাকো ; তোমার কশাই আসছে তোমাকে জবাই করতে " । কিছুক্ষণ পরে ইবনে-আবু সিনা ছুরি হাতে নিয়ে রোগীর ঘরে ঢুকে বললেন- " কোথায় সেই গরু " ? এখুনি তাকে আমি জবাই করব । রোগী তখন দীনভাবে নিজেকে দেখিয়ে বললে " আমি এখানে "। ইবনে-আবু সিনা তখন রোগীর সারা দেহ পরীক্ষা করে বললেন , এ যে বড্ড রোগা , একে এখন মেরে কোনো কাজ হবে না একটু মোটাসোটা হওয়া দরকার । শুনে রোগীর খুব খাবার আগ্রহ জাগল । খুব ভাল ভাল খাবার নিয়মিত দেওয়া হল তাকে । কিছুদিনের মধ্যেই দেহ বেশ পুষ্ট হল , সেই সঙ্গে বিদায় নিল ভ্রান্ত ধারণা । সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল রোগী । চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই ধরনের উপস্থিত এবং বিচক্ষণতার প্রয়োগের দৃষ্টান্ত খুব বেশি পাওয়া যাবে না ।*

# মধ্যযুগে মানসিক রোগের চিকিৎসা

মধ্যযুগের ইউরোপে মানসিক রোগের চিকিৎসা প্রধানতঃ খ্রীষ্টান পাদ্রীদের হাতেই ন্যস্ত ছিল। ২০০ খৃষ্টাব্দের পর থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত মোটামুটি মধ্যযুগ বলা যায়। এই মধ্যযুগের প্রথম ভাগে মানসিক রোগীদের প্রতি সদয় ব্যবহারের কিছু কিছু নজির পাওয়া যায়। এই সময়ে কোনো কোনো স্থানে ধর্মীয় মঠে মানসিক রোগীদের আশ্রয় দেওয়া হত এবং তাদের আরোগ্য কামনা করে ঈশ্বরের কাছে পূজা- প্রার্থনা করা হত।

রোগীদের দেহ থেকে ভূত বিতাড়নের ব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল তবে মৃদু মাত্রায়। যেমন , উৎকট গন্ধ আর কটু স্বাদ বিশিষ্ট গাছ গাছড়ার রস মদের সঙ্গে মিশিয়ে পাঁচন বানিয়ে পান করানো হত। এরপর একটু একটু করে ভূত বিতাড়নের ব্যবস্থা কঠোর থেকে কঠোরতর হতে থাকে। এর মধ্যে উদ্দেশ্যটা ছিল এই যে অদৃশ্য শয়তানটা মানুষের মধ্যে ঢুকে তার স্বভাব - বিকৃত করে দিচ্ছে , তাকে যেভাবেই হোক শরীর থেকে বের করে দিতে হবে। মানসিক রোগীর ওপর ভূত বিতাড়নের নামে যে অবর্ণনীয় দৈহিক আর মানসিক নির্যাতন করা হত, তার লক্ষ্য ছিল অনুপ্রবেশকারী সেই শয়তান , মানুষটা নয় । অত্যাচার চালানো হত এই ধারণা নিয়েইনিষ্ঠুর , নির্মমভাবে। মানসিক রোগীদের ওপর এই নিষ্ঠুর অত্যাচার তুঙ্গে উঠেছিল ১৪৮৬ সালের একটি তথাকথিত পবিত্র গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর *ডাইনির মুগুর* নামক একটি গ্রন্থে লেখা হয়েছিল পোপের নির্দেশে[6]। এই গ্রন্থেই বলা হয়েছে , ডাইনির কুপ্রভাবে মানুষের যে কোনো শারীরিক এবং মানসিক ব্যাধি হতে পারে । আরও বলা হয়েছে, ডাইনিতে ধরার সবচেয়ে নিশ্চিত আর সন্দেহাতীত অকাট্য প্রমাণ হচ্ছে ডাইনিতে ধরা ব্যক্তিকে দিয়েই তা স্বীকার করানো । স্বীকার করানোর পর্বে , স্বীকৃতি আদায় না হওয়া পর্যন্ত , অত্যাচার চালিয়েই যেতে হবে । নির্যাতনের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়ত- মানসিক রোগীরা - রেহাই

---

[6] *ডাইনির মুগুর – লেখক , হেনরী ক্র্যামার আর মেস্ স্প্রেন্জার । ইতিহাসের এক নির্লজ্জ বৃত্তান্ত বলা চলে এই গ্রন্থেকে , যে গ্রন্থে অন্ধ কুসংস্কারকে সংস্কাররূপেগ্রহণ করে মানবতার চরম অপমান আর মানুষের সভ্যতার ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছিল । এই গ্রন্থে ছিল ডাইনি বিদ্যা ( Witchcraft) - এর বিশদ বিবরণ এবং ডাইনি অনুসন্ধানের পন্থা । ডাইনির যেসব লক্ষণের কথা বলা হয়েছিল এই গ্রন্থে , সেগুলো কঠিন মানসিক রোগগ্রস্ত এবং হিস্টিরিয়া আক্রান্ত স্ত্রীলোকের প্রলাপ , আর অস্বাভাবিক আচার - আচরণের বিবরণ ছাড়া কিছুই নয় ।*

পাওয়ার জন্যে অত্যাচারীর দল যা বলত , তাই স্বীকার করে নিত স্বমুখে। এছাড়াও, নানা রকম জবরদস্তি করে রোগীদের কাছে জানতে চাওয়া হত তাদের এই দুষ্কর্মে সহযোগীদের নাম কি? যে নামগুলো পাওয়া যেত নির্মম নির্যাতনের মাধ্যমে তাদের প্রত্যেকের ওপর প্রয়োগ করা হত একই অত্যাচার পরম্পরা মুখ থেকে স্বীকৃতি আদায় না করা পর্যন্ত। পৈশাচিক পন্থায় সংগ্রহীত এই স্বীকৃতিই ছিল ডাইনির অস্তিত্ব আর ডাকিনীতত্ত্ব প্রমাণের সব সেরা তথ্য। এত করেও স্বীকৃতি আদায় করা না গেলে , চরম দণ্ডের ব্যবস্থাও হত[7]। ডাইনি সম্বন্ধে আরও কিছু ধারণা প্রবল ছিল এই সময়ে। যেমন, তাদের থাকত অনেক রকমের অলৌকিক ক্ষমতা । তারা মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে শরীরের আর মনের বিবিধ বিকৃতি ঘটাতে তো পারেই , তেমনি পারে মহামারীকে ডেকে আনতে, শস্যের ক্ষতি করতে, এমন কি দুর্ভিক্ষ, প্লাবন , ঝঞ্ঝাও তাদের হুকুমের বশ। এরা পুরুষের ধ্বজভঙ্গ ঘটাতে পারে, দুগ্ধবতীর দুধ নষ্ট করে নিতে পারে, মায়াবলে নানা আকৃতি ধারণ করতেও পারে, যে কোনো প্রাণীর রূপ ধারণ করতে পারে। ব্যক্তিগতভাবে মানুষের আর মানুষের সমাজের নানা ক্ষতি করতে পারে এরা এদের এই অতিপ্রাকৃত শক্তি দিয়ে [8] ।

ভূত-প্রেত পিশাচ দানো সম্বন্ধে এই ধরনের লোমহর্ষক ধারণা প্রচলিত ছিল সমাজে। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ধারণাগুলো ভীষণভাবে পেয়ে বসে মানুষকে ডাইনির মুগুর গ্রন্থেটা যে এই বন্ধ বিশ্বাসগুলোয় যথেষ্ট ইন্ধন যুগিয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ডাইনি আতঙ্কে দারুণভাবে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল সাধারণ মানুষ। আশ্চর্য এই যে, তৎকালীন ইউরোপে এবং অন্যান্য অনেক দেশে ধর্মীয় সংস্থার আর জনসাধারণের কর্তৃপক্ষরাও পরম বিশ্বাসে এই সব উদ্ভট তত্ত্বকে সরকারীভাবে গ্রহণ করেছিল। এই সময়েই প্রায় ১৫০ বছর ধরে, আনুষ্ঠানিক ভাবে আদালতের মাধ্যমে , হাজার হাজার মানুষকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল জনসমক্ষে - যাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিল স্ত্রীলোক। সাধারণতঃ তিনভাবে দেওয়া হত এই শাস্তি :ক) শিরচ্ছেদ বা শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলার পর পোড়ানো। খ) জীবন্ত পোড়ানো গ) অঙ্গচ্ছেদ করে তারপর পোড়ানো। এই তাণ্ডবলীলা ইউরোপে নাটকীয় রূপে অনুষ্ঠিত হয়েছিল

---

[7] তদেব , পৃষ্ঠা – ১৯৫

[8] তদেব , পৃষ্ঠা – ১৯৬

ষষ্ঠদশ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত । তবে , ডাইনির কুপ্রভাবে অথবা কুদৃষ্টিতে যে মানসিক বিকার ঘটে যেতে পারে , এমন ধারণা ছিল উনবিংশ শতাব্দীতেও ।

ভারতবর্ষে ও উন্মদনার এই ডাইনি প্রথা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। ইউরোপের মত অত নিকৃষ্ট রূপ না নিলেও , এদেশেও ওই ধারণার যে বিস্তার ঘটেছিল , তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই ধারণা আর প্রথা যে এদেশ থেকে বর্তমানে বিদায় নিয়েছে , এমন কথাও বলা যাবে না । আজও বিক্ষিপ্তভাবে ডাইনি নিধনের সংবাদ আসছে ভারতের নানান অঞ্চল থেকে । উৎকট ডাইনি বিশ্বাসের যুগেও কিছু মহান ব্যক্তি নির্ভীকভাবে এই ডাইনি তত্ত্ব আর ডাইনি নিধনের বিরোধিতা করেছিলেন । এঁদের মধ্যে দুটি নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : মোহান উইয়ার (১৫১৫-১৫৮৮) -ইনি একটি গ্রন্থে লিখেছিলেন । তাতে বলেছিলেন - ' ডাইনি বলে যাদের ওপর অত্যাচার চলছে , এবং পুড়িয়ে মারা হচ্ছে , তারা আসলে শারীরিক এবং মানসিক ভাবে অসুস্থ । এইভাবে নিরপরাধ ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়া ঘোরতর অপরাধ। ' চার্চ থেকে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছিল এই গ্রন্থের ওপর এবং তা প্রযোজ্য ছিল বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত। রেজিন্যান্ড স্কট ( ১৫৩৮-১৫৯৯ ) ইনি ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে এশটি পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন। ডাইনির অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছিলেন সেই গ্রন্থে । গ্রন্থেটির নাম ' ডাইনি আবিষ্কার ' *(The discovery of Witchcraft)* । গ্রন্থেয়ের বক্তব্য ছিল এই ডাইনি বলা হচ্ছে যে সব স্ত্রীলোকদের , তার আসলে মানসিক রোগী । এদের কথাবার্তা আচার - আচরণ সগ্রন্থে মস্তিস্ক বিকৃতির লক্ষণ এবং এই মস্তিস্ক বিকারের জন্যেই এদের সুস্থ বিচার বিবেচনার শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে । অনেকেই অবশ্য স্কটের এই বৈজ্ঞানিক চিন্তাকে সমর্থন করেননি , বরং উপহাস আর বিরোধিতাই করেছিলেন। নানা বিরোধিতা সত্বেও খৃষ্টান ধর্মীয় সমাজেরও কিছু ব্যক্তি এই ডাইনি তত্ত্বের অসারতা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন। সেন্ট ভিনসেন্ট দ্য পল ( ১৫৭৬-১৬৬০ ) নিজের জীবন বিপন্ন করেও প্রচার করেছিলেন মানসিক রোগ শারীরিক রোগ থেকে ভিন্ন নয় । খ্রীষ্ট ধর্মের উচিত এই রোগীদেও সর্বতোভাবে রক্ষা করা এবং এদের নিরাময়

করা[9]। এইভাবে প্রায় দুশো বছরেরও বেশি যাবৎ এই ডাইনি তত্ত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করার পর ইউরোপে ডাইনি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা অনেকটা অপসারিত হয়েছিল ।

## বিশ্ব প্রেক্ষাপটে মানসিক হাসপাতাল ও সংস্কার

৭৯২ খৃষ্টাব্দে এবং এর সমসাময়িক সময়ে আরবদেশে মানসিক রোগীদের জন্যে যে সব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল , সেগুলিতে মানবিক ব্যবহারের মাধ্যমে রোগীদের আরোগ্য করার ব্যবস্থা ছিল । এগুলিকে অবশ্যই হাসপাতাল বলা যায় । কিন্তু মধ্যযুগে ষষ্ঠদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে মানসিক রোগীদের রাখা হত , সেগুলিকে ঠিক হাসপাতাল বলা চলে না। প্রথম দিকে এগুলির নাম দেওয়া হয়েছিল , উন্মাদাগার বা উন্মাদ আশ্রম ( Lunatic Asylum ) , পরে অবশ্য এদের নাম পরিবর্তন করে মানসিক হাসপাতাল বলা হয়েছে । মধ্যযুগের এই প্রতিষ্ঠানগুলি রোগীদের চিকিৎসার জন্যে নির্মিত হয়নি হয়েছিল ডাইনিতে - ধরা লোকগুলিকে খোঁয়াড়ের মত জায়গায় আটকে রাখার জন্যে । সেখানে রোগীদের আষ্টেপৃষ্ঠে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হত এবং চিকিৎসার নামে নানা দৈহিক আর মানসিক অত্যাচার চলত । পয়সার বিনিময়ে পর্যটকদের দেখানো হত এই সব রোগীদের ঠিক যেভাবে চিড়িয়াখানায় দেখানো হয় জন্তু জানোয়ারদের ।

তথাকথিত এই ধরনের মানসিক হাসপাতালগুলির বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কাজ শুরু করেছিলেন ১৭৯২ সালে একজন ফরাসী - চিকিৎসক। সময়টা ছিল ফরাসী বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ের শেষ অংশ। এই চিকিৎসকের নাম ফিলিপ্পি পিনেল (১৭৪৫-১৮২৬)। ইনি ২০০ প্যারি শহরের দুটি হাসপাতালের ( বিসেত্রা আর সল্টপিটার) রোগীদের শৃঙ্খলমুক্ত করে দিয়ে দেখালেন , মুক্ত পরিবেশ মনের রোগ নিরাময়ে কতটা হিতকারী। তিনি বন্ধনমুক্ত রোগীদের উত্তম খাদ্য, নিয়মিত ব্যায়াম, উপযুক্ত কাজ, কাজের মাধ্যমে চিকিৎসা (occupational therapy) মনোরঞ্জনএবং মনোরম পরিবেশের ব্যবস্থা করলেন। মানসিক রোগীদের মানবিক অধিকারকে

---

[9] নন্দী, ধীরেন্দ্রনাথ ; মনের বিকার ও প্রতিকার , আনন্দ পাবলিশার্স , কোলকাতা, ১৩৯৯, পৃষ্ঠা – ১৯৭

স্বীকার করে নিয়ে যে দৃষ্টান্ত উনি সৃষ্টি করেছিলেন , তার ফলে পরবর্তীকালে অনেকেই তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ।

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম টুক ( ১৭৩২-১৯১৯ ) নানা বাধা অতিক্রম করে ইংল্যান্ডের ইয়র্ক রিট্রিট প্রতিষ্ঠা করলেন। সেখানে মনোরম শান্তিপূর্ণ পরিবেশ , উপযুক্ত কাজ এবং বিশ্রাম মানসিক রোগ নিরাময়ের পক্ষে যে কতখানি উপযোগী , তা তিনি প্রমাণ করলেন । ডরোথি ডিক্স ( ১৮০২-১৮৮৭) নামে আমেরিকার এক মহীয়সী মহিলা ১৮৪১ থেকে ১৮৮১ সাল পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে প্রচারের মাধ্যমে আমেরিকার জনগণের সামনে তুলে ধরলেন মানসিক হাসপাতালের দুরবস্থা এবং সেখানে রোগীদের ওপর অমানুষিক নির্মম অত্যাচারের কাহিনী । সংগ্রহ করলেন প্রচুর অর্থ , তা দিয়ে আমেরিকায় এবং অন্যান্য দেশে বহু আদর্শ হাসপাতাল স্থাপন করলেন। অনেক পুরাতন হাসপাতালেরও সংস্কার করেছিলেন ইনি ।

১৯০৮ সালে ক্লিফোর্ড বিয়ার ( ১৮৭৬-১৯৪৩ ) একটি পুস্তক প্রণয়ন করেন । সেই পুস্তক কে তিনি নিজে মানসিক রোগী হিসেবে আমেরিকার তিনটি মানসিক রোগ চিকিৎসার প্রতিষ্ঠানে ভর্তি থাকাঅবস্থায় তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেছেন । তাঁর এই পুস্তক টির নাম যে মন নিজেকে আবিষ্কার করেছিল ' ( The Mind That Found Itself ) তখনকার ওই তিনটি প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসার করুণ অভিজ্ঞতার কথা তিনি বিস্তারিত ভাবে লিখেছিলেন এই গ্রন্থে [10] । পরে তিনি সুস্থ হন , একজন পরিচারকের সহৃদয় ব্যবস্থার মধ্যে থেকে । নিদারুণ সেই অভিজ্ঞতার কাহিনী দিয়ে বোঝাতে চেয়েছিলেন , চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলিতে চিকিৎসার নামে যে সব ব্যবস্থা চালু ছিল চিকিৎসার পক্ষে তা একেবারেই অনুপযুক্ত। এই লেখা পড়ে অভিভূত হয়েছিলেন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং এগিয়ে এসেছিলেন প্রতিকারের জন্যে । আমেরিকার বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী উইলিয়াম জেমস আর বিশ্ববিখ্যাত মনোরোগ চিকিৎসক অ্যাডলফ মায়ার (Adolf Meyer ) ছিলেন এঁদের মধ্যে । ১৯০৩ সালে মানসিক স্বাস্থ্যের জাতীয় সমিতি স্থাপন করেন ক্লিফোর্ড বিয়ার। এখন তা একটি আন্তর্জাতিক সংস্থায় পরিণত হয়েছে ।

[10] নন্দী , ধীরেন্দ্রনাথ , পৃষ্ঠা – ২০২

# মস্তিষ্ক ও মনোবিকার

মস্তিষ্কের কাজের গোলযোগই যে মানসিক রোগের কারণ , এ বিষয়ে অনেক মনীষীই অনুমান করেছিলেন , কিন্তু বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণ করা শুরু হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে। এমিল ক্রেপিলিন ( ১৮৫৬-১৯২৬ ) খুব জোর দিয়েই বলেছিলেন , মস্তিষ্কের গোলযোগেই মানসিক রোগের উদ্ভব হয়। ক্রেপিলিন সমস্ত মানসিক রোগগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে দেখিয়েছেন , প্রত্যেক মানসিক রোগের প্রকৃতি আলাদা। রোগগুলি কিভাবে শুরু হয়, তারা কি গতিতে বৃদ্ধি পায় , লক্ষণগুলি কি নিয়মে প্রকট হয় এবং পরিণামে কি ঘটে । যদি প্রতিটির পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করা যায় , তাহলেই তাদের ভিন্নতা ধরা পড়বে। জেনারেল প্যারালিসিস অব দ্য ইনসেন ( General Paralysis of the Insane ) নামে একটা মানসিক ব্যাধির ওপর গবেষণা চালিয়ে রিচার্ড ক্রাফট এবিং ( ১৮৪০-১৯০২ ) ১৮৯৭ সালে প্রমাণ করলেন যে , মস্তিষ্কে সিফিলিসের আক্রমণের ফলেই এই রোগের উদ্ভব হয় । ১৯১৩ সালে নোগুচি ( ১৮৭৬-১৯২৮ ) জেনারেল প্যারালিসিসের রোগীদের মৃত্যুর পর সিফিলিসের জীবাণুর অস্তিত্বের চাক্ষুষ প্রমাণ দেখান । ১৯১৭ সালে জুলিয়াস ওয়েগনার জোরেগ রোগীদের দেহে ম্যালেরিয়ার জীবাণু প্রবেশ করিয়ে কৃত্রিমভাবে ম্যালেরিয়া রোগের সৃষ্টি করে জেনারেল প্যারালিসিস রোগীদের সুস্থ করে প্রমাণ করলেন , শারীরিক চিকিৎসায় মানসিক রোগ সেরে যায়। এর পর থেকে মানসিক রোগে যে সমস্ত চিকিৎসা পদ্ধতির প্রবর্তন ঘটেছে , সেগুলি মানসিক রোগের চিকিৎসা- এই পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে চিকিৎসার প্রবর্তকদের নাম আর তাঁদের প্রবর্তিত চিকিৎসা পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছে। ম্যানফ্রেড সেকেল ( ১৯০০-১৯৫৭ ) ১৯৩৫ সালে ইনসুলিন কোমা থেরাপির প্রবর্তন করেন । মেডুনা ( ১৮৯৬-১৯৬৪ ) ১৯৩৫ সালে আক্ষেপ চিকিৎসা বা কনভালসিভ চিকিৎসার প্রবর্তন করেন[11] ।

---

[11] নন্দী, ধীরেন্দ্রনাথ ; মনের বিকার ও প্রতিকার , আনন্দ পাবলিশার্স , কোলকাতা, ১৩৯৯,পৃষ্ঠা – ২০৩

# গোবরা লেপার অ্যাসাইলামের

# মানসিক চিকিৎসা ( ১৯১৬ খ্রীঃ )

একটা সময় ছিল যখন মানসিক রোগীদের মধ্যে কুষ্ঠরোগটি খুব বেশি দেখা দিত। কুষ্ঠ রোগীদেরকে পৃথক করার জন্য, গোবরায় অ্যালবার্ট ভিক্টোর লেপার অ্যাসাইলামে একটি মানসিক রোগীর ওয়ার্ড চালু করা হয়, ১৯১৬ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বরে। কুষ্ঠ আক্রান্ত মানসিক রোগীদেরকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা থেকে এখানে পাঠানো হতো। এই হাসপাতালটি ১৯৩৪ সালে বন্ধ হয়ে যায়। এটি পরে ১৯৬৭ সালে মনোরোগ চিকিৎসার জন্য ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট সম্পূর্ণ মানসিক হাসপাতালে রূপান্তরিত করা হয়। পরবর্তীতে একে কলকাতা পাভলভ হসপিটাল নামকরণ করা হয়[12]।

# কেন্দ্রীয় উন্মাদ আশ্রম , রাঁচি (১৯১৮ খ্রীঃ)

ইউরোপীয় রোগীদের জন্য ভবানিপুরে যে ইউরোপীয় লুনাটিক অ্যাসাইলাম তৈরি করা হয়েছিল, সেটি পরবর্তীতে ১৯১৮ সালে রাঁচিতে ইউরোপীয় হাসপাতাল স্থানান্তরিত হয় বর্তমানে সেন্ট্রাল (সি আই পি ) নামে পরিচিত। রাঁচির কেন্দ্রীয় পাগলাগারদ রোগীদের জন্য উন্মুক্ত করা হয় ১৯১৮ সালের ১৭ই মে তারিখে এবং বহরমপুর ও ভবানীপুরের সকল ইউরোপিয়ান ও অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান রোগীদেরকে সেখানে স্থানান্তরিত করা হয়। ভবানীপুরের পাগলাগারদ ১৯১৮ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বরে সাধারণ পাগলা গারদ হিসেবে বন্ধ করে দেওয়া হয়, এবং একই দিনে সেটি পর্যবেক্ষণাধীন রোগীদের জন্য সাময়িক ওয়ার্ড হিসেবে পরিচালিত হয়। ভবানীপুর মেন্টাল অবসার্ভেশন ওয়ার্ডের নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয় ১৯২৩ সালের জুন মাসে এবং ১৯২৪ সালের ১লা মে থেকে এটি চালু হয়। ১৯২২ সালে সকল “পাগলা গারদ”-এর নাম পরিবর্তিত করে রাখা হয় “মানসিক হাসপাতাল”।

---

[12] ক্যালকাটা গেজেট , পার্ট – ১, অক্টোবর , ১৯১৮ , পৃষ্ঠা ১৪৪২

বার্কলে হিল তাঁর আত্মজীবনীমূলক বই অল টু হিউম্যান (১৯৩৯)এ লিখে গেছেন, পূর্ব কথিত রাঁচি ইউরোপিয়ান অ্যাসাইলাম আসলে বাংলার সরকারের একটি আতঙ্কের ফসলমাত্র। প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বে কলকাতার লোকজন বুঝতে শুরুকরেছিল যে পুরনো ভবানীপুর পাগলাগারদ তাদের চমৎকার শহরের জন্য একটি অপমানজনক স্থান।, ১৮৮০ সালের দিকে ভবানীপুরে ভারতীয় মানসিক রোগীদেরকে রাস্তা-ঘাটে ময়লার ঠেলাগাড়ি চালানোর জন্য নিয়োগ দেওয়া হতো। কলকাতার বাসিন্দাদের এদের বিষয়ে অপরাধবোধ এতোটাই মারাত্মক হয়ে গিয়েছিল যে অবশেষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে এ বিষয়ে কিছু একটা করা দরকার এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় দুটো বৃহৎ পাগলাগারদ প্রতিষ্ঠা করার, একটি ভারতীয়দের জন্য এবং অপরটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের জন্য[13]। প্রাথমিকভাবে, রাঁচির নামকুমে স্থান নির্বাচন করা হয়, যেটি রাঁচির ইউরোপিয়ান বাসিন্দাদের মধ্যে বেশ প্রতিবাদের সৃষ্টি করে। এরপর, রাঁচি রেলওয়ে স্টেশন থেকে অন্তত ১০ মাইল দূরে কাঁকির একটি প্রায় জনবিহীন এলাকা নির্বাচন করা হয় মানসিক রোগীদের উপযুক্ত জায়গা হিসেবে! এখানকার প্রথম মেডিকেল সুপারইন্টেন্ডেন্ট ছিলেন মেজর এ এস এম পিবলস (যিনি ১৮ মাস পর প্রস্থান করেন) এবং ডেপুটি সুপারইন্টেন্ডেন্ট ডঃ জ্যোতির্ময় রায়। বার্কলি হিল ১৯১৯ সালের ১৯শে অক্টোবর মেডিকেল সুপারইন্টেন্ডেন্ট হিসেবে যোগ দেন, যাঁর দক্ষ নেতৃত্বে ইউরোপিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম হয়ে ওঠে উৎকর্ষের একটি প্রতীক, তবে সেটি ভিন্ন একটি গল্প।

ভারতীয় মানসিক রোগীদের জন্য হাসপাতাল রাঁচিতে চালু করা হয় মূলত ১৯২৫ সালে এবং এই হাসপাতালের প্রথম সুপারইন্টেন্ডেন্ট ছিলেন ক্যাপ্টেন জে ই ধঞ্জিভয়[14]। ১৯২৫ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বও হাসপাতালে প্রথম পাটনা থেকে আগত ১১০ জন পুরুষ মানসিক রোগী ভর্তি হয়,এরপর ১৯২৫ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর পাটনা পাগলাগারদ থেকে আরও ৫৩ জন মহিলা

---

[13] বন্দোপাধ্যায়, গৌতম কুমার, মলয় ঘোষাল, গৌতম সাহা এবং ওম প্রকাশ সিং বেঙ্গল, হিস্ট্রি অফ সাইকিয়াট্রি ইন বেঙ্গল, ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ সাইকিয়াট্রির,২০১৮

[14] দ্য ইন্ডিয়ান মেডিকেল গেজেট, 1922 জুলাই; 64(7): 362–371, জে.ই. ধুঞ্জিভয়,

মানসিক রোগী আসে এখানে। পাটনা, বহরমপুর এবং ঢাকার মানসিক হাসপাতালগুলো থেকে প্রচুর রোগী আসতে থাকে এখানে এবং ১৯২৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে হাসপাতালের রোগীসংখ্যা এসে দাঁড়ায় ১২২৬ জন রোগীতে, খুব শীঘ্রই ধারণ ক্ষমতার অধিক রোগীকে ভর্তি করাতে হয় সেখানে। এটি সম্পূর্ণ ক্যাপ্টেন ধঞ্জিভয় এবং তাঁর সহকারীর কর্মদক্ষতার পরিচয়, যে কোন ধরণের দুর্ঘটনা ছাড়াই এতো দূর-দূরান্ত থেকে এতো বেশি সংখ্যক মানসিক রোগী এখানে স্থানান্তরিত হয়ে এসেছিল। ক্যাপ্টেন ধঞ্জিভয়ের লেখায় উঠে আসে এই দীর্ঘ যাত্রার কথা- রোগীদেরকে হাসপাতাল থেকে মোটর গাড়িতে করে কিংবা স্টিমারে পৌঁছে দেওয়া হতো। স্টিমারের বিশেষভাবে নির্মিত কক্ষে নিরাপদভাবে সকল উত্তেজিত মানসিক রোগীকে রাখা হতো, এবং তাদের পাহারা দেওয়ার জন্য বহাল থাকতো হাসপাতালের কর্মচারী ও পুলিশ। ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের সাথে একটি চুক্তি হয়েছিল যে কারাগারের গরাদসহ পাঁচটি বগি নির্মাণ করা হবে এবং সেখানে নির্দেশনা অনুসারে বসার সুবন্দোবস্ত থাকবে, সেই সাথে সকল ল্যাট্রিনের দরজা অপসারন করা হবে  এবং এই পাঁচটি বগির সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য বরাবর একটি নিরবিচ্ছিন্ন করিডর নির্মাণ করা হবে , ইত্যাদি[15]।

১৯২৯ সালে, জনবহুলতার সমস্যা সামাল দেওয়ার জন্য ৫০টি জরুরি শয্যার ব্যবস্থা করা হয় এবং অপেক্ষাকৃত দীর্ঘমেয়াদী রোগীদের হাসপাতাল থেকে অব্যাহত দেওয়ার পদক্ষেও নেওয়া হয়। ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশনা দেওয়া হয় যাতে এই হাসপাতালে রোগীকে পাঠানোর সময় আরও সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। দক্ষিণ লন্ডনের মডিস্‌ল মেন্টাল হাসপাতালের অনুকরণে তৈরি হয়েছিল রাঁচীর এই হাসপাতাল। মডিস্‌ল হাসপাতালের ক্যাম্পাসের সঙ্গে অনেকটাই মিল রয়েছে রাঁচীর এই হাসপাতালের। মডিস্‌ল মানসিক হাসপাতালে কোনও গারদ নেই। এখানেও নেই। বিলিতি হাসপাতালটি শুরু হওয়ার দুবছর পরেই রাঁচীতে এই মানসিক হাসপাতাল তৈরির কাজ শুরু হয়। তখন বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে।

---

[15] দ্য ইন্ডিয়ান মেডিকেল গেজেট, 1922 জুলাই; 64(7): 362–371, জে.ই. ধুঞ্জিভয়, রাঁচির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, রাঁচি ইন্ডিয়ান মেন্টাল হাসপাতালে চিকিৎসা করা ভিন্ন কেসের উপর সংক্ষিপ্ত নোট।

কলকাতার ভবানীপুরে ও বহরমপুরে রয়েছে লুনাটিক অ্যাসাইলাম। কিন্তু দুজায়গাতেই তখন মানসিক রোগীর ভিড় উপচে পড়ছে[16]। বিদেশি মানসিক রোগীরা সেখানে জায়গা পাচ্ছেন না। তাই দরকার আর একটা হাসপাতাল।

তখন বাংলা, বিহার, ওড়িশা মিলে ছিল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি। ব্রিটিশ সরকার ঠিক করল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির মধ্যেই কোনও এক শহরে এই হাসপাতাল খুলতে হবে। এমন একটা জায়গা খুঁজছিলেন যেখানকার মনোরম আবহাওয়া রোগীদের মনমেজাজ ভাল রাখবে। জায়গা খুঁজতে খুঁজতে তাঁদের নজরে পড়ে গেল রাঁচী। প্রশাসনিক নানা কারণে এই শহরে তখন সাহেবদের আনাগোনা ছিল। সেই সাহেবদের থেকেই জানা গেল, যে রকম আবহাওয়ায় তাঁরা এই হাসপাতাল তৈরি করতে চাইছেন, রাঁচীর আবহাওয়া ঠিক সে রকমই। এখানে গরমকালেও প্রায় প্রতি দিন বিকেলে বৃষ্টি নামে। আবহাওয়া ঠান্ডা হয়ে যায়। প্রথমে ঠিক হয়েছিল রাঁচীর নামকুমে তৈরি হবে এই হাসপাতাল। কিন্তু পরে মত বদলে হাসপাতাল তৈরির সিদ্ধান্ত হল কাঁকের পুটপুটা নদীর ধারে। ১৯১৭ সালে শুরু হল হাসপাতাল তৈরির কাজ, আর ১৯১৮ সালের ১৭ মে খুলে গেল দেশের একমাত্র মানসিক হাসপাতাল। তবে শুধু বিদেশিদের জন্য। ১৭৪ জন রোগী নিয়ে শুরু হওয়া এই হাসপাতালের নাম দেওয়া হল ইউরোপিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম।

প্রথম দিকে খোদ সাহেবদের কাছ থেকেই এই হাসপাতালকে যথেষ্ট সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল। সেনাবাহিনীর চিকিৎসক কর্নেল বার্কলে হিল হাসপাতালের ডিরেক্টর হয়ে এলেন ১৯১৯ সালের অক্টোবর মাসে। ডিরেক্টর হওয়ার পরে হাসপাতালের সামগ্রিক পরিবেশ দেখে তিনি রীতিমতো ক্ষুব্ধ হলেন। সরাসরি যোগাযোগ করলেন তাঁর বন্ধু, স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে। হাসপাতাল ঘুরে ভাল করে সমালোচনামূলক একটা রিপোর্ট লিখতে অনুরোধ করলেন সম্পাদককে। কয়েক দিনের মধ্যে কাগজে প্রকাশিত হল রাঁচীর ইউরোপিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম নিয়ে একটি লেখা। লেখা পড়ে নড়েচড়ে বসেছিল ব্রিটিশ সরকার। কয়েক বছরের-

---

[16] দ্য ইন্ডিয়ান মেডিকেল গেজেট, সাইকোলজিক্যাল মেডিসিনের একটি হ্যান্ডবুক। (যুদ্ধকালীন মানসিক ব্যাধির একটি অধ্যায়) 1945 নভেম্বর; 80(11)

মধ্যেই ভোল পাল্টে গেল হাসপাতালের। ১৪ বছর টানা ডিরেক্টর থেকে যখন এই হাসপাতাল থেকে অবসর নিলেন বার্কলে হিল, তখন তিনি বলেছিলেন, শুধু দেশের মধ্যেই নয়, এশিয়ারও সব চেয়ে সুন্দর রাঁচীর এই ইউরোপিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম। বারং বার নাম পরিবর্তন হয়েছে এই হাসপাতালের। ১৯৪৭ সালে নাম পাল্টে হয় ইন্টার-প্রভিনশিয়াল মেন্টাল হসপিটাল। ১৯৫২ সালে এর নাম হয়  হসপিটাল ফর মেন্টাল ডিজিজেস। এবং সব শেষে (১৯৭৭) সালে এর নাম হয় সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব সাইকায়াট্রি [17]।

ইনস্টিটিউট অফ সাইকিয়াট্রি (সিআইপি) নামে পরিচিত । এই হাসপাতালে কখনো  রোগীদের কখনোই কঠোর শৃঙ্খলিত করার মাধ্যমে চিকিৎসা করা হতো না[18] বরং , তারা সবাই এর সীমানার মধ্যে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করতে পারে, একটি লাইব্রেরি রয়েছে যেখানে ইংরেজি, হিন্দি এবং বাংলা বই পড়ার জন্য পাওয়া যায়, মিউজিক সিস্টেম রয়েছে, রোগীরা ফুটবল খেলে এবং নারীরা সেলাই, সূচিকর্ম এবং অন্যান্য গৃহস্থালির কাজে নিজেদের নিয়োজিত করে। সম্ভবত, এই কারণেই অতীতে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এই প্রতিষ্ঠানে নিজেদের চিকিতসা করার জন্য বেছে নিয়েছিলেন। তারা হলেন আসরার উল হক মাজাজ (একজন ভারতীয় উর্দু কবি, রোমান্টিক ও বিপ্লবী কবিতা লেখার জন্য পরিচিত), কাজী নজরুল ইসলাম ( বিদ্রোহী কবি)

এখানে ভর্তি থাকা রোগীরা, যাঁরা কিছুটা সুস্থ হয়ে যান, তাঁদের নানা রকম প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পছন্দ মতো কাজ বেছে নেন তাঁরা। কেউ করেন দর্জির কাজ, কেউ ছবি আঁকেন, কেউ বা কাঠের কাজ করেন। অনেকে আবার কৃষি কাজ নিয়ে থাকেন।হাসপাতাল ইলেকট্রোকনভালসিভ থেরাপ্পি বিভাগ খুব গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে রোগীকে চিকিৎসার জন্য ইলেকট্রিক শক দেওয়া হত। এখন অবশ্য মন-চিকিৎসার ক্ষেত্রে আধুনিক নানানওষুধ বাজারে

[17] ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ সাইকিয়াট্রি, মেন্টাল হেলথ ইন এননসিয়েন্ট ইন্ডিয়া এন্ড ইটস রিলেভেন্স টু মডার্ন সাইকিয়াট্রি, ১৯৯৯, ৪১ (১)। ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ সাইকিয়াট্রির , হিস্ট্রি অফ সাইকিয়াট্রি ইন বেঙ্গল,  ,২০১৮

[18] দ্য জার্নাল অফ সোশিওলজি অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার, ভলিউম ১৪, আর্টিকেল ৫, ইস্যু ৪ ডিসেম্বর ১৯৮৭, হিস্টোরি ক্যাল পারস্পেক্টিভ অন দ্য কেয়ার এন্ড ট্রিটমেন্ট অফ দ্য মেন্টালি ইল।

আসার পরে এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা অনেক কমে গিয়েছে। চিকিৎসকরা জানালেন, এখন রোগীকে অ্যানাসথেসিয়া প্রয়োগ করে তার পরই এই থেরাপি দেওয়া হয়[19]।

চিকিৎসকদের এক অংশের মতে, ইলেক্ট্রোকনভালসিভ থেরাপি কিন্তু খুবই কার্যকরী। কিন্তু সাধারণ মানুষের ভুল ধারণার ফলেই এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা কমিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা। এক চিকিৎসক জানালেন, মাইক্রো ভোল্টের বিদ্যুৎ দিয়ে এক মিলিসেকেন্ডের মতো ইলেকট্রিক শক দেওয়া হয়। অথচ বেশির ভাগ মানুষেরই ধারণা, রোগীর হাত-পা বেঁধে বেশ কিছু ক্ষণ ধরে শক দেওয়া হয়। চিকিৎসকরা জানালেন, হাত-পা মোটেই বেঁধে রাখা হয় না, চিকিৎসকরা হালকা করে ধরে থাকেন, তা-ই যথেষ্ট। সিনেমাতে এই থেরাপিকে ভয়ঙ্কর ভাবে দেখানো হয়, তাই মানুষের মনে এই ভুল ধারণা তৈরি হয়েছে। ইলেকট্রোকনভালসিভ থেরাপি নিয়ে মানুষের ভুল ধারণা ভাঙা খুব দরকার। এই থেরাপির মাধ্যমে চিকিৎসার খরচও বেশ কম। অনেক ক্ষেত্রেই ওষুধের থেকেও

এই হাসপাতাল সকলের আগে ছিল। যেমন অকুপেশনাল থেরাপি ট্রিটমেন্ট এখানে এসেছে ১৯২২ সালে। ইলেকট্রোকনভালসিভ থেরাপি এসেছে ১৯৪৩ সালে। লিউকোটোমি নামে এক ধরনের মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচার হাসপাতালে চালু হয়েছে ১৯৪৯ সালে। তখন ভারতের অন্য কোনও হাসপাতালেই কিন্তু এই ধরনের চিকিৎসার প্রচলন ছিল না। স্বাধীনতার আগে ও পরে বেশ কয়েক বছর এই হাসপাতালের বেশির ভাগ ডিরেক্টরই ছিলেন বিদেশি। এ রকমই এক ডিরেক্টর, মেজর আর বি ডেভিসকে ভুলতে পারেনি এই হাসপাতাল। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত ডিরেক্টর ছিলেন ডেভিস। অবসর নেওয়ার পরেও তিনি এ দেশেই থেকে যান। সিআইপি-এর কাছে কাঁকে-তেই তিনি খোলেন ডেভিস ইনস্টিটিউট অব নিউরোসাইকায়াটি। এই দেশের মানসিক রোগীদের সেবার জন্য নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন মানুষটি। সিআইপি-র কয়েকটি ওয়ার্ডের নাম হাসপাতালের প্রাক্তন ডিরেক্টরদের নামে। কোনও ওয়ার্ডের নাম ক্রেপলিন ওয়ার্ড, কোনওটির বার্কলে হিল ওয়ার্ড, আবার কোনওটি কনোলি ওয়ার্ড।

[19] ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ সাইকিয়াট্রি, ডঃ ডি. এল.এন মুর্তিরাও অপরেশন ফরেনসিক সাইকিয়াট্রি ইন ইন্ডিয়া কারেন্ট এন্ড ফিউচার ডেভলপমেন্ট , এল পি শাহ, ১৯৯৯, ৪১ (৩)।

হাসপাতালের ওয়ার্ডগুলোতে বিলেতের স্থাপত্যের ছোঁয়া। একশো বছরের পুরনো হাসপাতালের গায়ে কোথাও একটুও জীর্ণতা নেই।

মধ্যযুগ ভয় পেত যুদ্ধ ও কুষ্ঠ রোগকে, আর রেনেসাঁস-এর সময় মানুষ ভয় পেতে শিখল পাগলামিকে। পাগলামি কার্যকারণ বোধকে নষ্ট করে দেয়, কাজকে করে দেয় মূল্যহীন, চিন্তাকে করে ধারহীন। ১৬৫৬ সালের প্যারিসে তাই জারি হল নির্দেশ: গরিব, হতভাগ্য, দুর্বল ও চলচ্ছক্তিহীনদের রেখে দেওয়া হবে সেখানকার হাসপাতালে। উন্মাদনাকে শিকল পরানোর সেটাই শুরু। আর মানসিক চিকিৎসা? দার্শনিক পরিষ্কার জানাচ্ছেন, উন্মাদনাকে এই যে বেড়ি পরানো শুরু হল, তার নৈতিক, সামাজিক ও আইনি ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্যই সবাইকে পাঁচিল ঘেরা একটা জায়গায় রেখে মানসিক চিকিৎসার শুরু। এখন সমাজ আধুনিক হয়েছে, রাঁচীর এই মানসিক হাসপাতালও। আধুনিক চিকিৎসায় সমাজের মধ্যেই মানসিক রোগীদের রেখে চিকিৎসা করার নিয়ম।

একশো বছরের পুরনো এই সিআইপি-র কাছেপিঠে তৈরি হয়েছে আরও বেশ কয়েকটি মানসিক হাসপাতাল। কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত এই হাসপাতালকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ছে তারই পাশে গড়ে ওঠা আর এক মানসিক হাসপাতাল  রাঁচী ইনস্টিটিউট অব নিউরো সাইকায়াট্রি অ্যান্ড অ্যালায়েড সায়েন্সেস (রিনপাস)। রাজ্য সরকার পরিচালিত এই হাসপাতাল সিআইপি-র প্রায় সমসাময়িক। অনেকের এমনও মত, বিভিন্ন ক্ষেত্রে রিনপাস সিআইপিকে টেক্কা দিচ্ছে, একশো বছরের পুরনো সিআইপি নিজেকে সময়ের সঙ্গে পুরোপুরি বদলাতে পারেনি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গিয়েছে অন্য অনেক কিছুই। যে মনোরম আবহাওয়ার জন্য রাঁচীতে এই মানসিক হাসপাতাল তৈরি হয়েছিল সেই আবহাওয়া রাঁচীতে নেই।

## বোর কমিটির প্রতিবেদন

১৯৪৪ সালে, রাঁচিতে অবস্থিত  ইউরোপিয়ান মেন্টাল হসপিটালের সুপারইন্টেন্ডেন্ট কলনেল এম টেইলর, হেলথ সার্ভে অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কমিটির (যা বোর কমিটি হিসেবে সুপরিচিত,

১৯৪৬) একজন সদস্য হিসেবে মানসিক হাসপাতালের জরিপ করার দায়িত্ব পান। তাঁর প্রতিবেদন অনুসারে, তখন অন্তত পক্ষে ১৯টি মানসিক হাসপাতাল ছিল। কলনেল টেইলর কলকাতার ছয়টি স্থান পরিদর্শনে যান ১৯৪৪ সালের ৩০শে ডিসেম্বরে, ডঃ জি বোসের সাথে দেখা করার জন্য। কেননা ১৯৪৫ সালের ১লা জানুয়ারি ডঃ বোসের শহর ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার কথা ছিল। তাঁর পরিদর্শন করা হাসপাতালগুলো হলো: লুম্বিনি পার্ক মেন্টাল হসপিটাল, মেন্টাল হসপিটাল ফর মেইল পেশেন্টস, মানকুন্ডু, দ্য মেন্টাল হসপিটাল ফর ফিমেইলস, দ্য অবসার্ভেশন ওয়ার্ড, ভবানীপুর, দ্য আউটডোর নিউরোসাইকিয়াট্রিক ক্লিনিক অফ কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ এবং কলকাতা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল।

**রাঁচি মানসিক হাসপাতালের ব্লক পরিকল্পনার চিত্র[20]**

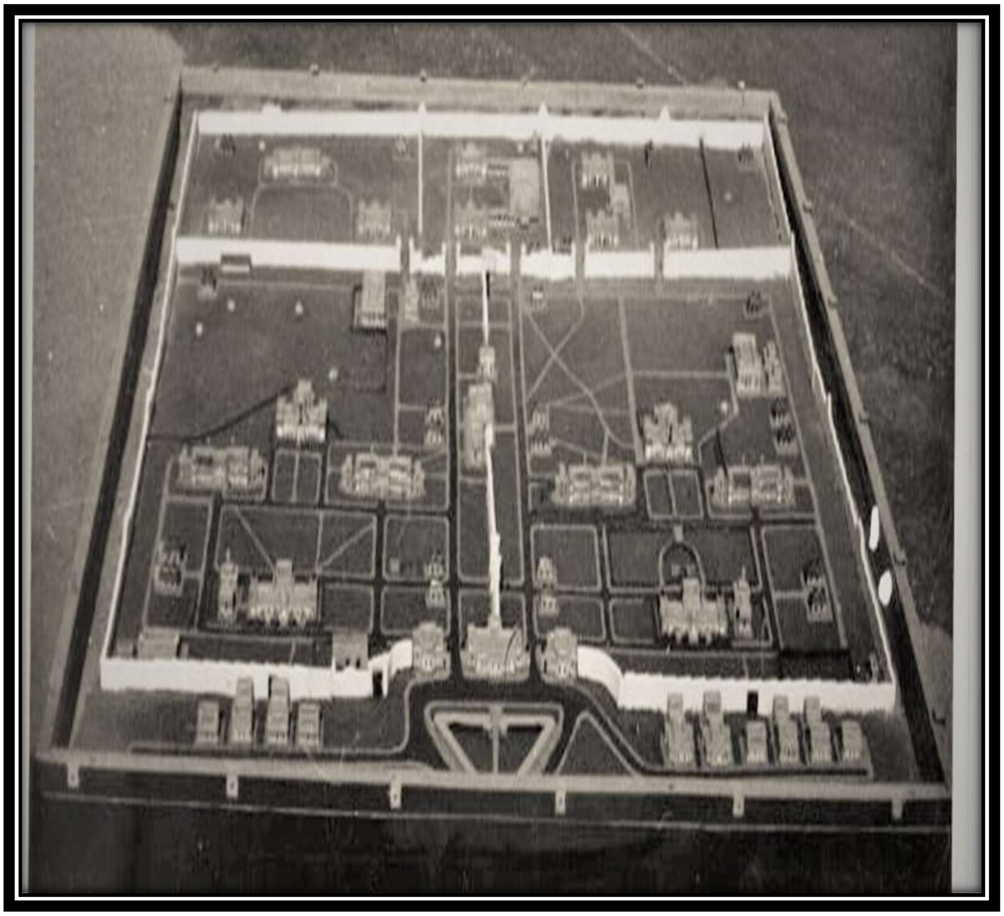

[20] রাঁচি মানসিক হাসপাতালের ব্লক পরিকল্পনাটি সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ সাইকিয়াট্রি দ্বারা সংরক্ষিত এবং প্রদর্শিত, এটি সি.আই.পি সরকারী ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

# রাঁচি মানসিক হাসপাতালের সাইট পরিকল্পনার চিত্র[21]

# ইউরোপীয়ান মেন্টাল হাসপাতাল  রাঁচি

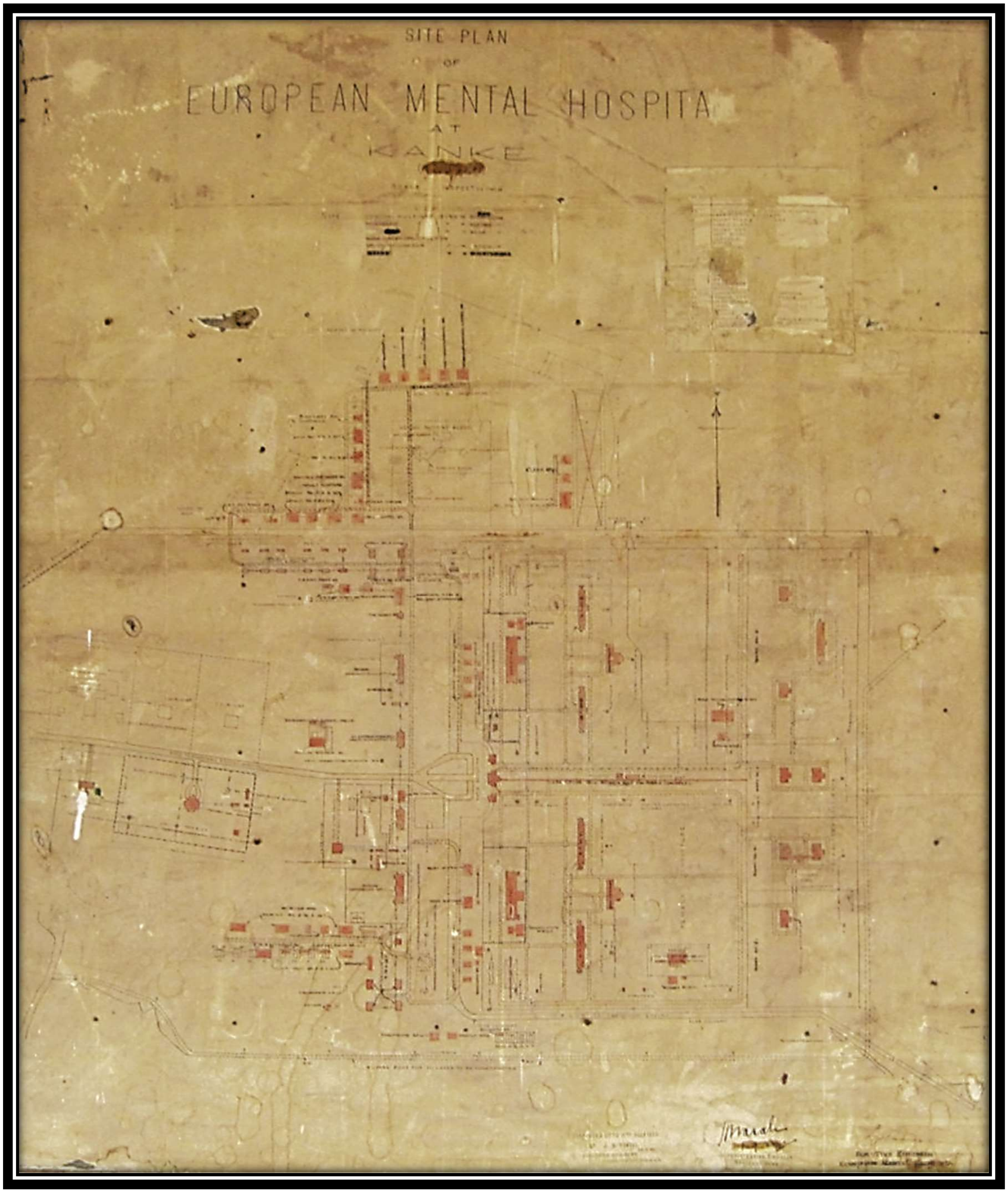


[21] রাঁচি মানসিক হাস পাতালের সাইট পরিকল্পনাটি সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ সাইকিয়াট্রি দ্বারা সংরক্ষিত এবং প্রদর্শিত, cit .অনুস্কা ভট্টাচার্যের প্রকাশিত গবেষনামুলক গ্রন্থ “ইন্ডিয়ান ইনসেন” (২০১৩) থেকে সংগৃহীত।

# সাধারণ হাসপাতালের মনোরোগ চিকিৎসা (১৯৩৩ খ্রীঃ )

পাগলাগারদভিত্তিক স্বায়ত্ত্বশাসিত, নির্জন মানসিক হাসপাতাল ব্যবস্থা যেখানে “বদ্ধ” উপায়ে মনোরোগের চিকিৎসা করা হতো সেই পদ্ধতি থেকে একটি নমনীয় “উন্মুক্ত” মনোরোগ চিকিৎসা সেবা প্রাথমিকভাবে শুরু করেছিলেন ডঃ জি এস বসু, যাতে সহায়তা দিয়েছে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর মেন্টাল হাইজিন। ১৯৩৩ সালের ১লা মে তারিখে, কারমাইকেল কলেজের সাইকায়েট্রি ওপিডি (বর্তমানে আর জি কর মেডিকেল কলেজ, কলকাতা) চালু করা হয় এবং এটি ছিল ভারতে সর্বপ্রথম হাসপাতালের মনোরোগের বহির্বিভাগ চিকিৎসা কেন্দ্র। প্রতি সপ্তাহে এই ওপিডি মঙ্গলবার ও সোমবারে সকাল ৮টা থেকে সকাল ১০টা পর্যন্ত খোলা থাকতো। প্রথম বছরে সর্বমোট রোগী ওপিডিতে চিকিৎসা নিতে এসেছিল ১৭৪ জন। ডঃ বসু ছিলেন ভারপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসার। ডঃ ভূপতি মোহন ঘোষ এবং ডঃ কামাক্ষী চরণ মুখার্জী ছিলেন তাঁর সহকারী হিসেবে। ডঃ নগেন্দ্রনাথ দে এবং ডঃ এস ব্যানার্জী পরবর্তীতে এই ক্লিনিকে যোগদান করেন। কলকাতা মেডিকেল কলেজে মনোরোগের বহির্বিভাগ চিকিৎসা কেন্দ্র চালু হয় ১৯৩৯ সালে।কর্নেল টেইলরের প্রতিবেদন থেকে এটি প্রতীয়মান যে, সাধারণ হাসপাতালে মনোরোগ চিকিৎসা সেবার সূচনালগ্নে মনোরোগবিদ্যা শিক্ষার অবকাশ ছিল ন্যূনতম। বোর কমিটির প্রতিবেদনে (১৯৪৬) টেইলর লিখেছেন,

> “আমি কলকাতা থেকে এই ধারণা সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি যে, আমার পরিদর্শন করা মানসিক হাসপাতাল এবং ক্লিনিকগুলো সন্তোষজনক হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়, এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেষ্টিত শহরে কোন ব্যক্তির গ্রহণযোগ্যতার মানদন্ডের তা খুবই নিম্নে অবস্থান করছে। কলকাতায় ভারতীয়দের জন্য একটি আধুনিক মানসিক হাসপাতাল নির্মাণ করা অতি জরুরি, অন্তত ২৫০ শয্যা থাকতে হবে তাতে এটি সমাজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সকলের পক্ষেই প্রয়োজন। ক্লিনিকাল সরঞ্জামের সিংহভাগ চলে যায় রাঁচির ইন্ডিয়ান মেন্টাল হসপিটালে, এবং এটি কোন মতেই সম্ভব নয় রাঁচি থেকে এতো সংখ্যক রোগীকে কলকাতায় নিয়ে আসা কিংবা রাঁচিতে মেডিকেল শিক্ষার্থীদের কে পাঠানো” [22]

---

[22] ডাবলু আর্নস্ট, কলোনিয়ালিসম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল সাইকিয়াট্রি ; দ্যা ডেভেলপমেন্ট অফ অ্যান ইন্ডিয়া মেন্টাল হসপিটাল ইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, অ্যান্থেম প্রেস, নিউ ইয়র্ক, ২০১৩ পৃ- ৮-১০

সকল মেডিকেল কলেজে সাইকিয়াইট্রিক ইউনিট খোলা হয় ১৯৬২-১৯৬৫ সালের মধ্যে, এখানে বর্তমানে মনোরোগ চিকিৎসা বিভাগ রয়েছে অভ্যন্তরীণ সুযোগ-সুবিধা সহকারে এবং এখানে বেশিরভাগ রয়েছে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট প্রশিক্ষণাধীন ডাক্তাররা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যথাক্রমে ১৯৫৯ সালে ডিপিএম কোর্স চালু করে এবং মনোরোগবিদ্যায় এমডি কোর্স চালু করে ১৯৬৭ সালে।

## মানকুন্ডু মানসিক হাসপাতাল (১৯৩৩ খ্রীঃ )

মানকুন্ডু মেন্টাল হসপিটাল প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান, যা ১৯৩৩ সালে চালু করা হয় এক ব্যক্তির প্রচেষ্টায় ডঃ কে কে দাস, যিনি ছিলেন এই হাসপাতালের সহকারী প্রতিষ্ঠাতা। মানকুন্ডু মেন্টাল হসপিটালের পুরুষ বিভাগ অবস্থিত ছিল মানকুন্ডুতে, কলকাতা থেকে প্রায় ২২ মাইল দূরে অবস্থিত। ১৯৪০ সালে লুনাসি আইনের অধীনে এটি পরিচিতি অর্জন করে। বোর কমিটির কলনেল টেইলর উলে-খ করেছেন, ভাবনগুলো চলনসই, তবে এর দ্রুত সংস্কার করা উচিত, এবং এর প্রাঙ্গণ একদম জঙ্গলে এলাকা। আমার দেখা মতে রোগীরা তেমন নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, এবং হাসপাতালের সার্বিক পরিবেশ অত্যন্ত বিষণ্ণ। মানকুন্ডু হাসপাতালের মহিলা বিভাগ কলকাতার ৭৫, নম্বর সার্কুলার রোডের একটি ভাড়া নেওয়া বাসায় স্থাপিত ছিল। টেইলরের ভাষ্যমতে, চিকিৎসার জন্য স্থানটি তেমন উপযুক্ত ছিল না, তবে পরিদর্শন করে দেখা গেছে যে রোগীরা বেশ হাসিখুশি এবং তাদের যত্ন নেওয়া হয়, যদিও তিনি নার্সিং কর্মীদের অপর্যাপ্ততা এবং মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। বাংলায় স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে আরও কিছু হাসপাতাল মনোরোগ চিকিৎসা সেবা প্রদান করতো বলে জানা যায়।

## বঙ্গীয় উন্মাদ আশ্রম (১৯৩৫ খ্রীঃ )
## (দত্ত নগর মানসিক হাসপাতাল - বর্তমান দমদম)

ঔপনিবেশিক বাংলায় প্রথম বেসরকারি ভাবে ১৯৩৫ খ্রীঃ ২৬ জানুয়ারি মানসিক হাসপাতাল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন কবিরাজ অতুল বিহারী দত্ত যা বঙ্গীয় উন্মাদ আশ্রম নামে পরিচিত। এটি ছিল একটি আয়ুর্বেদিক হাসপাতাল যেখানে উন্মাদ রোগীদের আশ্রমিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা

দাব করা হতো [23]। এ.বি. দত্তের  মৃত্যুর পর মিসেস নিলী সেনগুপ্ত, হাওড়ার লিলুয়ায় একটি ভাড়া বাড়িতে এই প্রতিষ্ঠানের পরিষেবা চালু রাখেন , অতঃপর ১৯৪০ সালে দমদমের নিকটবর্তী দত্তনগর এ তার স্থায়ীভাবে বঙ্গীয় উন্মাদ আশ্রম নাম পরিবর্তন করে দত্তনগর মেন্টাল হেলথ সেন্টার এ ক্লিনিক্যাল পরিষেবা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু  হয়। এই প্রতিষ্ঠানটিই দত্তনগর মেন্টাল হেলথ সেন্টার (ডিএমএইচসি) একটি বে সরকারী উদ্যোগে  মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী, যা মানসিক স্বাস্থ্য আইনের অধীনে স্বীকৃত। আনিল ভূষণ দত্ত কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে এম.বি.এস পাশ করার পর লন্ডন থেকে সাইক্রিয়া টিক বিষয়ে এম আর সি পাশ করার পর মেন্টাল হেলথ সেন্টারে দীর্ঘদিন রোগীদের জন্ম পরিষেবা দিতেন।

দত্তনগর মেন্টাল হেলথ সেন্টার বিগত ১২ বছর ধরে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা এবং গবেষণা এবং জনশিক্ষা কর্মসূচির প্রচারের প্রেক্ষাপটে বেশ কয়েকটি ঐতিহাসিক মাইলফলক স্থাপন করেছিল। বঙ্গদেশে মানসিক রোগে আক্রান্ত মানুষের মানবাধিকারের বিষয়টি উত্থাপনেও এই প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে[24]। মাল্টি-ডিসিপি-নারি ইনপুট, ওয়ার্ডে সাইকিয়াট্রি, নিউরোসাইকোলজি এবং ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সার্ভিসের সঙ্গে সমন্বিত মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা চালু ছিল, চিকিতসা পরিকল্পনা ছিল কমিউনিটি কেন্দ্রিক, হাসপাতালের অভ্যন্তরে বিস্তিত পরিসীমা জুড়ে  ছিল সুশীতল বাগান যা রোগীর চিকিতসা ক্ষত্রে প্রমাণ ভিত্তিক মানসিক স্বাস্থ্য অনুশীলনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ । হাসপাতালের চিকিতসার মানদন্ড পূরণ করে  আয়ুরবেদিক পদ্ধতিতে তুলনামূলক অল্প খরচে রোগীর যত্নের সহিত চিকিৎসা করা হতো ।

---

[23] ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেজেট, ভলিউম-৮৮, অফিস অফ দ্যা রেজিস্ট্রার অফ নিউসপেপারস । প্রেস ইন্ডিয়া , ১৯৬৮ পৃ-১৫৫

[24] রিপোর্ট অফ দ্যা কমিটি অন ইনডিজেনাস সিস্টেমস অফ মেডিসিন, রিপোর্ট অ্যান্ড রিকমেন্ডেশনস ইন্ডিয়া, কমিটি অন ইনডিজেনাস সিস্টেম অফ মেডিসিন, মিনিস্ট্রি অফ হেলথ, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, ১৯৪৮, পৃ-২৩

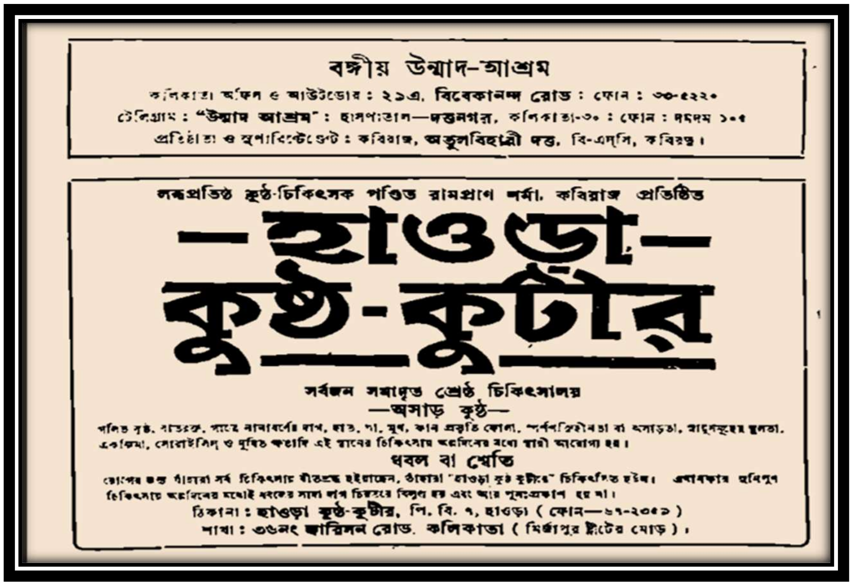


বঙ্গীয় উন্মাদ শ্রমের একটি বিজ্ঞাপন বিশ্ববানী পত্রিকায় প্রকাশিত [25]

## লুম্বিনি পার্ক মানসিক হাসপাতাল (১৯৪০ খ্রীঃ )

লুম্বিনী পার্ক মানসিক হাসপাতালটি তিলজলা এলাকার বেদিয়াডাঙ্গা রোডে অবস্থিত, যা বালিগঞ্জ শহরের অন্তর্ভুক্ত। এই প্রাইভেট মানসিক হাসপাতালটি ১৯৪০ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারিতে ইন্ডিয়ান সাইকো-অ্যানালাইটিকাল সোসাইটির উদ্যোগে চালু হয়। এই হাসপাতালের ভবনটি বিখ্যাত লেখক রাজশেখর বসু উপহার হিসেবে সাইকো-অ্যানালাইটিকাল সোসাইটিকে প্রদান করেন, যিনি ছিলেন ভারতে মনোবিশে-ষণের জনক। এই হাসপাতালটি মাত্র তিনটি শয্যাসহ চালু করা হয়, পরবর্তীকালে এটি ৪৮টি শয্যায় উন্নীত করা হয়, অবশেষে এটি ২০০-শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে পরিবর্ধিত হয়।

গিরীন্দ্রশেখরই এই লুম্বিনী পার্ক মানসিক হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা। জমিটি দান করেছিলেন রাজশেখর বসু। এর আগে কলকাতায় মানসিক রোগের চিকিৎসাও শুরু করেন গিরীন্দ্র শেখর বসু[২৬]। প্রথমে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে এর আউটডোর খোলার জন্যে আবেদন করেছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার সেই আবেদন নাকচ করে দেয়। তখন তিনি কারমাইকেল

---

[25] বিশ্ব বানী পত্রিকা আষাঢ় ,স্বামী অভেদানন্দ ,( সম্পাঃ ) ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ পৃষ্ঠা – ২

[26] বসু ,আমিতরঞ্জন ; ভুঁই ফোরের মনো বিদ্যা চর্চা , চর্যাপদ , কোলকাতা , পৃষ্ঠা ৪৪

হাসপাতালে (আজকের আর জি কর হাসপাতাল) যোগাযোগ করেন। কারমাইকেল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাকে একটি ঘরের খানিকটা অংশ, বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা, কয়েকটি আসবাবপত্রও দেন। গিরীন্দ্রের অধীনে সহযোগী ডাক্তার ছিলেন ভূপতিমোহন ঘোষ ও কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায়। সে কালে ভারত তথা এশিয়াতে এক মাইলস্টোন হয়ে ছিল এই ঘটনা। গিরীন্দ্র এর পরে একটি সম্পূর্ণ হাসপাতালের কথা ভাবেন। কিন্তু টাকা কোথায়, জায়গাই বা দেবে কে। বাড়িতে আলোচনা করেন এই নিয়ে। রাজশেখর বসু তার তিলজলার জমি দিয়ে দেন। অর্থের ব্যবস্থাও হয়ে যায়। ১৯৩৮ সালে তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪০-এর ৫ ফেব্রুয়ারি [27]।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম অবস্থাতেই লুম্বিনিপার্ক হাসপাতাল স্থাপন করা হয় । সুচনা থেকে বহু বাধা অতিক্রম করতে হয়। হাসপাতালের কাজ আরম্ভ হওয়ার পর বিশ্ব যুদ্ধের ফলে নতুন সমস্যা দেখা দিল। উত্তপ্ত কলকাতায় লোকজন একে বারে ভিতস্ত। সে অবস্থায় হাসপাতালে কাজ অব্যাহত ছিল। সব জিনিষ পত্রের দাম বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি করা হয় নি। ক্রমে দুভিক্ষ , রেশনের সমস্যা এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভৃতি বহু রকমের সমস্যা সামলে লুম্বিনি পার্ক হাসপাতালের অবস্থা অটুট ছিল। ক্রমশ লুম্বিনি পার্কের পরিধি আরও বৃদ্ধি পেতে থাকল। একদিকে নানা রকমের সমস্যায় পড়ে দেশে মানসিক রোগীর সংখ্যা বাড়তে লাগল। অন্যদিকে কিছু কিছু করে লোকে মানসিক রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধেও সজাগ হতে লাগল। তখনও ক্ষুদ্র হাসপাতাল হলেও এই মনোভাবের পরিবর্তনের মূলে লুম্বিনির অবদান অসামান্য ছিল। ১৯৪৩ সালের মাঝামাঝি বেদিয়াডাঙ্গা রোডে একটি অপেক্ষাকৃত বড় বাড়ী ভাড়া নিয়ে পুরুষ বিভাগটি সে স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়[28]। বেড় সংখা বাড়ানোর দাবি যত বাড়তে লাগল নানা চেষ্টায় ধীরে ধীরে নতুন ঘর তৈরী করে বেড ক্রমে বাড়ানো হয়। ১৯৫০ সাল থেকে আরবান ইঞ্জিনিয়ার হাসপাতালের গৃহনির্মাণের কাজে এগিয়ে আসেন। তাদের সাথে ওই একই সত্ত্বে যখন যেমন সম্ভব টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। আজও তারা সেই নিয়মে কাজ করে যাচ্ছেন। গত বছর, পূর্বে তাদের দেওয়া ১২,৮৮৭ টাকার মধ্যে ৮০০০ টাকা তাঁরা

---

[27] বসু ,আমিতরঞ্জন ; ভুঁই ফোরের মনো বিদ্যা চর্চা , চর্যাপদ , কোলকাতা , পৃষ্ঠা ৪৫

[28] চিত্ত, মনবিদ্যা বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা , সম্পাদক সুহৃত চন্দ্র পঞ্চমবর্ষ, কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৭০।

হাসপাতালকে দান করেন। ভারতীয় মনসীক্ষা সমিতি প্রথম থেকেই জমা সাধারণের যে সহানুভুক্তির উপর আস্থা রেখে এই লোকহিতকর কাজে আগ্রণী হয়েছিলেন তাদের সেই আস্থা আজ বহুগুণে বৃদ্ধি পায় [29] ।

লুম্বিনির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল , মানসিক রোগগ্রস্থদের চিকিৎসা যথাসাধ্য কম খরচে করা, এই হাসপাতাল কোনও মুনাফা রাখত না। যাহা আমদানি সব টাকা এই হাসপাতাল বা এতদসংযুক্ত সব শ্রেণীর কোনও লোকহিতকর কাজেই ব্যয় করা হয়তও। কেউ ঐ অর্থ থেকে লাভের অংশ হিসাবে নিতে পারতেন না [30] । জনসাধারণ লুম্বিনির বিষয় ক্রমে যত জানতে পারছেন ততই অধিক সংখ্যক বেড এবং আরও কম ব্যয়ের বেড রাখার দাবি বৃদ্ধি পায়। সাধারণ মানুষের অর্থকষ্ট দেশে ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি , ও নানা সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে রোগীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়, কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণে হাসপাতালে রোগী রাখার ব্যবস্থা সর্বদাই অভাব ছিল। অর্থাভাবই এর প্রধান ও একমাত্র কারণ ছিল [31]

১৯৪৭ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখ নানান অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলে লুম্বিনিপার্ক ৬ বছর পূর্ণ করে ৭ বছরে পদার্পণ করে । সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা , দুর্ভিক্ষ, দেশ বিভাগ ব্রহ্মদেশ ও পূর্ববঙ্গ হতে আগত উদবাস্তু ইত্যাদি বহু প্রকারের সমস্যার ছোট বড় ঝড় অতিক্রম করে অল্প অর্থে পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানটি, কেবল যে প্রাণে বেঁচে আছে তা নয়। প্রচুর বাধা বিপত্তি থাকা সত্বেও লুম্বিনিপার্ক ১৯৪০ সালে মাত্র ৩ টি শয্যা নিয়ে স্থাপিত হয়েছিল, এবং ১৭৫ টি শয্যাযুক্ত হাসপাতালে তা পরিণত হয় [32]। এটি এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণশক্তির পরিচয় দেয় । এই উন্মাদ আশ্রমটি ক্ষুদ্র হলেও সমাজকল্যাণব্রতী থাকায় সমাজের সহৃদয় জনসাধারণ এবং গত কয়েক বৎসর যাবৎ রাষ্ট্রীয় ও জনকল্যাণ সংস্থার সাহায্যে ক্রমে ক্রমে শাক্তিশালী হয়ে উঠেছে [33]। সেবার যে আদর্শ নিয়ে এই উন্মাদ আশ্রম কাজ শুরু করেছিল তা এই আশ্রমের প্রানশক্তি দান

---

[29] চিত্ত, মনবিদ্যা বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা , সম্পাদক সুহৃত চন্দ্র প্রথম বর্ষ , দ্বিতীয় সংখ্যা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৬।পৃষ্ঠা ৪৩

[30] চিত্ত, মনবিদ্যা বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা , সম্পাদক সুহৃত চন্দ্র দ্বিতীয় বর্ষ , তৃতীয় সংখ্যা, কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৬৭।

[31] চিত্ত,মনোবিদ্যা বিষয়ক ত্রৈ মাসিক পত্রিকা, সুহৃতচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত,"লুম্বিনি সম্বন্ধে" প্রথম বর্ষ,দ্বিতীয় সংখ্যা,শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৬, পৃষ্ঠা-৪৪

[32] ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ সাইকোলজি – ভলিউম ১৯-২২, পৃ- ১২১, ১৯৪৪

[33] চিত্ত, মনবিদ্যা বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা , সম্পাদক সুহৃত চন্দ্র তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৬৮।

করেছিল। বর্তমানে মানসিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই আশ্রমটি একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ লাভ। ভারতে রাষ্ট্র পরিচালিত হাসপাতাল গুলি বাদ দিলে, এতগুলি শয্যাযুক্ত মানসিক হাসপাতাল আর নেয়। উপযুক্ত মনঃসমীক্ষক দ্বারা রোগীর মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হতনা। ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি কর্তৃক পরিচালিত এই উন্মাদ আশ্রমের মত এত সংখ্যক শয্যা বিশিষ্ট উন্মাদ আশ্রম পৃথিবীর আর কোন দেশের মনঃসমীক্ষা সমিতির পরিচালনাধীনে নেই।

The following is the brief statement of admission and discharge of the patients of the Hospital since it was started in 1940[34]

| Year | Admission | Discharge |
|---|---|---|
| **1940** | 12 | 9 |
| **1941** | 25 | 22 |
| **1942** | 27 | 24 |
| **1943** | 56 | 47 |
| **1944** | 66 | 62 |
| **1945** | 61 | 58 |

দীর্ঘকাল ধরে কলকাতার সম্পর্কে ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল গুলিতে মানুষের মানসিক রোগীর চিকিৎসার চাহিদা অনুযায়ী আধুনিক বৈজ্ঞানিক সম্মত এই মানসিক হাসপাতাল চালানো হয়েছে। লুম্বিনি পার্ক মেন্টাল হাসপাতালটি ১৯৪০ সালের শুরুতে ভারতীয় সাইকো-অ্যানালিটিক্যাল সোসাইটি দ্বারা পরিচালিত ওরা হয়। এই হাপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য যার অবদান সব থেকে বেশে ছিল তিনি হলেন মূলত অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডাঃ গিরিন্দ্র শেখর বোস। মানসিক হাসপাতালটি বেদিয়া ডাঙ্গা রোডে অবস্থিত যা কলকাতার শহরতলিতে। জায়গাটি রেলওয়ে এবং বাস দ্বারা সহজেই উপলব্ধ এবং কলকাতার পৌরসভার সীমাটির ঠিক কাছেই।প্রথম থেকেই এটি -হসপিটাল ইনডোর এবং আউটডোর উভয় মানসিক রোগীদের জন্য শুরু হয়েছিল।প্রথমে এটি কেবল ৮ টি শয্যা বিশিষ্ট দিয়ে শুরু হয়েছিল তবে ঠিক পরের বছর 31 টি শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে পরিণত হয়। বিশেষ ওষুধ এবং বিশেষ উপস্থিতির জন্য চার্জ ব্যতীত সমস্ত ধরণের পরিষেবা বিদ্যমান ছিল । হাসপাতালটি দুটি ওয়ার্ডে রয়েছে, একটি পুরুষ

[34] এইচ পি মাইতি ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ সাইকোলজি, লুম্বিনি পার্ক মেন্টাল হস্পিটাল ভলিউম- XX, পার্ট- ১-৪, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি প্রেস ১৯৪৫, পৃ- ১২১

রোগীদের জন্য এবং অন্যটি মহিলা রোগীদেও জন্য । আবাসিক চিকিতসকদের জন্য কোয়ার্টার রয়েছে । কর্মীরা একজন সুপারিনটেনডেন্ট, দুটি সহকারী সুপারিন্টেন্ডেন্ট, দু'জন আবাসিক চিকিতসক এবং পরিদর্শনকারী চিকিতসক নিয়ে গঠিত। ইন্ডিয়ান সাইকো অ্যানালিটিক্যাল সোসাইটির সভাপতি ডাঃ বোস মেন্টাল হাসপাতালের পরিচালকএছাড়াও তিনি হাসপাতালের পরিচালনার কমিটির সভাপতি ।চিকিৎসার প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন ধরণের পদ্ধতি অনুসারে এখানে প্রচলিত আছে (i) হাইড্রোথেরাপি (ii) ড্রাগ-থেরাপি (iii) পেশাগত থেরাপি (iv) স্থাবরকরণ (v) সম্মোহনবাদ এবং (vi) মনোবিশ্লেষণ । বৈদ্যুতিক শক দেওয়ার জন্য একটি সরঞ্জাম সরঞ্জামগুলিতে যুক্ত করা হয় । ইনস্টিটিউটটি কেবল মানসিক চিকিতসার কেন্দ্রই নয়, এটি মেডিকেল গ্র্যাজুয়েটস এবং মনোবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি জায়গা। জনপ্রিয় বক্তৃতার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের জন্য ক্লিনিকাল বক্তৃতাগুলির ব্যবস্থা রয়েছে।

## লুম্বিনির ডায়েরী থেকে

লুম্বিনি পার্ক মানসিক পাগলদের চিকিৎসার একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল- প্রতিটা মানসিক রোগীদের জন্য পৃথক ডায়েরি রাখার ব্যবস্থা ছিল। ঐদৈনিক দিন লিপিতে মানসিক রোগীরা নিজের ভাবনা লিখে রাখত। কিন্তু সব রোগী বেশি নিয়মিত ডায়েরি ব্যবহার করত না, সামান্য কয়েকজন রোগী ব্যবহার করত। আবার দেখা যেত, হাসপাতাল ওয়ার্ড এ যিনি পরিদর্শনে থাকতেন তিনিও রোগীদের *Case History* লিখে রাখতেন। এটি ছিল চিকিৎসার প্রাথমিক শর্ত। প্রথমে রোগীর চ্যাক্ষুস প্রত্যক্ষের মাধ্যমে রোগীর আচরণ প্রত্যক্ষ করা, তারপর রোগীর মনের কথা শোনা, কোন রোগী ব্যক্তিগত কথা চিকিৎসকের প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক হলে তাকে ডায়েরি লিখনের জন্য অনুনয় করা হত। সাধারণতঃ এটা ধরে নেওয়া হয় যে , যে- সব ব্যক্তির মনের গোলমাল হয় ও মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসার্থে আসে তাদের উপর আর কোনও রকম ভরসা করা যায় না ।

লুম্বিনির মনোচিকিৎসক গিরিন্দ্রশেখর মনে করেন মানসিক রোগ মাত্রেই বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে যায়, এ রকম মনে করা খুব ঠিক নয় । মানসিক রোগের মূলে থাকে প্রক্ষোভজ ভারসাম্যহীনতা। মানসিক রোগীর যত রকম উপসর্গ হয় , প্রায় সে-সবই স্বভাবী ( normal ) মানুষের মধ্যেও

আছে ; কেবল মাত্রার তারতম্য থাকে[35] । তাই মানসিক রোগীর  রোগ সত্ত্বেও বহু কাজকর্ম স্বভাবী মানুষের মতোই করতে পারে । মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বহু রোগী নানারকম কাজ কর্ম করে রেখে যান , যা দেখে হাসপাতাল পরিদর্শনকারীরা অবাক হন অথচ এতে অবাক হবার কিছুই নেই[36] ।

একজন রোগিণীর রোগলক্ষণ ছিল স্বামীকে সন্দেহ , শাশুড়ীর সঙ্গে বনিবনাও না - হওয়া , সামান্য ব্যাপার নিয়ে তুমুল ঝগড়া , মারামারি পর্যন্ত ঘটে যাওয়া , এবং শেষপর্যন্ত বাপের বাড়ী চলে যাওয়া ; আবার সেখানে থাকতে না পেরে স্বামীর কাছে চলে - আসা এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দিনের পর দিন চলত । কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে তা অসুস্থতার পর্যায় পড়ে যায় । প্রথম প্রথম রোগিণী নিজের ব্যবহারকে যুক্তি দিয়ে সমর্থন করবার চেষ্টা করত। কিছু দিন পরে তার অন্তদৃষ্টি এল যে , বারবার যখন একই রকম ঘটাই তখন এটা রোগই বটে । মহিলাটির অন্যান্য সব কাজকর্ম সাধারণ লোকের মতই ; কোনও প্রভেদ নেই বললেই চলে।

যারা সন্দেহ রোগে ভোগে তাদের সব রকম লোকের চরিত্র বিশে-ষণ করবার ঝোঁক থাকে । তারা খুঁটিয়ে অন্য লোকের ব্যবহার সমালোচনা করতে ভালবাসে ও পারে । তাদের মধ্য থেকেই বহু সমালোচকের সৃষ্টি হয় । উল্লিখিত মহিলাটিকে বলা হয়েছিল নিজের মনের কথা লিখতে । নিম্নে তারই লেখা ডায়েরীর কিছু অংশ, এছারাও লুম্বিনীর ডায়েরি থেকে অন্যান্য কয়েকটি মানসিক রোগীর কথা উপস্থাপন করা হল যেমন লেখা ঠিক তেমনই তুলে দেওয়া হল ব্যক্তিগত পরিচয় গোপন করা ব্যতিরেকে অন্য কোনও রকম সংশোধন বা পরিবর্তন করা হয়নি।

## আবার এসেছি লুম্বিনি পার্কে,  রাত্রি ৯টায়

লুম্বিনি পার্ক মানসিক হাসপাতালে কোন এক মানসিক রোগীর আত্মকথা

---

35 বসু, গিরিদ্র শেখর, (এডিট) অ্যা নিউ থিওরি অফ মেন্টাল লাইফ, সমীক্ষা , জার্নাল অফ দ্যা ইন্ডিয়ান সাইকো – এনালাইটিক্যাল সোসাইটি, ভলিউম- ২ নম্বর, ১৯৪৮ ক্যালকাটা, পৃ-১০৮

36 বসু,গিরিন্দ্রশেখর, প্রবাসী, মনের রোগ, বৈশাখ, ১৩৩২

বড় অস্থির আমার মন। কোন কাজে বেশীদিন মন বসে না । মনটা আমার এমন কেন? শরতের প্রকৃতির মতই এলোমেলো! এই সময়েতে চঞ্চলতার কারণ যদিও হত তাহলেও মনকে বোঝাতে পারতাম । কিন্তু নিজের মনকে ঠকানো যায় না । আমি জানি আমার এই অশান্ত অস্থিরতার অঙ্কুর আছে আমার নিজের ভেতরে। অনেক ভিতরে অনেক গভীরে ড় সে কোন নিভৃতে এই অশান্তিরা জেগে ওঠে রাত্রি দিন । এই অতৃপ্তির বোধ আমি হয়তো নিয়েই জন্মেছিলাম । থেকে থেকেই ভাল লাগে না , কিছুতেই শান্তি আসে না তার কারণ এই বোধ। মর্মের কোন গভীরে যে মনের এই অশান্ত বীজ লুকিয়ে আছে কে তাকে আবিষ্কার করবে। পারবেন কি কোন ডাক্তার? মনে মনে কত যে লিখি তার আর শেষ নেই , কিন্তু হাতে-কলমে নিয়ে শব্দের মালা সাজাতে কেন জানি আজকাল আর ভাল লাগে না । কি যে বিচিত্র এই মন। সব কিছুতেই আজকাল মনে হয় কি হবে কিছু লিখে , কি হবে কিছু করে । পিছনের দশটা বছরের পানে যখন ফিরে তাকাই শুধু ক্রোধ আর ব্যর্থতার বন্যার থৈ থৈ নৃত্য । মনে মনে ভাবি এই দারুণ দুরন্ত ক্রোধ আর বিচিত্র এক বাঁধ ভাঙ্গা বন্যার জলরাশিতে আমার ভবিষ্যত , আমার সন্তান, আমার স্বামী সব কিছুকে ডুবিয়ে দেব? ডুবিয়ে আমি দিতে পারি ওদের কিন্তু আমার জীবনের মোড় ফেরান ভাঙ্গার আশ্বাসে ওদের কি আমি বাঁচিয়ে রাখতে পারবো ? বিশ্বাস নেই , আস্থা নেই আমার এই মনের ওপর । অসহায় , একান্তই অসহায় আমি , আমার এই কাজে । কত বাঁধনে যে বেঁধে রাখতে চেষ্টা করি আমার এই বন্ধছেড়া মনকে , কিন্তু হার স্বীকার করেছি এই রশিছেড়া মনের কাছে । কোন কবেকার , কোথাকার একটা ব্যর্থতার জালা মনের কোন কোণায় লুকিয়ে বসে থেকে আমায় এমন করে ক্ষেপিয়ে বেড়ায় কে জানে মনটাকে ছিড়ে খুঁড়ে কুটিকুটি করে দেখতে ইচ্ছে করে কোন জালায় আমি জলে যাই । কোন জালা আমাকে এমন ক ' রে পাগল করে ছেড়ে দেয়। আমার জীবনের সমস্ত মধুর মূহুর্তগুলোকে কালির কালো দিয়ে ঢেকে দেয় আবার হয়তো স্বপ্নময় দিনগুলো ফিরিয়ে এনেছি, আবার কালোর কালিতে ক্রোধের বহ্ণিতে ঢেকে গেল জীবনের সব আলো ।

মানুষ কি পারে বারবার কালির শেষ বিন্দুকে মুছে ফেলতে ? কিন্তু আমার স্বভাবের ট্রেই ভাল আছে সেটুকু দিয়েই বারবার মুছেছি আমার জীবনের যত কালো র বিন্দুগুলো , কিন্তু এইবার শেষ । মনে মনে ভাবি স্বভাব যদি এইই হয় তবে কেমন করে কোন পথে আমি ভাল হবো । ডাক্তারদের আশ্বাস শুধু যেন একটুখানি সান্তনার প্রলেপ বলে মনে হয় । সান্তনার বাণী কি আশ্বস ভরা জীবনে আমায় ফিরিয়ে দেবে ? ভগবানের পায়ে শত শতবার মাথা খুঁড়েছি। মানতের পর মানত করেছি । বাদর ভগবান আমার কোন কথাই -

*শোনেননি। ভগবানের ওপর যেন অবিশ্বাস আসে , এত আকুল ডাক কি ভগবান শোনেন না? না ভগবান বলে কিছু নেই জগতে । তা নয় ভগবান আমায় যন্ত্রণার আগুনে পুড়িয়ে আমার বিশ্বাসের পরীক্ষা করেন নিশ্চয়ই । এত ব্যথাতেও আমি তাকে ডাকা ভুলি কিনা তাই বোধহয় দেখেন । এ বড় কঠিন পরীক্ষা । শুধু চোখের জল ফেলেছি আর ভগবানকে ডেকেছি ঠাকুর আমায় মানুষ করো , আমাকে ভাল করে , আমায় দেখে যেন কেউ দুঃখ না পায় । আমার সন্তানেরা আমার গর্বের সন্তান , তাই কেঁদেছি আর বলেছি ঠাকুর আমার বিকৃতি , ঈর্ষা আর দুরন্ত ক্রোধ থেকে আমার সন্তানদের মুক্ত রেখ । ওরা যেন আমার মত তিক্ত মন নিয়ে আমারই মত কষ্ট না পায় । আমার চোখের জলের তপস্যার কোন ফল কি কোনদিনই পাব না ? এইভাবে ব্যর্থ হয়ে যাবে এই চারটি জীবন ? কে জানে । কে জানে । রমাদি আমায় বলেন লিখতে । কি লিপি , আর কি - ই বা বলি । যা কিছু লিখবো সব কিছুই হয়েছে লেখা বহুদিন হতে , বহুতর ভাবে । আর যা কিছু বলবো তা বহুজনের মুখে হয়েছে মুখরিত । আর কি - ই বা হবে কিছু লিখে আর কিছু বলে ? জীবনের অর্ধেক দিন ত কেটেই গেছে শুধু বাজে কথায় আর বাজে কাজে । কোটি কোটি জীবনের মাঝে ছোট এই এইটুকু জীবন যে কোন দিন পৃথিবীর বুক থেকে নিঃশব্দে নিঃশেষ হয়ে যাবে। যাদের মনে আমার দাগ থাকবে কালের চক্র এসে মুছে দেবে সে দাগ কোটীকে গোটাক হওয়ার সাধনা সকলের নয় । সাধনা থাকলেও সিদ্ধি শুধু দু ' একজনের ভাগ্যে জোটে । তাই সাধনার পিছনে শুধুই মাথা কুটে কি হবে । তার চেয়ে আসল ভাবনার পাখা মেলে দাও । শুধু গান আর শুধু হাসিতে ডুবিয়ে আর ভরিয়ে দাও মনের প্রতিটি অলিগলি*[37] ।

## ঠাকুমার অভিমান

*আয়ারা সুপারী দেয়নি বলে উঠানে একেবারে শুয়ে পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছেন আমাদের ঠাকুমা । ৭৫ বছরের ঠাকুমা যেন ছোট অবুঝ চার বছরের একটি দুরন্ত অভিমানিনি মেয়ে । এদিকে টনটনে জ্ঞান আছে ,উনি ৭৫ বছরের ঠাকুমা , কিন্তু কার্যকলাপের বেলায় নিতান্ত শিশুর মত। যখন যার যা কিছু পান তক্ষুনি জানালা গলিয়ে একেবারে বাড়ীর বাইরে ফেলে দেন । শুধু একটুখানি চোখের আড়াল , ব্যাস উনি কারুর কিছু না কিছু ফেলবেনই । যদি তাই নিয়ে কেউ বকলো তাহলেই গালাগালির গোলাবর্ষণ চললো । তার মধ্যে হারামজাদী গুখেকোর বেটী ” এই দুটো বেশী । তার মধ্যে রাক্ষসী খোক্কসি -*

[37] চিত্ত, মনবিদ্যা বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা , সম্পাদক সুহৃত চন্দ্র পঞ্চমবর্ষ, কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৭০।পৃষ্ঠা ১৪৩-১৪৪

*মুখপুড়ী ইত্যাদি তো আছেই। যদি জোর করে ধরে কেউ বসিয়ে দেয় তাহলে তাকে লাথি দেখিয়ে , মুখ ভেংচে - হাউ মাউ করে কেঁদে একেবারে হাট বাধিয়ে দেন । কত পেসেন্টদের কত জিনিস যে উনি ফেলে দিয়েছেন , নষ্ট করেছেন । সব পেসেন্ট ওঁর নাতনী আর সবাইকেই হারামজাদী বলে ডাকেন । তবু ওকে আয়া , নার্স , পেসেন্ট সবাই ভালবাসে । কারণ ওর মধ্যে যে শিশুসুলভ সরলতা সেটাই ওঁর স্বভাবের সৌন্দর্য আর সেইটুকুই সকলকে আকর্ষণ করে , ভালবাসতে বাধ্য করে কারণ আমার মনে হয়। সকলের মধ্যেই ছোট একটি শিশু ঘুমিয়ে আছে। চমৎকার ছড়া বলেন কথায় কথায় একদিন। কি কথায় উনি চুপ করে আছেন , আমি বললাম কথা বলুন। উনি বললেন চুপ কর- "কি কথা কহিতে/ কি কথা কহিব/কথা কয়ে কি মান খোয়াব/ যখন কথার যোগ্য হবো/ দাড়িয়ে কথার জবাব দেব/ এক কথাতে হটিয়ে দেব" একদিন কথায় কথায় ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করলাম , আচ্ছ । ঠাকুমা আপনাকে দাদু কি বলে ডাকতেন ? উনি তক্ষুনি উত্তর দিলেন " আবদারিণী নাম রেখেছিল শ্যাম" ঠাকুমার ৭৫ বছর বয়স হলে কি হবে উনি দিব্যি আধুনিক । জিজ্ঞেস করলাম আপনার বরের নাম কি ছিল ? ঠাকুমা আম্লান বদনে বললেন ...। সার্থক নাম রেখেছিলেন ... " আদরিণী " তাই বটে! সার্থক নামটি । এখানের সকলেরই তিনি আদরিণী । আমি শুধু অবাক হয়ে ভাবি এই শিশুর মত ছোট মানুষকে কোন প্রাণে ড় বাড়ীতে ওঁকে দেখার মত একটা লোক রেখে বাড়ীতে কি চিকিৎসা করা সম্ভব নয় কিছুতেই ! জানিনা কোন সে নিষ্ঠুর পুত্রকন্যা[38] ।*

## " লোকে আমাকে পাগল বলে "

*লোকে আমাকে পাগল বলে তা বলুক তাতে আমার ক্ষতি কি ? তারা বলে আমি নাকি যা তা ভাবি আর বড্ড বাজে কথা বলি । লুম্বিনীতে পাঠিয়ে আমার চিকিৎসা করাবে , Shock Therapy করাবে , ওষধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখবে , যাতে আমার প্রলাপ বাক্য শুনে অন্য লোকের মাথা খারাপ না হয় , অন্য লোকের মস্তিষ্ক বিকৃত করবার আমার কোন ইচ্ছা বা চেষ্টা আদৌ নেই । কিন্তু আমার ভাববার -*

---

38 চিত্ত, মনবিদ্যা বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা , সম্পাদক সুহৃত চন্দ্র পঞ্চমবর্ষ, কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৭০।পৃষ্ঠা ১৪৪-১৪৫

স্বাধীনতা ছাড়তে আমি একেবারেই রাজি নই এবং যেটা সত্য বলে আমার মনে হবে সেটা ব্যক্ত করতে আমি একটুও কন্ঠিত হব না । বেশ ত ঘুম পাড়িয়ে রাখুক না , সব মানুষই ত ঘুমায়ে , কিন্তু জাগেত, আমিও আবার যখন জাগব তখন ভাবব আর যা ভাবচি তা বলব ।

আসল কথা হচ্ছে আমি যা ভাবি তারা সাধারণত সে রকম ভাবে না তাই আমাকে কেমন সন্দেহের চোখে দেখে আর মনে মনে বোধ হয় একটু ভয়ও পায় । সবাই অনেকটা এক রকমের খাওয়া দাওয়া করে , এক রকমের কথাবার্তা বলে এমন কি চিন্তাধারা প্রক্ষোভের গতি প্রভৃতি এক রকমের করে । নিয়ে মিলে মিসে পরস্পরের সঙ্গে একতা বোধ করে মোটামুটি বেশ নিশ্চিন্ত ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে । তার মধ্যে হঠাৎ যদি কেউ একেবারে কতক গুলো নতুন ধরনের কথা বলতে আরম্ভ করে যা তাদের স্বাভাবিক চিন্তাধারার সঙ্গে খাপ খায় না , তখন তাদের মধ্যে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয় ; নিরাপত্তা বোধ নষ্ট হবার উপক্রম হয়, তাই সেই লোকটাকে যতক্ষন না তাদের সমাজ থেকে সরিয়ে দিতে পারবে ততক্ষণ তারা স্বস্তি অনুভব করে না , তাদের নিরাপত্তা বোধ ফিরে আসে না, তাই সকলে মিলে তাকে পাগল আখ্যা দিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠে । সে সেরে উঠেছে কখন বলবে যখন সে তার নতুন ধরনের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে চিরাচরিত ধারা মেনে নিয়ে আর পাঁচজনের মতই ভাববে আর কাজ করবে ।

আমি কিন্তু এই আচরণের ঘোর বিরোধী । সেই জন্যেই বোধ হয় আমাকে পাগল বলে । তাদের হাতে ক্ষমতা আছে বলে তারা আমায় আমার ইচ্ছামত ভাবতে দেবে না ? এ অধিকার তাদের কে দিয়েছে ? নানা অজুহাতে আইনের শরনাপন্ন হয়ে চিন্তার প্রকাশ্য রূপ দেওয়াটা হয়ত তারা বন্ধ করতে পারে ; কিন্তু যতক্ষণ না আমার ভাববার ক্ষমতা একেবারে নষ্ট করে দিচ্ছে , ওষুধ খাইয়েই হোক আর অপারেশন করেই হোক ততক্ষণ আমি ভাববই এবং আমার মতই ভাবব , তাদের হিসেব মত নয় । আর ভাবনা গুলো ব্যক্ত করবার চেষ্টাও একটু আধটু করব ।

যেমন এখন করছি , আপনাদের কাছে জানাচ্ছি যাতে আপনাদের অসংখ্য পাঠক পাঠিকারা আমার কথাটা শুনতে পান । আপনারা ছাপাবেন কি না তা অবশ্য জানি না - না - ই ছাপালেন তাতে আমার কি গেল এল ? ) একটা কথাই বলি এবার কোন মানুষের চিন্তাধারা সাধারণ চিন্তাধারা থেকে তফাৎ , খুব বেশী তফাৎ হলেও তখনই তাকে পাগল বলে ঘৃণা করা এবং তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা আমার মতে আপনাদের অমার্জনীয় অপরাধ । কি যন্ত্রণাটাই না আপনারা , মানে আপনাদের সমাজ আমাকে দিয়েছে

কারণ আমি ভেবেছিলুম এবং সেটা বলেওছিলুম যে যাক সে কথা আর এখন তুলে কাজ নেই) এরোপ্লেনের যুগের আগে একজন বৈজ্ঞানিক ভেবেছিলেন যে মানুষ পাখীর মত আকাশে উড়ে বেড়াতে পারে তখন আপনাদের মত বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কি হাসিই হেসেছিলেন। গ্যালিলিওকে (Galilio ) হাজতে পুরে ফেলে কি স্বস্তির নিঃশ্বাসই ফেলেছিলেন। বিজ্ঞানের ইতিহাসের পাতা উলটালে বিজ্ঞ লোকদের এই রকম কীর্তির বহু পরিচয় মেলে । শুধু বিজ্ঞান কেন , আপনাদের সামাজিক আচার ব্যবহার , আপনাদের ধর্ম তথাকথিত কৃষ্টি , এ সবের বিরুদ্ধে কেউ কিছু ভাবলেই বা করলেই আপনারা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে ওঠেন , পারলে শাস্তি দেন , না পারলে গালাগালি করে গায়ের ঝাল ঝাড়েন। বিরুদ্ধাচরণ করাটাকে আপনারা প্রায় পাগলামির পর্যায়েই ফেলেন । কিন্তু গ্যালিলিও যা বলেছিলেন তা ত সত্যিই। আর মানুষ আজ কাল স্বচ্ছন্দে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে । তা হলে ? পাগলামি , আজগুবি কল্পনা এসব কথাগুলো ব্যবহার করবার আগে একটু ভেবে দেখবেন কি ?

আর দেখুন, যাকে আপনারা ছিট , পাগলামি বলেন সেই রকম একটু না থাকলে কোন লোক কোন বড় কাজ করতে পারে ? পেরেচে এ পর্যন্ত ? বড় বড় মনীষীরা যারা পৃথিবীতে সৃষ্টি মুলক , গঠন মূলক কাজ সব করে গেছেন তাদের অনেকেরই দৈনন্দিন জীবনের ইতিহাস জানতে আপনারা ত ছি , ছি , তোবা , তোবা করে দশহাত দূরে সরে যাবেন , না হয়ত বদ্ধ পাগল বলে খুব একটা বিজ্ঞতার পরিচয়

দেবেন । লোকটা না খেয়ে , খাবার চেষ্টা পর্যন্ত না করে পাহাড়ের একটা গুহায় দিনের পর দিন পড়ে আছে , পোকা মাকড়ে তাকে কামড়ে রক্তপাত করছে , লোকটার ভ্রুক্ষেপ নেই নিশ্চয়ই একে পাগল বলবেন । কিন্তু যখন শুনবেন লোকটি হচ্ছেন এমন মহর্ষি , হয়ত একটু ঢোক গিলবেন । কোন বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করতে হলে , তা সে বিজ্ঞানই হোক , সঙ্গীতই হোক , ধর্মই হোক যাই হোক ড় সকলেরই সাধনার দরকার । আর সাধনার সময় তাদের ব্যবহার সাধারণ লোকেদের মত ত হয়ই না , উপরন্তু অনেক অসঙ্গতিতে ভর্তি হয়ে উঠে । চিরাচরিত আচার ব্যবহার মেনে নিয়ে চিরাভ্যস্ত কাজ একই প্রনালীতে করে গিয়ে , আহার , নিদ্রা , মৈথুনের সুখ উপভোগ করে , জীবনটা নিশ্চয়ই কাটিয়ে দেওয়া যায় । দিন না আপনার , আমি কি বারণ করচি , আমি বারণ করবার কে ! কিন্তু আমি যদি ঠিক ঐ নিয়মে না চলি আপনারা অত খাপ্পা হয়ে ওঠেন কেন ? আমায় হাসপাতালে পাঠাবার জন্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন কেন ?

এই কেন  র জবাব দেবার জন্যে আপনারা উদগ্রীব হয়ে উঠেছেন নিশ্চয়ই । চোখা চোখা প্রশ্নবান সব পরের বারে এই পত্রিকা মারকং ছুড়বেন বোধহয় আমার দিকে । তা ছুড়ুন ,আমার ইচ্ছে হয় জবাব দোব যখন খুশ , না হয় দোব না । যা বলচি তার মধ্যে বোধহয় আরও জোর প্রমাণ পেয়েছেন যে আমি । শুধু পাগল নই , একেবারে যাকে বলে বদ্ধ পাগল উন্মাদ । মনে রাখবেন কিন্তু Truth begins in a minority of one । আগে বুদ্ধ  একা তারপর বৌদ্ধধর্ম । আগে Einstein Zvici Relativisits এর দল । আগে Christ তারপর Christianity । ভেবে দেখুন Robber ই robber না Alexander robber[39] .

- ইতি

আপনাদের মতে,“পাগল”

---

[39] চিত্ত, মনবিদ্যা বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা , সম্পাদক সুহৃত চন্দ্র দ্বিতীয় বর্ষ , তৃতীয় সংখ্যা, কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৬৭। পৃষ্ঠা ১৫১

# লুম্বিনি পার্ক মেন্টাল হাসপাতালে

# পাগলদের কণ্ঠ

পাগলদের আপণ মনের কথা ঔপনিবেশিক আশ্রমের ইতিহাসে ইতিপূর্বে লিপিবদ্ধ করা হতনা। উনিশ শতকে উন্মাদ আশ্রমের বিভিন্ন প্রতিবেদনে পাগলারা নিজেদের কথা বলার সুযোগ পেতনা। গোটা উনিশ শতকে সরকারি প্রতিবেদনে কোন রকম ভাবে পাগলদের মনের কথা ( Voice of Insane People ) বিন্দু মাত্র উল্লেখ নেই। শুধু মাত্র কয়েকটি Case History মধ্য দিয়ে আমরা পাগলদের কথা জানতে পারি। কিন্তু " পাগলদের নিজস্ব কণ্ঠ " সম্পর্কে এক নতুন উদ্ভবনি পক্রিয়া থেকে চিকিৎসা করার প্রয়াস ( এশিয়া মহাদেশের মনোচিকিৎসা ) সর্ব প্রথম পদ্ধতি শুরু করেন লুম্বিনি পার্ক হাসপাতাল। সেক্ষেত্রে মনোচিকিৎসক গিরিন্দ্র শেখর বসুর অবদান অনস্বীকার্য।

কিন্তু উন্মাদনার ইতিহাসে এতদিন শুধুমাত্র পাগলদের নিয়ে চর্চা হয়েছে। কিন্তু বিংশ শতকের শুরুতে যখন দেশীয় চিকিৎসকগন পাগলদের নিজস্ব কণ্ঠকে, মনোবিদ্যা চর্চার প্রধান গুরুত্ব দিতে শুরু করলো তখন উন্মাদনার ইতিহাসের ধারনা বদলে গেল, ও চিকিৎসা বাবস্থায় আমূল পরিবর্তন সুচিত হল[40]। অর্থাৎ পাগলদের বন্দি করে নয়, বরং সহনশীলতার সাথে তাঁর চিকিৎসার প্রয়োজন। এক্ষেত্রে চিত্ত প্রত্রিকায় একাধিক সংখ্যায় পাগলদের ডায়েরি ( লুম্বিনি রচনা ডায়েরি ) থেকে বিভিন্ন মানসিক রোগীর জীবন-যন্ত্রণা আপন স্মৃতিচারনার কথা জানতে পারি। সামাজিক ঘাত - প্রতিঘাত ইত্যাদি ঘটনা প্রবাহ " লুম্বিনি রচনা কলা " থেকে উঠে এসেছে। অর্থাৎ পাগল ( মানসিক রোগী) যে নিজস্ব কথা বলতে পারে, তাঁর উদাহরণ লুম্বিনির ডায়েরির মধ্য দেখতে পায়।

উন্মাদনার ইতিহাস চর্চায় এতদিন পাগলদের কণ্ঠ কে গুরুত্ব দিয়ে ইতিহাসে কেউ লেখেনি, শুধু মাত্র সরকারি তথ্য ও প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে পাগলদের ইতিহাস লেখা হয়েছে। আবার এটাও সত্য " পাগলদের আপন কথা " এবিষয়ে তথ্যর প্রাচুর্য খুব কম। কিন্তু উনিশ শতকের বিভিন্ন সাহিত্যিক উপাদান যেমন " উন্মাদ মন "( নগেন্দ্র চন্দ্র সংকলিত ), " পাগল

[40] বোস, গিরিন্দ্র শেখর , (এডিটেড) এ নিউ থিয়োরি অফ মেন্টাল লাইফ সমীক্ষা, জার্নাল অফ দ্যা ইন্ডিয়ান সাইকো-অ্যানালিটিক্যাল সোসাইটির ভলিউম- ২ নং। ১৯৪৮ কলকাতা, পৃ -১০৮

"( বিনোদ বিহারী সম্পাদিত ) , কিংবা পাঁচ পাগলদের ঘর ইত্যাদি গ্রন্থের পাগলদের নিজস্ব কণ্ঠ লিপিবদ্ধ আছে। এপ্রসঙ্গে চিত্ত প্রত্রিকায় একাধিক সংখ্যায় বিভিন্ন পাগলদের নিজ কলমে লেখা মনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

স্বাধীনতা লাভের পূর্বে মনোচিকিৎসার ইতিহাসে লুম্বিনি পার্ক মানসিক হাসপাতালটি ছিল এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ব্রিটিশ প্রশাসনের অধীনতা মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ বাক্তিগত মালিকানায় ভিত্তিতে যে পথ চলা শুরু অ্যাজ তাঁর ধারা অব্যাহত। এক কথায় ঔপৌনিক অধ্যায়ে পাগল দের চিকিৎসা নিয়ে দেশীয় উদ্যোগের ক্ষেত্রে লুম্বিনি হাসপাতালের অবদান ছিল অনস্বীকার্য। ইতিপূর্বে মানকুন্ডু উন্মাদ আশ্রমের কথা আমরা জানতে পরেছি, কিন্তু সেটি কখনোই ব্রিটিশ সরকারের প্রভাব মুক্ত ছিল না। সেই দিক থেকে বিচার করলে লুম্বিনি পার্ক হাসপাতাল ছিল একমাত্র ভিন্ন যা শুধুমাত্র পাশ্চ্যাত্য চিকিৎসায় নয় আয়ুর্বেদ পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হত। অর্থাৎ দেশীয় ও জাতীয়বোধের চেতনা পরিলক্ষিত হয়।

## উন্মাদ আশ্রম থেকে মনোচিকিৎসায় উত্তরণ
## সাইকো অ্যানালিটিক্যাল সোসাইটি ও গিরিন্দ্র শেখর বসু (১৯২৫)

গিরিন্দ্রশেখর বসু ঐতিহাসিক ভাবেই ভারতীয় মনোবিদ্যা চর্চার ইতিহাসে এক উজ্জ্বল নাম। তিনি ছিলেন ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিদ্যা বিভাগের প্রথম বছরের (১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ )স্নাতকোত্তর স্তরের ছাত্রটি ভারতবর্ষে মনোবিজ্ঞানের প্রথম ডিএসসি ; তাঁর গবেষণাভিত্তিক গ্রন্থ দিয়ে শুরু করে পরবর্তী সময়ে সিগমুন্ড ফ্রয়েড সাহেবের সঙ্গে এক সুদীর্ঘ কথোপকথনে প্রবৃত্ত ছিলেন। পরবর্তীতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের বিভাগীয় প্রধান এবং ভারতীয় সাইকোঅ্যানালিটিক সোসাইটির পুরোধা হিসাবে তাঁর ভাবনা ও পথচলা তৈরি করে ভারতীয় মনোবিদ্যা ও মনোসমীক্ষণের একটি গতিপথ। যদিও মনোবিদ্যার শতবর্ষব্যাপী পথচলা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেই এগিয়েছে [41] ।

---

[41] বোস, গিরিন্দ্র শেখর , (এডিটেড) ইন্ডিয়ান সাইকো-অ্যানালিটিক্যাল সোসাইটির ; নেম অফ মেম্বার সমীক্ষা, জার্নাল অফ দ্যা ইন্ডিয়ান সাইকো-অ্যানালিটিক্যাল সোসাইটির ভলিউম- ২ নং- ৩। ১৯৪৮ কলকাতা, পৃ – ২৬১

১৯২২ সালের ১ জানুয়ারি ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় গিরীন্দ্রশেখরের সভাপতিত্বে । ফ্রয়েড গিরীন্দ্রশেখরের সাংগঠনিক উদ্যোগে প্রভাবিত হন এবং সে বছরেই ভারতীয় সমিতি আন্তর্জাতিক মনঃসমীক্ষক সমিতির সদস্য হয় এবং গিরীন্দ্রশেখরকে তাদের International Journal of Psychoanalysis- এর সহযোগী সম্পাদক হবার অনুরোধ জানান । ভারতীয় মনঃসমীক্ষক সমিতির পনেরো জন প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের মধ্যে দুজন ছিলেন ব্রিটিশ এবং তাদের মধ্যে সবথেকে উল্লেখজনক হলেন ডাঃ ওয়েন , এ.আর . বার্কলে - হিল । ১৯২১ সাল থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত ফ্রয়েডের সঙ্গে গিরীন্দ্রশেখরের পত্রাচার চলে। ফ্লয়েড ও জোনসের অনুকূল্যে এটি খুব শীঘ্রই আন্ডর্জাতিক মনঃসমীক্ষা সংস্থার সদস্য রূপে স্বীকৃতি লাভ করে। সেই সঙ্গে ফ্রয়েড ও অন্যান্য সমীক্ষকদের মতো গিরীন্দ্রশেখরও স্বীকৃত সমীক্ষক রূপে স্বীকৃতি পেলেন[42] । গিরীন্দ্রশেখর তাঁর নিজ বাসভবনের এক তলায় এই সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। ৯৬ বছর পরেও এই সমিতি আজও সেই স্থান থেকেই মানসিক রোগগ্রস্থ ব্যাক্তিদের সাহায্য করে চলেছে। সুতারং, বলা যেতেই পারে যে এশিয়ার সর্বপ্রথম মনঃসমীক্ষা সমিতি শুধুমাত্র ভারতবর্ষের মানসিক চিকিৎসার পথিকৃৎই নয় আজকের দিনেও তা সমান যুগোপযোগী [43]। গিরীন্দ্রশেখর বসুর সম্পর্কে অমিতরঞ্জন বসুর ভুঁইফোঁড়ের মনোবিদ্যাচর্চা গ্রন্থ টি গুরুত্বপূর্ণ। অমিতরঞ্জন তাঁর পেশাগত মনোচিকিতসকের নির্ধারিত ভূমিকা থেকে বেরিয়ে ব্যক্তিগত গবেষণায় বারে বারে ফিরে গেছেন গিরীন্দ্রশেখরের কাছে । এছারাও গিরীন্দ্রশেখর বসু: অগ্রন্থিত বাংলা রচনাটি পরিচিত করে গিরীন্দ্রশেখরের মনোচিকিৎসা জগৎ সম্পর্কে । এই সময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমাজতাত্ত্বিক অধ্যাপক আশিস নন্দী , যাঁর বিশ্লেষণে গিরীন্দ্রশেখর বসু আমাদের কাছে পরিচিত হয়ে ওঠেন স্যাভেজ ফ্রয়েড নামে , তাঁরই লেখা মুখবন্ধ এই বইটিকে আলাদা এক মাত্রা দিয়েছে।তাঁর না-শ্বেতাঙ্গ পরিচয়ের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে নজরটান দিয়ে তাৎপর্য তৈরি করেন অধ্যাপক নন্দী । এই আড়াই পাতার কথামুখ বিশ্লেষণ করে এবং -

---

[42] দে নগেন্দ্রনাথ, (এডিটেড) সাম নোটস অন ফ্রয়েড পারসোনালিটি — হেনরিখ র‍্যাকার নেম অফ মেম্বার সমীক্ষা, জার্নাল অফ দ্য ইন্ডিয়ান সাইকো-অ্যানালিটিক্যাল সোসাইটি ভলিউম- ১১ নং- ৩ । ১৯৫৭ কলকাতা, পৃ - ১৪৭

[43] মিশ্র , পুস্পা ; পত্রিকা- ডেইলি, কলকাতায় কী ভাবে প্রতিষ্ঠিত হল এশিয়ার প্রথম মনঃসমীক্ষা প্রতিষ্ঠা : মানসিক সমস্যার প্রতিকারে পুরো মহাদেশেই পথিকৃৎ, আজও প্রাসঙ্গিক। 21-08-2018

ভাবনার দরজা খুলে দেয় , যে পথ ধরে এগিয়ে পাঠক পরিচিত হয়ে উঠবেন গিরীন্দ্রশেখর বসুরবিষয়ীতা (subjectivit̠)-ভাবনার সঙ্গে[44] ।

তিনি উপলব্ধি করেছিলেন মনরোগের ইতিহাস জানতে গেলে সমস্যা সমাধানের জন্য আরও গভীর দৃষ্টিকোন থেকে পুনরায় পরীক্ষা করা দরকার। পশ্চিমের ঔপনিবেশিক দেশগুলির চিকিৎসাব্যবস্থায় স্বাস্থ্য মন এবং দেহের ধারনাগুলি ঐতিহ্যবাহী যা পূর্বের ধারনার তুলনায় বিভিন্ন অর্থে বিকশিত হয়েছিল। এছাড়াও বৈঞ্জানিক কৃতিত্ব সংস্কারের সমাধান এবং ঔপনিবেশিক সময়ে আইনি প্রতিষ্ঠানের পূর্বের ঐতাহ্যবাহী চিকিৎসা পদ্ধতির উপর বিরোধ ও অবমাননাকর প্রভাব ছিল[45] । দেশিয় আনুশীলন এবং স্থানিয় রোগ নিরাময় প্রদ্ধতিকে পশ্চিমা ঔপনিবেশির উন্নত চিকিৎসার জন্য অবৈঞ্জানিক এবং কুসংস্কার হিসাবে বাদ দেওয়া হয়। উনিশ শতকের ইংল্যান্ডের চিকিৎসা প্রদ্ধতির মতোই ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানির চিকিৎসা ব্যবস্থা। এখানে পাগলামির শারীরবৃত্তীয় এবং জৈব কারনের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল।

গিরীন্দ্রশেখরের মনচিকিৎসা নিয়ে যে ভাবনা বহুমুখী চিন্তার মিশ্রণ । তাঁর মনোরোগ চিকিৎসার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল একদিকে খুব অল্প পরিমাণে ঔষধ দিতেন ; কিন্তু রোগী ও তার অভিভাবকদের নিকট আত্মীয়স্বজনদের মনোসমীক্ষণভিত্তিক পরামর্শ দিয়ে যেতেন । এতে তাদের চিকিৎসকের সাক্ষাতে বড়ো একটা আসতে হত না । টেলিফোন ও চিঠিতেই কাজ করতেন । তার চিকিৎসার প্রধান লক্ষ্য ছিল রোগীর উত্তেজনা ও রোগীর চারপাশের । আবহাওয়ার উত্তেজনা যতদূর সম্ভব কমিয়ে দেওয়া , যাতে যুক্তিপূর্ণ পরামর্শ উভয়েই সহজে শোনেন । তার সময়ে মানসিক রোগের এত বিভিন্ন শ্রেণীর ঔষধের আবিষ্কার হয়নি । তবু যা দু - একটি ছিল তাতেই যা ফল হত , এখনকার এত বৈচির্ত্যেও সে ফল দেখতে পাই না । চিকিৎসার খরচও অতি সামান্য ছিল , কেবল সময় ও ধৈর্য বেশি লাগত কিন্তু নিরাময় বেশ মজবুত হত ... তথাকথিত অ্যালোপ্যাথির মতোই হোমিওপ্যাথি , আয়ুর্বেদ , ইউনানি প্রভৃতি

---

[44] গিরীন্দ্রশেখর বসু ঐতিহাসিক ভাবেই ভারতীয় মনোবিদ্যা চর্চার ইতিহাসে এক উজ্জ্বল নাম পশ্চিমের প্রচলিত অনুকরণ নয়, মনোবিদ্যাচর্চার ভারতীয় একটি গতিপথ তৈরিতে ব্রতী ছিলেন, এই সময় , সম্পাদকীয় কলাম, ২১ জানুয়ারি ২০১৮

[45] বোস, গিরিন্দ্র শেখর , (এডিটেড) প্রসেডিং অফ দ্যা ইন্ডিয়ান সাইকো-অ্যানালিটিক্যাল সোসাইটি সমীক্ষা, জার্নাল অফ দ্য ইন্ডিয়ান সাইকো-অ্যানালিটিক্যাল সোসাইটি ভলিউম- ২ নং- ৩। ১৯৪৮ কলকাতা, পৃ – ২০৮

চিকিৎসা পদ্ধতির প্রতি সমান সম্মান দেখাতেন ড় কোনোটাকেই ছোটো করে দেখতেন না । নিজের অভিজ্ঞতা আমাদের পরম্পরাগত অভিজ্ঞতার প্রয়োগকে অবৈজ্ঞানিক মনে করতেন না। নিম , তুলসী , কালমেঘ , সর্পগন্ধা প্রভৃতি প্রচুর ব্যবহার করতেন। এগুলি কোনো বিশেষ চিকিৎসাপদ্ধতির একচেটিয়া অধিকার মনে করতেন না।এখানে উল্লেখ্য গিরীন্দ্র শেখরেরসাইকোঅ্যানালিসিস ছিল পশ্চিমের ধ্যান ধারণা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা , বরং তা তৎকালীন ভারতীয় মননেরও পাঠ। মনোবিজ্ঞানের পরিসরে শুধুমাত্র সাধারণীকৃত জ্ঞান ও বস্তুনিষ্ঠার পরিবর্তে বিষয়ীতা এবং সামাজিক -সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত কে তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। দর্শন শাস্ত্রের পরিসর থেকে উঠে এসে স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে মনোবিদ্যার গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করার তাগিদে তৈরি করছিলেন আচরণবাদ এবং তার নিজস্ব বস্তুবাদী প্রণালীসমূহ। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে চেতনার বিশে-ষণ দিয়ে মনোবিদ্যার যে পথচলা শুরু, আচরণবাদের হাত ধরে তার বিষয়ী স্থানচ্যুত হয়ে পরিণত হয়েছে বিষয়ে[46]

কিন্তু একটি প্রশ্ন গিরীন্দ্রশেখর তুলে ধরেছিলেন মানুষের মন সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে - মনোবিদ্যা কেন শারীরবিদ্যার অংশমাত্র নয়।‘একদিকে দার্শনিক যেমন মনোবিদ্যার উপর নিজের দখল সাব্যস্ত করতে ব্যস্ত, অপর দিকে তেমনি শারীরশাস্ত্রবিদ শারীরবিদের আপত্তির উত্তরে মনোবিদ বলতে পারেন , মনে পরিবর্তন হইলে শরীরে পরিবর্তন হয় , অতএব শারীরশাস্ত্র মনোবিদ্যার অন্তর্গত হওয়া উচিত।’ আজ ও যখন মনোবিদ্যা ঘুরপাক খায় তার অধীত বিষয় নিয়ে , তখন গিরীন্দ্রশেখরের উপলব্ধি আজও সময়োপযোগী একমাত্র নিজের মন ব্যতীত অপরের মন প্রত্যক্ষের বিষয় হতে পারে না[৪৭]। ‘মনোব্যাকরণ রচনাটিতে অত্যন্ত সরল ও সাবলীল ভাবে উপস্থাপিত ফ্রয়েডিয় মনঃসমীক্ষণের ইতিহাস, অন্য দিকে কারণতত্ত্বে মনের কারণ অনুসন্ধানের প্রবৃত্তির বিশে-ষণ পরতে পরতে সাজানো যুক্তির মাধ্যমে উপস্থাপিত। মনোজগতে কার্য-কারণ সম্পর্ক কেন আপেক্ষিক এবং সেখানে আমার বিশ্বাসই আমার সত্য এই আলোচনার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে মনোবিজ্ঞানের সেই বিশ্বাসটির ‘সত্য বিবিধ

---

[46] বোস , জি; টেকনিক অফ সাইকোঅ্যানালাইটিক থেরাপি—সমীক্ষা : জার্নাল অফ দ্য ইন্ডিয়ান সাইকো-অ্যানালিটিক্যাল সোসাইটি ভলিউম- ২নং, ১, ১৯৪৮, পৃ-৬৪

[47] জি বোস, অ্যা নিউ থিওরি অফ মেন্টাল লাইফ, সমীক্ষা : জার্নাল অফ দ্য ইন্ডিয়ান সাইকো-অ্যানালিটিক্যাল সোসাইটি ভলিউম- ২নং,২, ১৯৪৮, পৃ- ১০৮-১১০

(multiple truth) এবং সাপেক্ষ (contingent), তার নিরপেক্ষ অস্তিত্বের খোঁজ এক ভ্রান্তিবিলাস মাত্র।

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে প্রবাসী তে প্রকাশিত মনের রোগ রচনাটি এখানে সংকলিত - আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশে চোখে পড়ে এমন কিছু মানসিক সমস্যার বর্ণনার মধ্যে দিয়ে প্রাঞ্জল ভাবে আলোচনা করেছেন মনোরোগের সাধারণ বৈশিষ্ট্যও। এই রচনাটি এবং শিশুর মন - এই দুটি নিবন্ধের লক্ষ ছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে মনোবিদ্যার প্রয়োগ সংক্রান্ত ধারণার উন্মেষ। এই সমস্ত প্রয়োগ ফ্রয়েডিয় মনোসমীক্ষণের নীতি নির্ভর হলেও , প্রেক্ষিতে ভারতীয় জীবনযাত্রার সুস্পষ্ট ছবি। গিরীন্দ্রশেখর তাঁর নিজস্ব বিশে-ষণের মধ্য দিয়ে এক দিকে যেমন অবস্থান নিয়েছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতিতে ফ্রয়েডিয় অবদমনের তত্ত্বটি অপ্রযোজ্য , অন্য দিকে তিনি তেমনই ছিলেন ফ্রয়েডিয় তত্ত্বের একান্ত অনুগামী , অবশ্যই তাঁর নিজস্ব বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে[48]।

সংকলনটির একাধিক প্রবন্ধে উঠে আসে নির্জ্ঞান মন এবং মনোসমীক্ষণ নিয়ে তাঁর বিশে-ষণ ও যুক্তি।, কারণ তা আমাদের মনোবিশ্লেষণ সম্পর্কে সাধারণ মনোভাব বুঝতে সাহায্য করে। এ কথা মনে রাখতে হবে যে উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে পশ্চিমি বিজ্ঞানভাবনা যথেষ্ট ভাবেই ভারতে এসে পড়েছে , যার প্রভাব তৎকালীন চিন্তা -চেতনার মধ্যে ক্রমশ সুস্পষ্ট। ঔপনিবেশিক পরিবেশ এই প্রভাবকে স্বাভাবিক ভাবেই আরও ত্বরান্বিত করেছিল[49] ।

গিরীন্দ্রশেখরের ডিএসসি গবেষণা -গ্রন্থ কনসেপ্ট অফ রিপ্রেসন-এর প্রধান স্তম্ভ বিরুদ্ধ -ইচ্ছার তত্ত্ব , ভয় রচনাটিতে যা নিদর্শনের সাহায্যে বোঝানো রয়েছে। সমস্ত ইচ্ছার সঙ্গেই উপস্থিত থাকে একটি বিরুদ্ধ ইচ্ছা। এর সঙ্গে আমাদের পরবর্তী ঔপনিবেশিক জ্ঞানচর্চার কোনো ধারাবাহিকতা নেই । আমাদের প্রয়োজন হয়নি পাগল দের জাহাজে তুলে সমুদ্রে পাঠিয়ে দেবার কিংবা আলাদা কোনো গ্রাম তৈরি করে তাদের রেখে দেবার । সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ

[48] গিরীন্দ্রশেখর বসু ঐতিহাসিক ভাবেই ভারতীয় মনোবিদ্যা চর্চার ইতিহাসে এক উজ্জ্বল নাম, পশ্চিমের প্রচলিত অনুকরণ নয়, মনোবিদ্যাচর্চার ভারতীয় একটি গতিপথ তৈরিতে ব্রতী ছিলেন, এই সময় , সম্পাদকীয় কলাম, ২১ জানুয়ারি ২০১৮

[49] সমীক্ষা ইন্ডিয়ান সাইকো-অ্যানালিটিক্যাল সোসাইটি জার্নাল অফ দ্য ইন্ডিয়ান সাইকো-অ্যানালিটিক্যাল সোসাইটি ভলিউম- ২নং,৩, ১৯৪৮, পৃ- ২৬১

বদল বোধ হয় মন ও শরীর সম্পর্কিত ধারণায় এল যেখানে দেকার্তের মন ও শরীরের বিভাজনকে ( যা আধুনিক মনশ্চিকিৎসা তার হৃদয়ে ধারণ করে) স্বীকার করা হল । যে সব ওনচর্চাগুলি মন ও শরীরকে আলাদাভাবে দেখে না , এমনকি এক স্বতন্ত্র , একক এবং মুক্ত ব্যক্তির অস্তিত্ব বিষয়েও সন্দেহ প্রকাশ করে , সেগুলিকে দেখা হল পশ্চাৎপদ জ্ঞানচর্চা হিসাবে , যাকে বাতিল করার সময় এসে গিয়েছিল[50] ।

তাই ঔপনিবেশিক আধুনিকতায় উন্মাদ আশ্রম থেকে মানসিক হাস পাতালে ইতিহাস টি একটু অন্য রকম । উপনিবেশি-জাত পরিসরে পাশ্চাত্যের জ্ঞান ও তার প্রয়োগ জন্ম দিয়েছিল এক বর্ণসংকর জ্ঞানের। যার মাধ্যমে আমরা চিহ্নিত করে চলেছি আমাদের আধুনিক মনশ্চিকিৎসাকে । যে মনশ্চিকিৎসার জ্ঞান সর্বদা এক অভাবের দ্বারা আক্রান্ত , সে সদাই অবিকশিত এবং অনুন্নত । তাই তর্ক করেছি উলটো করে দেখার স্বপক্ষে । অর্থাৎ অনুন্নত কে উন্নত হিসাবে দেখতে । কারণ জ্ঞানচর্চার রাজনীতিটা এখানেই কেন্দ্রীভূত । সেই রাজনীতির একটা পরিসর ঔপনিবেশিক সময়ে আসাইলাম বা পাগলাগারদে মনশ্চিকিতসা চর্চা হয়েছে[51] । এখানে ঔপনিবেশিক প্রভু এবং শাসিতের মধ্যেকার ভিন্নতা সত্ত্বেও একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা গেছে, সেটি হল আধুনিক মনশ্চিকিৎসার মাধ্যমে ঔপনিবেশিক ক্ষমতাকে প্রসারিত ও শক্ত করা।

ভারতে আধুনিক পশ্চিমি মনশ্চিকিৎসার শুরু সেই উনিশ শতক থেকে লুনাটিক অ্যাসাইলাম বা উন্মাদাগার নির্মাণের মধ্য দিয়ে হলেও , জ্ঞানচর্চার প্রতিষ্ঠানে তার সূত্রপাত এক অর্থে ১৯১৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিদ্যার বা সাইকোলজির মাধ্যমে । উনবিংশ শতকের শেষ থেকে যেভাবে বাঙালি মনোবিদরা তাদের মৌলিক চিন্তাভাবনার পরিচয় দিতে শুরু করেছিলেন, সেক্ষেত্রে গিরীন্দ্রশেখরই মনোচিকিৎসা জগতের প্রথম মৌলিক চিন্তার সূত্রপাত করেন। বিশ্ব বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণার পাশাপাশি চালিয়েছেন ভারতীয় মনঃসমীক্ষণ সমিতি এবং

---

[50] ভট্টাচার্য, জয়ন্ত সম্পাদিত, ভারতের পতভুমিতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস, অমিত রঞ্জন বসু, পাগলামি বিষায়ক নতুন জ্ঞান' উনিশ শতকের বাংলায় পাগলাগারদের মন চিকিৎসা চর্চা ,অবঘাস, কল্কাতা,২০০৯ পৃষ্ঠা নং ২০৯

[51] তদেব ,পৃষ্ঠা ২১০

১৯৪০ - এর পরে যুক্ত হল লুম্বিনী পার্ক মেন্টাল হসপিটাল পরিচালনা ইত্যাদির মধ্য মানসিক রোগ চিকিৎসায় তিনি যথেষ্ট অবদান রেখেছিলেন[52] ।

ইন্ডিয়ান সাইকোঅ্যানালিটিকাল সোসাইটি তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত যে লুম্বিনীপার্ক মেন্টাল হসপিটাল।, তার বৈঠকখানাতে উৎকেন্দ্র -সমিতি নামে আলোচনা সভা বসত , সেখানে নিয়মিত ভাবে অংশ নিতেন বিবিধ পেশার মানুষ এবং মনোচিকিৎসা নিয়ে বিদ্যাচর্চা হতো । বাংলার ইতিহাসে গিরিন্দ্র শেখরের সময়ই মনশ্চিকিৎসার ছেদ পর্ব। কারণ এই সময় উন্মাদ আশ্রমের বদ্ধ ও আটক প্রথা বর্জন করে নবরূপে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে মানসিক রোগীদের চিকিৎসা সুরু হয়েছিল । সেই প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে উন্মাদ আশ্রম থেকে মনোচিকিৎসার উত্তরন এই পর্বে শুরু হয়েছিল।

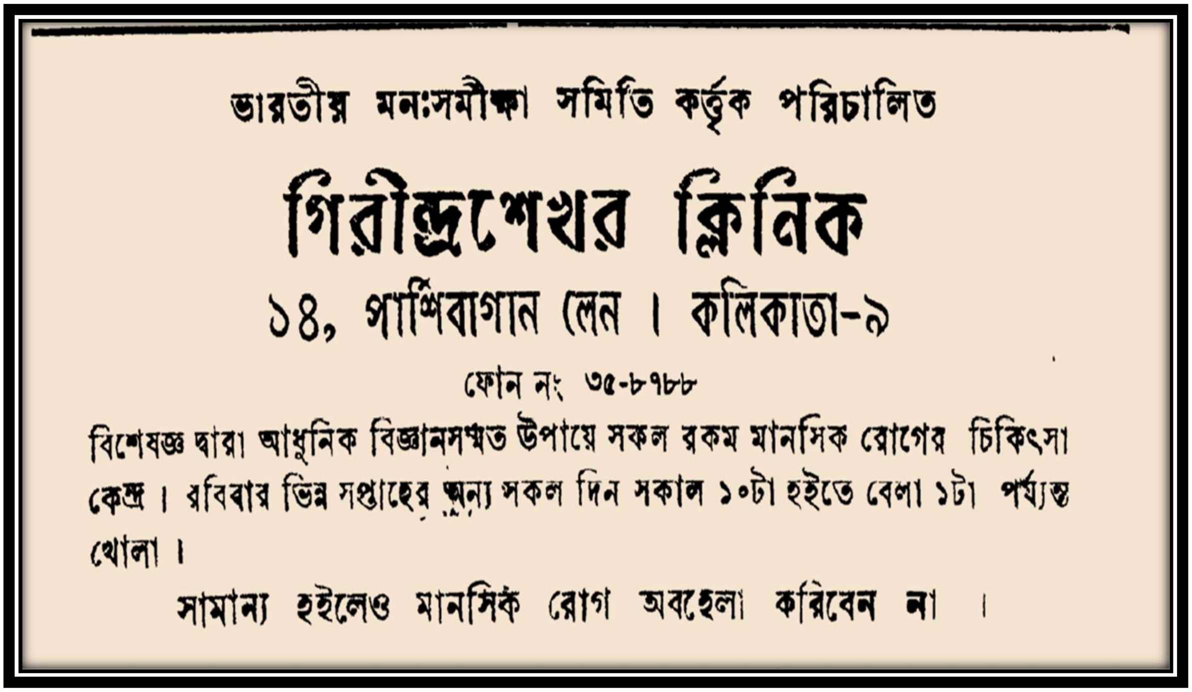


**মানসিক রোগ চিকিৎসা কেন্দ্র - গিরীন্দ্র শেখর ক্লিনিকের বিজ্ঞাপন[৫৩]**

[52] বি. সরদিন্দু (এডিটেড) অ্যা সাইকো অ্যানালিটিক্যাল স্টাডি : সমীক্ষা, জার্নাল অফ দ্যা ইন্ডিয়ান সাইকো-অ্যানালিটিক্যাল সোসাইটির ভলিউম- ৪০ নং- ৩। ১৯৮৬ কলকাতা, পৃ - ৯৪

[53] চিত্ত, মনবিদ্যা বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা , সম্পাদক সুহৃত চন্দ্র তৃতীয় বর্ষ , তৃতীয় সংখ্যা, কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৬৮।পৃষ্ঠা ১৪৫

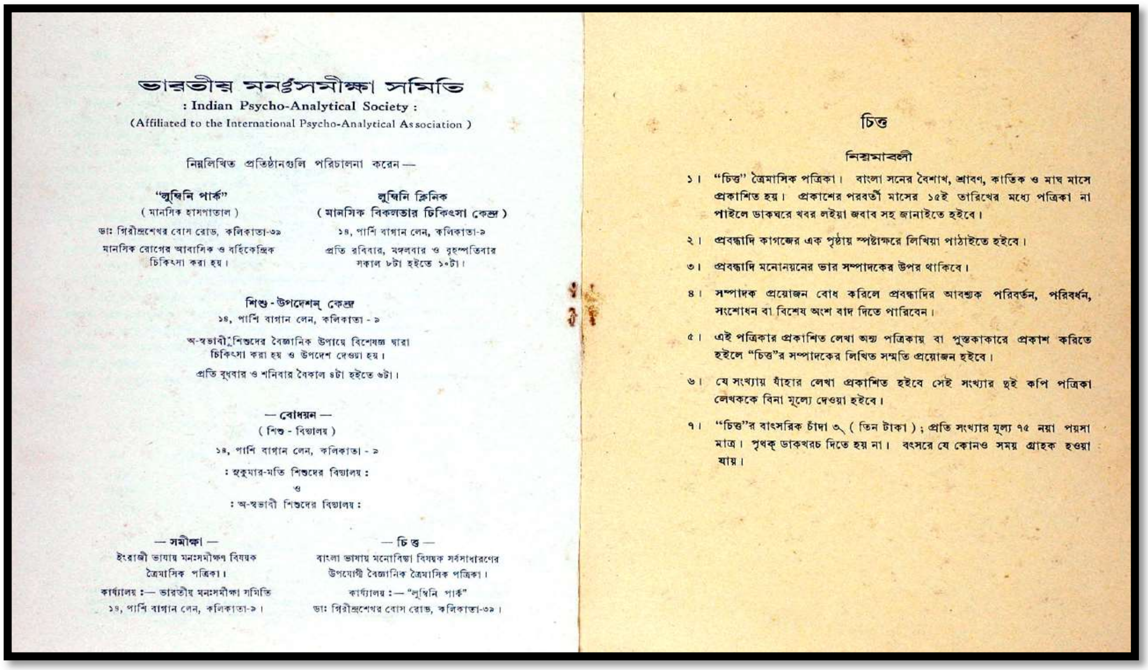

ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি

: Indian Psycho-Analytical Society :

(Affiliated to the International Psycho-Analytical Association)

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনা করেন —

"লুম্বিনি পার্ক"
(মানসিক হাসপাতাল)
ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বোস রোড, কলিকাতা-৩৯
মানসিক রোগের আবাসিক ও বহিঃকেন্দ্রিক চিকিৎসা করা হয়।

লুম্বিনি ক্লিনিক
(মানসিক বিকলতার চিকিৎসা কেন্দ্র)
১৪, পার্শি বাগান লেন, কলিকাতা-৯
প্রতি রবিবার, মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা হইতে ১০টা।

শিশু-উপদেশন্ কেন্দ্র
১৪, পার্শি বাগান লেন, কলিকাতা - ৯
অ-স্বভাবী শিশুদের বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশেষজ্ঞ দ্বারা চিকিৎসা করা হয় ও উপদেশ দেওয়া হয়।
প্রতি বুধবার ও শনিবার বৈকাল ৪টা হইতে ৬টা।

— বোধয়ন —
(শিশু - বিদ্যালয়)
১৪, পার্শি বাগান লেন, কলিকাতা - ৯
: সুকুমার-মতি শিশুদের বিদ্যালয় :
ও
: অ-স্বভাবী শিশুদের বিদ্যালয় :

— সমীক্ষা —
ইংরাজী ভাষায় মনঃসমীক্ষণ বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা।
কার্য্যালয় :— ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি
১৪, পার্শি বাগান লেন, কলিকাতা-৯।

— চিত্ত —
বাংলা ভাষায় মনোবিদ্যা বিষয়ক সর্বসাধারণের উপযোগী বৈজ্ঞানিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা।
কার্য্যালয় :— "লুম্বিনি পার্ক"
ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বোস রোড, কলিকাতা-৩৯।

চিত্ত

নিয়মাবলী

১। "চিত্ত" ত্রৈমাসিক পত্রিকা। বাংলা সনের বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্তিক ও মাঘ মাসে প্রকাশিত হয়। প্রকাশের পরবর্তী মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খবর লইয়া জবাব সহ জানাইতে হইবে।

২। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে।

৩। প্রবন্ধাদি মনোনয়নের ভার সম্পাদকের উপর থাকিবে।

৪। সম্পাদক প্রয়োজন বোধ করিলে প্রবন্ধাদির আবশ্যক পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন বা বিশেষ অংশ বাদ দিতে পারিবেন।

৫। এই পত্রিকার প্রকাশিত লেখা অন্য পত্রিকায় বা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে হইলে "চিত্ত"র সম্পাদকের লিখিত সম্মতি প্রয়োজন হইবে।

৬। যে সংখ্যায় যাঁহার লেখা প্রকাশিত হইবে সেই সংখ্যার দুই কপি পত্রিকা লেখককে বিনা মূল্যে দেওয়া হইবে।

৭। "চিত্ত"র বাৎসরিক চাঁদা ৩৲ (তিন টাকা); প্রতি সংখ্যার মূল্য ৭৫ নয়া পয়সা মাত্র। পৃথক্ ডাকখরচ দিতে হয় না। বৎসরে যে কোনও সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন কার্যকলাপ[54]

# ঔপনিবেশিক ভারতে মনোবিদ্যা ও মনোচিকিৎসা

ভারতে মন ও মনের তত্ত্ব নিয়ে চর্চার ইতিহাস প্রাচীনকাল থেকে হলেও এর জন্য কোনো পৃথক শাস্ত্র ছিল না। শাস্ত্রে এই মনকে কখনো অন্তঃকরণ , আত্মা , চিত্ত , বুদ্ধি , কখনো বা মনঃ শব্দ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই অন্তঃকরণ , আত্মা , চিত্ত নিয়ে বিস্তর জ্ঞানচর্চা হয়েছে এবং আজও হয় । ফলে এই জ্ঞানভান্ডারটি যথেষ্ট বৃহৎ ও সমৃদ্ধ । কিন্তু বিশেষ একটি জ্ঞানশৃঙ্খলা হিসাবে মনস্তত্ত্বের জন্ম হল Psychology অধ্যয়নের সঙ্গে। আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানচর্চার যে ব্যবস্থা ঔপনিবেশিক শাসনে গড়ে ওঠে তার মাধ্যমেই জন্ম নিয়েছিল মনস্তত্ত্বচর্চা । এমনকি মনস্তত্ত্ব , মনোবিদ্যা বা মনোবিজ্ঞান নামে যে বাংলা গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হতে শুরু করে ঊনবিংশ শতকের শেষের দিক থেকে , সেখানে ভারতীয় শাস্ত্র থেকে সেই অংশগুলিকে বাছাই করে সাজানো হয় , যা সাইকোলজির জ্ঞান- সংগঠনের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করে । এভাবেই

---

54 চিত্ত, মনবিদ্যা বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা , সম্পাদক সুহৃত চন্দ্র তৃতীয় বর্ষ , তৃতীয় সংখ্যা, কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৬৮।পৃষ্ঠা ১৪৬

আধুনিক জ্ঞানচর্চার উপযোগী করে ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে মেল্বন্ধন ঘটিয়ে মনোবিদ্যা বিষয়ক আলোচনাগুলি সংগঠিত হতে থাকে । ভারতের মনোচিকিৎসার জন্ম স্থান ছিল কলকাতা , যেখানে প্রথম স্াতকোত্তর স্তরে মনোচিকিৎসা সংক্রান্ত পঠনপাঠন শুরু হল ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে । ইতিপূর্বে দর্শনের পাঠক্রমে মানসিক ও নৈতিক দর্শন বিষয়ে কিছুটা মনস্তত্ত্ব পড়ানো হত । কিন্তু সাইকোলজিতে এম.এ বা এম.এস.সি ডিগ্রি নিয়ে সাইকোলজিস্ট বা মনস্তাত্ত্বিক হিসাবে বিশেষজ্ঞের জন্ম হল ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে , বিংশ শতকের প্রথম পর্বে। এও বলা যেতে পারে যে , মন ও মনের বিকলন বিষয়ক পেশাদারি জ্ঞানচর্চা , যা এতদিন লুনাটিক অ্যাসাইলামগুলির বিবরণীর মধ্যে সীমিত ছিল , এবারে সাধারনের জন্য উন্মুক্ত হল । জ্ঞানচর্চার এই বিশেষ শাখাটিকে আয়ত্ত করার সুযোগ এল শিক্ষিত ভারতবাসী তথা বাঙালির কাছে [55] । ফলে একই সাথে Psychology- র সঙ্গে সঙ্গে Psychiatry বা মনশ্চিকিৎসারও জন্ম হল । আগ্রহী ডাক্তাররা যেমন এম বি বি এস্ পাশ করে এসেছিলেন এম এসসি করতে , তেমনি শুরু হয়েছিল ডাক্তারি ছাত্রদের জন্য প্রাথমিক প্রশিক্ষণ এই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিভাগে ।

১৯১৫ সাল থেকে আজ পর্যন্ত যতগুলি ইতিহাসের আখ্যান রচিত হয়েছে ভারতে মনস্তত্ত্বচর্চা নিয়ে , তার একটা আন্দাজ নিলে বোঝা যায় যে এগুলি খন্ডিত এবং ভিন্ন - ভিন্ন সময় ও প্রসঙ্গের প্রভাবে নির্মিত । এমনকি কখনো কখনো সেগুলি পরস্পরবিরোধী, অর্থাৎ কোনো একটা নিরবচ্ছিন্ন , ধারাবাহিক এবং প্রগতিশীল ঐতিহাসিক আখ্যান পাওয়া অসম্ভব শুধু নয় , সেরকম কিছু খাড়া করা যায় কিনা সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ আছে । একবিংশ শতকের প্রথম দশকের শেষভাগে দাঁড়িয়ে মনস্তত্ত্বের জন্ম ও বৃদ্ধিকে প্রশ্ন করার আখ্যান এক বৈচির্ত্যময় এবং ভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে কীভাবে একটি বৈজ্ঞানিক ডিসকোর্স গড়ে উঠল যার উৎপত্তি ইয়োরোপে । আধুনিক মনস্তত্ত্বের আধিপত্য কি শুধুই ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানের একতরফা বিজয় ও প্রগতির কাহিনি ? এই আধিপত্যের প্রতি কি কোনো প্রশ্ন বা প্রতিরোধ ছিল না ? কারণ মনস্তত্ত্বচর্চার সময়ে এই ধারণাই ব্যাপক হয়ে উঠেছে যে , আধুনিক মনস্তত্ত্ব বাংলার সংস্কৃতিতে তার শ্রেষ্ঠত্ব

---

55 বসু ,আমিতরঞ্জন ;ভুঁই ফোরের মনো বিদ্যা চর্চা , চর্যাপদ , কোলকাতা পৃষ্ঠা- ১৯৬

প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে। এই ব্যাপক ধারণাটাকে প্রশ্ন করতে গিয়ে তাই এক বিস্তৃত ডিসকোর্সের মধ্যে সেইসব প্রতিরোধ ও প্রশ্নগুলিকে পড়তে চেয়েছি যা ভারতে মনস্তত্ত্বচর্চার গোড়ার দিকে উঠেছিল । কীভাবে এই নতুন জ্ঞানচর্চা এক ভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে নানান প্রশ্ন আর সমালোচনার মধ্য দিয়ে একটা হাইব্রিড বা বর্ণসংকর জ্ঞান উৎপাদন করছিল । যদিও এই বর্ণসংকরতাকে দেখেছি একটা অশুদ্ধ , ভ্রমাত্মক ও অবিকশিত জ্ঞানচর্চা হিসাবে । ফলে এমন একটা অসম্পূর্ণতার ফাদে পড়ে গিয়েছি যে বর্ণসংকরতাকে উপনিবেশিতের জ্ঞানক্ষমতার প্রকাশ হিসাবে দেখলে এই নেতিবাচক ফাদটি এড়ানো যেতে পারে ।

পাশ্চাত্যের আমদানি করা সাইকোলজিকে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত বলে মেনে নেওয়াটা একপেশে ছিল না। যারা আধুনিক সাইকোলজিকে সর্বজনীন ও সর্বতোগ্রাহ্য জ্ঞান করে আমাদের সংস্কৃতিজাত জ্ঞানকে অশুদ্ধ তকমা মেরে দেন তাদের কাছে এই সমালোচনার ডিসকোর্স বিশ্লেষণ করে প্রশ্ন তোলা দরকার সেই সর্বজনীন জ্ঞানচর্চার আধিপত্যের প্রতি । ঐতিহাসিক পদ্ধতি যে জ্ঞানচর্চার বর্তমান রাজনীতিকে উন্মোচিত করে নতুন তাত্ত্বিক বিতর্ক তুলতে পারে , এই আখ্যানে আমি সেই কথাই বলব , মনস্তত্ত্বচর্চার প্রেক্ষিতে[56] ।

## বাংলায় মনোবিদ্যা চর্চা

ঔপনিবেশিক ভারতে সাইকোলজির প্রভাব নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দুর্গানন্দ সিন্হা তার সুদীর্ঘ ভূমিকাতে এই জ্ঞানশৃঙ্খলার একটা ঐতিহাসিক বিবরণী দিয়েছেন । তার রচনাতে রয়েছে জাতীয়তাবাদী সমালোচনার সুর । মেকলে সাহেবের সেই বিখ্যাত মিনিট থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি মনস্তত্ত্বের আগমনের মুহূর্তটিকে পাশ্চাত্যকরণের বিজয় দৌড়ের প্রতীক হিসাবে দেখেছেন । প্রচুর পুরোনো লেখা আর নথি ঘেঁটে পাঠক্রম , পাঠ্যপুস্তক , নতুন বিভাগ খোলা, এসবের একটা দীর্ঘক্রমিকবিবরণী দিয়েছেন । বেশিরভাগ গবেষণাই তার মতে পাশ্চাত্যের অক্ষম অনুকরণ , কারণ খুব কম জোর দেওয়া হয়েছে ভারতীয় অবস্থার সঙ্গে ধারকরা মডেল ও ধারণাগুলি মিলিয়ে দেখার এবং প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রের জ্ঞানকে অঙ্গীভূত না করার। দুর্গানন্দ সিনহা মহাশয়ের এই আক্ষেপ ও সমালোচনাকে অনেকটা একপেশে লাগে । সিনহা

---

[56] বসু ,আমিতরঞ্জন ;ভুঁই ফোরের মনো বিদ্যা চর্চা , চর্যাপদ , কোলকাতা পৃষ্ঠা- ১৯৮

মহাশয়ের এই প্রখর সমালোচনা কার্যত এক বিবর্তনবাদী ইতিহাস যা সেই অসম্পূর্ণতার কথাই বারবার মনে করিয়ে দেয় । অর্থাৎ না পেরেছি । পশ্চিমের সমান হতে , না পেরেছি প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞান মেলাতে । তার এই প্রাচীন শাস্ত্রে ফিরে যাবার প্রবল বাসনা এক ধরনের বিশুদ্ধবাদই শুধু নয় , এই ঐতিহাসিক বিশে-ষণ মেনে নেওয়ার আর এক অর্থ সর্বজনীন ( বা পাশ্চাত্য ) মনস্তত্ত্বের আধিপত্যকে স্বীকার করে নেওয়া , সমালোচনা ও প্রশ্নগুলির অস্তিত্ব অস্বীকার করা । যদিও তার একটি অভিজ্ঞতাকে আমি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি , যেখানে তিনি মনস্তত্ত্বচর্চাকে হারিয়ে যেতে দেখছেন । এক যান্ত্রিক প্রকৌশলসর্বস্ব প্রয়োগে , আমাদের সামাজিক বিষয়গুলি থেকে নিজেকে বিছিন্ন করে দিয়ে । ভারতীয় মনস্তত্ত্ব যখন পাশ্চাত্যের মতন হতেই পারল না তখন কেন সে বিশুদ্ধ ভারতীয় হল না ? ফলে সিন্হা মহাশয়ের ইতিহাস সমালোচনা ও প্রশ্নবাচক আধুনিক ভারতীয় মনস্তত্ত্বের সন্ধান দিতে পারে না , মনস্তত্ত্বের ভারতীয়করণ - এর চেষ্টা করে গেছেন , কিন্তু বর্ণসংকরতার মাধ্যমে সৃজিত কাজগুলির তাৎপর্য বুঝতে পারেননি , এ যেন এক পরাজিত জাতীয়তাবাদী মনস্তত্ত্বের ইতিহাস ।

ভারতে সামাজিক মনস্তত্ত্বের বিবর্তন নিয়ে লেখার সময় অজিত দালাল ও গিরীশ্বর মিশ্র কোনো ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ দেননি । একটা সরল রূপরেখা পাওয়া যায় মাত্র । যদিও তারা লক্ষ করেছেন যে, গোড়ার দিকের বছরগুলি থেকে শুরু করে দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে সমাজবিদ্যার সঙ্গে মনস্তত্ত্বের কোনো নির্দিষ্ট অ্যাকাডেমিক যোগাযোগই ছিল না। ফলে সামাজিক মনস্তত্ত কখনোই দুটি জ্ঞান - শৃঙ্খলার মধ্যে সেতুর কাজ করে উঠতে পারেনি ।

ঠিক ইতিহাস বিষয়ক না হলেও , কুড়ি - পঁচিশ বছর অন্তর মনস্তাত্ত্বিক গবেষণার যেসব রিভিউ বেরোত ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস থেকে , সেখানে এক ধরনের তথ্য পাওয়া যায় যে , কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কবে কোর্স খোলা হয়েছে , কী কী বিশেষ বিভাগ নিয়ে পঠনপাঠন ও গবেষণা শুরু হয়েছে , বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে কী ধরনের সংগঠন গড়ে উঠেছে । কিন্তু সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বোধ হয় এর সুদীর্ঘ বিবলিওগ্রাফি। ওই সময়ের প্রায় সব গবেষণাপত্রের শীর্ষকগুলি পড়লে ধারণা করা যায় মূল স্রোতের ধারাটি কতটা ব্যাপকভাবে বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠেছিল, যার প্রায় সবটাই প্রকৌশলভিত্তিক। University College of Science Technology & Agriculture এর ৭৫ বছরে ( ১৯১৪-১৯৮৯) যে স্মারকগ্রন্থটি প্রকাশিত

হয় সেখানে একটা সংক্ষিপ্ত , ক্রমিক বিবরণী আছে । মনস্তত্ত্ব বিভাগের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তীর সময় প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থেও দুটি ছোটো ছোটো লেখা আছে । দুর্গানন্দ সিন্হা মহাশয়ের রচনাটি বাদ দিলে সাম্প্রতিক রচনাগুলির সবকটিই এক ধরনের সরলরৈখিক , ক্রমিক ইতিহাসের কথা বলে । যদিও দুর্গানন্দআমদানিকৃত পাশ্চাত্য মনস্ড়ত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা প্রায় কিছুই করেননি । অথচ আমরা এবার দেখতে পাব যে বিশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্বকে ভারতীয় বর্গগুলি দিয়ে বিচার করে এক ধরনের synthetic বা বর্ণসংকর জ্ঞানের সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে।

## মনস্তত্ত্বচর্চা শুরুর নমুনা

মনস্তত্ত্ববিদেরা মঞ্চে আসার আগে থেকেই থিওসফিকাল সোসাইটির সদস্যরা ভারতীয় তত্ত্বচর্চা বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু করেছিলেন এবং মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ে ভগবান দাসের The Sciences of the Emotions প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে । প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র পাঠে সমৃদ্ধ , বিশে-ষণী বর্ণনা আর সংস্কৃত ভাষায় রচিত লেখাটিকে আধুনিক ইংরাজি পাঠকের কাছে ভারতীয় শাস্ত্রের মন বিষয়ক আলোচনার একটা ক্লাসিক বলা চলে । ভগবান দাস সেইসব অল্প সংখ্যক লেখকদের মধ্যে পড়েন , যারা বিশ শতকের গোড়া থেকে দীর্ঘকাল পুব - পশ্চিমের তুলনামূলক গবেষণা করেছেন । জীবনের সায়াহ্নে এসে , মনঃসমীক্ষণ আর প্রাচীন ভারতীয় মনোবিশে-ষণের ( সাইকো - সিনথেসিস ) তুলনা করতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে , নতুনভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মনকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যা দুজনের কাছেই । বোধগম্য হয় এবং অপরকে ছাটো করা বা ভুল বোঝার বদলে সক্ষম হয়ে উঠতে হবে সঠিক ভাবে অপরকে বোঝার ও প্রশংসা করার[57] ।

## মনস্তত্ত্বের জ্ঞানশৃঙ্খলার উদ্ভব

ভারতের সায়েন্স কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশন ১৯৩৮ সালে , ভারতে বিজ্ঞানের প্রগতির পঁচিশ বছর পূর্তির একটা সমীক্ষা প্রকাশ করে , যার মনস্তত্ত্বের অধ্যায়টা লিখেছিলেন গিরীন্দ্রশেখর বসু ।

---

[57] বসু ,আমিতরঞ্জন ;ভুঁই ফোরের মনো বিদ্যা চর্চা , চর্যাপদ , কোলকাতা পৃষ্ঠা- ১৯৮

সেখানে তিনি আধুনিক মনোবিদ্যার আন্দোলনের সূত্রপাত হিসাবে ১৮৭৫ সালে লাইপজিগে উন্ডের মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষাগার স্থাপনাকে চিহ্নিত করেন । তিরিশ বছর পরে সেই আন্দোলন ভারতে পৌছায় এবং ১৯০৫ সালে তদানীন্তন উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় । স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে মনস্তত্ত্বের স্নাতকোত্তর পাঠক্রম শুরু করার পদক্ষেপ নেন এবং ড এন সেনগুপ্তর তত্ত্বাবধানে প্রথম মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষাগার চালু হয় ১৯১৬ তে। গিরীন্দ্রশেখরের এই রিপোর্টটিকে মনস্তত্ত্বের প্রথম পঁচিশ বছরের একটা সংক্ষিপ্ত , ধারাবাহিক ইতিহাস বলা যায় [58]। আর একটি রচনা , যা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ববিভাগের ইতিহাস হিসেবে রচিত হয়েছিল , এর একবছর আগে প্রকাশিত হয় , যার লেখক ছিলেন গিরীন্দ্রশেখরের সহকর্মী সুহৃৎচন্দ্র মিত্র ।

গিরীন্দ্রশেখরের রচনাটি ভারতের পরিপ্রেক্ষিত থেকে লেখা এবং ১৫৩ টি রচনারপঞ্জি সংবলিত । যা দেখে বোঝা যায় গত পঁচিশ বছরে মনস্তাত্ত্বিক গবেষণার বৃদ্ধি কতটা হয়েছে । গিরীন্দ্রশেখরের মতে এই মনস্তাত্ত্বিক আন্দোলন ভারতে একটা স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে এবং ১৯২৫ থেকে ভারতের সায়েন্স কংগ্রেস ও ভারতীয় দর্শনের কংগ্রেসের অধিবেশনে একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে মনস্তত্ত্ব আলোচিত হতে শুরু করেছে[59]। তার নিজের উদ্যোগে ১৯২২ সালে ভারতীয় মনঃসমীক্ষক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯২৮ সালে গড়ে ওঠে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ মেন্টাল হাইজিন । শেষের সংস্থাটির উদ্যোগেই প্রথম মনশ্চিকিৎসার আউটডোরে চালু হয় কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে ( বর্তমান আর.জি.কর মেডিকেল কলেজে ) , ১৯৩৩ সালে । এই আন্দোলনের প্রমাণ হিসাবে গিরীন্দ্রশেখর তালিকায় যোগ করেন ১৯৩৫ এলাহোরের এ সি কলেজে প্রতিষ্ঠিত চাইল্ড অ্যান্ড ইয়ুথ গাইডেন্স সেন্টার , কলকাতা আর কালিম্পঙে দুর্বল - মনের শিশুদের জন্য দুটি হোম , উদয়পুরের পরেন্টস লিগ, ন্যাশনাল মেডিকেল ইন্সটিটিউটে ডা . বি.সি.ঘঘাযের মনশ্চিকিৎসার ক্লিনিক এবং দিলি-তে ইউ.এস ঘেবার মনস্তাত্ত্বিক ক্লিনিকের কথা । এসবই ১৯৩০ - এর দশকের মধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছিল ।

---

[58] মেন্টাল হেলথ ইন এশিয়া অ্যান্ড দ্যা প্যাসিফিক ; হিস্টোরিক্যাল অ্যান্ড কালচারাল পারস্পেক্টিভ এডিটেড বাই হ্যারি মিনাস, মিল্টন লুইস ২০১৭, স্প্রিংগার প্রেস, পৃ – ৩১৯

[59] ব্রজ ভূষণ, (এডিটেড) এমিনেন্ট ইন্ডিয়ান সাইকলজিস্ট : ১০০ ইয়ার্স অফ সাইকোলজি ইন ইন্ডিয়া ২০১৭।

গিরীন্দ্রশেখরের মতে ভারতীয় গবেষণার মধ্যে সবথেকে উচ্চমানের কাজগুলি তাত্ত্বিক । যেখানে চেতনা, ইচ্ছা , আবেগ , প্রবৃত্তি সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে কাজ হয়েছে । এটা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ উত্তর - ঔপনিবেশিক সময়ে এসে দেখা যাবে ভালো তাত্ত্বিক কাজের মান ও সংখ্যা দুই-ই কমেছে । তার জায়গা । নিয়েছে প্রশ্নহীনভাবে পাশ্চাত্য কনসেপ্টগুলি মেনে পরীক্ষামূলক ও জৈব কেন্দ্রিক কাজ । ১৯৭৩ সালে শিবকুমার মিত্র দশ বছরের মনস্তত্ত্বের বিকাশের সমীক্ষা করতে গিয়ে বলেছিলেন যে , আমাদের কাজগুলি আন্তর্জাতিক মানের না হবার প্রধান কারণ আমরা তত্ত্ব সৃষ্টির চেয়ে তত্ত্বকে পরীক্ষা করার ওপরই বেশি জোর দিয়েছি । মনস্তত্ত্বের যতগুলি শাখায় সে - সময় ভারতে কাজ হচ্ছিল , গিরীন্দ্রশেখর তার সব কটিরই বিবরণী দিয়েছেন । বিশেষ করে লোক মনস্তত্ত্ব ( ফোক সাইকোলজি ) এবং সামাজিক মনস্তত্ত্বের ( সোশাল সাইকোলজি ) ব্যাপারে তিনি খুবই আগ্রহ দেখিয়েছিলেন । তার মতে : লোক ও সামাজিক মনস্তত্ত্বে খুবই ফলদায়ী কাজ করা যেতে পারে। ভারতে আধুনিক থেকে প্রাচীন এই দু - ধরনের সংস্কৃতিই দেখতে পাওয়া যায় পাশাপাশি । ভারতের প্রাচীন পন্ডিতেরা অন্তর্দর্শন বিষয়ে পারঙ্গম ছিলেন এবং ভারতীয় মনোবিদ সেই ঐতিহ্যের উত্তরসূরি । এদিক থেকে ভারতীয়রা পাশ্চাত্যের সহকর্মীদের থেকে বেশি সুবিধাজনক অবস্থানে আছেন । যদি এই জ্ঞান ঠিকভাবে চর্চাও আত্মস্থ করা যায় , তাহলে চিন্তার প্রক্রিয়া , উচ্চতর সাংস্কৃতিক বাধাজনিত সমস্যাগুলিকে গভীর অন্তর্দর্শনের সাহায্যে সমাধান করা সম্ভব । সাধুও যযাগীদের অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাগুলি মনস্তাত্ত্বিক গবেষণার বিষয়বস্তু হওয়া উচিত আর ভারতবর্ষই হল এর সব থেকে উপযুক্ত স্থান[৬০]। রচনাটি পড়লে এটা বোঝা যায় যে , গিরীন্দ্রশেখর আধুনিক মনস্তত্ত্বচর্চার একটা অ্যাকাডেমিক সীমারেখা নির্মাণ করেছিলেন এবং তার সুদীর্ঘ বিবলিওগ্রাফিতে ভগবান দাসের কোনো কাজের উল্লেখ নেই । অথচ গিরীন্দ্রশেখরের আগেই ভগবান দাস ভারতীয় শাস্ত্রগুলির মনস্তাত্ত্বিক অধ্যয়ন নিয়ে লিখেছিলেন । তাই গিরীন্দ্রশেখর পাঠের সময় আমাদের সচেতন থাকা উচিত তিনি কাদের কাদের বর্জন করেছিলেন । গিরীন্দ্রশেখরতার সমসাময়িক এলিট অ্যাকাডেমিক সংস্কৃতির উর্ধ্বে ছিলেন না , যেখানে অন্য গবেষকদের বা বুদ্ধিজীবীদের কাজের স্বীকৃতি দেবার একটা রাজনীতি চলত । তাছাড়া পঁচিশ বছরের যে ইতিহাস গিরীন্দ্রশেখর রচনা

---

[60] বসু ,আমিতরঞ্জন ;ভুঁই ফোরের মনো বিদ্যা চর্চা , চর্যাপদ , কোলকাতা পৃষ্ঠা- ২০০

করেছিলেন ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের জন্য , সেখানে এই নতুন বিজ্ঞানের প্রতি প্রশ্ন না থাকাটাই স্বাভাবিক ।ভারতীয় শাস্ত্র ও সংস্কৃতির প্রতি তিনি গভীর মনোযোগী হয়ে উঠেছিলেন শেষের দিকে। লোক মনস্তত্ত্ব নিয়ে আগ্রহজনক মন্তব্য করলেও তিনি কোনো কাজ এ - বিষয়ে করে যেতে পারেননি।তবুও রচনাটি আমাদের কাছে অনেক তথ্য হাজির করে যা ইতিহাসনির্মাণে কাজে লাগে । সুহৃৎ চন্দ্র মিত্রও তার রচনাটি শুরু করেছেন তত্ত্ব বিষয়ক প্রসঙ্গ দিয়ে । তিনি বলেছেন যে , মন বিষয়ক কোনও তত্ত্বই তার প্রবক্তা ও অনুরাগী ছাড়া অপরকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি।তবুও তত্ত্বনির্মাণ চলে , কারণ মন বিষয়ক প্রশ্নগুলিকে একটা সক্রিয় । চিন্তা ও তর্কের সূক্ষ্ম বিশে-ষণের মাধ্যমেই কেবলমাত্র ধরা যায় , যখন সেটা একটা ধাঁধার মতো এসে হাজির হয় ।

মিত্রর ঐতিহাসিক বিবরণীতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নতুন বিভাগের যে আখ্যান পাওয়া যায় , তথ্যের দিক থেকে , গিরীন্দ্রশেখরের রচনাটির থেকে সেটা ভিন্ন নয় । এর ভিন্নতা এসেছে এর স্থানীয়তা থেকে । যেখানে শুধু বিভাগীয় কাজকর্মের ওপরই জোর দেওয়া হয়েছে । ফলে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায় যা বিভাগীয় রাজনীতির দিকে ইঙ্গিত করে । যেমন , ডা . এন এন সেনগুপ্ত ১৯২৯ সালে এই বিভাগ ছেড়ে দিয়ে লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন মনস্তত্ত্ব বিভাগে যোগ দেন । গিরীন্দ্রশেখর তখন পার্ট টাইম লেকচারার হওয়া সত্ত্বেও তাকে প্রথমে ইনচার্জ পরে বিভাগীয় প্রধান করা হয় । এটা নিয়ে ড . মিত্র খুব একটা খুশি ছিলেন না । তিনি লিখেছেন ১৯৩০ সালে সমস্ত স্নাতকোত্তর পঠনপাঠনের একটা পুনর্গঠন করা হয় । বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে এবং আমাদের বিভাগের জন্য একটা প্রফেসরের পদ সৃষ্টি করা হয় । ছয় বছর হয়ে গেল পদটি এখনও ফাকা রয়েছে । এটা অস্বীকার করা যায় না যে , একটা বিভাগ এবং বিশেষত একটা দ্রুত বেড়ে ওঠা বিভাগের ক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টি হয় , যখন এমন পার্ট - টাইম লোক দিয়ে বিভাগীয় প্রধানের কাজ চালানো হয় ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর স্তরের পঠনপাঠন বিষয়ে ১৯১৮ ১৯১৯ সালের একটা প্রতিবেদন থেকে মনস্তত্ত্ববিভাগবিষয়ের কিছুখবরাখবর পাওয়া যায়। প্রতিবেদনটিতে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ২৩ অগাস্ট ১৯১৯ এ দেওয়া সেনেটের বক্তব্যের থেকে একটা অংশ তুলে দেওয়া হয়েছে । সেখানে তিনি নবগঠিত মনস্তত্ত্ব বিভাগকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে উল্লেখ

করলেও , স্বীকার করে নেন যে , স্থান ও অর্থ দুয়েরই অভাবে বেশ প্রতিকুল পরিস্থিতির মধ্যে বিভাগটি কাজ করে চলেছে । যেখানে ১৯১৭-১৮ বর্ষে মাত্র ৬ জন এই বিভাগে ঢুকেছিল , সেখানে ১৯১৮-১৯ এর মধ্যেই অ্যাডমিশনের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ১৫ তে ! এ বিষয়ে সেনেট মন্তব্য করে : এতে বোঝা যাচ্ছে যে , এই বিভাগে সিটের জন্য একটা উল্লেখজনক চাহিদা। সৃষ্টি হয়েছে এবং এটা আন্দাজ করা যায় যে বর্তমান সিটের সংখ্যা কম বলে মনে হতে বেশিদিন লাগবে না ক্রমবর্ধমান ছাত্রের জন্য । এদিকে ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করতে গিয়ে ছাত্রদের জন্য গবেষণার সুযোগ বাড়ানো যায়নি । এই অসুবিধা আরও বেড়েছে যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য দীর্ঘসময় লাগাতে এবং বেশ কিছু যন্ত্রপাতি স্থানীয়ভাবে তৈরি করা হয়েছে কিছু পরিবর্তন করে। মোট আটজন শিক্ষক নিয়ে বিভাগ চলছিল সে সময়ে [61] : তারা হলেন

১. বাবু মন্মথনাথ ব্যানার্জি , এম.এস.সি , ১৯১৬ ;

২. হরিদাস ভট্টাচার্য , এম.এ , গোল্ড মেডালিস্ট ; প্রাক্তন অধ্যাপক, স্কটিশ চার্চ কলেজ ,

৩. মি.বি.সি ঘোষ , এম.এ (এলাহাবাদ) ।, এম.এ.এম.বি, অধ্যাপক, বিদ্যাসাগর কলেজ

৪. মি. খগেন্দ্রনাথ মিত্র , বি এ ( উইসকনসিন ) , ১৯১৩

৫. ড. ব্রজেন্দ্রনাথ শীল , এম এ , পি এইচ ডি

৬ , বাবু নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত , এম এ , পি এইচ ডি

৭. গিরীন্দ্রশেখর বোস , এম এস সি , গোল্ড মেডালিস্ট , ১৯১৭ , এম ডি, ১৯১০

৮ , বাবু প্রমোদেরঞ্জন দাশগুপ্ত , এম এস সি , গোল্ড মেডালিস্ট,১৯১৬

প্রমোদেরঞ্জন দাশগুপ্ত পদত্যাগ করার পর ১৯১৯ এর ১ লা জানুয়ারি হরিপদ মাইতি যোগ দেন। থিয়োরি ও প্র্যাক্টিকাল নিয়েই সিলেবাস তৈরি হয়েছিল । প্র্যাক্টিকালের মধ্যে ছিল পরীক্ষামূলক কাজ , যন্ত্রপাতি ব্যবহারের বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ , শারীরিক , জৈবিক ও মানসিক নানা মাপজোক এবং সংখ্যাতত্ত্ব ও পরিমাণগত পদ্ধতি । থিয়োরি ক্লাসগুলো ভাগ করা হয়েছিল এভাবে :

---

[61] বোস, গিরিন্দ্র শেখর , (এডিটেড) ইন্ডিয়ান সাইকো-অ্যানালিটিক্যাল সোসাইটি ; নেম অফ মেম্বার সমীক্ষা, জার্নাল অফ দ্যা ইন্ডিয়ান সাইকো-অ্যানালিটিক্যাল সোসাইটির ভলিউম- ২ নং- ৩। ১৯৪৮ কলকাতা, পৃ - ২৬১

# মনোবিদ্যা সংক্রান্ত - বিষয় ও শিক্ষক

১ ম পেপার : ফিজিওলজিকাল সাইকোলজি (ক) জেনারেল সাইকোলজি ( মানুষ ও জাতির ইউ ,এন সেনগুপ্ত মনস্তত্ত্বের উপাদানসহ ) (খ) ফিজিওলজিকাল সাইকোলজি ,স্নায়ুতন্ত্রের মি. পি দাশগুপ্ত ফিজিওলজিসহ (গ) ফিজিওলজিকাল সাইকোলজি মি . এম ব্যানার্জি । ২য় পেপার: মেন্টাল প্যাথলজি ( মেন্টাল ডেফিসিয়েন্সি ও অপরাধ বিজ্ঞানের অধ্যয়ন - সহ ) (ক) মেন্টাল প্যাথলজি ও তার শারীরিক ভিত্তি মি . বি সি ঘোষ (খ) মেন্টাল প্যাথলজিও মনঃসমীক্ষণের পদ্ধতি । ৩ য় পেপার : অ্যানিমাল সাইকোলজি ( মানসিক বিবর্তন-সহ) (ক) অ্যানিমাল সাইকোলজি মি . কে মিত্র (খ) হেরিডিটি এবং সাধারণ বায়োলজিকাল মি . কে মিত্র ও ভিত্তি ( পশুদের মানসিক বিবর্তন - সহ ) মি , জি বোস মি . জি বোস. ৪ র্থ পেপার : চাইল্ড সাইকোলজি (ক) চাইল্ড সাইকোলজি মি সি দাশগুপ্ত (খ) এডুকেশনাল সাইকোলজি মি. এইচ ভট্টাচার্য মিত্রর বিবরণী থেকে পাওয়া যায় যে , এই সিলেবাসের কোনো পরিবর্তন পঁচিশ বছরে ঘটেনি ।২ য় পেপারের মধ্যে সাইকিয়াট্রির কিছু বিষয় পড়ানো হত , তার কথা মিত্র বলেছেন।

> মানসিক রোগ সংক্রান্ত বিষয়গুলি যা মেডিকেল শিক্ষাক্রমে হালকাভাবে ছুঁয়ে যাওয়া হত , ২য় পেপারে পড়ানো হত একেবারে সাম্প্রতিক মনস্তাত্ত্বিক ও অন্যান্য পদ্ধতিগুলি বিষয়ে , বিস্তারিতভাবে ।কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের মানসিক রোগ বহির্বিভাগে ক্লাস করতে যাওয়া ছিল বাধ্যতামূলক ।

প্রতি বছরই বেশ কিছু মেডিকেল গ্র্যাজুয়েট ও আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ক্লাসে আসত মনস্তত্ত্ব শিখতে। মিত্র বুঝেছিলেন যে এদের মধ্যে আগ্রহ বাড়ছে , কারণ । তখনও দেশে সাইকিয়াট্রির কোনো পোস্টগ্র্যাজুয়েট কোর্স শুরু হয়নি । তাই যতটা সম্ভব তাদের শেখানো হত বাস্তব প্রয়োগের কথা মাথায় রেখে । তার আখ্যানে শ্রী মিত্র এই ইতিহাসকে দেখেছিলেন শৈশবের কাহিনি হিসাবে। কারণ অন্যান্য বিভাগের মতো এর কোনো গৌরবময় ঐতিহ্য ছিল না , কোনো নির্দিষ্ট আদর্শও ছিল না বিভাগকে এগিয়ে নিয়ে যাবার । ফলে তার সময় অবধিও প্রধান কর্তব্যই ছিল আদর্শ স্থির করা এবং ঐতিহ্য নির্মাণ করা । বিভাগের উন্নতির সঙ্গে জড়িয়েছিল ইন্ডিয়ান সাইকোলজিকাল অ্যাসোসিয়েশন ও তার জার্নালের প্রতিষ্ঠা , ইন্ডিয়ান সাইকোঅ্যানালিটিকাল

সোসাইটি এবং ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর মেন্টাল হাইজিনের মতো সংস্থার প্রতিষ্ঠা। কারণ , মিত্রের মতে বিভাগের শিক্ষকেরাই এই সব প্রতিষ্ঠানগুলির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন । যদিও একজন পুরো সময়ের প্রফেসরের অভাব , স্থান । সংকুলান না হবার জন্য বারান্দা লেকচারের প্রবর্তন এবং সেই আশুতোষে বিল্ডিংসে লাইব্রেরি থাকার জন্য তিনি সমালোচনা করেছেন ।

ফলিত মনস্তত্ত্ব বা অ্যাপ-য়েড সাইকোলজি শুরু হয়েছিল মনস্তত্ত্ব বিভাগের একটা সেকশন বা শাখা হিসাবে এবং ১৯৩৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয় একজন রিসার্চ - স্কলারের পোস্ট অনুমাদেন করে ড . গিরীন্দ্রশেখর বসুর অধীনে বাঙালি । শিশুদের বুদ্ধির মাপ নেবার পরীক্ষা স্ট্যান্ডার্ডাইজড় করার জন্য । এর নয় । বছর পর ফলিত মনস্তত্ত্বে সার্টিফিকেট কোর্স চালু করা হয় এবং তারও সাত বছর পর চালু হয় পোস্টগর্যাজুয়েট কোর্স ! গিরীন্দ্রশেখরের একটি রিপোর্ট। এবং সিনহার একটি রিপোর্ট ২৪ থেকে পাওয়া যায় , কত ধরনের বুদ্ধি ও অন্যান্য বিষয়ের সমীক্ষা চালানো হয়েছিল বাঙালি শিশুদের মধ্যে এই বিভাগের মাধ্যমে[62] । বিশেষ করেগিরীন্দ্রশেখরের রিপোর্টটি পরিসংখ্যানে ভর্তি এবং সাড়ে তিন বছর ধরে ৪৬০ টি কেসের তথ্য সংগ্রহের পর তিনি প্রস্তাব করেছিলেন ৩৫০০ কেস সংগ্রহের , যাতে পরীক্ষাগুলিকে স্ট্যান্ডার্ডাইজ করা যায় ।

রিপোর্টটির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল , এর থেকে বোঝা যায় , বৃত্তিমূলক পরামর্শদানের মধ্য দিয়ে কীভাবে মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষাগুলি চালানো হয়েছিল সে - সময় । যেমন , তথ্য বলছে সমস্ত শিশুদের মধ্যে মাত্র শতকরা ৩ জনের সিভিল সার্ভিস , মেডিকেল সার্ভিস , ব্যরিস্টারি এবং সমতুল পেশার জন্য উপযুক্ত মনোভাব পাওয়া গিয়েছিল । বুদ্ধিবিষয়ক একই পরীক্ষায় বাঙালিরা লন্ডনের স্কুলের চেয়ে ভালো মানসিক অনুপাত ( মেন্টাল রেশিও ) দেখিয়েছিল । আর একটা জিনিস এই রিপোর্টে আমার নজর কেড়েছে, সেটা হল এই দীর্ঘ সমীক্ষা করতে গিয়ে ছাত্র - ছাত্রীদের প্রকৃত বয়স নির্ধারণের সমস্যা । কারণ প্রায়ই ইচ্ছাকৃত ভাবে ভুল তথ্য দেবার ঘটনা ধরা পড়ত । সারণিগুলোর ওপর চোখ বোলালে একটা ধারণা করা যায় যে , বাংলা - মাধ্যম স্কুল গুলিতে কত রকমের অসুবিধার মধ্যে শিক্ষাব্যবস্থা চলত।

---

[62] স্যামুয়েল টি. গ্ল্যাডিং, প্রমিলা বাত্রা, কাউন্সেলিং: অ্যা কমপ্রহেন্সিভ প্রফেশন, পিয়ারসন পাবলিকেশন ২০০৭, পৃ-১৯৯

বয়সের সমস্যার জন্য নয় থেকে ষোলো বছরের ছাত্র - ছাত্রীরা অনেক সময় একই শ্রেণিতে থাকত । ফলে শিক্ষার বিষয় বোঝানোর ক্ষেত্রে । সমস্যা দেখা দিত । গবেষকরা এও মনে করেছিলেন বয়ঃসন্ধির আগের এবং পরের ছাত্র - ছাত্রীদের একসাথে শিক্ষা দিলে নানান মানসিক সমস্যাও দেখা দিত। রিপোর্টটিতে ল্যাবরেটরিতে চালানো নানা ধরনের পরীক্ষার দশটা ছবি আছে । এমনকি তথ্য সারণিভুক্ত করা হচ্ছে , সেই ছবিও ! ছবিতে মনস্তাত্ত্বিকরা বেশিরভাগই ধুতি - পাঞ্জাবি বা ধুতি - পাঞ্জাবি শার্ট পরে , এবং মুখে কোনো এক্সপ্রেশন নেই। সব ছবিতেই যন্ত্রপাতিগুলো এমনভাবে সামনে সাজানো যে , সবমিলিয়ে একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারের এফেক্ট ফুটে ওঠে ।

গোড়ার দিকের মনস্তত্ত্বচর্চার এই ইতিহাসের বেশিরভাগটাই নির্মিত হয়েছিল ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের এই দশ বছর , পঁচিশ বছরের সমীক্ষাগুলো থেকে । শ্রী মিত্রর মনস্তত্ত্ব বিভাগের ওপর লেখাটি সামান্য ব্যতিক্রম , কারণ । এটি লেখা হয়েছিল ইন্ডিয়ান জার্নাল অফসাইকোলজির জন্য । এইইতিহাসগুলি থেকে আন্দাজ পাওয়া যায় যে ঔপনিবেশিক শাসন ও নিয়ন্ত্রণে কীভাবে এই জ্ঞানচর্চা শুরু হয়েছিল , যার স্থান বিজ্ঞানের মধ্যে প্রান্তিক ছিল । ইতিহাসের এই আখ্যানগুলি একটা সরলরৈখিক প্রগতির গল্প বললেও তার মধ্যকার সমালোচনাগুলি ছিল এই প্রগতি কাহিনির নানা ছেদবিন্দু । বোস ও মিত্র দুজনেরই লেখার রচনাপঞ্জির ওপর চোখ বোলালে নজর পড়ে সেইসব লেখা , যা আমদানি করা মনস্তত্ত্বকে নিজেদের সংস্কৃতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করেছিল । সাইকিয়াট্রি তখনও সাইকোলজির মধ্যেই মিশেছিল যদিও তার উপস্থিতি কোথাও কোথাও টের পাওয়া যায়। এই ইতিহাস ঘেঁটে এটা বুঝতে পারছি যে আমাদের সূচনাপর্বের মনস্তত্ত্বচর্চার মধ্যে একটা ক্রিটিকাল বা সমালোচনার ধারা তৈরি হয়ে গিয়েছিল । এখন দেখব এই ধারণার সম্পর্কে ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ সাইকোলজি - তে কিছু খুঁজে পাওয়া যায় কি না ।

ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণের সঙ্গে পদ্ধতি ও ব্যাখ্যা বা ইন্টারপ্রিটেশনের যে পার্থক্য এসব লেখায় ( বিশেষত গিরীন্দ্রশেখরের ) পাওয়া যায় তাতে বোঝা যায় যে , বিষয়টির প্রতি এঁদের প্রশ্ন ছিল । এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই বিস্তর আলোচনা হয়েছে হালে , তাই আমি সেটা এড়িয়ে সরাসরি ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ সাইকোলজি - র আলোচনায় চলে আসতে চাই । ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ

সাইকোলজি ( এরপর থেকে আই জে পি ) বেছে । নেওয়ার কারণ হল , এটাই প্রথম মনোবিদ্যার জার্নাল যা ভারতে প্রকাশিত হয়েছিল । সাইকিয়াট্রির দিক থেকে দেখলে এখানেই সে বিষয়ে চর্চা হত , যতদিন না ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ সাইকিয়াট্রি প্রকাশিত হয় ১৯৫১ সালে। দ্বিতীয়ত , এর সূত্রপাত অ্যাকাডেমিক পরিসরে , ইন্ডিয়ান মেডিকেল গেজেটের মতো এটা কোনো সরকারি প্রকাশনা ছিল না ।

আই.জে.পি ছিল ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান সাইকোলজিকাল অ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্র । এর প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালে , যার প্রথম লেখাটি ছিল সভাপতি ড. এন এন সেনগুপ্তর , যার শীর্ষক *'Psychology its present development and outlook'* ১৯১৫ রচনাটিতে সেনগুপ্ত সমসাময়িক মনস্তাত্ত্বিক ঘরানাগুলির কথা আলোচনা করতে গিয়ে দেখাচ্ছেন কীভাবে এগুলি পুরোনো তত্ত্বগুলিকে পালটেছে । তিনি মনে করেছেন যে দর্শনের ভূমিকা কখনো প্রধান হওয়া উচিত নয় , বরং ভারতীয় পরিস্থিতির ওপর আরও সমীক্ষাভিত্তিক ( এপেরিকাল ) এবং পরীক্ষাভিত্তিক ( এক্সপেরিমেন্টাল ) গবেষণা হওয়া উচিত। একটু ব্যঙ্গে র সুরেই তিনি মন্তব্য করেছেন : এক ধরনের অতীন্দ্রিয়বাদী আবহাওয়ার মধ্যে যেসব দার্শনিক ও আধা - দার্শনিক অনুমানভিত্তিক আলোচনা বেড়ে ওঠে , এবং সেইসব অধস্ফুট পূর্বাভাসগুলি এক ধরনের অতীন্দ্রিয়বাদী বাধা হয়ে দানা বাঁধে শুধু রাস্তায় নয় , শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভিতরেও। এটা এক ধরনের নেতিবাচক অবস্থার সৃষ্টি করে , যা সমস্ত বিজ্ঞানের প্রতি ক্রুদ্ধ , বিশেষত মনস্তত্ত্বের প্রতি । সেনগুপ্তর ঝোঁক বেশি ছিল সমাজ ও ব্যক্তিকে সাধারণীকৃত বর্গের সাহায্যে বস্তু হিসাবে অধ্যয়ন করে বিভিন্ন মানসিক অবস্থার একটা সাধারণ মনস্তাত্ত্বিক বিন্যাস প্রতিষ্ঠা করার। এ ব্যাপারে তিনি পরিষ্কার যে মনস্তত্ত্বের প্রগতি ক্রমাগত বস্তুনিষ্ঠ হবার ওপরই নির্ভরশীল। কারণ , যে বৈজ্ঞানিক আলোক প্রাপ্তি আমাদের ওপর প্রতিভাত হয়ে উঠেছে সেটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি মনস্তত্ত্ব এ - বিষয়ে পিছিয়ে থাকে ।

সুহৃৎ চন্দ্র মিত্রের কথা আগেই উল্লেখ করেছি , যিনি ভারতে মনস্তত্ত্বচর্চার পথিকৃৎদের মধ্যে অন্যতম, যদিও গিরীন্দ্রশেখরের তুলনায় কম আলোচিত। ওঁর বেশিরভাগ লেখাই আই জে পি - তে প্রকাশিত এবং উনি সাইকোলজির শৃঙ্খলার বাইরেও লিখেছেন। মিত্র স্কটিশচার্চ কলেজে অঙ্ক ও দর্শন নিয়ে পড়েন এবং দর্শনে বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছিলেন । সাইকোলজির

এম এ পরীক্ষাতেও তিনি প্রথম হন । তিনি বলেছেন যে তার মনস্তত্ত্বে আগ্রহ হবার কারণ তিনি যোগ ও যোগাভ্যাসের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি এর মাধ্যমে । খুঁজতে চেয়েছিলেন । মিত্র তার স্কটিশ কলেজের বন্ধু সুভাষচন্দ্র বোসকে মনস্তত্ত্বে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিলেন এবং সুভাষ বোস বিলেতে আই সি এস পরীক্ষা দিতে যাবার আগে কয়েক মাস শ্রী মিত্রের সঙ্গে ক্লাসও করেছিলেন । তবে মিত্র পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্বেই বেশি আগ্রহী ছিলেন এবং লাইপজিগেউন্ডের প্রতিষ্ঠিত ল্যাবরেটরিতে প্রফেসর ক্রুগারের কাছে ১৯২৬ সালে পি এইচ ডি করেন । সুভাষ বোসের প্রভাব যে মিত্রের ওপর পড়েছিল । সেটা বোঝা যায় তার রাজনীতি বিষয়ক রচনা দেখে । মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে রাজনৈতিক আলোচনা সম্ভবত তিনিই প্রথম আই জে পি - তে শুরু করেছিলেন ।

*The Spirit of the Nation in Peace and War* প্রবন্ধটি উনি উন্ডের বই *Die Nationen und ihre Philosophie*- র ওপর ভিত্তি করে লিখেছিলেন । সে - সময়ে যেরকমটা হত , অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীরা নানাভাবেই অন্যান্য লেখার মধ্যেও সমালোচনা ঢুকিয়ে দিতেন , সেইরকম মিত্রও করেছেন এই লেখায়

> *যুদ্ধের মধ্য দিয়েই যুযুধান ক্ষমতার একের অপরের প্রতি তীব্র ঘৃণা বেরিয়ে আসে , যা সাধারণ সময়ে তারা কূটনীতির নিয়মমাফিক মিথ্যা আর সৌজন্যের অসৎ বিনিময় দিয়ে ঢেকে রাখে ।*

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে এবং দ্রুত বিস্তারিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সংস্কৃতির মধ্যে মিত্রর এই মন্তব্যগুলি তেমন আশ্চর্যজনক কিছু । নয় ।উন্ডের বইয়ে ফরাসি , জার্মান আর ব্রিটিশ জাতীয়তাবাদের তুলনামূলক আলোচনার মধ্য থেকে মিত্র তাই ব্রিটিশদের সমালোচনা তুলে আনেন : যখন কোনো ইংলিশম্যান বিদেশে যান , যা তিনি প্রায়ই করেন , তখন সেখানকার লোকেদের জীবন ও মানসিকতা নিয়ে তার বিশেষ মাথাব্যথা থাকে না এবং কচিৎ তিনি সেখানকার ভাষা শেখার জন্য কষ্ট করেন ... ইংলিশম্যানের মানসিকতা বুঝতে গেলে আমাদের ইগোয়িস্টিক বা অহংবাদী শব্দটি ব্যবহার করতে হবে । তার দর্শন সঠিকভাবেই তার মানসিকতাকে প্রতিফলিত করে । অর্থাৎ প্রত্যেকে তার নিজের জন্য ভালো কিছু করলেই সবার ভালো হবার ব্যাপারটা সবথেকে ভালো ভাবে এগোয় এটাই হল নৈতিক দর্শনের আদর্শ । এটা হল পরিতৃপ্তির দর্শন , এটা অহংবাদী উপযোগিতাবাদ ( ইগোয়িস্টিক

ইউটিলিটারিয়ানিজম)। তবে এই উপনিবেশবাদের বিরোধী মনোভাবের উৎস কিন্তু রয়েছে উন্ডের জার্মান জাতীয়তাবাদী চেতনায়, যেখানে তিনি ফরাসি ও ব্রিটিশদের । সমালোচনা করেছেন । বলা যেতে পারে যে মিত্রের ব্রিটিশ বিরোধিতা এখানে । উন্ড ও সুভাষ বোসের জার্মান জাতীয়তাবাদের পক্ষপাতের সঙ্গে মিশে রয়েছে । মিত্রের জাতিরাষ্ট্রের চেতনা তেমন জটিল নয় , বরং কিছুটা সরলীকৃত এবং দেশ বা স্বদেশ চেতনার দ্বারা সমস্যায়িত নয় ।

দেশীয় মনোবিদ্যা চর্চার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রচনা হল এস. মিত্রর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রচনা *Suggestions for a New Theory of Emotion* অষ্টম ভারতীয় দর্শনের কংগ্রেসে মনস্তত্ত্ব বিভাগে পঠিত সভাপতির ভাষণ । সমসাময়িক মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বের একটা বিস্তত এবং বিশ্লেষণী সমীক্ষার পর তিনি বলেছেন আবেগ বা প্রক্ষোভ হল মনের আসল বস্তু বা এসেন্স । তাই মানসিক গন্ডগোল আসলে গভীর প্রক্ষোভের ভারসাম্য এবং সমন্বয়ের একটা ভাঙন। সেক্ষেত্রে একমাত্র আনন্দ অবস্থাই হল প্রকৃত সমন্বয়ের অবস্থা যা সমস্ত রকমের গন্ডগোলমুক্ত।

মিত্রের রচনাগুলির কোনোটাই সরাসরি ঔপনিবেশিক মনোবিদ্যাচর্চার সমালোচনা নয় । এমনকি ভারতীয় দর্শনের সাহায্যে পশ্চিমি তত্ত্বের সমালোচনাও নয় । যদিও দর্শন শাস্ত্রের অনুমানভিত্তিক তর্কের ছোঁয়া তার রচনায় পাওয়া যাবে । যখন তিনি প্রবৃত্তি বা instinct- এর ধারণা নিয়ে । লিখেছেন , তখন কিন্তু বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্যকার পার্থক্য ও বির্তকগুলি চিহ্নিত করলেও একটি ঐক্যবদ্ধ তত্ত্বে তিনি সেগুলিকে সংকুচিত করেননি । বরং সব তত্ত্বকে নিজের ধারণা দিয়ে যাচাই করে তবেই তাকে মানতেন তিনি । পাশাপাশি যদি এন এন সেনগুপ্তের উদাহরণ রাখা যায় তবে দেখতে পাব যে সেনগুপ্ত নির্দ্বিধায় বর্ণ - মনস্তত্ত্ব বা জধপব - Psycholog- র প্রতি আগ্রহী । হয়ে উঠেছেন কোনো প্রশ্ন ছাড়াই !

ভারতের ১৯২১ সালের সেন্সস রিপোর্ট উল্লেখ করে তিনি জানান যে , মানসিক ভাবে অসুস্থ মানুষদের সংখ্যা ৮৮,৩০৫ এবং তার মধ্যে শতকরা পঞ্চাশভাগই বংশগত । বিভিন্ন গবেষকদের কাজের কথা উল্লেখ করে তিনি তার প্রতিপাদ্যের স্বপক্ষে যুক্তি হাজির করেছিলেন। তিনি নিজে ৪,০৫০ টি জড়বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে অধ্যয়ন করে দেখেছেন তার মধ্যে ২৫.৪৩% সরাসরি বংশগত জড়বুদ্ধি থেকে এবং ৬.৯১% বংশগত মানসিক রোগ বা ইনস্যানিটি থেকে

উৎপন্ন । তার মতে এই সংখ্যাটা যেহেতু বেড়ে চলেছে তাই এই অনুপযুক্ত মানুষের সংখ্যা কমাননার জন্য তিনি তাদের নির্বীজকরণের প্রস্তাব দেন । ডা . মারী স্টোপসের কাজের প্রশংসা করে তিনি বলেন যে অনুপযুক্ত মানুষের জন্ম নিয়ন্ত্রণও করা উচিত অবিলম্বে । যা ভ্যাসেকটমির মতো সামান্য অপারেশনের দ্বারা সম্ভব ।

রাচি ইউরোপিয়ান মেন্টাল হাসপাতালের প্রধান , মেজর বার্কলে - হিল । আলোচনা শুরু করেন প্যাচেকোকে এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চমৎকার বক্তৃতা দেবার জন্য । তিনি বংশগতি ও মানসিক রোগ বিষয়ে দুটি তত্ত্বের কথা বলেন । প্রথমটি মেন্ডেলের মিউটেশন ডিফেক্ট এবং দ্বিতীয়টি জার্ম প্লাজম- এর অবনতির জন্য । প্রথমটির ক্ষেত্রে ২২ টি প্রজন্ম লেগে যাবে শতকরা ১ ভাগ মানসিক অপূর্ণতা কোনো একটি জনগোষ্ঠীতে ০.১ % কমিয়ে আনতে । দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে এটা অসম্ভব , কারণ পুরুষ ও নারী যাদের মধ্যেই মানসিক গন্ডগোল দেখা গেছে তাদের সবাইকে নির্বীজ করতে হবে । তার ধারণা মানসিক ত্রুটি ধীরে ধীরে একটি বংশের মধ্যে পরম্পরাগতভাবে কমতে থাকে , বাড়ে না । এ - বিষয়ে তিনি মিনকোঅস্তির গবেষণার কথা উল্লেখ করেন । তবে তিনি মনে করেছিলেন এই প্রস্তাব নিয়ে ভারতে প্যাচেকোর এত আশঙ্কা হবার কথা নয় ।

মানসিক চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত বার্কলে হিল এঁদের মধ্যে সব থেকে সুপরিচিত এবং জার্নালের কর্মসমিতিতে থাকার জন্য লেখাটি ছাপিয়ে দিয়েছিলেন সম্ভবত বিষয়টিকে সমসাময়িক পেশাজীবীদের মধ্যে প্রচারের জন্য । কিন্তু লেখাটির মধ্যে যেসব সমালোচনার সুর শুনতে পাওয়া যায় , তা থেকে বোঝা যায় । যে ভারতীয় সদস্যরা সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান এই দুই ধরনের উৎস ব্যবহার করেছিলেন তাঁদের তর্ককে জোরদার করতে ।নতুন , বিদেশি তত্ত্ব জার্মানি , আমেরিকা ও অন্যান্য জায়গায় গৃহীত হচ্ছে তাকে নির্দ্বিধায় মেনে নেননি । ভারতীয় মনশ্চিকিৎসকেরা , এমনকি বার্কলে - হিলও । নৃতত্ত্ব ও সমাজবিদ্যার দিক থেকেও মনোবিদ্যাকে দেখার চেষ্টা শুরু করেছিল আই জেপি । দুটি রচনার কথা উল্লেখ করব এখানে। প্রথমটা এ এস উডবার্নের লেখা , যিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মনস্তত্ত্বশাখার সভাপতি হিসাবে এটি ১৯৩০ সালে পাঠ করেছিলেন এবং সে - বছরেই সেটি প্রকাশিত হয় ।

বিষয় ছিল  নৃতত্ত্বে মনস্তত্ত্বের দান ।রচনাটিতে সমসাময়িক নৃতত্ত্বের ধারণায় জনগোষ্ঠীকে 'আদিম'  এবং সভ্য এই দুইভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে । এই দুই বর্গের যে পার্থক্য তিনি দেখিয়েছিলেন ভারতীয় এবং অন্যান্য উদাহরণ থেকে সেখানে কিন্তু নিরপেক্ষ বর্ণনা দেবার চেষ্টা সত্ত্বেও সভ্য জনগোষ্ঠীকে উচ্চ  বা  উন্নত  বলেই তিনি মনে করেছেন । আলোচনা আর বিশে-ষণ করতে গিয়ে অবশ্য তিনি তর্ক করেছেন যে আদিম বা প্রিমিটিভ জনগোষ্ঠীর মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক গবেষণায় তাদের অবস্থান থেকেই সেই জনগোষ্ঠীর ধ্যানধারণা , মনোজগৎ এবং মাটেভ বা উদ্দেশ্যকে অধ্যয়ন করা উচিত । আধুনিক বিশে-ষণের বর্গ দিয়ে এই জনগোষ্ঠীর ভাবনাচিন্তা ও কাজকর্মকে ব্যাখ্যা করা ভুল । বরং তাদের নিজস্ব ব্যাখ্যাগুলির সঙ্গে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে হয়তো কিছু সাধারণ ব্যাখ্যা বার করা যেতে পারে । রচনাটিতে প্রধানত বলার চেষ্টা হয়েছে কীভাবে মনস্তত্ত্ব নৃতাত্ত্বিক গবেষণার সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে ।

কোনো নির্দিষ্ট মনস্তবাত্ত্বিক পদ্ধতি দিয়ে রাধাকমল বর্ণনাগুলিকে বিশ্লেষণ । করলেও রচনাটিতে এরকম নানা ব্যাখ্যা আছে যা মনঃসমীক্ষণের সাহায্য নিয়েছে । ধর্মের মাধ্যমেই যে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে মানুষ তাঁদের মনের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলিকে সমাধান করেন সেই সামাজিক ক্ষেত্রটির ওপরই তিনি জোর দিয়েছেন ।দুটি রচনার ক্ষেত্রেই যেটা লক্ষণীয় , সেটা হল আচার অনুষ্ঠানগুলির গভীর অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নির্মাণ করা । বিজ্ঞানের নতুন শাখা মনোবিজ্ঞানকে তার সংস্কৃতির প্রতি মনোযোগী হয়ে উঠতে বলা।

*Psychology of Secrets* সেইসব রচনাগুলির মতো যা প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রের সঙ্গে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গোপন ভাবনা বা বিশ্বস্ততার সঙ্গে সম্পর্কিত ভাবনাগুলি কীভাবে মনোজগৎ এবং তার সংবেদনের মধ্যে বিকশিত হয়ে ওঠে তার একটা পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের সমান্তরাল ধারাবিবরণী বলা যায়। সেখানে Secrets বা গোপন ভাবনা আয়ুর্বেদের তামসিক গুণের মধ্যে পড়ে  ( মন্মথনাথ ব্যানার্জির, ) । তাই তমঃ বর্জন করতে পারলে , মনোজগতে গোপনীয়তা আর প্রকাশ্য হয়ে যাবার যে লুকোচুরি চলে তার অবসান ঘটে । কিন্তু আমরা জানি যে এই দুই ভিন্ন বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গিকে একজায়গায় এনে দাঁড় করানোর প্রচেষ্টার অন্তরালে ভারতীয় শাস্ত্রের মনস্তত্ত্বকেই উন্নত প্রমাণ করার বাসনাও থাকে । ইন্ডিয়ান জার্নাল

অফ সাইকোলজির তৎকালীন লেখাগুলি থেকে একটা ব্যাপার বেরিয়ে আসে যে, মনস্তত্ত্বচর্চার প্রতিষ্ঠালগ্নে যারা কাজ করেছিলেন তার এই নতুন বিজ্ঞানের দ্বারা উদ্দীপিত ও প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও একদম প্রশ্নাতীতভাবে সেগুলি মেনে নেননি । তাদের নিজস্ব পর্যবেক্ষণ ও ব্যাখ্যার পার্থক্যগুলিকে পড়া । তেমন দুরূহ কিছু নয় । আধুনিক জ্ঞানচর্চা করতে গিয়ে প্রায়ই তারা সংস্কৃতির প্রশ্নগুলির সঙ্গে সেটি তুলনা করে যাচাইকরেছেন ।

## সাংস্কৃতিক মনস্তত্ত্বের দিকে

ভারতে মনস্তত্ত্বচর্চার জন্মের যে আখ্যান সেখানে ডিসকোর্সগুলিকে সাজিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে এই ইতিহাস বা কুলজি কোনো নিরবচ্ছিন্ন বিবর্তনের কাহিনি বলে । ভারতে আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার প্রধান স্রোতের ইতিহাসগুলি যেভাবে অজ্ঞানতা থেকে বিজ্ঞানে সভ্য হয়ে ওঠার কাহিনি বলে , সেগুলিকে তাই নিপাট , স্ড়রহীন , সরল একটা বক্তব্য বলে মনে হয় । জাতীয়বাদী বিজ্ঞানের ইতিহাসেও লেখা হয় চাপা পড়ে যাওয়া প্রগতির কাহিনি । যেখানে বর্জিত হবে নানান লোক - বিশ্বাস ও নানান অনাধুনিক চর্চার ইতিহাস । বড়োজোর তা বর্ণিত হবে নেতিবাচক উদাহরণ হিসাবে , যাকে পুরোপুরি জয় না করা পর্যন্ত আমরা আধুনিক হয়ে উঠতে পারব না ! আর জাতীয়তাবাদের অপর একটি ধারা প্রবলভাবে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে ফিরে যাবার জোরালো ওকালতি করবে সব রকমের পাশ্চাত্য বিরোধিতা করে । লক্ষ করার বিষয় যে,এই বিজ্ঞানের ইতিহাসে ইসলাম , বৌদ্ধ এসব শাস্ত্রের কোনো চর্চা থাকে না । এই দু - ধরনের প্রবণতাই যেটা আড়াল করে দেয় , সেটা হল । জ্ঞান ও ক্ষমতার ইতিহাসের কথা । যে বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস নিয়ে বলার চেষ্টা করছি সেই বিজ্ঞানের প্রতি প্রশ্ন থাকলে এবং তথ্যের ভান্ডার থেকে সেই প্রশ্নগুলিকে খোঁজার চেষ্টা করলে বর্তমান বিজ্ঞানের চেহারাটা অন্যরকম দেখায় । তার ক্ষমতার ক্রিয়াকলাপ ও বিন্যাসকে প্রশ্ন করার বিষয় বলে মনে হয় ।

মনস্তত্ত্বচর্চার ক্ষেত্রটি বিজ্ঞান এমনকি চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিসরেও প্রান্তিক । হয়তো সেই জন্যই তার মনোবিজ্ঞান হয়ে ওঠার বাসনাও ছিল প্রবল। পরীক্ষামূলক পদ্ধতিতে সমস্ত রকমের মানসিক ঘটনা আর আচরণকে অধ্যয়ন করে বস্তুগত সত্যকে প্রমাণ করাই তার প্রধান

ঝোক। কিন্তু দর্শনের পাঠক্রম থেকে বিজ্ঞানের পাঠক্রমে চলে আসার যে ইতিহাস কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটেছিল তার একটা প্রভাব গোড়ার দিকে ছিল । সেটা অধ্যাপক সেনগুপ্তের তির্যক মন্তব্যেই প্রমাণিত । অধিকাংশ শিক্ষকদের দর্শনের পাঠ ছিল । এছাড়া মনোচিকিৎসার লেখাপত্রে এর নানান প্রতিফলন দেখতে পেয়েছি । ফলে নতুন বিজ্ঞানের চর্চায় যে ভারতীয় দর্শন ঢুকে পড়বে এটা আশ্চর্যজনক নয় । বরং আশ্চর্য লাগে এটা ভাবতে যে , কীভাবে ধীরে ধীরে কলকাতার মনস্তত্ত্বচর্চার পরিসর ক্রমশ দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিকচর্চা থেকে নিজেকে বিচ্যুত করেছে ।

ঔপনিবেশিক শাসনের কল্যাণে যে মনোবিজ্ঞানের আমদানি হয়েছিল তার সঙ্গে ঔপনিবেশিক বাংলার শিক্ষিত সমাজের সম্পর্ক একপেশে ছিল না । অর্থাৎ আমদানি করা মনোবিজ্ঞানের তত্ত্বঅধ্যয়ন ও প্রয়োগ করার ব্যাপারে তাদের যা উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল সেটাই সব কথা নয় । আমাদের সংস্কৃতিতে প্রয়োগ করতে গিয়ে তারা যে ঔপনিবেশিক শাসনের চাপে এবং রসদের অভাবে উঁচুদরের বিজ্ঞান করতে পারছিলেন না , সে কাহিনিও সর্বোগ্রাহ্য নয় । বরং এই বিষয়টাই বার বার দেখা গেছে যে মনস্তত্ত্বের আঁতুড়ঘর যাঁরা সামলে ছিলেন তারা জ্ঞানচর্চাকে প্রশ্ন করেছেন , সংশোধন করেছেন এবং স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে তাকে মেলাতে চেয়েছেন। ঔপনিবেশিক প্রভুদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যে একতরফা ছিল না , এই সম্পর্ক যে দুই দিকেই পরিবর্তন এনেছিল সেই দ্বিধার কাহিনির চমৎকার মনঃসমীক্ষণভিত্তিক বিশে-ষণ করেছিলেন । এই মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণকে মেনে নিলে একথাও মানতে হয় , যে জ্ঞান এই দুই ভিন্ন সংস্কৃতির সম্পর্কে সৃষ্টি হল সেখানেই রয়েছে শাসিতের জ্ঞান উৎপাদনের রাজনীতির আখ্যানমালা ।

অ্যাকাডেমিক মনস্তত্ত্ব প্রবলভাবে বৈজ্ঞানিক এবং দৃষ্টবাদী হবার চেষ্টা চালালেও তার বিকল্প এবং প্রতিবাদী তর্কগুলি কিন্তু সংস্কৃতি ও সমাজতত্ত্বের প্রশ্নগুলি হাজির করে চলেছে । তাহলে একটা বিষয় এই মনোবিদ্যার জন্মবৃত্তান্তের ইতিহাস থেকে বেরিয়ে আসছে যে বৈজ্ঞানিক মনস্তত্ত্বচর্চার পেছনে যে জ্ঞানতত্ত্বের রাজনীতি কাজ করে সেটার উন্মোচন হয় তার দাবি করা সত্যকে প্রশ্ন করার মধ্য দিয়ে । আমাদের পথিকৃতরা যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন সেই স্বল্প আবিস্তৃত কাহিনিগুলির অনুসন্ধান বর্তমান বিজ্ঞানবাদী এবং পুনরুত্থানবাদী এই দুই ছককেই

খন্ডন করার মতো অনেক উপাদান হাজির করে । কেননা আজ মনস্তত্ত্বচর্চা ঘোরতরভাবে দৃষ্টবাদী এবং বিশ্বায়িত এক প্রকল্পের অবতারণা করছে , সেই ক্ষমতার ক্রিয়াকলাপ আর প্রভাবকে ব্যাখ্যা করতে গেলে এ-ধরনের ঐতিহাসিক প্রশ্ন জরুরি হয়ে ওঠে । একসংস্কৃতিচ্যুত, নকলনবিশ, টেকনিকাল মনস্তত্ত্বের বোঝা ঘাড় থেকে নামানো আজকের প্রশ্নাতুর মনোবিদের প্রথম কাজ হওয়া উচিত ।

মানসিক রোগ বিষয়ক পাঠ্যপুস্তকে বা মানসিক হাসপাতালের রিপোর্টে যেগুলিকে মানসিক রোগের কারণ হিসাবে দেখানো হয় ( ব্যবসা নিয়ে উৎকণ্ঠা , নিকট আত্মীয়ের মৃত্যু , সম্পত্তির হানি , প্রেমে ব্যর্থতা , ধর্মীয় উন্মাদনা , রাজনৈতিক উত্তেজনা , আঘাত এবং রক্তদূষণ ) সেগুলি অধিকাংশ মানুষের জীবনেই ঘটে , তার জন্য সবাই মানসিক সুস্থতা হারান । এই কারণগুলি ব্যতিক্রম , সাধারণ নিয়ম নয় । মনস্তত্ত্বের একমাত্র ভারতীয় জার্নাল (IJP) হিসাবেও এটি শুধুই পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্ব বা মনঃসমীক্ষণে সীমিত থাকেনি বরং প্রথম থেকেই চেষ্টা করেছে চারপাশের আরও পাঁচটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত হবার। সংস্কৃতিচ্যুত এক সম্পূর্ণ বিজ্ঞানবাদী মতাদর্শের কাছে আধুনিক ভারতীয় মনস্তত্ত্বের শিক্ষকেরা তখনও পুরোপুরি সমর্পণ করেননি । বরং দুই সংস্কৃতির মিশ্রণে এক বর্ণসংকর আধুনিক জ্ঞানচর্চার জন্ম হয়েছে । যা ঔপনিবেশিক মনশ্চিকিৎসাকে তার কাম্য ছাঁচে ঢেলে সাজাতে দেয়নি ।

## উপসংহার

পাগল ও পাগলামি সম্পর্কিত জ্ঞানচর্চার ডিসকোর্স খুঁজতে গিয়ে দেখতে পেয়েছি যে , বিংশ শতকটি ছিল দেশীয় মনস্তত্ত্বচর্চার ইতিহাসে একটি বিজ্ঞানের প্রগতি পর্বের ইতিহাস । যা পাগল সম্পর্কে সমস্ত রকমের অপবিজ্ঞান বা অনাধুনিক জ্ঞানচর্চাকে পরাস্ত করে দিতে পেরেছিল । ব্যাপারটা এরকম সরল নয় বরং বেশ জটিল কারণ । জ্ঞান ও ক্ষমতার সংঘাতগুলি শুধুই একটি দ্বণুক ছকের মধ্যে সংঘটিত হচ্ছিল। আবার দেশীয় ও পশ্চিমের এই দুই ধরনের জ্ঞানচর্চাকে সচেতনভাবে মেশানোর একটা প্রচেষ্টা বিংশ শতকের গোড়া থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল । বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিদ্যা সংক্রান্ত কোর্স চালু হওয়ার পর যেসব আখ্যান দেখেছি, সেখানে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের কৃপণতার প্রমাণের পাশাপাশিই দেখা গেছে ভারতীয় মনো

বিজ্ঞানের উচ্চমানের গবেষণা । যার অনেকটাই তাত্ত্বিক ও প্রয়োগিক , কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হচ্ছিল । এটা ও প্রমাণিত যে , স্থানীয় শাস্ত্র ও সংস্কৃতির সঙ্গে আধুনিক মনস্তত্ত্ব সম্পর্ক স্থাপন করেছিল ভারতের প্রথম অ্যাকাডেমিক জার্নাল আই.জে.পি । এছাড়াও মনোবিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন পত্রিকা অধ্যায়ন করলে দেখা যায় যে স্থানীয় সংস্কৃতি , শাস্ত্র , রাজনীতি , সামাজিক আচার - অনুষ্ঠান এসব গ্রন্থ মনস্তত্ত্বের অধ্যয়নের বিষয় হয়ে উঠেছিল । পাশ্চাত্য থেকে আমদানি করা জ্ঞানকে নকল করার চেয়েও তাকে সংস্কৃতির সঙ্গে তুলনামূলক বিশ্লেষণে ফেলে বিচার করার বাংলায় মানসিক রোগ চিকিৎসায় একটা ধারার অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায় । মনোবিদ্যা কে আধুনিক হয়ে ওঠার বাসনার মধ্যেই থাকে বর্ণসংকরতার মধ্যে নিজের ছাপটি নির্মাণ করার প্রবণতা । এই আধুনিকতার চেহারা আলাদা , যা ক্রমশ উত্তর - ঔপনিবেশিক সংস্কৃতিতে বিকশিত হয় ওঠে । যার সঙ্গে ইউরো-আমেরিকান সংস্কৃতির মিল পাওয়া গেলেও তা স্থানীয় সংস্কৃতির আত্মপরিচিতি ও মেলবন্ধন ঘটে । ভারতীয় সমাজে মানসিক হাসপাতালের মধ্য দিয়ে মনস্তত্ত্বচর্চার জন্ম নেবার আখ্যানে তাই প্রমাণিত হয়। অ্যাকাডেমিক মনস্তত্ত্ব যখন প্রসারিত হয় লোক সমাজের মধ্যে তখন বাংলায় রূপান্তরিত মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসায় ও জ্ঞানতাত্ত্বিক মনোবিদ্যার আরও পরিবর্তন ঘটে , এভাবেই ঔপনিবেশিক বাংলায় আধুনিক মনস্তত্ত্বচর্চা গৃহীত হয়েছিল স্থানীয় সংস্কৃতির মধ্যে ।

পরিশেষে বলা যায় যে , ঔপনিবেশিক শাসকদের সৃষ্টি করা জ্ঞানে যাকে পাগল বলে মনে হতো সেটা সর্বদা বাংলার স্থানীয় জ্ঞানচর্চার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না । কারন পাগল সাব্যস্ত করতে যে সব লক্ষণগুলিকে তারা নথিভুক্ত করত বাংলার স্থানীয় মানুষদের জ্ঞানচর্চার সঙ্গে সেগুলো যথাযথ ছিল না। কিন্তু সেই অসঙ্গতি পরিপূর্ণ হয়েছিল বিংশ শতকের প্রথম অর্ধে, যখন দেশীয় উদ্যোগে মানসিক রোগ চিকিৎসার যাত্রা পথ সূচনা হয়েছিল। যার প্রধান রুপকার ছিলেন গিরিন্দ্র শেখর কিংবা কবিরাজ অতুল বিহারী দত্তের মতো চিকিৎসকরা। প্রকৃত পক্ষে ঔপনিবেশিক বাংলায় মানসিক রোগ চিকিৎসার উন্নতি বিধানের ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ান সাইকো অ্যানালিক্যাল সোসাইটি , লুম্বিনী পার্ক মানসিক হাসপাতাল কিংবা বঙ্গীয় উন্মাদ আশ্রমের মতো প্রতিষ্ঠানগুলি যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল । ফলে বাংলার পাগল চিকিৎসা এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল।

### চতুর্থ অধ্যায়

# উন্মাদ আইনের ইতিহাস ও সরূপ

## ঔপনিবেশিক বাংলায় প্রভাব

## ১৮৫৮ খ্রীঃ- ১৯১২ খ্রীঃ

মানসিক ভাবে অসুস্থ রোগীদের আলাদা সেবা ও চিকিৎসার জন্য আশ্রয় ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ও তাদের জন্য আইন-কানুন তৈরি করার একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। পূর্বে সাংগঠনিক উন্মাদ আশ্রমগুলি পশ্চিমা দেশগুলিতেই বেশী দেখতে পাওয়া যেত, তবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম থাকা সত্বেও ভারতীয় সমাজে উন্মাদ আশ্রম প্রতিষ্ঠা ও তাদের চিকিৎসা মধ্যযুগে ও প্রাক-আধুনিক যুগেও ছিল কিন্তুপাগলদের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন লিখিত আইন ছিলনা। এদেশে মানসিক রোগীদের উন্মাদ আশ্রম প্রতিষ্ঠা ব্রিটিশ উদ্ভাবন বলে মনে করা হয়, কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সেক্ষেত্রে বলা যেতেপারে পাগল দের জন্য একটি পৃথক আইন তৈরি এটি সম্পূর্ণ ব্রিটিশদের উদ্ভাবন বলে মনে করা হয়। অর্থাৎ ব্রিটিশদের আগমনের পূর্বে পাগলদের জন্য পৃথক কোন আইনের কথা জানা যায় না বরং প্রাক ব্রিটিশ যুগে ভারতে উন্মাদ আশ্রম প্রতিষ্ঠা ও বিভিন্ন চিকিৎসার কথা জানা যায় , ঔপনিবেশিক কাল পর্বেও পূর্বে বিশেষ করে বঙ্গদেশে দেশীয় পদ্ধতিতে উন্মাদ রোগের চিকিৎসা করা হতো । সেক্ষেত্রে চরক সংহিতায় মানসিক ব্যাধিগুলির প্রকারভেদ ও চিকিৎসাবিধি সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ থাকলেও এদেশীয় সমাজে পাগলদের জন্য পৃথক কোন আইন প্রাক ঔপনিবেশিক যুগে ছিল না ।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে ১১৭৩ সালে বাগদাদের আলমেরাফটান বা হাউস অফ গ্রেস নামে একটি উন্মাদ চিকিৎসালয় চিকিৎসালয় প্রথম পাগলদের জন্য কিছু নিয়ম কানুন তৈরি করেছিল। কিন্তু এই নিয়ম কানুন ছিল সম্পূর্ণ চিকিৎসা কেন্দ্রিক। যেখানে পার্সিয়া অঞ্চল থেকে পাগলদের আনা হত, এবং তাদের মানসিক রোগ থেকে মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত চিকিৎসা করা হত। ১৫৬০ সালে সুলেমানিয়া উন্মাদ আশ্রয় প্রতিষ্ঠা করা হয়, সেখানে সুপরিকল্পিত নিয়ম-কানুনের কথা জানা যায়। ভারতে সুলতানি আমলে উন্মাদ চিকিৎসালয়ের কথা জানা যায়, কিন্তু সেই আমলে পাগল সম্পর্কে কোন ফরমান-নামা বা আইন-কানুন প্রচলিত ছিল কিনা তা আজও একটি অনুসন্ধানের

বিষয়। সুলতানি আমলে মধ্যপ্রদেশের মান্ডুর কাছে অবস্থিত ধরা নামক স্থানে একটি মানসিক রোগীদের জন্য হাসপাতাল ছিল, এটি মাহমুদ খিলজি ( ১৪৩৬ -১৪৬৯ খ্রিঃ ) প্রতিষ্ঠা করেছিল, এবং মাওলানা ফজুলার লাহ হাকিম ছিলেন এখানকার চিকিৎসক। তিনি ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতিতে পাগলদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। নাজাবুদ্দিন-আন-হামদ ( ১২২২ খ্রিঃ ) মানসিক রোগীদের বিষয়ে বিশেষ গবেষনা, কিন্তু প্রশাসনিক বাবস্থায় কোন পাগল আইন প্রচলন ছিল কিনা তার কোন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না[1] ।

ঔপনিবেশিক কাল পর্বে ভারতে কিছু স্পষ্ট দলিলের ভিত্তিতে বলা যায় যে পাগল দের তদারকি ও নিয়ম নীতি প্রথম পর্তুগিজদের দ্বারা শুরু হয়েছিল, আবার বাংলা প্রেসীডেন্সিতে প্রথম বিয়ার্ডস্মর ও ডিক সাহেবের তত্ত্বাবধানে নিজস্ব নিয়ম ও কানুনের মাধ্যমে পাগল দের দেখভাল করা হতো। তবে সপ্তদশ শতকে গোয়াতে আশ্রয়ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে পাগলদের আলাদা আলাদা করে রাখা এবং তাদের আইনি তদারকি করা ব্রিটিশরা প্রথম শুরু করেছিল[2]। ১৭৭৪ সালে ভারতীয় আইন প্রবর্তনে একটি দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা গঠন করা হয়েছিল, যার মাধ্যমে বাংলার প্রায়ভেট উন্মাদ আশ্রম গুলির এই নিয়ন্ত্রণ করা হতো প্রেসিডেন্সি বোর্ডের মাধ্যমে। কোলকাতার গভর্নর জেনারেল কর্তৃক তত্ত্বাবধান করা হতো[3]। কিন্তু পরবর্তী কালে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা যত সুদৃঢ় হল আইনি ব্যবস্থায় ততো আমূল পরিবর্তন হল। ঠিক তেমনি পাগলদের উপর প্রশাসনিক ও চিকিৎসা নিয়ন্ত্রন করার জন্য শাসন ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে তৈরি হল উন্মাদ আইন ।

উন্মাদ আইন কি ? কিংবা, কেন এই পাগল আইন ? এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আলোকপাত করার পূর্বে আভিধানিক অর্থে ও আইনি পরিভাষায় পাগল বলতে কি বোঝায় সেটি আলোচনা

---

[1] ও. সোমাসুন্দরাম, দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট ১৯১২, ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ সাইকিয়াট্রি, জানুয়ারী ১৯৮৭, ২৯(১),পৃষ্ঠা- ১০

[2] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনাসি ম্যানুয়াল ফর মেডিকেল অফিসার অ্যান্ড দ্যা জেনারেল পাবলিক, অ্যা সামারি অফ দ্যা লুনাসি অ্যাক্ট অ্যান্ড রুলস রেগুলেটিং দ্যা এডমিশন ইন্টু ডিটেনশন ইন, অ্যান্ড ডিসচার্জ ফ্রম গভর্নমেন্ট লুনাটিক অ্যাসাইলাম অফ প্রাইভেট অ্যান্ড পাবলিক পেসেন্ট কমপ্লেইন্ড বাই মেজর আর, ব্রাইসন, ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস, থার্ড এডিশন, রিভাইসড বাই ক্যাপ্টেন পি. হাবফারনান, ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস, থ্যাকার স্পিংক অ্যান্ড কো, ক্যাল্কাটা, ১৯১৩।

[3] অ্যা ফিউ রিমার্ক অন দ্যা প্রভিশন ম্যাড ফর দ্যা ইনসেন ইন ইন্ডিয়া উইথ সাজেশনস ফর ইটস এক্সটেনশন অ্যান্ড ইনপ্রুভমেন্ট, উইথআউট এনক্রোএচিং অন দ্যা পাবলিক ট্রিএসারি, ফর প্রাইভেট সারকুলেশন, প্রিন্টেড বাই স্টুয়ার্ট অ্যান্ড মুরে, ওল্ড বেইলি, লন্ডন ১৮৪৯।

করা অবশ্যই দরকার। পাগল বলতে সাধারণ মানুষ যা বোঝে তা হচ্ছে- মাথা খারাপ , অপ্রকৃতিস্থ, মানসিক প্রতিবন্ধী ইত্যাদি। পাগলের বহুল ব্যবহৃত ইংরেজী প্রতিশব্দ গধফ হলেও আইন পরিভাষা লুনাটিক। অক্সফোর্ড ইংরেজি অভিধানে পাগলের অর্থ করা হয়েছে *“behaviorthat is Stupid or Crazy”* । কেমব্রিজ অভিধানে লুনাসি বলতে বোঝানো হয়েছে *“Stupid Behavior that will have bad results”* । কিন্তু ব্লাক -এর *Law* অভিধানে পাগলের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে

> *একজন পাগল ব্যক্তি হলেন মনঃরোগগ্রস্থ, নির্বোধ ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত, যে বাস্তবিক জ্ঞান থেকে বিচ্যুত, কিংবা এক বা একাধিক বিভ্রান্তি মিথ্যা বিশ্বাসে ভুগছে, কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা ওই ব্যক্তির মনে বিশ্বাসযোগ্য নয়, এবং কোন প্রমাণ বা যুক্তি দ্বারা মনোরোগাক্রান্ত বাক্তি কে বোঝানো যায় না । এক কথায় উন্মাদ একটি নির্বোধ প্রকৃতির , কিংবা স্বাভাবিক আচারনের থেকে আলাদা*[4] ।

আবার, ১৯১২ সালের পাগল আইন-এর ৩/৫ সেকশন এর বিধান অনুসারে, *“Lunatic means an idiot or person of unsound.”*

আলোচ্য অধ্যায়ের মূল বিষয় উপস্থাপনের পূর্বে উন্মাদনার ইতিহাস চর্চার প্রসঙ্গ টি আলোচনা করা অবশ্যই দরকার, আধুনিক সমাজবিদ্যা চর্চায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে পাগলদের নিয়ে ইতিহাস লেখা হয়েছে, তেমনি ভারতীয় প্রেক্ষাপটে পাগলদের নিয়ে ইতিহাস লেখা হয়েছে , তবে তা খুব-ই কম। ভারতীয় ও বিদেশী দের গবেষণার মধ্যে যে সর্ব প্রথম যে গবেষণার নাম উল্লেখে করা যায় সেটি হল অনুস্কা ভট্টাচার্যের “ ইন্ডিয়ান ইনসেন” (হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়,২০১৩) গবেষণায় ভারতীয় পাগলদের নিয়ে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক আলোচনা করেছেন তবে সেক্ষেত্রে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি আলোচনা খুব সামান্য ভাবে তুলে ধরেছেন, আবার সারাহ পিনটো মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির উন্মাদ আশ্রম ( ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়,২০১৭) নিয়ে গবেষণা করেছেন, কিংবা দেবযানী দাস ও ওয়াল্ট্রড আরনসট (পূর্ব অধ্যায়ে উল্লেখিত ) ভারতের উন্মাদনা নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা মূলক কাজগুলি উলেখযোগ্য ,কিন্তু উক্ত গবেষণা গুলিতে উন্মাদনার ইতিহাস নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনাহলেও লুনাসি অ্যাক্ট তথা পাগল আইন নিয়ে কোন ভাবেই সম্পূর্ণ আলোচনা হয়নি , অর্থাৎ উন্মাদ আইনের ইতিহাস ও ঔপনিবেশিক বাংলার জনসমাজে

---

[4] ব্ল্যাক ল ডিকশনারি ১১, এডিটেড বাই ব্রিয়ান, অ্যা, গারনার, ওয়েস্ট পাবলিশিং কো, ১৯১০।

তার প্রভাব নিয়ে এখনো অবধি কোন গবেষণা হয়নি। এই প্রেক্ষিতে বলা যায় ১৮৫৮ খ্রীঃ থেকে ১৯১২ খ্রীঃ পর্যন্ত সময়ে এদেশীয় সমাজে পাগলদের জন্য যে বিভিন্ন আইন তৈরি হয়েছিল সে বিষয়ে একটি বৃহৎ ক্ষেত্র বা গবেষণার জায়গা আছে। কিন্তু আজঅবধি উক্ত বিষয়ে কোনোরূপ পরিপূর্ণ গবেষণা হয়নি । তাই বাংলার পাগল ও পাগলা গারদের ইতিহাসে উন্মাদ আইনের বিষয়েটি আলোচনা খুব-ই প্রাসঙ্গিক।

## অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন

এই অধ্যায়ের মুখ্য অনুসন্ধানের বিষয় হল ঔপনিবেশিক সমাজে পাগল আইনের স্বরূপ কি ছিল? এবং পাগলের আইনগত অধিকারের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা, সর্বোপরি ঔপনিবেশিক বাংলায় লুনাসি অ্যাক্ট বাংলার সামাজিক জীবনে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল ? তা ঐতিহাসিক পর্যালোচনার মাধ্যমে অনুসন্ধান করা। এছাড়াও আলোচ্য অধ্যায়ে বিশ্লেষনাত্বক দৃষ্টিভঙ্গি তে যে বিষয়গুলি অনুসন্ধান প্রয়াস করা হয়েছে সে গুলি হল -.কেন এই আইন প্রণয়ন? .উন্মাদ আইন তৈরি করার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ছিল ? ঔপনিবেশিক সরকার উন্মাদ আইনের অন্তরালে কি কোনো শাসন ক্ষমতা চাপিয়ে দেওয়ার কোন দুরভিসন্ধি কাজ করেছিল ?

## পাগল আইনের ইতিহাস

## পাগলদের জন্য আইন

১৯১২ সালের আইন কার্যকর করার আগে সমসাময়িক ঔপনিবেশিক ভারতের মানসিক রোগীদের যত্ন ও চিকিৎসার বিভিন্ন রকম আইন পাগলদের জন্য প্রচলিত ছিল[5] , সেগুলি হল- পাগলাগারদ আইন (সুপ্রিম কোর্ট ) ১৮৫৮ অ্যাক্ট (XXXIV ) ১৮৫৮, পাগলাগারদ আইন (জেলা কোর্ট ) ১৮৫৮ অ্যাক্ট (XXXV) ১৮৫৮, ভারতীয় পাগলাগারদ আইন ১৮৫৮ অ্যাক্ট (XXXVI ) ১৮৫৮, সামরিক পাগল আইন ১৮৭৭ অ্যাক্ট (XI) ১৮৭৭, ভারতীয় উন্মাদ আশ্রয় আইন ( সংশোধন ) ১৮৮৬ অ্যাক্ট (XVIII) ১৮৮৬, ভারতীয় উন্মাদ আশ্রয় আইন (সংশোধন ) ১৮৮৯ অ্যাক্ট (XX) ১৮৮৯, অপরাধী পাগল আইন, অধ্যায় (XXXIV) ১৮৯৮,

---

[5] দ্যা আনরিপিএলেড সেন্টার আক্ট উইথ ক্রনোলজিক্যাল টেবিল অ্যান্ড ইন্ডেক্সস, ভলিউম- VI ফ্রম ১৯১১ টু ১৯১৬, বোথ ইনক্লুসিভ, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া রিফরম অফিস, ম্যানেজার অফ পাব্লিকেশনস, দিল্লি।

কয়েদী পাগল আইন ( অ্যাক্ট ১৯০০ )। প্রথম তিনটি আইন রানি ভিক্টোরিয়ার ঘোষণার পরপরই কার্যকর করা হয়, এবং ভারত ব্রিটিশ নিয়মের অধীনে আসে[6] ।তিনি তার ঘোষণা পত্রে প্রতিশ্রুতি দেন যে, ভারতের বিভিন্ন প্রেসিডেন্সির অভ্যন্তরীণ শাসন কে শান্তিপূর্ণ ভাবে পরিচালিত করাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা। এক্ষেত্রে জনসাধারনের উপযোগিতা এবং উন্নয়নমূলক কাজ গুলির প্রচার প্রয়োজন এবং ফলে সকল বিষয়ে সরকারের প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করা।

## ঔপনিবেশিক অধ্যায়ে বিভিন্ন উন্মাদ আইন[7]

[6] অ্যা কালেকশন অফ দ্যা আক্ট পাশড বাই দ্যা গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া কাউন্সিল, ইন দ্যা ইয়ার ১৯১৬, সুপারিন্টেনডেন্ট গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং, ইন্ডিয়া ক্যালকাটা ১৯১৭।

[7] *এই আইনগুলির প্রথম তিনটি ইংরেজি লুনাসি রেগুলেশন অ্যাক্ট, ১৮৫৩ (১৬ ও ১৭ Vic. সি ৭০) এবং ইংলিশ লুনাটিকস অ্যাক্ট, ১৮৫৩ (১৬ ও ১৭ ভিকস ৯৬) এর উপর ভিত্তি করে নির্মিত। বারং বার সংশোধনীর পর এই ইংরেজি আইন এখন লুনাসি অ্যাক্ট, ১৮৯০ (৫৩ Vic.c. ৫) দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে , যা লুনাসি অ্যাক্ট, ১৮৯১ (৫৪ ও ৫৫ vic. সি ৬৫) দ্বারা সংশোধিত। ঔপনিবেশিক সরকারের উপলব্ধি করেছিল ভারতে উন্মাদদের হেফাজত সংক্রান্ত আইন সংশোধন করা উচিত এবং এই বিষয়ে আধুনিক ব্রিটিশ আইনের সাথে সমন্বয় করা উচিত। এই উদ্দেশ্য কে সামনে রেখে ১৯১২ ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট কে ব্রিটিশ আইন প্রভাবিত করেছিল। ১৯১১ সালে আইনের খসড়া প্রণয়নে উন্মাদদের সাথে সম্পর্কিত সমগ্র আইনকে যতদূর সম্ভব পুনর্বিন্যাস ও মজবুত করার সুযোগ গ্রহণ করা হয়। ১৯১২ সালের আইন পাশ হওয়ার আগে এই বিষয়ে আইনটি কেবল বিভ্রান্তিকর এবং ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ছিল না, বরং পুরোপুরি পুরনো ছিল। এই আইন শুধুমাত্র এই বিষয়ে বিভিন্ন আইনকে মজবুত করে এবং আইনকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আনার চেষ্টা করা হয়। এই আইন শুধুমাত্র এই বিষয়ের উপর বিভিন্ন আইনকে একত্রিত করে এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আইনকে আধুনিক ইংরেজি আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার চেষ্টা করে। এই বিলের সাথে নীতির কোন প্রশ্ন জড়িত নয়। লুনাসি সম্পর্কিত আইন ১৯১২ সালের আইন চতুর্থ দ্বারা কোড করা হয়েছে, কিন্তু এই আইন উন্মাদদের অবস্থা সম্পর্কে খুব সামান্যই বলে। এই আইন ১৪ এবং ১৫ Vic c.৮১, ১-৫, ৭, এবং ৪৭ এবং ৪৮ Vic c.৬৪ সঙ্গে একত্রে। ১০(৪) এই বিষয়ে আইন আছে। কিন্তু, উন্মাদদের সীমিত ক্ষমতার জন্য আমাদের কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট এবং পেনাল কোডের দিকে ঝুঁকতে হবে। যতদূর চার্টারস নিয়ম নিয়ে উদ্বিগ্ন (ইন্ডিয়ান গেজেট দেখুন, ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯১১, পিটি ভি. পি. ১৪৭; এছাড়াও পিটি ৬. পি. ৬৫৫) আইন এই দেশে প্রযোজ্য হয়।*

## বিভিন্ন উন্মাদ আইন

| বৎসর (খ্রিঃ) | আইনের নং | সংক্ষিপ্ত শিরোনাম |
|---|---|---|
| ১৮৫৮ | ৩৪ নং | লুনাসি অ্যাক্ট (সুপ্রিম কোর্ট) |
| ১৮৫৮ | ৩৫ নং | লুনাসি অ্যাক্ট (জেলা কোর্ট) |
| ১৮৫৮ | ৩৬ নং | ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট -১৮৫৮ |
| ১৮৭৭ | ১১ নং | মিলিটারী লুনাটিকস্ অ্যাক্ট |
| ১৮৮৬ | ১৮ নং | ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট –(১৮৫৮),অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট ১৮৮৬ |
| ১৮৮৯ | ২০ নং | ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট –(১৮৫৮), অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট ১৮৮৯ |
| ১৮৯৪ | ১৩ নং | অ্যামেন্ডিং আর্মি অ্যাক্ট ১৮৯৪ |
| ১৯৯৮ | ৫ নং | কোড অফ ক্রিমিনাল প্রোসিডিওর - ১৮৯৮ |
| ১৯০৯ | ৫ নং | অ্যামেন্ডিং আর্মি অ্যাক্ট- ১৯০৯ |
| ১৯১২ | ৪ নং | দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট- ১৯১২ |

## উন্মাদ আইনের ইতিহাস - ব্রিটিশ পটভূমি

ঔপনিবেশিক কাল পর্বে লুনাসি অ্যাক্ট প্রসঙ্গে নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে ১৮৫৮ ও ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দের ভারতীয় উন্মাদদের আইনের মূল উৎস ছিল ব্রিটিশ আইন। এর মধ্যে ১৮৫৮ এর আইনটি ছিল মূলত পাগালগারদের প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক নিয়মকানুন এবং ১৯১২ এর লুনাসি অ্যাক্ট ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ আইন যার মধ্যে পাগল সম্পর্কিত বিষয়ে সমস্ত কিছুই আলোচিত হয়েছে[৪]। পাগলের অভাব অভিযোগ সেবা-যত্ন , চিকিৎসা ও রক্ষণাবেক্ষণ আইনগত অধিকার ইত্যাদি বিষয় গুলি আইনি পরিভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে কিন্তু ১৮৫৮ এর চতুর্দশ আইনটি ছিল মূলত উাদ আশ্রমের বিষয় সংক্রান্ত এক্ষেত্রে অভিযুক্ত পাগলকে গারদে কিভাবে আটক করা হবে সেই সংক্রান্ত বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। আবার ব্যক্তিগত উন্মাদ আশ্রমের ছারপত্র প্রদান কিভাবে করা হবে সেগুলি

[৪] রিচার্ড এম, ডুফি, ব্রিন্ডাম ডি, কেলি, ইন্ডিয়াঙ্গ মেন্টাল হেলথকেয়ার অ্যাক্ট, ২০১৭ বিল্ডিং লস, প্রটেক্টিং রাইটস, স্প্রিঙ্গার নেচার, পৃ-২৬৯।

পর্যালোচনা করা হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসকগন এদেশে ক্ষমতা লাভের পর তাদের অনুসৃত আইন কানুন এদেশে প্রয়োগ করতে শুরু করে , সেক্ষেত্রে পাগলদের ক্ষেত্রে ও তা ব্যতিক্রম হয়নি। পূর্ববর্তী সময়ে বিভিন্ন বিধিবদ্ধতা অনুসারে উন্মাদ আশ্রমে পাগলদের যত্ন ও চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিভিন্ন সময়ে নানা আইন কানুন তৈরি করেছিল।

১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দের পূর্ববর্তী সময়ে এদেশীয় সমাজে ইংল্যান্ডের যে নিয়ম নিতী মাধ্যমে পাগলদেরনিয়ন্ত্রন করা হতো সেগুলি হল- (১), বেসরকারি উন্মাদ আশ্রম গুলি নিয়ন্ত্রনের জন্য আইন ( ১৭৭৪ )। উন্মাদ আশ্রম আইন ( ১৮০৮) এছাড়াও কোন আলোচনা ছাড়াই ১৮২৯ এবং ১৮৪২ সালের মধ্য পাগলদের ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন কমিশনের নিয়ম নীতি অনুসারে বাংলার পাগলদের নিয়ন্ত্রন করা হতো, যেগুলি ডিক- এর আশ্রম, বিয়ার্ডস্মরের উন্মাদ আশ্রম, ঢাকার পাগলাগারদ কিংবা রসা পাগলা আশ্রম এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল । তখন ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন কমিশন যেটি ১৮৪৫ সালে লর্ড আসলি এর প্রচলিত “ পাগল আইন” অনুকরণ করে পাগলা গাররদ গুলি নিয়ন্ত্রন করত । লর্ড Ashel র আমলে এই আইন পাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তী ব্রিটিশ আইনে কিছু ক্ষেত্রে তিনি সংশোধনমূলক আইন চালু করেছিলেন[9]। পাগল নিয়ন্ত্রক আইন -১৮৫৩ . পাগলদের যত্ন ও চিকিৎসা সংশোধন আইন -১৮৫৩ . পাগলদের আশ্রয় সংশোধন আইন- ১৮৫৩, উক্ত ব্রিটিশ আইন বিধি অনুসরন করে ঔপনিবেশিক শাসকগন আংশিক ভাবে প্রথম দিকে বাংলার উন্মাদ আশ্রম ও পাগলদের নিয়ন্ত্রন করতো ।

## উন্মাদ আইন তৈরির উদ্দেশ্য

উনিশ শতকের প্রথম দিকে বাংলার উন্মাদ আশ্রম গুলি চলতো তাদের নিজস্ব নিয়ম কানুনের দ্বারা আবার বাক্তিগত উন্মাদআশ্রম গুলিতে (ডিক সাহেবের আশ্রম, বিয়ার্ডস্মর-এর আশ্রম) পরিচালনা সংক্রাহ ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে নানা রকম সমস্যা দেখা দিত, দেখা যায় রসা পাগলাগারদ কিংবা ঢাকার পাগলাগারদের বিভিন্ন বিষয়ে নিয়ম-কানুন কোন কোন ক্ষেত্রে মিল হতো না । ফলে উন্মাদ আশ্রম গুলিতে এই নিয়মের ভিন্নতা প্রশাসনিক ডিক থেকে নানা সমস্যা-

[9] এম, মুন্ডাসির ফিরদোসি অ্যান্ড জুল্কারনাইন জেড, আহাম্মাদ, মেন্টাল হেলথ ল ইন ইন্ডিয়া; অরিজিন্স অ্যান্ড প্রপোসড রিফর্মস, ভ্লিউম- ১৩, নুম্বের-৩, ৩ আগস্ট ২০১৬, পৃ- ৬৪-৬৫।

তৈরি করেছিল। ফলে একটা সর্বজনীন আইনের প্রয়োজনীয়তা আনুভব করেছিল ঔপনিবেশিক শাসকগন , এই উদ্দেশ্য কে লক্ষ্য রেখে ১৮৫৮ এর ভারত শাসন আইন অনুসারে সর্বজনীন ভাবে উন্মাদ আশ্রমের পরিকাঠামো ও পাগলদের নিয়ন্ত্রন করার জন্য লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট পাশ করা হয় ।

১৮৫৮ সালের লুনাতিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট ছিল মানসিকভাবে অসুস্থদের পরিচালনার জন্য আইনি কাঠামো গঠন, মানসিক আশ্রয় প্রতিষ্ঠার এবং রোগীদের ভর্তি করার জন্য নির্দেশিকা। পরে এই আইনটি ১৮৮৮ সালে বাংলায় নিযুক্ত একটি কমিটি দ্বারা সংশোধন করা হয়েছিল এবং দোষী পাগলদের ভর্তি ও চিকিৎসার জন্য বিস্তৃত নির্দেশাবলী তৈরি করা হয় । আবার ১৮৯০ সালে কয়েদীদের মধ্যে মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থাযুক্ত কয়েদী প্রথক ভাবে পাগল আইন কার্যকরহয়। ১৯১১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর সোমবারে, যেখানে পেনসাটের বোরন হার্ডিঞ্জ ভারতের গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের সভাপতিত্ব করে। মাননীয় মি. জেনকিনস দ্বারা পাগল সংক্রান্ত আইন এবং সংশোধনের জন্য একটি বিলের উপস্থাপন করেন। তিনি এই আইনে একীকরণ ও কিছু সংশোধন এবং বিশেষত নির্দিষ্ট এই গুরু ত্বপূর্ণ আইনটিকে ইংরেজ আইনের সাথে সামঞ্জস্য করার প্রস্তাবদেন। ইতিপূর্বে ১৮৫৮ খ্রীঃ এর আইন টি বিভিন্ন আলোচনা ও পরীক্ষা নিরিক্ষার মাধ্যমে ১৮৯১ সালে সংশোধন করা হয়। এক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বিবেচনা করেছিলেন যে বাছাই কমিটিতে সমস্ত বিবরণ সাবধানতার সাথে পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিষদের সাধারন আলোচনার চেয়ে এটি আরও উপযুক্ত।

## পাগল সম্পর্কিত বিল উত্থাপন ও নির্বাচিত কমিটি

১৯১২ সালের ১০ জানুয়ারি বুধবার জে.এফ. উইলসনের সভাপতিত্বে একটি মন্ত্রীসভা গঠিত হয়, এবং সেখানে ভারতীয় পাগলদের বিলটি সম্পর্কে নির্বাচিত কমিটির কাছে উল্লেখ করা হয়।

(১) জে.এল. জেনকিন্স (২) সৈয়দ আলি ইমাম,
(৩) মৌলবি সৈয়দ শামসুল হুদা (৪) মি. দাদাভাই,
(৫) বাবু ভুপেন্দ্রনাথ বসু, (৬) মি. গ্যেটেস ,
(৭) মি. মুধলকর , (৮)সার্জেন জেনারেল স্যার সি.পি.লুকিস,
(৯) মি. কেনরিক , (১০) মি. ম্যাজ মি. ভিনসেন্ট ,

## (১১) মিঃ. কার, (১২) মি.আরথর ও প্রস্তাবক

১৮৫৮ সালে পাগল আশ্রমটি আইনটি ৫ থেকে ১১ এবং ১৮ থেকে ২০ বিভাগে এই পদ্ধতিগুলি গণ্য করা হয়েছে। পাগল কে মিথ্যা আটক অবস্থার ভয়ের অবস্থার কারণগুলির বিবৃতি এখানে প্রতিফলিত হয়, সংবর্ধনা আদেশ জারি করার জন্য নির্ধারিত পদ্ধতি এবং ইংরাজী পাগল আইন (১৮৯০) এঁর উপর ভিত্তি করে, যে পদ্ধতিতে মেডিকেল শংসাপত্র, এবং যত্ন সহকারে পরীক্ষার পদ্ধতিও এই আইনে নির্ধারিত রয়েছে। পাগলদের অন্যায় ভাবে আটক করা, যে কোন ব্যক্তির প্রতি মিথ্যা অভিযোগরোধ করার প্রতি যত্ন নেওয়া হয়েছে। স্যার টমাস ডেভিড গিবসন কার মাইকেল ১৯১২ সালের একটি চিঠিতে গভর্নর জেনারেলকে জানান যে এই ধরনের ভর্তির কোনো প্রয়োজনতার মতে নেই।

সরকারের মতে ম্যাজিস্ট্রেটের জারি করা পাগল রিশেপ্সনের আদেশের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখিতহয়নি। অন্যায় ভাবে বন্দী হওয়ার ঝুকির থেকে অতিরিক্ত সুরক্ষা হিসাবে বিবেচিত হয়। এই নতুন ক্রমটির স্পষ্ট সুবিধা নেই মূর্ত আইন গঠনের ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট দুটি মেডিকেল শংসাপত্রের ক্ষেত্রে কাজ করতে অস্বীকার করেননা, এবং পাগলদেও আত্মীয়দের দৃষ্টিকোন থেকে এখানে বিলের বিধানগুলি অযৌক্তিকভাবে জটিল করে তুলবে, এবং এসব তদন্ত গুলি গুপ্তভাবে রাখা হলেও প্রচারের সম্ভাবনাখুববেশি পরিমানে বাড়বে। সরকার পাগলদেও ভর্তির জন্য শংসাপত্র প্রদান থেকে আশ্রয়ের সাথে যুক্ত কোনও মেডিকেল অফিসার বা নিয়ন্ত্রককে চরম অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। এই পাগল সম্পর্কিত অন্যান্য পরামর্শ এই আইনের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। তাই পাগলদের জন্য প্রয়োজন ছিল একটি সুপরিকল্পিত আইনি ব্যবস্থা । তাই পাগলদের জন্য পূর্ববর্তী আইন গুলি সম্পূর্ণ ছিল না ।

অতিরিক্ত রোগী স্বেচ্ছাসেবক বোর্ডদের এই আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। স্কটিশ আইন বিভাগের ২৯ এবং ৩০ এর ১৫ বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সরকার এই সুবিধাটি গ্রহন যোগ্য হিসাবে বিবাচনা করে। আশ্রয় কেন্দ্রিক অনুমোদনহীন স্বেচ্ছাসেবকদের ভর্তির অনুমোদন দেওয়া হয়। সরকার মনে করে যে, এই ধরনের নিয়ম এখন মাঝে মাঝে লাভজনক হবে, এবং যেটি শেষ পর্যন্ত যথেষ্ট মূল্যবান ও হতে পারে। যে ১৯৩০ সালে পাগল চিকিৎসা আইনের দ্বারা স্বেচ্ছাসেবক কেবল ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসে যুক্ত করা হয়েছিল। বছরের পর বছর এই স্বেচ্ছাসেবীর সংখ্যা

বাড়তে থাকে। সেই পদ্ধতি অনুকরণ করে উন্মাদ আশ্রমে স্বেচ্ছাসেবী ননিয়োগ করা হয়।

সরকার বিভিন্ন প্রক্রিয়া গুলি ১৯১২ সালের আইনে পরে প্রেসিডেন্সি শহর গুলিতে প্রযোজ্য করা হয় , এটি পাগল আইনের প্রায় অনুকরণ করে ইংল্যান্ডের পাগলদের সাথে বিশেষ মিল রাখেন। মানিসিক ভাবে অস্বাভাবিক, অপরাধী, অসুস্থ, পাগলদের বিষয়ে পদ্ধতিগুলির পদক্ষেপ, দন্ড বিধান উভয় এই আইনের অধীন। এবং পূর্ববর্তী আইন গুলি থেকে বস্তুগতভাবে পৃথক নয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এই আইনটি তৎকালীন ভারত সরকারের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল এক্ষেত্রে জনগনও আগ্রহী ছিল। এটিও কাম্য যে সমস্ত সরকারী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণ ভাবে নিয়ন্ত্রনে রাখা উচিত।এক্ষেত্রে বাছাইকৃত কমিটি তার চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি ভারতের গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের কাছে ১৯১২ সালের ২৮ শে ফেব্রুয়ারী জমা দেয়। সেই রিপোর্ট গুলি নিন্মে তুলে ধরা হল-আজমির এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। সংযুক্ত প্রদেশে, বর্মা, পাঞ্জাব, পূর্ব বাংলা এবং আসাম। মধ্য অংশের প্রদেশ গুলি, বাংলা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজ ইত্যাদি উন্মাদ আশ্রমের কার্যকলাপ সুবিধা ও অসুবিধা গুলি পেশ করা হয়। ১৯১২ সালের ১৬ মার্চ যখন ভারতীয় পাগল আইন কার্যকর হয়, তখন নিন্মলিখিত মানসিক হাসপাতাল গুলি চালু ছিল ( অতিরিক্ত সংযোজন ১৯২১ ) আসামের তাজপুর ( ভারতীয় ) বিহার এবং উড়িষ্যা, রাঁচি (ইউরোপিয়ান ) পাটনা , বাংলাঃ বহরমপুর ও ঢাকা উন্মাদ আশ্রম।

ঔপনিবেশিক সময় থেকে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক দিক থেকে দীর্ঘ পথ পরিভ্রমন করলে দেখা যায়া, ইউরোপীয় দেশ গুলির মতো মানসিক স্বাস্থ্য আইন নিয়ে ভারতীয় সমাজে কোন অগ্রগতি অর্জন করতে পারেনি। যা অবশ্যই সেকেলে ছিল। তবে জাই হোক ১৯১২ খ্রীঃ আইন কার্যকর করার পর এই আইন টি এশিয়া, আফ্রিকার মহাদেশের অন্যান্য উপনিবেশ গুলিতে ১৯১২ সালে আইন অনুসরণ করে প্রয়োগ করা হয়েছিল । যদিও ইতিপূর্বে বেশিরভাগ দেশ আধুনিক জনস্বাস্থ্য আইন এবং মানসিক রোগের চিকিৎসার লক্ষ্য অনুসারে বিগত বছর গুলিতে তাদের উন্মাদ আইনকে একাধিকবার সংশোধন করেছে।

## অন্যান্য আইনে পাগল সংক্রান্ত বিষয়

দ্য লুনাসি অ্যাক্ট-এর বাংলা অভিধানিক অর্থ যদিও উন্মাদ আইন, তথাপি এই আইনটির বহুল ব্যবহৃত নাম-পাগল আইন। সুতরাং পাগল আইন বলাই শ্রেয়। তবে ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোয় অন্যান্যবেশ কিছু আইনেও পাগল সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়। সেই আইন গুলি হল যথা- ১৮৬০ সালের দন্ডবিধি আইন , ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ সালের চুক্তি আইন, ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধি, দি বেঙ্গল জেলকোড, ১৯০০ সালের কয়েদী সম্পর্কিত আইন এবং সর্বোপরি ১৯১২ সালের পাগল আইন ইত্যাদি।

## অন্যান্য আইনে পাগল সম্পর্কিত তথ্য

| আইনের নাম | বিশেষ অংশ | মন্তব্য |
|---|---|---|
| সাক্ষ্য আইন,১৮৭২ (১ নং আইন) | ধারা ১১৮,১১৯ | পাগল তথা মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসাবে গ্রহন করা যাবে না |
| চুক্তি আইন, ১৮৭২ (৯ নং আইন) | ধারা ১১,১২,১৬, ১৯ ক | মনোসামাজিক প্রতিবন্ধীদের চুক্তি করার ক্ষমতা সংক্রান্ত |
| ফৌজদারী কার্যবিধি,১৮৯৮ (৫ নং আইন) | ধারা ১৯৯,১৯৯ ক,৪৬৪- ৪৭৫ | পাগল তথা মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে দ্বারা কোন অপরাধ করলে ফৌজদারী কার্যবিধি অনুযায়ী তাকে শাস্তি দেওয়া যাবে না। |
| দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮,(৫ নং আইন) | ধারা ১৪৭,আদেশ ৩২ | বুদ্ধি এবং মনোসামাজিক প্রতিবন্ধীদের দেওয়ানি অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য দেওয়ানী মামলা পরিচালনার পদ্ধতি সংক্রান্ত |
| ১৮৭২ সালের চুক্তি আইন | সম্পত্তি হস্তান্তর আইন | চুক্তি আইনের বিধান অনুযায়ী একজন নাবালক সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারবে না। |

# লুনাটিক অ্যাসাইলেম আইন, ১৮৫৮

# ১৮৫৮ এর XXXVI নং আইন

উন্মাদ আশ্রমের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে সর্বপ্রথমে ১৮৫৮ এর লুনাটিক আস্যাইলাম অ্যাক্ট টি উল্লেখযোগ্য। বলা হয় ১৮৫৮ এর এই অ্যাক্ট টি পাগলদের জন্য সর্বপ্রথম এদেশে প্রচলন করা হয় এবং সমগ্র দেশে ফলপ্রসু করার মূল কেন্দ্র ছিল বাংলা। কিন্তু ইতিপূর্বে কোলকাতা মেট্রোপলিটনকমিশনার নিজের মতো পাগলদের ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করতেন। অতঃপর মহারানী ভিক্টোরিয়া অধীনে এদেশে শাসন ভার অর্পিত হলে, ভারত শাসন আইন অনুসারে প্রশাসনিক শসন কাঠামোর অনেক পরিবর্তন সাধন করা হয়। সেক্ষেত্রে এদেশের উন্মাদ আশ্রমের ব্যবস্থাপনা তে নবরুপে পরিবর্তন আসে, পূর্বে সরকারী ও বযাক্তিগত উন্মাদ আশ্রম গুলিতে ইংল্যান্ডের কাউন্ট্রি লুনাটিক অ্যাসাইলাম (১৮৫৩) অ্যাক্টের নিয়ম নীতি অনুসরণ করে চলতো ,আবার কখনো কখনো কোলকাতা শহর কমিশনের নিয়ম নীতি চলতে হতো, কিন্তু এক্ষেত্রে নেটিভ ও ইউরোপীয় উন্মাদ আশ্রম গুলির নিয়ম নীতি মধ্যে বিভিন্ন তারতম্য দেখা দিত । অতঃপর ভারত শাসন আনুসারে উন্মাদ আশ্রমের জন্য ১৮৫৮ খ্রীঃ ১৪ ই সেপ্টেম্বর এই আইন টি পাশ করা হয়। এই আইনটি ছিল ৩৪ নং আইন , এই আইনটি ছিল মূলত উন্মাদ আশ্রম সংক্রান্ত একটি পূর্ণাঙ্গ আইন। মোট ১৮ টি ধারায় বিভক্ত এই আইনে আবার বেশ কিছু উপধারা যুক্ত আছে । এক কথায় বলা যায় পাগল ও পাগলাগারদ ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে ১৮৫৮ এর টি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ।

## আইনের মূল বিষয়

১৮৫৮ এর লুনাটিক অ্যাসাইলাম আইনের মূল বিষয় ছিল মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি তথা পাগল বাক্তিদের উন্মাদ আশ্রমে ব্যবস্থার নিয়ম, বিশেষ করে এই আইন টি উন্মাদ আশ্রমের অনুমোদনসংক্রান্ত ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোয় কিভাবে প্রাইভেট লুনাতিক অ্যাসাইলাম লাইসেন্স প্রদান করা হবে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। শুধু তাই নয় উন্মাদ আশ্রমের অন্দরে মানসিক ভারসম্যহীন বাক্তি দের প্রতি অবহেলা ও কোনোরকম নিষ্ঠুর আচারন যাতে করা না হয় সে বিষয়ে বিবরণ -

উল্লেখ আছে, আবার ভবঘুরে এবং বিপজ্জনকমানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিদের কিভাবে আশ্রমে আটক করা যায়, তার পক্রিয়া লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়াও উন্মাদ আশ্রমের রিসেপশানের জন্য আদেশ এবং শংসাপত্র, পরিদর্শকের দ্বারা মাসিক পরীক্ষণ, পাগলের ব্যয় ভার ও খরচ পরিশোধের জন্য নির্দেশ, অ্যাসাইলেম থেকে মুক্তির আদেশ, মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তির যথাযথ চিকিৎসার জন্য তার আত্মীয় কর্তৃক দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষেত্রে আদেশ, মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তিদের এক অ্যাসাইলেম থেকে অন্য অ্যাসাইলেমে স্থানান্তর, আদেশ বা শংসাপত্রের সংশোধন, সর্বোপরি মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তির দখলে থাকা সম্পত্তির দেখ ভাল ও অধিকার ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

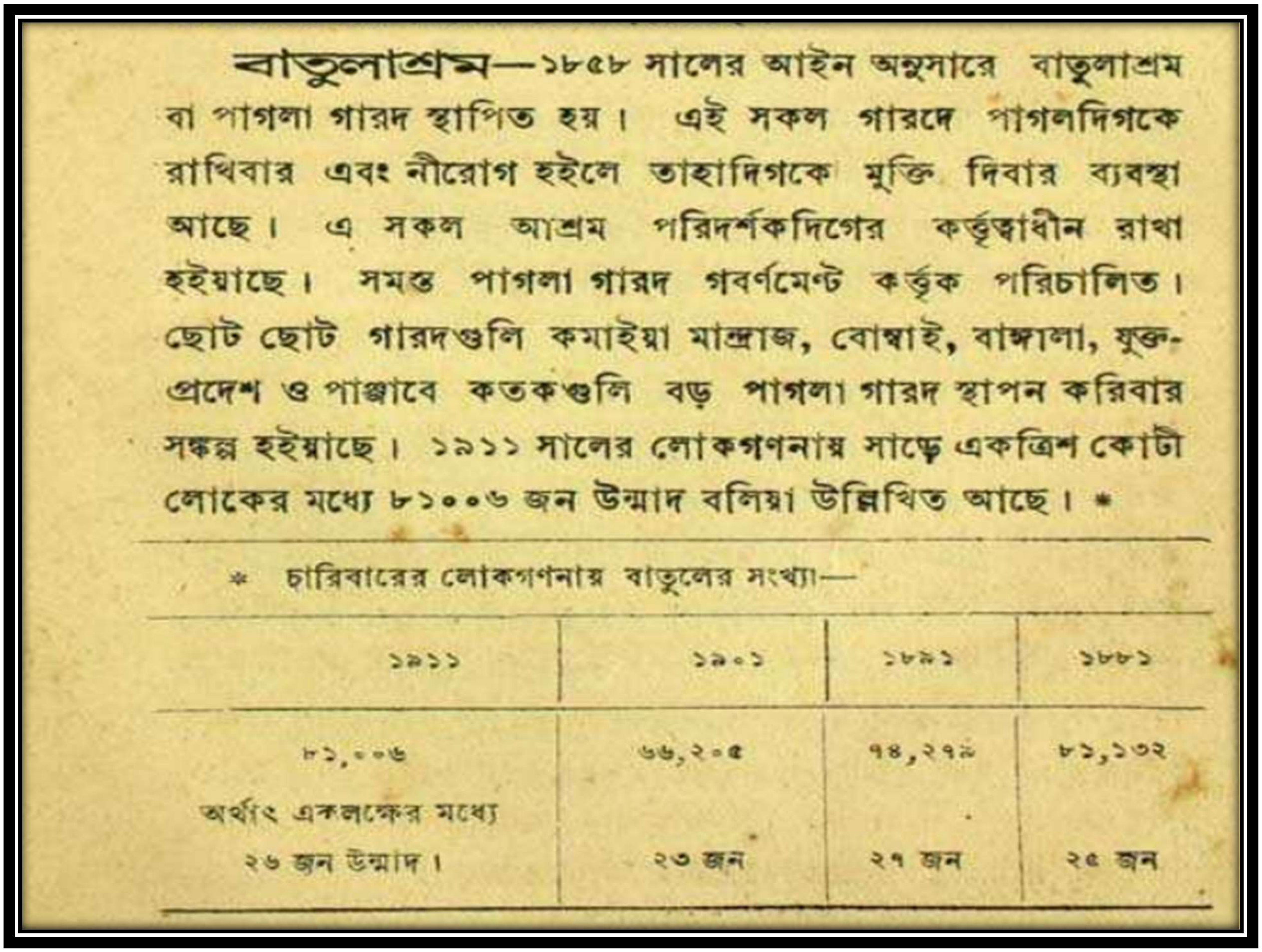

**বাতুলাশ্রম**—১৮৫৮ সালের আইন অনুসারে বাতুলাশ্রম বা পাগলা গারদ স্থাপিত হয়। এই সকল গারদে পাগলদিগকে রাখিবার এবং নীরোগ হইলে তাহাদিগকে মুক্তি দিবার ব্যবস্থা আছে। এ সকল আশ্রম পরিদর্শকদিগের কর্ত্তৃত্বাধীন রাখা হইয়াছে। সমস্ত পাগলা গারদ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত। ছোট ছোট গারদগুলি কমাইয়া মান্দ্রাজ, বোম্বাই, বাঙ্গালা, যুক্ত-প্রদেশ ও পাঞ্জাবে কতকগুলি বড় পাগলা গারদ স্থাপন করিবার সঙ্কল্প হইয়াছে। ১৯১১ সালের লোকগণনায় সাড়ে একত্রিশ কোটী লোকের মধ্যে ৮১০০৬ জন উন্মাদ বলিয়া উল্লিখিত আছে। *

* চারিবারের লোকগণনায় বাতুলের সংখ্যা—

| ১৯১১ | ১৯০১ | ১৮৯১ | ১৮৮১ |
|---|---|---|---|
| ৮১,০০৬<br>অর্থাৎ একলক্ষের মধ্যে<br>২৬ জন উন্মাদ। | ৬৬,২০৫<br>২৩ জন | ৭৪,২৭৯<br>২৭ জন | ৮১,১৩২<br>২৫ জন |

জনগণনার প্রতিবেদনে উন্মাদের সংখ্যা[10]

[10] খগেন্দ্রনাথ মিত্র , ভারতে ইংরেজ শাসন এন. এন. ঘোষ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত , কলিকাতা , ১৯২৭ পৃষ্ঠা- ১৩৩

# আইনের বিভিন্ন ধারা

১) ইন্ডিয়ান কাউন্সিলের গভর্নর জেনারেল অনুমোদন দ্বারা ব্রিটিশ অধিনস্ত  ভারতের সীমানার মধ্যে যেকোনো স্থানে  কার্যনির্বাহী সরকার উন্মাদ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে পারবে , তবে সেক্ষেত্রে সরকারের নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা থাকবে। কার্যনির্বাহী সরকার যদি সঠিক বলে মনে করেন তবে ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে লুনাটিক  অ্যাসাইলাম প্রতিষ্ঠার জন্য লাইসেন্স দিতে পারবে। এমনকি লাইসেন্স প্রত্যাহার করার ক্ষমতা থাকবে ।

**২) উন্মাদ আশ্রমের ব্যবস্থার নিয়ম ও অনুমোদনঃ-**

পাগল ব্যক্তির যত্ন ও হেফাজত করার জন্য কার্যনির্বাহী সরকার প্রতিটি উন্মাদ আশ্রমে নির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে পরিচালনা করবে। প্রতি লুনাটিক  অ্যাসাইলামে কমপক্ষে তিনজন পরিদর্শক রাখবে এবং কমপক্ষে একজন মেডিকেল অফিসার নিয়োগ করবে। জেল ইন্সপেক্টর অধীনস্থ এলাকায় সমস্ত  উন্মাদ আশ্রমের পরিদর্শক হিসাবে থাকবেন।

**৩) পরিদর্শকের দ্বারা মাসিক পরীক্ষণঃ-**

দুই বা তার অধিক পরিদর্শক , যার মধ্যে একজন মেডিকেল অফিসার মাসে অন্ড়ত একবার তাঁরা একসাথে উন্মাদ আশ্রম পরিদর্শন করবেন। পরীক্ষা করার জন্য ব্যবস্থাপনা, অবস্থা, উন্মাদ রোগী অবস্থার ও বিভিন্ন বিষয়ে চিহ্নিত করার জন্য উন্মাদ  রোগী অবস্থার উন্নতি বিষয় শংসাপত্র, পরিস্থিতি বোঝা, কতটা দিন আশ্রমে রাখা যাবে ইত্যাদি বিষয়ে পরীক্ষা করার জন্য পরিদর্শন[11] । লুনাসি অ্যাক্ট ১৮৯০;-এই আইনে মহিলা লুনাটিক দের দেখভাল করার জন্য ফিমেল অ্যাটেনডেন্স এর ব্যবস্থা করা হয়।

এই আইনটি কিছুটা রায় ১৬ এবং ১৭-এর বিবর্তন, ধারা ৯৬ (লুনাটিক্স আইন)এর উপর প্রতিষ্ঠিত। জেনারেল আইনের, দ্বিতীয় খন্ডের,স্থানীয় অস্ড়িত্ব আইন, ১৮৭৪ (১৮৭৪ এর ঢঠ) এর ৩-য় ধারা অনুসারে, তফসিলি জেলাগুলি ব্যতীত সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে এটি কার্যকর বলে ঘোষণা করা হয়। এটিহ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের বার্মার আইন (১৮৯৮ এর XIII),দ্বারা উচ্চতর বার্মায় সাধারণত (শান রাজ্যগুলি বাদ দিয়ে) কার্যকরভাবে ঘোষণা করা হয়েছে;

[11] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনাটিল অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট, XXXVI অফ ১৮৫৮, দ্যা ল অফ লুনাসি, সেকশন-৩

**৪. ভবঘুরে এবং বিপজ্জনক মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিদের ম্যাজিস্ট্রের কাছে প্রেরণ করা**[১২] **-** প্রত্যেক পুলিশের দায়িত্ব হবে যে তাঁর জেলার মধ্যে যে সমস্ত লোক মানসিক ভারসাম্যহীন বা উন্মাদ তাদের গ্রেপ্তার করে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রেরণ করা।

i. উন্মাদ আশ্রমের রিসেপশানের জন্য শংসাপত্র এবং আদেশ এই জাতীয় ব্যক্তিকে ম্যাজিস্ট্রেট মেডিকেল অফিসারের সহায়তায় পরীক্ষা বা অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতে তাদের উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন।

ii. কিছু ক্ষেত্রে, একজন মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি তার বন্ধু বা আত্মীয়দের যত্নে থাকতেপারে- কোনও মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির যথাযথ যত্ন ও অন্যের ক্ষতি না করার শর্তে ম্যাজিস্ট্রেট তার পরিবারকে সেই ব্যক্তির রক্ষনাবেক্ষন করার দায়িত্ব দিতে পারে।

iii. লাইসেন্সযুক্ত উন্মাদ আশ্রমে প্রেরণ করা -এই জাতীয় পরিবার যদি চান যে মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির উপর ব্যয়িত খরচ নির্বাহ করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে লিখিত আবেদন দিতে পারেন ওলাইসেন্সপ্রাপ্ত অ্যাসাইলেমে প্রেরণ করতে পারেন [13]|

**৫.মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির প্রতি অবহেলা বা নিষ্ঠুর আচরণের ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট তার আত্মীয় বা সেই ব্যক্তি যে তার রক্ষণাবেক্ষণ-এর জন্য বাধ্য, তাকে এই জাতীয় মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য আদেশ দিতে পারেন**[14]|

i.যদি কোন ব্যাক্তি তার পরিবার দ্বারা উপযুক্ত যত্ন ও নিয়ন্ত্রন না পায় তবে ম্যাজিস্ট্রেট

---

[12] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট, XXXVI অফ ১৮৫৮, দ্যা ল অফ লুনাসি, সেকশন-৪, আন্ডারিং অ্যান্ড ডেঞ্জারাস লুনাটিল টু বি সেন্ট দ্যা ম্যাজিস্ট্রেট

[13] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট, XXXVI অফ ১৮৫৮, দ্যা ল অফ লুনাসি, সেকশন-৪, (১) বাংলা ও আসাম, ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত পি. জেড.-এর স্থানীয় বিধি ও আদেশের আসাম তালিকা উল্লেখযোগ্য। (২) বোম্বাই, ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত টি.পি.-এর ২৪ খন্ডের স্থানীয় বিধি ও আদেশের বোম্বাই তালিকা দেখুন। (৩) বার্মা, ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত পি.৬.-এর বার্মার বিধি ম্যানুয়াল দেখুন (৪) মাদ্রাজ, ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত পি.৬.-এর স্থানীয় বিধি ও আদেশের মাদ্রাজ তালিকা দেখুন। (৫) পাঞ্জাব, ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে পিটি. ১, পি ১২৬২-এর পাঞ্জাব গেজেট দেখুন। (৬) আগ্রা ও ঔধের ইউনাইটেড প্রদেশগুলি, ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত, আবেদন ১৩ -এর এন.ভি.পি. এবং ঔধের স্থানীয় নিয়মাবলী এবং আদেশের তালিকা দেখুন; এমনকি এমনও ধরে নেওয়া হয় যে কোনও সুস্থির মনের ব্যক্তিকে লুনাটিক অ্যাসাইলেমে পাঠানো হলে যথাযথ কর্তৃত্বাধীন ব্যক্তির কাছ থেকে যতক্ষণ না ওই ব্যক্তিকে মুক্তির আদেশ পাবেন ততক্ষন অবধি অ্যাসাইলেম রক্ষাকর্মীরা তাকে ছাড়বে না এবং সেটি তাদের পক্ষে অবৈধ হবে না। ম্যাকিনটোস ভি. স্মিথ, ২ ম্যাক. এইচ.এল., ৯১৩।

[14] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট, XXXVI অফ ১৮৫৮, দ্যা ল অফ লুনেসি, সেকশন – ৫

উন্মাদগ্রস্থ ব্যাক্তিকে তার অধীনে রক্ষনাবেক্ষন ও চিকিৎসা ব্যবস্থা করতে পারেন।

ii.যদি কোনও ব্যক্তি তাকে রক্ষনাবেক্ষণ করতে বাধ্য না হয় তবে ম্যাজিস্ট্রেট তাকে পাগলাগারদে রিসেপশানের জন্য আদেশ দিতে পারেন।

iii.যদি কোন পরিবার মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির রক্ষনাবেক্ষন করতে বাধ্য না হন তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট তাকে উপযুক্ত অ্যাসাইলামে প্রেরন করার আদেশ দিতে পারেন।

iv. দারোগা অবহেলার কথা রিপোর্ট করবেন -প্রতিটি পুলিশ কর্মকর্তার কর্তব্য হবে উন্মাদের উপর নির্মম আচরনের রিপোর্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে করা।

**৬.পুলিশ কমিশনার ইত্যাদির কার্যনির্বাহী সভাপতি শহরগুলিতে কাজ করা-** ম্যাজিস্ট্রেট কতৃক অনুমদিত করনীয় সমস্ত আইন কার্যনির্বাহী সভাপতি, পুলিশ কমিশন দ্বারা নগর গুলিতে করতে পারে[15] ।

৬.এ পর্যবেক্ষণে থাকা আনুমানিক মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির আটকীকরণ [16]

১) যেখানে কোন ব্যক্তিকে ভবঘুরে বা উন্মাদ বলে মনে করা হয়েছে। সেই ব্যক্তির আটকীকরনের জন্য ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ কমিশনারের কাছে রিপোর্ট করা যেতে পারে।

২)পর্যবেক্ষণে থাকা উন্মাদ ব্যক্তি ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ কমিশনের তত্তাবধানে থাকবে। তবে ১৪ দিনের বেশি আটকানো যাবে না।

৩)সরকারি কতৃপক্ষ আটকিত পাগলা ব্যক্তির যত্ন ও চিকিৎসার জন্য নিজের মতো নিয়ম তৈরি করতে পারে।

**৭.প্রেসিডেন্সি-শহরগুলির উন্মাদ আশ্রমের রিসেপশানের জন্য আদেশ এবং শংসাপত্র।** প্রেসিডেন্সি শহর গুলিতে উন্মাদ আশ্রমের রিসপশনের জন্য শংসাপত্র ও আদেশের ক্ষেত্রে দুইজন ব্যক্তি দায়িত্ব পরিচালনা করবে। তাদের মধ্যে একজন হলেন চিকিৎসক অপরজন হলেন সার্জেন্ট[17]। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের (৪৯ রায় সি.২৫) ইডিয়েটস (নির্বোধ) আইন অনুযায়ী , নির্বোধ

---

[15] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট, XXXVI অফ ১৮৫৮, দ্যা ল অফ লুনেসি, সেকশন – ৬

[16] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট, XXXVI অফ ১৮৫৮, দ্যা ল অফ লুনেসি, সেকশন –৬/A

[17] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট, XXXVI অফ ১৮৫৮, দ্যা ল অফ লুনেসি, সেকশন – ৭

বা ইডিয়েটদের মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিদের থেকে পৃথক হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে এবং তাদের রেজিষ্টার্ড হাসপাতাল ও লাইসেন্সধারী বাড়িগুলিতে আটক রাখা যেতে পারে।

**৮.সিভিল কোর্টের আদেশ ছাড়াই অ্যাসাইলেমে রিসেপশান।**

**১.** সিভিল কোর্টের আদেশ ছাড়া পূর্ববর্তী ধারায় উল্লেখিত স্থান ব্যতীত অন্য কোনও স্থানে, কোনও মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে লুনাটিক অ্যাসাইলেমে আশ্রয় দেওয়া যাবে না[18] ।

**২. একজন অভিভাবকের দ্বারা অর্ডার করার জন্য আবেদন করা, যদি একজন অভিভাবকের নিয়োগ করা হয়ে থাকে।**

কোন মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির অভিভাবক তার ওয়ার্ডের আদালত বা সিভিল কোর্টের কাছে আবেদন করে তাকে অ্যাসাইলামে ভর্তি করাতে পারে। এবং মেডিকেল অফিসার যদি ফর্ম এ তে স্বাক্ষর করেন তাহলে বিচারক নিশ্চিত হবেন উন্মাদ ব্যক্তিটি যত্নে ও চিকিৎসার আওতায় আছেন[19] ।

**৩. যেখানে কোনো অভিভাবক নিয়োগ করা হয়নি সেখানকার আবেদন পত্র।**

যদি কোনও ব্যক্তির আত্মীয় বা বন্ধু অভিভাবক হিসাবে, ওয়ার্ডস আদালত বা কালেক্টর বা সিভিল কোর্ট কর্তৃক নিযুক্ত না হয়ে থাকেন, তিনি আবেদন করতে পারেন সিভিল কোর্ট এবং বিচারকের কাছে। **১৮৫৮** সালের আইনের XXXV এর ধারা ৩-এর বিধান অনুযায়ী মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তিদের সম্পদগুলির যত্নের জন্য আরও উন্নততর বিধানের জন্য একটি আইন নির্ধারণ করা হবে[20] ।

**৪.খরচ পরিশোধের জন্য নির্দেশ।-** বিচারক মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তিকে লুনাটিক অ্যাসাইলেমের মধ্যে রিসেপশানের আদেশের সাথে তার থাকার ব্যবস্থা, রক্ষণাবেক্ষণ, পোশাক, এই জাতীয় ব্যক্তির ঔষধ এবং যত্ন ইত্যাদি খরচ পরিশোধের জন্য নির্দেশ দেবেন [21] ।

**বিধান-** বিচারক যদি মনে করেন যে মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তির কাছে যথেষ্ট সম্পত্তি নেই এবং ব্যয় পরিশোধের পর্যাপ্ত উপায়ও নেই তাহলে মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তির ব্যয়ভার

[18] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট, XXXVI অফ ১৮৫৮, দ্যা ল অফ লুনেসি, সেকশন – ৮

[19] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট, XXXVI অফ ১৮৫৮, দ্যা ল অফ লুনেসি, সেকশন – ৮/১

[20] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট, XXXVI অফ ১৮৫৮, দ্যা ল অফ লুনেসি, সেকশন – ৮/২

[21] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট, XXXVI অফ ১৮৫৮, দ্যা ল অফ লুনেসি, সেকশন – ৮/৪

পরিশোধের অক্ষমতা নিশ্চিত করবেন।

**৯.অ্যাসাইলেম থেকে মুক্তির আদেশ-** সময় কার্যকর থাকাকালীন যে কোন আইন প্রয়োগের বিধান সাপেক্ষে, যে কোনও অ্যাসাইলেমে ঢোকার ক্ষেত্রে দর্শকের মধ্যে তিনজন বৈধতা পাবেন, যাদের মধ্যে একজন মেডিকেল অফিসার হতে হবে, তাদের অধীনে লিখিতভাবে, এই ধরনের অ্যাসাইলেমে আটককৃত যে কোনও ব্যক্তির মুক্তির আদেশ দেওয়ার যেতে পারে। ও তৎক্ষণাৎ এই নোটিশটি সরকারী কর্মকর্তাকে জানাতে হবে। একজন ব্যক্তিকে হাবিয়াস কর্পাস দ্বারা লুনাটিক অ্যাসাইলেম থেকে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে[22] ।

**১০.মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তির যথাযথ চিকিৎসার জন্য তার আত্মীয় কর্তৃক দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষেত্রে আদেশ -** যদি কোন মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির পরিবার মনে করেন যে অ্যাসাইলামের পরিবর্তে তার নিজের তত্ত্বধানে ও হেফাজাতে নেবেন তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট ও মেডিকেল অফিসারের সুপারিশে তাকে যত্ন ও চিকিৎসা ব্যবস্থা করার সুবাদে ওই মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তিকে মুক্তি দেওয়া হবে[23] ।

**১১.** কারাগারের পরিদর্শক একটি সার্বজনীন অ্যাসাইলেম থেকে অন্যটিতে কাউকে অপসারণের আদেশ দিতে পারেন। ] ভারতীয় লুনাটিকস অ্যাসাইলেম আইন(১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের), ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের সংশোধন আইন (১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের XX) দ্বারা রদ করা হয়েছিল[24] ।

**১২. আদেশ বা শংসাপত্রের সংশোধন -** যদি কোনও মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে কোনও অ্যাসাইলেমে রিসেপশানের পরে দেখা যায় যে, তিনি যে মেডিকেল শংসাপত্র পেয়েছেন সেটিত্রুটিযুক্ত বা ভুল, পরে মেডিকেল অফিসেরের অনুমোদন শংসাপত্র সংশোধন করা যাবে[25]।

**১৩. আটকের এবং পালানোর পরে পুনরায় আটক করার আদেশ ও শংসাপত্রের যৌক্তিকতা-** অ্যাসাইলেমে থাকা উন্মাদ ব্যক্তি যদি কোন অবস্থায় পলাতক বা অপসারন হয় তাহলে ঐ অ্যাসাইলেমের ম্যানেজার ও পলিস অফিসের দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে আসাইলামে পৌঁছানো

[22] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট, XXXVI অফ ১৮৫৮, দ্যা ল অফ লুনেসি, সেকশন – ৯

[23] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট, XXXVI অফ ১৮৫৮, দ্যা ল অফ লুনেসি, সেকশন – ১০

[24] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট, XXXVI অফ ১৮৫৮, দ্যা ল অফ লুনেসি, সেকশন – ১১

[25] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট, XXXVI অফ ১৮৫৮, দ্যা ল অফ লুনেসি, সেকশন – ১২

বা আটক করা যেতে পারে[26] ।

**১৪.কোন কোন ক্ষেত্রে মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তিদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকার অর্থ প্রদান করেঃ** যখন কোনও মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তির পরিবার তার ব্যয় পরিশোধের জন্য অক্ষম হয় তবে মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তির জন্য থাকার ব্যবস্থা, রক্ষণাবেক্ষণ, পোশাক, ওষুধ এবং যত্নের জন্য ব্যয়ভার ম্যানেজারকে প্রদান করা হবে[27] ।

**১৫.সিভিল কোর্ট, ম্যাজিস্ট্রেটের আবেদনের ভিত্তিতে মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তির সম্পত্তি থেকে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় বা তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আবদ্ধ ব্যক্তির দ্বারা আদেশ প্রদান করতে পারেঃ** ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ কমিশনার দ্বারা প্রেরিত ভারসাম্যহীন ব্যক্তির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ম্যাজিস্ট্রেটবা পুলিশ কমিশনার বা আদালত সেই ব্যক্তির প্রযোজ্য সম্পদ ব্যবহার করতে পারে, বা তাকে রক্ষণাবেক্ষণের উপায় রয়েছে, তাহলে তার থাকার ব্যবস্থা, রক্ষণাবেক্ষণ, পোশাক , ওষুধ এবং যত্নের জন্য ব্যয়ভার পুনরুদ্ধারের আদেশ দেবেন[28] ।

**আদেশের শৃঙ্খলা, ইত্যাদি-** এ জাতীয় আদেশ একই পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা হবে এবং উক্ত আদালত কর্তৃক উল্লেখিত সম্পত্তি বা ব্যক্তির বিষয়ে নিয়মিত মামলা হিসাবে উক্ত আদালত কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন রায় বা আদেশ হিসাবে একই বল প্রয়োগ ও কার্যকর করবে।

**১৬. মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তির দখলে থাকা সম্পত্তির বিচরণ-** যে কোনও ব্যক্তিগত সম্পত্তি যা মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তির দখলে থাকে ও যার সঠিক ব্যবহার হয় না, তার রক্ষণাবেক্ষণ-এর ব্যয় বহনের জন্য সেগুলি ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা বিক্রয় করা যেতে পারে।

**১৬.মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তিকে রক্ষনাবেক্ষনের জন্য আত্মীয় কর্তৃক তার সম্পত্তির দায়িত্ব।-** যে কোনও আত্মীয় বা ব্যক্তির যে কোনও মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তিকে রক্ষণাবেক্ষণের দায়বদ্ধতা এই আইনের অন্তর্ভুক্ত কোনও বিধান দ্বারা কেড়ে নেওয়া বা প্রভাবিত করা যাবে না[29]।

---

[26] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট, XXXVI অফ ১৮৫৮, দ্যা ল অফ লুনেসি, সেকশন – ১৩

[27] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট, XXXVI অফ ১৮৫৮, দ্যা ল অফ লুনেসি, সেকশন – ১৪

[28] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট, XXXVI অফ ১৮৫৮, দ্যা ল অফ লুনেসি, সেকশন – ১৫

[29] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট, XXXVI অফ ১৮৫৮, দ্যা ল অফ লুনেসি, সেকশন – ১৬

**১৭.সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতার সংরক্ষণ-** এই আইনের অন্তর্ভুক্ত কোন কিছুই তদন্তের মাধ্যমে বা ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের XXXIV-এর আইনের বিধানের অধীনে রয়্যাল চার্টার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিচার আদালতের ক্ষমতাতে হস্তক্ষেপ করা হবে না[30]। অপর্যাপ্ত বা কোনো অ্যাসাইলেম না থাকা প্রদেশগুলির জন্য বিধান।

**১৭.এ. নিম্নলিখিত যে কোনও একটি ক্ষেত্রে, যথা;**

(ক) যখন একজন সরকারী কর্মচারী মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তিদের রিসেপশান এবং আটক করার জন্য তার সীমাবদ্ধতার মধ্যে একটি সরকারী অ্যাসাইলেম প্রতিষ্ঠা করেননি।

(খ) যখন কাউন্সিলের গভর্নর জেনারেলের নিকট মনে হয় যে সীমাবদ্ধতার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি সার্বজনীন অ্যাসাইলেম সরকার কর্তৃক পরিচালিত অঞ্চলগুলির মধ্যে অবস্থিত নয় তাহলে তার সীমা অতিক্রম করে ব্রিটিশ ভারতের যে কোনও অংশে অ্যাসাইলেম নিযুক্ত করতে পারেন[31] ।

**১৭.বি আইনের উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক অ্যাসাইলেমকে প্রেসিডেন্সি অ্যাসাইলেম হিসাবে ব্যবহার করা।** কাউন্সিলের গভর্নর জেনারেল যেকোনো সময়ে প্রেসিডেন্সির সাথে সংযুক্ত নয় বা যারা প্রেসিডেন্সির সাথে সংযুক্ত ব্রিটিশ ভারতের যে কোনও অংশকে এই সমস্ত জায়গায় অবস্থিত ব্রিটিশের যে কোনও লুনাটিক অ্যাসাইলেমে সরাসরি আদেশ দিতে পারেন[32]।

**১৭.সি মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তিদের এক অ্যাসাইলেম থেকে অন্য অ্যাসাইলেমে স্থানান্তর-** সরকারী কর্মচারীর আদেশের মাধ্যমে কোনো মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তিকে এক অ্যাসাইলেম থেকে সরকারের সীমার মধ্যে অন্য যে কোনও অ্যাসাইলেমে স্থানান্তর করা যেতে পারে[33] ।

**১৮.মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তির ব্যাখ্যা-** এই আইনে ব্যবহৃত "লুনাটিক" শব্দের অর্থ নির্বিঘ্ন মনের প্রত্যেক ব্যক্তির এবং প্রত্যেক ব্যক্তির বোকা হওয়ার অর্থ অন্তর্ভুক্ত থাকবে[34]।

---

[30] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট, XXXVI অফ ১৮৫৮, দ্যা ল অফ লুনেসি, সেকশন – ১৭

[31] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট, XXXVI অফ ১৮৫৮, দ্যা ল অফ লুনেসি, সেকশন – ১৭- A

[32] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট, XXXVI অফ ১৮৫৮, দ্যা ল অফ লুনেসি, সেকশন – ১৭- B

[33] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট, XXXVI অফ ১৮৫৮, দ্যা ল অফ লুনেসি, সেকশন – ১৭- C

[34] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট, XXXVI অফ ১৮৫৮, দ্যা ল অফ লুনেসি, সেকশন – ১৮

## ১৮৫৮ খ্রীঃ উন্মাদ আশ্রম আইনের নীতি মালায় পাগলদের দৈনিক চার্জ [35] - চিত্র- ১

*In the 'Special Wards' as follows :—*

| Monthly income of the patient or head of a family. | Scale of daily charges for Government officials. * | | | Scale of daily charges for non-officials. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | | 3 | | |
| **EUROPEANS AND EURASIANS.** | | | | | | |
| | Rs. | A. | P. | Rs. | A. | P. |
| Minimum ... ... ... ... ... | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 300 to 399 ... ... ... ... | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| 400 to 499 ... ... ... ... | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
| 500 to 599 ... ... ... ... | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 600 to 699 ... ... ... .. | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 700 to 799 ... ... ... ... | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 800 to 899 ... ... ... ... | 9 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 |
| 900 to 999 ... ... ... ... | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 1,000 to 1,099 ... ... ... ... | 11 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 |
| 1,100 and above ... ... ... ... | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| **NATIVES.** | | | | | | |
| Minimum ... ... ... ... ... | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 50 to 74 ... ... ... ... ... | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 to 99 ... ... ... ... ... | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 100 to 149 ... ... ... ... ... | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 150 to 199 ... ... ... ... ... | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| 200 to 299 ... ... ... ... ... | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 300 and above ... ... ... ... | The rates for Europeans and Eurasians. | | | | | |

[35] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনাসি ম্যানুয়াল ফর মেডিক্যাল অফিসার অ্যান্ড দ্যা জেনারেল পাবলিক, মেজর আর, ব্রাইসন, ইন্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিস থার্ড এডিশন রিভাইসড বাই ক্যাপ্টেন পি, হেফারনান, ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস, ক্যালকাটা, থ্যাকার, স্পিনক অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯১৩ ওয়েলকাম লাইব্রেরি ডিজিটাইজড কালেকশন, পৃ- ১২

## ১৮৫৮ খ্রীঃ উন্মাদ আশ্রম আইনের নীতি মালায় পাগলদের দৈনিক চার্জ[36] - চিত্র- ২

SCALE OF HOSPITAL CHARGES.

*In the 'General Wards' Private Patients, both official and non-official, pay at the following rates :—*

| Monthly incomes. | | | Rates per diem. Rs. | A. | P. |
|---|---|---|---|---|---|
| From Rs. 25 to Rs. 49 | ... | ... | 0 | 4 | 0 |
| ,, ,, 50 to ,, 99 | ... | ... | 0 | 8 | 0 |
| ,, ,, 100 to ,, 149 | ... | ... | 0 | 12 | 0 |
| ,, ,, 150 to ,, 199 | ... | ... | 1 | 0 | 0 |
| ,, ,, 200 and above | ... | ... | 2 | 0 | 0 |

Children under 15 years—¼ rate for the head of the family.
Children above 15 years and wives—½ rate for the head of the family.

*Military patients treated in the General Wards shall be charged the rates laid down in the Army Regulations as in Military Hospitals.*

# মিলিটারি লুনাটিক অ্যাক্ট , ১৮৭৭

## এ. ফিলিপস, ভারত সরকারের সচিব দ্বারা রচিত

ঔপনিবেশিক শাসকগণ শুধুমাত্র সাধারণ উন্মাদদের জন্য আইন পাশ করেনি, সামরিক বাহিনী নিযুক্তিদের মধ্যে যদি কেউ উন্মাদগ্রস্থতা রোগে আক্রান্ত হয় তার জন্য ১৮৭৭ খ্রিঃ আর একটি আইন পাশ করা হয়, যা মিলিটারি লুনাটিক অ্যাক্ট নামে পরিচিত। অর্থাৎ সামরিক লুনাটিকদের উন্মাদ আশ্রমে ভর্তির সুবিধার্থে এই আইন পাশ করা হয়। ব্রিটিশ সামরিক কর্তাদের সামকালীন নথী-পত্র ও বিভিন্ন সরকারি প্রতিবেদন লক্ষ্য করা যায় যে, সামরিক কর্মচারীরা দীর্ঘদিন ধরে প্রবাসে দিনযাপনের ফলে ক্রমশ অবসাদ গ্রস্থ ও মনোবিকার রোগে ভুগত এরূপ অবস্থা দীর্ঘদিন চলতে থাকায় সামরিক করমচারীদের একটি বৃহৎ অংশ মানসিক রোগ গ্রস্থ হয়ে

[36] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনাসি ম্যানুয়াল ফর মেডিক্যাল অফিসার অ্যান্ড দ্যা জেনারেল পাবলিক, মেজর আর, ব্রাইসন, ইন্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিস থার্ড এডিশন রিভাইসড বাই ক্যাপ্টেন পি, হেফারনান, ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস, ক্যালকাটা, থ্যাকার, স্পিনক অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯১৩ ওয়েলকাম লাইব্রেরি ডিজিটাইজড কালেকশন, পৃ-১৩

যেত, কিন্তু ব্রিটিশ সামরিক আইন ছিল কঠোর ও সুশৃঙ্খল নিয়মানুবর্তিতায় ভরপুর। অতএব কঠোর জীবনযাপন সামরিক কর্মচারীদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলত। অপরদিকে মনরোগে আক্রান্ত সৈন্য বাহিনীর সাহায্যে সাম্রাজ্যের উপর সুনিপুন নজরদারি করতে ব্যহত হতো । তাই সামরিক অধিকর্তারা অনুভব করেছিল মনোরোগে আক্রান্ত সামরিক কর্মচারীদের সুব্যবস্থা করা। এই উদ্দেশ্য কে বাস্তবায়ন করার জন্য মেলেটারি লুনাটিক আইন পাশ করা হয় [37]।

## আইনের মূল বিষয়বস্তু

ভারতের কাউন্সিল অফ গভর্নর জেনারেল-এ নিুলিখিত আইনটি ৩০ ই-মে মাসে মহামান্য গভর্নর জেনারেলের সম্মতিতে পাশ করা হয়। ১৮৭৭, এবং এর মাধ্যমে সাধারণ তথ্যের জন্য প্রচারিত হয়। উন্মাদআশ্রমে সামরিক লুনাটিকদের প্রবেশের সুবিধার্থে একটি আইন। ইউরোপীয় লুনাটিক এবং নেটিভ মিলিটারি লুনাটিক দের উন্মাদ আশ্রমে ভর্তির জন্য; আইনে যে বিষয় গুলি উপস্থাপন করা হয়েছে সেগুলি বিভিন্ন ধারা অনুযায়ী নিন্মে আলোচনা করা হল।

১. ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোয় মেলেটারি লুনাটিক আইনটি সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই আইনটি নেটিভ মেলেটারি ও ইউরোপীয় মেলেটারিদের ক্ষেত্রে বলবত করা হবে। ভারতের দেশীয় রাজ্য ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রেসিডেন্সি গুলিতে কার্যকরী হয়।

২. মেলেটারি লুনাটিকদের জন্য এই আইন কার্যকরী হওয়ার পর ১৮৭২ সালে XXII অ্যাক্টটি বাতিল করা হয়। এবং ১৮৭৭ এর এই আইনের মাধ্যমে সৈনিকদের ক্ষেত্রে উন্মাদ গ্রস্থততার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় [38]।

(৩) এই ধারায় বলা হয় যে সামরিক বিভাগে কর্মরত কোন কর্মচারী যদি উন্মাদ গ্রস্থতা রোগে আক্রান্ত হয় তাহলে তাকে সুনির্দিষ্ট হেফাজতে রাখা হবে। এক্ষেত্রে কোন ইউরোপীয় কর্মকর্তা

---

[37] দ্যা মিলিটারি লুনাটিক অ্যাক্ট, ১৮৭৭, অ্যান অ্যাক্ট টু ফ্যাসিলিটি দ্যা এডমিশন অফ মিলিটারি লুনাটিক ইন্টু অ্যাসাইলাম, অ্যাক্ট নং- XI অফ ১৮৭৭, লেগিসলেটিভ ডিপার্টমেন্ট, জুলাই ৭ , ১৮৭৭, দ্যা ফলোইং অ্যাক্ট অফ দ্যা গভর্নর – জেনারেল অফ ইন্ডিয়া ইন কাউন্সিল রিসিভড দ্যা আসেন্ট ইফ হিস এক্সসিলেন্সি দ্যা গভর্নর – জেনারেল অন দ্যা থার্টি – ফাস্ট মে ১৮৭৭, অ্যা, ফিলিপ্স, সেক্রেটারি টু দ্যা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া।

[38] দ্যা মিলিটারি লুনাটিক অ্যাক্ট, ১৮৭৭, অ্যাক্ট নং- XI, সেকশন – ২।

যথা সৈনিক অফিসার তার চিকিৎসার জন্য পরামর্শ দেন। সুচিকিৎসার জন্য সেই লুনাটিক মেলেটারিকে ব্রিটিশ বাহিনীর মেডিকেল সার্ভিসে কোন একজন সার্জেন্ট জেনারেলের কাছে পাঠানো হয়। সার্জেন্ট জেনারেলের পরামর্শে ওই উন্মাদ সৈনিকের চিকিৎসা তদারকির কাজ শুরু করার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় । এক্ষেত্রে যদি মেডিকেল সার্জেন্ট মনে করে তাকে লুনাটিক অ্যাসাইলামের ভর্তি করা অবশ্যই প্রয়োজন তাহলে ওয়ারেন্ট অফিসার ও নন-কমিশন অফিসারদের উন্মাদ সৈনিক কে উন্মাদ আশ্রমে চিকিৎসার জন্য আটকের নির্দেশ দেন । আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ইউরোপীয় সৈনিকদের সুবিধাজনকভাবে ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। নেটিভ সৈন্যদের ক্ষেত্রে মেডিকেল অফিসার ও সার্জেন্ট জেনারেল গভর্নর জেনারেলের অনুমোদনের মাধ্যমে লুনাটিক অ্যাসাইলামে প্রেরণ করা হয়। উন্মাদ গ্রস্থততা থেকে সেরে ওঠা না পর্যন্ত সেই সৈনিককে অ্যাসাইলামের আটকে চিকিৎসা করার ব্যবস্থা করা হয়[39] ।

৪. যদি কোন সৈনিক পাগল বা উন্মাদ হয়ে যায়, তাহলে সেই রেজিমেন্টের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তা বাহিনীর কমান্ডিং জেনারেল এর কাছে সৈনিকদের চিকিৎসার জন্য রিপোর্ট করে এবং কমান্ডিং জেনারেল ইউরোপীয় সৈনিকদের চিকিৎসার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেন [40]।

## কমিটি কর্তৃক নেটিভ পরীক্ষা

৫. এই ধারায় লুনাটিক সৈনিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য একজন জেনারেল অফিসার ও দুইজন মেডিকেল অফিসার এর সমন্বয়ে একটি কমিটি তৈরি করা হয়। এই কমিটি ঠিক করে ওই সৈনিকটি প্রকৃতপক্ষে উন্মাদ রোগে আক্রান্ত কিনা [41]। ৬. উক্ত কমিটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর যদি সৈনিকটি উন্মাদ বলে বিবেচিত হয় তাহলে দায়িত্ব থাকা কর্মকর্তা ওই সৈনিক কে লুনাটিক আসাইলামে পাঠানোর আদেশ দিতে পারে । আর যদি সেই ব্যক্তিকে সুস্থ বলে বিবেচিত হয় তাহলে তাকে সামরিক বাহিনীর অধীনে পাঠানো হয়। অ্যাসাইলামের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তা কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী উন্মাদ আশ্রমে বা অ্যাসাইলামে চিকিৎসার জন্য সু ব্যাবস্থা গ্রহণ করেন। চিকিৎসার পর সৈনিকটি সুস্থ হয়ে গেলে সামরিক আইন অনুযায়ী তাকে উন্মাদ আশ্রম থেকে

[39] দ্যা মিলিটারি লুনাটিক অ্যাক্ট, ১৮৭৭, অ্যাক্ট নং- XI, সেকশন-৩

[40] দ্যা মিলিটারি লুনাটিক অ্যাক্ট, ১৮৭৭, অ্যাক্ট নং- XI, সেকশন-৪

[41] দ্যা মিলিটারি লুনাটিক অ্যাক্ট, ১৮৭৭, অ্যাক্ট নং- XI, সেকশন-৫

মুক্তি দেয়া হয়[42] । ৭. সামগ্রিক বিধিমালা অনুযায়ী অ্যাসাইলামের দায়িত্বে থাকা সুপার ইনটেন্ডেন্ট ওই সৈনিকটির মুক্তি তখনই দেবে যখন সে পরিপূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠবে । এক্ষেত্রে ওই সৈনিকটির আবার পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য মেডিকেল অফিসারের কাছে আনা হয় তার সুস্থতা বিবেচনার জন্য, সুস্থ স্বাভাবিক বলে মনে হলে মেডিকেল অফিসার তাকে উন্মাদ আশ্রম থেকে মুক্তি দেওয়ার অনুমোদন দেয় [43]। ৮. ইউরোপীয় নেটিভ যেকোনো সৈনিককে সমগ্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য ঔষধ খরচ, পোশাক পরিচ্ছেদ, রক্ষণাবেক্ষণ সমস্ত কিছু দায়িত্ব সামরিক সার্কেলের পে-মাস্টার অ্যাসাইলামের কর্মকর্তাকে প্রদান করবে [44]।

৯. সামরিক আইনের সর্বশেষ এই ধারায় বলা হয় সৈনিকদের চিকিৎসা ব্যবস্থা মেলেটারি লুনাটিক অ্যাক্টের মাধ্যমে গৃহীত ও বিবেচনা করা হয় [45]

## ক্রিমিনাল লুনাটিক অ্যক্ট- ১৮৯৮ অ্যক্ট-V

ঔপনিবেশিক অধ্যায়ে ভারতীয় উন্মাদদের জন্য যে আইন গুলি পাশ করা হয়েছিল, সেই আইন গুলির মধ্য অন্যতম ছিল ১৮৯৮ খ্রিঃ ক্রিমিনাল লুনাটিক অ্যক্ট। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত রকমের উন্মাদ রোগীদের থেকে যারা তুলনামুলক ভাবে অপরাধী প্রবন, ভয়ঙ্কর, তাদের ক্ষেত্রে আলাদা রকম ভাবে পরিচর্যা করা[46] । ঔপনিবেশিক সরকার এই আইনের দ্বারা সেই সমস্ত অপরাধী অথচ পাগল তাদের উপর বিধি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। সুনির্দিষ্ট নিয়ম কানুনের মধ্য উপযুক্ত চিকিৎসার মাধ্যমে আরোগ্য লাভ ঘটানো। কিন্তু প্রশ্ন হল ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো তাদের কে ক্রিমিনাল লুনাটিক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। তাদের দন্ড ও চিকিৎসার মাপকাঠি কিভাবে নির্ধারণ করা হবে। এই ধরনের বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক সরকার যে আইন প্রণয়ন করেছিলেন তা ক্রিমিনাল লুনাটিক অ্যক্ট নামে পরিচিত। ভারতীয় দন্ডবিধি আইনে

---

[42] দ্যা মিলিটারি লুনাটিক অ্যাক্ট, ১৮৭৭, অ্যাক্ট নং- XI, সেকশন-৬

[43] দ্যা মিলিটারি লুনাটিক অ্যাক্ট, ১৮৭৭, অ্যাক্ট নং- XI, সেকশন-৭

[44] দ্যা মিলিটারি লুনাটিক অ্যাক্ট, ১৮৭৭, অ্যাক্ট নং- XI, সেকশন-৮

[45] দ্যা মিলিটারি লুনাটিক অ্যাক্ট, ১৮৭৭, অ্যাক্ট নং- XI, সেকশন-৯

[46] দি বেঙ্গল জেলকোড,

যে সমস্ত অপরাধীকে চিহ্নিত করা হয় [47] তাদের একটি অংশ ছিল বাতিকগ্রস্থ উন্মাদ। মানসিক রোগ গ্রস্হতার দরুন বিভিন্ন সময়ে তাঁরা অপকর্মের মধ্য দিয়ে দোষী সাব্যস্ত হয়। কিন্তু সেই সমস্ত মানসিক রোগী ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যক্ট অনুযায়ী একজন অপরাধি। তাই ঔপনিবেশিক সাশন যন্ত্রে এই দোষী সাব্যস্ত অপরাধী অথচ মানসিক রোগীদের জন্য এই আইনটি ছিল, খুব গুরুত্বপূর্ণ [৪৮] যা ভারতের ইতিহাসে এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

## আইনের মূল বিষয়-

১৮৯৮ এর অ্যক্ট ঠ এর ৩৪ নম্বর অধ্যায়ে এই আইন সম্পর্কে সুবিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। ক্রিমিনাল লুনাটিকের আইনের ধারটি মোট ১১ টি অংশে বিভক্ত [৪৯]। ১৯১৩ খ্রিঃ প্রকাশিত ভারতীয় নীতিমালার সারগ্রন্থে মেজর আর.বিয়ারসন ক্রিমিনাল লুনাটিক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। পরবর্তী কালে কজাপ্তেন পি.হিফারনান সংশোধিত আকারে এই পাগলদের জন্য কিছু নীতি মালাও নিয়ম কানুন তৈরি করেন [50]।

**বিভিন্ন ধারাঃ-** ক্রিমিনাল লুনাটিক অ্যক্টটি ১৮৯৮ এর পঞ্চম আইনের ৪৬৪ নং ধারা থেকে ৪৭৫ নং টি ধারা পর্যন্ত আলোচিত হয়েছে। ৪৬৪ নং ধারাটি আবার দুটি ধারায় বিভক্ত করা হয়েছে, আবার ধারাগুলি আবার কয়েকটি উপধারায় বিভক্ত[৫১] ।

**৪৬৪ নং ধারাঃ- পাগল অভিযুক্ত করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রক্রিয়া [52]-**

---

[47] দ্যা ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট ( ১ অফ ১৮৭২ ), উইথ এন ইন্ট্রোডাকশন অন দ্যা প্রিন্সিপ্যাল অফ জুডিক্যাল এভিডেন্স, জেমস ফিটজ, জেমস স্টিফেন, লন্ডন; ম্যাক্মিলান অ্যান্ড কোম্পানি, ক্যালকাটা, থ্যাকার, স্পিনক অ্যান্ড কোং , পৃ-২০০ অ্যান্ড ২২৫

[48] বেঙ্গল অ্যাক্ট IX অফ ১৮৭৯, দ্যা কোর্ট অফ ওয়ার্ড অ্যাক্ট, ১৮৭৯।

[49] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনাসি ম্যানুয়াল ফর মেডিক্যাল অফিসার অ্যান্ড দ্যা জেনারেল পাবলিক, অ্যা সামারি অফ দ্যা লুনেসি অ্যাক্ট অ্যান্ড রুলস রেগুলেটিং দ্যা এডমিশন ইন্টু ডিটেনশন ইন, আন্ড ডিসচার্জ ফ্রম গভর্নমেন্ট লুনাটিক অ্যাসাইলাম অফ প্রাইভেট অ্যান্ড পাবলিক পেসেন্ট কমপ্লেইন বাই মেজর আর, ব্রাইসন, ইন্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিস, থার্ড এডিশন রিভাইসড বাই ক্যাপ্টেন পি, হেফারনান, ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস, থ্যাকার, স্পিনক অ্যান্ড কোম্পানি, ক্যালকাটা, ১৯১৩।

[50] দ্যা কোড অফ ক্রিমিনাল প্রোসিডিউর – অ্যাক্ট অফ ভলিউম- ১৮৯৮, ইন্ডিয়ান লেজিস্লেটিভ ডিপার্টমেন্ট, ক্রিমিনাল প্রোসিডিউর, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, মার্চ ১৮৯৮, পৃ- ১৪১-১৪৪।

[51] ক্রিমিনাল প্রোসিডিউর ইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া; বিইং অ্যা কমেন্টারি অন অ্যাক্ট ভলিউম- ১৮৯৮ এস এমেন্ডেড আপ টু ডেট, স্যার জন জর্জ উড্রফ, থ্যাকার, স্পিনক অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯২৬- ক্রিমিনাল প্রোসিডিউর , পৃ- ১৯৫।

[52] অ্যাক্ট V অফ ১৯৮৯, ক্রিমিনাল লুনাটিক, অধ্যায় - XXXIV, সেকশন- ৪৬৪

i. যদি কোন অপরাধী দন্ড বা বিচার ব্যবস্তায় অসুস্থ মনের হয় তখন তাকে কোন মেডিকেল অফিসার দ্বারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর একজন সাক্ষী হিসাবে গ্রহন করে, তাকে পাগলের সার্টিফিকেট দেওয়া হয়[53]।

ii.মেডিকেল অফিসারের পরামর্শ ও ম্যাজিস্ট্রেটের মতামতের ভিত্তিতে এই অসুস্থ ব্যক্তিকে বিচার সংক্রান্ত স্থগিত করা হয়[54] ।

**৪৬৫ নং ধারাঃ- সেশন কোর্ট বা হাইকোর্টে পাগল প্রমানের ক্ষেত্রে পক্রিয়া [55]।**

i. অভিযুক্তের মানসিক সুস্থতা ও মানসিক অক্ষমতার নির্ণয়ের জন্য আদালতে তার বিচারের অংশ হিসেবে বিবেচিত করা হয়[৫৬] ।

**৪৬৬ নং ধারাঃ- ত্তদন্ত বিচারের জন্য অপরাধী পাগলের মুক্তি [57]-**

i.তদন্ত ও বিচার ব্যবস্থার অপরাধী মানসিক ভাবে প্রমান হলে সেই মামলায় অপরাধিকে জামিন দেওয়া হয়, এবং ওই অপরাধী পাগলকে নিজের ও অন্যের ব্যক্তির প্রতি আঘাত থেকে বিরত রাখার জন্য মানসিক চিকিৎসা করা হয়[৫৮] ।

**পাগলদের রক্ষণাবেক্ষণ-**

ii.এই ধারায় অপরাধীদের রক্ষণাবেক্ষণ এর কথা বলা হয়। এবং মানসিক সুস্থতার জন্য ওই অভিযুক্ত পাগলকে স্থানীয় কারাগার কিংবা উন্মাদ আশ্রমে হেফাজত করা রাখা হয় [59]।

**৪৬৭ নং ধারাঃ-অপরাধী পাগলের তদন্ত ও বিচার পুনঃরায় শুরু করা [60]-**

---

[53] অ্যাক্ট V অফ ১৯৮৯, ক্রিমিনাল লুনাটিক, অধ্যায় - XXXIV, সেকশন- ৪৬৪/১

[54] অ্যাক্ট V অফ ১৯৮৯, ক্রিমিনাল লুনাটিক, অধ্যায় - XXXIV, সেকশন- ৪৬৪/২

[55] অ্যাক্ট V অফ ১৯৮৯, ক্রিমিনাল লুনাটিক, অধ্যায় -XXXIV, সেকশন- ৪৬৫

[56] অ্যাক্ট V অফ ১৯৮৯, ক্রিমিনাল লুনাটিক, অধ্যায় -XXXIV, সেকশন- ৪৬৫/১

[57] অ্যাক্ট V অফ ১৯৮৯, ক্রিমিনাল লুনাটিক, অধ্যায় - XXXIV, সেকশন- ৪৬৬

[58] অ্যাক্ট V অফ ১৯৮৯, ক্রিমিনাল লুনাটিক, অধ্যায় - XXXIV, সেকশন- ৪৬৬/১

[59] অ্যাক্ট V অফ ১৯৮৯, ক্রিমিনাল লুনাটিক, অধ্যায় - XXXIV, সেকশন- ৪৬৬/২

[60] অ্যাক্ট V অফ ১৯৮৯, ক্রিমিনাল লুনাটিক, অধ্যায় - XXXIV, সেকশন- ৪৬৭

i.এক্ষেত্রে ৪৬৪ এবং ৪৬৫ নং ধারায় আইনটি স্থগিত হলে ওই অপরাধী পাগলের ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালতের সামনে হাজির করা তার মানসিক অসুস্থ সংক্রান্ত বিষয়টি পুনঃরায় পর্যালোচনার জন্য তদন্ত শুরু হয় [৬১]।

ii.যখন অভিযুক্ত পাগলকে ৪৬৪ নং ধারা অনুযায়ী মুক্তি দেওয়া হয় এবং সেই অপরাধী পাগলের উপস্থিতি নিশ্চয়তা আদালত তার পক্ষে নিযুক্ত কর্মকর্তার কাছে পেশ করেন।এবং এই তদন্তে অপরাধীটি আদেও মানসিক রোগগ্রস্থ কিনা তা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয় [৬২]।

**৪৬৮ নং ধারাঃ-অভিযুক্ত পাগলকে আদালতে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে উপস্থিতি করার প্রক্রিয়া [63]-**

i. অভিযুক্তকে আবার প্রতিরক্ষা তদন্তের জন্য আদালতের সামনে উপস্থিত ক্রান হয়[৬৪]।

ii.ওই অভিযুক্ত পাগলটি যদি মানসিক রোগগ্রস্থ প্রামানিত হয়, তাহলে ৪৬৪ এবং ৪৬৫ নং ধারা অনুসারে তার সত্যতা যাচাই করার জন্য আবার তদন্ত শুরু হয় [৬৫]।

**৪৬৯ নং ধারাঃ-যখন অভিযুক্তকে পাগল বলে ধরা হয় সেই সম্পর্কিত বিষয় আলোচনা করা হয়েছে[66]** - ঔপনিবেশিক আইনের এই ধারায় বলা হয় অপরাধী যে কাজ তির জন্য দোষী বলে প্রমানিত হয়েছে, সেই কাজ টি সংগঠনের সময় তার মনের অসুস্থতা সম্পর্কে অণুসন্ধানের পর যদি সত্যি প্রমান হয় যে মনবৈকল্য এর কারনে তিনি এই অপরাধীটি করেছেন, অর্থাৎ তিনি সেই সময় মানসিক ভাবে সুস্থ ছিলেন না, তাহলে ওই অভিযুক্তকে পাগল বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু সেই অপরাধী আবার পরবর্তী কালে মানসিক ভাবে সুস্থ হয়ে উঠলে তাকে আদালতের কাছে প্রমান দিতে হয়।

**৪৭০ নং ধারাঃ-অপরাধীটিকে মানসিক অসুস্থতা বা উন্মাদনার ভিত্তিতে বেখসুর খালাসের রায় [৬৭]-** ঔপনিবেশিক এই আইনের ধারা অনুযায়ী, দোষী সাব্যস্তওই ব্যক্তি যে সময় অপরাধ করেছিল

---

[61] অ্যাক্ট V অফ ১৯৮৯, ক্রিমিনাল লুনাটিক, অধ্যায় - XXXIV, সেকশন- ৪৬৭/১

[62] অ্যাক্ট V অফ ১৯৮৯, ক্রিমিনাল লুনাটিক, অধ্যায় - XXXIV, সেকশন- ৪৬৭/২

[63] অ্যাক্ট V অফ ১৯৮৯, ক্রিমিনাল লুনাটিক, অধ্যায় -XXXIV, সেকশন- ৪৬৮

[64] অ্যাক্ট V অফ ১৯৮৯, ক্রিমিনাল লুনাটিক, অধ্যায় - XXXIV, সেকশন- ৪৬৮/১

[65] অ্যাক্ট V অফ ১৯৮৯, ক্রিমিনাল লুনাটিক, অধ্যায় -XXXIV, সেকশন- ৪৬৮/২

[66] অ্যাক্ট V অফ ১৯৮৯, ক্রিমিনাল লুনাটিক, চেপটার XXXIV, সেকশন- ৪৬৯

[67] অ্যাক্ট V অফ ১৯৮৯, ক্রিমিনাল লুনাটিক, অধ্যায় -XXXIV, সেকশন- ৪৭০

সেই সময় ওই ব্যক্তি মানসিক ভাবে অপ্রকৃতিস্থ ছিল, অর্থাৎ স্বাভাবিক ছিল না। তাই অপরাধের প্রকৃতি সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিল।তাই এইরুপ অবস্থার জন্য ঐ অপরাধী বেকসুর খালাস দেওয়া হয়।

**৪৭১ নং ধারাঃ-পাগলকে নিরাপদ স্থানে হেফাজত রাখার প্রক্রিয়া** [68]- ৪৭০ নং ধারা অনুযায়ী অপরাধীকে পাগলকে বেকসুর খালাস দেওয়ার পর আদালতের রায় অনুযায়ী নিরাপদ স্থানে হেফাজত করা হয়।

**৪৭২ নং ধারাঃ**-অতএব এই অপরাধীকে ডিসচার্জ করার পর স্থানীয় দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্বে ন্যস্ত করা হয় [69]।

**৪৭৩ নং ধারাঃ**-এই ধারায় অপরাধী পাগলের শাস্তি লাঘরের জন্য প্রতিবেদন উপস্থাপন [70]।

**৪৭৪ নং ধারাঃ**-এর পর অপরাধী যে কারাগারে বন্দী ছিল সেখান থেকে মুক্ত করার জন্য ( ৪৬৬ ও ৪৭১ নং ধারা অনুযায়ী )- আবেদন প্রক্রিয়া। এই ধারা অনুসারে ইন্সপেক্টর জেনারেল বা অন্যান্য পরিদর্শকরা তাকে সার্টিফিকেট প্রদান করেন। যদি ঐ অপরাধী নিজের বা অন্য কারোর জন্য বিপদজনক না হয় তাহলে তাকে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে, কিংবা মানসিক অসুস্থতার জন্য উন্মাদ আশ্রমে স্থানস্তর করা হতে পারে। এই প্রক্রিয়াটি একজন জুডিশিয়াল ও দুই জন মেডিকেল অফিসার নিয়ে কমিটির তত্তাবধানে সংগঠিত হয়[71]|

এই কমিটি ঐ ব্যক্তির মানসিক অবস্থা সম্পর্কে সঠিক তদন্ত করবে, প্রয়োজনে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা গ্রহণ করবে, এবং এরাই ঠিক করবে ঐ অপরাধী পাগলের মুক্তি দেওয়া যাবে না কি আটক করে রাখবে।

**৪৭৫ নং ধারাঃ**-অপরাধী পাগলকে নিকট আত্মীয়ের কাছে অর্পণ এবং তাকে সেবা শুশ্রূষা করার আদেশ করা হয়[72] ।

---

[68] অ্যাক্ট V অফ ১৯৮৯, ক্রিমিনাল লুনাটিক, অধ্যায় - XXXIV, সেকশন- ৪৭১

[69] অ্যাক্ট V অফ ১৯৮৯, ক্রিমিনাল লুনাটিক, অধ্যায় -XXXIV, সেকশন- ৪৭২

[70] অ্যাক্ট V অফ ১৯৮৯, ক্রিমিনাল লুনাটিক, অধ্যায় -XXXIV, সেকশন- ৪৭৩

[71] অ্যাক্ট V অফ ১৯৮৯, ক্রিমিনাল লুনাটিক, চেপটার XXXIV, সেকশন- ৪৭৪

[72] অ্যাক্ট V অফ ১৯৮৯, ক্রিমিনাল লুনাটিক, অধ্যায় - XXXIV, সেকশন- ৪৭৫

# ১৮৯৮ এর ক্রিমিনাল লুনাটিক আইনের একটি খন্ড চিত্র[73]

ACT V OF 1898.

CHAPTER XXXIV.

*Criminal Lunatics.*

**Procedure in case of accused being lunatic.**

464. (i). When a Magistrate, holding an enquiry or a trial, has reason to believe that the accused is of unsound mind and consequently incapable of making his defence, the Magistrate shall enquire into the fact of such unsoundness, and shall cause such person to be examined by the Civil Surgeon of the district or such other Medical Officer as the Local Government directs and thereupon shall examine such Surgeon or other Officer as a witness, and shall reduce the examination to writing.

(2). If such Magistrate is of opinion that the accused is of unsound mind and consequently incapable of making his defence, he shall postpone further proceedings in the case.

**Procedure in case of person committed before Court of Session or High Court being lunatic.**

465. (i). If any person committed for trial before a Court of Session or a High Court appears to the Court at his trial to be of unsound mind and consequently incapable of making his defence, the jury or the Court with the aid of assessors shall, in the first instance, try the fact of such unsoundness and incapacity, and, if satisfied of the fact, shall pass judgment accordingly and thereupon the trial shall be postponed.

(2). The trial of the fact of the unsoundness of mind and incapacity of the accused shall be deemed to be part of his trial before the Court.

**Release of lunatic pending investigation or trial.**

466. (i). Whenever an accused person is found to be of unsound mind and incapable of making his defence, the Magistrate or Court, as the case may be if the case is one in which bail may be taken, may release him on sufficient security being given that he shall be properly taken care of and shall be prevented from doing injury to himself or to any other person, and for his appearance when required before the Magistrate or Court or such Officer as the Magistrate or Court appoints in his behalf.

---

[73] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি মেনুয়্যাল ফর মেডিক্যাল আফিসার অ্যান্ড দ্যা জেনারেল পাবলিক, অ্যা সামারি অফ দ্যা লুনেসি অ্যাক্ট অ্যান্ড রুলস রেগুলেটিং দ্যা এডমিশন ইন্টু ডিটেনশন ইন, আন্ড ডিসচার্জ ফ্রম গভর্নমেন্ট লুনাটিক অ্যাসাইলাম অফ প্রাইভেট অ্যান্ড পাবলিক পেসেন্ট কমপ্লেইনড বাই মেজর আর, ব্রাইসন, ইন্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিস, থার্ড এডিশন রিভাইসড বাই ক্যাপ্টেন পি, হেফারনান, ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস, , থ্যাকার, স্পিনক অ্যান্ড কোম্পানি, ক্যালকাটা, ১৯১৩।

# লুনাটিক প্রিজনার অ্যাক্ট

## ১৯০০ এর অ্যাক্ট-III

ঔপনিবেশিক শাসন আমলে কারাগারে বা জেলখানায় বন্দী কয়েদীদের জন্য ১৯০০ এর তৃতীয় আইনটি পাশ করা হয়। কারাগারে বন্দীদের মধ্যে যদি কেউ উন্মাদগ্রস্থ বা মানসিক রগাক্রান্ত হয়, তাহলে তাদের ক্ষেত্রে কিরূপ ব্যবস্থা নেওয়া হবে , এই উদ্দেশ্য লক্ষ্য রেখে ঔপনিবেশিক শাসকগন উন্মাদ কয়েদীদের এই যে বিধি ব্যবস্থা চালু করেন সেটিই ছিল ১৯০০, অ্যাক্ট-III.

## আইনের মূল বিষয়বস্তু

**ধারা ৩০ এর (১)-** ঔপনিবেশিক আমলের এই আইন টি উন্মাদ কয়েদীদের জন্য ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৯০০ এর তৃতীয় আইনে কয়েদী সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে , আদালতের নির্দেশে যখন কোন ব্যক্তিকে শাস্তির জন্য কয়েদখানায় বন্দী করা হয়, তখন সেই ব্যক্তি যদি উন্মাদগ্রস্থ হয়ে ওঠে বা অসুস্থ মনের বলে মনে হয় তাহলে সরকারি নির্দেশে ঐ ব্যক্তিকে হেফাজতের জন্য ও অন্যান্যদের নিরাপত্তার জন্য উন্মাদ আশ্রমে চিকিৎসার জন্য প্রেরন করা হয়। উক্ত কয়েদীর শাস্তির মেয়াদের পূর্বে যদি চিকিৎসার মাধ্যমে আরোগ্য লাভ করে তাহলে তাকে আবার কয়েদখানায় বন্দী করা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে মেডিকেল অফিসারের শনশাপত্রের প্রয়োজন হয় [74]।

(২) ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের তৃতীয় আইনে বলা হয়, কারাগারে বন্দী পাগলের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে স্থানীয় সরকারি কতৃপক্ষ ঐ পাগল ব্যক্তির নিকট আত্মীয় বা অবিভাবকের সাথে পরামর্শ করার পর, পাগলের অবিভাবকগন যদি তাকে হেফাজতে রাখার দায়িত্ব গ্রহন করে তাহলে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়, নিরাপত্তাজনিত কারনে যদি অবিভাবকগন তাকে হেফাজতে রাখার দায়িত্ব না নেয়,

---

[74] অ্যাক্ট III অফ ১৯০০, লুনাটিক প্রিসনার, সেকশন – ৩০/১. *Whenever it appears to the Local Government that any person detained or imprisoned under any order or sentence of any Court is of un- sound mind, the Local Government may, by a warrant setting forth the grounds of belief that the person is of unsound mind, order his removal to a lunatic asylum, or other place of safe custody within the Province, there to be kept and treated as the Local Government directs during the remainder of the term for which he has been ordered or sentenced to be detained or imprisoned, or if on the expiration of that term it is certified by a Medical Officer that it is necessary for the safety of the prisoner or others that he should be further detained under medical care or treatment, then until he is discharged according to law.*

তাহলে তাকে আবার প্রদেশের অন্য কোন কারাগারে পাঠানো হয়[75] ।

(৩)১৯০০ খ্রিঃ অ্যাক্ট-৩০ এই আইনটিতে বলা হয় পাগল ব্যক্তিটি যখন কারাগার থেকে উন্মাদ আশ্রমে চিকিৎসার জন্য আটক করা হয়, তখনই উন্মাদ আশ্রমে থাকা অবস্থায় ওই পাগল ব্যক্তিতির আটক বা কারাদন্ডের মেয়াদের অংশ হিসাবে গণ্য করা হয় [76]। (এ) যে মেয়াদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর তাকে আটক বা কারাদন্ড প্রদান করা হয় এবং যে সময়ে কোন বন্দীকে ওই উপ-ধারার অধীনে উন্মাদ এসাইলামে আটকে রাখা হবে, তাকে আটক বা কারাদন্ডের মেয়াদের অংশ হিসেবে গণ্য করা হবে [77]|

(৪) যে কোন ক্ষেত্রে উপ-ধারা অনুযায়ী স্থানীয় সরকার নিন্ম লিখিত বিষয় গুলি কার্যকরী করতে সক্ষম হবে। কয়েদি পাগলদের আইনে ৪ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়, ব্রিটিশ ভারতে কাউন্সিল গভর্নর জেনারেল বন্দী উন্মাদকে ব্রিটিশ ভারতের যেকোনো উন্মাদ আশ্রমে নিরাপদ হেফাজতের জন্য আদেশ দিতে পারে [78]।

প্রদেশের অভ্যন্তরে কোন বন্দীকে উন্মাদ এসাইলাম বা অন্য কোন নিরাপদ হেফাজতে অপসারণের আদেশ দিতে, কাউন্সিলের গভর্নর-জেনারেল তাকে ব্রিটিশ ভারতের যে কোন অংশে যে কোন উন্মাদ এসাইলাম বা নিরাপদ হেফাজতে অপসারণের আদেশ দিতে পারেন; এবং স্থানীয় সরকারের আদেশে অপসারিত কোন বন্দীর হেফাজত, আটক, রিমান্ড এবং অব্যাহতি সংক্রান্ত এই বিভাগের বিধান, যতদূর তা প্রযোজ্য হবে, কাউন্সিলের গভর্নর-জেনারেলের আদেশে অপসারিত বন্দীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

(a)১৯০০ সালের তৃতীয় আইনের কোন বন্দীর উন্মাদ এসাইলামে আটকে রাখার অনুমোদন দেয় না, উন্মাদ এসাইলামে স্থানান্তরের আগে যদি কোন কয়েদীর শাস্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। তাহলে সেই ধরনের বন্দীর ক্ষেত্রে,তাকে মুক্তি রদ করার পর পুলিশ পুনরায় গেফতার করে

---

[75] অ্যাক্ট III অফ ১৯০০, লুনাটিক প্রিসনার, সেকশন - ৩০/২ . Where it appears to the Local Government that the prisoner has become of sound mind, the Local Government shall, by a warrant directed to the person having charge of the prisoner, if still liable to be kept in custody, remand him to the prison from which he was removed or to another prison within the Province, or if the prisoner is no longer liable to be kept in custody, order him to be discharged.

[76] অ্যাক্ট III অফ ১৯০০, লুনাটিক প্রিসনারস, সেকশন- ৩০/৩

[77] অ্যাক্ট III অফ ১৯০০, লুনাটিক প্রিসনারস, সেকশন- ৩০/৩-A

[78] অ্যাক্ট III অফ ১৯০০, লুনাটিক প্রিসনারস, সেকশন- ৩০/৪

এবং ১৯১২ সালের চতুর্থ আইনের অনুসারে সেই পাগল কে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে পেশ করা হয়[79] । (জি. ও নং ৬০০, জুডিশিয়াল, ৩১শে মার্চ ১৮৯০) ।

(b) উপ-ধারায় উল্লিখিত মেডিকেল অফিসারের সার্টিফিকেট । উন্মাদ আশ্রমে যদি কোন কয়েদী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আরোগ্য লাভ না করে সেক্ষেত্রে তাকে উন্মাদ আশ্রমের চিকিৎসকের অধীনে রাখা হয় , এবং মেডিকেল অফিসার তাকে পুনরায় আটকের অনুমতি দেয় না । কারণ ওই কয়েদী বা পাগলের আরও চিকিৎসা প্রয়োজন আছে [80] ।

(c ) উপ-ধারায় উলি-খিত পরোয়ানা- ধারা ৩০ এর নিুলিখিত ফর্মে থাকবে । এই পরোয়ানার অধীনে তার শাস্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর কোন উন্মাদকে এসাইলামে আটকে রাখার জন্য সরকারের আর কোন আদেশের প্রয়োজন নেই [81]

## লুনাটিক প্রিজনার অ্যাক্ট- ১৯০০ এর অ্যাক্ট-III এর কয়েদীর জন্য ওয়ারেন্ট লেটার

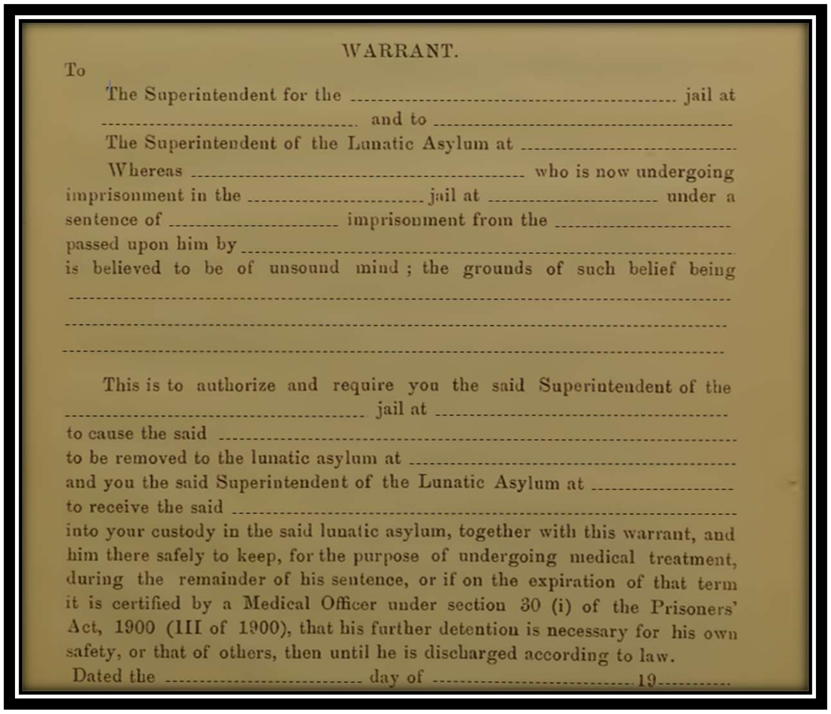

WARRANT.

To

The Superintendent for the ______ jail at ______ and to ______

The Superintendent of the Lunatic Asylum at ______

Whereas ______ who is now undergoing imprisonment in the ______ jail at ______ under a sentence of ______ imprisonment from the ______ passed upon him by ______ is believed to be of unsound mind ; the grounds of such belief being ______

This is to authorize and require you the said Superintendent of the ______ jail at ______ to cause the said ______ to be removed to the lunatic asylum at ______ and you the said Superintendent of the Lunatic Asylum at ______ to receive the said ______ into your custody in the said lunatic asylum, together with this warrant, and him there safely to keep, for the purpose of undergoing medical treatment, during the remainder of his sentence, or if on the expiration of that term it is certified by a Medical Officer under section 30 (i) of the Prisoners' Act, 1900 (III of 1900), that his further detention is necessary for his own safety, or that of others, then until he is discharged according to law.

Dated the ______ day of ______ 19______

---

[79] অ্যাক্ট III অফ ১৯০০, লুনাটিক প্রিসনার, সেকশন – ৩০/৪, (জি. ও. নং. ৬০০, জুডিসিয়াল, ৩১ মার্চ ১৮৯০)

[80] অ্যাক্ট III অফ ১৯০০, লুনাটিক প্রিসনার, সেকশন – ৩০/৪, ( জি. ও. নং. ১২৯৬ misc, ১২ জুন ১৮৮৮ )

[81] অ্যাক্ট III অফ ১৯০০, লুনাটিক প্রিসনার, সেকশন – ৩০/৪-C, দ্যা ওয়ারেন্ট রেফারেড টু ইন সাব-সেকশন (i) অফ সেকশন ৩০উইল বি ইন দ্যা ফলোইং ফ্রম, আন্ডার দিস ফ্রম অফ ওয়ারেন্ট নো ফিউচার অর্ডারস অফ গভর্নমেন্ট আর নিডেড ফর দ্যা ডিটেনশন ইন অ্যাসাইলাম অফ অ্যা লুনাটিক আফটার দ্যা এক্সপায়ার।

# ১৯১২ সালের পাগল আইন

১৯১২ সালের পাগল আইন যেহেতু পাগল সম্পর্কিত একটি বিশেষ আইন, সেহেতু পাগলদের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক তাৎপর্যগত দিক থেকে এই আইনটি অন্য আইনগুলোর চেয়ে বেশি গুরুত্ব বহন করে [৮২]। মূলতঃ পাগলের প্রতি যদি কেউ নির্দয় আচরণ করে কিংবা অবহেলা করে, সেক্ষেত্রে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যেই ১৯১২ সালের ১৬ মার্চ পাগল আইন (The Lunacy Act-১৯১২) প্রণীত হয়। এই আইনটি ঔপনিবেশিক শাসনের পরবর্তী কালপর্বে Indian Laws (Revision and Declaration) অপঃ, ১৯৭৩ (Act No. VIII Of ১৯৭৩)- এর মাধ্যমে যৎসামান্য সংশোধিত হয়ে অদ্যাবধি সারা দেশে কার্যকর রযেছে। ১৯১২ সালের পাগল আইনে ১০১টি সেকশন (এর মধ্যে কিছু সেকশন বাতিল ও কিছু উপসেকশন সংযোজিত) ও ১টি তফসিল (৮টি ফর্মসহ) সন্নিবেশিত হয়েছে। আইনটি সম্পূর্ণ ইংরেজি ভাষায় প্রণীত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কিছু সেকশন সমূহ অতিসংক্ষেপে করে উপস্থাপন করা হল।

## পাগল আইন ও পাগলের আইনগত অধিকার

ঔপনিবেশিক শাসনামলে মানসিকভাবে অসুস্থ নাগরিক দের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছিল *দ্য লুনাসি অ্যাক্ট।* যা বাংলায় পাগল আইন হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু ব্রিটিশদের হাত থেকে ভারত স্বাধীনতা লাভ করলেও আইনটির সুদূরপ্রসারী প্রভাব থেকে যায় । এগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, মানসিক স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ ও রিভিউ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা, মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় নিপতিত ও মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির অধিকার, মানসিক হাসপাতাল ও সেবালয়, চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি ও আটকাদেশ, রিসেপশন অর্ডার ছাড়পত্রের প্রক্রিয়া, অভিভাবকত্ব, সম্পত্তি ও অন্যান্য বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ, মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তির প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে কতিপয় সুরক্ষা সংক্রান্ত বিধান এবং বিবিধ। আইনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় নিপতিত

---

[82] এম.সোহেল,পাগল আইন ও পাগলের আইনগত অধিকার, সাপ্তাহিক অন্যধারা, মার্চ ১৫, ২০১৬।

ও মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির অধিকার সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সেকশন র ক্ষমতাবলে একজন মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তি যেসব অধিকার পাবেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, প্রকৃতিস্থ সময়ে সর্বক্ষেত্রে সমান আইনি সুবিধা পাওয়া, মানসিক অসুস্থ হওয়া অথবা মানসিক অক্ষমতা ঝুঁকিপূর্ণ শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে নাবালক, মহিলা, এবং অভিবাসী ব্যক্তিদের বৈষম্যের শিকার না হওয়া, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য সম্পত্তির অংশীদারিত্ব, স্বাধীন অভিব্যক্তি ও মত প্রকাশ এবং বোধগম্য উপায়ে তথ্য প্রাপ্তি, প্রাক প্রাথমিক হতে শুরু করে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত মূলসেকশন র শিক্ষার সর্বস্তরে অধ্যয়ন এবং সর্বস্তরে একীভূত শিক্ষায় অংশগ্রহণ, মানসিক চিকিৎসা গ্রহণের প্রয়োজনে কর্মক্ষেত্রে কর্মঘণ্টা শিথিলকরণের সুবিধা প্রাপ্তি। মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি নারী হলে পর্যাপ্ত গোপনীয়তা এবং পুরুষদের থাকার জায়গা থেকে পৃথক স্থানে অবস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে, পরিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক ও জনজীবনে অংশগ্রহণ, নিপীড়ন থেকে রক্ষার ব্যবস্থা এবং প্রসবোত্তর সেবা নিশ্চিত ইত্যাদি বিষয় গুলি আলোচিত হয়েছে।

## পাগলের আইনগত অধিকার

আমাদের সমাজে প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী এই যে , যারা অপ্রকিতস্থ , অস্বাভাবিক , কিংবা যার বোধ শক্তি নেই বললেই চলে তার জন্য আবার কিসের আইন অধিকার? তারা সমাজ গথনের গঠনের কোন কাজে লাগে না । কিন্তু এই ধারণা সঠিক নয় । ঔপনিবেশিক সমাজে বাংলায় প্রচলিত বিভিন্ন আইন গুলি তে এই অস্বাভাবিক মুলির আইন গত অধিকার সংরক্ষিত ছিল [83] সামাজিক দিক থেকে তাদের বিভিন্ন আইনি অধিকার ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। চিকিৎসা সংক্রান্ত, প্রশাসনিক, রাজনৈতিক পরিমন্ডল ছাড়া সমাজে সুস্থ ভাবে বসবাসের জন্য তাদের জন্য

---

[83] সোহেল মল্লিক, পাগল আইন ও পাগলের আইনগত অধিকার,মার্চ ,২০১৬, সাপ্তাহিক অন্যসেকশন

যে আইন গুলি ছিল তা নিন্মরুপ [৮৪]।

**পাগল যখন সাক্ষীঃ**

ঔপনিবেশিক আইনের একটি বিশেষত্ব হল পাগল কে সাক্ষী হিসাবে বিবেচনা করা যাবে কি না। ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের ১১৮ সেকশন ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে, কোনো পাগল যদি তার পাগলামির জন্য তাকে জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন বুঝাতে বা তার যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিতে অক্ষম না হয়, তবে সাক্ষ্য দানের অযোগ্য হবে না [৮৫]। এভিড্যান্স অ্যাক্ট-এর এই প্রভাব ঔপনিবেশিক পরবর্তী সময়ে লক্ষ্য করা যায়। (A lunatic is not incompetent to testify, unless he is prevented by his lunacy from understanding the questions put to him and giving rational answers to them)

**আত্মহারা হত্যার প্ররোচিতকারী কে শাস্তি-** যদি কোন উন্মাদ বাক্তি কে শারীরিক বা মানসিক ভাবে চাপ দিয়ে খতিগ্রস্থ করা হয়, কিংবা মনোবিকার গ্রস্থ ব্যক্তি কে কোন রকম ভাবে নেশাগ্রস্থ অবস্থায় আত্মহত্যায় সহায়তা করে অথবা তার আত্মহত্যায় প্ররোচিত করা হয়, তাহলে ১৮৬০ খ্রীঃ এর ৩০৫ নং ধারা অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি কে কঠোর শাস্তি বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের কথা বলা হয়েছে [৮৬]

---

[84] চৌধুরী লক্ষ্মী নারায়ণ, দীপ শিখা, ইন্ডিয়ান লিগ্যাল সিস্টেম অ্যান্ড মেন্টাল হেলথ, ইন্ডিয়ান জে সাইকিয়াট্রি ৫৫: ইন্ডিয়ান কনসেপ্ট I – সাপ্লিমেন্ট, জানুয়ারি ২০১৩, পৃষ্ঠা- ১৭৭

[85] দ্যা ইন্ডিয়া এভিডেন্স অ্যাক্ট, ১৮৭২ (১ অফ ১৮২), দ্যা গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল, উইথ অ্যান ইন্ট্রোডাকশন অন দ্যা প্রিন্সিপাল অফ জুডিসিয়াল এভিডেন্স, বাই জেমস ফিটজ জেমস স্টিফেন, লন্ডন, ম্যাকমিলান অ্যান্ড কোম্পানি, ক্যালকাটা; থ্যাকার, স্পিনক অ্যান্ড কোম্পানি, পৃষ্ঠা- ২০০। *Chapter ix.-of Witnesses.* C.118. *All persons shall be competent to testify unless the Court considers that they are prevented from understanding the questions put to them, or from giving rational answers to those questions, by tender years, extreme old age, disease, whether of body or mind, or any other cause of the same kind. Explanation- A lunatic is not incompetent to testify, unless he is prevented by his lunacy from understanding the questions put to him and giving rational answers to them.*

[86] ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন, ১৮৬০ সালের ৪৫ নং আইন,sec. 305 *If any person under eighteen years of age, any insane person, any delirious person, any idiot, or any person in a state*

**অপরাধের দায় থেকে পাগলের অব্যাহতি প্রাপ্তিঃ**

১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের ১০১ সেকশন র বিধান অনুযায়ী, মামলার অভিযোগ প্রমাণের ভার (Burden of proof) বাদী বা অভিযোগকারীর। সাক্ষী-সুবাদ দিয়ে আসামিকে দোষী সাব্যস্ত প্রমাণ করার দায়িত্ব মূলতঃ বাদীর। কিন্তু পাগলের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম রয়েছে। পাগল যদি অভিযুক্ত আসামি হয় সেক্ষেত্রে ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের ১০৫ সেকশন র বিধান অনুযায়ী মামলার প্রমাণের ভার (Burden of proof) বাদীর উপর ন্যস্ত না হয়ে পাগলের উপর ন্যস্ত হয়। অর্থাৎ প্রমাণের ভার Shift হয়। এক্ষেত্রে পাগলকেই তার নির্দোষিতা প্রমাণ করতে হবে। পাগল তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী ইত্যাদি সাক্ষী প্রদানের মাধ্যমে, বিভিন্ন ধরনের আলামত উপস্থাপনের মাধ্যমে, ডাক্তারী সার্টিফিকেট প্রদানের মাধ্যমে নির্দোষিত প্রমাণ করতে পারে এবং অপরাধের দায় থেকে অব্যহতি পেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারেঃ হত্যার দায়ে অভিযুক্ত পাগল অভিযোগ করে যে, মানসিক অপ্রকৃতিস্থতার কারণে সে তার কৃতকার্যের প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল না। এটি প্রমানের দায়িত্ব পাগলের উপর ন্যস্ত[87]।

**পাগলের জামিন পাবার অধিকার :**

পাগল মামলা মোকদ্দমায় আসামি হলে কিংবা পক্ষ সমর্থনে অক্ষম হলে মামলাটি জামিনযোগ্য বা অ-জামিনযোগ্য যাই হোক না কেনো ম্যাজিষ্ট্রেট কিংবা আদালত তাকে যে কোনো শর্ত সাপেক্ষে জামিন প্রদান করতে পারেন। এছাড়াও পাগলের চিকিৎসক যদি এই মর্মে মতামত প্রদান করেন বা , পাগলের ভবিষ্যতেও ভালো হবার কিংবা সুস্থ হবার কোনো সম্ভাবনা নেই, সেই ক্ষেত্রে বিচারক তাকে মেডিক্যাল হাসপাতালের হেফাজতে রাখার আদেশ দিতে পারেন।

---

*of intoxication commits suicide, whoever abets the commission of such suicide shall be punished with death or imprisonment for life, or imprisonment for a term not exceeding ten years, and shall also be liable to fine.*

[87] দ্যা ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট, ১৮৭২ (১ অফ ১৮৭২), দ্যা গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল ।

## পাগলের চুক্তি করার অধিকার

১৮৭২ সালের চুক্তি আইনের বিধান অনুযায়ী, সাধারনতঃ পাগলের চুক্তি করার অধিকার নেই। তবে পাগলের ভরণপোষনের জন্য তাদের অভিভাবকগণ চুক্তি সম্পাদন করতে পারে এবং এই চুক্তির জন্য ব্যক্তিগতভাবে পাগল দায়ী থাকবে না। অন্যদিকে, আমরা জানি, পাগলের মস্তিস্ক বিকৃতি নানা উপসর্গজনিত কারণে ঘটতে পারে। যেমনঃ অসুস্থতাজনিত কারণে, বার্ধক্যের কারণে, অতিরিক্ত পানাসক্তির কারণে কিংবা জড়বুদ্ধির কারণে। এসবের মধ্যে কিছু উপসর্গ স্থায়ী ও দূরারোগ্য, আবার কিছু উপসর্গ একেবারে সাময়িক। সুতরাং পাগল স্থায়ীভাবেও হতে পারে আবার অস্থায়ীভাবে বা সাময়িকভাবেও হতে পারে। চুক্তি করার সময় পাগল যদি সুস্থ মস্তিস্কে থাকে, তবে সেই চুক্তি গ্রহণযোগ্য। ১৮৭২ সালের চুক্তি আইনের ১১ সেকশনর বিধানমতে, মানসিক দিক থেকে সুস্থ ব্যক্তি বৈধ চুক্তি সম্পাদন করতে পারে। প্রকৃত অর্থে, পাগলের পাগলামি একটি ঘটনার বিষয়, আইনের বিষয় নয়। কাজেই সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে তা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যে ব্যক্তি পাগল কিংবা মানসিকভাবে অসুস্থ কিন্তু চুক্তি সম্পাদনের সময় সুস্থ ছিল বলে দাবি উত্থাপন করা হয়, সেক্ষেত্রে এরূপ দাবি উত্থাপনকারীকে প্রমাণ করতে হবে যে, উক্ত সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সুস্থ ছিল, পাগল ছিল না [৪৪]।

## পাগলের বিয়ে করার অধিকারঃ

আইনে পাগলের বিয়ে করার অধিকার রয়েছে। নাবালকের বিয়ের ক্ষেত্রে যেমন তাদের অভিভাকগনের সম্মতি বা ইচ্ছার প্রয়োজন হয়, ঠিক তেমনি পাগল বা বিকৃত মস্তিস্ক ব্যক্তির বিয়ের ক্ষেত্রেও অভিভাবকের সম্মতি বা ইচ্ছার প্রয়োজন হয়। তবে এই বিয়ের অঙ্গীকারের এখতিয়ার প্রয়োগ করতে হবে পাগল সুস্থ হওযার পর। পাগল আইন ও পাগলের আইনগত অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা গেলো। কিন্তু ঔপনিবেশিক সময় কালে এই গুলি উন্মাদ ব্যক্তিরা যথাযথ ভাবে তারা আইনি অধিকার পেত কিনা তা একটি প্রশ্নাতীত বিষয় , সমসাময়িক কাগজ পত্রে দেখা যায় পাগলের আইনি সুরক্ষার বিষয়ে টি যথা - নিরাপত্তা, চিকিৎসা, ও অধিকার নিশ্চিত করার বিভিন্ন উদাহরন পায় ।

---

[৪৪] বেঙ্গল অ্যাক্ট IX অফ ১৮৭৯, দ্যা কোর্ট অফ ওয়ার্ডস অ্যাক্ট, ১৮৭৯, অ্যান্ড ১৮৭২ সালের চুক্তি আইন,

# ভারতীয় উন্মাদনা সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ পুরানো ঐতিহাসিক দলিলের চিত্র[89]

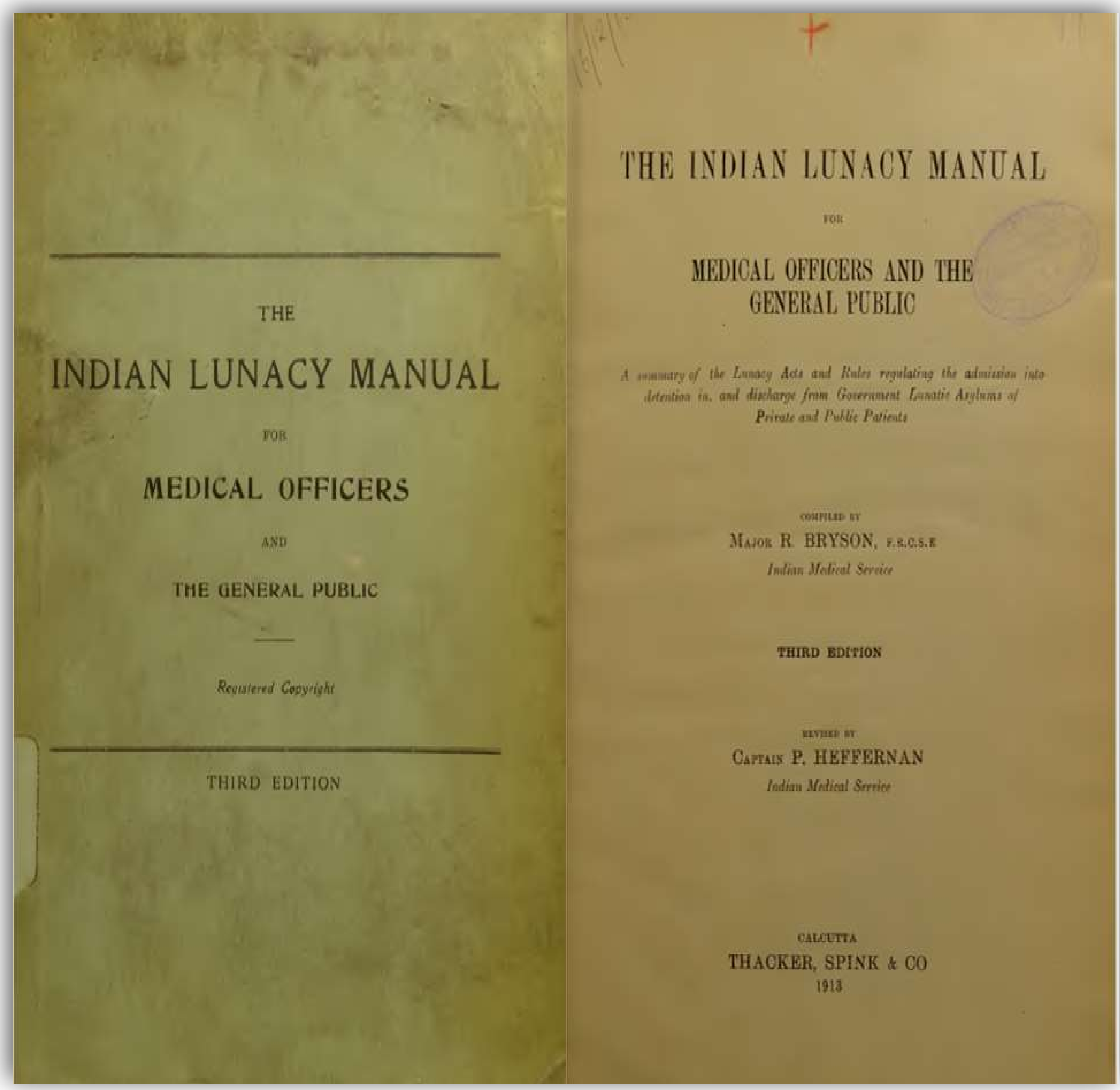

THE
INDIAN LUNACY MANUAL
FOR
MEDICAL OFFICERS
AND
THE GENERAL PUBLIC

*Registered Copyright*

THIRD EDITION

THE INDIAN LUNACY MANUAL
FOR
MEDICAL OFFICERS AND THE GENERAL PUBLIC

*A summary of the Lunacy Acts and Rules regulating the admission into detention in, and discharge from Government Lunatic Asylums of Private and Public Patients*

COMPILED BY
MAJOR R. BRYSON, F.R.C.S.E
*Indian Medical Service*

THIRD EDITION

REVISED BY
CAPTAIN P. HEFFERNAN
*Indian Medical Service*

CALCUTTA
THACKER, SPINK & CO
1913

---

[89] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনাসি মেনুয়্যাল ফর মেডিক্যাল অফিসার অ্যান্ড দ্যা জেনারেল পাবলিক, বাই মেজর আর, ব্রাইসন, ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস থার্ড এডিশন রিভাইসড বাই ক্যাপ্টেন পি, হেফারনান, ইন্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিস, ক্যাল্কাটা, থ্যাকার, স্পিনক অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯১৩, ওয়েলকাম লাইব্রেরি ডিজিটাইজড কালেকশন, ফ্রন্ট অ্যান্ড কভার পেজ।

# পাগল হত্যা ও তার আইনগত অধিকার সংক্রান্ত একটি দৃষ্টান্ত [৭০]- ১৯৩৭ খ্রীঃ

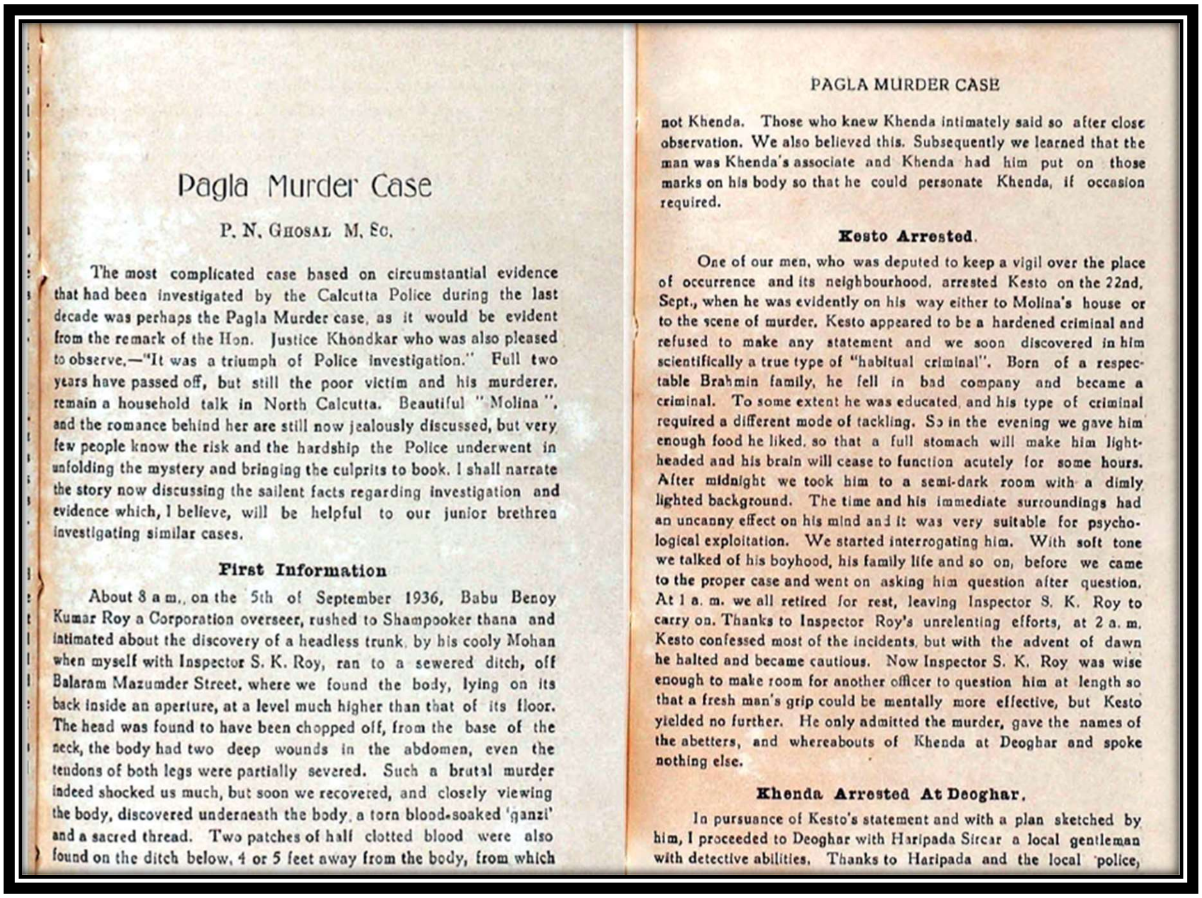

## Pagla Murder Case

P. N. Ghosal M. Sc.

The most complicated case based on circumstantial evidence that had been investigated by the Calcutta Police during the last decade was perhaps the Pagla Murder case, as it would be evident from the remark of the Hon. Justice Khondkar who was also pleased to observe.—"It was a triumph of Police investigation." Full two years have passed off, but still the poor victim and his murderer, remain a household talk in North Calcutta. Beautiful "Molina", and the romance behind her are still now jealously discussed, but very few people know the risk and the hardship the Police underwent in unfolding the mystery and bringing the culprits to book. I shall narrate the story now discussing the sailent facts regarding investigation and evidence which, I believe, will be helpful to our junior brethren investigating similar cases.

### First Information

About 8 a m., on the 5th of September 1936, Babu Benoy Kumar Roy a Corporation overseer, rushed to Shampooker thana and intimated about the discovery of a headless trunk, by his cooly Mohan when myself with Inspector S. K. Roy, ran to a sewered ditch, off Balaram Mazumder Street, where we found the body, lying on its back inside an aperture, at a level much higher than that of its floor. The head was found to have been chopped off, from the base of the neck, the body had two deep wounds in the abdomen, even the tendons of both legs were partially severed. Such a brutal murder indeed shocked us much, but soon we recovered, and closely viewing the body, discovered underneath the body, a torn blood-soaked 'ganzi' and a sacred thread. Two patches of half clotted blood were also found on the ditch below, 4 or 5 feet away from the body, from which

PAGLA MURDER CASE

not Khenda. Those who knew Khenda intimately said so after close observation. We also believed this. Subsequently we learned that the man was Khenda's associate and Khenda had him put on those marks on his body so that he could personate Khenda, if occasion required.

### Kesto Arrested.

One of our men, who was deputed to keep a vigil over the place of occurrence and its neighbourhood, arrested Kesto on the 22nd. Sept., when he was evidently on his way either to Molina's house or to the scene of murder. Kesto appeared to be a hardened criminal and refused to make any statement and we soon discovered in him scientifically a true type of "habitual criminal". Born of a respectable Brahmin family, he fell in bad company and became a criminal. To some extent he was educated, and his type of criminal required a different mode of tackling. So in the evening we gave him enough food he liked, so that a full stomach will make him light-headed and his brain will cease to function acutely for some hours. After midnight we took him to a semi-dark room with a dimly lighted background. The time and his immediate surroundings had an uncanny effect on his mind and it was very suitable for psychological exploitation. We started interrogating him. With soft tone we talked of his boyhood, his family life and so on, before we came to the proper case and went on asking him question after question. At 1 a. m. we all retired for rest, leaving Inspector S. K. Roy to carry on. Thanks to Inspector Roy's unrelenting efforts, at 2 a. m. Kesto confessed most of the incidents, but with the advent of dawn he halted and became cautious. Now Inspector S. K. Roy was wise enough to make room for another officer to question him at length so that a fresh man's grip could be mentally more effective, but Kesto yielded no further. He only admitted the murder, gave the names of the abetters, and whereabouts of Khenda at Deoghar and spoke nothing else.

### Khenda Arrested At Deoghar.

In pursuance of Kesto's statement and with a plan sketched by him, I proceeded to Deoghar with Haripada Sircar a local gentleman with detective abilities. Thanks to Haripada and the local police,

লুনাসি আইনের সার্থকতা কতটুকু ছিল , তা বোঝানোর জন্য একটি প্রকিস্ত প্রকৃষ্ট উদাহরণ এখানে উপস্থাপন করা হল। ১৯৩৬ খ্রীঃ একটি ঘটনা টি , কোলকাতার একটি পাগল হত্যার তদন্ত। পুলিশ কমিশনের তথ্য অনুযায়ী পাগল টি খুন হয় সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ নামক স্থানে। জনৈক পাগল কে পুরোপুরি মস্তক ছেদন করে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হয়। ফলে হত্যা কান্ড টি জনসমক্ষে আসায় অতঃপর ১৯১২ এর পাগল আইন অনুযায়ী দোষী ও হত্যাকারী প্রতি পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য পুলিশ কমিশনের আদেশ অনুসারে তদন্ত কার্য শুরু হয়। দীর্ঘ একবছর ধরে ইনভেসটিকেশন এর পর হত্যাকারী কে শনাক্ত করা হয়, অতঃপর তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান

---

[৭০] ঘোষাল, পি, এন, পাগলা মাডার কেস, দ্যা ক্যালকাটা পুলিশ জার্নাল, এডিটেড কে, পি সোভান, ভলিউম-১, নং-১, ক্যালকাটা, ১৯৩৭, পৃ- ৫১-৬১

করা হয়। প্রসঙ্গত বলা অবশ্যই দরকার কারণ দুই দশক হল সবেমাত্র পগলদের জন্য এই আইন পাশ করা হয়েছে, সুতরাং পাগল দের প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর আচারনের পতিক্রিয়া কতটা হতে পারে এই আইনি তদন্ত একটি অন্যতম উদাহরণ হিসাবে প্রমাণ করে ।

## দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট ১৯১২

## ১৯১২ সালের ৪নং আইন [১৬ মার্চ, ১৯১২]

পাগল সংক্রান্ত আইন সংহত ও সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

**প্রথম অধ্যায়**

সেকশন - ১: সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও ব্যাপ্তি, এই আইনকে পাগল আইন, ১৯১২, অভিহিত করা যেতে পারে। এটি সমগ্র দেশে কার্যকর হবে।

সেকশন - ২: আইনের সংরক্ষণঃ পাগলের সম্পত্তি, অধিকার ও অভিভাবক নিয়োগের ক্ষেত্রে এই আইনের দ্বিতীয় খন্ডে যাই-ই উল্লেখ করা থাকুক না কেনো তা মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনের ক্ষমতাকে খর্ব করবে না।

সেকশন - ৩: সংজ্ঞা - "পাগল "- বলতে নির্বোধ ব্যক্তি বা অপকৃতিস্থ মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে বোঝায়।" "অ্যাসাইলেম"-এর অর্থ হল উন্মাদ আশ্রম , কেন্দ্রীয় সরকার বা কোনও রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বা লাইসেন্সপ্রাপ্ত মানসিকরোগ গ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য একটি আশ্রয়স্থান বা মানসিক হাসপাতাল [91]।

**দ্বিতীয় অধ্যায়- মানসিকরোগ গ্রস্ত ব্যক্তিদের রিসেপশান, যত্ন এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়**

**৪. অ্যাসাইলেমে আশ্রয়প্রাপ্ত ব্যক্তিদের রিসেপশান-** (১) ৮,১৬ এবং ৯৮ ধারা অনুসারে তদন্তের মাধ্যমে পাওয়া মানসিকরোগ গ্রস্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে রিসেপশান অর্ডার ব্যতীত আশ্রয়কেন্দ্রে গ্রেপ্তার বা আটক করা যাবে না[92] । ২) উপ-ধারা ১ এর বিধানের অধীনে আশ্রয় প্রাপ্ত একজন বোর্ডারকে তার অ্যাসাইলেম ত্যাগের লিখিত আবেদনের চব্বিশ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে তাকে

---

[91] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পারত-১, প্রিলিমিনারি, চ্যাপ্টার- I, সেকশন- ১, ফর স্টেটমেন্ট অফ অবজেক্ট অ্যান্ড রিজন, ছি গ্যাজেট অফ ইন্ডিয়ান Pt, ভলিউম, পৃ- ১৪৭, ফর রিপোর্ট ফর সিলেক্ট কমিটি, সি প্রাইভেট Pt,ভলিউম, পৃ- ৫৭, অ্যান্ড ফর প্রসেডিং ইন কাউন্সিল,

[92] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- II, অধ্যায় - II, সেকশন- ৪/১

অ্যাসাইলেমে আটকে রাখা যাবে না [93] ।

**৫. রিসেপশান অর্ডারের জন্য আবেদন; - ১)**রিসেপশান অর্ডারের জন্য আবেদন হাইকোর্টের স্থানীয় সীমাতে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিবৃতি প্রদানের সাথে আবেদন করা হবে ও ফর্মে দুটি মেডিকেল শংসাপত্র দ্বারা সমর্থিত হতে হবে, যার মধ্যে একটি শংসাপত্র একজন মেডিকেল অফিসারের হতে হবে[94] । ২)যদি মেডিকেল শংসাপত্রগুলির মধ্যে যে কোনও স্বজন আবেদকের আবেদনকারী স্বাক্ষরিত হয়, তবে আবেদনকারীর সাথে তার সম্পর্ক সঠিকভাবে ব্যক্ত করবে[95] । ৩)এর মাধ্যমে কোন উন্মাদ ব্যক্তির সক্ষমতা তদন্তের পূর্বে আবেদিত অভিযোগের আদেশের ভিত্তিতে একটি প্রত্তায়িত অনুলিপি সংযুক্ত করতে হবে[৯৬] ।৪) রাজ্য সরকার এই অঞ্চলটিকে এমন একটি অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করেন যেখানে রিসেপশান অর্ডার দেওয়া যেতে পারে [97] ।

**৬. যার দ্বারা আবেদন উপস্থাপন করতে হবে[98]** - (১) সাব-সেকশন ৩-এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, অভিযুক্ত উন্মাদ গ্রস্ত ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রীর দ্বারা দরখাস্তটি উপস্থাপিত হবে। যদি স্বামী বা স্ত্রী না থাকে নিকটতম আত্মীয়কে দরখাস্তটি উপস্থাপিত করা যাবে। (২) যদি আবেদনটি আত্মীয় দ্বারা করা হয় ,সেইক্ষেত্রে দরখাস্তটিতে তাদের পেশ না হওয়ার কারণগুলির বিবরণ থাকতে হবে। (৩) যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন ব্যক্তি এই আইনের দ্বারা নির্ধারিত সংখ্যাগরিষ্ঠের বয়স অর্জন করবেন, ততক্ষণ কোন ব্যক্তি কোন দরখাস্ত পেশ করতে পারবেন না। (৪) এই দরখাস্তের মাধ্যমে উক্ত ব্যক্তির দ্বারা নির্ধারিত বিবরণ ও বিবৃতি স্বাক্ষরিত ও যাচাই করা হবে।

**৭. রিসেপশান অর্ডারের জন্য দরখাস্তের প্রক্রিয়া [99] - (১)** দরখস্ত উপস্থাপনের পরে ম্যাজিস্ট্রেট দরখাস্ততের উল্লেখিত অভিযোগ এবং শংসাপত্রগুলির দ্বারা উপস্থিত উন্মাদ ব্যক্তির প্রমাণ বিবেচনা

---

[93] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- II, অধ্যায় - II, সেকশন- ৪/২

[94] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- II, অধ্যায় - II, সেকশন- ৫/১

[95] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- II, অধ্যায় - II, সেকশন- ৫/২

[96] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- II, অধ্যায় - II, সেকশন- ৫/৩

[97] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- II, অধ্যায় - II, সেকশন- ৫/৪

[98] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- II, অধ্যায় - II, সেকশন- ৬/১,৬/২,৬/৩

[99] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- II, অধ্যায় - II, সেকশন- ৭/১,৭/২,৭/৩,৭/৪

করবেন। (২) যদি তিনি বিবেচনা করেন যে আরও এগিয়ে যাওয়ার কারণ আছে তবে তিনি অভিযুক্ত মানসিকরোগ গ্রস্তব্যক্তির ব্যক্তিগতভাবে যাচাই করবেন। (৩) যদি তিনি সন্তুষ্ট হন যে রিসেপশান অর্ডারটি যথাযথভাবে তৈরি করা হয়েছে তবে তিনি সেই অনুযায়ী অগ্রসর হতে পারেন। ৪) তিনি যদি সন্তুষ্ট না হন তবে আবেদনটি বিবেচনার জন্য তিনি ব্যক্তিকে যেমন উপযুক্ত মনে করবেন তেমন অনুসন্ধান করতে বলতে পারেন।

**৮. উন্মাদ গ্রস্তব্যক্তিকে অসম্পূর্ণ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটকে রাখা-** আবেদনের উপস্থাপনের পরে ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তের সমাপ্তির জন্য উপযুক্ত হেফাজতে অসম্পূর্ণ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অভিযুক্ত উন্মাদ ব্যক্তিকে এই আদেশ দিতে পারেন[100] ।

**৯. দরখাস্তের বিবেচনা -** আবেদনকারী, অভিযুক্ত উন্মাদ গ্রস্ত ব্যক্তি কর্তৃক নিযুক্ত যে কোনও ব্যক্তি এবং ম্যাজিস্ট্রেট যাকে উপযুক্ত মনে করবেন এমন অন্যান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে ব্যক্তিগতভাবে দরখাস্তটি বিবেচিত হবে [101]।

**১০. অর্ডার -** (১) আবেদনের বিবেচনার জন্য নির্ধারিত সময়ে ম্যাজিস্ট্রেট রিসেপশান করতে পারেন অর্ডার। অন্যথায় যেমন সে উপযুক্ত মনে করবেন সেই অনুযায়ী আদেশ দেবেন। (২) দরখাস্তটি খারিজ হয়ে গেলে ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত অভিযোগ খারিজ করার জন্য তার কারণ লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করবেন। এবং আবেদনকারীকে এই আদেশের একটি অনুলিপি সরবরাহ করবেন[102] ।

**১১. দরখাস্তের বিষয়ে রিসেপশান অর্ডারের আরও বিধান আছে[103]** - ধারা ৭ বা ধারা ১০ এর অধীনে কোনও রিসেপশান অর্ডার দেওয়া হবে না, তবে মানসিকরোগগ্রস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে বিপদজনক এবং অযোগ্য হওয়ার বিষয়টি যথেষ্ট নয়, যদি না (ক) ম্যাজিস্ট্রেট নিশ্চিত হয় যে অ্যাসাইলেমের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি উন্মাদগ্রস্থ ব্যক্তিকে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। (খ) আবেদনকারী বা অন্য কোনও ব্যক্তি মানসিকরোগ গ্রস্ত ব্যক্তির রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় বহন করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে লিখিতভাবে আবেদন জানাবেন।

---

[100] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- II, অধ্যায় - II, সেকশন- ৮

[101] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- II, অধ্যায় - - II, সেকশন- ৯

[102] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- II, অধ্যায় - - II, সেকশন- ১০/১,১০/২

[103] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- II, অধ্যায় - - II, সেকশন- ১১/১,১১/২

**[১১-এ] যার আবেদনের ভিত্তিতে রিসেপশান অর্ডার দেওয়া হয়েছে তার জন্য বিকল্প নিয়োগের ক্ষমতা[104]** - ১) ম্যাজিস্ট্রেট এই বিভাগের বিধান সাপেক্ষে লিখিতভাবে আদেশের মাধ্যমে যে ব্যক্তির আবেদনের উপর রিসেপশান অর্ডার দেওয়া হয়েছে, তার এই আইনের অধীনে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য স্থানান্তর করতে পারে। (২) প্রতিস্থাপনের কোনও আদেশ দেওয়ার আগে ম্যাজিস্ট্রেট সেই ব্যক্তিকে নোটিশ প্রেরণ করবেন যার আবেদনের ভিত্তিতে রিসিপশন অর্ডারটি দেওয়া হয়েছিল ও তারিখটি নোটিশ প্রেরণের ২০ দিনের কম যাতে না হয় সেটিও দেখতে হবে।৩) মানসিকরোগ গ্রস্তব্যক্তির অন্য কোনও আত্মীয়ের কোনো আপত্তি থাকে তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট এই তারিখ স্থগিত করতে পারেন ও সেটি বিবেচনা করবেন। ৪)এই ধারার অধীনে কার্যধারা চলাকালীন যদি কোনও প্রশ্ন উত্থাপিত হয় তবে যে ব্যক্তির আবেদনের উপর রিসেপশান অর্ডার দেওয়া হয়েছে ম্যাজিস্ট্রেট মানসিকরোগ গ্রস্ত ব্যক্তির সেই আত্মীয়কে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনের আদেশ দেবেন। (৫) ম্যাজিস্ট্রেট এই ধারার অধীনে তদন্তের ব্যয় যে কোনও পক্ষের বা মানসিকরোগ গ্রস্ত ব্যক্তির সম্পত্তির বাইরে থাকা কোনও ব্যক্তিকে, যাকে তিনি উপযুক্ত মনে করবেন তাকে আদেশ দিতে পারেন। (৬) এর অধীনে যে কোনও নোটিশ পোস্টের মাধ্যমে যাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে তার শেষ পরিচিত ঠিকানাতে প্রেরণ করা যেতে পারে।

**[১১-বি] ভারতে বিদেশী রাষ্ট্র থেকে আসা উন্মাদের ক্ষেত্রে রিসেপশান অর্ডার[105]**। ১) যখন ভারতের অ্যাসাইলেমে উন্মাদদের রিসেপশান বিষয়ে কোনও বিদেশী ইউরোপীয় রাষ্ট্রের সাথে ব্যবস্থা করা হয়, তখন কেন্দ্রীয় সরকার অফিসিয়াল গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সেই রিসেপশান অর্ডারকে নির্দেশ দিতে পারে। (২) উপ-ধারা ১.এর অধীনে একটি প্রজ্ঞাপন প্রকাশের সময়, এই আইনের বিধানগুলি নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলির সাথে এই জাতীয় উন্মাদদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যথা: (ক) রিসেপশান অর্ডারের জন্য যে কোনও আবেদন বিদেশী রাজ্যের এমন কর্মকর্তা বা এজেন্টের দ্বারা উপস্থাপিত পিটিশনের মাধ্যমে করা যেতে পারে। (খ) ম্যাজিস্ট্রেটের কার্য

[104] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- II, অধ্যায় - - II, সেকশন- ১১-A

[105] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- II অধ্যায় - II, সেকশন- ১১-B

সম্পাদনকারী উক্ত আধিকারিকের দ্বারা সম্পাদিত হবে। গ) ধারা ৫ এবং ১৮(১)-এর উদ্দেশ্যে, "মেডিকেল অফিসার" এবং "মেডিকেল অনুশীলনকারী" এর অভিব্যক্তিগুলিতে এই জাতীয় ব্যক্তি বা ব্যক্তির শ্রেণি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। (ঘ) ম্যাজিস্ট্রেট তার বিচক্ষণতার সাথে ধারা ১৯ অনুসারে নির্ধারিত সময়সীমা বাড়িয়ে দিতে পারেন। (ঙ) এই আইনের ধারা(১), (২), (৩), ১১,এলএল-এ এবং ৩৪, প্রয়োগ করবেন না এবং উল্লিখিত বিধানগুলির প্রয়োগের সুবিধার্থে সরাসরি নির্দেশ দিতে পারে। (৩) এই ধারার অধীনে একটি রিসেপশান অর্ডার ৭ অথবা ১০ নং ধারায় প্রণীত রিসেপশান অর্ডার বলে গণ্য হবে, যেমন মামলা হতে পারে।

**১২. কোনও ইউরোপীয় মানসিক ভারসাম্যহীন সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিকের ক্ষেত্রে রিসেপশান অর্ডার**-যেকোনও ইউরোপীয়ান যাকে বিভিন্ন আইন বিধান(সেনাবাহিনী আইন,নৌবাহিনী আইন,নৌবাহিনী (শৃঙ্খলা) আইন,) মেনে উন্মাদ বলে ঘোষণা করা হয়েছে, এই আইন প্রয়োগ করা হয়এবং যে কোনও প্রশাসনিক মেডিকেল অফিসারের কাছে এটি প্রত্যাশিত যে তাকে অ্যাসাইলেমে দেওয়া উচিৎ[106] ।

**১৩. বিপজ্জনক উন্মাদ বা মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিদের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ বা যথাযথ যত্ন না নেওয়া এবং নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পুলিশের ক্ষমতা এবং কর্তব্য[১০৭] ...** ১)থানায় দায়িত্বে থাকা প্রতিটি কর্মকর্তা বিস্তৃতভাবে ঘুরে বেড়ানো সমস্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে পারেন এবং গ্রেপ্তার হওয়া যে কোনও ব্যক্তিকে তাড়াতাড়ি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে পেশ করতে হবে। ২) থানার দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তা যদি মনে করেন যে তার অধীনে থাকা উন্মাদ ব্যক্তির যথাযথ যত্ন নেওয়া হচ্ছে না ও নিষ্ঠুর আচরণ করা হচ্ছে তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে ম্যাজিস্ট্রেটকে বিষয়টি জানাবেন।

**১৪. ভবঘুরে পাগল এবং বিপজ্জনক পাগল ব্যক্তির ক্ষেত্রে রিসেপশান অর্ডার**- কোনও ভবঘুরে উন্মাদ ব্যক্তিকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে আনা এবং তাকে মেডিকেল অফিসার কর্তৃক পরীক্ষা করার পর একটি মেডিকেল সার্টিফিকেট দেন তবে তাকে অ্যাসাইলেমে ভর্তির জন্য রিসেপশান অর্ডার দিতে পারেন । তবে শর্ত থাকে যে , কোনও বন্ধু বা আত্মীয় স্বজন চাইলে

[106] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- II, অধ্যায় - II, সেকশন- ১২

[107] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- II, অধ্যায় - II, সেকশন- ১৩/১,১৩/২

উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তিকে লাইসেন্সপ্রাপ্ত অ্যাসাইলেমে প্রেরণ করা যেতে পারে।আবার ব্যক্তির যথাযথ যত্ন নেওয়া হবে এবং তাকে নিজের বা অন্যের ক্ষতি না করার শর্তে ব্যক্তিকেতার বন্ধু বা আত্মীয়ের কাছে দেখাশোনা করার জন্য রিসেপশান অর্ডার দিতে পারেন[108] ।

**১৫. পাগল ব্যক্তির প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করা বা যথাযথ পরিচর্যা ও নিয়ন্ত্রণে না রাখার উপর আদেশ[109]** - (১) যদি কোনও পুলিশ কর্মকর্তার অধীনস্থ কোন উন্মদ বা ভারসাম্যহীন ব্যক্তি তার আত্মীয় বা তার দায়িত্বে থাকা অন্য ব্যক্তির দ্বারা নিষ্ঠুর আচরণ দ্বারা অবহেলিত হচ্ছে, তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট তার দায়িত্বে থাকা আত্মীয় বা অন্য ব্যক্তিকেও তলব করতে পারেন। (২) এইরূপ আত্মীয় বা অন্য ব্যক্তিকে আইনতভাবে ম্যাজিস্ট্রেট মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে যথাযথভাবে যত্ন নেওয়ার ও চিকিৎসা করার আদেশ দিতে পারেন।

**১৬. মেডিকেল অফিসার কর্তৃক অভিযুক্ত পাগল ব্যক্তিকে আটকে রাখার, মুলতুবি প্রতিবেদন[110]**
(১) যখন অভিযুক্ত কোনো মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি হয় তবে তাকে ধারা ১৩ বা ১৫ এর বিধানের আওতায় ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে আনা হবে, ম্যাজিস্ট্রেট লিখিতভাবে আদেশের মাধ্যমে অভিযুক্ত মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে আটকের জন্য উপযুক্ত হেফাজতে উপযুক্ত সময়হিসাবে দশ দিনের বেশি অনুমোদিত করতে পারবেন না। (২) ম্যাজিস্ট্রেট যদি প্রয়োজনীয় মনে করলে, একই উদ্দেশ্যে লিখিতভাবে আদেশের ভিত্তিতে অভিযুক্ত উন্মাদগ্রস্থ ব্যক্তিকে এমনভাবে আরও আটকে রাখার আদেশ দিতে পারেন যা কখনই দশ দিনের বেশি সময়সীমা অতিক্রম করবে না।

**১৭. মহানগরের শহরগুলিতে পুলিশ কমিশনার প্রমুখদের জন্য আইন** -ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অনুমোদিত বা আইনী ধারা ১৪, ১৫ বা ১৬ দ্বারা করণীয় যে সমস্ত কাজ পুলিশ কমিশনারদেও দ্বারা মহানগর শহরে করা যেতে পারে বা কোনও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুমোদিত ও কর্ম সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত দায়িত্ব নিতে পারে[111] ।

**১৮.মেডিকেল শংসাপত্র- রিসেপশান অর্ডার উপর আরও বিধান-** (১)এই আইনের অধীনে প্রতিটি মেডিকেল শংসাপত্র,মেডিকেল অফিসারের দ্বারা তৈরি এবং স্বাক্ষরিত হতে হবে। (২) প্রত্যেক

---

[108] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- II, অধ্যায় - II, সেকশন- ১৪

[109] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- II, অধ্যায় - II, সেকশন- ১৫/১,১৫/২

[110] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- II, অধ্যায় - II, সেকশন- ১৬/১,১৬/২

[111] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- II, অধ্যায় - - II, সেকশন- ১৭

মেডিক্যাল সার্টিফিকেটে যে সকল তথ্য-প্রমাণ আছে, তার ভিত্তিতে অন্যের দ্বারা জানানো তথ্যপ্রমাণ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত সত্যগুলি প্রমাণিত হয়। (৩) এই আইনের অধীনে প্রদত্ত প্রতিটি মেডিকেল শংসাপত্র থেকে এটিতে উলে-খিত তথ্যের সত্যতা এবং উক্ত রায় প্রমাণিত হয়[112]।

**১৯. মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির ডাক্তারী পরীক্ষার সময় ও রীতি[113]।-** (১) মেডিকেল শংসাপত্রের ভিত্তিতে অভিযুক্ত উন্মাদ ব্যক্তিকে পরীক্ষা করবেন, যেটি আবেদনের উপস্থাপনের সময় থেকে সাত দিনের মধ্যে হতে হবে। (২) যেখানে দুটি মেডিকেল সার্টিফিকেট প্রয়োজন হয়, সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যয়ন পত্র স্বাক্ষর না করলে, রিসেপশান অর্ডার দেওয়া হবে না।

**২০.রিসেপশনের জন্য কর্তৃপক্ষ-** একটি রিসেপশান অর্ডার, যদি এই আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয় তবে আবেদনকারী বা তার দ্বারা অনুমোদিত কোনও ব্যক্তির আবেদনের উপর দেওয়া আদেশের ক্ষেত্রে, অনুমোদিত ব্যক্তির পক্ষে এটি করার জন্য পর্যাপ্ত কর্তৃপক্ষ থাকবে যিনি উন্মাদগ্রস্থ ব্যক্তিকে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেবেন এবং তাকে উলি-খিত অ্যাসাইলামে পৌঁছে দেবেন[114] ।

**তবে শর্ত থাকে যে কোনও রিসেপশান অর্ডার কার্যকর হবে না** - (ক) এই রিসেপশান অর্ডার তৈরির ত্রিশ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও, মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকেসেই সময়কালের মধ্যে উল্লেখিত স্থানে ভর্তি না করা। (খ)মুক্তির পর, এই আইনঅনুসারে, এই ধরনের স্থান থেকে অথবা যে কোন অ্যাসাইলেম থেকে তাকে অপসারিত করা হবে।

**২১. অ্যাসাইলেমের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তির কাছে রিসেপশান অর্ডারের অনুলিপি পাঠানো। -** এর অধীনে রিসেপশান অর্ডার দেওয়া যে কোনও কর্তৃপক্ষ তৎক্ষণাত অ্যাসাইলেমের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিকে এই আদেশের একটি প্রত্যয়িত কপি প্রেরণ করবে যাতে এই ধরনের মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে ভর্তি করা যায় [115]।

---

[112] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- II, অধ্যায় - II, সেকশন- ১৮/১,১৮/২,১৮/৩

[113] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- II, অধ্যায় - II, সেকশন- ১৯/১,১৯/২

[114] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- II, অধ্যায় - II, সেকশন- ২০/১,২০/২

[115] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- II, অধ্যায় - II, সেকশন- ২১

**২২.অ্যাসাইলেমের সীমাবদ্ধতা যেখানে রিসেপশান অর্ডারের সহায়তায় সরাসরি ভর্তি হতে পারে। -** ৮৫ ধারার বিধান অনুসারে, ম্যাজিস্ট্রেট যে এখতিয়ার প্রয়োগ করেন তাতে রাজ্যের বাইরে কোনও সরকারী অ্যাসাইলামে কোনও মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে ভর্তির জন্য রিসেপশান অর্ডার দেবেন না[116] ।

**২৩. অ্যাসাইলেমের থেকে অপসারণ মুলতুবির জন্য মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিদের আটকে রাখা -** বিভিন্ন ধারা অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেট লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করার জন্য উন্মাদ ব্যক্তিকে অ্যাসাইলেম থেকে অপসারণের মুলতুবি না হওয়া পর্যন্ত সঠিক হেফাজতে আটকে রাখার নির্দেশ দিতে পারেন[117] ।

**২৪. অপরাধী মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির রিসেপশান এবং তাকে আটকে রাখা -**আইনের বিভিন্ন ধারা দ্বারা অভিযুক্ত উন্মাদগ্রস্থ ব্যক্তিকে রিসেপশানের জন্য নির্ধারিত অ্যাসাইলেমে পাঠানো হয় বা অন্য কোন অ্যাসাইলেমে আইনীভাবে স্থানান্তরিত করা যেতে পারে, রিসেপশান ও আটকানোর জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষন জরুরী[118] ।

**২৫. বিচার বা তদন্তের পর রিসেপশান**

তদন্ত্রের দ্বারা পাওয়া একজন মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে যে কোনও অ্যাসাইলেমে ভর্তি করা যেতে পারে। তদন্তের ক্ষেত্রে চতুর্থ অধ্যায় অনুসারে অর্ডারটি উচ্চ আদালতের বা তার কর্তৃপক্ষের অধীনে হবে এবং পঞ্চম অধ্যায় অমুসারে অর্ডার জেলা আদালত কর্তৃক প্রদত্ত বা তৈরি হয়[119] ।

**২৬. মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির রক্ষণাবেক্ষণের খরচ প্রদানের আদেশ-** যখন কোনও মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে ২৫ ধারার বিধান অনুসারে যে কোনও অ্যাসাইলেমে ভর্তি করা হয়, তখন হাইকোর্ট তার রক্ষণাবেক্ষণের খরচ প্রদানের জন্য আদেশ দেয় [120]।

---

[116] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- II, অধ্যায় - II, সেকশন- ২২

[117] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- II, অধ্যায় - - II, সেকশন- ২৩

[118] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- II, অধ্যায় - II, সেকশন- ২৪

[119] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- II, অধ্যায় - II, সেকশন- ২৫

[120] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- II, অধ্যায় - II, সেকশন- ২৬

**২৭. আদেশ বা শংসাপত্রের সংশোধন** -রিসেপশান অর্ডার অনুযায়ী কোনও মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে কোনও অ্যাসাইলেমে রিসেপশানের পরে,তার মেডিকেল শংসাপত্রটি ত্রুটিযুক্ত বা ভুল হয় ,তবে শংসাপত্রটির সংশোধন করা যেতে পারে [121] ।

উন্মাদ আইনের **তৃতীয় অধ্যায়ে** পাগল ব্যক্তির যত্ন ,তদারকি, মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে মুক্ত করা,মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির অপসারণ,এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত অংশে ২৮ থেকে ৩৬ নং ধারা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ । আইন এটি মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিদের দর্শকদের সাধারণত "চ্যানসারি ভিসিটার" আইনের কে অনুসরন করা হয়েছে , এছাড়াও অন্যান্য কাজগুলির মধ্যে মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিদের দেখাশোনা এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া।

**২৮. পরিদর্শকদের নিয়োগ** -১)প্রতিটি অ্যাসাইলেমের তিনজন পরিদর্শক ও একজন ভারতীয় মেডিকেল অফিসার নিয়োগ থাকবেন। ২)কারাগারের ইন্সপেক্টর অ্যাসাইলেমের প্রাক্তন পদাধিকারি একজন ভিজিটর হিসাবে নিয়োজিত হবেন [122] ।

**২৯.পরিদর্শকদের দ্বারা মাসিক পরিদর্শন** - দুজন বা তার বেশি পরিদর্শক, যাদের মধ্যে একজন মেডিকেল অফিসার হবেন, তারা প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার, অ্যাসাইলেমের প্রতিটি অংশ একসাথে তদারকি করবেন এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী যতটা অনুমতি পাবেন তাতে প্রতিটি মানসিকভারসাম্যহীন ব্যক্তি এবং তাদের বিস্তৃতি দেখবেন এবং পরীক্ষা করবেন[123] ।

**৩০. ইন্সপেক্টর-জেনারেল বা পরিদর্শকদের দ্বারা অপরাধী মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিদের পরিদর্শন**[124] (১) যখন কোনও মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে কারাগারের ইন্সপেক্টর-জেনারেল বা পরিদর্শক বা তাদের দুজনের মধ্যে একজনের আদেশের দ্বারা তাকে আটক করা হয়েছিল তার কাছে ওই ব্যক্তির মনের অবস্থা সম্পর্কে একটি বিশেষ প্রতিবেদন তৈরি করে পেশ করবেন। (২)রাজ্য সরকার মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে আটক থেকে নির্গমনের জন্য কারাগারের অফিসার ইনচার্জকে ক্ষমতা দিতে পারে।

**৩১. পরিদর্শকদের দ্বারা অ্যাসাইলেম থেকে মুক্তির আদেশ-(১)** যে কোনও অ্যাসাইলেমের

---

[121] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- II, অধ্যায় -II, সেকশন- ২৭

[122] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- III, অধ্যায় -III, সেকশন- ২৮/১,২৮/২

[123] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- III, অধ্যায় -III, সেকশন- ২৯

[124] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- III, অধ্যায় -III, সেকশন- ৩০/১,৩০/২

দর্শনার্থীর মধ্যে তিন জন, যার মধ্যে একজন মেডিকেল কর্মকর্তা লিখিতভাবে আদেশক্রমে এই অ্যাসাইলেমে থাকা যে কোনও মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির মুক্তির নির্দেশ দিতে পারেন। ২)এই জাতীয় আদেশের ক্ষেত্রে নোটিশ অবিলম্বে উক্ত সরকারি কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে[125]|

**৩২. মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তিদের অন্যান্য ক্ষেত্রে এবং ইউরোপীয় মানসিক ভারসাম্যহীন সৈনিকদের মুক্তির ক্ষেত্রে [126]-** ১) একজন উন্মাদ ব্যক্তির লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে তাকে মুক্তিদেওয়া হবে, শর্ত থাকে যে, মানসিক ভারসাম্যহীন ছেড়ে দেওয়া যাবে না যদি অ্যাসাইলেমেরঅফিসার ইনচার্জের লিখিতভাবে প্রমাণ থাকে যে ভারসাম্যহীন ব্যাক্তি বিপজ্জনক এবং সকলের সাথে থাকার অযোগ্য। ২) ১২ নং ধারার অধীনে রিসেপশন অর্ডার যে কোনও অ্যাসাইলেমে আটককৃত একজন ব্যক্তিকে অবসর গ্রহণ না করা অবধি নৌ বা বিমান বাহিনী কর্তৃক ইংল্যান্ডে তাকে অপসারণের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাকে সেখানে আটকে রাখা হবে।

**৩৩. মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তিদের যত্নের জন্য আত্মীয়দের দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষেত্রে আদেশ-** অ্যাসাইলেমের দায়িত্বে থাকা পরিদর্শকদের সাথে বা মেডিকেল অফিসারের সাথে পরামর্শ করে লিখিত আদেশের ভিত্তিতে অ্যাসাইলামে আটককৃত মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তিকে তার আত্মীয় বা বন্ধুর কাছে ছেড়ে দেওয়ার তবে শর্ত থাকে মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তিকে সঠিকভাবে যত্ন নেওয়া হবে, নিজের এবং অন্যের ক্ষতি করতে বাধা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে আদেশ দিতে পারেন[127] ।

**৩৩-এ উপধারা অনুযায়ী মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তির অস্থায়ী মুক্তি[128]**

১) ভারসাম্যহীন ব্যাক্তিকে তার আত্মীয় বা বন্ধুর কাছে ছেড়ে দেওয়া যাবে সঠিকভাবে যত্ন নেওয়া হবে, এবং অন্যের ক্ষতি না করা সুপারিশে এই ধরনের মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তিকে অস্থায়ী মুক্তির জন্য আদেশ দেবেন যা কোনও কারণেও ষাট দিনের বেশি হবে না।

(২) বিভিন্ন ধারা এবং উপ-ধারার অধীনে আটক হওয়া মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তিদেও অস্থায়ীভাবে মুক্তির জন্য ধারা ৭ বা ১০ - এর অধীনে সেই আবেদনকারীর আবেদন ব্যতীত

---

[125] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- III, অধ্যায় - III, সেকশন- ৩১/১,৩১/২

[126] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- III, অধ্যায় - III, সেকশন- ৩২/১,৩২/২

[127] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- III, অধ্যায় - III, সেকশন- ৩৩

[128] ৩৩-এ ধারার ১৯৩৮ এর XV-র ৩ সংশোধন আইনের মাধ্যমে এর সাথে যুক্ত করা হয়।

আদেশ দেওয়া যাবে না, যার আবেদন হিসাবে এই ধরনের উন্মাদকে আটক করা হয়েছিল বা এই জাতীয় আবেদনকারীর লিখিত সম্মতি ছাড়াও তা সম্ভব না। (৩) উপ-ধারা ১ এর অধীনে উন্মাদকে মুক্তি দেওয়ার জন্য যে কোনও আদেশ, মুক্তির সময় কোনও আত্মীয় বা বন্ধুর আবেদনে, আলাদা করা যেতে পারে বা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হতে পারে। (৪)মুক্তিপ্রাপ্ত মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তি যদি বিপজ্জনক এবং অন্যদের সাথে থাকার জন্য অযোগ্য হয় তবে আবার তাকে অ্যাসাইলেমে আটক করা হবে [129]।

**মাদ্রাজ সংশোধন--**

**৩৩-এ। স্বাস্থ্যের স্বার্থে উন্মাদ গ্রস্তব্যক্তিকে মুক্তির অস্থায়ী আদেশ[130]--** যদি কোনও উন্মাদগ্রস্থ ব্যক্তিকে ধারা ১৪, ১৫ বা ১৭- এর বিধান অনুসারে আটক করা হয় এমন কোনও অ্যাসাইলেমের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি যদি নিশ্চিত হন যে উন্মাদ গ্রস্থ ব্যক্তির সুস্বাস্থ্যের স্বার্থে, তাকে অস্থায়ীভাবে মুক্ত করা প্রয়োজন, ব্যক্তি পূর্বোক্ত সময়ের জন্য মুক্তির আদেশ দিতে পারে, কারণ তিনি উপযুক্ত মনে করতে পারেন এবং রাজ্য সরকার বিধি দ্বারা এইরকম শর্ত সাপেক্ষে থাকতে পারে।

**৩৪. তদন্তের পর যদি কোনো ব্যক্তিকে অবাস্তব মনের না পাওয়া যায় তবে তার মুক্তির আদেশ-** ধারা ৭, ১০, ১৪, ১৫ বা ১৭-র পর চতুর্থ অধ্যায় বা পঞ্চম অধ্যায়ের অধীনে একটি অনুসন্ধানে পাওয়া যায় যে ব্যক্তিটি অবাস্তব মনের নয় এবং নিজেকে ও তার বিষয়গুলি পরিচালনা করতে অক্ষম হবে, অ্যাসাইলেমের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তির তৎক্ষণাত, অ্যাসাইলেম থেকে উন্মাদের মুক্তির একটি শংসিত কপি দেবেন [131]।

**৩৫. মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি ও অপরাধী মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির অপসারণ[132]**

(১) যে কোনও উন্মাদ গ্রস্ত ব্যক্তিকে, রাজ্য সরকারের বিশেষ আদেশ অনুসারে রাজ্যের অভ্যন্তরে যে কোনও সরকারী অ্যাসাইলেম থেকে বা অন্য কোনও অ্যাসাইলেমে সরানো যেতে পারে।

---

129 দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- III, অধ্যায় - III, সেকশন- ৩৩-A

130 ধারা ৩৩-এর পরে মাদ্রাজ আইন অনুসারে নিম্নলিখিত ধারা ৩৩-এ ১৯৪৩-এর মাদ্রাজ আইন ১২-এর সংশোধিত আইনকে ১৯৩৮ সালের XV-এর সাথে যুক্ত করা হয়।

131 দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- III, অধ্যায় - III, সেকশন - ৩৪

132 দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- III, অধ্যায় -III, সেকশন- ৩৫/১,৩৫/২

(২)রাজ্য সরকার এই জাতীয় বা বিশেষ আদেশ দিতে পারে কারণ সে মনে করে যে কোনও ব্যক্তির অপসারণকে ৪৬৬ বা ৪৭১ ধারার অধীনে একটি আদেশ দেওয়া হয়েছে বলে আটকের নির্দেশ দেওয়া উপযুক্ত হতে পারে,রাজ্য সরকারের সম্মতিতে যে কোনও অ্যাসাইলেমে, জেল বা সুরক্ষার অন্য কোনও জায়গায় অপসারণ এবং পুন:রুদ্ধার করা হতে পারে।

**৩৬. ন্যায়সঙ্গত আটক এবং পলায়নের পর পুন:রুদ্ধারের আদেশ** এই আইনের দ্বারা প্রয়োজনীয় যে কোনও আদেশের অধীনে আশ্রয় প্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে আইনের দ্বারা পুলিশ অফিসার বা অ্যাসাইলেমের দায়িত্বে থাকা কোনও ব্যক্তির অনুমোদিত হিসাবে এবং অপসারণ করা বা অব্যাহতি না দেওয়া পর্যন্ত সেখানে আটক রাখা যেতে পারে, অনুমোদিত অন্য কোনও ব্যক্তি পুনরায় চার্জ গ্রহণ করতে পারেন। যদি মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি পালিয়ে যায়, তাহলে সেটি তার পালানোর তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে ব্যবহার করা যাবে[133] ।

**চতুর্থ অংশে** (৩৭ নং ধারা থেকে ৬১ নং পর্যন্ত ) প্রেসিডেন্সি শহর গুলিতে মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির কার্যক্রিয়ার উপর তদন্ত, মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির বিচার , মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তির সম্পত্তি হস্তান্তর, তাদের সম্পত্তির হেফাজত, চুক্তির কার্য সম্পাদন, মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির মালিকানাধীন জমির আদালত কর্তৃক দায়ভার গ্রহণ ইত্যাদি বিষয় গুলি আলোচিত হয়েছে।

**৩৭. রাষ্ট্রপতির-নগরগুলিতে মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির বিচার-** এই অধ্যায়ের অধীনস্থ আদালতগুলি ফোর্ট উইলিয়াম, মাদ্রাজ এবং বোম্বাইয়ের বিচার বিভাগের উচ্চ আদালত হবে[134]|মাদ্রাসার হাইকোর্ট ধারা ৩৭ অনুসারে লুনসি আইনের অধীনে প্রদত্ত বিধি তৈরি করেছে যেটি ধারা ৬১ এর অধীনে কার্যকর করার জন্য এই আইনের চতুর্থ অধ্যায়ের অনুসারে ঘটে।

**৩৮. আদালত অভিযুক্ত মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির উপর তদন্তের আদেশ দিতে পারে** [135]

(১) আদালত আবেদনের উপর আদেশের মাধ্যমে অনুসন্ধানের নির্দেশ দিতে পারে, যে সে বিকৃত মস্তিষ্ক-এর মানুষ এবং নিজেকে ও নিজের কাজকর্ম পরিচালনা করতে অক্ষম কিনা।(২)এই জাতীয় আদেশে অভিযুক্ত মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তিদের মালিকানাধীন সম্পত্তির স্বরূপ, আদালতের কাছে এই জাতীয় অন্যান্য বিষয়াদি সম্পর্কে অনুসন্ধানের দিকনির্দেশনাও

---

[133] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- III, অধ্যায় - III, সেকশন- ৩৬

[134] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- IV, অধ্যায় -IV, সেকশন- ৩৭

[135] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- IV, অধ্যায় - IV, সেকশন- ৩৮/১,৩৮/২

থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

**৩৯. যার দ্বারা আবেদন করা যায়-** এই ধরনের তদন্তের আবেদন অভিযুক্ত মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তির কোনও আত্মীয় বা অ্যাডভোকেট-জেনারেল করতে পারে[১৩৬] ।

**৪০. সময় এবং তদন্তের স্থানের বিজ্ঞপ্তি-** (১)মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে তদন্তের জন্য যে সময়ও স্থানের প্রস্তাবের ভিত্তিতে নোটিশ দেওয়া হবে। (২) ভারসাম্যহীন ব্যক্তির উপর আদালত নোটিশের উপযুক্ত বিকল্প হিসাবে বিবেচনা করবেন বলে নির্দেশ দিতে পারে। (৩) আদালত অভিযুক্ত উন্মাদ গ্রস্থ ব্যক্তির কোনও আত্মীয় এবং যে কোনও ব্যক্তির নিকট আবেদনের মতামত অনুযায়ী এই ধরণের নোটিশের অনুলিপিও সরবরাহ করতে পারে[১৩৭] ।

**৪১. মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির উপস্থিতি ও পরীক্ষার বিষয়ে আদালতের ক্ষমতা- (১)** মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে আদালত সুবিধাজনক সময় এবং স্থানে উপস্থিত থাকার জন্য অভিযুক্ত মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে আদেশ দিতে পারে। (২) আদালত পরীক্ষার উদ্দেশ্যে অভিযুক্ত মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিদের কাছে প্রবেশের জন্য যে কোনও ব্যক্তিকে প্রবেশ করার অনুমতি দিতে পারে[১৩৮] ।

**৪২. উন্মাদ বলে অভিযোগ প্রাপ্ত মেয়েদের উপস্থিতি এবং পরীক্ষার বিষয়ে নিয়ম বিধি ।**

৪১ ধারায় অভিযুক্ত উন্মাদ এমন একজন মহিলা যদি দেশের আচার-আচরণ ও রীতিনীতি অনুসারে জনসাধারণের মধ্যে নিজেকে মানিয়ে নিতে না পারে তবে অন্যান্য দেওয়ানী মামলায় এ জাতীয় ব্যক্তিকে পরীক্ষার জন্য আইন ও অনুশীলন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা হবে[১৩৯] ।

**৪৩. নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে তদন্ত করার জন্য জেলা আদালতকে সরাসরি নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা [140]-** ১) মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি যদি আদালতের স্থানীয় সীমার মধ্যে না থাকে এবং তদন্তটি সুবিধামতভাবে করা না যায়, তবে আদালত স্থানীয় এখতিয়ারের মধ্যে জেলা আদালতকে তদন্তের নির্দেশ দিতে পারে। ২) জিজ্ঞাসাবাদের সময় গৃহীত প্রমাণাদি রেকর্ড করা হবে এবং আদালত

---

[136] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- IV, অধ্যায় - IV, সেকশন- ৩৯

[137] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- IV অধ্যায় - IV, সেকশন- ৪০/১,৪০/২

[138] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- IV, অধ্যায় - IV, সেকশন- ৪১/১,৪১/২

[139] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- IV, অধ্যায় - IV, সেকশন- ৪২

[140] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- IV, অধ্যায় - IV, সেকশন- ৪৩/১,৪৩/২

তার পক্ষে যে তদন্তের নির্দেশনা জারি করেছিলেন তা আদালতের পক্ষে উপযুক্ত বলে মনে করা যেতে পারে।

**৪৪. ফর্ম ত্রুটিযুক্ত বা অপর্যাপ্ত থাকলে জেলা আদালতের সন্ধানের সংশোধন** - জেলা আদালতের তদন্তের সময় যদি ফর্ম ত্রুটিযুক্ত বা অপর্যাপ্ত বলে মনে হয় তবে তা সংশোধন করতে পারে[141] ।

**৪৫. আদালতের অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া** - আদালতের তদন্তের সন্ধানের বিষয় বা জেলা আদালতের যে সন্ধানের বিষয়ে তদন্তের ধারা ৪৩ এর বিধান অনুসারে তদন্তের বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে[142]।

**৪৬. মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তির ও তাদের সম্পত্তির হেফাজত** - (১) আদালত মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তির সম্পদের তদন্ত এবং ব্যবস্থাপনার দ্বারা সেগুলির হেফাজতের আদেশ দিতে পারেন। (২) তদন্তের সময় এটি বিশেষভাবে পাওয়া যায় যে অনুসন্ধানের সাথে যার সম্পর্ক রয়েছে সে তার কাজ পরিচালনা করতে অক্ষম হতে পারে, তবে সে নিজেকে পরিচালনা করতে সক্ষম হবে যদি সে নিজের জন্য বিপজ্জনক নয় বা অন্যদের জন্যও বিপদজনক নজদিএরুপ আদেশ আদালত দেয় [143]।

**৪৭. মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তির পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিচালকের ক্ষমতা** - আদালত, মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তির ভূসম্পত্তির জন্য একজন পরিচালক নিয়োগের জন্য আদালতের আদেশের মাধ্যমে বা পরবর্তী কোনও আদেশের মাধ্যমে নির্দেশ দিতে পারে যে এই ধরনের পরিচালকের পক্ষে সম্পত্তির পরিচালনার পক্ষে আদালতের মতোই ক্ষমতা থাকতে পারে। তবে শর্ত যুক্ত করা হয় যে, কোনও পরিচালক আদালতের অনুমতি ব্যতীত [144] (ক) বন্ধক, বিক্রয়, উপহার, বিনিময় বা কোন স্থাবর সম্পত্তির দ্বারা পরিবর্তন বা স্থানান্তর মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তির সম্পত্তির উপর করতে পারবে না। (খ) পাঁচ বছরের বেশি মেয়াদে এ জাতীয় কোনও সম্পত্তির ইজারা দেওয়া হবে না।

**৪৮. মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তির সাথে জড়িত যেকোনো বিষয় সম্পর্কে আদেশ দেওয়ার**

---

[141] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- IV, অধ্যায় - IV, সেকশন- ৪৪

[142] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- IV, অধ্যায় - IV, সেকশন- ৪৫

[143] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- IV, অধ্যায় - IV, সেকশন- ৪৬/১,৪৬/২

[144] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- IV, অধ্যায় - IV, সেকশন- ৪৭/১,৪৭/২

**ক্ষমতা-** আদালত, মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির বা তার সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত যে কোনও বিষয়ে আবেদনের মাধ্যমে বিধান সাপেক্ষে, দরখাস্তের উপর ভিত্তি করে, এই আদেশ দিতে পারেন[145] ।

**৪৯. নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তির সম্পত্তি হস্তান্তর করার ক্ষমতা[146] -** আদালত যদি মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তির ন্যায্যতা বা মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তির উপকারের জন্য প্রতীয়মান হয়, তবে মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তির যে কোনও সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারে। অন্যথায় নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে, যথা: (১) মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির ঋণ বা চুক্তির অর্থ প্রদান। (২) তার সম্পত্তিতে যে কোনও প্রকারের ক্ষতির অব্যাহতি। (৩) মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির রক্ষণাবেক্ষণের বা তার উপকারের জন্য ব্যয়িত অর্থ প্রদান। (৪) তার ভবিষ্যতের রক্ষণাবেক্ষণের খরচ এবং তার পরিবারের এই সদস্যদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নির্ভরশীলতা, সমস্ত ব্যয় এতে ঘটনাক্রমে প্রদান করতে হবে। (৫) এই অধ্যায়ের অধীনে যে কোনও তদন্তের ব্যয় এবং আদেশ দ্বারা বা আদালতের কর্তৃপক্ষের অধীনে যে কোনও ব্যয় হয়েছে সেগুলি প্রদান করতে হবে।

**৫০. আদালতের আদেশে ম্যানেজারের মাধ্যমে বিক্রয় এবং ক্ষমতা সম্পাদন করা[147] -** (১) মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তির সম্পত্তির পরিচালক, মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তির সম্পত্তি সম্পর্কিত সমস্ত কার্য এবং সরঞ্জামাদি কার্যকর করার আদালত আদেশ দিতে পারেন। (২) এই জাতীয় ব্যবস্থাপক আদালতের আদেশের অধীনে একইভাবে, মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তির হাতে ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

**৫১. আদালত চুক্তির কার্য সম্পাদনের আদেশ দিতে পারে --** যেখানে কোনও ব্যক্তি তার সম্পত্তি বা তার কোনও অংশ বিক্রয় বা অন্যথায় নিষ্পত্তি করার জন্য চুক্তি করার পরে মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে যায়, আদালত যদি চুক্তি ঠিক মনেকরেন, তবে আদালত এটি সম্পাদন করবে[148] ।

---

145 দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- IV, অধ্যায় - IV, সেকশন- ৪৮

146 দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- IV, অধ্যায় - IV, সেকশন- ৪৯

147 দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- IV, অধ্যায় - IV, সেকশন- ৫০/১,৫০/২

148 দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- IV, অধ্যায় - IV, সেকশন- ৫১

**৫২. মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে যাওয়া সদস্যের অংশীদারত্বের সম্পত্তির হ্রাস এবং নিষ্পত্তি করা**[149]-(১) যেখানে কোনও ব্যক্তি অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠানের সদস্য হওয়া সত্তেও মানসিক ভারসাম্যহীন বলে প্রমাণিত হয়, সেখানে আদালত তার অংশীদারিত্বকে হ্রাস করতে পারে। (২) এ জাতীয় হ্রাস হওয়ার পরে, আদালতের নির্দেশ দ্বারা বিলোপ হওয়ার পরে ভূসম্পত্তির ব্যবস্থাপক অংশীদারিত্ব নিষ্পত্তি করার জন্য অন্য অংশীদারদের সাথে নাম এবং উন্মাদের পক্ষে অংশ নিতে পারেন।

**৫৩. ব্যবসায়ের জায়গার নিষ্পত্তি -** যেখানে একজন মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তির সাথে ব্যবসায়ের কিছু তথ্য জড়িত থাকে, আদালতের যদি প্রতীয়মান হয় যে মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তির সুবিধার জন্য ব্যবসায়ের জায়গাটি নিষ্পত্তি করা উচিৎ, ভূসম্পত্তির ব্যবস্থাপককে বিক্রয় ও নিষ্পত্তি করার আদেশ দিতে পারেন[150] ।

**৫৪. ম্যানেজার ভাড়া নিষ্পত্তি করতে পারেন-** যেখানে মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তিকে ভাড়া বা শিকামী ভাড়া দেওয়ার অধিকার রয়েছে এবং এটি তার সম্পত্তির সুবিধার জন্য বলে মনে হয় যে এটি নিষ্পত্তি করা উচিৎ, সেখানে সম্পত্তির ব্যবস্থাপক আদালতের আদেশক্রমে আদেশ দিতে পারেন[151]|

**৫৫. নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির মালিকানাধীন জমির আদালত কর্তৃক দায়ভার গ্রহণ**[১৫২]- রাষ্ট্রের যেখানে এই জাতীয় সম্পত্তি অবস্থিত, সেটির মালিকানাধীন ব্যক্তিকে যদি অযোগ্য ঘোষণা করা হয়,আদালত এই জাতীয় সম্পত্তির দায়ভার গ্রহণ করতে পারে এবং আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারে যেমন পরিচালনার জন্য জোর দেওয়া। প্রদত্ত যেড়(১)এই জাতীয় ক্ষেত্রে মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির বিষয়ে আর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না,যতক্ষন না পর্যন্ত কাউকে উক্ত মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির অভিভাবক নিয়োগের জন্য উপযুক্তআদেশ দেবেন। (২)এই জাতীয় সম্পত্তির আয়ের উদ্বৃত্ততা, সরকারী রাজস্ব প্রদান ও পরিচালনার ব্যয়, হাইকোর্ট যেভাবে নির্দেশ দেবেন সেভাবেই তা নিষ্পত্তি করা যাবে। (৩) অন্য যে কোন ধারার

---

[149] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- IV, অধ্যায় - IV, সেকশন- ৫২/১,৫২/২

[150] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- IV, অধ্যায় - IV, সেকশন- ৫৩

[151] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- IV, অধ্যায় - IV, সেকশন- ৫৪

[152] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- IV, অধ্যায় - IV, সেকশন- ৫৫/১,৫৫/২,৫৫/৩

অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা, ধারা ৪৯, ৫০ এবং ৫১ এর অধীনে উচ্চ আদালতে প্রদত্ত ক্ষমতাগুলি দ্বারা প্রভাবিত হবে না।

**৫৬.নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে ম্যানেজার নিয়োগ না করে মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিদে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সম্পত্তি প্রয়োগের ক্ষমতা প্রদান**[153] - (১) মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির সম্পত্তি তার বা তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রত্যক্ষ ও ব্যয়বহুল উপায়ে সরবরাহ করা উচিৎ। (২) কোনও ব্যক্তির কোনও অর্থ প্রদান করা বা মানসিক ভারসাম্যহীন কোনো ব্যাক্তির কোনও সম্পত্তি এইরূপ ব্যক্তির নিকট বিতরণ করতে হবে যা বৈধ হতে হবে।

**৫৭. নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত স্টক স্থানান্তর করার আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা**- যেখানে কোনও স্টক বা সরকারী সিকিওরিটি বা কোনও কোম্পানির কোনও অংশ অন্তর্ভুক্ত থাকে বা মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির নামেই সেগুলি থাকে, একজন মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির উপকারের জন্য অধিকারী, বা তার সম্পত্তি বা তার জন্য একজন ট্রাস্টি হিসাবে যিনি নিযুক্ত, এবং সেই ম্যানেজার যদি মারা যায়, বা নিজেই উন্মাদ হয়ে যায়, আদালত কিছু উপযুক্ত ব্যক্তিকে এই ধরনের স্থানান্তর করতে, এবং যেভাবে নির্দেশ দেয় সেভাবে লভ্যাংশ গ্রহণ ও প্রদানের আদেশ দেবেন[154]।

**৫৮. ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে থাকা উন্মাদদের স্থানান্তর করার আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা**- এই জাতীয় কোনও স্টক বা সরকারী সিকিওরিটি বা কোনও সংস্থায় অংশীদারি কোনও ব্যক্তির নামে আছে যিনি ভারতের বাইরে থাকেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের কোনও অংশ নয়, সেইক্ষেত্রে আদালত যদি নিশ্চিত হয়ে যে যার নামে এই সম্পত্তি তাকে উন্মাদ বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি তার পরিচালনার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে[155]।

**৫৯. অস্থায়ী মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সম্পত্তি প্রয়োগের ক্ষমতা**- যদি আদালতে হাজির হওয়া যে কোনও উন্মাদের মানসিকতা তার প্রকৃতির, অস্থায়ী এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তার উপর নির্ভরশীল তার পরিবারের বা তার পরিবারের সদস্যদের

---

[153] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- IV, অধ্যায় - IV, সেকশন- ৫৬/১,৫৬/২

[154] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- IV, অধ্যায় - IV, সেকশন- ৫৭

[155] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- IV, অধ্যায় -IV, সেকশন- ৫৮

রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অস্থায়ী ব্যবস্থা করা সমীচীন , আদালত, ধারা ৫৬ এর অধীনে তার সম্পত্তি বা এর একটি পর্যাপ্ত অংশকে পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করার জন্য নির্দেশ দিতে পারে[১৫৬] ।

**৬০. আদালত যদি জানতে পারে যে মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির মনের অযৌক্তিকতা স্থগিত হয়ে গেছে তাহলে লুনাসির মামলা বন্ধ করতে বা সরিয়ে দিতে পারে**[157]- (১) যখন এই অধ্যায়ের অধীনে কোনও ব্যক্তিকে নিরবচ্ছিন্ন মনে করা হয় এবং নিরবচ্ছিন্নতা বন্ধ হয়ে গেছে, তবে আদালত তা যাচাই করতে তদন্তের জন্য আদেশ দেবেন । (২) অভিযুক্ত উন্মাদের মনের অসচ্ছলতা অনুসন্ধানের জন্য এই অধ্যায়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে তদন্ত পরিচালনা করা হবে এবং যদি প্রমাণিত হয় যে তার মনের অদম্যতা বন্ধ হয়ে গেছে, আদালত লুনাসির সমস্ত কার্যক্রম বন্ধ রাখার আদেশ দেবেন।

**৬১. আদালতের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা** - আদালত, মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই অধ্যায়ের বিধান কার্যকর করার লক্ষ্যে সময়ে সময়ে বিভিন্ন বিধি তৈরি করতে পারে[158] । ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট এর পঞ্চম অধ্যায়ে (৬২ নং ধারা ৮০ নং )থেকে প্রেসিডেন্সি-শহরগুলির বাইরে লুনাসির তদন্তের ক্ষেত্রে নেওয়া পদক্ষেপ, এক্ষেত্রে জেলা আদালতের কার্যবিবরণীর নিয়ন্ত্রণ, মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তির সম্পত্তির দায়ভার, মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তির আইনী উত্তরাধিকারী বিষয় গুলি আলোচনা করা হয়েছে ।

**৬২. মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি বলে অভিযুক্ত ব্যক্তির তদন্তের জন্য জেলা আদালতের ক্ষমতা** - আদালতের এখতিয়ারের সাপেক্ষে কোন ব্যক্তি সম্পত্তির মালিকানার অধিকারী হন এবং তাকে জেলা আদালতে একজন মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি বলে অভিযোগ করা হয়, তিনি আবেদনের মাধ্যমে এইরকম ব্যক্তিকে অযৌক্তিক মনের অধিকারী এবং নিজেকে পরিচালনা করতে ও তার বিষয় সম্পত্তি রক্ষনাবেক্ষণ-এ অক্ষম কিনা তা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে তদন্তের নির্দেশ দিতে পারে[159] ।

**৬৩. যার দ্বারা আবেদন করা যায়** - ১) এই ধরনের অনুসন্ধানের জন্য আবেদন করা অভিযুক্ত

---

[156] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- IV, অধ্যায়- IV, সেকশন- ৫৯

[157] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- IV, অধ্যায় - IV, সেকশন- ৬০/১,৬০/২

[158] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- IV, অধ্যায় - - IV, সেকশন- ৬১

[159] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- V, অধ্যায় - V, সেকশন- ৬২

উন্মাদ গ্রস্থ ব্যক্তির কোনও আত্মীয় বা উত্তরাধিকার (সম্পত্তি সুরক্ষা) আইন, এর অধীনে নিযুক্ত কোন সরকারী কিউরেটর দ্বারা আবেদন করা যেতে পারে। ২) সম্পত্তি যদি কোনও রাজ্যের আইন অনুসারে কার্যকর হয়,যেখানে সম্পত্তির মালিকানাধীন বিষয় স্বত্বাধিকারী, যদি তাকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়, আবেদনটি ওয়ার্ডস কোর্টের পক্ষে কালেক্টরের পক্ষে হতে পারে[১৬০]।

**৬৪. জেলা আদালতের কার্যবিবরণীর নিয়ন্ত্রণ-** ৪০, ৪১ এবং ৪২ ধারার অধীনে জেলা প্রশাসনের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলির তাদের নিয়ন্ত্রণ করবে [161]।

**৬৫. জেলা আদালত কর্তৃক অনুসন্ধান এবং তৎসহ তদন্ত-** (১) জেলা আদালত যদি মনে করে তবে উক্ত কাজ করার জন্য দুজন বা বেশি ব্যক্তি নিয়োগ করতে পারে। (২) তদন্ত শেষ হওয়ার পরে, আদালত নির্ধারিত করবে যে অভিযুক্ত উন্মাদ গ্রস্থ ব্যক্তিটি নিরবচ্ছিন্ন এবং নিজেকে ও তার বিষয় সম্পত্তির পরিচালনা করতে অক্ষম কিনা [162]।

**৬৬. জেলা আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কমিশনের অধীনস্থ আদালত কর্তৃক অনুসন্ধান এবং তদন্ত-** (১) যদি জেলা আদালতে আবেদন করা হয়, সেই জায়গা থেকে পঞ্চাশ মাইলেরও বেশি দূরে যদি কথিত উন্মাদ ব্যক্তি থাকে, আদালত জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য যে কোনও অধঃস্তন আদালতে একটি কমিশন জারি করতে পারেন, এবং এই জাতীয় অধঃস্তন আদালত তা করতে পারেন[163]।

**৬৭.মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি এবং তার সম্পদ পরিচালনার জন্য হেফাজত প্রদান** [১৬৪]-(১) আদালত মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তিদের হেফাজতের জন্য আদেশ জারি করতে পারে যাতে অনুসন্ধান এবং তাদের সম্পদ পরিচালনার জন্য ম্যানেজার নিযুক্ত করে।(২) অনুসন্ধানের সময় এটি বিশেষভাবে পাওয়া যায় যে অনুসন্ধানের সাথে যার যার সাথে সম্পর্ক রয়েছে সে তার কাজ পরিচালনা করতে অক্ষম হতে পারে।আদালত আদেশ দিতে পারে যদি সে নিজেকে পরিচালনা করতে সক্ষম এবং সে নিজের বা অন্যের পক্ষে বিপজ্জনক না হয়।

---

160 দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- V, অধ্যায় -V, সেকশন- ৬৩/১,৬৩/২

161 দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- V, অধ্যায় - V, সেকশন- ৬৪

162 দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- V, অধ্যায় - V, সেকশন- ৬৫/১,৬৫/২

163 দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- V, অধ্যায় - V, সেকশন- ৬৬

164 দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- V, অধ্যায় - V, সেকশন- ৬৭/১,৬৭/২

**৬৮. মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তির সম্পত্তির দায়ভার গ্রহণের জন্য ওয়ার্ড আদালত কর্তৃক নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে প্রদেয় অনুমোদন[165]-** যদি কোনও উন্মাদের সম্পত্তির বিষয়ে কোনো মামলা হয় যা আইন দ্বারা কার্যকর থাকায় মালিকানাধীনকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয় তবে এটি ওয়ার্ড কোর্ট-এর দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অনুমোদিত হবে।

**৬৯. কালেক্টরকে নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে উন্মাদ গ্রস্থব্যক্তির এবং তার সম্পত্তির দায়িত্ব নেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান** [166] - (১) যদি প্রাপ্ত উন্মাদ গ্রস্ড় ব্যক্তির সম্পদ পুরো বা জমির অংশ বিশেষ বা জমির প্রতি আগ্রহের সাথে অন্তর্ভুক্ত থাকে তবে জেলা আদালত উন্মাদ গ্রস্থ ব্যক্তির এবং সম্পত্তির দায়িত্ব নেওয়ার জন্য কালেক্টরকে নির্দেশ দিতে পারে। (২)কালেক্টর ঐ ব্যক্তির সম্পদের জন্য একজন ম্যানেজার এবং তার জন্য অভিভাবক নিয়োগ করতে পারবেন। **৭০. কালেক্টরের কার্যবিধির উপর নিয়ন্ত্রণ**-এই অধ্যায়ের অধীনে মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তির সম্পত্তির বিষয়ে কালেক্টরের সমস্ত কার্যক্রম রাজ্য সরকারের বা যেই কর্তৃপক্ষের উপর নিযুক্ত হতে পারে এমন কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে থাকবে [167]।

**৭১. অভিভাবক ও ম্যানেজার নিয়োগ এবং ম্যানেজারের কাছ থেকে নিরাপত্তা আমানত নেওয়ার জেলা আদালতের ক্ষমতা[168]** - (১) অন্য সকল ক্ষেত্রে জেলা আদালত মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তির সম্পত্তির জন্য একজন পরিচালক নিয়োগ করতে পারেন এবং তার জন্য অভিভাবকও নিয়োগ করতে পারেন। (২) মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তির সম্পত্তি পরিচালনার জন্য জেলা আদালত বা কালেক্টর কর্তৃক নিযুক্ত যে কোনও ব্যক্তি, প্রয়োজনবোধে, এইরূপ ফরমে এবং আদালত বা কালেক্টরের নিকট জামিনে প্রবেশ করতে পারে।

[165] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- V, অধ্যায় - V, সেকশন- ৬৮

[166] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- V, অধ্যায় - V, সেকশন- ৬৯/১,৬৯/২

[167] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- V, অধ্যায় - V, সেকশন- ৭০

[168] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- V, অধ্যায় - V, সেকশন- ৭১/১,৭১/২

**৭২. মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তির আইনী উত্তরাধিকারী, তার অভিভাবক হওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা-** মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তির কোন উত্তরাধিকারী আদালতে উপস্থিত না থাকলে ওই ভারসাম্যহীন ব্যক্তির অভিভাবক হিসাবে নিয়োগ করা হবে না [169]।

**৭৩. ম্যানেজার এবং অভিভাবকগণের পারিশ্রমিক -** এই অধ্যায়ে নিযুক্ত মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির অভিভাবক বা তার সম্পত্তির ম্যানেজার নিযুক্ত থাকবেন[170] ।

**৭৪. অভিভাবকের দায়িত্ব -** ১) ভারসাম্যহীন ব্যক্তির অভিভাবক হিসাবে নিযুক্ত ব্যক্তিটির ওপর তার যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থাকে। ২) যখন কোনও স্বতন্ত্র অভিভাবক নিযুক্ত হয়, তখন ম্যানেজার মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তি এবং তার পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জেলা আদালত কর্তৃক নির্ধারিত অভিভাবককে একটি ভাতা প্রদান করবেন[171] ।

**৭৫. ম্যানেজারের ক্ষমতা -** (১) পূর্বোক্ত হিসাবে প্রদত্ত যে কোনও নিয়োগপ্রাপ্ত ম্যানেজার প্রত্যেক ব্যবস্থাপক সম্পত্তির পরিচালনায় নিযুক্ত মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তির সম্পত্তির উপর একই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন। (২) ম্যানেজার আদালতের অনুমতি ব্যতীতমানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তির সম্পত্তির বন্ধক, চার্জ, বা বিক্রয়, উপহার, বিনিময় বা অন্য কোনও স্থাবর দ্বারা স্থানান্তরিত করতে পারবে না[172] ।

**৭৬. ম্যানেজার কর্তৃক ইনভেন্টরি এবং বার্ষিক অ্যাকাউন্টগুলি সরবরাহ করা-**(১) প্রত্যেক ব্যক্তি জেলা আদালত কর্তৃক বা সম্পত্তির পরিচালক বা মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তির মালিকানাধীন এবং এই জাতীয় সমস্ত অর্থের, সমস্ত বিবরণী সহ এবং একসাথে সমস্ত স্থাবর সম্পত্তির নিকটবর্তী বৎসরের শুরু হওয়ার তিন মাসের মধ্যে সংগ্রহ করে নিতে পারেন। (২) এই জাতীয় প্রত্যেক পরিচালককে জেলায় বর্তমান সময়ের সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে, তার দায়িত্বে থাকা সম্পত্তির হিসাব, আদালত বা কালেক্টরের নিকট পেশ করবেন [173]।

**৭৭. যদি অ্যাকাউন্টগুলির ইনভেন্টরির যথার্থতা বঞ্চিত হয় তবে তার প্রক্রিয়া -** যদি মানসিক

---

[169] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- V, অধ্যায় - V, সেকশন- ৭২

[170] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- V, অধ্যায় - V, সেকশন- ৭৩

[171] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- V, অধ্যায় - V, সেকশন- ৭৪/১,৭৪/২

[172] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- V, অধ্যায় - V, সেকশন- ৭৫/১,৭৫/২

[173] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- V, অধ্যায় - V, সেকশন- ৭৬/১,৭৬/২

ভারসাম্যহীন ব্যক্তির কোনও আত্মীয় আদালতে দরখাস্তের মাধ্যমে কালেক্টর উক্ত তালিকা এবং কোনও বার্ষিক হিসাবের যথাযথতা অনুগ্রহ করে তবে আদালত বিষয়টি সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য ম্যানেজারকে তলব করতে পারে[174] ।

**৭৮. জনসাধারণের কোষাগারে অর্থ প্রদান এবং ইনভেন্টরির ক্ষেত্রে সম্পত্তির উপার্জনের বিনিয়োগ-** মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির বা তার সম্পত্তির বর্তমান ব্যয়ের জন্য যে পরিমাণ সম্পদ প্রয়োজনহয়

তার চেয়ে বেশি কোনও সম্পত্তির জন্য কোনও পরিচালক কর্তৃক প্রাপ্ত সমস্ত পরিমাণ অর্থ- প্রজাতন্ত্রে প্রদান করা হবে, নির্দিষ্ট সময়ে বিনিয়োগ করা হবে [175]।

**৭৯. আত্মীয় কোনও অ্যাকাউন্টের জন্য মামলা করতে পারে** -জেলা আদালতের অনুমতি নিয়ে উন্মাদের যে কোনও আত্মীয় এই অধ্যায়ের অধীনে নিযুক্ত যে কোনও পরিচালকের কাছ থেকে, এই উন্মাদ গ্রস্থ ব্যক্তির অ্যাকাউন্টের জন্য তার মৃত্যুর ক্ষেত্রে, এই জাতীয় সম্পত্তির বিষয়েও মামলা করতে পারেন তার আইনি প্রতিনিধি[176] ।

**৮০. পরিচালক এবং অভিভাবক অপসারণ-** (১) জেলা আদালত পর্যাপ্ত কারণে, কিউরেটর না হয়ে নিযুক্ত যে কোনও ম্যানেজারকে অপসারণ করতে পারে এবং তার জায়গায় এই জাতীয় কিউরেটর বা অন্য কোনও উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিয়োগ করতে পারে ।(২) আদালত পর্যাপ্ত কারণে, নিযুক্ত মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির অভিভাবককে অপসারণ করতে পারে [177]।

**৮১. অ্যাকাউন্ট বা সম্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করতে অস্বীকার করায় ম্যানেজারের দন্ড-** মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির ম্যানেজার আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বা এইরকম অ্যাকাউন্ট বা সম্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ না করা পর্যন্ত বা তথ্য সরবরাহ করতে অস্বীকার করলে, তাকে সিভিল কারাগারে আটক করা যেতে পারে এবং তার ৫০০ টাকা জরিমানা হতে পারে[178] ।

---

[174] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- V, অধ্যায় - V, সেকশন- ৭৭

[175] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- V, অধ্যায় - V, সেকশন- ৭৮

[176] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- V, অধ্যায় - V, সেকশন- ৭৯

[177] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- V, অধ্যায় - V, সেকশন- ৮০/১,৮০/২

[178] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- V, অধ্যায় - V, সেকশন- ৮১

**৮২. আদালত যদি দেখেন যে মাসসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তির পাগলামি বন্ধ হয়ে গেছে তবে পদক্ষেপ গ্রহণ বা ত্যাগ করতে পারে[179]** - (১) এই অধ্যায়ে যদি কোনও ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায় যে সে নিরবিচ্ছিন্ন মনের এবং পরে তা দেখানো হয় যে মনের এইরকম নিরবচ্ছিন্নতা বন্ধ হয়েছে,তবে নিজেকে ও তার বিষয় পরিচালনা করতে অক্ষম কিনা তার যাচাই করতে আদালত তদন্তের জন্য আদেশ দিতে পারে। (২) মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তির মানসিকতা সম্পর্কে তদন্তের জন্য এই অধ্যায়ে নির্ধারিত হবে, এবং যদি প্রমাণিত হয় যে মানসিক ভারসাম্যহীনতা বন্ধ হয়ে গেছে, তাহলে আদালত মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তির সমস্ত কার্যক্রম স্থগিত করার আদেশ দেবে।

**৮৩. আবেদন** -এই অধ্যায়ের অধীনে জেলা আদালতের যে কোনও আদেশ দেওয়া থেকে হাইকোর্টে আবেদন করা যাবে [180]।

**ষষ্ট অধ্যায় (৮৪ নং থেকে ৮৫ নং )- বিষয় হল অ্যাসাইলেমের প্রতিষ্ঠা, ও অন্য রাজ্যে ভর্তি সংক্রান্ত নিয়ম কানুন ।**

**৮৪.রাজ্য সরকার অ্যাসাইলেম প্রতিষ্ঠা করতে বা লাইসেন্স দিতে পারে-** রাজ্য সরকার যেই স্থানে উপযুক্ত বলে মনে করে এমন স্থানে অ্যাসাইলেম প্রতিষ্ঠা বা লাইসেন্স প্রদান করতে পারে, যদি নিশ্চিত হয় যে মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের নিরাময়ের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যাবে[181]।

**৮৪-এ. নিরাময়ের চিকিৎসা ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত হলে লাইসেন্স বাতিল করার ক্ষমতা** - যদি কোনও লাইসেন্সপ্রাপ্ত অ্যাসাইলেমে নিরাময় চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা করা না হয়, বা রাজ্য সরকার বিবেচনা করে লাইসেন্স প্রত্যাহারও করতে পারে[182] ।

**৮৫. একটি রাজ্যের বাইরে অ্যাসাইলেমে উন্মাদদের ভর্তির বিধান-** ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালত যে কোনও রাজ্যে এখতিয়ার প্রয়োগ করে উন্মাদ বা যে কোনও শ্রেণির মানসিক ভারসাম্যহীন

---

[179] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- V, অধ্যায় - V, সেকশন- ৮২/১,৮২/২

[180] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- V, অধ্যায় - V, সেকশন- ৮৩

[181] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- VI, অধ্যায় - VI, সেকশন- ৮৪

[182] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- VI, অধ্যায় - VI, সেকশন- ৮৪-A

ব্যক্তিদের অন্য যে কোনও রাজ্যের অ্যাসাইলেমে রাজ্য সরকারের যে কোনও সাধারণ বা বিশেষ আদেশ অনুসারে পাঠাতে পারে [183]।

**সপ্তম অধ্যায়- মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তিদের ব্যয়**

**৮৬. সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে লাইসেন্সপ্রাপ্ত অ্যাসাইলেমের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় প্রদান[184]-** (১) এই আইনের বিধানের অধীনে ব্যয় পরিশোধের জন্য আদালত কর্তৃক প্রদত্ত উন্মাদ বা তার বন্ধু বা আত্মীয়দের কাছ থেকে কোনও সম্পৃক্ততা নেওয়া হয় না, সরকার কর্তৃক অর্থ প্রদান করা হয়। (২) কোন অ্যাসাইলেম যার মধ্যে মিলিটারি সার্কেলের বেতনপ্রাপ্ত ব্যক্তি এই জাতীয় অ্যাসাইলেমের দায়িত্বে থাকা অফিসারকে প্রদান করবে এবং মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তিদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যয় করবে।

**৮৭. একজন ভবঘুরে উন্মাদের সম্পত্তি দখলের আবেদন** -একজন ভবঘুরে মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তির থাকা যে কোনও অর্থ তার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় বা তার উপর খরচ হওয়া অন্য কোনও ব্যয় এবং উন্মাদ গ্রস্থ ব্যক্তির যে কোনও স্থাবর সম্পত্তির জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আবেদন করতে পারেন, এই সম্পত্তি ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা বিক্রয় করা যেতে পারে [185]।

**৮৮. মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তির সম্পত্তির বাইরে রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বা তার রক্ষণাবেক্ষণ-এ দায়বদ্ধ ব্যক্তির উপর আদেশের জন্য সিভিল কোর্টে আবেদন**[186]- যদি কোনও ব্যক্তি আইনগতভাবে এই জাতীয় মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তির সম্পত্তি বজায় রাখতে বাধ্য হয় তবে উচ্চ আদালত বা জেলা আদালতে আবেদন করতে পারে।

**বোম্বে সংশোধন** - বোম্বে রাজ্যে ৮৮ ধারার ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের জে ঢঠুর বোম্বে আইন অনুসারে নিুলিখিত সংশোধনীগুলি করা হয়েছে।

(i)যে কোনও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আপাতত কোনও আইনের অধীনে এই জাতীয় মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়বদ্ধ শব্দটি বাদ দেওয়া হবে।(ii)"থাকা"শব্দটির

---

[183] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- VI, অধ্যায় - VI, সেকশন- ৮৫

[184] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- VII, অধ্যায় - VII, সেকশন- ৮৬/১,৮৬/২

[185] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- VII, অধ্যায় - VII, সেকশন- ৮৭

[186] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- VII, অধ্যায় - VII, সেকশন- ৮৮

পর, বা রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের জন্য দায়বদ্ধ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ গঠনের পরে" শব্দটি প্রবেশ করানো হবে।(iii)মূল নোটের শেষে, নিম্নলিখিতগুলি যুক্ত করা হবে, যথা: "বা এই জাতীয় ব্যয়ের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দায়বদ্ধ"।

**৮৯. আদালত এবং প্রবর্তনার আদেশ-** (১) আদালত এই বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে তদন্ত করবে যে ব্যক্তি আইনতভাবে তার সম্পত্তি বজায় রাখতে বাধ্য এবং তার কাছে এই জাতীয় উন্মাদকে রক্ষণাবেক্ষণের উপায় রয়েছে, তার জন্য আদেশ দিতে পারেন। (২) এই জাতীয় আদেশ একই পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা হবে, এবং আদালত কর্তৃক উল্লিখিত সম্পত্তি বা ব্যক্তির মামলা হিসাবে আদালত যে আদেশ জারি করেছিল, সেই আদেশ অনুসারে আবেদনের সাপেক্ষে কার্যকর হবে [187]।

**৮৯-এ রক্ষণাবেক্ষণ-এর ব্যয় নির্ধারণ** - (১) যে কোনও রাজ্য সরকার দায়বদ্ধ থাকাকালীন যে কোনও অ্যাসাইলেমে আটক হওয়া মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তির রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়ের হিসাব বহাল রাখার কারণে চার্জ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে এই প্রতিষ্ঠাক্ষেত্রে। (২) এই জাতীয় উন্মাদের ক্ষেত্রে, রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রদেয় অর্থের ব্যয় হিসাবে তার রক্ষণাবেক্ষণ নির্ধারিত হবে।

**৮৯-বি- সরকার কর্তৃক প্রদেয় রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়ের ঘটনা** - এই আইনের বিধানের অধীনে যখন মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তিদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকার কর্তৃক প্রদেয় অর্থ ব্যয় করা হয়, তখন এইরূপ ব্যয় প্রদেয় হবে [188] -(ক) মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তিদের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার দ্বারা ভারতে আবাসিক নয়, তাদের জন্য ২৫ ধারার অধীনে রিসেপশান অর্ডার বা আদেশ দিতে পারে। (খ) রাজ্য সরকার কর্তৃক ভারতে গৃহীত মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তির ক্ষেত্রে, এবং যদি মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তি কিছু সময়ের জন্য কোনও একটি রাজ্যে বাস না করে থাকে তবে রাজ্য সরকার সেই অনুযায়ী আদেশ দেবেন।

**৯০. মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তিদের আর্থিক দায়বদ্ধতা বজায় রাখার জন্য আত্মীয়দের**

---

[187] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- VII, অধ্যায় - VII, সেকশন- ৮৯/১,৮৯/২

[188] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- VII, অধ্যায় - VII, সেকশন- ৮৯-B

**ভূমিকা**- এই আইনের অন্তর্ভুক্ত কোনও মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তির আর্থিক দায়বদ্ধতা বজায় রাখার জন্য তার আত্মীয় বা কোনও ব্যক্তির উপর কোনও বিধান কেড়ে নেওয়া বা প্রভাবিত হবে না[189] ।

**অষ্টম অধ্যায়(৯১ থেকে ১০০ )- অন্যান্য নিয়ম বিধি**

**৯১ . রাজ্য সরকারের বিধি তৈরির ক্ষমতা**- সরকার নিম্নলিখিত বা যেকোনও উদ্দেশ্যে নিয়ম তৈরি করতে পারে, যথা... (ক) এই আইনের অধীনে কোনও হাইকোর্টের সামনে কার্যক্রমের জন্য ফর্মগুলি

লিখতে হবে । (খ) অষ্ঠম ধারা এবং ১৬ ধারার আওতায় আটক ব্যক্তিদের যত্ন ও চিকিৎসা নিয়ন্ত্রণ করতে। (গ) অপরাধী মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তি দের আটক, যত্ন, চিকিৎসা এবং মুক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে। (ঘ) অ্যাসাইলেম ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা এবং এর বন্দীদের পরিচর্যা ও হেফাজত এবং তাদের এক অ্যাসাইলেম থেকে অন্য অ্যাসাইলেম স্থানান্তরকে নিয়ন্ত্রণ করতে। (ঙ) অপরাধে মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তিদের অ্যাসাইলেমে স্থানান্তর নিয়ন্ত্রণ করতে। (চ) অ্যাসাইলেম লাইসেন্সপ্রাপ্ত হতে পারে এমন শর্ত সাপেক্ষে। (ছ) এই আইনে সরবরাহ করা হিসাবে সংরক্ষণকরন, সাধারণত আইনের বিধান কার্যকর করার জন্য [190]।

৯২. বিধির প্রচার- উক্ত আইন কানুন গুলি প্রচারের ব্যবস্থা ।

৯১ ধারার অধীনে তৈরি সমস্ত বিধি সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হবে এবং এরপরে এই আইন হিসাবে প্রণীত হয়ে কার্যকর হবে [191]।

**৯৩. মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তিদের অনুপযুক্ত রিসেপশান বা আটককরণের দন্ড**[192] - (ক) এই আইনের বিধান মেনে অ্যাসাইলেমে মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তি গ্রহণ বা আটক করেন। (খ) লাভের জন্য দুই বা আরও বেশি মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তিকে অ্যাসাইলেম না করে থাকবেন, কারাদন্ডে দন্ডনীয় হতে পারে যা দুই বছর বা জরিমানা বা উভয় দন্ডে প্রসারিত হতে পারে।

---

[189] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- VII, অধ্যায় - VII, সেকশন- ৯০

[190] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- VIII, অধ্যায় - VIII, সেকশন- ৯১

[191] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- VIII, অধ্যায় - VIII, সেকশন- ৯২

[192] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- VIII, অধ্যায় - VIII, সেকশন- ৯৩/১,৯৩/২

**৯৪. চুক্তি হিসাবে বিধান - ১৮৭৩** সালের ফৌজদারি কার্যবিধি, ধারা ৪৪৫ থেকে ৪৫০ র XXXIIIএর অধ্যায় (উভয়ই অন্তর্ভুক্ত) এর বিধানগুলি এই আইনের আওতায় গৃহীত চুক্তিগুলিতে প্রযোজ্য হবে [১৯৩]।

**৯৫. আইনের অধীনে কাজ করা ব্যক্তিদের সুরক্ষা** - এই আইনের অধীনে সৎ বিশ্বাসের উদ্দেশ্যে করা বা উদ্দেশ্যপ্রাপ্ত যে কোনও কাজ করার জন্য কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনও মামলা ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না [১৯৪]।

**৯৬. ভারতের বাইরে কয়েকটি আদালতের ওয়ারেন্ট ও আদেশ কার্যকর করার ক্ষমতা** - অ্যাসাইলেমের দায়িত্বে যে কোনও কর্মকর্তা এই আদালত দ্বারা প্রদত্ত উন্মাদকে রিসেপশান ও আটকের জন্য যেকোনও আদেশ বা পরোয়ানা কার্যকর করতে পারে [১৯৫]।

**৯৭. ভারতের বাইরে থেকে প্রাপ্ত উন্মাদদের রিসেপশানর জন্য বিধি তৈরি করার ক্ষমতা**- রাজ্য সরকার মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তিদের রাজ্য আবাসে রিসেপশান এবং আটককরণের পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করার নিয়ম তৈরি করতে পারে যার ধারা দ্বারা রিসেপশান এবং আটককরণ সরবরাহ করা হয়[১৯৬] ।

**৯৮. বাতিলকরণ আইনসমূহের অধীন আদেশসমূহ** - মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তিদের আটকের সমস্ত আদেশ এবং যে কোনও আইন প্রয়োগের অধীনে প্রদত্ত **১৮৫৮** এর পুরবরবরতি পূর্ববর্তী অকেজো কিছু আইন বাতিল করা এবং এই আইনের আওতায় এবং প্রদত্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা প্রদত্ত কর্তৃপক্ষের কাছে একই বল ও প্রভাব থাকবে[197] ।

**৯৯. রাঁচির ইউরোপীয় মানসিক হাসপাতাল[১৯৮]**- [এ.এল.ও,-এর দ্বারা বাতিল করা হয়েছিল]

**১০০. বাতিলকরণ-এর আইন**-[১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের,দ্বিতীয় রোহিতকরণ সংশোধন আইন, (১৯১৪

---

[193] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- VIII, অধ্যায় - VIII, সেকশন- ৯৪

[194] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- VIII, অধ্যায় - VIII, সেকশন- ৯৫

[195] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- VIII, অধ্যায় - VIII, সেকশন- ৯৬

[196] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- VII, অধ্যায় - VII, সেকশন- ৯৭

[197] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- VII, অধ্যায় - VII, সেকশন- ৯৮/১,৯৮/২

[198] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- VII, অধ্যায় - VII, সেকশন- ৯৯

এর XVII দ্বারা বাতিল), ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় সিডিউল অনুযায়ী[199] ।

## লুনাসি অ্যাক্ট সম্পর্কিত সমসাময়িক চিঠিপত্র ১

## দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট কে অনুসরন করে ব্রিটিশ অন্যান্য উপনিবেশ গুলিতে এই আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল[200]

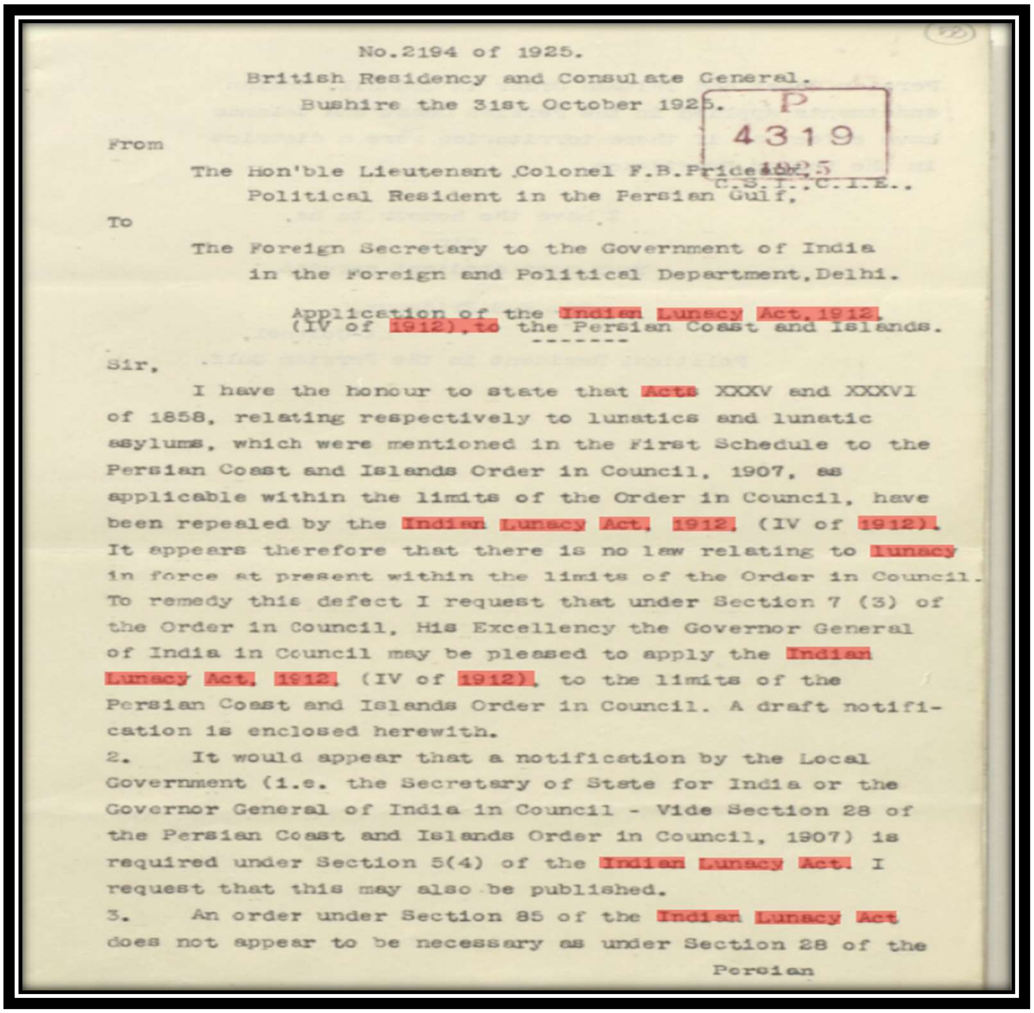

No.2194 of 1925.
British Residency and Consulate General.
Bushire the 31st October 1925.

P
4319
1925

From

The Hon'ble Lieutenant Colonel F.B.Prideaux, C.S.I.,C.I.E.,
Political Resident in the Persian Gulf,

To

The Foreign Secretary to the Government of India
in the Foreign and Political Department, Delhi.

Application of the Indian Lunacy Act, 1912, (IV of 1912), to the Persian Coast and Islands.

Sir,

I have the honour to state that Acts XXXV and XXXVI of 1858, relating respectively to lunatics and lunatic asylums, which were mentioned in the First Schedule to the Persian Coast and Islands Order in Council, 1907, as applicable within the limits of the Order in Council, have been repealed by the Indian Lunacy Act, 1912, (IV of 1912). It appears therefore that there is no law relating to lunacy in force at present within the limits of the Order in Council. To remedy this defect I request that under Section 7 (3) of the Order in Council, His Excellency the Governor General of India in Council may be pleased to apply the Indian Lunacy Act, 1912, (IV of 1912), to the limits of the Persian Coast and Islands Order in Council. A draft notification is enclosed herewith.

2. It would appear that a notification by the Local Government (i.e. the Secretary of State for India or the Governor General of India in Council - Vide Section 28 of the Persian Coast and Islands Order in Council, 1907) is required under Section 5(4) of the Indian Lunacy Act. I request that this may also be published.

3. An order under Section 85 of the Indian Lunacy Act does not appear to be necessary as under Section 28 of the

Persian

---

[199] দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট- VII, অধ্যায় - VII, সেকশন- ১০০

[200] আই,ও,আর/এল/পি,এস/১২/৩৩১৪, Digital Manuscript, Access Date – 10th August 2020 , Note- The correspondence is mostly interdepartmental in nature, between the Foreign Office, India Office , and the Government of India (Foreign and Political Department). Communications from the Political Residency in the Persian Gulf , British Legation in Tehran, and the British Consulate in Sistan and Kain are also included. Correspondence, minute papers, and notes related to The Persian Coasts and Islands Order in Council , 1907. The papers concern the drafting and passing of amendments to the Order in Council and new regulations under the articles of the Order in Council , including 'Sessions Court Original Jurisdiction', 'Abadan Jurisdiction', and 'The Persian Coast and Islands (Amendment No. 2) Order in Council , 1922'. Questions of extending the jurisdictional limits of the Order in Council are considered, as well as applications for re-trial of some cases previously tried in Duzdap. Discussion of the application of a number or Government of India acts is also covered by the file.

# লুনাসি অ্যাক্ট সম্পর্কিত সমসাময়িক চিঠিপত্র[201]- ২

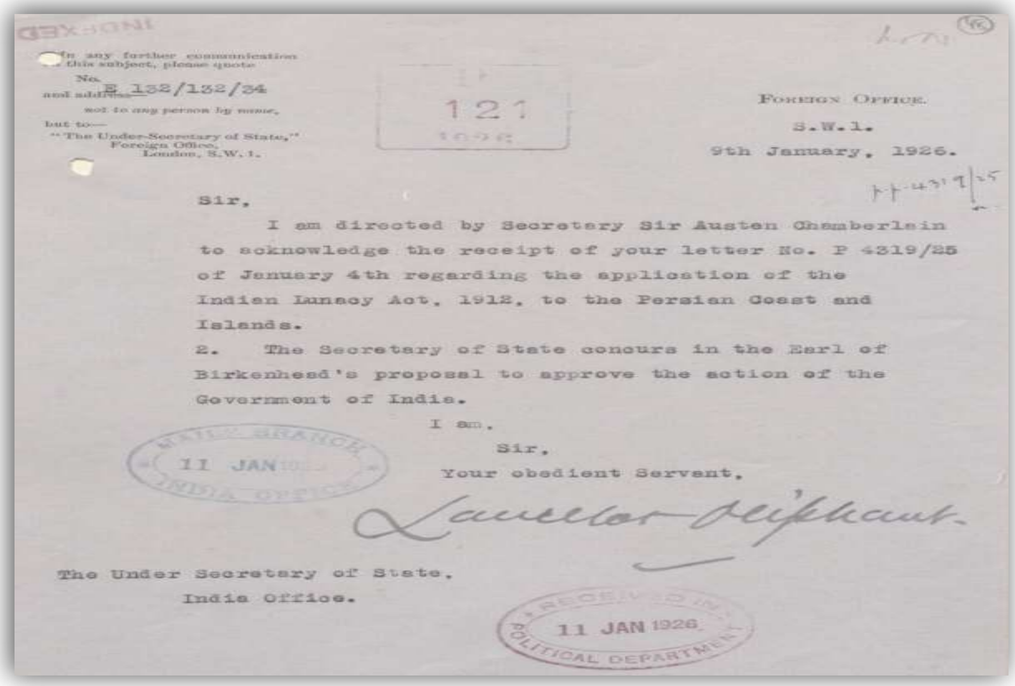

INDEXED

In any further communication on this subject, please quote
No. E 132/132/34
and address— not to any person by name, but to— "The Under-Secretary of State," Foreign Office, London, S.W.1.

121
1926

Foreign Office.
S.W.1.
9th January, 1926.

Sir,

I am directed by Secretary Sir Austen Chamberlain to acknowledge the receipt of your letter No. P 4319/25 of January 4th regarding the application of the Indian Lunacy Act, 1912, to the Persian Coast and Islands.

2. The Secretary of State concurs in the Earl of Birkenhead's proposal to approve the action of the Government of India.

I am,
Sir,
Your obedient Servant,
Lancelot Oliphant

The Under Secretary of State,
India Office.

MAILS BRANCH 11 JAN 19.. INDIA OFFICE

RECEIVED IN POLITICAL DEPARTMENT 11 JAN 1926

# লুনাসি অ্যাক্ট সম্পর্কিত সমসাময়িক চিঠিপত্র[202] - ৩

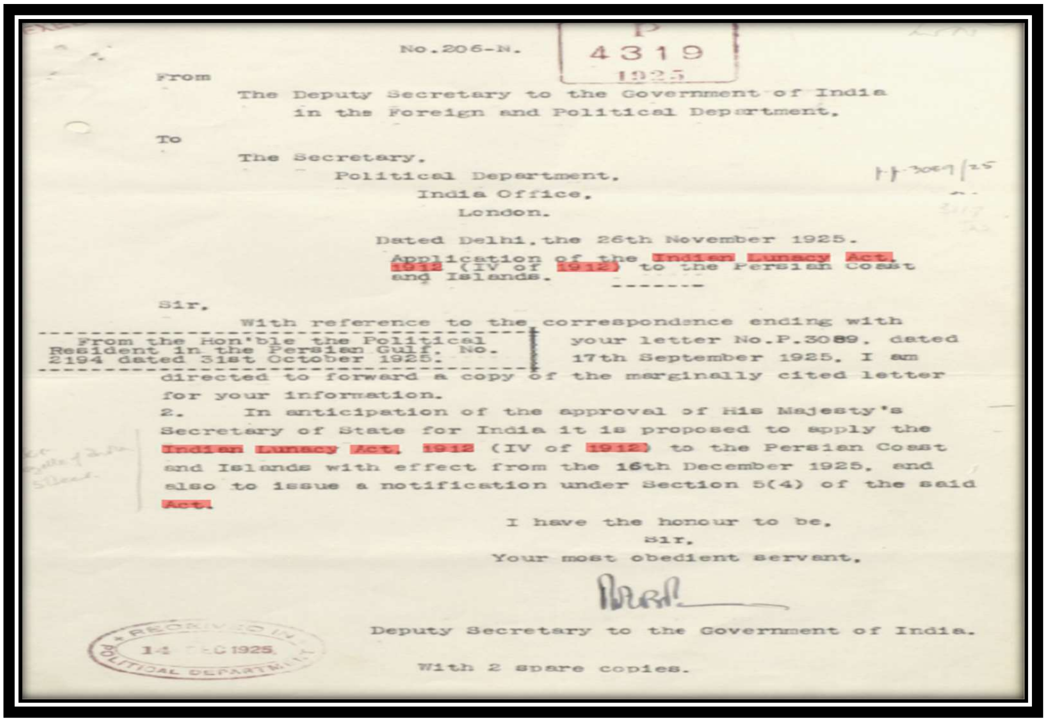

No.206-N.

P
4319
1925

From
The Deputy Secretary to the Government of India in the Foreign and Political Department.

To
The Secretary, Political Department, India Office, London.

Dated Delhi, the 26th November 1925.

Application of the Indian Lunacy Act, 1912 (IV of 1912) to the Persian Coast and Islands.

Sir,

With reference to the correspondence ending with your letter No.P.3089, dated 17th September 1925, I am directed to forward a copy of the marginally cited letter for your information.

From the Hon'ble the Political Resident in the Persian Gulf, No. 2194 dated 31st October 1925.

2. In anticipation of the approval of His Majesty's Secretary of State for India it is proposed to apply the Indian Lunacy Act, 1912 (IV of 1912) to the Persian Coast and Islands with effect from the 16th December 1925, and also to issue a notification under Section 5(4) of the said Act.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant,

Deputy Secretary to the Government of India.

With 2 spare copies.

RECEIVED IN POLITICAL DEPARTMENT 14 ..C 1925

---

[201]আই,ও,আর/এল/পি,এস/১২/৩৩১৪, ডিজিটাল ম্যানুস্ক্রিপ্ট, এক্সেস ডেট – ১০ আগস্ট ২০২০ ,

[202] আই,ও,আর/এল/পি,এস/১২/৩৩১৪, ডিজিটাল ম্যানুস্ক্রিপ্ট, এক্সেস ডেট – ১০ আগস্ট ২০২০ ,

## লুনাসি অ্যাক্ট সম্পর্কিত সমসাময়িক চিঠিপত্র[203]- ৪

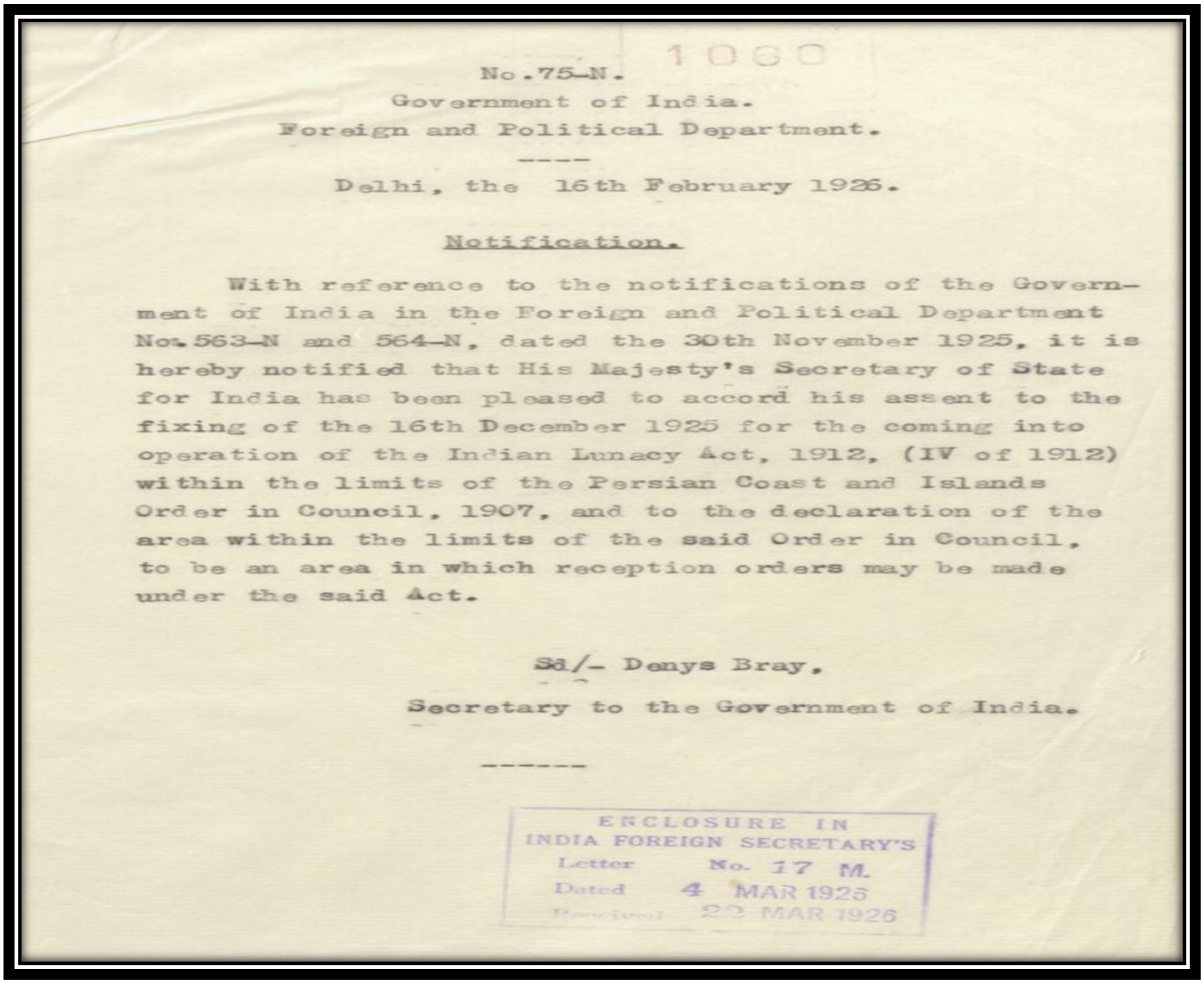

1060

No.75-N.
Government of India.
Foreign and Political Department.
----
Delhi, the 16th February 1926.

Notification.

With reference to the notifications of the Government of India in the Foreign and Political Department Nos.563-N and 564-N, dated the 30th November 1925, it is hereby notified that His Majesty's Secretary of State for India has been pleased to accord his assent to the fixing of the 16th December 1925 for the coming into operation of the Indian Lunacy Act, 1912, (IV of 1912) within the limits of the Persian Coast and Islands Order in Council, 1907, and to the declaration of the area within the limits of the said Order in Council, to be an area in which reception orders may be made under the said Act.

Sd/- Denys Bray,
Secretary to the Government of India.

------

ENCLOSURE IN
INDIA FOREIGN SECRETARY'S
Letter No. 17 M.
Dated 4 MAR 1926
Received 22 MAR 1926

১৮০০এর দশকের শেষের দিকে এবং ১৯'র দশকের গোড়ার দিকে ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল বাংলা প্রদেশ। প্রকৃতপক্ষে,অর্থনৈতিক দিক এটি থেকে ব্রিটেনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপনিবেশ হিসাবে বিবেচনা করা হত। ঔপনিবেশিক সময়ে ভারতে উন্মাদদের উপর হস্তক্ষেপ (ভারতের উপর সরাসরি ব্রিটিশ শাসনের সময়কাল) একটি বিতর্কিত বিষয়, শাসককুল যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে ব্রিটিশরা ভারতের সমাজ কাঠামো কে উন্নত করতে সহায়তা

---

203 আই,ও,আর/এল/পি,এস/১২/৩৩১৪, ডিজিটাল ম্যানুস্ক্রিপ্ট, এক্সেস ডেট – ১০ আগস্ট ২০২০ ,

করেছিল[204] , এবং বেয়াদব কে আদব শেখানো তাদের নৈতিক দায় । কিন্তু দেখা যায় এর পশ্চাতে ছিল ঔপনিবেশিক সরকারের গভীর দুরাভিসন্ধি। প্রকিতপক্ষে উন্মাদ আইনের মাধ্যমে দমনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। ভারতের জনগণের উপরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেও আধিপত্য বিস্তার কররা পক্ষে লাভবান হয়েছিল।

## উন্মাদ আইনের প্রভাব

ঔপনিবেশিক অধ্যায়ে প্রচলিত বিভিন্ন উন্মাদ আইন গুলির যে ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব পরেছিল তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

- পাগলদের সামাজিক অবস্থা সুরক্ষিত হয়েছিল।
- প্রাক ঔপনিবেশিক পর্বে পাগল দের প্রতি যে অবহেলা ও অবজ্ঞা করা হতো , উন্মাদ আইন রুপায়নের ফলে তা অনেকটা দূরীভূত হয়েছিল।

  মিলিটারি লুনাটিক অ্যাক্টের মাধ্যমে সামরিক ব্যবস্থায় পাগল দের অধিকার সুরক্ষিত হয়েছিল।
- কয়েদী পাগল ক্ষেত্রেও মানব অধিকার রক্ষা হয়েছিল প্রিজনার অ্যাক্টের মাধ্যমে।
- পাগলদের সংগঠিত ও নির্দিষ্ট ব্যবস্থা র মাধ্যমে আইন গত সুরক্ষা দেওয়ার জন্য এই আইন গুলি ছিল যথেষ্ট গুরুত্ব পূর্ণ।
- ইতিপূর্বে বাংলায় দেশীয় সমাজে পাগলদের যেভাবে দেখভাল করা হতো অর্থাৎ ওঝার বাড়ি কিংবা কবিরাজী আশ্রম ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে কিন্তু ঔপনিবেশিক উন্মাদ আইন তৈরি হওয়ার ফলে উক্ত দেশীয় ঐতিহ্য গুলি ধ্বংস সাধন হয়ে গিয়েছিল।
- ঔপনিবেশিক বাংলায় লুনাসি অ্যাক্টের মাধ্যমে সামাজিক , রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, অর্থাৎ আইনি ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পক্রিয়া কে সুগম করেছিল।

---

[204] মেডিক্যাল এথিক্স অ্যান্ড ল ফর ডক্টর – পার্ট ৪, মেডিক্যাল লেজিস্লেশন বাই ডক্টর শেখ আহমেদ, শেখ ইসমাইল, পাবলিশড বাই এড়ু ক্রিইয়েশন পাবলিশিং, পৃ-৬৭, অ্যান্ড রিডিং ইন ইন্ডিয়ান সোসিওলজি; ভলিউম IV, সোসিওলজি অফ হেলথ এডিটেড বাই মধু নাগলা, সেজ পাবলিকেশন্স, পৃ- ২৯৩।

- শুধুমাত্র ইতিবাচক নয় লুনাসি অ্যাক্টের ফলে নেতিবাচক প্রভাব পরেছিল- দেখা যায় অপরাধ প্রবণ আসামী কে দোষী সাব্যস্ত থেকে মুক্ত করার জন্য পাগলামির অজুহাতে নির্দোষপ্রমাণ করার প্রবনতা দেখা যায়।

## ঔপনিবেশিক কাল পর্বে ও পরবর্তী কালে উন্মাদ আইনের প্রভাব

ব্রিটিশ ভারতে মানসিক অসুস্থতা সম্পর্কিত প্রথম আইনটি ছিল উন্মাদ আশ্রম আইন ১৮৫৮।১৮৫৮ সালে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রশাসন অধিগ্রহণের পরে, মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের যত্নের জন্য অনেক আইন চালু করা হয়েছিল, কিন্তু এই আইনের অধীনে যে ব্যবস্থা ছিল , সুস্থ জীবনযাত্রার পরিবেশে রোগীদের অনির্দিষ্টকালের জন্য আটকে রাখা হয়, যেখানে আরোগ্য লাভ সম্ভাবনা কম ছিল । এর ফলে ১৯১১ সালে একটি বিল প্রবর্তন করা হয় যা বিদ্যমান আইনকে একত্রিত করে এবং ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট (আইএলএ) ১৯১২ নেতৃত্ব দেয়। আবার আইএলএ- ১৯১২ মূলত প্রথম আইন যা ঔপনিবেশিক পরবরতীকালে ভারতে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রণ করে। এটি এসাইলাম ব্যবস্থাপনার জন্য মৌলিক পরিবর্তন এনেছিল , বিশেষ করে মানসিক হাসপাতাল গঠন করতে সাহায্য করেছিল[205]। যাইহোক, উক্ত আইন সাধারণ মানুষ ও পাগলদের সুরক্ষার উপর মনোযোগ প্রদান করে যারা সমাজের জন্য বিপজ্জনক হিসেবে বিবেচিত হয় (অর্থাৎ মানসিক অসুস্থরোগীদের)। আইএলএ ১৯১২ মানবাধিকারকে অবহেলা করেছে এবং শুধুমাত্র হেফাজতে থাকা শাস্তি নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল। ফলস্বরূপ, ইন্ডিয়ান সাইকিয়াট্রিক সোসাইটি পরামর্শ দেয় যে আইএলএ ১৯১২ অনুপযুক্ত এবং পরবর্তীতে ১৯৫০ সালে একটি মানসিক স্বাস্থ্য বিল খসড়া করতে সাহায্য করেছিল।

[205] এস, ধনশেকরন, এস.কে.কার, এ. ত্রিপাঠি, দ্যা মেন্টাল হেলথ কেয়ার বিল ; চেঞ্জ অ্যান্ড আপ্রেইজল, ফরেনসিক সাইকিয়াট্রি, দিল্লি সাইকিয়াট্রি জার্নাল, ভলিউম- ১৭, নং- ১, এপ্রিল ২০১৪, অ্যান্ড ঋত্বিকা খাটুয়া, দ্যা লিগাল স্ট্যাটাস অফ ইন্সেনিটি- অ্যা ক্রিটিক্যাল অ্যানালাইসিস কিং স্টাব অ্যান্ড কাশিভ অ্যাডভোকেট অ্যান্ড অ্যাটর্নিস।

মানসিক স্বাস্থ্য আইন সম্মতি পেতে তিন দশকেরও বেশি সময় লাগে (১৯৮৭ সালের মে মাসে);এটি অবশেষে নব্বই এর দশকে একটি আইন হিসেবে বাস্তবায়িত হয়। মানসিক স্বাস্থ্য আইন (এমএইচএ) এর সুবিধা ছিল যে এটি মানসিক অসুস্থতাকে একটি প্রগতিশীল উপায়ে সংজ্ঞায়িত করে[206], হেফাজতের বদলে যত্ন এবং চিকিৎসার উপর জোর দেয়। এটি বিশেষ পরিস্থিতিতে হাসপাতালে ভর্তির জন্য বিস্তারিত পদ্ধতি প্রদান করে এবং মানবাধিকার, অভিভাবকত্বএবংমানসিক অসুস্থ ব্যক্তিদের শারীরিক রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়[207] ।

## উন্মাদ আইনের তাৎপর্য ও বিশ্লেষণ

ঔপনিবেশিক সময়ে উন্মাদ আইনের ইতিহাস একটি বৃহৎ অংশই ব্রিটিশ উপনিবেশবাদী ভাবনা চিন্তার সঙ্গে যুক্ত। উত্তর উপনিবেশিক কাল পর্বে এবং নিতান্ত আধুনিক সময়ের ইতিহাসচর্চার কথা বাদ দিলে পুরনো ইতিহাস চর্চার একটি বিশেষ ধরন ছিল । অন্য সমস্ত ইতিহাস রচনার মতই উন্মাদ আইনের ইতিহাস অনুধাবন করতে গেলে কোনো একটি একমাত্রিক ছকে কিংবা শাসক-শাসিতের সরল কাঠামোতে একে বোঝা যাবে না । পশ্চিমী শাসন ও শিক্ষা কেবল চুইয়ে চুইয়ে বা ব্যাপন প্রক্রিয়ায় এদেশে এসে পৌছোয়নি ঠিকই কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে যেমন, তেমনি পশ্চিমী চিকিৎসার সঙ্গে ভারতীয় চিকিৎসার বিভিন্ন ধারা সহবাস সহযোগিতা - সংঘাত - এর মধ্য দিয়ে স্তরায়িত ও সম্পর্কিত হয়ে গিয়েছিল । কিন্তু উন্মাদ আইন ক্ষেত্রে তা হয় নি , বরং ব্রিটিশ অনুসৃত এই উন্মাদ আইন পুরোপুরি এদেশীয় সমাজে পূর্ববর্তী শাসন ব্যবস্থার বিপরিতে ছিল । এ কারণে শুধুমাত্র নাকচ কিংবা গ্রহণ এই কাঠামোকে অতিক্রম করে নানাভাবে

---

[206] বেহেরে প্রকাশ বি, রাথোড অনুপম ভি, বেহেরে অনিরুদ্ধ, পি, অ্যা জার্নি ফ্রম ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট ১৯১২ টু ইন্ডিয়ান মেন্টাল হেলথ অ্যাক্ট ১৯৮৭ অ্যান্ড ড্রাফট আমেন্ডমেন্ট, ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ ফরেনসিক মেডিসিন অ্যান্ড প্যাথলজি, ভলিউম- ৩,নং- ৪, অক্টোবর– ডিসেম্বর ২০১০,

[207] ডেভেলপমেন্ট ইন সাইকিয়াট্রি ইন ইন্ডিয়া; ক্লিনিক্যাল, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি পারস্পেক্টিভস এডিটেড বাই সবিতা মালহোত্রা, শুভ চক্রবর্তী, স্প্রিংগার পাবলিকেশন, পৃ- ৬১২।

ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্তরে উন্মাদ আইনের ইতিহাসকে খোঁজার চেষ্টা আজ উন্মাদনার ইতিহাসে ধীরে ধীরে প্রাধান্য লাভ করছে। এর মাঝে সামাজিক রাজনৈতিক - অর্থনৈতিক অনুষঙ্গ যেমন আছে , তেমনি ভাষা , শব্দ বিশেষ ভূমিকাকে বোঝার অনুষঙ্গগুলোও আছে, কারণ পাগলের ক্ষেত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষা ও আইনের পরিভাষা একটু অন্যরকম।

বর্তমান সময়ে উন্মাদ আইন কে নতুন করে বোঝা উন্মাদনার ইতিহাসচর্চার অন্যতম বিষয় হয়ে উঠছে। বাংলার পাগল ইতিহাস চর্চায় উন্মাদ আইনের ইতিহাস স্বরূপ যে ভাবে বঝার চেষ্টা করেছি তা পূর্ববর্তী ইতিহাসের বোধের ধরনের সঙ্গে ( উপনিবেশিক , উত্তর - উপনিবেশিক ও আধুনিক শিক্ষার আলাকে নির্মিত এবং যাদের হাতে প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র রচিত হয়েছে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী) কখনো একরকমের হবে না । এমনকি প্রাক-ব্রিটিশ ও ব্রিটিশ উত্তর ভারতে ইতিহাসের বোধ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ছিল । বাঙালির কোনো ইতিহাস নেই বলে বঙ্কিমচন্দ্রের খোদ উক্তি সবারই জানা, তাই বাংলার ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে পাগল আইন নিয়ে এই চর্চা । ইতিহাস মানে যে একটি সময়রেখা ( সরলরৈখিক ) বরাবর বিভিন্ন ঘটনার সংঘটনকে বুঝে নেওয়া সেটা আমাদের বোধিতে প্রথিত হয়েছে, উপনিবেশিক আধুনিকতার সূচনালগ্ন থেকে । বর্তমান কালের এর সর্বব্যাপী ধারণা পৃথিবীর ইতিহাসের নতুন নির্মাণ সম্ভব করেছে । এই সমসত্ত্ব শূন্য সময় জাতীয়তাবাদের জনকও বটে ।

ইউরোপীয় উত্তরাধিকার থেকে পাওয়া জ্ঞানের পরিচিত ধরনের সাথে ভারতীয় চিন্তার এই দুস্তর ব্যবধানের বিষয়টি উন্মাদ আইনের ক্ষেত্রে একেবারেই অনুধাবন করতে পারেন নি । যে বিস্তৃতএবং পান্ডিত্যপূর্ণ শাস্ত্রগুলিকে অনুসরণ করে ভারতবর্ষের সনাতনী চিকিৎসাভাবনা এবং পদ্ধতিগুলি গড়ে উঠেছে সেগুলি সম্পর্কে ঔপনিবেশিক একেবারেই অজ্ঞ ছিলেন। ভারতবর্ষের দেশজ আইন শাস্ত্র ও সমাজ কে পুরোপুরি বোধগম্য জন্য যে সময় ব্যয় করা দরকার ছিল তা তারা করেননি।

ঔপনিবেশিক উন্মাদ আইনের সঙ্গে অভিযোজিত হয়ে এদেশে পাগলরা আবার ১৮৫৮ থেকে ১৯১২খ্রীঃ পর্যন্ত সময়ে ঘটনা পরম্পরায় কিভাবে বিবর্তিত হয়েছিল তা পাগলও পাগলাগারদের

ইতিহাসে এশটি গুরুত্বপূর্ণ, এবং বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি কে অনুসরন করে তুলনামূলক ভাবে এই ইতিহাসের মুখ্য পর্যালোচনা, কারণ ঔপনিবেশিক শাসনের মূল কেন্দ্র ছিল কোলকাতা এবং যাবতীয় শাসন কার্যকলাপ মূলত পরিচালিত হতো এই কলকাতা কে কেন্দ্র করে , সেক্ষেত্রে বাংলা প্রেসিডেন্সি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় এই আইন গুলির প্রভাব ও ফলপ্রসূ হওয়ার তীব্রতা অনেক বেশী হওয়া স্বাবাভিক ও যুক্তিযুক্ত। আবার বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি তে উন্মাদ আশ্রমের সংখ্যা ছিল বেশী। সেই দিক থেকে বিবেচনা করে বলা যায় বাংলার সমাজ জীবনে এই আইন গুলির প্রভাব ছিল যথেষ্ট ।

## উপসংহার

বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসন ও উন্মাদ আইনের বিবর্তনের চিত্র আনুধাবন করার মাধ্যমে উন্মাদ আইনে মূল বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্ন ধারা , উপধারাগুলিও ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ।, কিভাবে ও কেন আইন গুলি বারংবার সংশোধন করা হয়েছিল সেগুলি সুক্ষ দৃষ্টিতে অনুধাবনের বিষয় হয়ে উঠেছে । সর্বোপরি এই আইন গুলিতে কিভাবে পাগলদের জন্য আইনী অধিকার রক্ষা , উন্মাদ আশ্রমের রিসেপশানের জন্য আদেশ এবং শংসাপত্র, পরিদর্শকের দ্বারা মাসিক পরীক্ষণ, পাগলের ব্যয় ভার ও খরচ পরিশোধের জন্য নির্দেশ, অ্যাসাইলেম থেকে মুক্তির আদেশ, পাগল ব্যাক্তির যথাযথ চকিৎসার, আত্মীয় কর্তৃক দায়িত্ব নেওয়ার আদেশ, মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তিদের এক অ্যাসাইলেম থেকে অন্য অ্যাসাইলেমে স্থানান্তর, সর্বোপরি মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যাক্তির দখলে থাকা সম্পত্তির দেখভাল ও অধিকার ইত্যাদি বিষয়গুলি সামাজিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ।

পরিশেষে বলা যায় যে, ঔপনিবেশিক উন্মাদ আইনিগুলি নৈতিক চিকিৎসা হিসাবে পাগলের সুযোগ সুবিধা দিয়েছিল ঠিকই কিন্তু আশ্রমের অভ্যন্তরে নিপীড়ন এবং দমনকারী হিসাবে কাজ করেছিল। আবার এই আইন পাগল কে শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন দিয়েছিল কিন্তু উন্মাদ আশ্রমের সৃষ্টি উদার মানবতার মনোভাবের অন্তরালে পাগলের উপর যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থা ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে শাসক কুলের আধিপত্য ও প্রভুত্ব মূলক মনোভাব কাজ করেছিল। ঔপনিবেশিক

বাংলায় পাগল আইন তৈরির আগে পাগলরা আসলে আরও ভাল ছিল। কারণ পাগলরা তাদের ইচ্ছে মতো চলতে পারত কিন্তু কিন্তু ঔপনিবেশিক অনুশাসন তাদের এক কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ করেছিল এবং পাগলের কণ্ঠস্বর এখন আইনি পরিকাঠামোর মধ্য দিয়ে পরিচালিত হতে শুরু করে , পাগলকে মুক্তি দেওয়ার নামে এই বৈধ ব্যবস্থা পাগলের জন্য আরও বেশি শক্তিশালী 'নৈতিক কারাবাস' জন্ম দিয়েছিল।

# পঞ্চম অধ্যায়

# ঔপনিবেশিক বাংলায় উন্মাদ রোগের চিকিৎসা

# (১৮০০-১৯৪৭)

পৃথিবীর সবদেশের ইতিহাসের মধ্যেই পাগল চিকিৎসার উল্লেখযোগ্য বর্ণনা পাওয়া যায়। তখনকার দিনে এই ধরনের আচরণের সুচিকিৎসা দূরের কথা, সেগুলির যথার্থ ব্যাখ্যাও মানুষের জানা ছিল না। ফলে পাগলদের অস্বাভাবিক আচরণ কে ঘিরে মানুষের মনে তৈরি হয়েছিল কুসংস্কারপূর্ণ ধারণা, অন্ধবিশ্বাস ও বিকৃত ব্যাখা। বহুক্ষেত্রেই এগুলিকে শয়তান বা অপদেবতার প্রভাব থেকে উদ্ভুত ঘটনা বলে মনে করা হত, কখনো কখনো অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপ, শান্তি-স্বস্তায়ন, দেবতার সন্তুষ্টির আয়োজন এবং অমানুষিক চিকিৎসা পদ্ধতির দ্বারা এগুলি দূর করার চেষ্টা করা হত। তেমনি বঙ্গদেশেও পাগল চিকিৎসার ক্ষেত্রেও এর কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। আলোচ্য অধ্যায়ের মূল বিষয় হল , উনিশ শতক থেকে বিংশ শতকের প্রথম অর্ধ পর্যন্ত সময়ে ঔপনিবেশিক বাংলায় পাগল চিকিৎসা কিভাবে করা হতো তা আলোকপাত করা। এক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক বাংলার মানসিক রোগ চিকিৎসার ইতিহাস আলোচনা করার পূর্বে বিশ্ব প্রেক্ষাপটে তথা পশ্চিমী সমাজের মনোচিকিৎসার সঙ্গে ভারতীয় সমাজের উন্মাদ চিকিৎসার যে মেলবন্ধন কিভাবে শুরু হয়েছিল তার ইতিহাস আলোচনা করা অবশ্যই প্রয়োজন , কারন পশ্চিমী মনোচিকিৎসার সঙ্গে ঔপনিবেশিক বাংলার পাগল চিকিৎসার একটি মেলবন্ধন আছে। পশ্চিমী মনোচিকিৎসার ধারা ঔপনিবেশিক শাসকের হাত ধরে এদেশে এসেছিল কিন্তু পশ্চিমী পদ্ধতিতে মানসিক রোগ চিকিৎসা ছাড়াও দেশীয় পদ্ধতিতে উন্মাদ রোগ চিকিৎসার একটি ধারা ( আয়ুর্বেদ পদ্ধতি )প্রচলিত ছিল , ফলে উন্মাদ রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে দেশীয় পদ্ধতি ও পশ্চিম চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব চলেছিল ।

উনবিংশ শতকে বাংলার লুনাটিক অ্যাসাইলাম নামক প্রতিষ্ঠান গুলি ছিল পাগলদের আস্তানা, বা পাগলদের ডাই। উনবিংশ শতকে এই ধরনের বাধন ও আটক পদ্ধতির বদলে মানবিক, যুক্তিবাদী এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা হতে সময় লেগেছিল প্রায় একশো বছর।

পাগলাগারদগুলি রূপান্তরিত হয়েছিল মানসিক হাসপাতালে এবং সর্বোপরি সাইকিয়াট্রিক নামে চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি মূল শাখা উদ্ভব হয়েছিল। অতঃপর পাগল নিয়ন্ত্রণের পক্রিয়া সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল । শিঁকল আর লোহার বেড়ী পড়িয়ে নিয়ন্ত্রণ নয় , বরং পাগলদের প্রতি সহনশীল পদক্ষেপ নিয়ে চিকিৎসা শুরু হয়ছিল।

মনশ্চিকিৎসার ইতিহাসে দেখা যায় যে, কীভাবে উনিশ শতকের প্রথন পর্ব থেকে ভয়ানক সব পদ্ধতির মধ্য দিয়ে একটি আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক সম্মত মনোশ্চিকিৎসার জন্ম হয়েছিল । দেখা যায় যে, উনিশ শতক থেকে বিংশ শতকের প্রথম দশক অবধি বীভৎস অবস্থার মধ্যে একের পর এক পরিক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে পাগলদের জীবন কে অতিবাহিত করতে হয়েছিল , এমনকি চিকিৎসার নামে উন্মাদ আশ্রমে পাগলদের কে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখার রেওয়াজ চালু ছিল। প্রথম দিকে মনে করা হতো মানসিক রোগ সারানো যায় না এবং আরও একটি ধারণা যে মানসিক রোগীদের বাহ্যিক আচরণ তাদের ভিতরের দুর্বলতা ও ভিত্তিহীনতার বহিঃপ্রকাশ।

একশো বছর পূর্বে ঔপনিবেশিক বাংলার বিভিন্ন উন্মাদ আশ্রমের নথিপত্রে দেখা যায় যে পাগলদের প্রতি চিকিৎসাব্যবস্থার নামে বিভিন্ন রকমের অবজ্ঞা ও বর্বর আচরণ করা হত , আবার দেখছি পাগলামির কারণ ও চরিত্র সম্বন্ধে ভুল ও ধোঁয়াটে ধারণা। মানসিক রোগে আক্রান্তদের প্রতি সংবেদনহীন , খাপছাড়া , মনকি ক্ষতিকর সব চিকিৎসাপদ্ধতি যা তাদের অবস্থাকে আরও দুর্বিষহ করে তুলেছিল। বাংলায় উন্মাদআশ্রম বা অ্যাসাইলাম গড়ে তোলার বিষয়টি ঔপনিবেশিক সরকারের সঠিক পদক্ষেপ ছিল ঠিক-ই এবং মনশ্চিকিৎসার পেশাকে একটি সঠিক দিকে পরিচালিত করলেও চিকিৎসার নামে শাসন ক্ষমতা কায়েম করার বিষয়টিও কখনই আড়াল করা যায় না ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে , ফ্রানস ফ্যানন এর ডি-কলোনাইজিং ম্যাডনেস ও অ্যান্ড্রু স্কাল এর ম্যাডনেস ইন সিভিলাইজেশন এর ভাষ্য আগমনের পর একবিংশ শতকে পাগলাগারদ ও পাগলামির ইতিহাসচর্চা পালটে গিয়েছে। ইতিপূর্বে বিভিন্ন গবেষণা কর্মগুলি ছিল একধরনের বিবর্তনবাদী ইতিহাস , যা শুধুই বর্ণনা করে গেছে অ্যাসাইলাম চর্চাকে সংগঠিত করা ও তার প্রাতিষ্ঠানিক গল্প ,কিন্তু পরবর্তীকালে যা সাইক্রিয়াটির ডিসিপ্লিন হিসাবে কিভাবে বিকশিত হয়েছিল তা আলোচনায় একান্ত উপজীব্য বিষয় , অর্থাৎ কীভাবে আমরা পাগল সম্পর্কে ভৌতিক ধারনা ( ভূত, বা

প্রেত / এভিল থট) থেকে সাম্প্রতিক মানসিক স্বাস্থ্যের ধারণায় এসে পৌছেছি এক প্রগতির পথ বেয়ে ।ফ্রানস ফ্যানন ও অ্যান্ড্রু স্কাল এই ধরনের ঐতিহাসিক আখ্যানের প্রতি গুরুতর প্রশ্নই তোলেননি , বরং এমন কতগুলি সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছিলেন যার প্রভাবে আজ মানসিক হাসপাতাল ও সাইক্রিয়াটির ইতিহাস রচনায় অনেক নতুন প্রশ্ন উঠে এসেছে।

সাম্প্রতিক বিশ্ব পেক্ষাপটে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাগলামি ও পাগল চিকিৎসার ইতিহাস নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা হয়েছে। তেমনি দক্ষিণপূর্ব এশিয়া তথা ভারতীয় উপমহাদেশেও পাগলামির ইতিহাস ভারতীয় ও অভারতীয় ঐতিহাসিকরাও করেছেন, নতুন নতুন চিন্তা ভাবনার পেক্ষিতে পাগল চিকিৎসার ইতিহাসকে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোকপাত করেছেন। বিদেশের বিভিন্ন গবেষণা কর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আন্ড্রু স্কাল এর ; ম্যাডনেস ইন সিভিলাইজেশনঃ অ্যা কালচারাল হিস্ট্রি অফ ইন্সানিটি, ম্যাডনেসঃ অ্যা ভেরি শর্ট ইন্ট্রোডাকশন, (Madness : A very short introduction) ও ordermental disorder, নাইজেল গিবসন সম্পাদিত একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ডি কলোনাইজিংঃ দ্য সাইক্রিয়াট্রি রাইটিং অফ ফ্রানস ফ্যানন (Decolonizing Madness, The Psychiatric Writings of Frantz Fanon, Palgrave Macmillan, ২০১৯ ) , আবার ড্যারিয়ান লিডার এর হোয়াট ইস ম্যাডনেস? (What is Madness?), রয় পোটার এর ম্যাডনেসঃ অ্যা ব্রিফ হিস্ট্রি (Madness: A brief history, Routledge, London), পেট্টিরি পিয়েটিকাইনেন এর ম্যাডনেসঃ অ্যা হিস্ট্রি (Madness : A History) , এবং টমাস স্টিফেন শাজজ এর ইনসানিটিঃ দ্য আইডিয়া অ্যান্ড ইডিয়ট কন্সিকয়েন্স (Isanity: the idea and idiots Consequences) ইত্যাদি গ্রন্থ গুলি বর্তমান পাগলামি চর্চার ইতিহাস কে একটি নুতুন মাত্রা দিয়েছে। এমনটা নয় যে বর্তমানে পাগলামির ইতিহাসচর্চায় বিবর্তনবাদী , দৃষ্টবাদী এবং সংকোচনবাদী ( রিডাকশনিস্ট ) ইতিহাসচর্চা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে কিংবা পূর্বে যারা পাগলামির ইতিহাস লিখছেন তাদের গবেষণা কর্ম গুলি যে কম গুরুত্বপূর্ণ তেমন নয় , কিন্তু এটাও সত্য ফ্রানস ফ্যানন ও অ্যান্ড্রু স্কাল গবেষণা কর্মের ফলে ফুকোর কাজের যে প্রভাব অনেকটা কমে গেছে এবং পাগলামি ইতিহাসচর্চার ওপর একটি নতুন প্রভাব পড়েছে, তা হল ফ্যানন ও স্কাল এর চিন্তা ভাবনার পর পাগলদের ইতিহাসে একধরনের ছেদ বা ব্রেক সৃষ্টি করেছে পরবর্তী গবেষকদের কাছে। যে ধরনের প্রশ্নগুলি ঘিরে মনোচিকিৎসার

ইতিহাসগুলি নির্মিত হয়েছে তা কোন এক 'সত্য'কে বাস্তবসম্মত এবং প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপিত করার জন্য পাগলামি ইতিহাসচর্চার সাবেকি পদ্ধতিকেই প্রশ্ন করেছে [1]।

## গবেষণার ক্ষেত্র পরিসর

বাংলার সমাজ জীবনের চিকিৎসা ব্যবস্থার বিভিন্ন আঙ্গিক নিয়ে কয়েকটি কাজ খুবই উল্লেখযোগ্য, যে গুলি হল সুব্রত পাহারীর " উনিশ শতকের বাংলার সনাতনী চিকিৎসা ব্যবস্থার সরূপ " (২০০৩), বিনয় ভূষণ রায়- এর " চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস" (২০০৫), সাম্প্রিতিক সুজাতা মুখার্জি "জেন্ডার মেডিসিন এন্ড সোসাইটি ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া" (২০১৭) উক্ত গবেষণা মূলক গ্রন্থে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতীয় চিকিৎসা ও ঔপনিবেশিক চিকিৎসা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে। কিন্তু পাগল চিকিৎসার ইতিহাস সম্পর্কে কোনরূপ আলোচনা নেই বললেই চলে। যদিও দেবযানী দাস এর হাউজেস অফ ম্যাডনেস  তার গবেষণা কর্মে উনিশ শতকে আশ্রমিক পাগল চিকিৎসা সম্পর্কে স্বল্প পরিসরে বিশ্লেষণ করেছেন। আবার বিদেশী ঐতিহাসিক দের মধ্যে ওয়াল্ট্রড আরনস্ট, সারাহ পিন্টো  কিংবা দেবোরা ফুলে  এর  প্রমুখ তাদের ভারতীয় উন্মাদ আশ্রম বিষয়ক গবেষণায় আশ্রমের বিষয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করেছেন।

এতদ সত্ত্বেও ঔপনিবেশিক বাংলার পাগল চিকিৎসার ইতিহাসে কোথাও একটা অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে । শুধুমাত্র ড. দাস এর হাউসেস অফ ম্যাডনেস : ইনস্যানিটি এন্ড অ্যাসাইলাম অফ বেঙ্গল ইন নাইন্টিথ সেঞ্চুরি ইন্ডিয়া (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সটি প্রেস, ২০১৫) নামক শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থে তিনি উনিশ শতকে উন্মাদ আশ্রমের পাগল চিকিৎসা ক্ষেত্রে  মোরাল থেরাপি , মেডিক্যাল ট্রিটমেন্ট, বাথ-থেরাফি , অকুপেশানল থেরাফি , শিক্ষা ও খেলাধুলা মাধ্যমে চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে স্বল্প পরিসরে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু বাংলায় পাগলের চিকিৎসার যে সার্বিক চিত্র তা শুধুমাত্র উক্ত কয়েকটি চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না , অর্থাৎ উন্মাদ রোগ চিকিৎসার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ড. দাস এর গবেষণায় অপূর্ণ থেকে গেছে। সেগুলি হল উন্মাদ রোগ চিকিৎসার দেশীয় ধারা তথা আয়ুর্বেদ পদ্ধতিতে উন্মাদ চিকিৎসার ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণার একটি সুবিশাল

---

[1] বসু, আমিত রঞ্জন, *পাগলামি বিষয়ক নতুন জ্ঞান* , জয়ন্ত ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), ভারতের পটভুমিতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস – সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা  -- কোলকাতা , অববাস মার্চ ২০০৯ পৃষ্ঠা – ২০৩

ক্ষেত্র পরিসর আছে। আবার উন্মাদ রোগ নিরাময়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কেমন ছিল সেটিও অনালোচিত। সর্বোপরি কিভাবে উনিশ শতকের পরবর্তী কালে বিশেষ করে বিংশ শতকের প্রথম অর্ধকালীন সময় পর্যন্ত পাগল চিকিৎসার ক্ষেত্রে কি কি পরিবর্তন এসেছিল সেগুলি আলোকপাত করা প্রয়োজন। বাংলায় উনিশ শতকে উন্মাদ আশমের যাত্রা পথের মধ্য দিয়ে বিংশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে পাগল চিকিৎসার পদ্ধতি ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে চালিত হয়েছিল অর্থাৎ এই পর্যায়ে পাগলামি চিকিৎসার ক্রমবিকাশ লাভ করেছিল । অর্থাৎ উনিশ শতকে বাংলায় উন্মাদ আশ্রমের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যে যাত্রাপথ হয়েছিল তার পরিপূর্ণতা বিকশিত হয়েছিল বিংশ শতকের প্রথম অর্ধ-কালীন সময়ে। এক কথায় উন্মাদ আশ্রম থেকে মানসিক হাসপাতালে যে উত্তরণের মাধ্যমে মনোচিকিৎসায় আমূল পরিবর্তন এসেছিল। এই উত্তরণের পর্ব টি ঔপনিবেশিক বাংলার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র, কিন্তু এই বিষয়টি নিয়ে আজ অবধি কোন পূর্ণাঙ্গ কোন গবেষণা হয়নি। তাই উক্ত বিষয়গুলি আলোচ্য গবেষণায় ইতিহাসের প্রেক্ষিতে আলোকপাত করার চেষ্টা করবো।

## অনুসন্ধান মূলক প্রশ্ন

আলোচ্য অধ্যায়ে গবেষণার মূল বিষয় হল ঔপনিবেশিক অধ্যায়ে ১৯০০-১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে বাংলার সমাজে পাগলদের কিভাবে চিকিৎসা করা হতো , তা ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করা । এছাড়াও বাংলা প্রেসিডেন্সীতে পাগল চিকিৎসার ক্ষেত্রে কি কি পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তা অনুসন্ধান করা । বিশেষ করে আলোচ্য অধ্যায়ে যে গবেষণা মূলক প্রশ্নগুলি পর্যায়ক্রমে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি সে গুলি হল - ঔপনিবেশিক বাংলায় উন্মাদ আশ্রমে কিভাবে পাগলদের চিকিৎসা করা হত ? এবং পাগলাগারদের চিকিৎসার প্রকৃতি কি ছিল ? দেশীয় পদ্ধতি তথা আয়ুর্বেদিক পদ্ধতিতে পাগল কে কতরকম ভাবে চিকিৎসা করা হত তার ইতিহাস অনুসন্ধান।

ঔপনিবেশিক বাংলায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাবিদ্যায় উন্মাদপীড়া কেমন ভাবে দেখা হতো এবং হোমিওপ্যাথি পদ্ধতিতে উন্মাদরোগের চিকিৎসা পদ্ধতি স্বরূপ কি ছিল ? পাগল চিকিৎসা হাইড্রোপ্যাথি পদ্ধতি কি? সম্মোহন পদ্ধতিতে কিভাবে পাগলদের চিকিৎসা করা হত।

বিংশ শতকে পাগল চিকিৎসার প্রকৃতি কি ছিল  অর্থাৎ উন্মাদ চিকিৎসা পদ্ধতিতে কি কি পরিবর্তন এসেছিল। সর্বোপরি পাগল চিকিৎসা ক্ষেত্রে দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতি ও পশ্চিমী চিকিৎসার মধ্যে আসল দ্বন্দ্বের কারন কি ছিল ?

আমরা যারা আজ ভারতীয় পাগল চিকিৎসার ইতিহাস ও স্বরূপ বুঝতে চেষ্টা করছি, তাদের ইতিহাসের বোধের ধরন  উপনিবেশিক , উত্তর - উপনিবেশিক ও আধুনিক শিক্ষার আলোকে নির্মিত হয়েছে  এবং কিন্তু যাদের হাতে উন্মাদ চিকিৎসাশাস্ত্র রচিত হয়েছে সেই দৃষ্টিভঙ্গীর কখনো একরকমের হবে না । এমনকি প্রাক-ব্রিটিশ ও ব্রিটিশ- পরবর্তী ভারতে ইতিহাসের বোধ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ছিল । ইতিহাস মানে যে একটি সময়রেখা ( সরলরৈখিক ) বরাবর বিভিন্ন ঘটনার সংঘটনকে বুঝে নেওয়া, সেটা আমাদের বোধিতে প্রোথিত হয়েছে ঔপনিবেশিক আধুনিকতার সূচনালগ্ন থেকে। স্মরণে রাখা দরকার, উনবিংশ শতকের শেষদিক থেকে এদেশে জাতীয়তাবাদের ধারণা জন্মলাভ করতে শুরু করে । একটু অন্যভাবে বললে , চরক বা সুশ্রুত - সংহিতায় যেভাবে চিকিৎসাবিদ্যাকে আহরণ করার কথা বলা আছে তা সময়ের এই পশ্চিমী চিকিৎসার  ধারণার সঙ্গে খাপ খায় না । এজন্য টি.এ.ওয়াইজ থেকে হেনরি জিমার পর্যন্ত সবার লেখাতেই ভারতীয় চিকিৎসার ইতিবৃত্ত প্রকৃতপক্ষে কেবল একটি প্রাচীন সভ্য জাতির *repository of knowledge* হয়েছে , দেশীয় পদ্ধতিতে উন্মাদরোগ চিকিৎসার ইতিহাসকে বোঝার একটি ধরন হতে পারে , যদিও ইতিহাস বলতে কেবলমাত্র রেনেসাঁ -উত্তর ঐতিহাসিক চেতনার পুনর্নির্মিত কাঠামো ও বৌদ্ধিক হাতিয়ার না বোঝায়। উপনিবেশ যুগ পরবর্তী সময়ে ইতিহাস-বোধের যে আড়াআড়ি ও খাড়াখাড়ি বিভাজন হল তাতে আধুনিক বিজ্ঞানের চেতনার প্রসার,সার্বজনীন শিক্ষার প্রধান মাধ্যম হিসেবে নতুন বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সৃষ্টি করা ও ইউরোপে অনুসৃত পদ্ধতি অনুসারে প্রাচীন ধ্রুপদী সংস্কৃত বা ইংরেজি দুটোকেই পরিহার করে স্থানীয় ভাষায় নতুনভাবে প্রয়োজনীয় ধারনা তৈরি করে নেওয়াড় এসবকিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে শুরু করল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সার্জন পিটার ব্রেটন ১৮২৫ সালে মেডিসিনের ক্ষেত্রে অনুবাদের সমস্যার সমাধান করবার জন্য গ্রন্থ লিখলেন, এর ১৪ বছর পরে  ১৮৩৯ - এ প্রকাশিত দ্য ওরিয়েন্টাল হেরাল্ড অ্যান্ড কলোনিয়াল ইনটেলিজেন্সার মেডিসিনের  মাধ্যমে ভারতে চিকিৎসা ব্যবস্থার অনুবাদের সঙ্গে পশ্চিমের চিকিৎসার সামঞ্জস্য করা হয়েছিল। ডেভিড আর্নল্ড যাকে

এনক্লেভ মেডিসিন থেকে পাবলিক হেলথ - এ যাত্রা বলেছেন , একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবলে, একে ভারতের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ধরনে বেডসাইড মেডিসিন থেকে হসপিটাল মেডিসিনে যাত্রা বলেও ভাবতে পারি হয়তো সেটা আরও বেশি সঙ্গতিপূর্ণ। চার্লস লাশিংটনের দ্য হিস্টরি ডিজাইন অ্যান্ড প্রেজেন্ট স্টেট অব দ্য রিলিজিয়াস , বেনেভোলেন্ট অ্যান্ড চ্যারিটেবল ইনস্টিটিউশনস ফাউন্ডেড বাই দ্য ব্রিটিশ ইন ইন্ডিয়া (কলিকাতা : হিন্দুস্থানি প্রেস , ১৮২৪ ) গ্রন্থে দেখতে পায় কীভাবে উনিশ শতকের সূচনায় আয়ুর্বেদীয় বা ইউনানি চিকিৎসকদের মতো রোগীকে ঘরের পরিবেশে রেখে আরোগ্য সম্ভবনা - নির্ভর চিকিৎসার পরিবর্তে বিচ্ছিন্ন , উন্মুক্ত হাসপাতালের পরিবেশে রোগীর দেহের ওপর পরীক্ষানিরীক্ষা ও কিউরেটিভ চিকিৎসা শুরু হল। এটা শুধুই এনক্লেভ মেডিসিনের দরজা খুলে উপনিবেশের প্রয়োজন জনস্বাস্থ্যের দিকে যাত্রা নয় , এর মাঝে রয়েছে মনোচিকিৎসার গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ।

১৭৬৪ সালেই বেঙ্গল মেডিক্যাল সার্ভিস ( ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস - এর পূর্বসূরী ) তৈরি হয়। উদ্দেশ্য ছিল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যদের এবং কর্মচারীদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান[2] । ঔপনিবেশিক সময়ের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এ প্রসঙ্গগুলো জরুরি হয়ে ওঠে। কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ ইংল্যান্ডের বাইরে প্রথম লন্ডন ইউনিভার্সিটি স্বীকৃত কলেজ হলেও এবং সে কলেজ থেকে প্রামাণ্য ডিগ্রি নিয়ে ডাক্তারি পাশ করলেও চাকরি এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রকট পার্থক্য অনুসন্ধানের যোগ্য বিষয় হয়ে ওঠে বইকি, তা আরেকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে । উনবিংশ শতক জুড়ে রোগ ও চিকিৎসা সম্পর্কে যেসব শব্দবন্ধের ব্যবহার হয়েছে তার একটা বড় অংশই ছিল।

পাগল চিকিৎসার ক্ষেত্রে ভারতীয় দেশীয় চিকিৎসার অবস্থান ও আধুনিক পশ্চিমী মেডিসিনের সাথে সম্পর্ক ও টানাপোড়েন বিষয় টি গুরুত্বপূর্ণ । ব্রিটিশের হাত ধরে পশ্চিমী তথা আধুনিক মেডিসিনের আগমনের পরে ভারতীয় আয়ুর্বেদে চিকিৎসার গুরুত্ব অনেকটা প্রকট হতে শুরু করেছিল। ত্রিদোষ তত্ত্বভিত্তিক রোগ অনুধাবনের পরিবর্তে অঙ্গ-সংস্থান নির্ভর চিকিৎসা প্রাধান্যকারী অবস্থান গ্রহণ করতে থাকল [3]। কিন্তু লক্ষ করার বিষয় , বিংশ শতাব্দীর শুরুতেও

---

[2] ইম্পেরিয়াল গেজেটিয়ার অব ইন্ডিয়া , ৪ র্থ খণ্ড , পৃ . ৪৫৯

[3] ইম্পেরিয়াল গেজেটিয়ার অব ইন্ডিয়া , ৪ র্থ খণ্ড , পৃ . ৪৩৮

আধুনিক চিকিৎসার ব্যাখ্যায় আয়ুর্বেদের অভ্যন্তরে দুটি উপাদানের ঘাটতি ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত আয়ুর্বেদ বিশারদদের কাছে প্রধান পীড়ার কারণ হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। প্রথম, সভ্যতার ক্রমোচ্চ ধাপ সম্পর্কে ( যার সর্বোচ্চ ধাপে রয়েছে ব্রিটিশ তথা ইউরোপীয়রা) স্থির বিশ্বাস জন্মানোর ফলে আয়ুর্বেদে শব্দের বিশেষ প্রেক্ষিত নির্ভর যে শব্দার্থ আছে তাকে প্রেক্ষিতমুক্ত করে সার্বজনীন সাধারণ অর্থে পর্যবসিত করা এবং দ্বিতীয় , অ্যানাটমি- শিক্ষা ও এর ফলশ্রুতিতে শল্যচিকিৎসার ক্ষেত্রে আধুনিক মেডিসিনের যে চমকপ্রদ সাফল্য তার আধিপত্য কে ' আয়ুর্বেদের কাল্পনিক অ্যানাটমির জ্ঞানকে আধুনিক করে তোলা।

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান আগমনের মধ্য দিয়েই বাংলা তথা ভারতে পেশা হিসেবে চিকিৎসাবিদ্যার নতুন জন্ম হয়, কী আধুনিক চিকিৎসক কী আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক , উভয়ের ক্ষেত্রেই । এ নিয়ে এখনও বাংলা ভাষায় কোনো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়নি । ভারতে দেশজ চিকিৎসা ও আধুনিক চিকিৎসার মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে যেমন বহু স্তরায়িত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলেছে ও আধুনিক চিকিৎসার অভ্যন্তরেও চলেছে অসংখ্য টানাপোড়েন। তেমনি এদেশে উন্মাদ রোগ চিকিৎসায় বহুমাত্রিক , বহুস্বরীয় , বহুধাবিভক্ত চিকিৎসা ভাবনার জ্ঞান ও পাগল চিকিৎসার বিকাশ কীভাবে ঘটছে তা আলোচনা করা অবশ্যই প্রয়োজন ।

## পাগল সম্পর্কে ধারনা ও চিকিৎসা

সুপ্রাচীন কালে মানুষ শারীরিক অসুখ আর মানসিক অসুখের মধ্যে কোন পার্থক্য জানত না। তখন মনে করা হতো এক অশরীরী শক্তি বা কোন ভৌতিক শক্তি দ্বারা এটি সৃষ্টি হয়। তখনকার দিনে পাগলামি কে শয়তানের (ভূত, প্রেত কিংবা জীন ) শক্তির কাজ বলে মনে করা হত। অতিপ্রাকৃতিক শক্তি দুরকম ছিল ভাল এবং মন্দ ( অনেকটা ফেরেশতা ও শয়তানের মত )। ভাল শক্তি কে বলা হত ঈশ্বরের দান হিসেবে আর মন্দ শক্তিকে বলা হত " ডেমন " বা " শয়তান”( প্রেত বা ভূত)। মানুষ যখন প্রকিতির নিয়ম লজ্ঘন করত তখন ঈশ্বর তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য ভূতকে পাঠাতেন অভিশাপ হিসেবে। এসব বিশ্বাসকে বলা হয় ডেমনোলজি বা প্রেততত্ত্ব। ক্রমশঃ প্রেততত্ত্ব শাররিক ব্যাধির চেয়ে মানসিক ব্যাধির সঙ্গে বেশি অনুষঙ্গাবদ্ধ হয়ে পড়ে , অর্থাৎ লোকেরা ভূত-প্রেতকে মানসিক ব্যাধির জন্য বেশি দায়ী করত । কিন্তু শারীরিক ব্যাধির জন্য

ভূত - প্রেতকে এতটা দায়ী করতো না। যে শারীরিক ব্যাধিতে ভুগতো তার চেতনা বা মস্তিষ্ক ঠিক আছে বলে সে চিকিৎসকের কাছে সাহায্য চাইতে পারে । প্রাক আধুনিক সমাজে মানসিক ভাবে ব্যাধিগ্রস্থদের ও ভয়ের চোখ দেখা হত [4] । প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন অন্যান্য পুস্তকাদি থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে , সেই যুগে মানসিক ব্যাধির জন্য প্রেত প্রেতাত্মা দায়ী করা হতো। প্রস্তর যুগের মানুষের মাথার খুলি থেকে এ ধরনের প্রমাণ পাওয়া গেছে । কিছুকিছু মাথার খুলিতে একটি গোলাকৃতি ছিদ্র পাওয়া গেছে । এতে মনে হয় যে , প্রেতগ্রস্ত মানুষের মাথায় যে প্রেতাত্মা প্রবেশ করেছে সেটি ঐ ছিদ্র দিয়ে তা বের হয়ে যাবে । বিশেষ করে যাদের মাথার খুলিতে বেশি চাপ থাকত তাদের ক্ষেত্রে এরূপ করা হতো। এ ধরনের ঘটনা চিকিৎসা শাস্ত্রে আরও অনেকবার ঘটতে দেখা গেছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে মানসিক ব্যাধির জন্য যে ধরনের ভূত বা প্রেতাত্মাকে দায়ী করা হত , তার চিকিৎসা ও ঠিক করা হতো সেই অনুসারে অথবা ঝাড় -ফুঁক, তন্ত্রমন্ত্র উচ্চারণ করে বা শাস্তি দিয়ে শয়তান তাড়ানো হতো । মধ্যযুগে কঠোর শাস্তির সঙ্গে কিছু মৃদু ব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল । আশ্রিত বা ভূতে পাওয়া ব্যক্তিকে কিছু পবিত্র বস্তু স্পর্শ করতে দেয়া হতো , তাদের কানের কাছে তীব্র শব্দে বাদ্য বাজানো হতো , নাকে দুর্গন্ধ প্রবেশ করানো হতো ( যেমন লঙ্কা পুড়িয়ে ঝাজ দেয়া ) এবং সঙ্গে একজন ওঝা / পুরোহিত শয়তানের চিত্রের উপর লাঠি বা ঝাড়ু দিয়ে আঘাত করতেন । তারা বিশ্বাস যে, এভাবে ভয় দেখান হলে প্রেতাত্মা রোগীর দেহ ছেড়ে পালাবে । এতে কাজ না হলে শুরু হতো কঠিন শাস্তি। যেমন চাবুক মারা , উপবাস করতে বাধ্য করা , অত্যাচার করাড় এমন কি উন্মত্ততার নামে ডাইনিদের পুড়িয়ে মারা হতো ।

সভ্যতার সূচনা থেকেই বহু প্রাচীন পুথিপত্রে উন্মাদ রোগের উল্লেখ দেখা যায়। প্রাচীন গ্রীক এবং ইজিপসীয়ান গ্রন্থ সমূহে, এমন কি ওল্ড টেস্টামেন্টেও এর উল্লেখ আছে। কিন্তু উন্মাদ রোগের কারণ যে মন এই সিদ্ধান্ত এবং এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও চিকিৎসা প্রণালীর উদ্ভাবন আধুনিক

---

[4] নীহার রঞ্জন সরকার ও ডাঃ তনুজা সরকার, অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান মানসিক ব্যাধির লক্ষন কারন ও আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি, জ্ঞান কোষ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১, পৃষ্ঠা- ২৯

কালের [5]। এই ব্যাধির ব্যাখ্যা ও অগ্রগতির পিছনে রয়েছে বহু মনীষীর অমর চিন্তাধারার দান[6]। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে উন্মাদ ব্যাধির উল্লেখ প্রায়ই দেখা যায়। সেই সময়কার কতিপয় বিখ্যাত চিকিৎসক তাদের চিকিৎসায় এই রোগ নিরাময়ের সুখ্যাতি অর্জন করেন । এই সময়কার সুবিখ্যাত চিকিৎসক হিপোক্রেটিস উন্মাদ রোগ কে অলৌকিক কিছু বলে মানতে রাজী ছিলেন না। তিনি এবং প্রসিদ্ধ অঙ্কশাস্ত্রবিদ পিথাগোরাস তাদের লেখায় কোমলতা ও সহানাভূতি পুর্ণ চিকিৎসার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন । তারা বিশ্বাস করতেন,সুস্থ দেহই সুস্থ মনের আধার[7]। এই সমস্ত উন্মাদ রোগীদের চিকিৎসা কল্পে বলকারক খাদ্য,খেলাধুলা ,গানবাজনা, মুক্তবয়ুতে ভ্রমণ, স্নান ইত্যাদি বিধান প্রচলনের চেষ্টা করেন।

উন্মাদ রোগীদের চিকিৎসা সাধারণতঃ ধর্মগুরু পুরোহিতরাই করতেন। কারণ, তাদের বিশ্বাস ছিল উন্মাদরোগ শয়তান বা ডাইনীয় মন্ত্রশক্তির ফল। রোগীদের মধ্যে যারা সৌভাগ্যবান তাদের চিকিৎসা হত পবিত্র জল, গাছগাছড়া , সুগন্ধি ধূপ ইত্যাদিতে। অধিকাংশ পাগল চিকিৎসাতে অর্থাৎ ডাইনীর মন্ত্র কাটাতে চাবুকমারা , শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা প্রভৃতি অমানুষিক অত্যাচার চলত । ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সব মানসিক রোগাক্রান্তদের বেঁধে রাখার রেওয়াজ চালু ছিল। স্ত্রী এবং পুরুষ রোগীদের পৃথক পর্যন্ত রাখা হত না [8] ।

পরবর্তীকালে উন্মাদ রোগের চিকিৎসাক্ষেত্রে মানবিক ধারা শুরু হয়েছিল কিন্তু মানসিক কারণ সম্বন্ধে তখনও পর্যন্ত কেউ সজাগ হয়নি। এই উন্মাদ রোগের কারন অনুসন্ধান, বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা এবং পদ্ধতি তখন বহুদূরে।এরপর পরিবর্তন এল অন্যদিক হতে। রোগীদের চিকিৎসায় চিকিৎসকদের কৌশল , বিচারবুদ্ধি এবং সহানুভূতি সব থেকে বেশী কার্যকর হয়। ফলে

---

[5] টুকে, ড্যানিয়েল হ্যাক; ইন্সেনিটি ইন এন্সিয়েন্ট অ্যান্ড মডার্ন লাইফ : উইথ চেপ্টার অন ইটস প্রিভেনশন, রয়্যাল কলেজ অফ ফিজিশিয়ানস অফ এডিনবার্গ, পাব্লিসার: ম্যাকমিলান, লন্ডন, ১৮৮৭ , পৃ- 24।

[6] প্রিয়াংশুশেখর ভট্টাচার্য , মানসিক চিকিৎসার ক্রমবিকাশের ধারা, চিত্ত পত্রিকা , সম্পাদনা – তরুন চন্দ্র সিংহ , প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা , ১৩৭০ পৃষ্ঠা -৬১

[7] চিকিৎসা সম্মিলনি, চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্রিকা, দ্বিতীয় খণ্ড, ১২৯২ সাল , সম্পাদকঃ শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী, প্রকাশকঃ কলিকাতা, পৃষ্ঠা - ২২।

[8] প্রিয়াংশুশেখর ভট্টাচার্য , মানসিক চিকিৎসার ক্রমবিকাশের ধারা, চিত্ত পত্রিকা , সম্পাদনা – তরুন চন্দ্র সিংহ , প্রথম বর্ষ , প্রথম সংখ্যা , ১৩৭০ পৃষ্ঠা -৬৩

চিকিৎসকেরা সচেতন হয়ে উঠলেন এই সব বিষয়ে। এরই সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার ঔষধের প্রয়োগ এবং প্রথম রক্তমুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হল এই সব রোগের ক্ষেত্রে[9] ।হিপোক্রেটিসকে চিকিতসাবিদ্যার জনক বলা হয় । তিনিই সর্ব প্রথম মনোবিকৃতির গবেষণা ও ব্যাখ্যায় অভিজ্ঞতা ভিত্তিক ( অর্থাৎ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ ) এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি প্রচলন করেন[10] । মানসিক রোগের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি পূর্ব - প্রচলিত ধারণাগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বিষন্নতা বা মেলানকোলিয়া , নিউরোটিক ভৃতি বা অমূলক ভয়, প্রলাপ ইত্যাদিতে আক্রান্ত রোগীদের গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন এবংতাদের লক্ষণাবলী বর্ণনা করেন। তিনি উল্লেখিত প্রত্যেকটি রোগের বিকাশ এবং পরিণতি ( course ) এবং সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে বিবরণ দেন । তিনিই মানসিক ব্যাধির শুরু থেকে পরিণতি বা শেষ পর্যায় পর্যন্ত বিকাশের ধারা লিপিবদ্ধ করার রীতি প্রচলন করেন[11]। মানসিক রোগ সম্পর্কে অতিপ্রাকৃতিক ব্যাখ্যার মূলে তিনি কুঠারাঘাত করেছিলেন।

আবার প্রাচীন ভারতীয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্র মতে - এর মানসিক ব্যাধির কার্যকারণ সম্পর্কিত তত্ত্ব ছিল সহজ। চরক সংহিতা অনুযায়ী , মানসিক ব্যাধি শুধুমাত্র মস্তিক্ষের ক্ষয়, মস্তিস্কে আঘাত বা পিত্ত রসের আধিক্যের জন্য সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে চরক সংহিতায় চার ধরনের পিত্তরসের কথা বলছিলেন, কৃষ্ণ পিত্ত , রক্ত, হলুদ পিত্ত , শ্লেষ্ম এই চারটি রস সৃষ্টি হয়েছে জগতের চারটি পদার্থ থেকে । যেমন কৃষ্ণপিত্তের উপাদান হল মৃত্তিকা , রক্তের উপাদান হল বায়ু , হলুদ পিত্তের উপাদান হল অগ্নি, এবং শ্লেষ্মর উপাদান হল জল। এখন চারটি পিত্তের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেলে এবং যেকোন একটি পিত্তরসের আধিক্য ঘটলে ব্যক্তিত্বের বিভিন্নতা বা মেজাজের পার্থক্য ঘটে। যেমন কৃষ্ণপিত্তের আধিক্যে ব্যক্তি বিষাদগ্রস্থ এবং শোকাচ্ছন্ন হয়। যেকোন একটি উপাদানের

---

[9] প্রিয়াংশুশেখর ভট্টাচার্য , মানসিক চিকিৎসার ক্রমবিকাশের ধারা, চিত্ত পত্রিকা , সম্পাদনা – তরুন চন্দ্র সিংহ , প্রথম বর্ষ , প্রথম সংখ্যা , ১৩৭০ পৃষ্ঠা -৬৩

[10] নীহার রঞ্জন সরকার ও ডাঃ তনুজা সরকার, অস্বাভাবিক মনো বিজ্ঞান মানসিক ব্যাধির লক্ষন কারন ও আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি , জ্ঞান কোষ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১, পৃষ্ঠা- ৩৩

[11] নীহার রঞ্জন সরকার ও ডাঃ তনুজা সরকার, অস্বাভাবিক মনো বিজ্ঞান মানসিক ব্যাধির লক্ষন কারন ও আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি , জ্ঞান কোষ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১, পৃষ্ঠা- ৩৫

অতিশয় বৃদ্ধি ঘটলে ব্যক্তিত্বে একটি মাত্র বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধি না পেয়ে ব্যক্তিত্বের বিপর্যয় ঘটে , তার আবেগীয় গোলযোগ এবং মানসিক বিকৃতি দেখা দেয় ।

## মধ্যযুগীয় সমাজে মানসিক ব্যাধি

মানসিক বিকৃতি সম্বন্ধীয় ধ্যান - ধারণা মধ্যযুগের প্রথমভাগেই প্রাচীন সমাজের সঙ্গে মিল ছিল, এগুলো অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত দীর্ঘদিন যাবৎ মানুষের মনে বিরাজমান ছিল । তেমনি ভারতীয় সমাজে মধ্যযুগে মানসিক ব্যাধিগুলোকে চিকিৎসা শাস্ত্রে এখতিয়ারের বাইরে রাখা ছিল , এবং অতিপ্রাকৃতিক শক্তি বা যাদুবিদ্যার সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয় এবং মানসিক রোগের দায়িত্ব অর্পিত হয় পুরোহিত বা ধর্মযাজকদের উপর। অসংখ্য শয়তান বা প্রেত যাদুমন্ত্রের দ্বারা মানসিক ব্যাধি সৃষ্টি করছে- এটাই ছিল মধ্যযুগীয় মানুষের বিশ্বাস। মধ্য যুগের মানসিক রোগীদের চিকিৎসা ছিল ঈশ্বরের কাছে রোগ মুক্তির জন্য প্রার্থনা করা ; রোগীর সমুখে মন্ত্র উচ্চারণ করা , পবিত্র দ্রব্যাদি স্পর্শ করানো, ওঝাদের মনের থেকে তৈরি নানা রকম ঔষধ এগুলো ছিল প্রাকৃতিক চিকিৎসার কয়েকটি হাস্যকর অনুকরণ। কোন কোন সময় মন্ত্রের সাহায্যে ভূত ছাড়ানোর চেষ্টা করা হত। ভূত তাড়ানোর মন্ত্রগুলো ছিল অদ্ভুত ধরনের । অনেক সময় কাল্পনিক শয়তানের নাম ধরে ডাকা হত এবং রোগীর দেহ ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য অশালীন শব্দ প্রয়োগ করা হত ।

মানসিকভাবে অসুস্থ রোগীদের দেখলে অনেকেই ভয় পেত । সেজন্য পরিবারের লোকেরা তাদের কে এড়িয়ে চলতো কিংবা তাকে ছেড়ে দিত । ফলে তারা বিভিন্ন স্থানে ঘুড়ে বেড়াত এবং দিনে দিনে তাদের চেহারা এমন হত যে তাদের স্বাভাবিক মানুষ বলে চেনাই যেত না এবং মনোবিকৃতির অবস্থা ক্রমশ বৃদ্ধি পেত , তখন তাদের যে , ভূতে পেয়েছে সেই সন্দেহই পাকাপোক্ত হত । মধ্যযুগ যতই অগ্রসর হতে থাকে, মানসিক ব্যাধিকে তত বেশি করে " পাপ" হিসেবে গণ্য করা শুরু হয়[12] ।

পাগল চিকিৎসার হাসপাতাল লন্ডনে ১৪০৩ সালে প্রথম স্থাপিত হয় । তখনকার বেথলহেম পাগল চিকিৎসা কেন্দ্রটি লুনাটিক অ্যাসাইলাম ' নামেই বেশী পরিচিত ছিল । ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে

---

[12] ডাক্তার বিনোদ বিহারী রায় (সম্পাদিত ), চিকিৎসক, চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্রিকা, প্রথম খণ্ড, ১২৯৭ সাল , প্রকাশকঃ তালন্দ বিনোদ প্রেশ, রাজশাহী

নিযুক্ত বিশেষ কমিশনের তদন্তের পর এই হাসপাতালের কিছু কিছু পরিবর্তন হল । ১৮৪৫ সালে লুনাসি কমিশন গঠিত হয় । ক্রমশ এই কমিশনই ১৯১৩ সাল হতে বোর্ড অফ কন্টোল রূপে ইংল্যান্ডে কাজ পরিচালনা করছেন। পশ্চিমী সভ্যতায় ১৮ শতক নাগাদ প্রথম মনোবিদ্যাসম্মত চিকিৎসার সূচনা দেখা দেয়। এই সময় ফ্রান্সে চিকিৎসাবিদ পিনেল রেভোলিউশ্যনারী কমিউনের হাসপাতালের কার্যভার গ্রহণ করেন । তিনি প্রথমেই হাসপাতালে বছরের - পর - বছর বেঁধে - রাখা রোগীদের মুক্তি দিলেন তাদের বন্ধন-দশা থেকে, তাছাড়া এদের কাজ করবার জন্য ছোট কারখানা , অবসর বিনোদনের জন্য নানা সাজসরঞ্জাম এবং খোলা হাওয়ায় বেড়াবার ব্যবস্থা করে দিলেন ।

## বিশ্ব প্রেক্ষাপটে উন্মাদ রোগ চিকিৎসা - আধুনিক যুগ

আধুনিক যুগকে দু' ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে মোটামুটি ১৯০০ সাল পর্যন্ত সময়কে অন্তর্ভুক্তকরা হয় এবং এই সময়ে জৈবিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রবল ছিল। দ্বিতীয় কালপর্ব শুরু হয় ১৯০০-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত যখন মনোচিকিৎসার জৈবিক দৃষ্টিভঙ্গি সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল। আধুনিক যুগের দ্বিতীয় পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য হল মানসিক রোগের কারণ হিসেবে মানসিক শর্তাবলীকে প্রাধান্য দেওয়া[13] । এখন এ দুটি দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করা হবে। বহু সাধনার পর অবশেষে জার্মান সাইকিয়াট্রিস্ট এবং মনোবিজ্ঞানী ক্রেপেলিন ( ১৮৫৬-১৯২৬) বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে একটি মোটামুটি গ্রহণযোগ্য শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। এই শ্রেণীবিন্যাস বহুদিন প্রচলিত ছিল। বিংশশতাব্দীর শেষ ভাগে এসে আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক সমিতি শেষ বারের মত একটি নতুন শ্রেণীবিন্যাস প্রবর্তন করেছেন যা আবারো পরিবর্তিত হতে পারে। তিনি সর্ব প্রথম মানসিক ব্যাধির প্রাকৃতিক এবং জৈবিক কারণের কথা বলেন । শারীরিক গঠনের সঙ্গে মেজাজ ও ব্যক্তিত্বের সম্পর্ক দেখান এবং কতকগুলোমানসিক রোগের সৃষ্টি / উৎপত্তি, বিকাশ ফলাফল লিপিবদ্ধ করেন ।

---

[13] ওয়েন বার্কলে হিল, মেন্টাল হাইজিন, ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ সাইকোলজি, প্রেসিডেন্টিয়াল এডড্রেস-ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস, সেকশন অফ সাইকোলজি, জানুয়ারী ১৯২৭, ক্যালকাটা ভলিউম- ৭, পৃ- ১১।

তিনি মানসিক রোগের প্রথম শ্রেণীবিভাগ করেন।

উনিশ শতাব্দীতে শারীরসংস্থান এবং শারীরবিদ্যায় যে প্রভূত উন্নতি সূচিত হয় , তাই অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞানে জৈবিক যুগের সূচনা করে[14]। শারীরবিদ্যা ও শারীর সংস্থান বিদ্যার জ্ঞান এবং প্রেততত্ত্বের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া একটি অভিজ্ঞতাভিত্তিক এবং প্রাকৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন মনোচিকিৎসা শাস্ত্র সৃষ্টি করে যা ছিল মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত[15] ।

এই যুগের প্রধান প্রধান বিজ্ঞানী ছিলেন উইলহেলম গ্রিসিঞ্জার ( ১৮১৭) এবং এমিল ক্রেপেলিন। তাদের আগেই বেশ কয়েকজন সাইকিয়াট্রিস্ট বলেছিলেন যে ,স্নায়ুতন্ত্রের ক্লান্তি, মস্তিষ্কের আকার এবং আকৃতি , মস্তিষ্কের কোষ -কলার ধ্বংস , বংশগতি , সন্তান প্রসব, ইত্যাদি কারণ থেকে আবেগীয় বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে।

গ্রিসিঞ্জার ছিলেন একজন জার্মান সাইকিয়াট্রিস্ট । তিনি মানসিক রোগ সম্পর্কিত সব ধরনের পর্যবেক্ষণ লব্ধ তথ্য এবং তত্ত্ব বা অনুমানসমূহ সংগ্রহ করেন এবং এগুলো মেন্টাল প্যাথোলজি অ্যান্ড থারেপি ( ১৮৪৫) নামক গ্রন্থে সংকলিত করেন । এই বইটিকে মানসিক রোগের চিকিৎসা সংক্রান্ত সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ বলা যায় । ক্রেপলিন গ্রিসিঞ্জারের দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করেন ও তার তত্ত্ব অনুসরণ করে মানসিক রোগের একটি শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি প্রবর্তন করেন ।

কয়েক হাজার রোগীর জীবনবৃত্তান্ত পর্যালোচনা করে ক্রেপেলিন উল্লিখিত দুটি মানসিক ব্যাধিসহ সব ধরনের মানসিক ব্যাধির লক্ষণগুলোর একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা ও শ্রেণীবিভাগ তৈরি করেছিলেন। ক্রেপেলিন সব ধরনের মানসিক ব্যাধির জন্য মস্তিস্কের ক্ষয়ক্ষতি বা রোগকে, অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির অস্বাভাবিক ক্রিয়াকে, বিপাক ক্রিয়ার ত্রুটিকে, অথবা বংশগতিকে দায়ী করেছিলেন। যাইহোক , ক্রেপেলিনের সময়ে মানসিক ব্যাধির বিস্তৃত শ্রেণীবিন্যাস এবং লক্ষণ সমষ্টির তালিকা প্রায় পূর্ণাঙ্গ

---

[14] দ্যা ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল গ্যাজেট, ১৯৩২ নভেম্বর, ৬৭(১১); ৬১২-৬১৭, সালফার ট্রিটমেন্ট ইন মেন্টাল ডিজেজাস এন এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডি অফ ১০০ কেস।

[15] দ্য ইন্ডিয়ান মেডিকেল গেজেট, এডিটর – এস, ডি এস, গ্রাভাল ভলিউম ৯০(১), ভলিউম এলএক্সএল নং, ১ কলকাতা, জানুয়ারী ১৯৫৫

হলেও চিকিৎসার ব্যাপারে তেমন কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি । এমনকি অনেক রোগের জৈবিক কারণ আবিষ্কৃত হওয়ার পরও এসব রোগের চিকিৎসায় তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি ।

বেঞ্জামিন রাস (১৭৪৫-১৮১৩) ছিলেন সর্ব প্রথম আমেরিকান সাইক্রিয়াট্রিস্ট , তিনিও সেলসাস এর সঙ্গে একমত হয়ে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার জন্য রক্ত মোক্ষণ পদ্ধতিকে সমর্থন করেছিলেন । মানসিক রোগীদের মানবীয় পরিবেশে রাখার জন্য , বিশেষ করে তাদের শৃঙ্খল মুক্ত করার জন্য , সর্বপ্রথম সরকারী অনুমতি আদায় করেছিলেন ফরাসি সাইকিয়াট্রিস্ট ফিলিপ পিনেল । প্যারিসের *La BIcetre* হাসপাতালে প্যারিসের নাগরিকবৃন্দ সবিস্ময়ে দেখলেন যে, এসব মানসিক রোগীদের শেকল খুলে দেওয়ার পর তারা মোটেই বিশৃঙ্গল , আক্রমনাত্মক আচরণ করেনি বরং তারা শান্ত শিষ্ট ছিল। ঠিক পিনেলের অবদানের সমকক্ষ অবদান রেখেছেন উইলিয়াম টিউক মানসিক রোগীদের স্বাধীনভাবে থাকতে দেয়া হলে তা রোগীদের জন্য নিরাপদ এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির সহায়ক । আমেরিকায় ডরোথিয়া ডিকস নামের একজন বিদূষী মহিলা পাগলাগারদে বা জেলখানায় অবস্থানরত মানসিক রোগীদের অমানুষিক নির্যাতন ও পাশবিক , নিষ্ঠুর অবস্থার বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সচেতন করার জন্য কয়েক দশক ধরে প্রচারণা চালিয়েছিলেন[16] ।

ইতিমধ্যে ১৮৩৭ সালে লন্ডন কলেজের মেডিসিনের অধ্যাপক ডাঃ ইলিয়টসন সংবেশন (সম্মোহন) দ্বারা পাগল চিকিৎসা শুরু করেন। কিন্তু তাঁর এই চিকিৎসা - পদ্ধতি অন্যান্য সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক কর্তৃক কঠোরভাবে সমালোচিত হয়[17] । এই সম্মোহন বিদ্যার দ্বারা উন্মাদরোগ নিরাময়ের ইতিহাসে মেসমারের কার্যাবলী স্মরণীয়। ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দে এন্টন মেসমার তার জীবনের ইতিহাসে এক

---

[16] সরকার, নীহার রঞ্জন ও সরকার, তনুজা; অস্বাভাবিক মনো বিজ্ঞান মানসিক ব্যাধির লক্ষন কারন ও আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি , জ্ঞান কোষ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১, পৃষ্ঠা- ৪৫

[17] প্রিয়াংশুশেখর ভট্টাচার্য , মানসিক চিকিৎসার ক্রমবিকাশের ধারা, চিত্ত পত্রিকা, সম্পাদনা – তরুন চন্দ্র সিংহ, প্রথম বর্ষ,প্রথম সংখ্যা , ১৩৭০ পৃষ্ঠা -৬৪

অভূতপুর্ব রহস্যালোক রচনা করে[18] এবং ভারতেবিশেষ করে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীতে পাগল চিকিৎসার জন্য ডঃ ইসাডেল ও এই পদ্ধতি অনুসরণ করলেন[19]।

## মনোবৈজ্ঞানিক যুগ

১৮৮০ সালের কাছাকাছি সময়ে বিশুদ্ধ জৈবিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটতে থাকে এবং কিছুটা নমনীয় জৈবিক ও মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে একটি মিশ্র বা সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ ঘটতে থাকে।এই দৃষ্টিভঙ্গির পেছনে সক্রিয় ছিল নিউরোসিস , ব্যক্তিত্বের বিকৃতি এবং কিশোর বয়সের মনোবিকৃতি - ইত্যাদি মানসিক ব্যাধির জন্য যে মস্তিষ্কের অনুমিত ক্ষয়ক্ষতিড়যা তখনো প্রমাণিত হয়নি সে সম্পর্কে অবহিত ।মানসিক ব্যাধির চিকিৎসায় মনোবৈজ্ঞানিক বিপ্লবের সূচনা হয় আংশিকভাবে মানবতাবাদী দৃষ্টিভক্তির অবদানের ফলে, আর আংশিকভাবে হিপ্নোসিস বা নিদ্রাবেশের আবিষ্কারের ফলে । পিনেল এর লেখায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, মানসিক রোগীরা অন্যান্য সাধারণ মানুষের মতই মানুষ। তাদের যখন শেকল খুলে মুক্ত করা হল তখন তাদের আচরণ নিয়ে অনেকেই উৎসাহ দেখালেন । এ ধরনের রোগীদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে ভিয়েনার চিকিতসক ফ্রেঞ্জ এনটন মেসমার (১৭৩৩-১৮১৫ ) হিপনোসিস বা সংবেশনের ব্যবহার শুরু করেন ।জ্যা মার্টিন শারকো (১৮২৫-১৮৯৩) নামক একজন ফরাসি সাইকিয়াট্রিস্ট এবং স্নায়ুতত্ত্ববিদ কে আধুনিক স্নায়ুশারীরবিদ্যার - র জনক বলা হয় । তিনি প্যারিসের সালপেট্রিয়ার হাসপাতালে নিউরোসিস , বিশেষ করে হিসিটটিয়ার রূপান্তর প্রতিক্রিয়ার ) প্রকৃতি অনুসন্ধান করতে গিয়ে সংবেশন বা নিদ্রাবেশ পদ্ধতি প্রয়োগ করেন ।

শারকো যখন প্যারিসে কাজ করছিলেন , সেই সময়ে ন্যান্সির দুজন চিকিৎসক-- একজন লাইবল্ট (১৮২৩-১৯০৪) এবং অন্যজন বার্ণহাইম (১৮৪০-১৯১৯) নিউরোটিক রোগীদের চিকিৎসার জন্য সংবেশন প্রয়োগ করছিলেন ।তাদের ধারণাগুলোর মাধ্যমে ১৯২০ এর পরবর্তী

---

[18] এলিয়টসন, জন; মেসমারিজম ইন ইন্ডিয়া , রয়্যাল কলেজ অফ সার্জনস অফ ইংল্যান্ড, প্রকাশক: হিপোলাইট বেইলিয়ার, রিজেন্ট স্ট্রিট, লন্ডন, ১৮৪৯ , পৃষ্ঠা - ২১৯,

[19] প্রিয়াংশুশেখর ভট্টাচার্য , মানসিক চিকিৎসার ক্রমবিকাশের ধারা, চিত্ত পত্রিকা , সম্পাদনা – তরুন চন্দ্র সিংহ , প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা , ১৩৭০ পৃষ্ঠা -৬৫

কালে এদেশে মনোচিকিৎসা বা সাইকোথেরাপীর সূত্রপাত ঘটে। এর ফলে মানসিক রোগের জৈবিক কারণের উপর বেশি প্রাধান্য দিয়ে আবেগীয় কারণের উপরে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হতে থাকে এবং সাইকোটিক রোগীদের চেয়ে বরং নিউরোটিক রোগীদের উপর বেশি মনোযোগ দেওয়া শুরু হয়[20] ।

ইতিমধ্যে মানসিক রোগের ইতিবৃত্ত , কারণ এবং শ্রেণী বিভাগ করবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কয়েকজন মনীষী সচেতন হয়ে উঠছিলেন ।গ্রীক চিকিৎসকদের অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে রচিত রোগের শ্রেণীবিভাগ ছাড়া আর কিছুই এ পর্যন্ত জানা ছিল না । সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক লিনিয়াস উন্মাদ রোগেরও প্রথম শ্রেণীবিভাগ করেন । সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই শ্রেণীবিভাগ হল নৈতিক , বুদ্ধিগত এবং বংশানুক্রম উন্মাদ । এই সঙ্গেই কয়েকপ্রকার শারীরিক কারণে উন্মাদ রোগ দেখা যেতে পারে বলে কয়েকজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি সিদ্ধান্ত করলেন ; তারা সাধারণ অসুস্থতা, বিষক্রিয়াজনিত অসুস্থতা এবং সমবেদনামূলক অসুস্থতাও উন্মাদ রোগের কারণ হতে পারে বলে ঘোষণা করলেন[21]। ঠিক এরপরের উন্মাদ রোগের শ্রেণীবিভাগ যেটি হল তাতে দেখা যায় যে, শ্রেণী বিভাগকারী বৈজ্ঞানিকেরা এই সময় শারীরিক রোগের অথবা তার প্রবণতার সঙ্গে সরাসরি উন্মাদ রোগের কারণকে যুক্ত করবার চেষ্টা করেছেন ।

১৮৫৪ সালে প্রথম বিজ্ঞানসম্মত প্রথায় উন্মাদ রোগের শ্রেণীবিভাগের সঙ্গে পরিচয় ঘটে । এই বছরেই প্রথম ম্যানিয়া বা উন্মত্ততা এবং ডিপ্রেসন অর্থাৎ বিষন্নতা একই রোগের দুইটি লক্ষণ বলে বর্ণিত হল । বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে উন্মাদরোগের ব্যাখ্যা হল এই প্রথম । একই রোগী এক সময় চরম উন্মাদনা , আবার অন্য সময় অপরিসীম বিষন্নতায় ডুবে যেতে পারেন। ফরাসী চিকিৎসকগণ এর নাম দিলেন চক্রাকার বিষণ্ণতা। ১৮৯৬ সালে সুপ্রসিদ্ধ জার্মান মনোচিকিৎসক ক্রেপলীন এই ব্যাধিকে খেদোন্মত্ত বাতুলতা বলে আখ্যা দিলেন ।

[20] সরকার, নীহার রঞ্জন ও সরকার, তনুজা; অস্বাভাবিক মনো বিজ্ঞান মানসিক ব্যাধির লক্ষন কারন ও আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১, পৃষ্ঠা- ৪৯

[21] প্রিয়াংশুশেখর ভট্টাচার্য , মানসিক চিকিৎসার ক্রমবিকাশের ধারা, চিত্ত পত্রিকা , সম্পাদনা – তরুন চন্দ্র সিংহ , প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা , ১৩৭০ পৃষ্ঠা - ৬৩

পিয়েরে জেনে খুব বিস্তৃতভাবে হিস্টিরিয়ার লক্ষণাবলী বর্ণনা করেছিলেন এবং সংবেশন সম্পর্কে একটি মতবাদ গঠন করেছিলেন , যার মধ্যে শারকো এবং ন্যান্সি সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় ঘটেছিল । জেনের আরেকটি অবদান হল এই যে , তিনি পাগলামি ছাড়াও আরো কয়েক ধরনের নিউরোটিক রোগের লক্ষণাবলী বর্ণনা করেছিলেন এবং এগুলোর মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছিলেন।

ফ্রয়েড শারকোর অধীনে পড়াশুনা করেন , এবং বার্ণহাইমের কার্যাবলীর সাথে পরিচিত হন। ভিয়েনায় তিনি চিকিৎসক যোসেফ ব্রয়ারের সাথে কাজ করেন । বুয়ার তখন নিউরোটিক রোগীদের চিকিতসায় সংবেশনোত্তর অভিভাবনের মাধ্যমে অবাধ অনুষঙ্গা পদ্ধতি প্রয়োগ করছিলেন । সংবেশন করার পর তিনি রোগীদের জিজ্ঞাসা করতেন নিউরোসিসের লক্ষণগুলো কখন থেকে , কিভাবে , কি কারণে শুরু হল তা নিয়ে মুক্তভাবে কোন বাধা বা নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই আলোচনা করতেন। ফ্রয়েড মানসিক অবস্থা ও ব্যক্তিত্বের তিনটি স্তরের কথা বলেছিলেন - যেগুলোর একটি ইদ বা জৈবিক সত্তা , আরেকটি ইগো বা বাস্তব জ্ঞান কিংবা অহংসত্তা এবং বিবেক । মানুষ এই তিনটি সত্তার সমন্বয়ে গঠিত এবং এই তিনটি সত্তার মধ্যে সব সময় দ্বন্দ্ব সংঘটিত হচ্ছে। প্রত্যেকটি মানুষকে এই তিনটি সত্তার মধ্যে অর্থাৎ তার তাগিত এবং অবদমনগুলোর সঙ্গে বাস্তব জগতের নীতিগুলোর সমন্বয় সাধন করে তারা ।

ফ্রয়ডের মনোসমীক্ষণমূলক চিকিৎসায় রোগীর অন্তর্দৃষ্টি বাড়ানোর চেষ্টা করা হয় । যাতে সে সচেতন চিন্তার ফাক তার আচরণকে নিয়ন্ত্রন করতে সক্ষম হয় । এই লক্ষ্যটি অর্জন করার জন্য ফ্রয়েড অভিসার এর বিশ্লেষণ এবং মুক্ত অনুষঙ্গ ও অভিভাধন পদ্ধতি ব্যবহার করেন। অতিসঞ্চালন বলতে বুঝায় রোগীর পিতামাতা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সম্পর্কে রোগীর শৈশবককালীন অবচেতন মনোভাব ও অনুভূতিগুলো চিকিৎসকেরর উপরে সঞ্চালিত করা। অভিসঞ্চারের বিশ্লেষণ করা হলে রোগী তার শৈশবকে বুঝতে পারে এবং তার আচরণের অবচেতন কারণগুলোকে আবিস্কার করতে পারে । তার আচরণগুলো আগে যেমন অবচেতন শর্তের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো সেগুলো এখন নিজের সচেতন ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় [22] ।

---

[22] সরকার, নীহার রঞ্জন ও সরকার, তনুজা; অস্বাভাবিক মনো বিজ্ঞান মানসিক ব্যাধির লক্ষন কারন ও আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি , জ্ঞান কোষ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১

মনঃসমীক্ষণের প্রবর্তনকারী সিগমুন্ত ফ্রয়েড নিজে চিকিৎসাবিদ ছিলেন এবং স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশ, বৃদ্ধি ও রোগ সম্বন্ধে গবেষণা করছিলেন । তিনি প্রায়ই শাকোর চিকিৎসাগারে হিষ্টিরিয়া রোগীদের দেখতেন । ক্রমে তিনি এই রোগ সম্বন্ধে কৌতুহল হয়ে উঠলেন । তিনি উন্মাদনার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন , এই ব্যাধি হচ্ছে বাস্তবের সঙ্গে রোগীর সম্মুখীন হওয়ার সাহসের অভাব। তিনি এই তথ্যের সন্ধান পেয়েছিলেন তারই সহকর্মী ক্রয়ারের কাছ থেকে । ক্রয়ার অনুসন্ধান করতে করতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে হিষ্টিরিয়ার কারণ হচ্ছে গোপন এবং কষ্টকর স্মৃতি যেগুলি বিষঙ্গ হেতু রোগীর মন থেকে মুছে গেছে । ক্লয়ার সংবেশন দ্বারা এই পীড়াদায়ক গোপন স্মৃতিগুলিকে উদ্ধার করে এবং একটি রোগীর ক্ষেত্রে দেখলেন যে মানসিক রোগের লক্ষণগুলি দূর হয়ে গেছে। শুরু হল যুগান্তকারী মনঃসমীক্ষণের সকল তথ্যের আবিষ্কার। ফ্রয়েডকে ঘিরে শুধু একটিমাত্র মতবাদ মনোবিদ্যায় প্রচলিত হল ভাবলে ভুল করা হবে ; তার মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গীর সহায়তায় নতুন নতুন আরও মতবাদের পথ উন্মুক্ত হল । এই বিভিন্ন মতবাদের পুরোধা হিসাবে উল্লেখযোগ্য ইয়উং, এদলার মনবিদগণ এবং ভারতের গিরিন্দ্রশেখর বসু [23]। আজ আমরা ভালো ভাবে জানি ফ্রয়েড হচ্ছেন মনোবিদ্যা জগতের এক পুরুষ যার চিন্তাধারা জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে গৃহীত হয়েছে। আর তারাই আবিষ্কৃত পদ্ধতি আজ মানসিক রোগের চিকিৎসা পথ উদ্ভাসিত করে তুলেছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে।

মনোসমীক্ষণ একটি তত্ত্ব হিসেবে এবং একটি চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবেও প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠতে পারেনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয় **১৯১৪ - ১৯১৮** সাল পর্যন্ত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পীড়ন বা চাপ এত প্রবল হয়েছিল যে হাজার হাজার সৈনিকদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের বিপর্যয় ঘটেছিল এবং তাদের মধ্যে হিস্টিরিয়ার লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। অনেক পর্যবেক্ষকদের নিকট মনে হয়েছিল যে , ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব অপ্রত্যাশিত গণবিপর্যয়ের ঘটনাটিকে অন্যান্য তত্ত্বের চেয়ে ভালভাবে ব্যাখ্যা করতে পেরেছিল । এরপর থেকে আমেরিকায় ও বিশ্বের অন্যত্র মনোসমীক্ষণ তত্ত্ব মনোবিজ্ঞান ও সাইকিয়াট্রির উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। ফ্রয়েডের মনোসমীক্ষণ তত্ত্ব আজ সর্বজন স্বীকৃত না হলেও ব্যক্তিত্ব ও নিউরোসিস বা মানসিক

---

[23] ভট্টাচার্য; পি , মানসিক চিকিৎসার ক্রমবিকাশের ধারা, চিত্ত পত্রিকা , সম্পাদনা – তরুন চন্দ্র সিংহ , প্রথম বর্ষ , প্রথম সংখ্যা , ১৩৭০ পৃষ্ঠা -৬৬

ব্যাধিকে ব্যাখ্যা  করার জন্য আজ পর্যন্ত যত তত্ত্ব প্রণয়ন করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট ।

পরবর্তীকালে মনোসমীক্ষণতত্ত্বের কিছু সংশোধন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে। যারা মনোসমীক্ষণ তত্ত্বের মূল ধারাকে অক্ষুন্ন রেখে মনোসমীক্ষণ তত্ত্বের সংশোধন , পরিমার্জন করেছেন তাদের মধ্যে কার্ল ইয়ু , আলফ্রেড এডলার, ক্যারেন হর্ণি, হ্যারি স্ট্যাক স্যুলিভান প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটে ১৯১৪ সালে রাশিয়ান মনস্তত্ত্ববিদ আইন প্যাভলভ  কর্তৃক পরীক্ষণমূলক নিউরোসিস আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে । সুতরাং প্যাভলভের গবেষণা মানুষের নিউরোসিসের কিছু উৎস কে আলোকিত করতে সাহায্য করেছে।

অতি সাম্প্রতিক কালে অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞানে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বা মনোদৈহিক দৃষ্টিভঙ্গি অথবা অর্গানিজমিক  ব্যক্তিত্ব সম্পর্কিত  দৃষ্টিভঙ্গির উপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রচলন ঘটেছে প্রখ্যাত আমেরিকান সাইকিয়াট্রিস্ট এডলফ-এর অবদানের ফলশ্রুতিতে। একটি মনোশারীবৃত্তীয় বিকৃতিকে বুঝতে হলে বা এর কারণ ব্যাখ্যা করতে হলে  এর শারীরবৃত্তীয় দিক এবং আবেগীয় দিকগুলোকে বুঝতে হবে এবং এর জন্য সামগ্রিক বা অর্গানিজমিক দৃষ্টি ভঙ্গির প্রয়োজন [24] ।

১৯৩০ সালের দিকে কতকগুলো নতুন শারীরিক চিকিৎসাপদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ায় অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞানে আরো একটি নতুন ধারার সূচনা হয়েছে। এসব নতুন চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে আছে ইনস্যুলিন শক চিকিৎসা, বৈদ্যুতিক শক চিকিৎসা, মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার, ইত্যাদি । ৪০এর দশকে আবিষ্কৃত হয়েছে উদ্বেগ  প্রশমনকারী ঔষধ । বৈদ্যুতিক আঘাতের দ্বারা চিকিৎসা বিষন্নতার রোগীদের জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ। উদ্বেগ প্রশমক ঔষধগুলো চিকিৎসকদের যাদুর কাঠি এনে দিয়েছে । পূর্বে যেখানে হাসপাতালে মানসিক রোগীর সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যেত , এসব ঔষধ প্রয়োগের ফলে এখন তা কমে যাচ্ছে[25]।

---

[24] মনো বৈজ্ঞানিক, লেখকঃ শ্রী সত্যেন সিংহ , প্রথম সংস্করণ আশার,১৩৫৯, প্রকাশকঃ- দাশগুপ্ত এন্ড কোং, লিঃ,কলিকাতা-পৃষ্ঠা - ১২।

[25] সরকার, নীহার রঞ্জন  ও সরকার, তনুজা;  অস্বাভাবিক মনো বিজ্ঞান মানসিক ব্যাধির লক্ষন কারন ও আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি , জ্ঞান কোষ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১, পৃষ্ঠা-৫৩

## বাংলার উন্মাদ আশ্রমে চিকিৎসা- উনিশ শতক

ইংরেজ উন্মাদ আশ্রমের অনুকরণে উপনিবেশিক সরকার এদেশে নেটিভ এবং ইউরোপীয় রোগীদের চিকিৎসার জন্য ভারতে পাগলগারদ প্রতিষ্ঠা করেছিল। প্রাথমিক ভাবে তারা ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চলে লুনাটিকদের প্রতি ভয় ও ভিন্ন সমস্যা জনিত কারনে তাদের সমাজ থকে পৃথকীকরণের উন্মাদআশ্রমটি নির্মাণ করেছিল। আসলে উন্মাদ চিকিৎসালয় গুলি প্রথম দিকে ছিল আটক কেন্দ্র । বিভিন্ন বার্ষিক বিবরনের প্রতিবেদনে ভিত্তিতে কেউ এমন সিদ্ধান্তে আসতে পারেন যে, এখানে চিকিৎসা ব্যবস্থাকে যথার্থই অগ্রাধিকার দেওয়া হতো । তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আটককৃত উন্মাদদের সাধারন মানের চিকিৎসা করা হতো সেটিকেও কখনো অস্বীকার করা যায় না ।

## প্রাক-ঔপনিবেশিক আমল

কথিত আছে সম্রাট অশোকের সময়কালে মানসিক অসুস্থ রোগীদের জন্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানে দেশীয় পদ্ধতিতে উন্মাদ রোগীদের চিকিৎসা করা হতো। অশোক সংহিতার লেখকদের মতে, উন্মাদ রোগীদের ক্ষেত্রে সেই সময় সিদ্ধা ও আয়ুর্বেদ পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হতো। এছাড়াও সেই সময় অধিক উন্মত্ত রোগী দের চিকিৎসার জন্য পৃথক পৃথক কক্ষে রাখা হতো [26]। আবার তামিলনাড়ুর চিংলেপুটের তিরুমুক্কুডালে প্রভু ভেঙ্কটেশ্বরের একটি মন্দিরে চোল যুগের দেয়ালে শিলালেখ তে উন্মাদ রোগ চিকিৎসার কিছু নিদর্শন মেলে , গুজরাট ও পাঞ্জাবের শাহদৌলার চৌহাসে মানসিকভাবে অসুস্থ রোগীদের বিচ্ছিন্ন করার কিছু প্রাচীন প্রমাণ রয়েছে। সুলতানি যুগে মোহাম্মদ খিলজির (১৪৩৬- ১৪৬৯) সময়ের একটি উন্মাদ আশ্রমে ইউনানি পদ্ধতিতে পাগল চিকিৎসার উল্লেখ আছে। যেটি মধ্যপ্রদেশের মান্ডুর কাছে অবস্থিত , এই মানসিক হাসপাতালের যার চিকিৎসক ছিলেন মাওলানা ফজলুল হাকিম [27]।

---

[26] এস.এইচ. নিজামি অ্যান্ড এন. গোয়াল, হিস্টোরি অফ সাইকিয়াট্রি ইন ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ সাইকিয়াট্রি। ২০১০, জানুয়ারী নং- ৫২, সাপ্লিমেন্ট, ইস্যু ১ পৃ- ৭

[27] এস.এইচ. নিজামি অ্যান্ড এন. গোয়াল, হিস্টোরি অফ সাইকিয়াট্রি ইন ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ সাইকিয়াট্রি। ২০১০, জানুয়ারী নং- ৫২, সাপ্লিমেন্ট, ইস্যু ১ পৃ- ৮

হেস্টিংস ভারতে গভর্নর জেনারেল হওয়ার পর শাসন ব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন আনেন, কিন্তু তাঁর সময়কালে উন্মাদ আশ্রম বা চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে তেমন ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া যায় না । ১৭৮৪ সালে তাঁর শাসন আমলে 'পিটস ইন্ডিয়া বিল' প্রবর্তন করেন ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকারের কার্যক্রম "নিয়ন্ত্রণ বোর্ড" এর অধীনে আনা হয় , অর্থাৎ সেই সময় শুধুমাত্র প্রশাসনিক বিষয়ের উপরই গুরুত্ব দেওয়া হয় , তখন পাগল দের নিয়ন্ত্রন বা চিকিৎসা নিয়ে ততটা আগ্রহ দেখা দেয় নি , পরবর্তীকালে লর্ড কর্নওয়ালিসের (১৭৮৬-৯৩) শাসন আমলে পদ্ধতিগত সংস্কার ও কল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। তাঁর শাসন আমলে কোলকাতায় পশ্চিমী পদ্ধতির অনুকরনে প্রথম উন্মাদ চিকিৎসার উল্লেখ পাওয়া যায়, যা ১৭৮৭ সালের ৩ এপ্রিল কলকাতা মেডিক্যাল বোর্ডের কার্যক্রমে রেকর্ড করা হয় এবং ভারতে পাগল চিকিৎসা সেবা ও উন্নয়নে ঔপনিবেশিক শাসকের হস্তক্ষেপ সূচনা হয়[28] ।

কোলকাতায় প্রথম অস্থায়ী ভাবে পাগল চিকিৎসা শুরু করেন জর্জ. এম. কেন্ডারডাইন। কিন্তু ১৭৮৭ সালের ১৯ মে তাঁর মৃত্যুর পর উইলিয়াম ডিক মেডিকেল বোর্ড পরামর্শ ও অনুমুতি নিয়ে ১৮০৬ একটি স্থায়ী উন্মাদ চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে মাসে ৪০০ টাকা দিয়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যায়ে একটি প্রতিষ্ঠান চালুপাগলদের জন্য চিকিৎসার সূচনা হয় ১৮০৮ খ্রীঃ ভবানীপুর ইউরোপীয় আশ্রমে কিন্তু , পরবর্তী কালে ১৮০৫ সালে নেটিভ পাগল চিকিৎসার জন্য রসাপাগলা আশ্রম খোলা হয়[29] , পরে ১৮৪৭ খ্রী. এটি দুলান্দা স্থানান্তরন করা হত এটি ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠান থেকে কয়েক শত গজ দূরে অবস্থিত ছিল এবং একই সুপার ইন্টেনটেড দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল।

প্রথম প্রতিবেদনে ভারতীয় আশ্রম গুলিতে মানসিক রোগীদের জন্য স্বল্প মূল্যে ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল।১৮৫৬-৫৭ সালে দুলুন্ডার ও ভবানীপুরের রিপোর্টে ভালো খাবার আহার,

---

[28] এস.এইচ. নিজামি অ্যান্ড এন. গোয়াল, হিস্টোরি অফ সাইকিয়াট্রি ইন ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ সাইকিয়াট্রি। ২০১০, জানুয়ারী নং- ৫২, সাপ্লিমেন্ট, ইস্যু ১ পৃ- ৯

[29] মেডিক্যাল বোর্ড প্রসেডিং, জানুয়ারী ১৮১১, লেটার সেন্ট টু মিস্টার টাকার, সেক্রেটারি টু গভর্নমেন্ট, পাবলিক ডিপার্টমেন্ট বাই আই, ফ্লেমিং, ফাস্ট মেম্বার , মেডিক্যাল বোর্ড, ডেট ১ জানুয়ারী ১৮১১, এন, এ, আই ।

রোগীদের ভালো পরিষেবা গুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরপ করা হয়। দীর্ঘস্থায়ী রোগীদের সচেতন লোকের সাথে কথাবাত্রা বলার সুযোগ থেকে বিশেষ সুবিধা দেখা গেছে [30]।

চিকিৎসার অঙ্গ হিসাবে রোগীদের মাঝে মাঝে বিনোদন, আনন্দমূলক কাজে নিযুক্ত করা হয়। ১৮৬২ সালের রিপোর্ট অনুসারে , ঢাকা আশ্রয়ে ভারতীয় সঙ্গীত ও খেলার সরঞ্জাম সান্ধ্য ভোজনের পর বিনোদনের জন্য প্রদান করা হয়। এই বিনোদন মূলক যন্ত্রের দ্বারা সঠিক ভাবে পরিচালনা করতে পারত। তাদেরকে রক্ষণাবেক্ষণের সাথে বাজারে স্থানীয় উৎসবে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হতো। এই প্রতিষ্ঠানে অধিক রোগীদের জন্য আবাসন কম ছিল। এখানে রোগীদের জন্য কাঠের মাচা নির্মাণ করা হয় , যাতে রোগীদের মাটিতে বা মেঝেতে ঘুমাতে না হয়। ১৮৭২ সালে ঢাকা আশ্রমে এবিষয়ে উন্নতির বাবস্থা করা হয় । ফলস্বরূপ অসুস্থ, রোগ, মৃত্যুর হার যথেষ্ট কম হয়, চিকিৎসার ক্ষেত্রে সহায়তাও লক্ষ্য করা যায়। পরে প্রকাশিত রিপোর্টের ভাবনা অনুযায়ী একে অপরের শারীরিক যৌন অবমাননা রোধ করতে রোগীদের আলাদা আলাদা থাকা ও ঘুমের জায়গা করা প্রয়োজন [31]।

উনবিংশ শতকের শেষার্ধে বাংলার উন্মাদ আশ্রমের কর্তৃপক্ষ, সামাজিক মূল্যবোধ , মানসিক রোগীদের মানবিকতা, চিকিৎসার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় যেটি ১৮৩০ এবং ১৮৬০ সালে ইংরেজ মনোচিকিৎসায় সঙ্গে অনেকটা লক্ষণীয় ছিল[32] ।

## উন্মাদ আশ্রমের নৈতিক চিকিৎসা সংক্রান্ত একটি দলিল[33]

---

[30] দ্যা রেকর্ড অফ গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল, N: XXVIII, রিপোর্ট অফ দ্যা অ্যাসাইলাম ফর ইউরোপিয়ান অ্যান্ড নাটিভ ইনসেন পেসেন্ট, এট ভবানিপুর অ্যান্ড দুলুন্দা, ফর ১৮৫৬ অ্যান্ড ১৮৫৭, নং- ২৭০, জন গ্রে, ক্যালকাটা গেজেট অফিস ।

[31] অ্যানুয়াল রিপোর্ট অন দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল, ফর দ্যা ইয়ার - ১৮৭৩ জে. ক্যাম্পবেল ব্রাউন, ইন্সপেক্টর – জেনারেল অফ হসপিটাল , ইন্ডিয়ান মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট, ক্যালকাটা।

[32] অ্যানুয়াল রিপোর্ট অ্যান্ড রিটার্ন অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৬৩ , জে ম্যাক.ক্লেল্ড, অফিসিয়াটিং প্রিন্সিপাল ইন্সপেক্টর – জেনারেল, মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট।

[33] দ্যা রেকর্ড অফ গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল, N: XXVIII, রিপোর্ট অফ দ্যা অ্যাসাইলাম ফর ইউরোপিয়ান অ্যান্ড নাটিভ ইনসেন পেসেন্ট, এট ভবানিপুর অ্যান্ড দুলুন্দা, ফর ১৮৫৬ অ্যান্ড ১৮৫৭, নং- ২৭০, জন গ্রে, ক্যালকাটা গেজেট অফিস। পৃ- ৪২

MEANS OF MORAL TREATMENT.

*20th.* It is the intention of the Government, that no articles shall be withheld which may tend to the recreation or occupation of the Patients, and as such may be deemed necessary or useful means of Moral Treatment; a Library and three Periodicals will be allowed for the use of the Patients, also Musical Instruments, Music, Writing and Drawing Materials, appropriate Games, Philosophical Instruments, Tools for Work-shops, Materials for Male and Female industry,—in short, all requisites for recreation and intellectual or manual occupation. All such articles shall be supplied in the manner directed regarding General Supplies.

ফলস্বরূপ , উন্মাদ আশ্রমের বার্ষিক প্রতিবেদনে পাগল চিকিৎসার ক্ষেত্রে কঠোর নিয়ন্ত্রণ, অপব্যবহার যাতে না হয় সে বিষয়ে বিশেষ মনযোগী ও দৃষ্টি আরোপ করা হয়। এ বিষয়ে একটি উদাহরণ সরূপ বলা যায় - ভবানীপুর উন্মাদ আশ্রমের সুপারইন্টেনটেড আটক ইউরোপীয় রোগীর পায়ে লোহা ব্যবহারের জন্য সমালচনা করেন। জেনারেল সার্জন লিখছেন,-- আমার মতে এটি একটি ভুল পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে রোগীকে কিছু সময়ের জন্য অশান্ত আচারন কিংবা বিরক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে বিরত রাখা যায় কিন্তু এরফলে রোগী পালানোর জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। তাই অসহায় পাগলদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সুচিকিৎসাও সহনশীল ভাবে যত্ন করা[34]।

[34] জে ফরসিথ, ডিরেক্টর জেনারেল মেডিক্যাল মেপার্টমেন্ট, রিপোর্ট অন দ্যা অ্যাসাইলাম ফর ইউরোপিয়ান অ্যান্ড নাটিভ ইনসেন পেসেন্ট, এট ভবানিপুর অ্যান্ড দুলুন্দা, ফর ১৮৫৭

১৮৫৬ এবং ১৮৫৭ সালের ভবানীপুর এবং দুলান্দা আশ্রমের প্রতিবেদনে থিওডোর কান্টন জানান, যে উন্মাদ রোগীদের চিকিৎসার জন্য সুব্যবস্থা গ্রহন ও নিয়ন্ত্রন মাফিক পদ্ধতি আশ্রমের নিয়ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে প্রতিবেদন পেশের পর সুপার ইন্টেনটেড থিওডোর কান্টন লিখেছেন যে, ১৮৫৬ সালে জড়বুদ্ধি নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ রূপে প্রয়োগ করা হয়নি [35] । তবে প্রচন্ড হিংস্র রোগীদের জন্য শিকল সংরক্ষিত করে রাখা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, এদের জন্য নয়-ভীরু পরিচারক তারা রোগীদের জড়বুদ্ধি দমনের উপায় সঠিক ভাবে প্রয়োগ , ব্যাখ্যা করতে পারে না , রোগীদের এই জড়বুদ্ধি, উদাসীনতা থেকে মুক্তি দেওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে তাদের স্থানীয়দের থেকে অপমান, কোন ক্ষতি সহ্য করতে না হয়।

১৮৭০ এর দশকে দুলুন্ডাতে রোগীদের জন্য জ্যাকেট বাঁধন, ঔষধ ও অন্যান্য চিকিৎসার সামগ্রীর বিভিন্ন টুলস নির্দিষ্ট করা হয়। এছাড়াও তখন রোগীদের নিয়ন্ত্রণের জন্য অধিক কর্মীও নিয়োগ করা হয়। উন্মাদ রোগীদের দেখভাল ও পরিচালনা করার জন্য নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে শ্রমিক আনায়ন করা হয়, সেবিকা ও পরিচালিকার দ্বারা চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহের উপর নজর রাখা হয়। পাগলদের চিকিৎসার অঙ্গ হিসাবে উন্মাদ আশ্রমে মানসিক রোগীদের নিয়ম মাফিক বিভিন্নরকম কাজের ব্যবস্থা করা হয়েছিল । তবে রোগীদের জন্য কাজগুলি ছিল চিকিৎসাগত এবং বাধ্যতামূলক নয়, কাজের উপর কোন জবরদস্তি করা হতো না এবং মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার লক্ষে এই প্রক্রিয়া টি বিশেষ কার্যকরী। দুলুন্ডা আশ্রয়ে এই কাজের উপকারের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। যেখানে কাজে নিযুক্তের পর বেশ কয়েকটি দীর্ঘস্থায়ী রোগীর পুনরুদ্ধারের কথা বলেছিলেন। ১৮৭৩ সালে এক রিপোর্টে সুপার ইনন্টেনটেড ডাঃ নিভেন জানিয়েছেন, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আমার নজরে এসেছে যে কোলাহল পূর্ণ সকল রোগীরা কেমন ঘুমায়। আবার যখন তারা তিন চার ঘণ্টা ধরে বালি বহন, বাগানের জন্য মাটি অথবা কাদা তোলার উদ্দেশে কাজ করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তারা কেমন ঘুমায়, ইত্যাদি বিষয় গুলি নজরে আনা

[35] দ্যা রেকর্ড অফ গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল, N: XXVIII, রিপোর্ট অফ দ্যা অ্যাসাইলাম ফর ইউরোপিয়ান অ্যান্ড নাটিভ ইনসেন পেসেন্ট, এট ভবানিপুর অ্যান্ড দুলুন্দা, ফর ১৮৫৬, নং- ২৭০, জন গ্রে, ক্যালকাটা গেজেট অফিস।

হয়[36] । এ প্রসঙ্গে Dr. Payne তাঁর প্রতিবেদনের উল্লেখ করেছন যে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যদি আশ্রমের সাথে ২০ বা ৩০ একর চাষযোগ্য জমি থাকে তবে দৈনিক কর্ম প্রনালীর মাধ্যমে রোগীদের রোগ নিরাময় দ্বিগুণ হবে [37] ।

পাগল চিকিৎসার পদ্ধতিতে বিভিন্ন উন্মাদ আশ্রমের সুপার ইন্টেনডেন্ট দের ভিন্ন মত লক্ষ্য করা যায়- লাহোরের ডাঃ স্মিথ আধুনিকতায় বেশি বিশ্বাসী ছিলেন। দিল্লীর ডাঃ পেন্নি এ সম্পর্কে কোন ওষুধের কথা উল্লেখ করেন নি। আমেদাবাদ আশ্রয়ে ক্লোরাইড হাইড্রেট কে মাঝে মাঝে রোগীর উত্তেজনা ও অনিদ্রা দূরীকরণে সাহায্যকারী হিসাবে উল্লেখ করা হয়। পাশাপাশি পেটে সরিষার তেলের প্রলেপও প্রয়োগ করা হয়। উন্মাদরোগীদের চিকিৎসার জন্য সোডিয়াম ব্রোমাইডের উল্লেখ করা হয়। আমেদাবাদের সুপার ইন্টেনটেড জানিয়েছেন জড়বুদ্ধি নিয়ন্ত্রণের এই উপায় গুলি খুবই কম ব্যবহৃত হয়েছে। তবুও এই পদ্ধতির ব্যাবহার ও কাজ রোগীদের পক্ষে মনোরম, আরামদায়ক[38] ।

ময়দাপুর আশ্রয়ে উন্মাদরোগীদের (মৃগী রোগাক্রান্ত) জন্য সিলভার নাইট্রেট এবং হিং ব্যাবহার করা হয়েছিল। ১৮৭২ সালে দুলুন্ডা আশ্রয়ে কখনো কখনো সময় ছাড়া মৃগী রোগের সহায়ক ঔষধ পাওয়া যায়নি- রোগীদের সক্রিয় উত্তেজনা থেকে উপযুক্ত প্রতিকার করার জন্য ইউরোপে প্রচলিত ইলেক্ট্রো শক থেরাপি বাবহারের কথা উল্লেখ করা হয়, এবং দুলুন্ডাতে কিছু আশ্চর্যজনক পদ্ধতির সাথে রোগীর চিকিৎসার চেষ্টা করা হয়েছিল[39] । দুর্ভাগ্যবশত, এই চিকিৎসা পদ্ধতির প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আর কোন বিবরন সরবরাহ করা হয় নি। ১৮৭৩ সালে প্রযুক্তিগত সমস্যার

---

[36] অ্যানুয়াল রিপোর্ট অন দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল, ফর দ্যা ইয়ার - ১৮৭৩ জে. ক্যাম্পবেল ব্রাউন, ইন্সপেক্টর – জেনারেল অফ হসপিটাল , ইন্ডিয়ান মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট, ক্যালকাটা।

[37] অ্যানুয়াল রিপোর্ট অন দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল ফর দ্যা ইয়ার ১৮৭৯ , এ. জে. পেইন সার্জেন জেনারেল ফর বেঙ্গল, প্রিন্টেড এট দ্যা বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস। ১৮৮০

[38] অ্যানুয়াল রিপোর্ট অন দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল, ফর দ্যা ইয়ার - ১৮৭৩ জে. ক্যাম্পবেল ব্রাউন, ইন্সপেক্টর – জেনারেল অফ হসপিটাল , ইন্ডিয়ান মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট, ক্যালকাটা।

[39] অ্যানুয়াল রিপোর্ট অন দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল, অফ দ্যা ইয়ার - ১৮৭২, জে. ক্যাম্পবেল ব্রাউন, ইন্সপেক্টর – জেনারেল অফ হসপিটাল , ইন্ডিয়ান মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট, ক্যালকাটা।

কারনে প্রযুক্তির প্রয়োগ যুক্ত করা হয়নি- বর্তমানে মেডিকেল স্টোর বিভাগের যন্ত্রপাতি গুলি সাধারণত সেকেলে এবং অসম্পূর্ণ ছিল।

১৮৬২ সালে বহরমপুর উন্মাদ আশ্রমের রিপোর্টে উল্লিখিত হয়েছে- শীতল ঝর্না জল রোগীদের মাথায় খুবই কার্যকরী হয়। তবে এখানে রোগীকে যত্নের সাথে প্রতিপালন, ভালো খাবার খাওয়ানো নম্রতা এবং সহানুভূতির উপর বিশেষ ভাবে জোর দেওয়া হয়। সম্ভবত ১৮৬০ সালের শেষ এবং ১৮৭০ সালের প্রথম দশকে ঢাকা আশ্রয়ের আক্রমণাত্মক রোগী, রোগীদের ভির মকাবিলা করার জন্য মূলত চিকিৎসা পরীক্ষামূলক খিল সিস্টেমের উদ্ভাবনী প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। যাদের জন্য এই নিরাপত্তা বাবস্থা করা হয় তাদের সাথে কথা বলার কোন লোকজন, বন্ধু ছিল না। ফলস্বরূপ তাদেরকে একটি সন্মানিত ব্যাক্তির বাড়িতে রাখার বাবস্থা করা হয়েছিল। যেখানে চিকিৎসকরা পর্যায়ক্রমে তাদের স্থিতি পরীক্ষা করতে পারেন। অনেক ব্যর্থ চেষ্টার পর, ১৮৭২ সালের ঢাকার আশ্রয়ের সুপার ইন্টেনটেড মুখ্য সার্জন J.Wise দুইজন স্থানীয় ব্যাক্তির কাছে ছয়জন পাগলের থাকার বাবস্থা করেন , এবং অন্য তিনজন রোগীকে একটি সাধারন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছে রাখা হয়। প্রতিটি বোর্ডকে মাসে ৫ টাকা করে দেওয়া হতো। যেখানে আশ্রয়ে থাকাকালীন ৭ - ১০ টাকা করে খরচ হয়। ফলস্বরূপ এই বাবস্থাটি আর্থিক সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। প্রধান সমস্যা ছিল তাদের পক্ষে যথেষ্ট ভয়ের , যারা রোগীদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছিল, তারা রোগীর যত্ন, রোগ মুক্তিতে দায়বদ্ধ ছিল।

উনিশ শতকের শেষ দিকে পশ্চিমা এবং অধিক জনপ্রিয় দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা দেখা যায়। ব্রিটিশ আশ্রমের সুপার ইন্টেনটেডরা উন্মাদ রোগ চিকিৎসায় ঝাড়ফুঁক , তুকতাক, ভূত ঝাড়ানো প্রভৃতি সমস্যার দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতিকে খুবই ঘৃণা করত। কিন্তু পরবর্তী কালে দেশীয় পদ্ধতির চিকিৎসা ব্যবস্থা তথা , আয়ুর্বেদ পদ্ধতিতে উন্মাদ চিকিৎসা প্রনালী যেগুলিকে পশ্চিমাদেশ গুলি তারা তাদের জটিল উন্মাদরোগের সহায়ক পদ্ধতি হিসাবে গ্রহন করে। কার্যকরী পদ্ধতিগুলো কোন একসময় তারা অবহেলা করেছিল, ভুলে গিয়েছিল সেই

দেশীয় পদ্ধতিগুলিই বর্তমানে তাদের চিকিৎসা বাবস্থায় অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই উদ্ধত মনোভাব, উপনিবেশিক সরকারের ইংরেজি নীতির প্রভাব থেকে এখানে দৃষ্টি নিবন্ধ হয়েছিল। মেকলের মিনিট ১৮৩৫ সালে শিক্ষা বিষয়ে স্পষ্ট প্রকাশ করেছেন, ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে ইংরেজ এবং পশ্চিমা শিক্ষায় মূল্যবোধের প্রাধান্য অনুমোদিত হয়েছে।

অতীত ইতিহাসে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে দেখা যায় যে, ভারতীয় উন্মাদ আশ্রমের প্রতিবেদনে ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতিতে ছিল মানবিক মূল্যবোধ প্রতিফলন। উনিশ শতকের বেশির ভাগ সময় ধরে পাগলের নৈতিক চিকিৎসার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল [40]। যার মান মূল্যবোধ শেষে প্রকৃত বুঝতে পারা যায়। তবুও , এই চিকিৎসা পদ্ধতিগুলি আঠারো এবং উনিশ শতকের সময়কালে উন্মাদ আশ্রয়ে মানসিক ব্যধির নিরাময়ের জন্য স্থানীয় ও দেশীয় ধারনাকে উপেক্ষা করা হয়।

## ঔপনিবেশিক আমলে পাগল চিকিৎসা

বিভিন্ন ঐতিহাসিক দলিল থেকে জানা যায় ঔপনিবেশিক আমলে ১৮৫৭ সালের আগে পর্যন্ত উন্মাদ আশ্রমের চিকিৎসা ছিল খুবই প্রকট। ১৭৪৫ সালে বোম্বেতে ভারতের প্রবীনতম উন্মাদ আশমে প্রতিষ্ঠিত হয় যা প্রায় ৩০ শয্যাবিশিষ্ট উন্মাদ রোগীর আশ্রমিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা ও সেবা দান করা হতো, ওপর দিকে সার্জন কেন্ডারলাইন ১৭৮৭ সালে কোলকাতায় ভারতে প্রথম উন্মাদ আশ্রমে পাগল চিকিৎসা শুরু করেন। এটি ছিল ব্যক্তিগত উন্মাদ আশ্রম যা মেডিকেল

---

[40] আই ও আর/পি/১৩/৩৭, ৬ অক্টোবর ১৮৪১ নং-১৬-১৭- ডিজিটাল মেনুসক্রিপ্ট (ডেট অফ এক্সেশন- ৫.০২.২০২১)
আই ও আর/পি/১৩/৩৭, ৮ সেপ্টেম্বর ১৮৪১ নং-২১-২২- ডিজিটাল মেনুসক্রিপ্ট (ডেট অফ এক্সেশন- ৫.০২.২০২১)
আই ও আর/পি/১৩/৩৭, ১৪ জুলাই ১৮৪১ নং-২৬-২৭- ডিজিটাল মেনুসক্রিপ্ট (ডেট অফ এক্সেশন- ৫.০২.২০২১)
আই ও আর/পি/১৪/৩১, ০১ সেপ্টেম্বর ১৮৪১ নং-২৩-২৪- ডিজিটাল মেনুসক্রিপ্ট (ডেট অফ এক্সেশন- ৫.০২.২০২১)

বোর্ড দ্বারা স্বীকৃত এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ভাড়া দিয়ে সার্জন উইলিয়াম ডিকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতো[41] ।

১৮০০-এর বিভিন্ন রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেও বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী তে উন্মাদ আশ্রমের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পায় । এটা কৌতূহলজনক যে অন্যান্য তিনটি প্রেসিডেন্সীর তুলনায় বাংলা তে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক নিযুক্ত ইংরেজ ও ভারতীয় 'সিপাহী' দের চিকিৎসা ও পরিচালনার জন্য হাসপাতাল স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা আরো তীব্র হয়ে ওঠে। বাংলায় মিলিটারি লুনাটিকদের জন্য ১৮৯৫ সালের ১৭ এপ্রিল বিহারের মুঙ্গেরে প্রথম সরকার পরিচালিত উন্মাদ চিকিৎসার জন্য আশ্রম খোলা হয়। আবার দক্ষিণ ভারতের প্রথম মানসিক হাসপাতাল ১৮৯৪ সালে মাদ্রাজের কিলপাউকে সার্জন ভ্যালেন্টিন কনোলি কর্তৃক শুরু হয়। উনিশ শতকের প্রথম দিকে এই আশ্রম গুলিতে উত্তেজিত উন্মাদ রোগীদের আফিম দিয়ে চিকিৎসা করা হয়[42] , আবার ঠান্ডা জলে স্নান করানো এছাড়াও রোগীদের শান্ত করার জন্য একটি সঙ্গীত পদ্ধতি ব্যবহার করা হতো [43]। ওপর দিকে লোক সমাজে ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় চিকিৎসকরা আয়ুর্বেদ এবং ইউনানি পদ্ধতিতে উন্মাদ রোগের চিকিৎসা করতেন ।

১৮৫৮ থেকে ১৯১২ খ্রীঃ, এই কালপর্বের মধ্যে ঔপনিবেশিক বাংলায় উন্মাদ আশ্রম সংখ্যা ধারাবাহিক ভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৮৫৮ সালে প্রথম লুনাসি অ্যাক্ট (অ্যাক্ট নং ৩৬ নামেও পরিচিত) প্রণয়নের জন্য এই সময়কালটি উল্লেখযোগ্য ছিল। কারন এই আইনের মাধ্যমে উন্মাদ রোগীর দের চিকিৎসার জন্য নানা ররকম নিয়ম কানুন তৈরি হয়। ১৮৫৮ এর উন্মাদ আশ্রমের আইনের চিকিৎসা সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয়ে অপূর্ণতা থাকলে ১৮৫৮ - এর পঞ্চম আইনটি পরবর্তীতে

---

[41] আর্নস্ট ডব্লিউ. দ্যা রাইস অফ দ্যা ইউরোপীয়ান লুনেসি অ্যাসাইলাম ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া (১৭৫০-১৮৫৮) ইন্ডিয়ান হিস্টোরি মেড হায়দ্রাবাদ। ১৯৮৭; ১৭;৯৪-১০৭।

[42] মিলস জে, রে-ফরমিং দ্যা আদার ট্রিটমেন্ট রেজিমস ইন দ্যা লুনেটিক অ্যাসাইলাম অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, ১৮৫৭-১৮৮০, ইন্ডিয়া ইকোনোমিক সোশ্যাল হিস্টোরি , ১৯৯৯-৪-৪০৭—২৯।

[43] মিলস জে, দ্যা হিস্টোরি অফ মর্ডান সাইকিয়াট্রি ইন ইন্ডিয়া ১৮৫৮-১৯৪৭, হিস্টোরি সাইকিয়াট্রি, ২০০১-১২-৪৩১—৫৮

১৮৮৮ সালে বাংলায় নিযুক্ত একটি কমিটি দ্বারা সংশোধন করা হয় এবং মেডিক্যাল বোর্ডের সহযোগিতায় উন্মাদ রোগীদের চিকিৎসার বিষয়ে গুরুত্ব পূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এই সময়ে দুলান্দা, পাটনা, ঢাকা, ভবানীপুর, বহরমপুর, কটক ময়দাপুর ইত্যাদি আশ্রমে পশ্চিমে যে 'নৈতিক ব্যবস্থাপনা' ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছিল, তা গৃহীত হয়। এই সময়ের মধ্যে ভারতে মানসিক রোগের চিকিৎসাও চালু করা হয়, যেমন- ক্লোরাল হাইড্রেট। এর উদ্দেশ্য ছিল মূলত রোগীদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা এবং একই সাথে রোগীকে ঘুমের মাধ্যমে তার অবস্থা থেকে কিছুটা বিশ্রাম দেওয়া[44] ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে মানসিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। একটি নতুন এবং স্বতন্ত্র সময়ের সূচনার ইঙ্গিত দেয়, এই সময় ১৯১৮ সালে রাঁচিতে ইউরোপীয় মানসিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা হয় , এইহাসপাতালের তৎকালীন সুপার ইনটেনডেন্ট (বর্তমানে সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ সাইকিয়াট্রি নামে পরিচিত), কর্নেল ওয়েন এ.আর. বার্কলে-হিল, এর পরিচালনায় মানসিক চিকিৎসা ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন হয় । সে সময় ভারতের একটি অনন্য কেন্দ্রে পরিণত হয় যা অনেক ইউরোপীয় রোগীকে আকৃষ্ট করে। তাছাড়াও বার্কলে-হিল সে সময় মানসিক হাসপাতালের উন্নতি নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ছিল।

রাঁচিতে মানসিক আশ্রমে প্রথমদিকে ইউরোপীয় রোগীদের চিকিৎসার জন্য স্থির কথা, ১৯১৮ সালের পরে সকলের জন্য উন্মুক্ত করা হয় । বার্কলে-হিলের প্রচেষ্টায় শুধুমাত্র চিকিৎসা এবং যত্নের মান বাড়াতে সাহায্য করেনি, একই সাথে সরকারকে ১৯২০ সালে 'এসাইলাম' শব্দটি পরিবর্তন করে "হাসপাতাল" পরিণত করতে উৎসাহিত করে। ভারতে মানসিক রোগী দের পুনর্বাসন ও উদ্ভাবনী পন্থার মাধ্যমে চিকিৎসা হিলের ভাবনা চিন্তা ও বিভিন্ন কর্মসূচীতে খুঁজে

[44] এস.এইচ. নিজামি অ্যান্ড এন. গোয়াল, হিস্টোরি অফ সাইকিয়াট্রি ইন ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ সাইকিয়াট্রি। ২০১০, জানুয়ারী নং- ৫২, সাপ্লিমেন্ট, ইস্যু ১ পৃ- ১০

পাওয়া যায়, যা ১৯২২ সালে সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ সাইকিয়াট্রি (সি.আই.পি) শুরু হয় যখন অকুপেশনাল থেরাপি ইউনিট শুরু হয়। এরপর ১৯২৩ সালে হাইড্রোথেরাপি শুরু হয় এবং একই সময়ে হাসপাতাল মানসিক পরিচ্ছন্নতা এবং প্রোফিল্যাক্সিসের প্রতি জনগণের আগ্রহ বাড়াতে শুরু করে, মনোরোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করে[45]।

১৯২০ সালে প্রথম পাগল চিকিৎসার জন্য এই মানসিক হাস্পাতালে রোগীদের জন্য নতুন কৌশল শুরু করা হয় এবং যাকে "অভ্যাস গঠন চার্ট" নামে ডাকা হয়। গিরিন্দ্র শেখর বসু কলকাতায় ইন্ডিয়ান সাইকোঅ্যানালিটিক্যাল সোসাইটিতে মনোরোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে ঐ একই পদ্ধতি অনুসরণ করতেন । তিনি ভারতের মনোরোগ চিকিৎসার প্রাচীনতম অনুশীলনকারীদের একজন যিনি মনোরোগীদের জীবনের সাথে মানিয়ে নিয়ে এই কৌশল (রগীদের "অভ্যাস গঠন চার্ট") ব্যবহার করেন।

প্রসঙ্গত অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ঔপনিবেশিক শাসকগণ বাংলায় পাগল চিকিৎসা ও নিয়ন্ত্রন কে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সুস্পষ্ট রূপ হিসেবে বর্ণনা করেছেন [46]। তাদের এই ধারনার কতটা যুক্তি যুক্ত তা অনেকটা সংশয়যুক্ত। সামাজিক নিয়ন্ত্রন নয় বরং ভারতে পাগলদের কে তারা প্রাথমিক ভাবে ব্যবহার করেছিল । আর এদেশের উন্মাদ আশ্রম গুলিকে পরীক্ষাগার হিসাবে গড়ে তুলেছিল। কারন মনোচিকিৎসার চর্চা তখন সবেমাত্র শুরু হয়েছিল , ভারতে মানসিক আশ্রমগুলির চিকিৎসার দ্বারা ব্রিটিশ মনোরোগ ব্যাপকভাবে প্রভাবিত এবং এদেশ কে পাগল চিকিৎসার জন্য উন্মাদ আশ্রম গুলি প্র্যাকটিস ক্ষেত্র হিসাবে গ্রহন করেছিল।

---

[45] দ্যা ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেট, ১৯২২ জুলাই, ৬৪(৭); ৩৬২—৩৭১, জে, ই, ধুঞ্জিভয়, এনসেফালাইটিস লেথারজিকা—A ব্রিফ ডেসক্রিপশন অফ দ্যা ডিজিস, উইথ শর্টস নোটস অন দ্যা পোস্ট-এনসেফালিটিক লেথারজিক কেস ট্রিয়েটেড এট দ্যা রাঁচি ইন্ডিয়ান মেন্টাল হস্পিটাল

[46] আই ও আর/পি/১৩/৩৭, ৪ আগস্ট ১৮৪১ নং-০৪-০৫- ডিজিটাল মেনুসক্রিপ্ট (ডেট অফ এক্সেশন- ৫.০১.২০২১)

# ভবানী পুর উন্মাদ আশ্রমে রোগীদের তালিকা, অক্টোবর- ১৮৪১[৪৭]

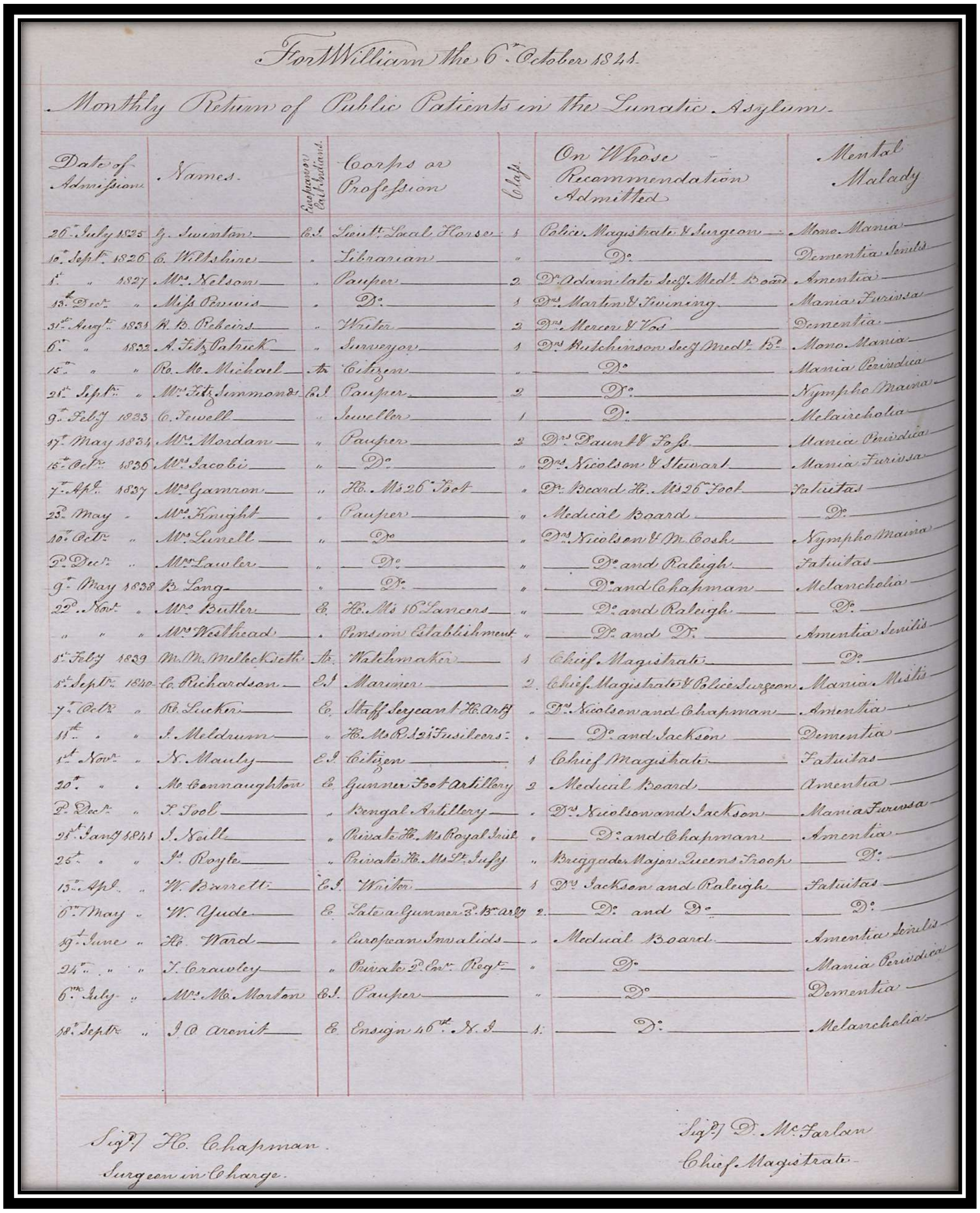

Fort William the 6th October 1841.

Monthly Return of Public Patients in the Lunatic Asylum.

| Date of Admission | Names | European or East Indians | Corps or Profession | Class | On Whose Recommendation Admitted | Mental Malady |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26th July 1825 | G. Swinton | E.I. | Lieut. Local Horse | 1 | Police Magistrate & Surgeon | Mono Mania |
| 10th Septr. 1826 | C. Wiltshire | " | Librarian | " | Do. | Dementia Senilis |
| 1st " 1827 | Mrs. Nelson | " | Pauper | 2 | Dr. Adam late Secy. Medl. Board | Amentia |
| 13th Decr. " | Miss Purvis | " | Do. | 1 | Drs. Martin & Twining | Mania Furiosa |
| 31st Augt. 1831 | H. B. Pebeirs | " | Writer | 2 | Drs. Mercer & Vos | Dementia |
| 6th " 1832 | A. FitzPatrick | " | Surveyor | 1 | Drs. Hutchinson Secy. Medl. Bd. | Mono Mania |
| 15th " " | R. McMichael | Ar. | Citizen | " | Do. | Mania Periodica |
| 25th Septr. " | Mrs. FitzSimmonds | E.I. | Pauper | 2 | Do. | Nympho Mania |
| 9th Feby. 1833 | C. Jewell | " | Jeweller | 1 | Do. | Melancholia |
| 17th May 1834 | Mrs. Mordan | " | Pauper | 2 | Drs. Daunt & Foss | Mania Periodica |
| 15th Octr. 1836 | Mrs. Jacobi | " | Do. | " | Drs. Nicolson & Stewart | Mania Furiosa |
| 7th Apl. 1837 | Mrs. Gamron | " | H. M's 26th Foot | " | Dr. Beard H. M's 26th Foot | Fatuitas |
| 23d May " | Mrs. Knight | " | Pauper | " | Medical Board | Do. |
| 10th Octr. " | Mrs. Lunell | " | Do. | " | Drs. Nicolson & McCosh | Nympho Mania |
| 2d Decr. " | Mrs. Lawler | " | Do. | " | Do. and Raleigh | Fatuitas |
| 9th May 1838 | B. Lang | " | Do. | " | Do. and Chapman | Melancholia |
| 22d Novr. " | Mrs. Butler | E. | H. M's 16 Lancers | " | Do. and Raleigh | Do. |
| " " " | Mrs. Westhead | " | Pension Establishment | " | Do. and Do. | Amentia Senilis |
| 5th Feby. 1839 | M. M. Melbecksetti | Ar. | Watchmaker | 1 | Chief Magistrate | Do. |
| 5th Septr. 1840 | C. Richardson | E.I. | Mariner | 2 | Chief Magistrate & Police Surgeon | Mania Mitis |
| 7th Octr. " | R. Lucker | E. | Staff Sergeant H. Arty. | " | Drs. Nicolson and Chapman | Amentia |
| 11th " " | J. Meldrum | " | H. M's R. 21 Fusileers | " | Do. and Jackson | Dementia |
| 1st Novr. " | N. Manly | E.I. | Citizen | 1 | Chief Magistrate | Fatuitas |
| 20th " " | Mc Connaughton | E. | Gunner Foot Artillery | 2 | Medical Board | Amentia |
| 2d Decr. " | T. Tool | " | Bengal Artillery | " | Drs. Nicolson and Jackson | Mania Furiosa |
| 21st Jany. 1841 | J. Neill | " | Private H. M's Royal Irish | " | Do. and Chapman | Amentia |
| 25th " " | J. Royle | " | Private H. M's Lt. Infy. | " | Briggader Major Queens Troop | Do. |
| 13th Apl. " | W. Barrett | E.I. | Writer | 1 | Drs. Jackson and Raleigh | Fatuitas |
| 6th May " | W. Yude | E. | Late a Gunner 3d Bn. Arty. | 2 | Do. and Do. | Do. |
| 19th June " | H. Ward | " | European Invalids | " | Medical Board | Amentia Senilis |
| 24th " " | T. Crawley | " | Private 2d Eur. Regt. | " | Do. | Mania Periodica |
| 6th July " | Mrs. McMarton | E.I. | Pauper | " | Do. | Dementia |
| 18th Septr. " | J. O. Aronit | E. | Ensign 46th N. I. | 1 | Do. | Melancholia |

Sigd. H. Chapman.
Surgeon in Charge.

Sigd. D. McFarlan
Chief Magistrate.

## ১৮৭৫ এর বাংলার  লুনাটিকঅ্যাসাইলামের একটি প্রতিবেদনে পাগল চিকিৎসার সরনী

[47] আই ও আর/পি/১৩/৩৭, ৬ অক্টোবর ১৮৪১ নং-১৬-১৭- রিটার্ন অফ পাবলিক পেসেন্ট ট্রিএটেড এট ভবানিপুর অ্যান্ড দুলুন্দা অ্যাসাইলাম- ১৮৪০-৪১

# ইন্ডিয়ান অফিস রেকর্ড থেকে সংগৃহীত[৪৮]

| Asylums. | Total treated. | Cured. | Transferred to friends. | Died. | Daily average strength. | Daily average sick. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dullunda ... ... ... ... | 469 | 83 | 22 | 49 | 309·69 | 11·5 |
| Dacca ... ... ... ... | 353 | 14 | 5 | 39 | 249·55 | 41·4 |
| Patna ... ... ... ... | 360 | 34 | 5 | 16 | 251·93 | 21·77 |
| Cuttack ... ... ... ... | 84 | 8 | 11 | 2 | 62·16 | 1·65 |
| Moydapore ... ... ... ... | 73 | 7 | 1 | 6 | 65·18 | 3·19 |
| Berhampore ... ... ... ... | 253 | 9 | 2 | 15 | 187·93 | 4·94 |

উপরের পরিসংখ্যান থেকে বঝা যাচ্ছে যে " চিকিতসার মোট সংখ্যা " এবং " দৈনিক গড় " যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে যা দুলান্দা, ঢাকা পাটনা এবং ময়দাপুর এসাইলামের ক্ষেত্রে বছরের পরিসংখ্যানের সাথে তুলনা করে বোঝা যায় । ১৮৭৫ খ্রীঃ দুলান্দা পাগল চিকিৎসার সংখ্যা মোট ৪৬৯ জন এর মধ্যে আরোগ্য লাভ করেছে ৮৩, ২২ জন কে অন্যত্র স্থানন্তরন করা হয় , এবং রোগী মৃত্যু সংখ্যা ৪৯ জন । অনুরূপ ভাবে ঢাকা উন্মাদ আশ্রমে মোট রোগী ৩৫৩ জনের মধ্যে ১৪ জন আরোগ্যলাভ, ৫ জন স্থানন্তরন, এবং ৩৯ জনের মৃত্যু হয় । পাটনা আশ্রমে মোট রোগী ৩৬০ জনের মধ্যে ৩৪ জন পুরোপুরি আরোগ্য লাভ করে, ৫ জন কে অন্য আশ্রমে ট্র্যান্সফার করা হয় , এবং ঐ বৎসর ১৬ জন রোগীর মৃত্যু ঘটে। কটক আশ্রমে মোট রোগী ছিল ৮৪ জন, এর মধ্যে ৮ জন আরোগ্য লাভ করে ১১ জনের ট্র্যান্সফার, ও ২ জনের মৃত্যু হয় । ময়দাপুর উন্মাদ আশ্রমে মোট রোগী ছিল ৭৩ জন , ৭ জন আরোগ্য লাভ করে , ১ জনের স্থানাতরন ও জনের মৃত্যু হয় । অপর দিকে বেরহামপুর আশ্রমে রোগীর সংখ্যা ছিল ২৫৩ জন , ৯ জন রোগী সেরে উঠেছিল , ২ জন কে অন্য আশ্রমে ট্র্যান্সফার করা হয় এবং ১৫ জনের মৃত্যু হয় । পর্যালোচনাধীন বছরে বাংলার আশ্রয়ে চিকিৎসাধীন উন্মাদদের মোট সংখ্যার মধ্যে ১০.৪ শতাংশ নিরাময় করা হয়েছে, এবং ৩.১ শতাংশ তাদেও স্বজন কাছে তাদের স্থানান্তরের হয়েছিল । আগের বছরের

---

[৪৮] আই ও আর-পি-১০০৫ মার্চ ১৮৭৭ নং, ১৯-২১, রেজোলিউশন রিগার্ডিং দ্যা আনুয়াল রিপোর্ট অন দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম অফ বেঙ্গল ফর ১৮৭৫, ফুল, রেজোলিউশন রিগার্ডিং দ্যা আনুয়াল রিপোর্ট অন দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম অফ বেঙ্গল ফর ৮৭৫

অনুরূপ অনুপাত ছিল ১৩.৮৯ শতাংশ।নিরাময়, এবং ৩.৪ শতাংশ উন্নতি হয়েছিল । বিগত বছরগুলোতে যেমন দেখা গেছে, পাগলামির সবচেয়ে সাধারণ শারীরিক কারণগুলি ছিল, প্রথমত, গাঁজা এবং ভাং-এ অত্যধিক সেবন , অসহিষ্ণুতার অভ্যাস; তৃতীয়ত, বংশানুক্রমিক প্রিডিসপোজড, এবং চতুর্থত, মৃগীরোগ, এছারও পূর্ববর্তী প্রতিবেদনের ২৩তম অনুচ্ছেদে দেওয়া একটি টেবিল থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বছরের শেষের দিকে চিকিৎসাধীন উন্মাদদের ক্ষেত্রে, ৭২.৮ শতাংশ। দীর্ঘস্থায়ী উন্মাদনা এবং দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিভ্রংশের ঘটনা ছিল, যখন বছরে ভর্তির ক্ষেত্রে ৪২ শতাংশ।

## ঢাকা ইনসেন হসপিটালে ভর্তি উন্মাদ রোগীদের সংখ্যা

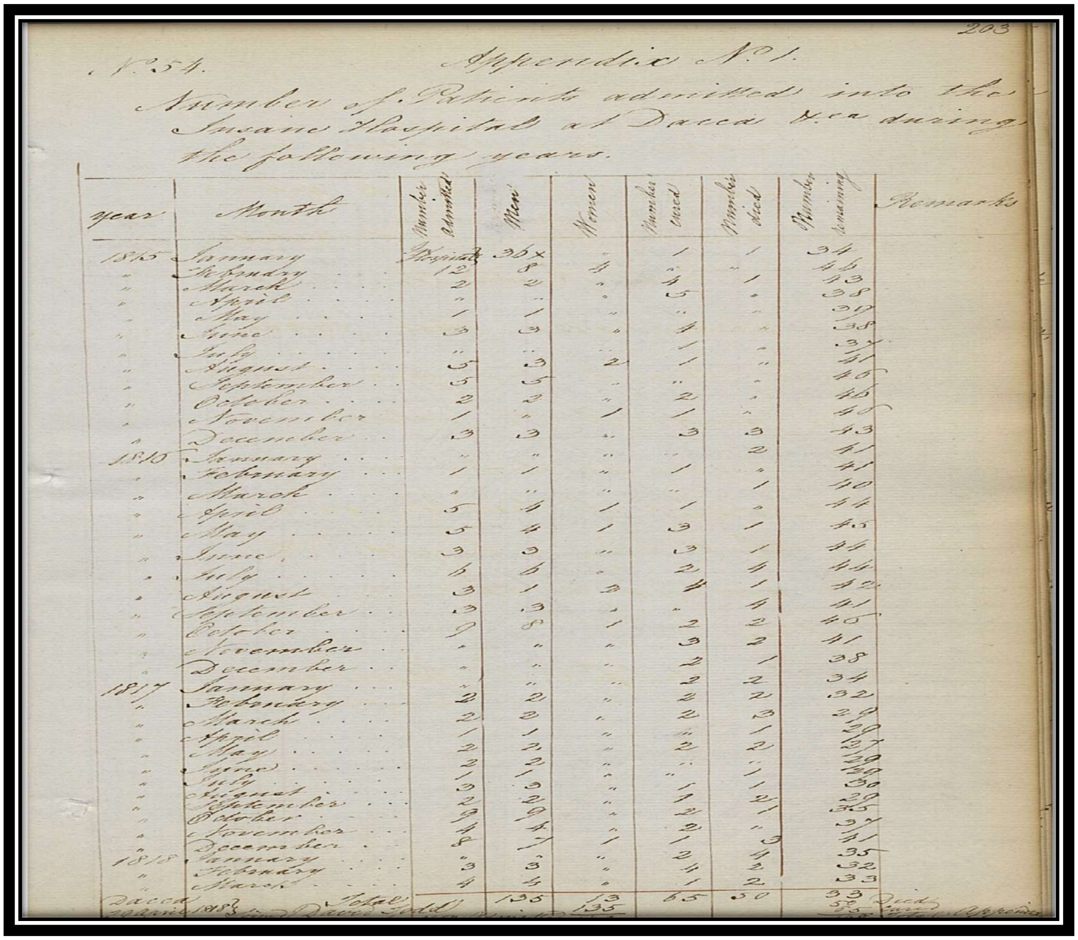

203

No. 54. Appendix No. 1.

Number of Patients admitted into the Insane Hospital at Dacca &ca during the following years.

| Year | Month | Number admitted | Men | Women | Number cured | Number died | Number remaining | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1815 | January | Hospital | 36x | " | 1 | 1 | 34 | |
| " | February | 12 | 8 | 4 | " | " | 46 | |
| " | March | 2 | 2 | " | 4 | 1 | 43 | |
| " | April | " | " | " | 5 | " | 38 | |
| " | May | 1 | 1 | " | " | " | 39 | |
| " | June | 3 | 3 | " | 4 | " | 38 | |
| " | July | " | " | " | 1 | " | 37 | |
| " | August | 5 | 3 | 2 | 1 | " | 41 | |
| " | September | 5 | 5 | " | " | " | 46 | |
| " | October | 2 | 2 | " | 2 | " | 46 | |
| " | November | 1 | " | 1 | 1 | " | 46 | |
| " | December | 3 | 3 | " | 3 | 3 | 43 | |
| 1816 | January | " | " | " | " | 2 | 41 | |
| " | February | 1 | 1 | " | 1 | " | 41 | |
| " | March | " | " | " | " | 1 | 40 | |
| " | April | 5 | 4 | 1 | 1 | " | 44 | |
| " | May | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 45 | |
| " | June | 3 | 3 | " | 3 | 1 | 44 | |
| " | July | 6 | 6 | " | 2 | 4 | 44 | |
| " | August | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 42 | |
| " | September | 3 | 3 | " | " | 4 | 41 | |
| " | October | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 46 | |
| " | November | " | " | " | 3 | 2 | 41 | |
| " | December | " | " | " | 2 | 1 | 38 | |
| 1817 | January | " | " | " | 2 | 2 | 34 | |
| " | February | 2 | 2 | " | 2 | 2 | 32 | |
| " | March | 2 | 2 | " | 2 | 3 | 29 | |
| " | April | 1 | 1 | " | " | 1 | 29 | |
| " | May | 2 | 2 | " | 2 | 2 | 27 | |
| " | June | 2 | 2 | " | " | " | 29 | |
| " | July | 1 | 1 | " | " | 1 | 29 | |
| " | August | 3 | 3 | " | 1 | 1 | 30 | |
| " | September | 2 | 2 | " | 1 | 2 | 29 | |
| " | October | 9 | 9 | " | 2 | 1 | 35 | |
| " | November | 4 | 4 | " | 2 | " | 37 | |
| " | December | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 41 | |
| 1818 | January | " | " | " | 2 | 4 | 35 | |
| " | February | 3 | 3 | " | 4 | 2 | 32 | |
| " | March | 4 | 4 | " | 1 | 2 | 33 | |
| Dacca 1818 | Total | | 135 | 13 / 135 | 65 | 50 | 33 / 50 / 65 | Died / Cured |

১৮১৫,১৮১৬ ও ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দের ঢাকা ইনসেন হসপিটালে ভর্তি উন্মাদ রোগীদের সংখ্যা জানুয়ারিথেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত[49]

---

[49] আই ও আর-এফ-৬১৭-১৫৩৭৩, রিপোর্ট অফ দ্যা মেডিক্যাল বোর্ড অন দ্যা এডমিনিস্ট্রেশন অফ দ্যা লুনাটিক অ্যাসাইলাম এট ঢাকা , মুর্শিদাবাদ, পাটনা, বারাণসী, বেরেলি অ্যান্ড রসপাগলা পাবলিসড ডিসেম্বর ১৮১৬-ডিসেম্বর-১৮১৯

## দুলান্দা লুনাটিক অ্যাসাইল্যামের উন্মাদ রোগী চিকিৎসার একটি তালিকা - ১৮৬২এর প্রতিবেদনে [50]

***ANNUAL RETURN** of Native Insane Patients treated in the Asylum at Dullunda during the year* 1862.

FORT WILLIAM, DULLUNDA, *1st January* 1863.

( 19 )

| Number. | NAMES. | Age. | Occupation. | Caste. | Birth-place. | Diseases. | Cause. | Complication. | Date of | | | Deaths. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Admissions. | Discharged cured. | Transferred to friends, improved. | Date. | Cause. |
| | MALES. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Joyoh Cowrah | 57 | Coolie | Hindoo | Bengal | Mania Chronic | Unknown | None | 7th Jan. 1832. | | | | |
| 2 | Chonee, prisoner | 63 | Unknown | Burmah | ditto | Monomania | ditto | ditto | 3rd July 1836. | | | | |
| 3 | Kristhurry | 56 | Shop-keeper | Hindoo | ditto | Mania Chronic | Intemperance | ditto | 31st Sept. ,, | | | | |
| 4 | Ram Singh | 43 | Cook | Madrajee | ditto | ditto | Unknown | ditto | 31st ,, ,, | | | | |
| 5 | Rajkrist Dutt | 56 | Carpenter | Hindoo | ditto | Monomania | Intemperance | ditto | 7th Oct. 1839. | | | | |
| 6 | Nubloo Pode, prisoner | 43 | Mason | ditto | ditto | Mania Chronic | Unknown | ditto | 26th Mar. 1846. | | | | |
| 7 | Nilmonee, prisoner | 25 | Unknown | ditto | ditto | ditto | ditto | ditto | 7th Oct. ,, | | | | |
| 8 | Kadarnauth | 37 | ditto | ditto | ditto | Dementia | ditto | ditto | 12th Dec. ,, | | | | |
| 9 | Bengallee or Jeetoo | 60 | Mehter | ditto | ditto | Mania Chronic | ditto | ditto | 7th Mar. 1847 | ... | ... | 3rd Nov... | Fever. |
| 10 | Raragopaul, prisoner | 47 | Unknown | ditto | ditto | ditto. | Masturbation | ditto | 7th Jan. 1848. | | | | |
| 11 | Mahamud Joomah, prisoner | 41 | Burkundauz | Mussulman | ditto | ditto | Unknown | ditto | 5th Feb. ,, | | | | |
| 12 | Hossein | 43 | Unknown | ditto | ditto | ditto | ditto | ditto | 7th Mar. ,, | ... | ... | 2nd ,, ... | Asthania. |
| 13 | Chintamonee | 65 | Chamar | Hindoo | ditto | ditto | ditto | ditto | 6th Aug. ,, | | | | |
| 14 | Johurullah | 35 | Khalasee | Mussulman | ditto | ditto | ditto | ditto | 3rd May 1849. | | | | |
| 15 | Muddoo | 37 | Unknown | Hindoo | ditto | ditto | ditto | ditto | 13th ,, ,, | | | | |
| 16 | Kurrumally | 40 | ditto | Mussulman | ditto | ditto | ditto | ditto | 20th Sept. ,, | | | | |
| 17 | Rajnarine | 50 | Washerman | Hindoo | ditto | ditto | ditto | ditto | 2nd Dec. ,, | | | | |
| 18 | Hurremohun, prisoner | 59 | Unknown | ditto | ditto | ditto | ditto | ditto | 14th Jan. 1850. | | | | |
| 19 | Sheik Punnoo | 50 | ditto | Mussulman | ditto | ditto | ditto | ditto | 7th Aug. ,, | | | | |
| 20 | Mohes Chunder Sirkar | 41 | ditto | Hindoo | ditto | ditto | ditto | ditto | 2nd Oct. ,, | | | | |
| 21 | Gowsee | 40 | ditto | Mussulman | ditto | ditto | ditto | ditto | 9th Nov. ,, | | | | |
| 22 | Rammasore | 42 | ditto | Hindoo | ditto | Dementia | ditto | ditto | 4th Dec. ,, | | | | |
| 23 | Sagour | 25 | ditto | ditto | ditto | ditto | ditto | ditto | 4th Jan. 1851. | | | | |
| 24 | Kallee Churn Haldar | 29 | ditto | ditto | ditto | Amentia | ditto | ditto | 2nd Feb. 1852. | | | | |
| 25 | Juggurnauth | 55 | ditto | ditto | ditto | Mania Chronic | ditto | ditto | 29th May ,, | | | | |
| 26 | Rogoonoth or Bhogobone | 42 | ditto | ditto | ditto | ditto | ditto | ditto | 30th ,, ,, | | | | |
| 27 | Mohes Chunder | 29 | ditto | ditto | ditto | ditto | ditto | ditto | 2nd Sept. ,, | | | | |
| 28 | Takoordoss, prisoner | 42 | ditto | ditto | ditto | ditto | ditto | ditto | 6th Mar. 1853. | | | | |
| 29 | Asseemuddee, prisoner | 35 | ditto | Mussulman | ditto | ditto | Epilepsy | ditto | 18th July ,, | | | | |
| 30 | Boykunt | 35 | ditto | Hindoo | ditto | Monomonia | Unknown | ditto | 28th ,, ,, | | | | |
| 31 | Kallee Napith | 40 | Barber | ditto | ditto | Mania Chronic | ditto | ditto | 6th Aug. ,, | | | | |
| 32 | Roshunally | 28 | Unknown | Mussulman | ditto | ditto | ditto | ditto | 3rd Sept. ,, | ... | ... | 13th Jan... | Diarrhoea. |
| 33 | Sheikh Dedar, prisoner | 40 | ditto | ditto | ditto | Dementia | ditto | ditto | 17th Oct. ,, | ... | ... | 18th Nov... | Dysentery. |
| 34 | Goopenauth | 35 | Barber | Hindoo | ditto | Mania Chronic | ditto | ditto | 31st Jan. 1854. | | | | |
| 35 | Ram Chunder | 46 | Unknown | ditto | ditto | ditto | ditto | ditto | 17th Mar. ,, | | | | |
| 36 | Laul Chund or Luchman | 38 | ditto | ditto | ditto | ditto | ditto | ditto | 18th ,, ,, | ... | ... | 31st Dec... | Cholera; |
| 37 | Taruck Cole, prisoner | 34 | ditto | ditto | ditto | Dementia | ditto | ditto | 18th April ,, | | | | |
| 38 | Merageague, prisoner | 35 | ditto | Mug | ditto | Mania Chronic | ditto | ditto | 16th May ,, | | | | |

***ANNUAL RETURN** of Native Insane Patients treated in the Asylum at Dullunda during the year* 1862.—(*Continued.*)

( 20 )

| Number. | NAMES. | Age. | Occupation. | Caste. | Birth-place. | Diseases. | Cause. | Complication. | Date of | | | Deaths. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Admissions. | Discharged cured. | Transferred to friends, improved. | Date. | Cause. |
| | MALES.—(*Continued.*) | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Banamadhub | 36 | Unknown | Hindoo | Bengal | Dementia | Unknown | None | 30th May 1854. | | | | |
| 40 | Sheikh Seyfoo | 36 | ditto | Mussulman | ditto | Mania Chronic | ditto | ditto | 1st June ,, | | | | |
| 41 | Soseebhoosun | 38 | ditto | Hindoo | ditto | ditto | ditto | ditto | 1st Dec. ,, | | | | |
| 42 | Mooneeah | 42 | ditto | ditto | ditto | ditto | ditto | ditto | 1st Aug. 1855. | | | | |
| 43 | Sheikh Guphur Arramdee | 40 | ditto | Mussulman | ditto | ditto | ditto | ditto | 25th ,, ,, | ... | ... | 5th Oct. | Asthania. |
| 44 | Sheikh Asgur, prisoner | 41 | ditto | ditto | ditto | Monomania | ditto | ditto | 25th ,, ,, | | | | |
| 45 | Obhoy Churn Bose | 31 | ditto | Hindoo | ditto | Mania Chronic | ditto | ditto | 25th ,, ,, | | | | |
| 46 | Ugneeram | 40 | ditto | ditto | ditto | ditto | ditto | ditto | 31st ,, ,, | | | | |
| 47 | Prankrist | 40 | ditto | ditto | ditto | Amentia | ditto | ditto | 6th May 1856. | | | | |
| 48 | Pettumber, prisoner | 32 | ditto | ditto | ditto | ditto | ditto | ditto | 25th ,, ,, | | | | |
| 49 | Mothoormohun, prisoner | 35 | ditto | ditto | ditto | Monomania | ditto | ditto | 14th July ,, | | | | |
| 50 | Jadhub Chunder | 32 | ditto | ditto | ditto | Mania Chronic | ditto | ditto | 28th ,, ,, | | | | |
| 51 | Mooneeah | 32 | ditto | ditto | ditto | ditto | ditto | ditto | 29th ,, ,, | | | | |
| 52 | Hydar | 39 | ditto | Mussulman | ditto | Monomania | ditto | ditto | 28th Aug. ,, | | | | |
| 53 | Nubbokrist | 44 | ditto | Hindoo | ditto | Mania Chronic | ditto | ditto | 28th ,, ,, | | | | |
| 54 | Omourtoo, prisoner | 25 | ditto | Dhangur | ditto | ditto | ditto | ditto | 29th ,, ,, | | | | |
| 55 | Muddoo | 25 | ditto | Hindoo | ditto | ditto | ditto | ditto | 4th Dec. ,, | | | | |
| 56 | Audoonauth | 29 | ditto | ditto | ditto | ditto | Intemperance | ditto | 6th Jan. 1857. | | | | |
| 57 | Harradhun Barick | 26 | ditto | ditto | ditto | ditto | Unknown | ditto | 6th Feb ,, | | | | |
| 58 | Tincouree | 36 | Carpenter | ditto | ditto | Dementia | ditto | ditto | 17th ,, ,, | ... | 16th Aug. | | |
| 59 | Laul Chund or Bhuruth | 34 | Unknown | ditto | ditto | Mania Chronic | ditto | ditto | 7th April ,, | ... | ... | 21st Aug.... | Dysentery. |
| 60 | Pranbundoo | 39 | ditto | ditto | ditto | Dementia | ditto | ditto | 3rd May ,, | ... | ... | 15th ,, ... | Asthania. |
| 61 | Gungadhur | 31 | ditto | ditto | ditto | Mania Chronic | ditto | ditto | 24th ,, ,, | | | | |
| 62 | Bogobone | 40 | Milkman | ditto | ditto | ditto | ditto | ditto | 21st Aug. ,, | | | | |
| 63 | Prankrist Chuckurbutty | 24 | Unknown | ditto | ditto | ditto | ditto | ditto | 23rd Sept. ,, | | | | |
| 64 | Hurronoth Sein | 20 | ditto | ditto | ditto | ditto | ditto | ditto | 24th ,, ,, | | | | |
| 65 | Protabe Shan, prisoner | 44 | Beggar | ditto | ditto | ditto | ditto | ditto | 26th ,, ,, | | | | |
| 66 | Madhub | 44 | Goohla | ditto | ditto | Monomania | ditto | ditto | 4th Oct. ,, | | | | |
| 67 | Mungul | 28 | Baneoh | ditto | ditto | Mania Chronic | Intemperance | ditto | 14th ,, ,, | | | | |
| 68 | Kannooram, prisoner | 54 | Unknown | Mug | ditto | ditto | Unknown | ditto | 15th ,, ,, | | | | |
| 69 | Beharee, prisoner | 57 | Milkman | Hindoo | ditto | ditto | Intemperance | ditto | 28th Feb. 1858 | 14th March. | | | |
| 70 | Ram Chunder, prisoner | 35 | Unknown | ditto | ditto | ditto | Unknown | ditto | 29th ,, ,, | | | | |
| 71 | Bholanauth Dey | 38 | ditto | ditto | ditto | ditto | ditto | Chorea St. Viti | 4th April ,, | | | | |
| 72 | Bissen Chunder, prisoner | 54 | ditto | ditto | ditto | ditto | Intemperance | None | 28th ,, ,, | | | | |
| 73 | Ramcoomar Barick | 27 | ditto | ditto | ditto | ditto | Unknown | ditto | [illegible]th ,, ,, | 19th August. | | | |
| 74 | Sheikh Buckshoo | 40 | ditto | Mussulman | ditto | ditto | ditto | ditto | 5th May ,, | 18th March. | | | |
| 75 | Beepoth Hallowye | 31 | Shop-keeper | Hindoo | ditto | ditto | Intemperance | ditto | 22nd ,, ,, | | | | |
| 76 | Mohes Chunder | 32 | Unknown | ditto | ditto | ditto | ditto | ditto | 22nd May ,, | ... | 16th Oct. | | |
| 77 | Narine Doss, prisoner | 41 | ditto | ditto | ditto | ditto | Unknown | ditto | 27th ,, ,, | | | | |
| 78 | Gnophoo, prisoner | 28 | ditto | Mug | ditto | Monomania | ditto | ditto | 29th ,, ,, | ... | ... | 18th Sept... | Asthania. |

[50] অ্যানুয়াল রিপোর্ট অ্যান্ড রিটার্ন অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৬২, জে ম্যাক.ক্লেল্ড,অফিসিয়াটিং প্রিন্সিপাল ইন্সপেক্টর জেনারেল, মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট।

## উনিশ শতকে উন্মাদপীড়ার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় ভারতবর্ষের ইতিহাসে উনিশ শতক হল যুগ পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণ। অর্থনৈতিক , সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে পাশ্চাত্য ভাবধারার সঙ্গে এই সময়ে ভারতের পরিচয় ঘটে। তেমনি উন্মাদরোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রেও তার কোনও ব্যতিক্রম ঘটেনি। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা প্রণালী নিয়ে আলোচনা শুরু হলেও প্রায় একই সময়ে বেসরকারি প্রচেষ্টায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাপ্রণালীরও প্রবর্তন হয়।

হোমিওপ্যাথি দর্শনের ভাষায় উন্মাদ একটা মননপীড়া মাত্র । মনোরাজ্যের বিশৃঙ্খলা যখন এক প্রকার অবস্থায় আসে , তখন মনবিকারগ্রস্থ রোগী কি বলে , কি করে , তা কোনও কিছুই ঠিক করতে পারে না , অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির গোলযোগ ঘটে এবং অনেকটা আত্মবিস্মৃত হয় , অন্যের সাথে তার কি সম্বন্ধ তা ঠিক করতে পারে না ইত্যাদি লক্ষণ যখন দেখা যায় , তখনই লোকে বলে রোগীটি উন্মাদপীড়ায় পীড়িত হয়েছে[51] । আলোচ্য অংশের মূল বিষয় হল ঔপনিবেশিক বাংলায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাবিদ্যায় উন্মাদপীড়া কেমন ভাবে দেখা হতো এবং এই পদ্ধতিতে কিভাবে চিকিৎসা করা হতো তা আলোচনা করা ।

## হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাবিদ্যায় উন্মাদপীড়া

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের মতে- অন্য কোনও প্যাথিতে উন্মাদরোগ সারে না। একথা বলার প্রধান বা একমাত্র কারণ হল , আয়ুর্বেদ ও হোমিওপ্যাথি ছাড়া অন্য প্যাথির ঔষধ স্থূলভাবে ব্যবহৃত করা হয়, সূক্ষ্মন্তরে আদৌ উন্নীত হয় না , সুতরাং ঐ সকল ঔষধের দ্বারা মনোবৈকল্য টি প্রভাবান্বিত হয় না । কারন মনন্তর অতিমাত সূক্ষ স্তর , এবং সূক্ষ্ম ঔষধ , যাহাকে ইংরাজীতে dynamic বলে[৫২], সেই প্রকার সূক্ষ্ম-অতি সূক্ষ্ম ঔষধ ব্যতীত মনোরাজ্যের বিশৃঙ্খলা দুরীকরণের

---

[51] ভট্টাচার্য, মহিম মোহন ; (সংকলিত) হোমিওপ্যাথি -দর্শন গবেষণা, দি ইস্টার্ন এন্ড ওরিয়েন্টাল প্রিন্টিং লিঃ , কোলকাতা , ১৩৫১ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ১৩-২০

[52] শ্রী ত্রিগুণা নাথ অর্গানন অফ মেডিসিন, প্রকাশকঃ হ্যানিম্যান পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, প্রথম সংস্করণ ১৩৬৮,ভাদ্র, পৃষ্ঠা ১২।

সামর্থ্য স্থুল ঔষধের সম্ভব নয় [53]। তৎকালীন সুখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক মহিম মোহন ভট্টাচার্যের উদ্ধৃতিটি এখানে উল্লেখ্য-

> *আমি নিজের চিকিৎসা কার্য্যব্যপদেশে অনেক উন্মাদ রোগীর চিকিৎসাক্ষেত্রে তাহাদের ইতিহাস প্রাপ্ত হয়েছি যে , অনেকদিন পূর্বে রোগীর যখন পূর্ণমাত্রায় মানসিক বৈকল্য উপস্থিত হয়েছিল, তখন চিকিৎসক ঔষধ সাহায্যে সে অবস্থা প্রশমিত করিয়াছিলেন এবং রোগীর উম্মাদ লক্ষণ অপসারিত হইয়া গিয়া ঠিক সহজ মানুষের মত আহার বিহারাদি করতেছিল এবং তাহার পর কিছুদিন বেশ ভাল থাকিবার পর পুনরায় আক্রান্ত হয়। অথবা ইহাই দেখিয়াছি যে , এইরূপ বার বার উন্মাদ লক্ষণ সকল আসে এবং সেই সময়ের জন্য চিকিৎসার দ্বারা আবার ভাল হয় । ফলতঃ উন্মাদ লক্ষণগুলি চিরদিনের মত আরোগ্য হতেছে না । উন্মাদ-রোগীর চিকিৎসায় যেখানে যেখানে সর্বপ্রথমেই আহূত না হয়েছি , সেখানে সেখানেই এই প্রকার ইতিহাস প্রাপ্ত হইয়া থাকি বলিয়াই মনে হয় যে , আমার চিকিৎসক ভ্রাতাদিগের বোধ হয় এই পীড়ার চিকিৎসা বিষয়ে অনেকেরই পূর্ণজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ হয় নাই । এক্ষণে সেজন্যই ইহার চিকিৎসা সম্পর্কে কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় আলোচনা করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছি । এ বিষয়ে আমার বক্তব্যটা কেবল এক কথায় লিখিতে হইলে বলিতে হয় যে , মন স্তরের কোন পীড়ার পশ্চাতে বাহ্য দৈহিক পীড়া সকল চাপা থাকা , লোপ পাওয়া ইত্যাদি থাকেই থাকে , সুতরাং মনোলক্ষণগুলির তিরোভাব ঘটিলেও চিকিৎসার বিরাম হওয়া কখনও সঙ্গত নয় , কেননা যে চাপা পড়া পীড়লক্ষণের জন্য মনোপীড়া উপস্থিত হয়েছিল , তাহার পুনঃপ্রকাশ এবং আরোগ্য ব্যতীত রোগীকে " আবোগ্যপ্রাপ্ত " বলিয়া মনে করা গৃহস্থ ও চিকিৎসক উভয়ের পক্ষেই ভ্রমাত্মক । যখনই কোন উন্মাদবরাগী সর্বপ্রথমে হাতে আসিবে , তখনই তাহার যাবতীর পূর্ব পীড়াগুলি এবং তাহাদের চিকিৎসার ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গ্রহণ ও রোগী লিপিখানি সর্বাঙ্গসুন্দররূপে লিখিত হওয়া নিতান্তই আবশ্যক[54] ।*

এছাড়াও চিকিৎসক মহিমমোহন যথার্থই বলেছেন যে, *"যারা উন্মাদ রোগ দেখা দিলে বেলেডোনা, হাইওসিয়েমাস বা ঔমোনিয়াম অথবা এই প্রকার কোনও লঘুজাতীয় ঔষধকেই চরম আরোগ্যদায়ক বলে মনে করেন , তাদের পক্ষে এ বিষয়ের অবতারণা নিরর্থক । অর্থাৎ রোগীর দিনলিপি তৈরি না করে কেবল মৌখিক বর্ণনা শুনে উন্মাদ রোগের ঔষধ নির্বাচনের করা যায় না । এর জন্য রোগীর চিকিৎসার জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়"*[55], ডঃ ভট্টাচার্যের মতে , উন্মাদ পীড়া চিকিৎসার জন্য প্রথমে রোগী সম্মন্ধে সম্যক

---

[53] ভট্টাচার্য , মহিম মোহন ; (সংকলিত) হোমিওপ্যাথি দর্শন গবেষণা, দি ইস্টার্ন এন্ড ওরিয়েন্টাল প্রিন্টিং লিঃ , কোলকাতা , ১৩৫১ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ১৪ *উন্মাদ পীড়ার চিকিৎসাটী সাধারণতঃ যে ভাবে অবলম্বিত হয়ে থাকে এবং উহা যে ভাবে হওয়া উচিত ,যাহাতে রোগীটা নির্ম্মলভাবে আরোগ্যলাভ করতে পারে , সেই বিষয়েই আলোচনা করতে হইবে । সর্ব্ব প্রথম একটা কথা লিখিত হওয়া সঙ্গত যে , উচ্চাঙ্গের প্রকৃত আয়ুর্বেদ এবং হানিম্যানের প্রকৃত হোমিওপ্যাথি ব্যতীত উন্মাদপীড়ার কোনও প্রতীকার হয় না । কেহ হয়ত মনে করতে পারেন যে , আমরা হোমিওপ্যাথ বলিয়া এলোপ্যাথি - বিদ্বেষী , এজন্যই একথা কহিতেছি । আমার সবিনয় নিবেদন এই যে , আমার কোনও প্রকার বিদ্বেষ নাই , একমাত্র সত্যের খাতিরে একথা লিখিতে বাধ্য হতেছি , বলিয়াই লিখিতেছি । যদি সে ভাবে কেহ আমাকে ও আমার আলোচনাকে বিদ্বেষদোষদুষ্ট বলিয়া মনে করেন , তবে তিনিই অন্যায় করিবেন এবং সত্যের প্রতি প্রকৃত সমাদর প্রদর্শনে তিনিই বিচলিত হইবেন । হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের মতে - অন্য কোনও প্যাথিতে উন্মাদরোগ সারে না, একথা বলার প্রধান বা একমাত্র কারণ হল , আয়ুর্বেদ ও হোমিওপ্যাথি ছাড়া অন্য প্যাথির ঔষধ স্থূলভাবে ব্যবহৃত করা হয় , সূক্ষ্মন্তরে আদৌ উন্নীত হয় না , মনোরাজ্যের বিশৃঙ্খলা দূরীকরণের সামর্থ্য স্থূল ঔষধের সম্ভব নয়। যাহারা উন্মাদ বলিলেই বেলেডোনা , হাইওসিয়েমাস বা ঔমোনিয়াম অথবা এই প্রকার কোনও লঘুজাতীয় ঔষধকেই চরম আরোগ্যদায়ক বলিয়া মনে করেন , তাহাদের পক্ষে এ বিষয়ের অবতারণা নিরর্থক ।*

[54] ভট্টাচার্য , মহিম মোহন ; (সংকলিত) হোমিওপ্যাথি দর্শন গবেষণা, দি ইস্টার্ন এন্ড ওরিয়েন্টাল প্রিন্টিং লিঃ , কোলকাতা , ১৩৫১ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ১৪

[55] ভট্টাচার্য , মহিম মোহন ; (সংকলিত) হোমিওপ্যাথি দর্শন গবেষণা, দি ইস্টার্ন এন্ড ওরিয়েন্টাল প্রিন্টিং লিঃ , কোলকাতা , ১৩৫১ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ১৬

জ্ঞান লাভ হয় তারপর রোগের কার্য করন সম্পর্ক নির্ণয় নিরীক্ষণ করা হয়। দিনলিপি প্রস্তুত অস্বাভাবিক আচরণ ও মনো বৈকল্য লক্ষন ও তাঁর অস্বাভাবিকতার হ্রাস বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করে চিকিৎসা শুরু করতে হয় । এবং রোগীর বুদ্ধিবৃত্তি, অনুভূতি, মনোবিশৃঙ্খলা জন্ম , রোগীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রভৃতি বিষয় গুরুত্ব দিয়ে চিকিৎসা করা হয়[56] ।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাপদ্ধতিতে কবে এদেশে পাগল চিকিৎসা শুরু হয় , সেই সম্পর্কে কোনও প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় না। জনশ্রুতি অনুসারে একজন জার্মান চিকিৎসক ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের জন্য প্রথম ভারতে আসেন । বাংলাদেশে থাকাকালীন তিনি নিজের ভৃত্য ও অন্যান্য দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে মানসিকরোগের জন্য হোমিওপ্যাথিক ওষুধ বিতরণ করতেন। লন্ডন মিশনারি সোসাইটির মিশনারি ডা . মুলেনস ভবানীপুর অঞ্চলে অনেকদিন ওই ওষুধ বিতরণ করেন । অবসরপ্রাপ্ত সার্জন স্যামুয়েল বুকিং ১৮৪৭ সালে তাঞ্জোরে একটি হোমিওপ্যাথি

---

[56] ভট্টাচার্য , মহিম মোহন ; (সংকলিত) হোমিওপ্যাথি দর্শন গবেষণা, দি ইস্টার্ন এন্ড ওরিয়েন্টাল প্রিন্টিং লিঃ , কোলকাতা , ১৩৫১ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ১৫ উন্মাদের চিকিৎসার বর্ণনা প্রসঙ্গে চিকিৎসকের মন্তব্য – "*যাহার লিপি প্রস্তুত না করিয়াই কেবল মৌখিক বর্ণনা শুনিয়াই ঔষধ নির্বাচনের পক্ষপাতী , এ প্রবন্ধ তাঁহাদের জন্যও নয় । যাহারা মনে প্রাণে রোগীকে প্রকৃত আরোগ্য করিবার ইচ্ছা করেন এবং কি উপায়ে তাহা করতে পারা যায় , তাহার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের ইচ্ছা করেন , তাঁহাদের কার্য সৌকার্য্যার্থে এ সকল বিষয়ের অবতারণা । সর্বপ্রথমেই জানিতে হইবে যে , উন্মাদরোগীর লিপি প্রস্তুতকরণ একেবারেই সমাধা করিবার আশা করা চলে না । সর্বপ্রথমে, তাহার মনো লক্ষণগুলি এবং তাহাদেরই হ্রাস বৃদ্ধি ইত্যাদি লিখিয়া লইতে হয় এবং তাহাদেরই সমষ্টিগত সাদৃশ্যানুসারে কোনও লঘুজাতীয় ঔষধই নির্বাচনযোগ্য হতেছে , ইহাই দেখা যায় । তাহার পর মনোবৈকল্য অপসারিত হইয়া যাইবার পর, রোগ যখন সাধারণ অনন্য গুণে উপনীত হইল , দেখিতে পাওয়া যায় , তখন পুনরায় লিপি প্রস্তুত করিবার অবশ্যকতা আসে এবং তখনই প্রকৃত প্রস্তাবে রোগীলিপি প্রস্তুত করা সম্ভব হয় , তৎপূর্ব্বে হয় না , কেননা তৎপূর্বে রোগী নিজে তাহার বুদ্ধিবৃত্তি ও অনুভূতির বিশৃঙ্খলা জন্ম , তাহার ইচ্ছ , অনিচ্ছা প্রভৃতি ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা প্রকাশ করতে কখনও সমর্থ হয় না, সুতরাং এ সময়েই তাহার ব্যক্তিগত ও ধাতুগত বিশিষ্টতা জ্ঞাপক লক্ষণগুলি প্রাপ্ত হইবার সুবিধা থাকে , তৎপূর্বে থাকে না । সুতরাং এ অবস্থায় তাহার লিপিখানি দ্বিতীয়বার বিশেষ মনোযোগের সহিত প্রস্তুত করা যে একান্ত কর্তব্য সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই । এই দ্বিতীয়বার লিপি প্রস্তুত করে রোগীর ব্যক্তিগত বিশিষ্টতার সমষ্টি হিসাবে ঔষধ নির্বাচন সাহায্যে , নির্মল আরোগ্য আনয়ন করতে না পারলে রোগী আরোগ্য হল , একথা মনে করা সঙ্গত নয় । যদি তা না করা হয় , তবে রোগী অল্প কিছুদিন মাত্র ভাল থাকবে এবং পুনরায় তার উন্মাদ লক্ষণগুলি ফিরে আসবে , তার কোনও সন্দেহ নেই। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হতে পারে , " কেন তা হয় ? এর কারণ এই যে, উন্মাদপীড়া পূর্ণ বিকাশের অবস্থায় যে সকল ঔষধ সূচিত ও নির্বাচিত হয় , সেগুতি অতি লঘুজাতির , সেগুলির গভীরতা আদৌ থাকে না । যেখানে উন্মাদপীড়ার পূর্ণ বিকাশের সময় কোনও ঔষধ না দেওয়া সত্বেও কিছুদিন পরে উন্মাদ লক্ষণগুলি আপনিই অপসারিত হয়ে যায় এবং তখন লঘুচেতা ব্যক্তিগণ মনে করে রোগী উন্মাদ হয়েছিল " -এখন সেরে গেছে , ফলতঃ এ ধারণা কখনও সঙ্গত নয় । উন্মাদপীড়ার ন্যায় এত গভীর জাতি পীড়া আপনিই সারবে , এমন মনে করাও বাতুলতা। অনেক সময় আবার জটীবটী , মাদুলী বা অমুকের "Insanity specific" ইত্যাদি ব্যবহারের পর এই ভাল থাকার অবস্থাটী আসলে অতি অবশ্যই লোকে ধারণা করে থাকে যে , রোগিটা ভাল হয়ে গেছে। ফলতঃ* প্রত্যেক হোমিওপ্যাথি ভ্রাতৃগণকে আমি সসম্ভ্রমে সাবধান করছি , এটি কখনও যেন তারা মনে না করেন । উন্মাদ টিউবার কুলার দোষজ অভিব্যক্তি , সে বিষয়ের সন্দেহ নেই । ঐ দোষের অভিব্যক্তি বা ক্রিয়াস্থান যদি মস্তিস্কে নির্দিষ্ট হয় , তবে তাকে উন্মাদ বলে। কিন্তু যদি ফুসফুসে প্রদাহ কিংবা যক্ষা বলে , ইত্যাদি কোন অন্ত্রে অভিব্যক্তি দেখা দেয় , তবে তাহার নাম গ্রহণী বা Abdominal T. B. বলা হয় , আবার যদি অস্থিতে দেখা দেয় তবে তাহাকে অস্থিক্ষয় বা Bone ' T. B. ইত্যাদি নানা নাম দেওয়া হয়ে থাকে ; ফলতঃ নাম যাই হক , প্রত্যেক প্রকার অভিব্যক্তির প্রকৃতিটা একই প্রকার অর্থাৎ লক্ষণসম্পন্ন , তাহার সন্দেহ নেই । সুতরাং এ প্রকার একটা পীড়া লক্ষণকে অতি সহজসাধ্য মনে করা অন্যায় ও অসঙ্গত । উন্মাদ পীড়াটা প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার দ্বারা আরোগ্য হলে , অতি অবশ্যই দেখা যাবে যে , কোনও একটা বাহ দৈহিক পীড়া চাপা পড়ার ফলে, মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয়েছিল এবং সেই পীড়লক্ষণটা পুনর্বিকাশ প্রাপ্ত হয়ে পড়ে ।

হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন । ১৮৩৯ সালে জার্মান হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডা . জন মার্টিন হনিগৰাৰ্গার মহারাজা রঞ্জিত সিংকে চিকিৎসা করে সুস্থ করেন । সদর দেওয়ানী আদালতের জর্জ মি. ডিলাটর কলেরা অধ্যুষিত ডায়মন্ডহারবারে বিনা পয়সায় হোমিওপ্যাথি ওষুধ বিতরণ করার ময় উন্মাদ রোগীদের আগমন লক্ষ করেন এবং উন্মাদ রোগ নিরসনের জন্য তিনি পদক্ষেপ গ্রহন । ফোর্ট উইলিয়ামে কর্মরত দুজন চিকিৎসক ডা.কুপার ও ডা. জে.রাদারফোর্ড রাসেল অবসর গ্রহণের পর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের পেশা গ্রহণ করেন, এই দুই চিকিৎসকই প্রথম বাংলা প্রেসিডেন্সি তে হোমিওপ্যাথি পদ্ধতিতে পাগল চিকিৎসার সুচনা করেন। অনুরূপভাবে অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক মি . এইচ . রাইপারও খিদিরপুরের কুলিবাজারে হোমিওপ্যাথি পদ্ধতিতে উন্মাদ রোগের চিকিৎসা শুরু করেন [57] ।

ফরাসি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক সি.ফেবরি টনেয়ার ১৮৫১ সালে কলকাতায় আসেন এবং তৎকালীন বাংলার ডেপুটি গভর্নর স্যার জন হান্টার লিটলারের পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতায় একটি হাসপাতাল ও অবৈতনিক চিকিৎসাকেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সেই সময়ে কলকাতায় অল্প কয়েকজনই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাপদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। সামান্য কয়েকজন সৈনিক ও অসামরিক সরকারি কর্মচারীর মধ্যেই এর ব্যবহার ছিল। চিৎপুরের পূর্বদিকে বড়তলা অঞ্চলে ওই হাসপাতালটি স্থাপিত হয় । কালিদাস দত্ত ও শ্যামসুন্দর মিত্র তার সচিব এবং মতিলাল গুপ্ত তার সহকারী চিকিৎসক পদে নিযুক্ত হন। এই হাস্পাতালে উন্মাদ পীড়ার চিকিৎসা শুরু করা হয়। দেশীয়মতে পথ্য তৈরির জন্য সেখানে একজন ব্রাহ্মণ ঠাকুর রাখা হয়। কোলকাতায় মেডিক্যাল কলেজে বহির্বিভাগের ডা. টনেয়ার অল্প কয়েকজন রোগীকে ব্যক্তিগত ভাবে চিকিৎসা করতেন । তাদের আরোগ্যলাভে উৎসাহিত হয়ে ক্রমে ক্রমে রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় । কলকাতার সমস্ত অঞ্চলের রোগীই প্রায় সেখানে ভর্তি হতে থাকে । পরবর্তী ছ-মাসে ওই হাসপাতালের বেড কখনও ফাঁকা থাকেনি । গড়ে ১০০ জন বহির্বিভাগের সুযোগ গ্রহণ করতে থাকে । হাসপাতালে থেকে , ওই ছ- মাসে মোট ৮৫ জন রোগীর চিকিৎসা হয় এর মধ্যে বেশ কয়েক জন উন্মাদ রোগীও ছিল।

---

[57] রায়; বিনয়ভূষণ, চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস : উনিশ শতকে বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব, সাহিত্যলোক , কলকাতা , আশ্বিন ১৪১২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ২৬৩-৭০ ।

আগেই আলোচনা করা হয়েছে , কোনও একজন দেশীয় ব্যক্তি ওই হাসপাতালের জন্য বড় একটি বাড়ি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন । তা পাওয়া গেলে সেখানে হোমিওপ্যাথি ওষুধের সাহায্যে সম্মোহন পদ্ধতিতে চিকিৎসা মাধ্যমে পাগল রোগীদের চিকিৎসা করা হতো । ডা . টনেয়ার ওই হাসপাতালে প্রতিদিন দু-ঘণ্টা রোগী দেখতেন । বিগত চারমাস মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র মতিলাল গুপ্ত তার সহকারী হিসেবে কাজ করেন[58] ,

উন্মাদরোগীদের চিকিৎসায় ডা. টনেয়ার সিদ্ধহস্ত ছিলেন । হোমিওপ্যাথি-পদ্ধতিতে তিনি মানসিক রোগীর চিকিৎসা করতেন । ওই হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে Lepra Tuberculosis- তে আক্রান্ত ও মানসিক রোগীর সংখ্যা ছিল ১৫ জন । এর মধ্যে তিনজন আরোগ্যলাভ করে এবং ৮ জন চিকিৎসাধীন থাকে[59] । এরপর ১৮৮৩ সালের জানুয়ারি মাসে দি ক্যালকাটা জার্নাল অব মেডিসিন -এ প্রকাশিত একটি সংবাদ থেকে জানা যায় বোম্বাই শহরে একটি হোমিওপ্যাথি হাসপাতাল স্থাপনের জন্য সেখানকার অবস্থাপন্ন লোকরা একটা সভা করে। এতে উৎসাহিত হয়ে একজন পুনরায় কলকাতায় একটি হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল স্থাপনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে ওই পত্রিকার সম্পাদককে অনুরোধ করে চিঠি লেখেন । ওই চিঠিতে কলকাতার বাসিন্দাদের হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করা হয় । তাই এখানে সরকারের পক্ষ থেকে যেমন হোমিওপ্যাথি হাসপাতাল স্থাপনের চেষ্টা হয়নি তেমনি বেসরকারি উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়নি। অথচ কলকাতার জনসংখ্যা অনেক বেশি এবং তারা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার দ্বারা অনেক উপকৃত। অপরদিকে প্রবল উৎসাহের হোমিওপ্যাথির সমর্থকগণ এখানে একটি হাসপাতাল স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন[60]। আলোচনা প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন , বিনাপয়সায় দরিদ্র জনসাধারণের চিকিৎসার জন্য মহেন্দ্রলাল সরকার ব্যক্তিগতভাবে নিজের বাড়িতে একটি হোমিওপ্যাথি ডিসপেনসারি স্থাপন করেন। ১৮৬৯ সালের জুলাই মাস থেকে এর কাজ শুরু হয়।

---

[58] রায়; বিনয়ভূষণ, চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস : উনিশ শতকে বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব, সাহিত্যলোক , কলকাতা , আশ্বিন ১৪১২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ২৬৫

[59] তদেব- ২৬৫

[60] রায়; বিনয়ভূষণ, চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস : উনিশ শতকে বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব, সাহিত্যলোক , কলকাতা , আশ্বিন ১৪১২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ২৬৭ ।

১৮৭৩ পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান রোগীর সংখ্যা লক্ষ্য করে হাসপাতাল স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এই তথ্য ১৮৭৪ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারির ক্যালকাটা জার্নাল অব মেডিসিনে প্রকাশ করা হয়। তারপর আরও দু-বছর কেটে যাওয়ার পরেও জনসাধারণের কাছ থেকে কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি । তাই সরকার ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে ১৮৭৬ সালের জুলাই মাসের সংখ্যায় ১৮৭৪ ও ১৮৭৫ সালের তথ্য পুনরায় প্রকাশিত হয়। এবার হিন্দু প্যাট্রিয়ট ' তার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে এবং মন্তব্য প্রকাশিত হয়। এর পরেও ১৮৮৩ সাল পর্যন্ত সরকারের কাছ থেকে কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি[61] ।

**উন্মাদ রোগের চিকিৎসক -** যে সমস্ত ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় ও প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক পদ্ধতিতে হোমিওপ্যাথি পদ্ধতিতে উন্মাদপীড়া চিকিৎসা জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন তাদের সম্পর্কেও কিছু আলোচনা করা হল

**রাজেন্দ্রলাল দত্তঃ** বহুবাজারের বিখ্যাত দত্ত পরিবারে রাজেন্দ্রলাল ডেভিড ড্রামাণ্ডের স্কুলে শিক্ষালাভের পর হিন্দু কলেজে ভর্তি হন । সেখান থেকে মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন । ১৮৬৪ সালে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডা . বেরিনী কলকাতায় আসেন । রাজেন্দ্রলাল দত্ত তাঁর কাছ থেকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মূলসুত্র রপ্ত করেন। উন্মাদ রোগ তিনি যথেষ্ট খ্যাতি করেন অর্জন , যে সমস্ত রোগী তার চিকিৎসায় মানসিক রোগ থেকে আরোগ্যলাভ করেন[62] তারা রাজেন্দ্রলাল দত্তের চিকিৎসা সম্পর্কে প্রচার করতেন , তার সফলতা লক্ষ্য করে ডা . মহেন্দ্রলাল সরকার ওই পেশা গ্রহণ করেন ।

**মহেন্দ্রলাল সরকার :** ১৮৬০ সালে এল.এম.এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর মহেন্দ্রলাল অ্যালোপ্যাথিক মতে চিকিৎসা শুরু করেন । ১৮৬৩ সালে এম.ডি পরীক্ষায় প্রথম হন । প্রথমে তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতির সমালোচক ছিলেন । পরে রাজেন্দ্রলাল দত্তের চিকিৎসা

---

[61] রায়; বিনয়ভূষণ, চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস : উনিশ শতকে বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব, সাহিত্যলোক , কলকাতা , আশ্বিন ১৪১২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ২৬৬

[62] রায়; বিনয়ভূষণ, চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস : উনিশ শতকে বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব, সাহিত্যলোক , কলকাতা , আশ্বিন ১৪১২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ২৬৮

পদ্ধতি লক্ষ্য করে তিনি তার প্রতি আকৃষ্ট হন । পরে মার্গণর হোমিওপ্যাথিক দর্শন অধ্যায়ন করে তার মতের পরিবর্তন হয় এবং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতিতে আত্মনিয়োগ করেন[63] ।

**মোহিনীমোহন বসু :** ১৮৫০ সালের ২৪ মার্চ ময়মনসিংহ জেলার পয়সিদ্ধি গ্রামে মোহিনীমোহন জন্মগ্রহণ করেন। নিউইয়র্ক হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ ও ফ্লাওয়ার হাসপাতালে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেন। ১৮৭৯ সালে কলকাতায় ফিরে এসে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় আত্মনিয়োগ করেন এবং বিভিন্ন রোগী দের মধ্যে তিনি উন্মাদ রোগের ও চিকিৎসা করতেন । ১৮৮৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সাথে যুক্তভাবে কলিকাতা স্কুল অফ হোমিওপ্যাথি স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানে মানসিকরোগ চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন গবেষণা শুরু করেন[64]। কিছুদিনের মধ্যে মতান্তর হওয়ায় তিনি পৃথকভাবে বেঙ্গল হোমিওপ্যাথিক স্কুল স্থাপন করেন। তারপর ওই দুটি প্রতিষ্ঠান যুক্ত হয়ে ক্যালকাটা হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ এন্ড হসপিটাল নাম ধারণ করে, তা এখন ২৬৫-২৬৬ নং আচার্য প্রফুল-চন্দ্র রায় রোডে অবস্থিত[65] ।

**প্রতাপচন্দ্র মজুমদার :** বিদ্যাসাগর কলেজে আই.এ পড়ার পর মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন হোমিওপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকায় তার প্রচুর দখল ছিল । মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাস করার আগেই হোমিওপ্যাথিক প্রথম চিকিৎসা নামে একখানি বই লেখেন। উক্ত গ্রন্থে মানসিক রোগ চিকিৎসা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এছাড়াও তাঁর প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা স্কুল অফ হোমিওপ্যাথি নামক প্রতিষ্ঠানে উন্মাদ পীড়া আক্রান্ত রোগীদের সুচিকিৎসা দেওয়া হতো ।

## উনিশ শতকে বাংলা প্রেসিডেন্সীতে উন্মাদপীড়ার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকদের সরনী

| হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক | চিকিৎসার সুত্রপাত | চিকিৎসার স্থান |
|---|---|---|
| ডাঃ পুসিন জর্জ মিঃ ডিলাটার | ১৮৩৯ খ্রীঃ | ডায়মন্ড হারবার |
| ডাঃ কুপার (উচ্চ পদস্থ কর্মচারী ) | ১৮৩৯ | ফৌর্ট উইলিয়াম |
| ডাঃ জে. রাদার ফোর্ড | ১৮৩৯/৪০ | কলকাতার ফৌর্ট উইলিয়াম অঞ্চলে |

[63] রায়; বিনয়ভূষণ, চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস : উনিশ শতকে বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব, সাহিত্যলোক , কলকাতা , আশ্বিন ১৪১২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ২৬৯ ।

[64] শরৎচন্দ্র ঘোষের মত অনুসারে ১৮৮৯ হ্যানিম্যান পত্রিকায় প্রচারিত বিজ্ঞাপন , ১৮৮৩ সাল ১৫ ফেব্রুয়ারি

[65] তদেব- ২৬৯

| | | |
|---|---|---|
| ডাঃ মুলনেস | ১৮৪৭ | ভবানীপুর |
| মিঃ এইচ। রাইপার<br>অবসর প্রাপ্ত সৈনিক | --------- | খিদিরপুর (বড়তলা) |
| সি. ফেবরী | ১৮৫১ | চিতপুর |
| ডাঃ টনেয়ার | ১৮৫০/৫১ | মেডিক্যাল কলেজে- কুষ্ঠ বিভাগ |
| মোহিনী মোহন বসু | ১৮৫০- ৭৬ | ---- |
| ডাঃ বেরীনি | ১৮৬৪ | কোলকাতা |
| প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার | ১৮৬৯ | কোলকাতা ও পাবনা |
| পি. সি. মজুমদার | ১৮৮৩ | কোলকাতা |
| এম.এম.বসু | ১৮৮৪ | কোলকাতা |
| পরেশ নাথ মুখারজী | ১৮৮৪ | কোলকাতা |
| কুঞ্জ বিহারী ভট্টাচার্য | ১৮৮৫ | কোলকাতা |
| পূর্ণচন্দ্র সেন | ১৮৯০ | কোলকাতা |
| মহিম মোহন ভট্টাচার্যের | ১৩৫১ বঙ্গাব্দ | কোলকাতা |

# শ্রীমতী মেনকা দাসীর উন্মাদ পীড়ার ইতিবৃত্ত

*হোমিওপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকায় ল্যাক-কেনিনাম নামক ঔষধের বর্ণনায় শ্রীমতী মেনকা দাসীর উন্মাদ পীড়ার ইতিবৃত্ত এবং চিকিৎসার ফলে- একদিকে মস্তিষ্কের গোলযোগ নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয় , অন্যদিকে রোগিণীর বাহ্যদেহের " চাপা দেওয়া " লক্ষণের পুনর্বিকাশ প্রাপ্তি পাঠ করলেই , উন্মাদ পীড়া বিভিন্ন তত্ত্বটীর সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যাবে। এই রোগিণীর ডিম্বাধারের যাতনা " চাপা পড়িবার " ফলে , ধীরে ধীরে তাহার মস্তিস্কটী আক্রান্ত হয় এবং তিনি পূর্ণ উন্মাদিনী হয়ে উঠে এবং তাঁহার চিকিৎসা অর্থাৎ প্রকৃত চিকিৎসা বা সমলক্ষণসূত্রে চিকিৎসা হলে , মস্তিষ্কলক্ষণ চলে যায় এবং অন্যান্য শারীরিক পীড়ার লক্ষন ফিরে আসে । তবে কি দৈহিক লক্ষণ মাত্রই "চাপা পড়িলে মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয়ে উন্মাদ পীড়ার সৃষ্টি করে ? না , নয় । যেখানে যেখানে উন্মাদ পীড়ার আবির্ভাব , সেখানে সেখানেই জানতে হয় যে , নিশ্চয়ই কোনও বাহ দৈহিক পীড়া চাপা পড়েছে , কিন্তু তাই বলে তার বিপরীত প্রতিজ্ঞাও যে সত্যই হবে এরূপ কথা বলা যায় না ; অর্থাৎ বাহ্য দৈহিক পীড়া যেখানে চাপা পড়বে , সেইখানেই উন্মাদের আবির্ভাব হবে, এরূপ কথা বলা যায় না । যেমন বৃষ্টি হলে নিশ্চয়ই মেঘ সঞ্চার হয়েছে , বলতেই হবে , কিন্তু তাই বলে , উহার বিপরীত প্রতিজ্ঞা , যথা মেঘ সঞ্চার হলেই বৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী , সত্য হবেই , তাহা বলা যায় না । যাহা হক , এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে , কোনও ক্ষেত্রে বাহ্য দৈহিক পীড়ালক্ষণ চাপা পড়লে মস্তিস্ক আক্রান্ত হয় , আবার কোনও ক্ষেত্রে হয় না , এর কারণ কি ? এর এক মাত্র কারণ এই যে , যেখানে দেহটা টিউবারকুলার দোষে দুষ্ট , সেইখানেই এই প্রকার হয়ে থাকে , অন্য ক্ষেত্রে যথা সোরা বা সাইকোসিস অথবা সিফিলিস দোষদুষ্ট দেহে তা হয় না। সোরাদুষ্ট দেহে বাহ পীড়ালক্ষণ চাপা পড়লে , ঐ দোষের উগ্রতা বৃদ্ধি করে , সাইকোসিস দুষ্ট দেহ হলে , সেখানে বাতরোগ , স্নায়ুশূলাদি যাতনা প্রকাশ পায় এবং সিফিলিস্তুষ্ট দেহ হলে সেখানে গ্ল্যান্ডে বিবৃদ্ধি, দারুণ শিরঃপীড়া ইত্যাদির উদ্ভব হতে পারে । সাইকোসিষ্ট দেহে ঐ প্রকার " চাপা পড়া " হতে অনেক ক্ষেত্রে রোগীকে বধীর ও ক্ষীণদৃষ্টি হতেও দেখা*

*যায় ; ফলতঃ দেহটা টিউবারকুলার হলে ক্ষয়পীড়া , উন্মাদপীড়া প্রভৃতির উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী হয়ে থাকে । রোগীদেহে সুপ্ত দোষের অবস্থা ও প্রভাব অনুসারেই ফলাফল দেখা দিয়া থাকে , ইহা সুনিশ্চিত । যেখানে উন্মাদলক্ষণগুলি অপসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যদেহের " চাপা পড়া " লক্ষণগুলির পুনর্রিকাশ ঘটে , সেখানে রোগীকে তাহার উক্ত পূনর্রিকাশ প্রাপ্ত পীড়ার জন্য কোনও ঔষধ প্রয়োগের প্রায় আদৌ আবশ্যক হয় না । তবে যেখানে নিতান্তই তাহা পূর্বপ্রযুক্ত ঔষধের ক্রিয়ায় অর্থাৎ যে ঔষধের ক্রিয়াবশে , পুনর্ব্বিকাশ ঘটে , সেই ঔষধের ক্রিয়াতেই নির্ম্মলভাবে অপসারিত না হয় , তবে ঔষধ দিবার আবশ্যকতা হাসিতে পারে , নতুবা নয় । কিন্তু একটি বিষয় এখানে মনে রাখতে হবে , যদি লুপ্ত লক্ষণের পুনর্বিকাশ ঘটে , তবেই ঐ নিয়ম এবং রীতিমত লক্ষণ সমষ্টি প্রাপ্ত হলে এবং পূর্ব্বপ্রদত্ত ঔষধের ক্রিয়াতেই আরোগ্য না হলে ঔষধ দিতে হইবে । ফলতঃ আরও একটি বিষয় আছে , তাহার উপর মনোযোগ না করলে , অনেক সময় রোগীর ভয়ানক ক্ষতি করা হয়ে এ বিষয় যদিও নানাস্থানে নানা ভাবে লিখেছি , তবুও প্রসঙ্গক্রমে এখানেও লেখা সঙ্গত বলে লিখলাম । যেখানে উন্মাদ বা অন্য কোনও সুগভীর পীড়ায় পীড়িত ব্যক্তির চিকিৎসা চলার পর , রোগীর পীড়া আরোগ্য হল এবং সেই গভীর পীড়াটা যে আভ্যন্তর স্তরে দেখা দিয়েছিল , (corresponding) বাহ্য যন্ত্রাদিতে কোনও পীড়া লক্ষণ প্রকাশ পেলে , ঔষধ প্রয়োগ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । এর কারণ এই যে , আভ্যন্তর তাহারই সমসূত্রের প্রদেশে ঔষধের ক্রিয়া ফলে , উক্ত সমসূত্রযুক্ত বাহ্যযন্ত্রের ক্রিয়াটা অর্থাৎ উহাতে রোগলক্ষণের আবির্ভাবটী "পীড়া নয় , উহা আবোগ্য পথেরই চমৎকার নিদর্শন ; ফলতঃ উহা আপনিই সারে এবং রোগী ও নির্মল আবোগ্য হয় , বিপরীত পক্ষে , উহার প্রতিকারকল্পে ঔষধ প্রয়োগের ফলে , রোগটি যেখানে ছিল , সেইখানেই পুনরুপনীত হয় , অর্থাৎ পূর্ব পীড়া ফিরে আসে। এ বিষয়ের পূর্ণ* আলোচনা , তৎলিখিত " হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকায় " ইগ্নেসিয়ায় মধ্যে ৭০৫ ও ৭০৬ পৃষ্ঠা দেখলেই তত্ত্বটী পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম হবে । লক্ষণ সকলের পুনর্রিকাশ হলে , বিশেষ চিন্তা ও ধীর গবেষণার পর তবেই ঔষধ প্রয়োগ সঙ্গত বা অসঙ্গত , তাহা স্থির করতে হয়। পুরাতন পীড়ার চিকিৎসা হঠকারীর বা ব্যস্তবাগীশের দ্বারা হয় না , অন্য পক্ষে , যে রোগীর ধৈর্য্য না থাকে , তাহাকে আরোগ্য করাও ঘটে না [66] ।

## উন্মাদের চিকিৎসা পদ্ধতির কয়েকটি উদাহরণ

### ব্রোমাইড-জাত নিদ্রা চিকিৎসা

ডাক্তার নীল ম্যাকলিয়ডের[67] মতানুসারে কারাগারের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ রেখে এবং কোন পরিচালকের শুশ্রুসার অধীনে রেখে, পাগল চিকিৎসা হতে পারে না। বাধ্য হয়ে তিনি রোগীকে নিজ বাড়িতে রেখে চিকিৎসা পরিষেবার কথা বলেছিলেন। চিকিৎসক যে ধরনের ব্রোমাইড জাত ঘুমের বিষয় বিবৃত করেছেন, সে বিষয়ে অন্য কেও অবগত আছেন কিনা চিকিৎসক তা

---

[66] ভট্টাচার্য , মহিম মোহন ; (সংকলিত) হোমিওপ্যাথি দর্শন গবেষণা, দি ইস্টার্ন এন্ড ওরিয়েন্টাল প্রিন্টিং লিঃ , কোলকাতা , ১৩৫১ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ১৬

[67] শ্রীযুক্ত নীল ম্যাকলিয়ডের, তৎকালীন সময়ের এম.ডি ডাক্তার উন্মাদ চিকিৎসা প্রনালীর ক্ষেত্রে তিনি ব্রোমাইড জাত নিদ্রা চিকিৎসা এক নতুন পদ্ধতি আবিস্কার করেন । চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্রিকা ভিষক দর্পণের লেখক ।

জানেন না এবং কোন গ্রন্থেও উক্ত বিষয় বর্ণিত দেখেন নি। অন্য কোন চিকিৎসক এরূপ ব্রোমাইড প্রয়োগ করে নিদ্রামগ্ন করে রোগীর চিকিৎসা করেছেন কিনা তা অবগত নয় [68]। বহু গুন বিশিষ্ট ঔষধের অভ্যাস দূর করা এবং রোগের চিকিৎসার জন্য যে প্রণালীতে ব্রোমাইড প্রয়োগ করেন যেটি ছিল সম্পূর্ণ নতুনত্ব।

## ম্যাকলিয়ডের উন্মাদ চিকিৎসার বর্ণনা

ব্রোমাইড প্রয়োগের জন্য ঘুম পাঁচ থেকে নয় দিন স্থায়ী হয়, এই সমস্ত সময় রোগী গভীর ঘুমে মগ্ন থাকে। এই ঘুম থেকে জাগানো যায় না। রোগী চলতে পারে না, উঠতে পারে না , বসতে পারে না, কিছু বলতে পারে না, এমনকি নিজে নিজে পানীয় ইত্যাদি পান করতে পারে না। মস্তিষ্কের উচ্চ ক্রিয়া সমস্ত বন্ধ থাকে। রোগীকে এমন অবস্থায় রেখে দিলে সে আপন ইচ্ছায় কখনো খাদ্য পানীয় ইত্যাদি গ্রহন করবে না। অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকবে । কিন্তু শরীর সচল রাখার জন্য চেষ্টা করে অল্প দুধ পান করানো হয়। এই দুধ পানেই শরীর রক্ষা হয়, রোগী শুয়েই মল মূত্র ত্যাগ করে কিন্তু চেষ্টা করলে তার প্রতিবেদন করা যেতে পারে। প্রতিদিন সকালে সঠিক সময়ে উঠিয়ে মল মূত্র ত্যাগ করানো হয়। এই ব্রোমাইড নিদ্রার সময় উচ্চ স্নায়ুকেন্দ্র এত শান্ত এবং সুস্থির অবস্থায় অবস্থান করে যে, অত্যন্ত উজ্জ্বল আলো কিম্বা ভয়ঙ্কর শব্দ ইত্যাদিতেও তার জ্ঞান ফেরে না। ঘুম ভাঙার পর দৈহিক চলাচল ক্রিয়া ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্তন করে। অর্থাৎ প্রথমে দুই এক কথা বলতে পারে, তারপর দুই এক পা চলতে পারে। কিছু কিছু বিষয় বুঝতে পারে।

এই ভাবে ধীরে ধীরে অন্যান্য ক্রিয়াও কার্যকর হতে আরম্ভ করে। প্রতিদিন পরস্পর উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। ১৫ দিনের মধ্যে সব কিছু স্বাভাবিক অবস্থায় সমাগত হয়, ঊর্ধ্ব সংখ্যায় ২৪ দিনেও হতে পারে। এই সময় মস্তিষ্কের উচ্চ ক্রিয়া আংশিক শান্ত সুস্থির অবস্থায় অবস্থান করে। শান্ত সুস্থির অবস্থার পর মস্তিষ্কের শক্তি সুস্থতা লাভ করে ।অস্বাভাবিক অবস্থা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায়

[68] ভিষক- দর্পণ, বঙ্গভাষায় চিকিৎসা তত্ত্ব বিষয়ক মাসিক পত্রিকা, সম্পাদকঃ শ্রী কালী মোহন সেন ও শ্রী ডাক্তার গিরীশচন্দ্র বাগছী রায় সাহেব , *তরুন উন্মাদের নতুন চিকিৎসা প্রণালী- ব্রমাইড নিদ্রা* , শ্রীযুক্ত ডাক্তার নীল ম্যাকলিয়ডের দশম খণ্ড , চতুর্থ সংখ্যা, কলিকাতা, এপ্রিল ১৯০০ পৃষ্ঠা- ১৩৪

সমাগত হয়। নয় জন রোগীর চিকিৎসায় চিকিৎসক উল্লেখিত ব্রোমাইড নিদ্রা উপস্থাপন করেছিলেন এবং একটি স্থান ছাড়া সর্বত্রই ভাল ফল হয়েছিল। যে রোগীর সুফল হয়নি তার চিকিৎসা সময়ে নিউমোনিয়ার প্রবল এপিডেমিক হয়েছিল। একুশ বছরের মধ্যে আর কখনো এরূপ নিউমোনিয়া হতে দেখা যায় নি। এই সময় অনেক লোকের নিউমোনিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছিল। যে লোকটির মৃত্যু হয়েছে , তার মরফিয়া এবং কোকেন সেবন করার স্বভাব হয়েছিলো। চিকিৎসার সময় উভয় ফুসফুসের প্রদাহ হওয়ার মৃত্যু হয়েছিলো [69]।

ব্রোমাইড জাত নিদ্রার সময় অতি সাবধানে পরিচর্যা করা এবং দুই ঘণ্টা পর পর এক গ্লাস করে দুধ দিনে সাত বার পান করাতে হয়। আরগ্যের পর স্নায়ুমন্ডলের কোন খারাপ লক্ষণ বর্তমান থাকে না। সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থা উপস্থিত হয়[70] ।

ব্রোমাইড জাত সম্পূর্ণ পরিবর্ধিত গভীর নিদ্রা যিনি কখনো দেখেনি , তিনি প্রথমে এই নিদ্রার অবস্থা দেখলে হয়তো আতঙ্কিত হতে পারে। রোগীর আত্মীয় পরিজনের মধ্যেই এইরূপ আতঙ্ক উপস্থিত হওয়ার অধিক সম্ভাবনা। সুতরাং এইরূপ লোকদের এই নিদ্রার বিষয় এবং স্থায়িত্ব আগেই বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। প্রথম দুই তিন দিন রোগীকে দুধ পান করানো অত্যান্ত কঠিন বোধ হতে পারে। এই সময়ে গলাধরে অল্প অল্প করে চামচ দ্বারা পান করানই সৎ পরামর্শ সিদ্ধ এবং ধীরে ধীরে গিলনের সাহায্য করলেই দুধ পাকস্থলীতে পৌঁছায়।

কীরূপ ব্রোমাইড সেবন করানো উচিত তা বর্তমান সময় পর্যন্ত নির্ধারিত হয় না, কিন্তু চিকিৎসক কেবল দিনেই সেবন করিয়ে থাকেন। দুই ড্রাম মাত্রায় ব্রোমাইড অর্ধেক গ্লাস জলে

---

[69] ভিষক- দর্পণ, বঙ্গভাষায় চিকিৎসা তত্ত্ব বিষয়ক মাসিক পত্রিকা, সম্পাদকঃ শ্রী কালী মোহন সেন ও শ্রী ডাক্তার গিরীশচন্দ্র বাগছী রায় সাহেব , *তরুন উন্মাদের নতুন চিকিৎসা প্রণালী- ব্রমাইড নিদ্রা* , শ্রীযুক্ত ডাক্তার নীল ম্যাকলিয়ডের দশম খণ্ড , চতুর্থ সংখ্যা, কলিকাতা, এপ্রিল ১৯০০ পৃষ্ঠা- ১৩৫

[70] ভিষক- দর্পণ, বঙ্গভাষায় চিকিৎসা তত্ত্ব বিষয়ক মাসিক পত্রিকা, সম্পাদকঃ শ্রী কালী মোহন সেন ও শ্রী ডাক্তার গিরীশচন্দ্র বাগছী রায় সাহেব , *তরুন উন্মাদের নতুন চিকিৎসা প্রণালী- ব্রমাইড নিদ্রা* , শ্রীযুক্ত ডাক্তার নীল ম্যাকলিয়ডের দশম খণ্ড , চতুর্থ সংখ্যা, কলিকাতা, এপ্রিল ১৯০০ পৃষ্ঠা- ১৩৬

মিশ্রন করে দুই ঘণ্টা পরে পরে সেবন করান। এক আউন্স ব্রোমাইড সেবন করানো হলে সেদিন আর সেবন করানো হয় না। দ্বিতীয় দিনেও ঐ প্রণালীতে এবং ঐরূপ মাত্রায় সেবন করানো হয়। পরে বর্ণিত রোগীর বিবরন দেখতে পাবেন যে, কারও কারও এই মাত্রাতেই নিদ্রা উপস্থিত হয়। কিন্তু সে নিদ্রা অত গভীর নয়। চার পাঁচ দিন ব্রোমাইড সেবন না করালে কারও কারও গভীর নিদ্রা উপস্থিত হয় না। শেষ মাত্রা ঔষধ সেবনের ২৪ ঘণ্টা পর গভীর নিদ্রা উপস্থিত হয়। একদিনেই অধিক মাত্রায় অল্প সময় পর পর সেবন করালে অল্প ঔষধেই উৎকৃষ্ট ফল হতে পারে। শেষ মাত্রা ঔষধ সেবনের ২৪ ঘণ্টা পর ঔষধের পূর্ণ ক্রিয়া প্রকাশিত হয় এবং তা ক্রমাগত কয়েক দিন স্থায়ী থাকে। সুতরাং ২৪ ঘণ্টা পর পর ঔষধ সেবন করানই সৎ পরামর্শ এবং নিরাপদ। ২৪ ঘণ্টা পওে যদি দেখা যায় যে রোগী গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়ে রয়েছে। সেই সময় ডাকাডাকি করেও জ্ঞান না ফেরে অথবা জ্ঞান ফিরেও যদি অজ্ঞানের মতো আচরন করে এবং সেই নিদ্রা অবিচ্ছেদ্য ভাবে চলতে থাকে, অথবা ঐ নিদ্রা গভীর থেকে আরও গভীর হতে থাকে, তবে আর ব্রোমাইড সেবন করানো উচিত না[71] । এই গভীর নিদ্রা অবস্থায় যাতে রোগীর কোনরূপ অনিষ্ট না হয় সে বিষয়ে সাবধান হতে হয়। শীতের সময় রোগীর দেহ বস্ত্রাবৃত করে রাখা আবশ্যক। রোগীর প্রকোষ্ঠের উত্তাপ অত্যাধিক বৃদ্ধি বা হ্রাস না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। গভীর নিদ্রাবস্থায় বিছানা থেকে পড়ে গিয়ে আহত না হয় , ইত্যাদি বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত।

## উন্মাদ রোগ চিকিৎসার কেস-স্টাডি

একজন স্ত্রীলোক নিয়মিত মরফিয়া সেবন করার ফলে মরফিয়া নেশাগ্রস্থ হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ মরফিয়া না খেলে থাকতে পারত না । কয়েক বছর ধরে এভাবে মরফিয়া সেবন করে আসছিল। এই স্ত্রীলোক অত্যান্ত স্নায়ু প্রধান ধাতু প্রকৃতি বিশিষ্টা, তার সমস্ত লক্ষণ বর্তমান ছিল। **১৮৯৭** খ্রিস্টাব্দের একদিন কোন আকস্মিক ঘটনায় দুই তিন দিনের মধ্যে আড়াই আউন্স সোডিয়াম

[71] তদেব ১৩৭

ব্রোমাইড সেবন করে। এর ফলে পূর্বে বর্ণিত গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়। নিদ্রা শেষ হলে দেখা যায় তার পূর্ব স্বভাব পরিবর্তিত হয়েছে, আর মরফিয়া সেবন করতে চায় না। মরফিয়া সেবন অভ্যস্ত হওয়ার পর যে সমস্ত লক্ষণ দেখা গিয়েছিল তা বিলুপ্ত হয়েছে।

উক্ত ঘটনার পর কয়েক মাসের মধ্যেই একজন জাহাজের কর্মচারী মরফিয়া সেবনের সঙ্গে সঙ্গে সুরা পানেও অভ্যস্ত হয়। শেষে উভয়ই পরিত্যাগ করে চিকিৎসকের কাছে উপস্থিত হয়ে বর্ণিত প্রণালীতে ব্রোমাইড সেবন করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। তারপরে ব্রোমাইড সেবন জনিত নিদ্রার বিষয় তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয় এবং একথাও বলা হয় যে , কোনরূপ বিপদ হওয়া অসম্ভব নয়। কারন বর্তমান সময় পর্যন্ত ঐ সন্মন্ধে বিশেষ কিছু অবগত হওয়া যায় নি । যে সমস্ত অবগত হয়ে ব্রোমাইড নিদ্রার চিকিৎসা সন্মত হলে ব্রোমাইড সেবন করানো হয়।

**তৃতীয় রোগীঃ** তরুন উন্মাদগ্রস্থ এক জনকে জাহাজে করে বিদেশ থেকে নিয়ে আসার সময় জাহাজে যাতে অধিক উত্তেজনা সৃষ্টি না হয় এবং সহজে আনা যেতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ব্রোমাইড প্রয়োগ করা হয়। এছাড়াও আরও উদ্দেশ্য ছিল স্নায়বিক উত্তেজনাও হ্রাস করা। উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল[72] ।

**চতুর্থ রোগীঃ-** ইনি ছিলেন বিদেশের বাসিন্দা কর্মসুত্রে এদেশে এসেছিল। দুই বছর ধরে মাদক দ্রব্য সেবন করতে করতে করতে মানসিক রোগগ্রস্থ হয়ে পরে এবং মাঝে মাঝে অস্বাবাভিক আচরণ করতে থাকে, ফলে উন্মাদ গ্রস্থতায় , অতঃপর চিকিৎসকের কাছে উপস্থিত হয়েছিলো। ব্রোমাইড জাত নিদ্রায় কোন অনিষ্ঠ হয়নি অথচ নেশার অভ্যাস পরিত্যাগ হয়েছিল এবং সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল[73] ।

---

[72] ভিষক- দর্পণ, বঙ্গভাষায় চিকিৎসা তত্ত্ব বিষয়ক মাসিক পত্রিকা, সম্পাদকঃ শ্রী কালী মোহন সেন ও শ্রী ডাক্তার গিরীশচন্দ্র বাগছী রায় সাহেব , *তরুন উন্মাদের নতুন চিকিৎসা প্রণালী- ব্রমাইড নিদ্রা* , শ্রীযুক্ত ডাক্তার নীল ম্যাকলিয়ডের দশম খণ্ড , চতুর্থ সংখ্যা, কলিকাতা, এপ্রিল ১৯০০ পৃষ্ঠা- ১৩৬

[73] ভিষক- দর্পণ, বঙ্গভাষায় চিকিৎসা তত্ত্ব বিষয়ক মাসিক পত্রিকা, সম্পাদকঃ শ্রী কালী মোহন সেন ও শ্রী ডাক্তার গিরীশচন্দ্র বাগছী রায় সাহেব , *তরুন উন্মাদের নতুন চিকিৎসা প্রণালী- ব্রমাইড নিদ্রা* , শ্রীযুক্ত ডাক্তার নীল ম্যাকলিয়ডের দশম খণ্ড , চতুর্থ সংখ্যা, কলিকাতা, এপ্রিল ১৯০০ পৃষ্ঠা- ১৩৬

**পঞ্চম রোগীঃ-** ইনি ছিলেন একজন স্ত্রীলোক । প্রবল স্নায়বিক প্রকৃতি বিশিষ্টা। বমন নিবারন করার সমস্ত উপায় ব্যর্থ হওয়ার পর ব্রোমাইড জাত নিদ্রা উপস্থিত করে চিকিৎসা করার পর বমন বন্ধ হয়েছিল। এবং প্রবল স্নায়বিক প্রকৃতিও পরিবর্তন হয়েছিল [74]।

**সপ্তম রোগীঃ-** একজন স্ত্রীলোক, মাঝে মাঝে বিষণ্ণ করে রাখা হয় । এতে কোনরূপ অবসাদের লক্ষণ উপস্থিত হয় নি। সাধারন সাস্থ উন্নত হয়েছে এবং মরফিয়া সেবনের অভ্যাস দূর হয়েছে[75]।

**অষ্টম রোগীঃ-** ইনি ছিলেন একজন ডাক্তার। মরফিয়া এবং কোকেন সেবন করার অভ্যাস হয়েছিল, ফলে নেশাগ্রস্থ ও মানসিক রোগের সম্মুখীন হয়। ইতিপূর্বে এই চিকিৎসা প্রণালীতে কয়েকজনের স্বভাব পরিবর্তন হতে দেখে তিনিও এই চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহন করেছিলেন। কিন্তু চিকিৎসা শুরুর পর সপ্তম দিনে উভয় ফুসফুস প্রদাহ পীড়া হওয়ায় তার মৃত্যু হয়েছিল[76] ।

**নবম রোগীঃ-** তরুন উন্মাদ্গ্রস্থ রোগীর উন্মাদনার লক্ষণ উপস্থিত ছিল। উৎকৃষ্ট উন্মাদ আশ্রমে রোগীকে আবদ্ধ অবস্থায় রাখা হয় যাতে নিজে আহত হতে না পারে এবং অন্যকে আহত করতে না পারে। সেই বাবস্থা করে এই চিকিৎসা প্রণালীতে উৎকৃষ্ট ফল হবে ইহা দৃঢ় বিশ্বাস করে এই রোগীর চিকিৎসায় লিপ্ত হওয়া গিয়েছিল[77]।

## উন্মাদ রোগীর চিকিৎসার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ [78] -

**বিবাহিতা স্ত্রীলোক । বয়স ৪৯ বছর** । ইতিপূর্বে দুই বছর যাবৎ তাঁর শারীরিক অসুবিধা ছিল। **১৮৯৭** খৃষ্টাব্দে অকস্মাৎ পারিবারিক কোন শোকে সংবাদ প্রাপ্ত হওযায় স্নায়ুবিক ধাক্কা উপস্থিত হয় , তারপর থেকে উন্মাদপীড়ার লক্ষণ সমুহ প্রকাশ পেতে থাকে ।গ্রীষ্ম ঋতুর অবসানে আবার

---

[74] ভিষক- দর্পণ *তরুন উন্মাদের নতুন চিকিৎসা প্রণালী- ব্রমাইড নিদ্রা* , শ্রীযুক্ত ডাক্তার নীল ম্যাকলিয়ডের, দশম খণ্ড , চতুর্থ সংখ্যা, কলিকাতা, এপ্রিল ১৯০০ পৃষ্ঠা ১৩৭

[75] তদেব ১৩৭

[76] তদেব ১৩৭

[77] তদেব ১৩৮

[78] ভিষক- দর্পণ, বঙ্গভাষায় চিকিৎসা তত্ত্ব বিষয়ক মাসিক পত্রিকা, সম্পাদকঃ শ্রী কালী মোহন সেন ও শ্রী ডাক্তার গিরীশচন্দ্র বাগছী, *তরুন উন্মাদের নতুন চিকিৎসা প্রণালী- ব্রমাইড নিদ্রা* , শ্রীযুক্ত ডাক্তার নীল ম্যাকলিয়ডের দশম খণ্ড , চতুর্থ সংখ্যা, কলিকাতা, এপ্রিল ১৯০০ পৃষ্ঠা- ১৪০

তার উন্মত্ততার  লক্ষণ প্রকাশ পায় ; তারপর ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের  সেপ্টেম্বব মাস শেষ থকে সম্পূর্ণ উন্মাদ অবস্থাতেই ছিল । তবে কাজ কর্মে অপেক্ষাকৃত অক্ষম ছিল। পূর্বে সে  অশ্বারোহণে দক্ষ ছিল ,  । এরপর মার্চ মাসে আবার স্নায়ুবিক লক্ষণ সমূহ সামান্য ভাবে প্রকাশিত হয় এবং তা অল্প সময় পরে  তাহার উপশম হয়। পুনারায়  গ্রীষ্ম আরম্ভ হলে জুন মাসে পীড়ার লক্ষন দেখা দিতে শুরু করে অনিদ্রা , অক্ষুধা , স্মরণ  শক্তির  হ্রাস , শিরঃপীড়া ,স্বরক্ষীণ, এবং জলবৎ ভেদ আরম্ভ হওয়ায় অবসন্নতা উপস্থিত হয়েছিল,  ফলে অসম্বন্ধ বাক্য ব্যয় , উত্তেজনা , বাক্যের জড়তা, বিনা কারনে হাসাহাসি, সর্বদা  প্রলাপ, রাত্রে বেলা ভয় এবং গৃহ ত্যাগের চেষ্টা ইত্যাদি উন্মত্ততার লক্ষন তাঁর মধ্যে দেখা দিয়েছিল ,৩০ শে জুন থেকে ১লা জুলায় পর্যন্ত রোগীর মধ্যে এই সব  লক্ষন উপস্থিত ছিল । অতঃপর একজন শিক্ষিতা  নার্স কে তাকে সেবা শুশ্রূষার জন্য নিযুক্ত করা হয়।

**প্রথম দিনের চিকিৎসা :-** ইতিপূর্বে রোগী এক সপ্তাহ ধরে কোন ঔষধ করেনি  কেবলমাত্র দুগ্ধ পান করেছে। সকালবেলা ৮.৩০  এর সময় দুই ড্রাম ব্রোমাইড অফ সোডিয়াম অর্ধ গেলাশ জলে দ্রবন করে সেবন করানো হয় । ঐরূপ মাত্রাতে আবার ১০.৩০ মিনিতে এবং বিকাল ৩.৩০ এ  এক একবার ঔষধ সেবন করান হয় । সামান্য মাত্রায় সর্বসমেত  এক আউন্স ব্রোমাইড অফ সোডিয়াম সেবন করানো সেই সঙ্গে দুই ঘণ্টা পর পর এক গ্লাস করে দুগ্ধ পান করানো হল। এই প্রনালীতে সমস্ত দিন শুধুমাত্র মোট ৭ গ্লাস দুধ পান করানো হয় । রোগিণী সমস্ত দিন গৃহের চতুর্দিকে ভ্রমণ , ক্রমাগত প্রলাপ বাক্য অনর্থক হাসি ইত্যাদি প্রকাশ করেছিল । রাত্র ৯.০০ টার সময় নিদ্রাভিভুতা হয়ে পরেরদিন সকাল ৭.০০ টা পর্যন্ত ঘুমিয়ে ছিল ।

**দ্বিতীয় দিনের চিকিৎসা -** সকাল সাতটার সময় নিদ্রা ভঙ্গ হয় কিন্তু আগেরদিনের মতো ভ্রমন না করে বিছানায় বসে ছিল । এইভাবে দিবসের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেছিল । বিকাল বেলায় পূর্ব দিনের মতো অনুরূপ গোলমাল শুরু করেছিল। চলার সময় পায়ে দুর্বলতা ও কম্পন দেখা দিয়েছিল। অতঃপর সকাল ৮.৩০, দুপুর ১.৩০ বিকাল ৩.৩০ ও ৬.০০ টার সময় সোডিয়াম ব্রোমাইড দুই ড্রাম মাত্রায় সেবন করানো হয় । সন্ধ্যা ৬ টার সময় এই দিনের শেষ মাত্রা সেবন করানো হয়েছিলো , অপরাহে রোগিণী সামান্য সময় ঘুমিয়েছিল।

**তৃতীয় দিন** - সমস্ত রাত নিদ্রাভিভুতা ছিল সত্য কিন্তু মধ্যে মধ্যে নিদ্রা ভঙ্গ হলে পাগলামির লক্ষন উপস্থিত হতো । বাটি থেকে চুমুক দিয়ে দুগ্ধ পান করতে কষ্ট বোধ করছিল। কারো সাহায্য ছাড়া চলতে ও উঠতে পারত না । **চতুর্থ দিবস-** ওঠা বসা কিংবা কথা বলতে পারে না, বাটি থেকে অতি কষ্টে দুগ্ধ পান করে । মস্তক সরল ভাবে স্থাপন করার চেষ্টা করলে গ্রীবার পেশী বক্র হয়ে যায় । **পঞ্চম দিন** - উঠিতে পারে না , নিজ ইচ্ছাই চুমুক দিয়া খাদ্যাদি গ্রহন করতে পারা না । টার জন্য চামচ দিয়া দুগ্ধ পান করাতে হয় , সময়ে সময়ে কাশির দারা গলা পরিস্কার করে। শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত ও গভীর । দৈহিক তাপমাত্রা ৯৯ এর বেশী হয় নি । **ষষ্ট ও সপ্তম দিন-** কাশী নাই। অন্যান্য অবস্থা পঞ্চম দিবসের মতো । **অষ্টম দিন** - সর্দি হয়েছে । পাখার বাতাস দিবা রাত্র দেওয়া হয়েছিলো । রাত্রিতে সম ভাবে নিদ্রা হয়েছিলো। দৈহিক তাপমাত্রা পূর্বে ৯৯ ডিগ্রী F এর বেশে হয় নি , কিন্তু আজ ১০০ ডিগ্রী ফ । সহজে খাদ্য করতে পারে, শ্বাস প্রশ্বাস এক একবার দ্রুত হয়েছিলো। বিকালে ৩.৩০ মি. শরীরের তাপমাত্রা ১০১-১০২ F.

**নবম দিন-** শরীরের তাপমাত্রা ৯৯.৮ ফারেনাইট । ডাকলে চক্ষু উন্মেচিত করে অস্পষ্ট শব্দ উচ্চারন করে। পদতলে স্পর্শ (সুরসুরি) করলে সমস্ত পা সঙ্কুচিত করে। ইশারায় জিহ্বা বহির্গত করতে বললে কিংবা দেখিয়ে দিলে সে জিহ্বা বহির্গত করে ।

**দশম দিন-** শরীরের তাপমাত্রা ৯৯.4 । রাত্রে সামান্য কাশী হয়েছিলো , জিহ্বা বহির্গত করতে বললে বহির্গত করার চেষ্টা করে। ভাল ভাবে খাদ্য গ্রহন করে ও কথা বলতে পারে । দাড়াতে পারে।

**একাদশ দিন** - শরীরের তাপমাত্রা ১০০.২ ফারেনাইট। ঘুমের ভাব আগের দিনের তুলনায় অনেক বেশী। ডাকলে সারা দেয় । অস্পষ্ট শব্দ উচ্চারন করে । সবলে অঙ্গ সঞ্চালন করে। পূর্বে জিহ্বা অপরিষ্কার ছিল এখন টা পরিস্কার হতে আরম্ভ করেছে ।

**দ্বাদশ দিন-** শরীরের তাপমাত্রা ৯৯.4 f । সকালে ক্রন্দন করেছিল । নাসিকা থেকে শ্লেষ্মা ফেলার সময় যত্ন করছিল । জিহ্বা বাইরে বের করতে বললে তা করে । জিহ্বা পরিষ্কার হয়েছে। কয়েকটি সুস্পষ্ট কথার সাথে অস্পষ্ট শব্দ উচ্চারন করে । যখন কথা বলার চেষ্টা করে তখন এমন হয় ।

**১৩-তম দিন** - রাত্রিতে অশান্ত ছিল । এ অবস্থা এই প্রথম । এখন ভাল অবস্থায় কথা বলে । কোনও উত্তেজনা লক্ষন নেই । মৃদু হাস্য ও অস্পষ্ট ভাবে কথা বলেছিল । নিজে নিজে খাদ্য গ্রহন করে ।কারোর সাহায্য নিয়ে দু এক পা চলতে পারে । কিন্তু হস্ত কম্পিত অবস্থা ছিল । বিকালে উষ্ণ দুধ , রুটি ও মাখন খেয়েছিল । মাঝে মাঝে শয্যা পরিত্যাগ বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল ।

**১৪তম দিন** - কাহাকেও চিনতে পারে না । স্থির ভাবে কথা বলে কিন্তু বাক্য অস্পষ্ট । মাঝে মাঝে পায়চারী করে বেড়ায় , কিন্তু হস্ত দুর্বল । **১৫তম দিন**- কথা বলার চেষ্টা করে , প্রথম কয়েক টি শব্দ অর্থ বোধক হয় এবং স্পষ্ট কিন্তু শেষ বাক্য গুলি অস্পষ্ট ও নিরর্থক । **১৬ তম দিন** - রাত্রিতে অবস্থা ভাল ছিল না । অস্পষ্ট শব্দ করে অশান্তিতে অতিবাহিত করেছে। দিনের প্রথম দিকে এবং রাত এগারটার সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল। সর্বমোট ৭ ঘণ্টা ৩০ মিনিট ঘুমিয়েছিল।

**১৭তম দিন** - অল্প কথা পরিষ্কার ভাবে বলতে অয়ারে এবং তা অর্থবোধক হয়। আর বেশি কথা বললেই তা অস্পষ্ট হয়ে যায়। **১৮তম দিন** - রাতে খারাপ অবস্থায় ছিল, যদিও উত্তেজনার কোন লক্ষণ ছিল না কিন্তু মোটেও ঘুম হয়নি। সাধারন ভাবে কথা বলে এবং টেবিলের পাশে বসে সাধারন খাবার খাচ্ছিল। বেলার প্রথমে শব্দের উচ্চারণ ভালছিল কিন্তু দুপুরে আবার অস্পষ্ট হয়েছিল। **১৯ তম দিন** - ঘুম খারাপ হয় নি। অল্প কথায় আলাপ করতে পারে । বইয়ের লেখা পড়তে পারে ।কিন্তু বই ধরতে পারে না। দৃষ্টিশক্তি অত্যান্ত দুর্বল । স্বরন শক্তি ভাল। **২০ তম দিন** - ভাল ঘুম হয়নি ।শব্দ করেছিল, সব দিন ভাল ছিল। দুপুর বেলা অর্থহীন কথাবাত্রা বলছিল। শ্রবন শক্তি স্বাভাবিক ছিল কিন্তু সামান্য একটু শব্দ হলেই খুব বিরক্ত হয়ে ওঠে।

**২১তম দিন** - রাত্রে ভাল ছিল। মনের ভুল আছে কিন্তু তা অতি সামান্য , তাহা উপস্থিত হওয়ার কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। **২২তম দিন**- রাত্রে খুব খারাপ অবস্থায় ছিল । হাব ভাব স্বাভাবিক ছিল। নতুন বাসস্থান সম্পর্কে দ্বিধাবোধ করছিল।

**২৩তম দিন** - রাত্রে ভালছিল। মানসিক গন্ডগোল খুবই সামান্য ছিল। এই দিনের পর থেকে মানসিক স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল আর কোন ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় নি। বাগানে ঘুরে বেড়ায় , আহারের সময় নীচ তলায় নির্দিষ্ট স্থানে এসে আহার করে। সামান্য পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এই দিন রাত্রে খুব ভাল ঘুম হয়। আবার পরের দিন রাত্রে ঘুম হয় না। এমন আগের কয়েকটা রোগীর ক্ষেত্রেও দেখা গেছে। আরোগ্য লাভ হওয়ার পর রোগী সুস্থ ছিল ।

## ১৮৭২ এর একটি দলিল- মানসিক অসুস্থতার ঘটনা[79]

ক্যালকাটা জানাল জার্নাল অফ মেডিসিনের ক্লিনিক্যাল রেকর্ড

### CLINICAL RECORD.

*A Case of Mental Aberration.* Recovery.

UNDER CARE OF DR. M. L. SIRCAR.

Moksoda, a Hindu female, aged about 20, resident of Sibpur, was brought to me on the 11th Nov. 1872, for treatment. The symptoms with which she was troubled were the following :—Acidity of the stomach ; vertigo ; palpitations ; involuntary weeping ; dislike for her child, with desire to kill it. The husband told me her disease commenced when she was five months in the family way. At the time she was first brought, the child was one year old and was quite healthy. The first manifestation of her impulse to kill the child was when it was three months old.

I prescribed *Plat.* 6, which she took till the 21st Dec. The improvement was in all her symptoms from the commencement of treatment, was steady, and terminated in complete recovery.

---

[79] দ্যা ক্যালকাটা অফ জার্নাল অফ মেডিসিন, (এডিটেড) মহেন্দ্র লাল সরকার, অ্যা কেস অফ মেন্টাল অ্যাবেরেশন রিকভারি, উন্ডার কেয়ার অফ এম,এল, সরকার নং- ৫, মে, ভলিউম- VI, ১৮৭৩ , পৃ- ১৮৬

## ব্রোমাইড নিদ্রা মাধ্যমে উন্মাদ চিকিৎসা[৪০] - ভিষক দর্পণ পত্রিকায় প্রকাশিত

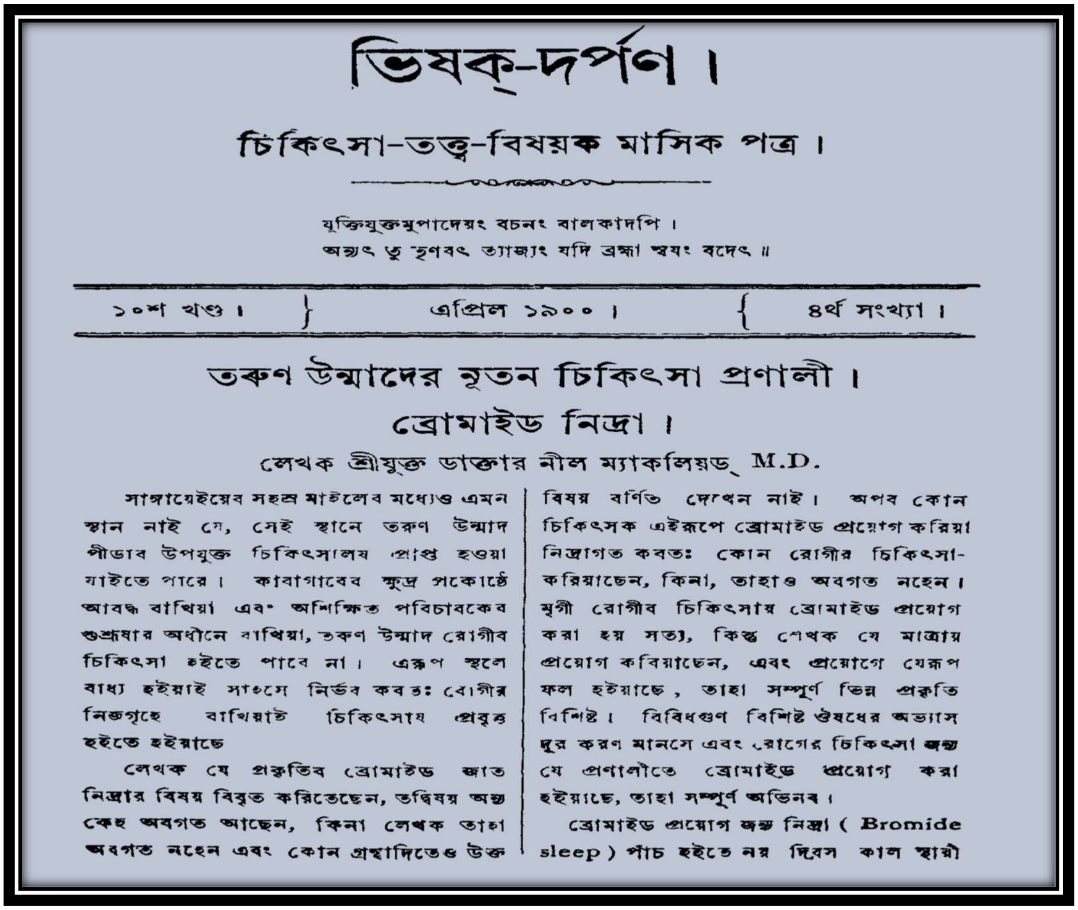

# ভিষক্-দর্পণ।

চিকিৎসা-তত্ত্ব-বিষয়ক মাসিক পত্র।

যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
অন্যৎ তু তৃণবৎ ত্যাজ্যং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ॥

১০শ খণ্ড। | এপ্রিল ১৯০০। | ৪র্থ সংখ্যা।

## তরুণ উন্মাদের নূতন চিকিৎসা প্রণালী।

### ব্রোমাইড নিদ্রা।

লেখক শ্রীযুক্ত ডাক্তার নীল ম্যাকলিয়ড্ M.D.

সাঙ্গায়েইয়ের সহস্র মাইলের মধ্যেও এমন স্থান নাই যে, সেই স্থানে তরুণ উন্মাদ পীড়ার উপযুক্ত চিকিৎসালয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। কারাগারের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ রাখিয়া এবং অশিক্ষিত পরিচারকের শুশ্রূষার অধীনে রাখিয়া, তরুণ উন্মাদ রোগীর চিকিৎসা হইতে পারে না। এরূপ স্থলে বাধ্য হইয়াই সাহসে নির্ভর করতঃ রোগীর নিজগৃহে রাখিয়াই চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে

লেখক যে প্রকৃতির ব্রোমাইড জাত নিদ্রার বিষয় বিবৃত করিতেছেন, তদ্বিষয় অন্য কেহ অবগত আছেন, কিনা লেখক তাহা অবগত নহেন এবং কোন গ্রন্থাদিতেও উক্ত বিষয় বর্ণিত দেখেন নাই। অপর কোন চিকিৎসক এইরূপে ব্রোমাইড প্রয়োগ করিয়া নিদ্রাগত করতঃ কোন রোগীর চিকিৎসা-করিয়াছেন, কিনা, তাহাও অবগত নহেন। মৃগী রোগীর চিকিৎসায় ব্রোমাইড প্রয়োগ করা হয় সত্য, কিন্তু লেখক যে মাত্রায় প্রয়োগ করিয়াছেন, এবং প্রয়োগে যেরূপ ফল হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট। বিবিধগুণ বিশিষ্ট ঔষধের অভ্যাস দুর করণ মানসে এবং রোগের চিকিৎসা জন্য যে প্রণালীতে ব্রোমাইড প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ অভিনব।

ব্রোমাইড প্রয়োগ জন্য নিদ্রা ( Bromide sleep ) পাঁচ হইতে নয় দিবস কাল স্থায়ী

# উনিশ শতকে পাগলামি নিরাময়ের

## জল চিকিৎসা (হাইড্রোথেরাপি)

প্রাচীনকাল থেকে পাগল কে অতিপ্রাকৃত ও ভৌতিক রূপে দেখা হতো, তখন কার দিনগুলিতে উন্মাদ রোগের কারন সম্পর্কে সঠিক ব্যাখ্যা জানা ছিল না। লোকধারনা অনুযায়ী জলকে আধ্যাত্মিক পরিশোধক হিসাবে দেখা হত । জল চিকিৎসার প্রচলন বঙ্গদেশে একবারে নতুন নয়, প্রাক ঔপনিবেশিক সমাজে ও জল চিকিৎসার প্রচলন ছিল, কারন ইতিপূর্বে উন্মাদ রোগী দেও কবিরাজী পন্থায় ঠান্ডা জলে স্নান করিয়ে হিংসাত্মক পাগল কে মস্তিস্কেও উদ্দিপনা

---

[৪০] ভিষক- দর্পণ, বঙ্গভাষায় চিকিৎসা তত্ত্ব বিষয়ক মাসিক পত্রিকা, সম্পাদকঃ শ্রী কালী মোহন সেন ও শ্রী ডাক্তার গিরীশচন্দ্র বাগছী, তরুন উন্মাদের নতুন চিকিৎসা প্রণালী- ব্রমাইড নিদ্রা , শ্রীযুক্ত ডাক্তার নীল ম্যাকলিয়ডের দশম খণ্ড , চতুর্থ সংখ্যা, কলিকাতা, এপ্রিল ১৯০০ পৃষ্ঠা- ১৩৭

প্রশমিত করার রেওয়াজ বঙ্গদেশে প্রচিলিত ছিল[81] । কিন্তু কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই জল চিকিৎসার বৈজ্ঞানিক সম্মত ব্যাখ্যা আবিস্কার ও তা কার্যকরী করার ফলে পাগল চিকিৎসার ক্ষেত্রে জল চিকিৎসা খুব ই- জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল । প্রাচীন ভারতে জলকে বহু ব্যাধি নিরাময়ের জন্য ব্যবহার করত। মধ্যযুগের সময়, ম্যানিক লোকেদের প্রায়শই পবিত্র কূপগুলিতে দীর্ঘ সময় ধরে স্নান করান হতো। পাগলামি চিকিৎসার ক্ষেত্রে ঠান্ডা জলে স্নান করানর মূল উদ্দেশ্য ছিল হলুদ পিত্তের সাথে সম্পর্কিত উচ্চতাপ এবং শুষ্কতা হ্রাস করে উন্মাদ রোগীর শারীরিক শিথিলতা বজাই রাখা । রেনেসাঁর সময়, ফ্লেমিশ নামক এক চিকিতসক এবং রসায়নবিদ জে.ব্যাপটিস্ট ভ্যান হেলমন্ট তার আর্টস মেডিসিনে জল চিকিৎসার প্রবর্তন করেছিলেন । ভ্যান হেলমন্ট সর্বপ্রথম উন্মাদ রোগীদের চিকিৎসার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে ঠান্ডা জলে সল্প সময়ের জন্য ডুবিয়ে রাখতেন তারপর আনুসঙ্গিক চিকিৎসা শুরু করতেন । অষ্টাদশ শতাব্দীতে উন্মাদ রোগের জন্য জল নিরাময়ের চিকিৎসা ক্রমশ বিকাশ লাভ করে ছিল , কিন্তু সমস্ত পাগলদের জন্য জল নিরাময় পদ্ধতি প্রযোজ্য হতো না , শুধুমাত্র বিশেষ বিশেষ রোগী দের জন্য এই চিকিৎসা করার ব্যবস্থা করা হত । ভ্যান হেলমন্ট উপলব্ধি করেছিলেন সমস্ত রোগীর দের জন্য জল নিরাময় প্রয়োগ করারবার পর কিছু রোগীর মৃত্যুও ঘটেছিল [82] ।

উনিশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ বাংলার উন্মাদ আশ্রম গুলিতে যত রকমের চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তাঁর মধ্যে হাইড্রোথেরাপি চিকিতসা ছিল সবচেয়ে বেশী সহজলভ্য ও সাধারন, এছাড়াও চিকিৎসার ক্ষেত্রে খরচ খুবই কম । বাংলার উন্মাদ আশ্রয়কেন্দ্র গুলিতে জল

---

[81] দৈনন্দিন রোগের জল চিকিৎসা, লেখকঃ শ্রী কুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্রকাশকঃ শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কলিকাতা।
বৈজ্ঞানিক জল চিকিৎসা, লেখকঃ শ্রী কুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশকঃ শ্রী সত্তেন্দ্রনাথ সেন, বৈজ্ঞানিক জল চিকিৎসালয় , কলিকাতা।

[82] স্মিথ, ম্যাথিউ অ্যা সর্ট হিস্টোরি অফ মেন্টাল হেলথ, দ্যা হিলিং ওয়াটার; দ্যা লঙ্গ হিস্টোরি অফ ইউজিং ওয়াটার টু কিওর ম্যাডনেস, সাইকোলজি টুডে, ২০১৫

চিকিৎসার দুটি প্রধান পদ্ধতি ছিল হাইড্রোথেরাপির ডুচে (ঝরনা), জলের একটি ধ্রুবক বর্ষণ পাগলের উত্তাপকে শীতল করতে পারে বা মেলানলিককে কমিয়ে তোলে; এবং ব্যালেনিয়াম (স্নান), যা স্নায়ুকোষগুলিকে শান্ত করার জন্য তৈরি হয়েছিল [83]।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় উন্মাদ আশ্রম বৃদ্ধি প্রসারের সাথে সাথে জল- চিকিৎসার প্রচলনও বৃদ্ধি পেয়েছিল , প্রায় সব উন্মাদ আশ্রম গুলিতে হাইড্রোথেরাপি মাধ্যমে চিকিৎসা করা হত । সেক্ষেত্রে অধিক উন্মত্ত রোগীদেরের জন্য সপ্তাহে বেশ কয়েকবার হাইড্রোথেরাপি করা হত , অর্থাৎ পাগল দের মধ্যে যারা বেশি উন্মত্ত ছিল এবং মাঝে মাঝে যাদের উন্মাদনার মাত্রা যখন বেশি হয়ে যেত , তখন তাদের কে ঠান্দা জলে সমগ্র শরীর ও মস্তক ভিজিয়ে দেওয়া হতো। এই জন্য বেশির ভাগ উন্মাদ আশ্রম গুলির অভ্যন্তরে তৈরি হয়েছিল শীতল ঝরনা ঘর, স্নানের বাক্স, ডানকিং ডিভাইস, মই এবং বালতি এবং যেগুলি বেনজমিন রাশের (১৭৪৬-১৮১৩) "ট্রানকুইলাইজার" অন্তর্ভুক্ত ছিল [84]।

যদিও উনিশ শতক ছিল মানসিক রোগ চিকিৎসায় একটি প্রাথমিক পর্যায়, এই সময় মনোরোগের প্রকৃত কারন কি , মনোরোগের শ্রেণী বিভাগ কিংবা চিকিৎসার মূল সুত্র সর্বোপরি সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্পর্কে অবগত হওয়া পশ্চিমী চিকিৎসকদের আবশ্যিক হয়ে উঠেছিল। ঔপনিবেশিক সরকার আধিপত্য বিস্তার করার পর তারা বিভিন্ন রোগের উপর নানা পরীক্ষা নিরিক্ষা চালিয়েছিল । তেমনি মানসিক রোগ চিকিৎসায় ক্ষেত্রেও তা ব্যতিক্রম। পাগল চিকিৎসায় ও মনোরোগের নতুন বিশ্লেষণ ও নতুন পন্থা আবিস্কারের জন্য এদেশের পাগলাগারদ গুলি নমুনা সরূপ ঔপনিবেশিক সরকার ব্যাবহার করেছিল। তাই বিভিন্ন প্রকার উন্মাদ রোগীর উপর চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন প্র-কৌশল পদ্ধতি প্রয়োগ করা হত। কখন কখনো বা ঘুম পাড়ানোর ঔষধ সেবনের পর ঠান্ডা জলে স্নান করানোইত্যাদি প্রকৌশল বা উদ্ভাবনী পন্থার মাধ্যমে মানসিক রোগীদের অভীক্ষা (Test) করা হতো।

---

[83] বৈজ্ঞানিক জল চিকিৎসা, লেখকঃ শ্রী কুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশকঃ শ্রী সত্তেন্দ্রনাথ সেন, বৈজ্ঞানিক জল চিকিৎসালয় , কলিকাতা।

[84] স্মিথ, ম্যাথিউ অ্যা সর্ট হিস্টোরি অফ মেন্টাল হেলথ, দ্যা হিলিং ওয়াটার; দ্যা লঙ্গ হিস্টোরি অফ ইউজিং ওয়াটার টু কিওর ম্যাডনেস, সাইকোলজি টুডে, ২০১৫

# পাগল চিকিৎসায় হাইড্রোথেরাপির ডুচে পদ্ধতি ও ঝর্না জলের বর্ষণ[85]

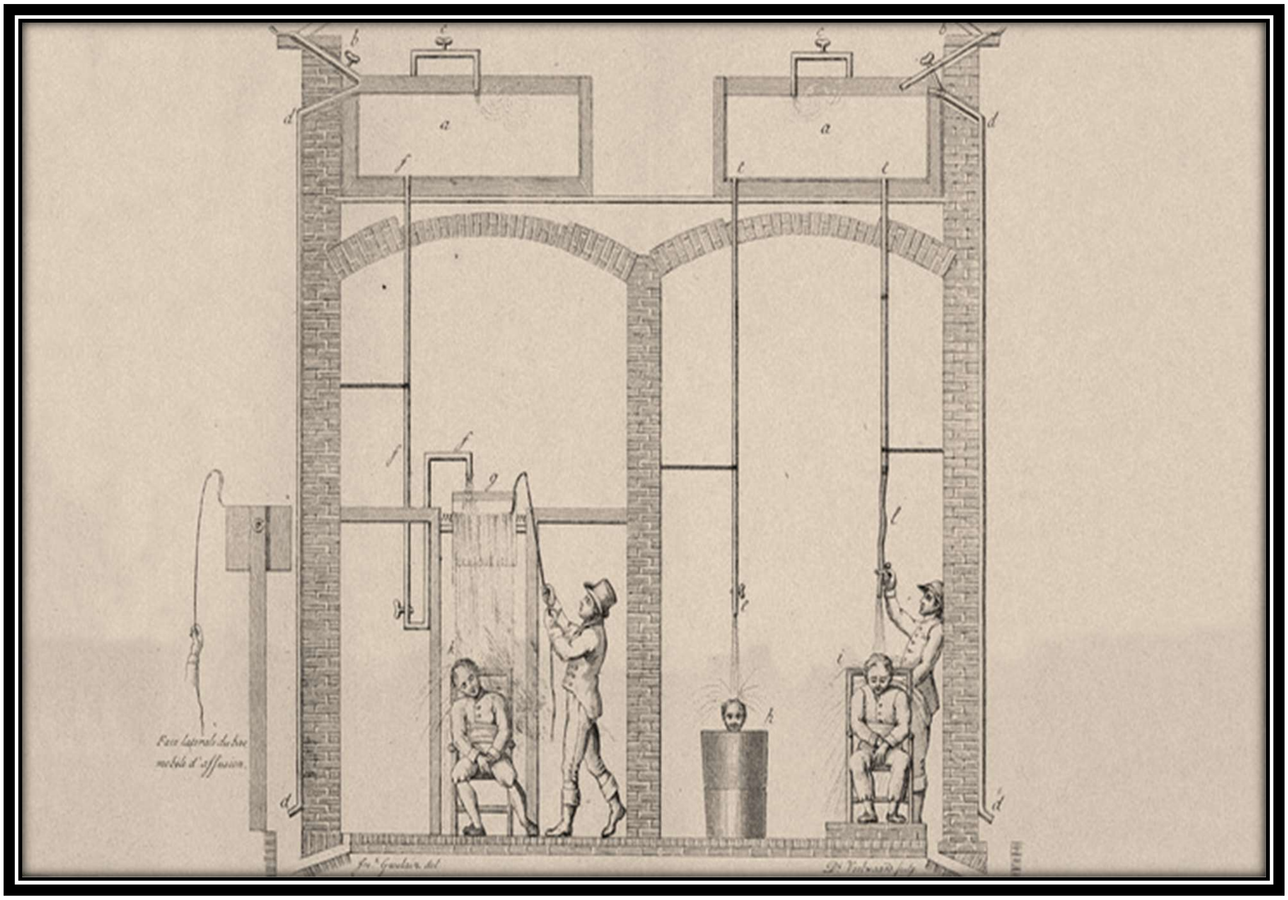

[85] ইন্টারনেট আর্কাইভ থেকে সংগৃহীত, Guislain Joseph এর চিত্রিত মডেল। (Traité sur l'alienation mentale et sur les hospices des aliénés), Published, 1826 p-58

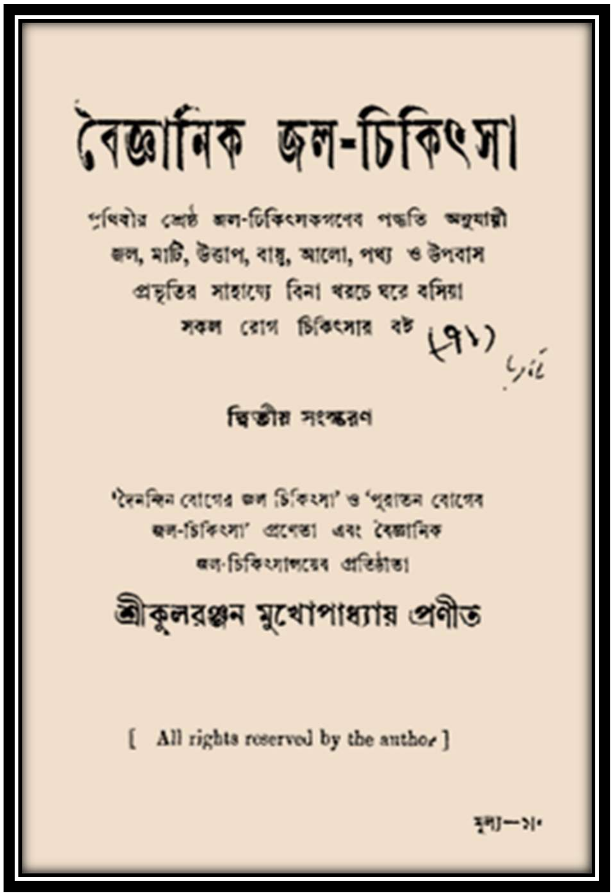

বৈজ্ঞানিক জল-চিকিৎসা

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জল-চিকিৎসকগণের পদ্ধতি অনুযায়ী
জল, মাটি, উত্তাপ, বায়ু, আলো, পথ্য ও উপবাস
প্রভৃতির সাহায্যে বিনা খরচে ঘরে বসিয়া
সকল রোগ চিকিৎসার বই

দ্বিতীয় সংস্করণ

'দৈনন্দিন রোগের জল চিকিৎসা' ও 'পুরাতন রোগের
জল-চিকিৎসা' প্রণেতা এবং বৈজ্ঞানিক
জল-চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠাতা

শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

[ All rights reserved by the author ]

মূল্য—১৷৹

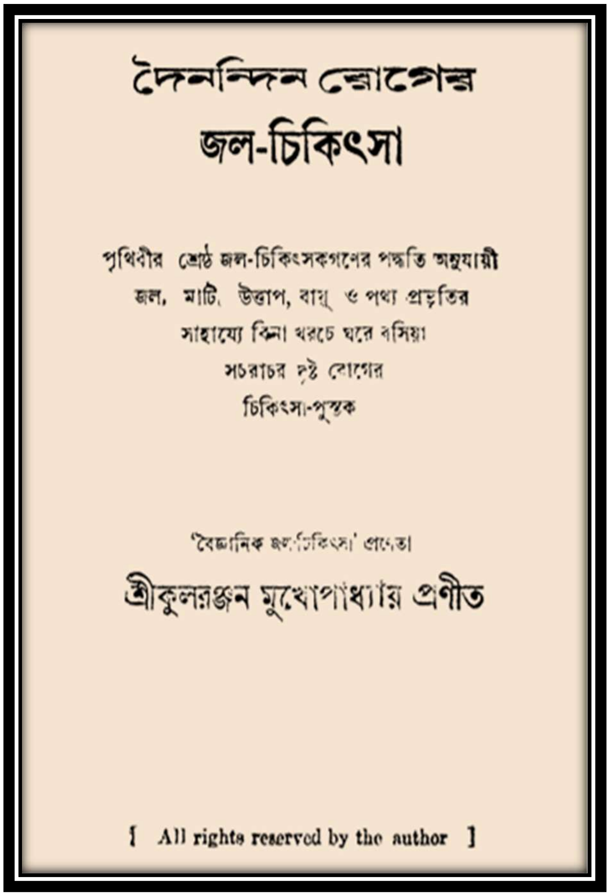

দৈনন্দিন রোগের
জল-চিকিৎসা

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জল-চিকিৎসকগণের পদ্ধতি অনুযায়ী
জল, মাটি, উত্তাপ, বায়ু ও পথ্য প্রভৃতির
সাহায্যে বিনা খরচে ঘরে বসিয়া
সচরাচর দৃষ্ট রোগের
চিকিৎসা-পুস্তক

'বৈজ্ঞানিক জল-চিকিৎসা' প্রণেতা

শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

[ All rights reserved by the author ]

বাংলা প্রেসিডেন্সিতে বেনজমিন রাশের পদ্ধতি কে অনুসরন করে শ্রী কুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায় পাগল চিকিৎসার জন্য জল চিকিৎসার প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন, যা উক্ত গ্রন্থ দুটি তে আলোচিত আছে[86] [87] ।

## উন্মাদ রোগ ও দেশীয় চিকিৎসাবিধি

প্রাক ঔপনিবেশিক যুগে বাংলার সমাজে উন্মাদ রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে যে প্রথাটি আয়ুর্বেদ শাস্ত্র নামে পরিচিত সেই পদ্ধতির প্রয়োগকরে নানাবিধ উপায়ে উন্মাদ রোগের চিকিৎসা করা হত।এপ্রসঙ্গে চরক সংহিতা বিশেষ উল্লেখযোগ। উক্ত গ্রন্থে উন্মাদ

---

[86] দৈনন্দিন রোগের জল চিকিৎসা, লেখকঃ শ্রী কুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্রকাশকঃ শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কলিকাতা।

[87] বৈজ্ঞানিক জল চিকিৎসা, লেখকঃ শ্রী কুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশকঃ শ্রী সত্তেন্দ্রনাথ সেন, বৈজ্ঞানিক জল চিকিৎসালয় , কলিকাতা ।

কী ? উন্মাদের কারণ কী ? উন্মাদের লক্ষণ কী ? এমন কি এই রোগের চিকিৎসা বিধান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে । উক্ত চিকিৎসা বিধান কে অনুসরণ করে বাংলার কবিরাজ ও বৈদ্যরা পাগলদের চিকিৎসা করত । সাধারণত এদেশীয় সমাজে লোকভাষায় যে সমস্ত ব্যক্তি পাগল রূপে পরিচিত হত তাদের কে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের পরিভাষায় বলা হত উন্মাদ রোগী বলা হত। উন্মাদ শব্দটি উৎপত্তি হয়েছে সংস্কৃত শব্দ থেকে । আসলে উন্মাদ একটি রোগ । চরক সংহিতায় উন্মাদ রোগ কারণ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন।

*" ইহ খলু পঞ্চোন্মাদা ভবন্তি*

*তদ্যথা বাতপিত্তকফসন্নিপাতাগনিমিত্তা*[88] "

অথাৎ উন্মাদ রোগ পাঁচ প্রকারে হয়ে থাকে ; যথা ১.বাত নিমিত্ত , ২.পিত্তমিনিত্ত , ৩.শে-ষ্মনিমিত্ত , ৪.সন্নিপিত জন্য ও ৫.আগুন্ত নিমিত্ত।

## আয়ুর্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্রে উন্মাদের কারণ

আয়ুর্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্রে মনে করা হয়- উক্ত পাঁচ প্রকার কারণের জন্য শুরু উন্মাদ রোগ হয় । তাছাড়া উন্মাদ দেহের ব্যাধি নয় - মনের ব্যাধি । কিন্তু এই মনের ব্যাধি কিভাবে হয় তার জন্য উক্ত কারণগুলির উল্লেখ্য করেছেন । অবৈধ আহারে ফলে বায়ু , পিত্ত ও কফ ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে । বুদ্ধির স্থান হৃদয় কে এবং সেখানকার মনোবহা ধমনীগুলিকে দুষিত করে বুদ্ধি-শক্তি ও স্মৃতিকে নষ্ট করে দেয় এবং চিত্তের বিকৃতি জন্মায় । তখন বুদ্ধি ঠিকভাবে কাজ করে না , মনও স্বাভাবিকভাবে কাজ করে না । সেই অবস্থায় নাম উন্মাদ রোগ । এছাড়াও মনের বিকৃতি ঘটানোর মূলে আরো অনেক কারণ থাকতে পারে যেমন হঠাৎ অতি ভয় বা অতি হর্ষ , ধন নাশ, স্বজনের মৃত্যু প্রভৃতি । যাদের মনের শক্তি দুর্বল , তাদেরই এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে[89] ।

---

[88] নাগ , ব্রজেন্দ্র নাথ ( সম্পাদিত ) চড়ক সংহিতা বাংলা অনুবাদ, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা পৃষ্ঠা ৫১

[89] নাগ , কবিরাজ ব্রজেন্দ্র নাথ(সম্পাদিত ) *আয়ুর্বেদ প্রদীপ*, নবপত্র প্রকাশন,১৯৮০,কলিকাতা পৃষ্ঠা ৬৮

বুদ্ধিভ্রম , মনের অস্থিরতা , ব্যাকুলিত নেত্র দর্শন , অধীরতা , অসম্বদ্ধ বাক্য - প্রয়োগ ও হৃদয়ের শূন্যতা , এই সমস্ত উন্মাদ রোগরে সাধারণ লক্ষণ । এছাড়া অযোগ্য ক্ষেত্রে হাসি-কান্না তর্জন -গর্জন , অনেক কথা বলা বা খুবই কমকথা বলা , নির্জনে একা একা ভাবা , গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করা এবং আরও অন্যান্য লক্ষণও দেখা যায়[90] ।

ভারতীয় চিকিৎসা ব্যবস্থায় যে শাখাটি আয়ুর্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্র নামে পরিচিত চরক সংহিতা হল ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের একটি অন্যতম আকর গ্রন্থ। এই গ্রন্থের উপর ভিত্তি প্রাচীন ভারতে চিকিৎসা বিজ্ঞানে যে ঘরানা তৈরী হয়েছিল সেটি আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ব্যবস্থা নামে পরিচিত[91] । ( Ayurveda ) আয়ুর্বেদ একটি সংস্কৃত শব্দ যার অর্থ জীবনের জ্ঞান ( চরক সংহিতা ; রচনা ৩০০-৫০০ ইঈ , গুপ্তযুগ ) এবং এই শাস্ত্রের অন্যতম বিষয় হল কোন রোগীকে প্রতক্ষ্য দর্শন (Direct observation ) মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা। যদিও অধিবিদ্যার বিষয়টি কঠিন রোগ নির্ণয় - এর ব্যবহার করা হত [92] । বিশেষ করে মানষিক রোগীদের ক্ষেত্রে। কোন রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মুলত ব্যবহারিক জীবনে চারটি বিষয় আয়ুর্বেদিয় চিকিৎসা গুরুত্ব দেওয়া হত। সেগুলি হল যথা ১. রোগ নির্ণয় ,২ .রোগ নির্ণয়ের পর রোগীর পথ্য , ৩.রোগীর সেবাদান, এবং ৪. রোগীর অবস্থা। উক্ত বিষয়গুলি আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় উন্মাদ রোগীর ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত করা হত । আবার উন্মাদ রোগীর মানষিক পরিমন্ডল বা মানষিক অবস্থা এছাড়াও জৈবিক অবস্থা নির্ণয়ের পর নির্ধারিত পথ্যের মাধ্যমে সেবায়ত করা হত। বিশেষ করে যিনি রোগীর পাশে থেকে সেবা দান করত তার ব্যবহারিক কার্যকলাপ , রোগীর সঙ্গে সুসম্পর্ক এবং রোগীর কার্যকলাপ কে সুস্থির ভাবে নিয়ন্ত্রন ও পর্যবেক্ষণ করা ছিল দেশীয় চিকিৎসা ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট [93] ।

---

[90] সেন শর্মা, বৈদ্য আচার্য কালী কিংকর ও ভট্টাচার্য সত্যশেখর (সম্পাদিত) ***আয়ুর্বেদ প্রদীপ,*** দীপায়ন প্রকাশন, কলিকাতা, পৃষ্ঠা-১০৭

[91] আয়ুর্বেদ, মাসিক পত্রিকা ও সমালোচক , সম্পাদকঃ কবিরাজ শ্রী বিরজাচরন গুপ্ত,তৃতীয় বর্ষ, ১৩২৫ আশ্বিন – ১৩২৬ ভাদ্র পর্যন্ত , কলিকাতা। পৃষ্ঠা- ৪৬

[92] কবিরাজ শ্রী অমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ ***আয়ুর্বেদ শিক্ষা,*** ,প্রথম খণ্ড,চতুর্থ সংস্করণ,কলিকাতা,১৯১২ পৃষ্ঠা-১৩

[93] চিকিৎসা সম্মিলনি, চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্রিকা, দ্বিতীয় খণ্ড, ১২৯২ সাল , সম্পাদকঃ শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী, প্রকাশকঃ কলিকাতা।

# আয়ুর্বেদশাস্ত্রে উন্মাদের শ্রেণী বিভাগ ও লক্ষ্মণ

দেশীয় চিকিৎসা ব্যবস্থায় বুদ্ধিভ্রংশ , মনের অস্থিরতা, ব্যাকুলিতনেত্রে দর্শন , অধীরতা , অসম্বদ্ধ বাক্য প্রয়োগ ও হৃদয়ের শূন্যতা , ইত্যাদি বিষয় গুলি কে উন্মাদ রোগের সাধারণ লক্ষণ হিসাবে বিবেচনা করা হয় । উক্ত লক্ষন গুলির পাশাপাশি আয়ুর্বেদ চিকিৎসা উন্মাদ রোগের লক্ষ্মণকে মুলত ৫ টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে [94] । সেগুলি হল যথা -

**১. বাতিক উন্মাদরোগের লক্ষণ -** বাতিক উন্মাদরোগী কখন কখন ঈষৎ হাস্য , নৃত্য , গীত , অত্যধিক বাক্যালাপ , অঙ্গচালনা ও ক্রন্দনাদি করে এবং তাহার শরীরের কৃশতা , কর্কশতা ও অরুণবর্ণতা লক্ষিত হয়। আহার জীর্ণ হলে , এই রোগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় । রুক্ষ অম্ল ও শীতলদ্রব্যসেবন এবং বিরেচন , ধাতুক্ষয় ও উপবাসাদি দ্বারা । অত্যন্ত বায়ুবৃদ্ধি হইয়া চিন্তাযুক্ত হৃদয়কে আশ্রয়পূর্বক অবিলম্বে বৃদ্ধি ও স্মৃতি বিনষ্ট করে বাতিক উন্মাদ জন্মায় [95] ।

**২. পৈত্তিক উন্মাদরোগের লক্ষণ -** পৈত্তিক উন্মাদরোগে রোগীর অসহিষ্ণুতা , মৌখিক জাকজমক ও শরীরের পীত দৃষ্ট হয় । অন্য লোক দেখিলে রোগী ভয় পায় ও লুক্কায়িত হয় । সর্বদা তাহার শরীর উষ্ণ , দাহান্বিত ও ক্রোধযুক্ত থাকে , ছায়াতে অবস্থান করতে এবং শীতল অম্ল ও পানীয় সেবন করতে অভিলাষ জন্মে । আহারের পচ্যমান অবস্থায় এই রোগ বৃদ্ধি পায় । কটু , অজীর্ণকারক , অম্ল রসযুক্ত , পিত্তবৰধক ও উষ্ণগুণ বিশিষ্ট দ্রব্য সেবন দ্বারা সঞ্চিত ও কুপিতপিত্ত হৃদয়কে আশ্রয়পূর্ব্বক পৈত্তিক উন্মাদ উৎপাদন করে[96] ।

**৩. শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগের লক্ষণ-** শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগে রোগীর অল্পবাক্যকথন , আহারে অরুচি , জনশূন্যস্থানে থাকিতে ইচ্ছ , নিদ্রাধিক্য , বমন , লালাস্রাব এবং শরীরের চর্ম , মূত্র ও নেত্র শুষ্কতা পরিলক্ষিত হয় , পরন্তু আহার করা মাত্র এই রোগ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে । সুস্থ শরীরে ব্যায়ামাদি কিংবা পরিশ্রম না করলে, অত্যধিক ভোজন দ্বারা পিত্তের সহিত কফ হৃদয়কে আশ্রয়

---

[94] নাগ , কবিরাজ ব্রজেন্দ্র নাথ ( সম্পাদিত ) আয়ুর্বেদ প্রদীপ, নবপত্র প্রকাশন,১৯৮০ কলিকাতা পৃষ্ঠা ৫২

[95] চরক সংহিতা ( বাংলা অনুবাদ ), কবিরাজ বজেন্দ্র চন্দ্র নাগ, নব পত্র প্রকাশনী, ১৯৮৪ কোলকাতা, পৃষ্ঠা -১১১

[96] চরক সংহিতা ( বাংলা অনুবাদ ), কবিরাজ বজেন্দ্র চন্দ্র নাগ, নব পত্র প্রকাশনী, ১৯৮৪ কোলকাতা, পৃষ্ঠা -১১২

পূর্ব্বক বুদ্ধি ও স্মৃতিকে বিনষ্ট এবং চিত্তকে মোহিত করে , এই জন্য শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগ উৎপন্ন হয়[97] ।

**৪. সান্নিপাতিক উন্মাদরোগের লক্ষণ -** ত্রিদোষাশ্রিত উন্মাদরোগে পূর্ব্বকথিত বাতিক , পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগের লক্ষণ সকল মিলিত ভাবে প্রকাশ পেয়ে থাকে । এই রোগ অসাধ্য বাতিক , পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক উন্মাদের কারণ সমূহ মিলিত হলে , সান্নিপাতিক উন্মাদ জন্মে।

**৫. মানসিক দুঃখজনিত উন্মাদরোগের লক্ষণ -** মানসিক দুঃখজন্য উন্মাদরোগে রোগী সময় সময় জ্ঞানশূন্য হইয়া মনোগত গোপনীয় কথা প্রকাশ করে এবং গান , হাস্য বা রোদন করতে থাকে[98] ।

## উন্মাদ রোগের অন্যান্য লক্ষণ[99]

আয়ুর্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্রে উপরিউক্ত পাঁচটি প্রধান লক্ষন ছাড়াও উন্মাদ রোগের অন্যান্য কয়েকটি লক্ষণ গুলি নিম্নে আলোচনা করা হল -

**বিষজনিত উনামাদের লক্ষণ -** বিষজনিত উন্মাদে রোগীর চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ , মুখ কৃষ্ণবর্ণ , এবং রোগী অত্যন্ত ক্লান্তিযুক্ত ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে থাকে ।

**যক্ষগ্রহাবিষ্ট উন্মাদের লক্ষণ -** যক্ষগৰহজনিত উন্মাদে রোগীর চক্ষুর্দ্বয় তাম্রবর্ণ হয় ও ঐ ব্যক্তি মনোরম সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করে এবং স্বভাবতঃ গম্ভীর প্রকৃতি , দ্রুতগমনশীল , অল্প বাক্য প্রয়োগকারী , ধৈৰ্য্যগুণসম্পন্ন ও তেজস্বী হয় , পরন্তু তাকে কোন বস্তু দান করে , ইত্যাকার বাক্য প্রয়োগ করে ।

**পিতৃগৰহজন্য উন্মাদের লক্ষণ -** পিতৃগ্রহ জনিত উন্মাদে রোগীর বংশগত কারনে উন্মাদ গ্রস্থতা দেখা যায়। প্রশান্ত চিত্তে পিতৃলোকের উপর যথোচিত ভক্তিপ্রকাশ করে , পরন্তু মাংস , তিল , গুড় ও পায়স প্রভৃতি ভক্ষণের ইচ্ছা হয় ।

---

[97] চরক সংহিতা ( বাংলা অনুবাদ ), কবিরাজ বজেন্দ্র চন্দ্র নাগ, নব পত্র প্রকাশনী, ১৯৮৪ কোলকাতা, পৃষ্ঠা -১১২
[98] চরক সংহিতা ( বাংলা অনুবাদ ), কবিরাজ বজেন্দ্র চন্দ্র নাগ, নব পত্র প্রকাশনী, ১৯৮৪ কোলকাতা, পৃষ্ঠা -১১৩
[99] চরক সংহিতা ( বাংলা অনুবাদ ), কবিরাজ বজেন্দ্র চন্দ্র নাগ, নব পত্র প্রকাশনী, ১৯৮৪ কোলকাতা, পৃষ্ঠা -১১৩

**নাগাবিষ্ট উন্মাদের লক্ষণ-** সাপের কামড়ের পর যদি রোগী আরোগ্য লাভ করে কিন্তু পরবর্তীকালে সুচিকিৎসা তারতম্য জনিত কারনে উন্মাদ অবস্থার লক্ষন দেখা দিতে পারে। রাক্ষসবিষ্ট উন্মাদের লক্ষণ রাক্ষসগৰহজনিত উন্মাদে রোগী মাংস ভক্ষন ও অধিক সোমরস পানে অভিলাষী , অত্যন্ত নিষ্ঠুর , অতি বলবান , ক্রোধান্বিত এবং অতি সাহসী ও শুদ্ধাচারে বিদ্বেষভাবাপন্ন হয় ।

## আয়ুর্বেদ চিকিৎসা মতে উন্মাদরোগর কারন

আয়ুর্বেদ চিকিৎসা মতে উন্মাদরোগে বায়ু , পিত্ত ও শ্লেষ্মা প্রকুপিত এবং বর্ধিত হয়ে বুদ্ধির স্থান, হৃদয় ও মনোবহা ধমনীকে আশ্রয় করে মনের বৈকল্য উৎপাদন করে থাকে , এই জন্যই একে **মানসরোগ** বলে। উন্মাদরোগ মানসিক ব্যাধি শারীরিক ব্যাধি নয়। অন্যান্য রোগে বায়ু পিত্তাদি প্রকুপিত হয়ে রসাদি ধাতু ও শারীরিক অন্যান্য অঙ্গযন্ত্রকে আশ্রয় করে থাকে, কিন্তু উন্মাদরোগে বাতাদি দোষ মনোবহা ধমনীকে আশ্রয় করে , এই জন্যই চিত্তের অস্থিরতা প্রযুক্ত বুদ্ধিবৃত্তি বিপথ গামিনী হয় , অতএব অন্যান্য রোগের ন্যায় এই রোগেও প্রকুপিত বাতাদি দোষ প্রশমিত না হলে মনোবৃত্তির দ্বিরতা হয়না [100] ।

বাতাদি দোষ বিবিধ কারণে বৃদ্ধি হয়ে রজ ও তমো গুণবহুল ব্যক্তির হৃদয়স্থিত ধমনী আশ্রয় পুর্ব্বক বুদ্ধিবৃত্তির বিপর্যয় ঘটায় । বহুবিধ কারণে এই রোগ জন্মে , কিন্তু অস্বাভাবিক উপায়ে বা দীর্ঘকাল অভিলষিত দ্রব্যের অভাব কিংবা অন্যান্য যে সমস্ত কারণ উন্মাদরোগের উৎপাদক স্বরূপ পশ্চাৎ বর্ণিত হয় , সেই সমস্ত কারণ অনেকস্থলে পরিলক্ষিত হলেও সর্বত্রই উন্মাদরোগ উৎপন্ন হয় না । বিরুদ্ধদ্রব্য বা বিষাক্ত অন্নভোজন , সাধ্যাতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম , ভয় বা হর্ষজন্য মনোবিভ্রংশ ও মদ , গাঁজা , আফিং প্রভৃতি সেবন , এই সকল কারণে বিভিন্ন প্রকার উন্মত্ততা প্রকাশ পায় । মস্তিষ্কের বিভিন্ন যন্ত্রের পীড়া ও বিবিধ রোগ থেকে মস্তিষ্ক বিকৃতি হতে পারে ।

পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারনে অনেক সময় মস্তিষ্ক বিকার হতে পারে । অল্পবয়সে সর্বদা মানসিক পরিশ্রমে নিযুক্ত করা অধিক কাৰ্য্য নিয়োজিত থাকলে মস্তিষ্ক বিকৃতির সম্ভবনা জন্মে । আবার

---

[100] সেন শতীশ চন্দ্র , আয়ুর্বেদ চিকিৎসা, ধবনন্তরি প্রকাশনী, শালদাহ ১৯১৪, পৃষ্ঠা ২৮

বাল্যকালে পিতা - মাতা সন্তানকে কঠোর শাসনাধীনে রাখিলেও বালকের মানসিক বিকৃতি সম্ভবনা দেখা যেতে পারে । অনেকের আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা জন্মে বা অনেকে উন্মাদগ্রস্থ পরিণত হয় ।

সভ্য - সমাজে অনেকেই শিল্প ও বিজ্ঞান প্রভৃতির উন্নতি লাভ আকাঙ্খায় সাধ্যাতীত চিন্তা করে থাকেন,এই অতিরিক্ত চিন্তার ফলে এই রোগের উৎপত্তি হয় । পিতামাতার পানদোষে অথবা সুরাপানের অভ্যাস থাকলে, সন্তানের উন্মত্ততা বা মনোবিকৃতি হতে পারে ।

## উন্মাদ রোগের ঔষধ

ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় চিকিৎসায় আয়ুর্বেদ শুধুমাত্র একটি ভেষজ ঐতিহ্য নয়, রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতির সাথে জীবনের একটি বিশুদ্ধ বিজ্ঞান। আদর্শগত ভাবে আয়ুর্বেদের উল্লেখযোগ্য অবদান আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সংশ্লেষিত করা হয় । আয়ুর্বেদ পন্ডিতদের মনস্তাত্ত্বিক রোগের ক্ষেত্রে দার্শনিক তত্ত্ব বিখ্যাত ছিল এবং উন্মাদ রোগ চিকিৎসায় বিভিন্ন প্রকার ঔষধ প্রনালী লিপিবদ্ধ করেছেন , সেগুলি হল বটি ঔষধ , চূর্ণ জাতীয় ঔষধ, রস জাতীয় (তরল/সিরাপ), তৈল জাতীয়, ঘৃত জাতীয়, নস্য জাতীয় ও বিবিধ ঔষধ । নিন্মে উন্মাদ রোগ চিকিৎসার বিভিন্ন প্রকারের ঔষধ ও তার প্রনালী সম্পর্কে সরণীর মাধ্যমে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল ।

### উন্মাদ রোগের ঔষধ-বটি ও চূর্ণ জাতীয়[১০১]

| ঔষধের নাম | উন্মাদ রোগের লক্ষন ও ঔষধ প্রয়োগ | ঔষধ প্রনালী – ভেষজ উপাদান |
|---|---|---|
| ব্রাহ্মীযোগ - | বাতিক উন্মাদরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় স্মৃতিশক্তির হ্রাস এবং কখনও নৃত্য , কখনও বা গীত ও হাস্য প্রভৃতি অস্বাভাবিক ব্যাপার পরিলক্ষিত হলে ,এই ঔষধ রোগীকে সেবন করার কথা বলে হয়েছে। পৈত্তিক এবং শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগের ক্ষেত্রেও ইহা উপকারী। | ব্রাহ্মীশাকের রস ৪ তোলা , কুড়চূর্ণ ১ আনা ও মধু ১ তোলা মিশ্রিত করে একবারে সকালে সেবন করানো হয় । |
| কুস্মন্ডযোগ – | পৈত্তিক উন্মাদরোগে রোগীর পিপাসা ও ক্রোধ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পেলে , রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় রোগীকে এই ঔষধ সেবন করতে দেবে। বাতাশ্রিত উন্মাদরোগে এই ঔষধ দ্বারা উপকার হয় | কুষ্মাণ্ডবীজ চূর্ণ ১ তোলা , কুড়চূর্ণ ১ আনা এবং মধু ১ তোলা একত্র মিশ্রিত করে সেবন করার কথা বলা হয়েছে । |
| বচাদ্যযোগ — | শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগে রোগীর স্তম্ভিত – ভাব, নির্জন প্রিয়তা , কার্য্যের ও কথার অল্পতা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়, এই ঔষধ রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় রোগীকে সেবন করতে দেবে। এটি বাতিক বা সান্নিপাতিক উন্মাদরোগেও উপকারী । | বচাদ্যযোগ । বচচূর্ণ ১ তোলা , কুড় আনা ও মধু ১ তোলা , এই সকল দ্রব্য একত্র করে রোগী কে সেবন করানো হয় । |

[101] নাগ , কবিরাজ ব্রজেন্দ্র নাথ ( সম্পাদিত ) আয়ুর্বেদ প্রদীপ, নবপত্র প্রকাশন,১৯৮০ কলিকাতা পৃষ্ঠা ৬৯

| | | |
|---|---|---|
| শঙ্খপুষ্পীযোগ- | সান্নিপাতিক উন্মাদরোগে রোগীর বিবিধ লক্ষণ লক্ষিত হলে, রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে সেবন করতে দেবে । বাতিক বা শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করা যেতে পারে। | শঙ্খপুষ্পীর রস ৮ তোলা , কুড়চূর্ণ ১০ আনা ও মধু ১ তোলা , এই সকল দ্রব্য একত্র করে সেবন করতে দেবে। |
| সিন্দুরযোগ – | শ্লৈষ্মিক উন্মাদ বা সান্নিপাতিক উন্মাদরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে সেবন করতে দেবে। | স্বর্ণসিন্দুর ২ রতি মধুসহ তালের শাখার রসসহ মিশ্রিত করে প্রাতে সেবন করানো হয় । |
| সিদ্ধার্থকাদিযোগ- | বাতিক, পৈত্তিক অথবা শ্লৈষ্মিক উন্মাদ রোগের লক্ষণ সকল প্রকাশ পেলে , রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় এই চুর্ণ রোগীকে সেবন করতে দেবে । শ্লৈষ্মিক উন্মাদ রোগে এই চূর্ণের নস্য প্রয়োগ করলে সমধিক উপকার হয় । | সিদ্ধার্থকাদিয়োগ – শ্বেতসর্ষ, হিংবচ,ডহরকরঞ্জ , দেবদারু , মজিষ্ঠা , হরীতক,আমলা, বহেড়া , শ্বেত অপরাজিতা , লাতফীর ছাল, শুঠ , পিপুল , মরিচ , প্রিয়ঙ্গু , শিরীষবীজ , হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা , এই সকল দ্রব্য একত্র করে । মাত্রা ১ আনা। |

# উন্মাদ রোগের ঔষধ - তরল জাতীয়[102]

| ঔষধের নাম | উন্মাদ রোগের লক্ষন ও ঔষধ প্রয়োগ | ঔষধ প্রনালী – ভেষজ উপাদান |
|---|---|---|
| লঘবানন্দরস – | পৈত্তিক উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পেলে এবং বাতশ্লেষ্মর অনুবন্ধ থাকলে ও সান্নিপাতিক উন্মাদরোগে পিত্তের প্রবলতা দৃষ্ট হলে , এই ঔষধ রোগীকে সেবন করতে দেবে । । | অনুপান – ক্ষেতপাপড়ার রস , বেদানার রস বা পটোলের রস |
| বীরেশ্বররস – | বাতিক বা পৈত্তিক উন্মাদরোগে পিত্তের অনুবন্ধ থাকিলে এবং রোগীর নিদ্রার অভাব , বের ক্রমশঃ ক্ষয়ভাব ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পেলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করতে দিবে । | বাতিক ও পৈত্তিক মোদের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় ইহা সেবন করান যায় । অনুপান – ক্ষেত পাপড়ার রস ও মধু। |
| উন্মাদভঞ্জনরস – | বাতিক বা পৈত্তিক উন্মাদরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় যে কোন লক্ষণ প্রকাশ পেলে এবং রোগীর শরীরের কৃশতা দেখা হলে , তাকে এই ঔষধ সেবন করতে দেওয়া হয় । ইহা সেবন করিয়ে সপ্তাহান্তর রেচক ঔষধ প্রদান করা হয় । অনুপান = ভৃঙ্গরাজের রস ও মধু । | উন্মাদভঞ্জনরস । শুঠ , পিপুল , মরিচ , হরীতকী , আমলা , বহেড়া , গজপিপ্পলী , বিড়ঙ্গ , দেবদারু , চিরতা , 417ন্টিকারী , যষ্টিমধু , ইন্দ্রযব , রক্তচিতা , বেড়েলা , পিপুলমূল , বেণার মূল , শজিনাবীজ , তেউড়ীমূল , রাখাল শশার মুল , বঙ্গ , রূপা ও প্রবাল এই সকল চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্বসমান একত্রে মিশ্রিত করে জল দ্বারা মর্দন করবে । বটী ৩ রতি । |
| চিন্তামণিরস – | বাতিক বা পৈত্তিক উন্মাদরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় যতোক্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং সান্নিপাতিক উন্মাদরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় বাতপিত্ত প্রবল হলে , এই ঔষধ রোগীকে সেবন করতে দিবে । মেহাদি দোষজনিত চিত্তের বিকৃতি ঘটলে , এটি সেবনে বিশেষ উপকার হয় । | অপরাহ্নে সেব্য । অনুপান – হরীতকী , আমলা ও বহেড়া – ভিজানো জল এবং মধু ২ ফোঁটা । |
| চতুর্মূখরস – | বাতিক উন্মাদরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় যথোক্ত লক্ষণ প্রকাশ পেলে অথবা সান্নিপাতিক উন্মাদরোগের পুরাতন অবস্থায় বায়ুর আধিক্য থাকলে | ঔষধ- হরীতকী , আমলা ও বহেড়া – ভিজানোসহ মধুসহ বৈকালে রোগকে সেবন করতে দিবে । |
| যোগেন্দ্ররস- | প্রমেহ বা ধাতুক্ষয় প্রভৃতি দোযে বায়ুর প্রকোপবশতঃ উন্মাদরোগ উৎপন্ন হলে এবং বায়ুর অত্যন্ত রুক্ষতা প্রকাশ পেলে , | এই ঔষধ রোগীকে হরীতকী , আমলাও বহেড়া - ভিজান জল এবং মধু অথবা গব্যদুগ্ধসহ সেবন করতে দিবে । |
| উন্মাদভঞ্জন রস- | সর্ব্বপ্রকার উন্মাদ , কাশ্য ও সুদারণ পৈত্তিক কারন বশত উতপত্তি হলে । | ত্রিকটু , ত্রিফলা , গজপিপ্পলী , বিড়ঙ্গ , দেবদারু , চিরতা , কট্রী , কন্টকারী , যষ্টিমধু , ইন্দ্রযব , চিতামূল , বেড়েলমূল , পিপুলমূল , বেণামূল , শজিনাবীজ , তেউড়ীমূল , রাখাল শশার মূল , বঙ্গ , রৌপ্য , অভ্র ও প্রবাল প্রত্যেক সমভাগ , সকলের সমান লৌহচুর্ণ দিয়া জলে মর্দন করত ২ রতি পরিমিত বটী করে |

[102] নাগ , কবিরাজ ব্রজেন্দ্র নাথ ( সম্পাদিত ) আয়ুর্বেদ প্রদীপ, নবপত্র প্রকাশন,১৯৮০ কলিকাতা পৃষ্ঠা ৭৩

| | | |
|---|---|---|
| উন্মাদগজাঙ্কুশ রস | ঐ | জল পিপুলের রসে এবং কুঁচিলার সাথে তিন দিবস ভাব না দিয়া উর্ধ্বপাতন করিবে । পরে তাহা সমভাগ গন্ধকের সাথে মিশ্রন করে উপযুক্ত পরিমাণ তাম্রপত্র চক্রিকায় স্থাপনপূর্ব্বক পুট দিবে। |
| ভূতাঙ্কুশ রস - | সন্নিপাতিক উন্মাদ রোগীর ক্ষেত্রে এই রস খুব ইহা উপকারী। | মনছাল , গন্ধক , হরিতাল , কুঁতে , রসান , সমুদ্রফেন , শিলাজিৎ পাথর ও পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১ ভাগ নিয়ে ভৃঙ্গ রাজ , চিতামূলের ক্বাথ ও মনসা আঠায় মনপূর্ব্বক পিণ্ডাকার করে দিনান্তে পাক করিবে । আদার রস সহ ২ রতি মাত্রায় এই ঔষধ সেবনান্তে দশমূলের সাথে পিপুল - চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করতে দিবে এবং তিতলাউ - এর স্বেদ প্রদান করিবে । তীক্ষ ও রূক্ষ দ্রব্য বর্জনীয় । মাহিষ ঘৃত দুগ্ধ ও গুরুপাক অন্ন ভোজন এবং গাত্রে সর্ষ তৈল মর্দন করে । |
| চতুর্ভূর্জরস- | শ্লৈষ্মিক উন্মাদের প্রথমাবস্থায় রোগীর অল্প বাক্যোচ্চারণ , নির্জনপ্রিয়তা এবং বাতিক উন্মাদে সময় সময় নৃত্য , গীত , হাস্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পেলে , এই ঔষধ প্রযোজ্য । পৈত্তিক অথবা সান্নিপাতিক উন্মাদের যে কোন লক্ষণ প্রকাশ পেলে , ইহা প্রয়োগ করা যায় । এই ঔষধ উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় অতি উপকারী , কিন্তু মধ্যাবস্থায় তা উপকারী নয় । | । অনুপান – কচি তালের শাখার রস ২ তোল ও মধু দুই- তিন ফোটা । রসসিন্দুর ২ ভাগ , মনঃশিলা , মৃগনাভি , হরিতাল প্রত্যেক ১ ভাগ , সমস্ত দ্রব্য একদিন সুকুমার রসে মিশ্রন করে একটি গোলক প্রস্তুত করিবে । ঐ গোলক ভেরেণ্ডাপত্র দ্বারা বেষ্টন করে ৩ দিন ধন্যরাশির মধ্যে রাখবে । অতঃপর ( ২ রতি ) বটী প্রস্তুত করিবে |

# উন্মাদ রোগের ঔষধ - তৈল জাতীয় ঔষধ[103]

| ঔষধের নাম | রোগের লক্ষন ও ঔষধ প্রয়োগ | ঔষধ প্রনালী – ভেষজ উপাদান |
|---|---|---|
| বৃহৎ দশমূলতৈল – | শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগের পুরাতন অবস্থায় বায়ুর অনুবন্ধ থাকলে ও তজ্জন্য রাত্রিতে নিদ্রাহীনতা বা সময় সময় হাস্য , গীতাদি লক্ষণ প্রকাশ পেলে , রোগীকে বটিকা , নস্য প্রভৃতি ব্যবহার করে শ্লেষ্মর কিঞ্চিৎ শমতা হলে , এই তৈল তাহার মাথায় মালিশ করতে দিবে । বাতিক বা সান্নিপাতিক উন্মাদরোগেও শ্লেষ্মর অনুবন্ধ থাকলে এই তৈল রোগীর মস্তকে মালিশের ব্যবস্থা করা যায় । | কটুতৈল ৪ সের । যথা নিয়মে মুচ্ছপাক করে জাথ্যদ্রব্য – বেলছাল , শোণাছাল , এখারীহল , পারুলছাল , গণিয়ারী , শালপাণী, চাকুলে , বৃহতী ও কন্টকারী , ইহাদের প্রত্যেক ৪০ তোলা , তেল ৬ সের, শেষ ৮ সের।তালের রস ৪ সের।নিসিন্দাপাতার রস ৪ সের। |
| মধ্যমবিষ্ণু তৈল – | বাতিক বা পৈত্তিক উন্মাদরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় রোগীর নিদ্রাহীনতা , নৃত্য, গীত , হাস্য ও শীতলদ্রব্য পানেচ্ছা প্রভৃতি বিবিধ উপসর্গ কথঞ্চিৎ হ্রাস হলে , এই তৈল রোগীর মস্তকে প্রতিদিন ৪ ঘন্টা যথারীতি মর্দন করতে দেওয়া , অথবা তৈল দ্বারা মস্তক সর্ব্বদা সিক্ত করে রাখবে । তৈল মর্দনান্তে রোগীকে মধ্যাহ্নে স্নান করান একান্ত কর্ত্তব্য । | কদ্রব্য – পিপুলমুল , কচিতমূল , জীরা , কৃষ্ণজীরা , শ্বেতসর্ষপ , সৈন্ধব , যবক্ষার , তেউড়ী , হরিদ্রা ও দারুরিদ্রা , ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা ,ওঠ এবং পিপু, ইহাদের প্রত্যেক ৪ তোলা । পাকার্থ –জল ৮ সের। যথানিয়মে তৈলপাক করে ছেকে নিতে হয়। |
| মধ্যমনারায়ণ তৈল – | বাতিক বা পৈত্তিক উন্মাদরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় নানা প্রকার উপসর্গ পুর্ব্বাপেক্ষা কিয়দংশে হ্রাস হলে অর্থাৎ রোগী পূর্ব্বাপেক্ষা কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হলে , এই তৈল প্রত্যহ ৩/৪ বার রোগীর মস্তকে মর্দন করতে দিবে । | রোগীর মস্তিষ্ক উষ্ণবোধ হলে , এই তৈল দ্বারা মস্তক সর্ব্বদা সিক্ত করে রাখবে । সান্নিপাতিক উন্মাদে বায়ু বা পিত্তের প্রাবল্য থাকলে , ইহা প্রয়োগে সমধিক ফললাভ হয়ে থাকে। |
| ত্রিশতীপ্রসারণী তৈল- | বাতিক , পৈত্তিক ও সান্নিপাতিক উন্মাদরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় এই তৈল প্রয়োগ করা কর্তব্য । শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগের অতি পুরাতন অবস্থায় এই তৈল প্রয়োগ করলে অত্যন্ত উপকারী । | রোগীর মনে স্থিরতা আনাই একমাত্র চিকিৎসা । রোগীকে প্রতিদিন উষ্ণ দুধ পান করাবে ; যাতে কোষ্ঠ পরিস্কার থাকে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখবে — পরিস্কার না থাকলে এরন্ডতেলের জোলাপ বা পিচকারি দেবে প্রতিদিন । ত্রিফলা ( হরীতকী , বহেড়া , আমলকী ) ভিজানো জল খাওয়াবে । শতমূলীর রস পান করাবে । পুরানো ঘি উন্মাদ রোগের খুব উপকারী । |
| শিবাতৈল - | যখন উন্মাদ রোগীর চিকিৎসা খুবই কঠিন হয়ে যায় অর্থাৎ রোগীকে আয়ত্ত করা যায় না , রোগী ইচ্ছেমতো চলে , বিধিনিষেধ মানে না । আপন খেয়ালে সে নানা উৎপাত করে , হয়তো বা ঔষধ খেতে চায় না। তাই সেবার উপরেই নির্ভর করে এই রোগের চিকিৎসা । যেভাবে কথা বললে | শিবাতৈল তৈরির উপাদান প্রথমে তিলতৈল ৪ সের নিয়ে যথা নিয়মে মূচ্ছাপাক করবে । তারপর পোট্টলীবদ্ধ বেলছাল , শোণাছাল , গাম্ভারীছাল , পারুলছাল , গণিয়ারীছাল , শালপাণী , চাকুলে , বৃহতী ও কন্টকারী, এদের প্রত্যেক ৬ ছটাক , জল ৬৪ সের , দুগ্ধ ১৬ সের । |

[103] নাগ , কবিরাজ ব্রজেন্দ্র নাথ ( সম্পাদিত ) আয়ুর্বেদ প্রদীপ, নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮০ কলিকাতা পৃষ্ঠা ৭৪,

| | | |
|---|---|---|
| | , আশ্বাস দিলে বা কাজ করলে রোগীর মন অধিকক্ষণ এক বিষয়ে নিবিষ্ট রাখা যায় সেই ব্যবস্থা করতে হয় । যাতে সে নিয়মের মধ্যে থাকে , নিয়মিত ঔষধ খায় — যিনি সেবা করবেন তাকে তাই করতে হবে । অবস্থা বুঝে কখনও প্রিয় কথা বলতে হবে , এখনও ভয় দেখাতে হবে , কখনও তিরস্কার করতে হবে । উন্মাদরোগীর শুশ্রুষায় বুদ্ধিমান , ধীর ও নিপূণ লোকের প্রয়োজন। | পিপ্পলীমূল , যষ্টিমধু , সৈন্ধব , বেড়েলা , শুলফা , দেবদারু , রামা , গজপিপ্পলী , মুখা , শটী , লাক্ষা , গন্ধভাদুলে ও রক্তচন্দন , এদের প্রত্যেক ২ তোলা । যথানিয়মে তৈলপাক করে হেঁকে নেওয়া হয়। |

# উন্মাদ রোগের ঔষধ - ঘি জাতীয় ঔষধ[104]

| ঔষধের নাম | রোগের লক্ষন ও ঔষধ প্রয়োগ | ঔষধ প্রনালী – ভেষজ উপাদান |
|---|---|---|
| রসোনাদ্য ঘি – | শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগের পুরাতন অবস্থায় ও বায়ুর প্রকোপ এবং বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পেলে অথবা বাতিক উন্মাদরোগরে পুরাতন অবস্থায় শ্লেষ্মনুবন্ধ থাকলে , এই ঘি রোগীকে প্রত্যহ সেবন করতে দিবে । অনুপান — উষ্ণদুগ্ধ । | বৎসরাতীত গব্যঘৃত ৪ সের যথানিয়মে মূচ্ছাপাক করিবে । ক্কাথ্যদ্রব্য – খেসাবিহীন রসুন সোয়া ছয় সের এবং বিশ্বছাল , শোণাছাল , গাম্ভারীছাল , পারুলছাল , গণিয়ারী , শালপাণী , চাকুলে , বৃহতী , ও কন্টকারী , ইহাদের প্রত্যেক ২০ তোলা , ' জল ৩২ সের , শেষ ৮ সের । রসুনের রস ৪ সের । বদূরীক্কাথ ৪ সের । মুলার রস ২ সের । মহাপরি রস ২ সেঃ । সুরা ২ সের , দবির মতি ২ সের ও কাজি ২ সের।কদ্রব্য – হরীতক , আমলা , বহেড়া , দেবদারু , সৈন্ধব , ওঠ , পিপুল , মরিচ , বনমানী , যমানী , চৈ , হিং ও অম্লবেতস , ইহাদের প্রত্যেক ৪ তলো ; যথানিয়মে ঘৃতপাক করে ছেকে নেবে। মাত্রা অর্জতোলা হতে এক তোলা । |
| চৈতস ঘি – | বাতিক , পৈত্তিক অথবা সান্নিপাতিক উন্মাদরোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীকে এই ঘি সেবন করানো হয় । যে সমস্ত মানসিক বিকার হতে উন্মাদরোগ জন্মে , সেই সমস্ত মানসিক বিকারের জন্য এই ঘি অতি উপকারী । এটি অপরাহ্নে সেবন করানো হয় । অনুপান — উষ্ণ দুগ্ধ । | দশ বৎসরের পুরাতন গব্যঘৃত ৪ সের । যথানিয়মে মূর্হপাক করিবে । ক্কাথ্যদ্রব্য – বেলছাল , শ্রেণাছাল , পারুলছাল , গণিয়ারী , শালপাণী , চাকুলে , বৃহতী , কন্টকারী , গোক্ষুর রা , এরমূল , তেউড়ীমুল , বেড়েলা , দুর্ব্বমূল , ইহাদের প্রত্যেক ১৬ তোলা । জল ৬৪ সের , শেষ ১৬ সের । কদ্রব্য - রাখালশশার মূল , হরীতকী , আমলা , বহেড়া , রেণুকা , দেবদারু , এলবালুক , শালপাণী , টগরপাদুকা , হরিদ্রা , দারুহরিদ্রা , শ্যামালতা , অনন্তমূল , প্রিয় , নীলসুন্দি , ছোটএলাচ , মঞ্জিষ্ঠা , দন্তীমূল , দাড়িমবীজ , নাগেশ্বর , তালীশশত্র , বৃহতী , মালতীপুষ্প , বিড়ঙ্গ , চাকুলে , কুড় , রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ , ইহাদের প্রত্যেক ২ তোলা , পাকার্থ জল ১৬ সের । যথানিয়মে ঘৃতপাক করে ঘাকিয়া লইবে । মাত্র– অর্ধ তোলা হতে এক তোলা। |
| মহাচৈতস ঘি – | বাতিক, পৈত্তিক অথবা সান্নিপাতিক উন্মাদরোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর চিত্তের বিকৃতিবশতঃ সময় সময় অস্বভাবের বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ কোন সময় ক্রোধ , কোন সময় বা নৃত্য , গীত , হাস্য অথবা কোন সময় স্থিরচিত্ততা ইত্যাদি উপসর্গ হলে , এই ঘৃত রোগীকে সেবন করা আবশ্যিক । বিবিধকারণে চিত্তবিকৃতি এবং বায়ু ও পিত্ত প্রবল হলে , রোগীকে এই ঘৃত সেবন করান কর্তব্য ; | পুরাতন গব্যঘৃত ৮ সের । যথানিয়মে মূচ্ছাপাক করার পর বিষছাল , শোণাছাল , গান্তরীছাল , পারুলছাল , গণিয়ারী , শালপাণী , চাকুলে , বৃহতা , কন্টকারী , গোক্ষুর , রামা , ভেরেণ্ডামূল , তেউড়ীমুল , বেড়েলা , মূর্ব্বা ও শতমূলী , ইহাদের প্রত্যেক ৩২ তোলা , জল ১২৮ সের , শেষ ৩২ সের । কদ্রব্য — রাখালশশা , হরীতকী , আমলা , বহেড়া , রেণুকা , দেবদারু , এলবালুকা , শালপাণী , অনন্তমূল , হরিদ্রা দারুহরিদ্রা , প্রিয়ঙ্গু , অনন্তমূল , শ্যামলতা , নীলসুন্দি , এলাচ , মঞ্জিষ্ঠা , দন্তীমূল , দাড়িমের খোসা , নাগেশ্বর , বিড়ঙ্গ , কুড় , রক্তচন্দন , পদ্মকাষ্ঠ , |

[104] কবিরাজ শ্রী অমৃতলাল গুপ্ত , আয়ুর্বেদ শিক্ষা , তৃতীয় খণ্ড , দিপায়ন প্রকাশনী । কোলকাতা ১৯৮০ , পৃষ্ঠা ১১৪

| | | |
|---|---|---|
| | | তালীশপত্র , বৃহতী ও মালতীমুল , এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক দুই তোলা নিয়ে যথানিয়মে আগুনে জ্বালিয়ে ঘি পাক করা হয়। |
| মহাকল্যাণ ঘি – | মহাকল্যাণ ঘি – বাতিক , পৈত্তিক বা সান্নিপাতিক উন্মাদরোগের পুরাতন অবস্থায় বায়ু ও পিত্ত প্রবল হলে এবং উন্মাদরোগীর শরীর ক্রমশঃ কৃশ অবস্থা দেখা দিলে, এই ঘৃত অপরাহ্নে সেবন করতে দেওয়া হয় । বিবিধ রোগ হতে মানসিক বিকৃতিবশতঃ বায়ুপিত্ত প্রবল উন্মাদরোগ উৎপন্ন হলে , এই ঘৃত প্রয়োগে অত্যন্ত উপকার হয় । ইহা কৃশ ও দুর্ব্বল উন্মাদরোগীর পক্ষে পুষ্টিও বলবর্ধক । | গব্যঘৃত ৪ সের যথানিয়মে মূচ্ছাপাক করে ক্কাথদ্রব্য – শালপাণী , টগরপাদুকা , হরিদ্রা , দারুহরিদ্রা , শ্যামালতা , অনন্তমূল , প্রিয়ঙ্গু , নীলসুন্দি , এলাচ , মঞ্জিষ্ঠা , দন্তীমূল , দাড়িমবীজ , নাগেশ্বর , তালীশপত্র , বৃহতী , নূতন মালতীফুল , বিড়ঙ্গ , চাকুলে , কুড় , রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ , এই একুশটি দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ সের , জল ১৬ সের , শেষ ৪ সের । একবার প্রসুতা গাভীর দুগ্ধ ১৬ সের । কল্কদ্রব্য চাকুলে , মাষাণী , মুগাণী , কাকোলী , শূকশিম্বী , ঋষভক , ঋদ্ধি ও মেদ , এদের প্রত্যেক ৮ তোলা । যথানিয়মে আগুনে পাক করে ঘি করে ছেকে নেবে । মাত্রা অর্ধ তোলা রোগী কে প্রতিদিন সেবন করাতে হবে সঙ্গে উষ্ণদুগ্ধ । |
| মহাপৈশাচিক ঘি – | অল্প বয়সের রোগীদের ক্ষেত্রে অধিক মানসিক পরিশ্রম বশতঃ ক্রমশঃ মানসিক বিকার এবং সংসর্গ দোষে বা পিতামাতার কঠোর শাসনে চিত্তের অধীরতা বশতঃ মনের বিকুতিভাব থেকে উন্মাদ প্রকাশ পেলে , এই ঔষধ সেবন করানো হয়। এটি উত্তম ফলাদায়ক এবং স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধির উৎকর্ষতা জনক । | এই ঔষধ তৈরির জন্য গব্যঘৃত ৪ সের , যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করে তার সাথে জটামাংসী , হরীতকী , কুষ্মারুলতা , আলকুশীবীজ , বলাড়ুমুর , জয়ন্তী , ক্ষীরকাকোলী, ব্রাহ্মী , চামার আলু , মোরী , শুলফা , গুগুলু , শতমূলী , রান্না , গন্ধরামা , গন্ধভাদুলে , বিছুটি ও শালপাণী ,এগুলি সমান ভাবে মিলিত করে ১৬ সের জল মিশ্রন করা হয় । যথা নিয়মে ঘৃতপাক করে সেবন করানো হয়। সঙ্গে অনুপান – উষ্ণদুগ্ধ। |

## উন্মাদ রোগের ঔষধ - নস্য জাতীয় ঔষধ [105]

| ঔষধের নাম | রোগের লক্ষন ও ঔষধ প্রয়োগ | ঔষধ প্রনালী – ভেষজ উপাদান |
|---|---|---|
| শিরীষাদ্য নস্য — | শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগে রোগীর স্তম্ভিতভাব , নির্জনপ্রিয়তা অথবা সান্নিপাতিক উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় রোগীর কখনও হাস্য , গীত বা নৃত্য , কখনও স্তম্ভিতবাব , কখনও বা রোদন প্রভৃতি রকমভাবে লক্ষণ প্রকাশ পেলে , এই নস্য জলসহ গুলিয়া রোগীর নাসারন্ধ্রে প্রয়োগ করিবে । ইহা রোগের প্রবলতা অনুসারে ৫/৭ দিন অন্তর প্রাতে প্রযোজ্য । | শিরীষপুষ্প , রসানে , শুঠ , শ্বেতসর্ষপ , বচ , মঞ্জিষ্ঠা , হরিদ্রা ও পিপুল , এই সকল দ্রব্যেগুলি একত্র করে সমভাবে চূর্ণ করবে । |
| উন্মাদভঞ্জন নস্য- | শ্লৈষ্মিক উন্মাদে রোগীর বিমর্ষভাব , নির্জনে উপবেশন ও স্তম্ভিতভাব প্রভৃতি লক্ষিত হলে এবং সান্নিপাতিক উন্মাদরোগে বিভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পেলে , এই বটী কাজির জলসহ মিশ্রন করে রোগীর নাসিকা মেধ্যে এমনভাবে প্রদান করবে , যেন উহা নিঃশ্বাসপথে গৃহীত হয় । এই নস্য উন্মাদরোগে অতি উপকারী । এটা রোগের প্রবলাবস্থায় ৭ দিন বা ১০ দিন বা ১৫ দিন অন্তর প্রাতে প্রয়োগ করবে । | উন্মাদভন নস্য তৈরির জন্য রসসিন্দুর , হিজলবীজ , শুঠ , পিপুল , মরিচ ও কপূর , এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ১ তোলা এবং বিঙ্গাবীজ ও তিক্ত ধুধুলবীজ প্রত্যেক ১ তোলা , এই সকল দ্রব্য একত্র করে চূর্ণ করা হয়। |
| সারস্বতচূর্ণ — | বাতিক , পৈত্তিক , শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক উন্মাদ রোগে স্মৃতিশক্তিলোপ ও চিত্তের বিকলতা লক্ষিত হলে , এই ঔষধ ঘৃত ও মধুসহ রোগীকে সেবন করতে দেবে । যে কারণেই হোক স্মৃতিলোপ বা চিত্তবিকার ঘটলে , এটা অতি উপকারী । এই ঔষধ স্মৃতিশক্তিবর্ধক । | সারস্বতচূর্ণ তৈরির উওয়াদান গুলি হল কুড় , অশ্বগন্ধা , সৈন্ধবলবণ , যমানী , জীরা , কৃষ্ণজীরা , শুঠ , পিপুল , মরিচ , আকনাদি ও শঙ্খপুষ্পী , এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্বচূর্ণ সমান বচচূর্ণ , সমস্ত একত্র মিশ্রিত করে ব্রাহ্মীশাকের রস দ্বারা ৩ বার ভাব দিয়ে রৌদ্রে শুরু করতঃ চূর্ণ করবে । মাত্রা ২ আনা বা ৩ আনা । |

---

105 কবিরাজ শ্রী অমৃতলাল গুপ্ত , আয়ুর্বেদ শিক্ষা , তৃতীয় খণ্ড , দিপায়ন প্রকাশনী । কোলকাতা ১৯৮০ , পৃষ্ঠা ১২৪

| | | |
|---|---|---|
| কল্যাণচূর্ণ— | শ্লৈষ্মিক উন্মাদ বা বাতিক উন্মাদ রোগের প্রথমাবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পেলে , এই চূর্ণ উষ্ণজলসহ রোগীকে সেবন করতে দেবে । | কল্যাণচূর্ণ তৈরির জন্য পিপুল , চই , রক্তচিতা , শুঠ , মরিচ , হরীতকী , আমলা , বহেড়া , বিটলবণ , সৈন্ধবলবণ , বিড়ঙ্গ , পুতিকর , যমানী , ধনে ও জীরা , ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ ভাগ এং পিপুলচূর্ণ ২ ভাগ , সমস্ত একত্র মিশ্রন তৈরি করা হয় । মাত্রা —হাফ তোলা । |
| মনঃশিলাদ্যঞ্জন – | শ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিক উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় রোগীর নেত্রে এই অঞ্জন প্রয়োগ করবে । | মনঃশিলা , রসাঞ্জন এই তিনটি দ্রব্য একত্র করে উহা দ্বারা রোগীর সেবন করানো হয় । |
| কৃষ্ণাদ্যঞ্জন – | শ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিক উন্মাদ রোগের প্রথমাবস্থায় রোগীর স্তম্ভিতভাব ও নির্জনপ্রিয়তা এবং সান্নিপাতিক উন্মাদে সময় সময় নৃত্য , গীত বা অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পেলে | পিপুল , মরিচ , সৈন্ধবলবণ ও গোরোচনা , এই সকল দ্রব্য সমভাগে নিয়ে মধুর সাথে মিশ্রিত করে রোগী কে সেবন করানো হয়। |

**ত্রিগুন তৈল -** বাতিক , পৈত্তিক বা সান্নিপাতিক গ্রস্ত উন্মাদরোগের ক্ষেত্রে ত্রিগুন তৈল মহা উপকারী , এই তৈল রোগীর মস্তকে মালিশ করতে হয় । আবার শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগে পুরাতন অবস্থায়ও এই তৈল প্রয়োগ করা যেতে পারে । এই তৈলর সঙ্গে অনুপান ব্রাহ্মীশাকের রস চারতলা , ও মধু যোগ উন্মাদরোগে হিতকর। চতুর্মুখ , চিন্তামণিরস , যোগেন্দ্ররস , মকরধ্বজ ( অভাবে রসবিন্দুর ) মিশ্রন করে শতমূলীর রস , তুলসী পাতার রস একত্র করে তৈল উৎপাদন করা হয়। সঙ্গে অনুপান- মধু ও ত্রিফলার জল ।

## উন্মাদ রোগ চিকিৎসার অন্যান্য ঔষধ সমুহ[১০৬]

**স্বল্পলক্ষীবিলাস -** শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় রোগীর স্তম্ভিতভাব লক্ষণ প্রকাশ পেলে , এই ঔষধ তাহাকে সেবন করতে দেওয়া হয়। সান্নিপাতিক উন্মাদরোগেও শ্লেষ্মর আধিক্য থাকলে ,এটি প্রয়োগ করা যেতে পারে । অনুপান নিসিন্দাপাতার রস ও মধু ।

**মহালক্ষীবিলাস -** শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পেলে , এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাতে হয় । সান্নিপাতিক উন্মাদরোগেও বাতশে-য়ার প্রবলতা থাকলে , এটি প্রয়োগ করা যেতে পারে। অনুপান - নিসিন্দাপাতার রস ও মধু ।

**ত্রৈলোক্যচিন্তামণি -** বাতিক উন্মাদরোগে শ্লেষ্মর অনুবন্ধ থাকলে বা সান্নিপাতিক উন্মাদরোগে বায়ুর আধিক্য থাকলে , প্রথম বা মধ্যাবস্থায় , এই ঔষধ রোগীকে সেবন করানো হয় । বাতিক

[106] কালী কিঙ্কর সেনশর্মা এবং সত্য শেখর ( সম্পাদিত ) আয়ুর্বেদ শিক্ষা , কোলকাতা ১৯৮০ , পৃষ্ঠা ১১৮

উন্মাদরোগে বায়ুর রূক্ষতা না থাকলে , পুরাতন অবস্থায়ও এই ঔষধ সেবন করান যেতে পারে । অনুপানু তালের শাখার রস ও মধু , পুরাতন উন্মাদে হরীতকী , আমলা ও বহেড়া ভিজানো জল ও মধু ; প্রমেহাদি রোগ বিদ্যমান থাকলে গো - দুগ্ধ ।

## উন্মাদ রোগের দেশীয় ঔষধ

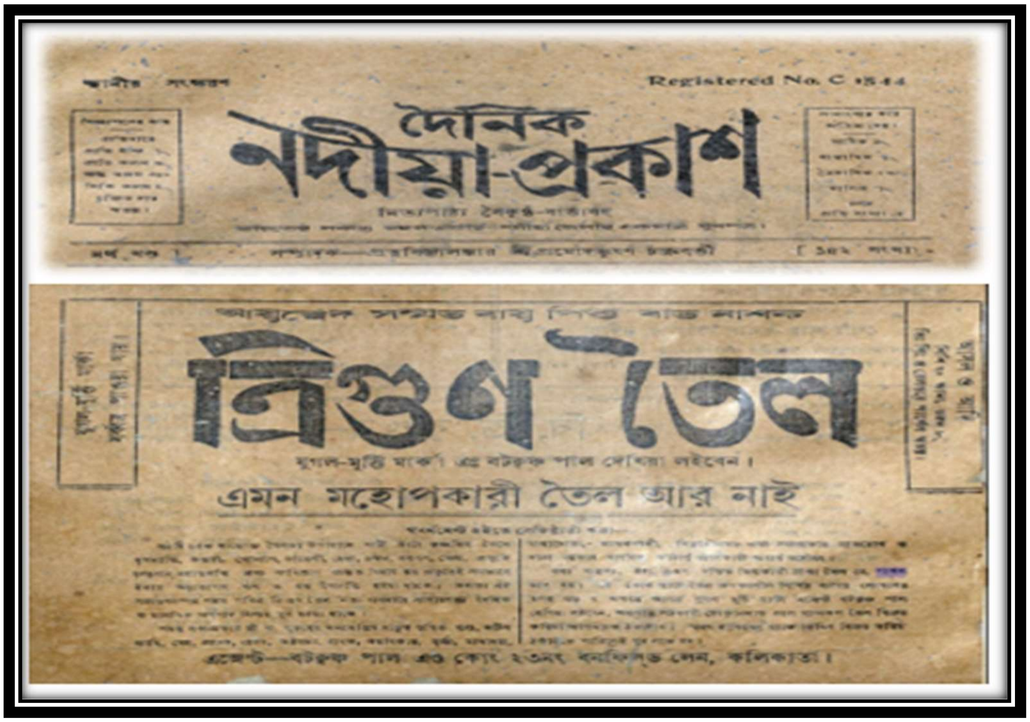


দৈনিক নদিয়া প্রকাশ পত্রিকায় প্রকাশিত পাগল সম্পর্কিত বিজ্ঞাপন- ত্রিগুন তৈল মহর্ষি চরক শাস্ত্রোক্ত ভৈষজ্য উপাদানে তৈরি এই তেল "………. *বলা বাহুল্য , ইহা এরূপ মস্তিস্ক স্নিগ্ধকারী ঠান্ডা তৈল যে , পাগল ভালো হয়"* [107]

**বৃহৎবাতচিন্তামণি** - বাতিক বা পৈত্তিক উন্মাদরোগের পুরাতন অবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পেলে এবং শারীরিক রুক্ষতা ও পিত্তের প্রবলতা বিদ্যমান থাকলে , এই ঔষধ রোগীকে অপরাহ্নে হরীতকী , আমলা এবং বহেড়া - ভিজান জল ও মধুসহ সেবন করতে দেওয়া হয় ।

---

[107] দৈনিক নদিয়া প্রকাশ, সম্পাদক- প্রত্ন বিদ্যালঙ্কার শ্রী প্রমোদ ভূষণ চক্রবর্তী , আগস্ট ১৯২১ নদিয়া, মায়াপুর , চতুর্থ খণ্ড ,১৫২ সংখ্যা, পাগল সম্পর্কিত প্রকাশিত বিজ্ঞাপন- ত্রিগুন তৈল

**ত্র্র্যষণাদ্যবতি-** উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় বা শ্লৈষ্মিক উন্মাদে রোগীর স্তুতিভাব , দেহের জড়তা , নির্জনপ্রিয়তা এবং সান্নিপাতিক উন্মাদরোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পেলে , - ওঠ , পিপুল , মরিচ , হিং , সৈন্ধব , বচ , কটৰী , শিরীষবীজ , ডহলকরঞ্জবীজ ও শ্বেতসর্ষ , এই সকল দ্রব্য পেষণ করে বটি প্রস্তুত করে রোগী কে খাওয়ানো হয় ।

**উন্মাদকেশরী -** শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় রোগীর নির্জনপ্রিয়তা ইত্যাদি প্রকাশ পেলে অথবা বাতিক উন্মাদরোগে শ্লেষ্মর অনুবন্ধ থাকলে , এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে ঘি সহ সেবন করতে দেবে। উন্মাদগজকেশরী প্রস্তুতের জন্য গন্ধক , মনঃশিলা ও শশাধিত ধুতুরাবীজ , এ সকল দ্রব্য সমভাগে নিয়ে পেষণ করে তৈরি করা হয় ।

**উন্মাদভঞ্জিনী -** বাতিক ও পৈত্তিক উন্মাদ রোগের জন্য এটি প্রয়োগ করা হয় । শোধিত মনছাল চূর্ণ , সৈন্ধবলবণ , কটকী , শিরীষবীজ , হিং , শ্বেতসর্ষ , ডহর করঙ বীজ , ত্রিকটু , এগুলি সমভাগে নিয়ে পেষণ করে বটীকা তৈরি করা হয় । প্রাতঃ - সন্ধ্যায় মধুরাদিরসের সাথে এবং রাত্রিকালে জলের সাথে এক এক বটিকার অঞ্জন দিলে চাতুর্থক জ্বর , অপস্মার ও উন্মাদরোগ নিবারণ হয় ।

**পাগলের মহৌষধ-** উন্মাদ রোগের জন্য এই ঔষধ টি খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। মুলত কয়েকটি সম জাতীয় উন্মদ রোগের ঔষধের সংমিশ্রনে কবিরাজ উমেশচন্দ্র রায় এই পাগলের মহাঔষধ টি তৈরি করেন। মহা চৈতস[108], মহাতৈস [109] , পানীয় কল্যাণ ঘৃত উন্মাদরোগের পরম ঔষধ । এই তিনটি একত্র করে রোগী কে সেবন করানো হয় , মাত্রা আধ তোলা থেকে[110] দু-তোলা পর্যন্ত । অনুপাণ উষ্ণ দুধ ও চিনি ।

---

[108] দশ বৎসরের পুরাতন গব্যঘৃত ৪ সের । যথানিয়মে মূর্হপাক করিবে । এরমূল , তেউড়ীমুল , বেড়েলা , দুর্ব্বমূল , ইহাদের প্রত্যেক ১৬ তোলা । জল ৬৪ সের , শেষ ১৬ সের । কদ্রব্য - রাখালশশার মূল , হরীতকী , আমলা , বহেড়া , রেণুকা , দেবদারু , এলবালুক , শালপাণী , টগরপাদুকা , হরিদ্রা , দারুহরিদ্রা , শ্যামালতা , অনন্তমূল , প্রিয় , নীলসুন্দি , ছোটএলাচ , মঞ্জিষ্ঠা , রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ , ইহাদের প্রত্যেক ২ তোলা , পাকার্থ জল ১৬ সের । যথানিয়মে ঘৃতপাক করে ঘাকিয়া লইবে । মাত্র– অর্ধ তোলা হতে এক তোলা।

[109] পুরাতন গব্যঘৃত ৮ সের । যথানিয়মে মূচ্ছাপাক করার পর বিষছাল, ভেরেণ্ডামূল , তেউড়ীমুল , বেড়েলা , মূর্ব্বা ও শতমূলী , ইহাদের প্রত্যেক ৩২ তোলা , জল ১২৮ সের , শেষ ৩২ সের । কদ্রব্য — রাখালশশা , হরীতকী , আমলা , বহেড়া , রেণুকা , দেবদারু , এলবালুকা , শালপাণী , অনন্তমূল , হরিদ্রা দারুহরিদ্রা , প্রিয়ঙ্গু , অনন্তমূল , শ্যামলতা , নীলসুন্দি , এলাচ , মঞ্জিষ্ঠা , দন্তীমূল , দাড়িমের খোসা , নাগেশ্বর , বিড়ঙ্গ , কুড় , রক্তচন্দন , পদ্মকাষ্ঠ , তালীশপত্র , বৃহতী ও মালতীমুল , এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক দুই তোলা নিয়ে যথানিয়মে আগুনে জ্বালিয়ে ঘি পাক করা হয়।

[110] পুরাতন গব্যঘৃত ৮ সের । যথানিয়মে মূচ্ছাপাক করার পর বিষছাল , শোণাছাল , গান্তরীছাল , পারুলছাল , গণিয়ারী , শালপাণী , চাকুলে , বৃহতা , কন্টকারী , গোক্ষুর , রামা , ভেরেণ্ডামূল , তেউড়ীমুল , বেড়েলা , মূর্ব্বা ও শতমূলী , ইহাদের প্রত্যেক ৩২ তোলা , জল ১২৮ সের , শেষ ৩২ সের । এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক দুই তোলা নিয়ে যথানিয়মে আগুনে জ্বালিয়ে ঘি পাক করা হয়।

# ডাক্তার উমেশ চন্দ্র রায়ের জগত বিখ্যাত পাগলের মহৌষধ[111]

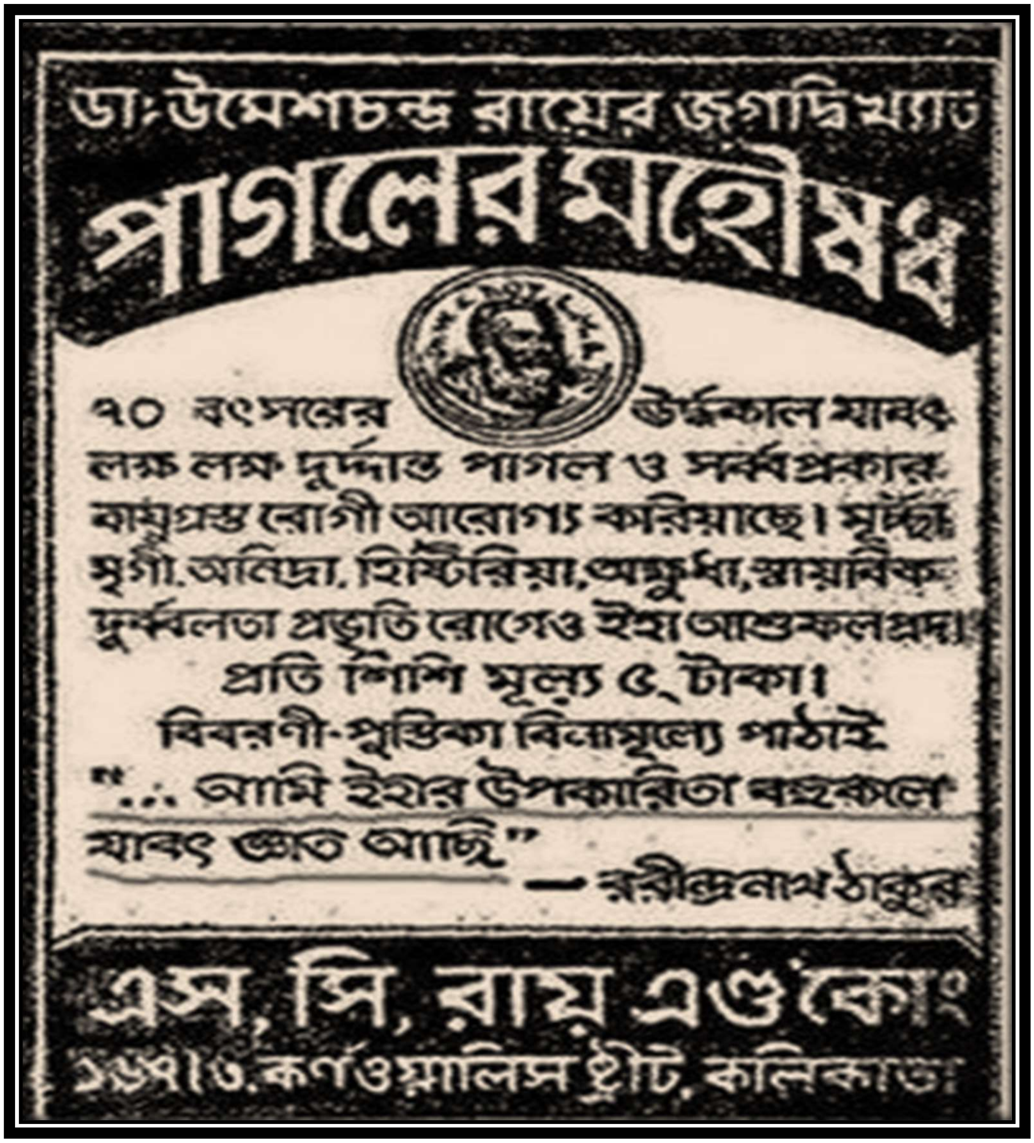


**পাগলের মহৌষধ-** *"আমি ইহার উপকারিতা বহুকাল যাবৎ জ্ঞাত আছি"রবীন্দ্রনাথ। এস সি রায় অ্যান্ড -এর বিজ্ঞাপনে। কলকাতার ১৬৭/৩ কর্নওয়ালিশ রোডে নিজস্ব ফ্যাক্টরিতে ওরা তৈরি করত পাগলের ওষুধ। সেই ওষুধের বিজ্ঞাপনেও রবীন্দ্রনাথের প্রত্যয়ন পত্রের সন্ধান মেলে। ডাক্তার উমেশচন্দ্র রায়ের জগদ্বিখ্যাত পাগলের মহৌষধ শিরোনামের সেই বিজ্ঞাপনে বলা হচ্ছেড় ৭০ বৎসরের উর্ধ্বকাল যাবৎ লক্ষ লক্ষ দুর্দ্দান্ত পাগল ও সর্ব্বপ্রকার বায়ুগ্রস্ত রোগীর আরোগ্য*

---

[111] প্রবাসী পত্রিকার বিজ্ঞাপনে, এস.সি.রায় অ্যান্ড কম্পানিতে তৈরি দেশীয় ঔষধ , কলকাতার ১৬৭/৩ কর্নওয়ালিশ রোডে নিজস্ব ফ্যাক্টরিতে প্রস্তুত পাগলের ওষুধ।

*করিয়াছে। মূর্চ্ছা, মৃগী, অনিদ্রা, হিষ্টিরিয়া, অক্ষুধা, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি রোগেও ইহা আশুফলপ্রদ ।*

## প্রবাসী পত্রিকার বিজ্ঞাপন

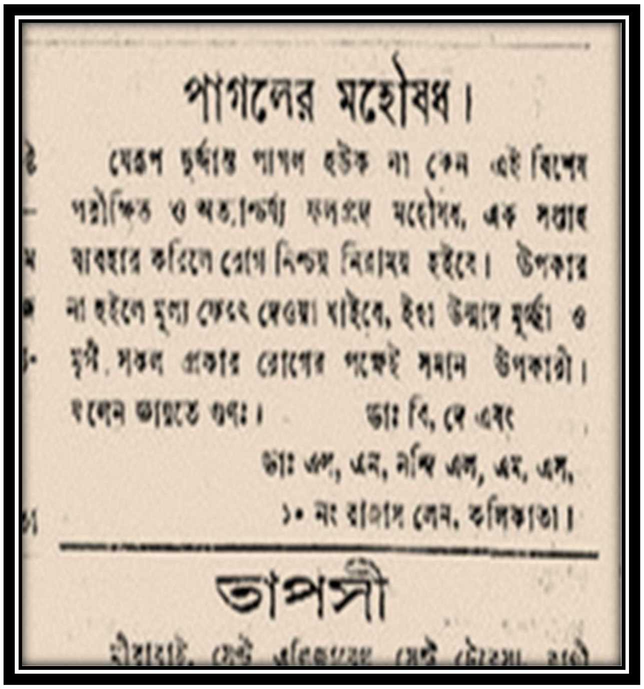
পাগলের মহৌষধ।
যেরূপ দুর্দ্দান্ত পাগল হউক না কেন এই বিশেষ পরীক্ষিত ও অত্যাশ্চর্য্য ফলপ্রদ মহৌষধ, এক সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগ নিশ্চয় নিরাময় হইবে। উপকার না হইলে মূল্য ফেরৎ দেওয়া যাইবে, ইহা উন্মাদ মূর্চ্ছা ও মৃগী সকল প্রকার রোগের পক্ষেই সমান উপকারী।
ডাঃ বি, দে এবং
ডাঃ এল, এন, নন্দি এল, এম, এস,
১০ নং রাগান লেন, কলিকাতা।
তাপসী

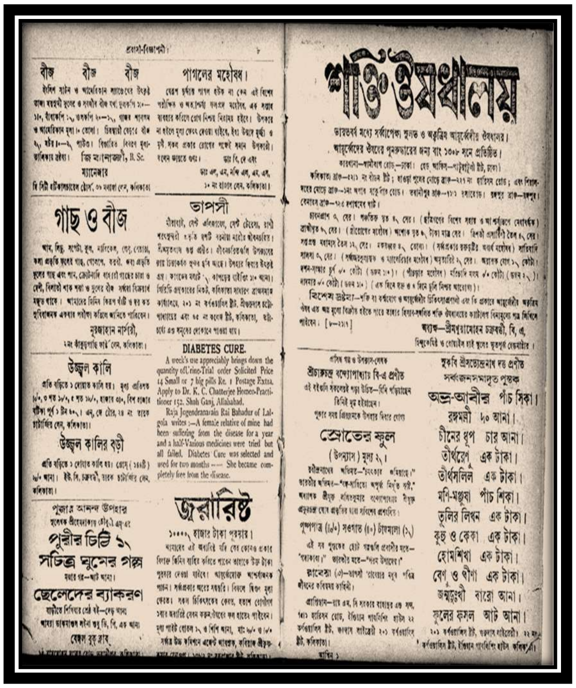


আলোচ্য অংশে এই পর্যায়ে বলা যায় বাংলা ভাষায় আমরা যাকে পাগল বলি বা মনোবিকারগ্রস্থ রোগী বলি ভারতীয় সমাজে সেই মানষিক রোগী আয়ুর্বেদের চিকিৎসার পরিভাষায় উন্মাদ ব্যক্তি বলে গন্য হতো এবং তাদের এই রোগকে বলা হতো মানস রোগ বা উন্মাদ রোগ । দেশীয় চিকৎসা ব্যবস্থায় এই আয়ুর্বেদ প্রথাই পাগল বা উন্মাদ রোগীদের দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন রকম পন্থায় চিকিৎসা করা হতো যা সুবিস্তৃত দিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি । উদ্মাদ রোগের দেশীয় চিকিৎসাবিধি প্রসঙ্গে বলা যায় যে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা ব্যবস্থায় উন্মাদের কারণ সম্পর্কে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা জৈবিক চিকিৎসা ত্বত্তের সার্বজনীন ভাবনা এছাড়াও উন্মাদের শ্রেণী বিভাগ ও লক্ষ্মণ , উন্মাদ রোগ চিকিৎসার ঔষধ সমুহ ঔষধ প্রনালী ভযজ উপাদান, লক্ষন অনুযায়ী ঔষধ প্রয়োগ ইত্যাদির প্রেক্ষিতে বলা যায় যে দেশীয় ধারার এই উন্মাদ চিকিৎসা পদ্ধতি ছিল খুবই উন্নত । অর্থাৎ আয়ুর্বেদ পদ্ধতিতে মানস রোগ যেভাবে চিকিৎসা করা হতো

তা বিশ্বের অন্যান্য সভ্যতার থেকেও অধিক উন্নত । উন্মাদ রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে দেশীয় চিকিৎসা ব্যবস্থার সঙ্গে ঔপনিবেশিক চিকিৎসার যদি তুলনামূলক আলোচনা করা হয় তাহলে নিঃসন্দেহ এটাও বলা যেতে পারে যে দেশীয় ঐতিহ্যের পাগল বা পাগলামীর চিকিৎসা ব্যবস্থা পশ্চিমের পদ্ধতি থেকে অনেকগুণ এগিয়েছিল।

## সম্মোহন চিকিৎসা ( হিপনোসিস থেরাপি )

চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানে সম্মোহন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । সম্মোহন [112] একদিকে মনোচিকিৎসার সহায়ক হিসেবে কাজ করে । অন্যদিকে এটি নিজেই অনেকাংশে একটি চিকিৎসা পদ্ধতি । সম্মোহনের ব্যবহারিক প্রয়োগ হয়ে আসছে বহুকাল আগে থেকেই । কিন্তু সম্মোহন নিয়ে পদ্ধতিগত আলোচনা ও প্রাতিষ্ঠানিক চিন্তা - ভাবনা শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে । ১৮৩০ সালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাবিদ্যার প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ করার পরে একজন যাজক - পুত্র এবং গভীরভাবে ধর্মবিশ্বাসী স্কটল্যান্ড বাসী হিসেবে ড : জেমস এসডেইলি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সার্জন হিসেবে কাজ করার জন্য কলকাতার উদ্দেশ্যে জাহাজে পাড়ি দেন । এসডেইলি সম্মোহনবিদ্যা নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চালান এবং মানসিক যন্ত্রণা ও কিছু ছোটখাটো অসুখ - বিসুখের ক্ষেত্রে যন্ত্রণা উপশমের কার্যকরী পদ্ধতি হিসেবে এর প্রয়োগ করেন ( আর্নস্ট , ১৯৯৫ ) । মানসিক রোগ চিকিৎসায় এসডেইলি তাঁর নেটিভ ' সহযোগিতা সাহায্যে ভারতীয় রোগীদের প্রভাবিত করে রাখতেন । অতি বিস্ময়করভাবে , যে সময় মানসিক যন্ত্রণা উপশম ঘটাতেন। তিনি কলকাতায় মেসমারিক হাসপাতাল ও হুগলি ইমামবাড়া হাসপাতালে সিভিল সার্জন হিসেবে নিযুক্ত থাকাকালীন সময়ে কয়েকটি মানসিক চিকিৎসা ও করেছিলেন। কিন্তু অন্যান্য চিকিৎসকরা এই পদ্ধতিকে যুক্তিবাদী চিন্তা ও আলোকপ্রাপ্ত দক্ষতার শ্রেষ্ঠ যুগে সংশয়যোগ্য এবং অযৌক্তিক ধাপ্পাবাজি চিকিৎসা বলে মনে করতেন ।

---

[112] সম্মোহন যার ইংরেজী প্রতিশব্দ hypnosis, শব্দটি গ্রীক শব্দ hypnos থেকে উদ্ভূত হয়েছে । Hypnos গ্রীক তন্দ্রা দেবতার নাম । সুতরাং সংবেশন বলতে সাধারণতঃ তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা বোঝায় । কিন্তু এখানে উল্লেখ্য যে , সম্পূর্ণ জাগ্রত ও স্বাভাবিক ব্যক্তির মধ্যেও অভিভাব্য অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে । তবে এরূপ অভিভাব্য অবস্থার মাত্রাগত তারতম্য রয়েছে । পুনঃ পুনঃ নির্দেশ দান বা অভিভাবনের মাধ্যমে ব্যক্তির সংবেশন অবস্থার গভীরতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা যায় । সংবেশন অবস্থার মাত্রা যতই বৃদ্ধি পায় , ব্যক্তি ততই বেশী তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং পরিশেষে সে সমাধিদশা ( hypnotic trance ) প্রাপ্ত হয় । সমাধিগ্রস্ত অবস্থায় ব্যক্তির বাহ্যিক চৈতন্য বিলুপ্ত হয়ে গেলেও সংবেশনকারীর সাথে তার সম্পর্ক অটুট থাকে এবং নিদ্রিত অবস্থাতেও সে সংবেশনকারীর নির্দেশ পালন করতে পারে ।

সম্মোহনের জনক বলতে আমরা ফ্রানজ এনটন মেজমার ( Franz Anton Mesmer) -কেই বুঝিয়ে থাকি। ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে ভিয়েনায় চিকিৎসা শাস্ত্রে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন । এ প্রসঙ্গে তার প্রথম প্রকাশিত পুস্তক " De Planetarum Influxu " । এতে তিনি সম্মোহনকে জৈবিক চুম্বকত্ব হিসেবে বর্ণনা করেন । অবশ্য বর্তমান কালের সম্মোহনের[113] ধারণার সাথে মেজমারের ধারণার পার্থক্য রয়েছে অনেক ।

সম্মোহন একটি মানসিক রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি । অথবা বলা যায় যে চিকিৎসা পদ্ধতির অংশ বিশেষ । যাই হোক সম্মোহন হচ্ছে চেতনার এমন একটি অবস্থা যা পারিপার্শ্বিকতা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবলমাত্র সম্মোহনকারীর প্রতি নিবিষ্ট হয় । নানা পদ্ধতিতে সার্থক সম্মোহন করা যায় ।

**ক্যালকাটা মেসমারিক হসপিটাল[114]**

উন্মাদনায় সম্মোহন পদ্ধতির একটি দলিল

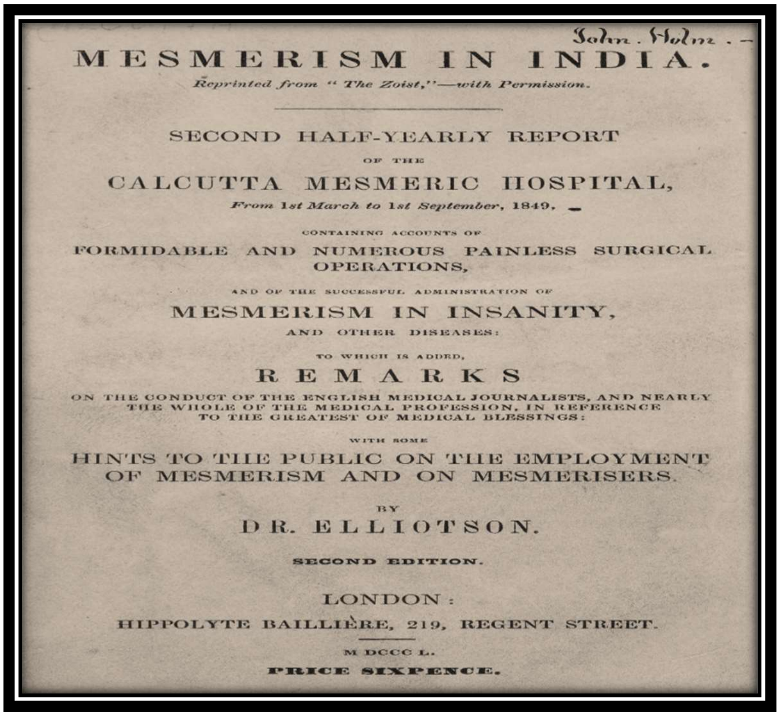

MESMERISM IN INDIA.

*Reprinted from "The Zoist,"—with Permission.*

SECOND HALF-YEARLY REPORT
OF THE
CALCUTTA MESMERIC HOSPITAL,
*From 1st March to 1st September, 1849.*

CONTAINING ACCOUNTS OF
FORMIDABLE AND NUMEROUS PAINLESS SURGICAL OPERATIONS,

AND OF THE SUCCESSFUL ADMINISTRATION OF
MESMERISM IN INSANITY,
AND OTHER DISEASES:

TO WHICH IS ADDED,
REMARKS
ON THE CONDUCT OF THE ENGLISH MEDICAL JOURNALISTS, AND NEARLY THE WHOLE OF THE MEDICAL PROFESSION, IN REFERENCE TO THE GREATEST OF MEDICAL BLESSINGS:

WITH SOME
HINTS TO THE PUBLIC ON THE EMPLOYMENT OF MESMERISM AND ON MESMERISERS.

BY
DR. ELLIOTSON.

SECOND EDITION.

LONDON:
HIPPOLYTE BAILLIÈRE, 219, REGENT STREET.

M DCCC L.

PRICE SIXPENCE.

---

113 বিশিষ্ট গবেষক ব্রেইড সর্বপ্রথম hypnosis কথাটির প্রচলন করেন । এ প্রসঙ্গে ইলিয়টসন ,শার্কো, ফ্রয়েড, এসডেইল (প্রমুখ মনীষীরা ব্যাপক পরীক্ষা - নিরীক্ষা করেন । তাদের গবেষণালব্ধ ফলাফলের দ্বারা সম্মোহন সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান আহরণ সম্ভব হয়েছে । এরপর প্রখ্যাত চিন্তাবিদ , বেকটেরেভ,টোকারস্কি , কোরসাকভ , সেকেনভ, প্যাভলভ , ম্যাকডুগ্যাল । প্রমুখ বিজ্ঞানীগণ সম্মোহনের নানাবিধ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন ।

114 সেকেন্ড হাফ- ইয়ারলি রিপোর্ট, ক্যালকাটা মেস্মেরিজম হস্পিটাল ১৮৪৯, মেস্মেরিজম ইন ইন্ডিয়া, ফর্মিডেবল অ্যান্ড নিউমেরাস পেইনলেস সার্জিক্যাল অপারেশন, বাই ডক্টর ইলিওটসন, লন্ডন।

সংবেশন এর প্রকৃতি সম্পর্কে সাধারণ লোকের মনে বিভ্রান্তিমূলক ধারণা রয়েছে । সাধারণতঃ সংবেশনকে রহস্যময় যাদুবিদ্যা বা অতিপ্রাকৃতিক ঘটনা বলে মনে করা হয় । কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সংবেশনমূলক অবস্থা বলতে মনের এরূপ একটি অভিভূত অবস্থাকে বুঝায় , যে অবস্থায় মানুষ নির্দ্বিধায় ও নির্বিচারে অপরের নির্দেশ উপদেশ পালন করার প্রবণতা বোধ করে । মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এরূপ অবস্থাকে অভিভাব্য অবস্থা বলা হয় এবং যে প্রক্রিয়ায় এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয় , তাকে অভিভাবন বলা হয় । এইভাবে অসুস্থ ব্যক্তিকে সম্মোহিত অভিভাবনের মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে মানসিক দুশ্চিন্তা লোপ করা যায় [115] ।

মেসমার ও তার পরবর্তী অনেক মনোচিকিৎসকই চিকিৎসামূলক কাজে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন । তবে ফ্রয়েড সংবেশন পদ্ধতিকে বর্জন করেন । এসাডেল এই পদ্ধতিকে মানসিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে ক্যালকাটা মেস্মারিক হাপাতলে শুরু করেন  আবার গিরিন্দ্র শেখর বসু প্রথম দিকে মেস্মারিক পদ্ধতির প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন ।   কিন্তু  এ পদ্ধতি প্রয়োগ কালে তিনি কতকগুলো , বাধার সম্মুখীন হন । প্রথমতঃ জেনারেল চিকিৎসক দের মতে সংবেশন চিকিৎসায় রোগ নিরাময় স্থায়ী হয় না । দ্বিতীয়তঃ সকল রোগীকেই সমভাবে সংবেশিত করা যায় না । তৃতীয়তঃ সংবেশনোত্তর বিস্মৃতি ( post hypnotic amnesia বা সংবেশনকালীন ঘটনাবলী সম্পর্কে রোগীর বিস্মৃতি ) রোগীর পূর্ণাঙ্গ অন্তদৃষ্টি লাভের পথে বাধার সৃষ্টি করে। চতুর্থতঃ সংবেশন অবস্থা অভিসঞ্চালন ( transference ) প্রক্রিয়াকে জটিল করে তোলে । আধুনিক যুগের মনোচিকিৎসায় সংবেশন পদ্ধতির প্রয়োগ কমে গিয়েছে ।

## বিংশ শতকের পাগল চিকিৎসা ও পদ্ধতিগত রকমভেদ

## (১৯০০-১৯৪৭ খ্রীঃ)

উনিশ শতকে পাগলের চিকিৎসা পদ্ধতি ছিল অনেকটা আশ্রম কেন্দ্রিক সেই সময় ঔপনিবেশিক চিকিৎসক  পাগলদের অনেকটা  বলপূর্বক চিকিৎসার প্রয়োগ ঘটাত , কিন্তু বিংশ শতকের প্রথম দশক থেকেই পাগল চিকিৎসার পদ্ধতি সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল , শুরু হয়েছিল চিকিৎসা নুতুন উদ্ভাবনী পন্থা , ইতিমধ্যে মনোরোগ নিয়ে শুরু হয়েছিল  বিভিন্ন গবেষণা ফলে মনোচিকিৎসার

[115] আহমেদ, মঞ্জুর ; মনঃসমীক্ষণ মতধারা , জ্ঞানকোষ প্রকাশন, ২০০৫ , ঢাকা, পৃষ্ঠা ২৫৭

জগতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। যার প্রভাব ঔপনিবেশিক বাংলার চিকিৎসা ক্ষেত্রেও পরেছিল। বিংশ শতকের প্রথমদশক থেকে বাংলা প্রেসিডেন্সীতে নানারকম পদ্ধতিতে মানসিক রোগের নানারকমের হতে চিকিৎসা শুরু হয় । আধুনিককালে এসব চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার করে মানসিক রোগের চিকিৎসায় কার্যকরী সাফল্য লাভ শুরু হয়। মানসিক রোগের এসব চিকিৎসা পদ্ধতি বৈচির্ত্যময় । ওষুধ প্রয়োগ ছাড়াও চিকিৎসায় নানারকমের মনস্তাত্ত্বিক কৌশলগত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় । মানসিক রোগের চিকিৎসা পদ্ধতিগুলোকে সাধারণত থেরাপি বলা হয় । মানসিক রোগের চিকিতসার তত্ত্বগত পদ্ধতিগুলোকে প্রধান তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায় । যথা

১) ডাক্তারি বা শারীরতাত্ত্বিক চিকিৎসা,

২ ) মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা

৩) সামাজিক চিকিৎসা ।

মনোরোগের দেহভিত্তিক চিকিৎসা বহু প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত রয়েছে । প্রাকবৈজ্ঞানিক প্রাচীন যুগের ট্রেফিনিজম ও অন্যান্য উপাচারের মাধ্যমে মনোরোগের চিকিৎসা মূলতঃ শারীরভিত্তিক ছিল । আবার প্রাচীন কালের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সম্পন্ন চিকিৎসক হিপোর্ক্যাটস ও তার পরবর্তী অনুগামীরা মনোরোগ চিকিৎসা করার জন্য মূলতঃ শারীরভিত্তিক পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন । মনোরোগ সংক্রান্ত আধুনিক ধ্যান ধারণা বিকাশের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে , প্রথম দিকে দেহতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ( somatogenic viewpoint ) প্রায় এককভাবে প্রাধান্য বিস্তার করেছে । এর সঙ্গত কারণও রয়েছে । তক্কালে মনোরোগ চিকিৎসার দায়িত্ব যাদের ওপর ন্যস্ত ছিল , তারা সবাই চিকিৎসাশাস্ত্র ও শারীরবিজ্ঞানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছিলেন । ফলে স্বাভাবিক ভাবেই তারা মনোরোগকে দৈহিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে এবং মনোরোগ চিকিৎসার জন্য শারীরভিত্তিক পদ্ধতি প্রয়োগ করেন [116]।

বিংশ শতকের প্রথম দশক থেকে কোলকাতা শহরের মনোচিকিৎসকরা পাগল চিকিৎসায় ডাক্তারি পদ্ধতিতে সাধারণত ওষুধ এবং এমন সব পদ্ধতি ব্যবহার করতে শুরু করে [117] যা বস্তুগত

---

[116] সমীক্ষা, ফোর টাইপ ইন্ডিকেটিং প্রোগ্রেস ডুরিং সাইকএনালাইটিক ট্রিটমেন্ট, এডিটেড বাই ই, বার্গলার, ভ্লিউম-৪, নং-৪, ক্যালকাটা ১৯৫০, পৃ- ১৪২

[117] দ্য হসপিটাল, “দ্য সাইকো থেরাপিউটিক্স অফ ইনসানিটি” ১৪ ই মার্চ ১৯১৪

উপাদান তথা যন্ত্রপাতি দ্বারা পরিচালিত হত । ডাক্তারি চিকিৎসা প্রয়োগ করার এখতিয়ার ছিল একমাত্র মনোচিকিৎসকদের । কারণ ডাক্তারি চিকিৎসা প্রয়োগ করতে হলে মানসিক দিকের সাথে সাথে শারীরতত্ত্ব সম্পর্কেও সমান জ্ঞান থাকা দরকার । তাই কেবলমাত্র মনস্তত্ত্বে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বা ডিগ্রীধারী কোন বিশেষজ্ঞ এ চিকিৎসা চালাতে পারত না। এক্ষেত্রে জৈব রসায়ন ও শারীরতত্ত্বের জ্ঞান থাকা একান্তই বাঞ্ছনীয়। এ পদ্ধতিকে আবার মনোচিকিৎসকরা প্রধানত চারভাবে ভাগ করেছেন।

**জৈবিক চিকিৎসা**

মানসিক রোগের চিকিৎসায় শারীরবৃত্তিক বা জৈবিক পদ্ধতিকে ডাক্তারি চিকিৎসা পদ্ধতিও বলা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রাক ঔপনিবেশিক সমাজে এদেশে যে চিকিৎসা প্রচলিত ছিল সেক্ষেত্রে মানসিক রোগের সঙ্গে শারিরীক প্রক্রিয়ার যে সম্পর্ক তা ইতিপূর্বে বেশির ভাগ চিকিৎসক রা অনুধাবন করতে পারেনি, ফলে উন্মাদ চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটিমাত্র পদ্ধতিতে সাধারন চিকিৎসা করা হতো। অর্থাৎ উন্মাদ রোগের বিভিন্ন শ্রেণী বা ভিন্ন ভিন্ন উন্মাদ রোগের একটিই চিকিৎসা করা হতো [১১৮], তৎকালীন উন্মাদ আশ্রমের বিভিন্ন রিপোর্টে দেখা বেশীর ভাগ পাগলদের ক্ষেত্রে আফিন জাতীয় ঔষধ খাইয়ে রোগী কে ঘুম পারিয়ে রাখা হতো। কিন্তু উনিশ শতকের একেবারে শেষের দিকে চিকিৎসাবিজ্ঞান যত উন্নতি হতে শুরু করে তখন ভিন্ন উন্মাদ রোগীর জন্য ভিন্ন কৌশল শুরু হয়[১১৯]।

শারীরবৃত্তিয় চিকিৎসা পদ্ধতি চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানীরা ব্যবহার করতেন কারণ এসব চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার করতে হলে চিকিৎসককে Chemistry Bio-chemistry , Pharmacology . Physiology Ges Anatomy সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আবশ্যক। তাই এই ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার করার একতিয়ার মুলত মনোচিকিৎসক এবং স্নায়ুবিদদের আছে। আবার স্নায়ুবিদ হচ্ছেন তারা যারা স্নায়ুতন্ত্রের উপর বিশেষজ্ঞ। এরা স্নায়ুতন্ত্রের সমস্যায় ওষুধ প্রয়োগ এবং শল্য চিকিতসা করে থাকেন। যাইহোক বিভিন্ন রকমের মনোচিকিৎসায় শারীরবৃত্তিয় পদ্ধতি কার্যকরী আছে পদ্ধতি। ইহার কয়েকটি প্রধান পদ্ধতি নিতে আলোচনার করা হলো-

**জ্ঞানজ চিকিৎসা**

---

118 সইফুদ্দিন, কাজী ; অস্বাভাবিক ও চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান , আবীর পাবলিকেশন , ঢাকা, ২০০৬, পৃষ্ঠা ২৬৭

119 আহমেদ, মঞ্জুর ; মনঃসমীক্ষণ মতধারা , জ্ঞানকোষ প্রকাশন, ২০০৫ , ঢাকা, পৃষ্ঠা ২৪৩

এই চিকিৎসা পদ্ধতিটি সর্বপ্রথম মনোচিকিৎসক Aaron T. ইবপশ আবিষ্কার করেন। Aaron T. Beck থিয়োরি কে অনুসরণ করে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে সালে মনোবিদ্যা পাঠক্রমে জ্ঞানজ চিকিৎসা পদ্ধতি সংযুক্ত হয় । জ্ঞানজ চিকিৎসা পদ্ধতিকে অনেকে জ্ঞানজ আচরণ চিকিৎসা বলে থাকেন । মূলত আচরণ চিকিৎসা ও অন্তর্দর্শনের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত এ জ্ঞানজ চিকিৎসা । এ জ্ঞানজ চিকিৎসার সাথে আচরণগত চিকিৎসারও সম্পর্ক আছে। আবার অন্তর্দর্শন প্রক্রিয়ার সাথেও সম্পর্ক রয়েছে[120]। আচরণ চিকিৎসায় ব্যক্তির আচরণকে সরাসরি পরিবর্তনের চেষ্টা করা হয় অন্ধভাবে । এজন্য শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে আচরণের মূল কারণে যাওয়ার চেষ্টা করা হয় না । তারা অবচেতনের গভীরে গিয়ে মানসিক সমস্যার মূল উৎপাটনের চেষ্টা করেন[121] । আচরণ চিকিৎসা পদ্ধতি এ দুটির ঠিক মাঝামাঝি । এ পদ্ধতিতে আচরণের কারণ পরিবর্তনের চেষ্টা করা হয় এবং পাশাপাশি আচরণ পরিবর্তনেরও চেষ্টা করা হয় । এ পদ্ধতিটি মূলত দ্বৈত প্রক্রিয়ায় কাজ করে ।

### মানবতাবাদী চিকিৎসা

উনিশ শতকে বাংলায় পাগল চিকিৎসায় ব্যবহৃত একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হচ্ছে মানবতাবাদী চিকিৎসা। এ পদ্ধতিটি সেই যুগের সমাজ ব্যবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ বলে তা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। মনোবিজ্ঞানের চিকিৎসা ব্যবস্থাতেই এ পদ্ধতির গুরুত্ব বর্তমানে অনেক বেশি । মনোবিজ্ঞানী কার্ল রোজার্স (১৯০২ ) এই পদ্ধতির আবিষ্কারক । তাঁর এই পদ্ধতি কে অনুসরন করে ঔপনিবেশিক চিকিৎসকগণ ও নেটিভ চিকিৎসকরা পাগল চিকিৎসায় ব্রতী হয়েছিলেন । রোজার্স এক বিশেষ ধরনের মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বের অবতারণা করেন । যাকে বলে মানবতাবাদী মনোবিজ্ঞান । মানবতাবাদী চিকিৎসা পদ্ধতিটি মূলত দুটি মৌলিক দর্শনের উপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয়েছে[122] । এ দর্শন দুটি হলো-

- মানুষ প্রাকৃতিক ভাবেই ধনাত্মক মানসিকতার ।
- ঋণাত্মক অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটাতে সে নিজেই সচেষ্ট হয় ।

---

[120] সইফুদ্দিন, কাজী ; অস্বাভাবিক ও চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান , আবীর পাবলিকেশন , ঢাকা, ২০০৬, পৃষ্ঠা ২৬৮

[121] সরকার নিহার রঞ্জন , সরকার তনুজা; অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান মানসিক ব্যধির লক্ষণ কারন ও আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি, জ্ঞানকোষ প্রকাশন ,ঢাকা ২০০২, পৃষ্ঠা ৯২

[122] সইফুদ্দিন, কাজী ; অস্বাভাবিক ও চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান , আবীর পাবলিকেশন , ঢাকা, ২০০৬, পৃষ্ঠা ২৭০

মনোবিজ্ঞানীরা মানসিক রোগের চিকিৎসার এ দর্শন দুটিকে কাজে লাগাতে গিয়েই এ মানবতাবাদী চিকিৎসা পদ্ধতির উন্মেষ ঘটিয়েছেন । এ চিকিৎসা পদ্ধতিটি বিভিন্নভাবে **১৯২১** এর পরবর্তী কালে বাংলার বিভিন্ন মানসিক হাসপাতাল গুলিতে মানসিক রোগীদের উপর প্রয়োগ করা হতো[123] । তবে এক্ষেত্রে তিনটি পদ্ধতি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ । যথা

(i) মক্কেলকেন্দ্রিক চিকিৎসা পদ্ধতি ,
(ii) অস্তিত্ববাদী চিকিতসা পদ্ধতি ,
(iii) সমগ্রতাবাদী চিকিৎসা পদ্ধতি ।

## অস্তিত্ববাদী চিকিৎসা

অস্তিত্ববাদী চিকিৎসা পদ্ধতি মূলত অস্তিত্ববাদী দর্শনের ( existential philosophy ) উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। এ পদ্ধতিটিকে মানবতাবাদী চিকিৎসা পদ্ধতির অন্তর্গত ধরা হয় । যদিও , মানবতাবাদী পদ্ধতির সাথে এর কিছুটা পার্থক্য আছে। মানবতাবাদী দর্শনে ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। আর অস্তিত্ববাদী দর্শনে জোর দেয়া হয় মূলত ব্যক্তির বাস্তব অস্তিত্বের উপর অটল থাকার স্বাধীনতায়। মানবতাবাদী দর্শন হচ্ছে ব্যক্তির স্বতন্ত্র স্বাধীনতা এবং গতিশীলতা যা ধনাত্মক মানসিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয় । অন্যদিকে অস্তিত্ববাদী দর্শনের কথা হচ্ছে উক্ত স্বাধীনতায় কাজ করার ক্ষেত্রে অযোগ্যতা। এরূপ অযোগ্যতা মানসিক যন্ত্রণা ও ভীতির জন্য দেয়[124] যা পরবর্তীতে মানসিক রোগের সৃষ্টি করে। এগুলো হলো

(ক) শারীরতাত্ত্বিক উপাদান
(খ) মনস্তাত্ত্বিক উপাদান
(গ) সমাজতাত্ত্বিক উপাদান
(ঘ) অস্বাভাবিক উপাদান ।

## সমগ্রতাবাদী চিকিৎসা অস্তিত্ববাদী চিকিৎসা

সমগ্রতাবাদী চিকিৎসা মতবাদটি সৃষ্টি করেছিলেন জার্মান সমগতাবাদী মনোবিজ্ঞানী ওয়ার্দিমার , কোহলার ও কোককা। এ চিকিৎসা পদ্ধতিটিতে অবশ্যই মানবতাবাদী মতবাদের মূলমন্ত্র যে

---

123 তদেব ২৭১

124 সইফুদ্দিন, কাজী ; অস্বাভাবিক ও চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান , আবীর পাবলিকেশন , ঢাকা, ২০০৬ পৃষ্ঠা ২৭১

ব্যক্তি স্বাধীনতা কাজ করে থাকে । তবে এক্ষেত্রে রোগীর স্বাধীনতা জাগ্রত করা হয় মূলত পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলোকে একত্রে এনে স্বাধীনভাবে চিন্তা করা ও স্বক্ষমতা বৃদ্ধি করার মধ্য দিয়ে । মনোবিজ্ঞানী রবার্ট ফেল্ডম্যান এই পদ্ধতিতে রোগীর সকল চিন্তা, অনুভূতি ও আচরণকে একত্রে এনে মূল্যায়ন করতে হয়[125] ।

সমগ্রতাবাদী মনোচিকিতসার কয়েকটি মৌলিক ধারণা রয়েছে যেগুলোর উপর ভিত্তি করে মনোচিকিৎসা প্রদান করা হয়ে থাকে । অতীত অভিজ্ঞতা ও বর্তমান অভিজ্ঞতার আলোকে সার্বিকভাবে বিশ্লেষণ করে রোগীর চিকিৎসা করা হয়।

## পরিবেশগত চিকিৎসা

মানসিক রোগ ও মনোদৈহিক রোগের চিকিৎসায় পরিবেশগত চিকিৎসা পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে । আধুনিককালে পদ্ধতিটির ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় । পরিবেশগত চিকিৎসা পদ্ধতি বুঝতে হলে প্রথমেই বুঝতে হবে পরিবেশ কি এবং মানুষের সাথে পরিবেশের সম্পর্কই বা কি । মানুষের চারদিকে ঘিরে যা কিছু আছে তাহাই ব্যক্তির পরিবেশ । অন্য কথায় পরিবেশ হচ্ছে সে অস্তিত্ব ব্যক্তি যার সাথে মিথস্ক্রিয়া করে । অর্থাৎ ব্যক্তি পরিবেশ থেকে অনেক কিছু উদ্দীপক হিসেবে গ্রহণ করে এবং পরিবেশকেও অনেক কিছু ফিরিয়ে দেয় । এভাবে পরিবেশ পরিবর্তন করে বা পরিবেশের উপাদানগুলোর পরিবর্তন করে যখন ব্যক্তির অস্বাভাবিক আচরণের চিকিৎসা করা হয় তখন তাকেই বলে পরিবেশগত চিকিৎসা । এ পরিবেশগত চিকিৎসা দু'ভাবে প্রদান করা যায় । যেমন-

( ক ) সামাজিক পরিবেশ চিকিৎসা :

সামাজিক পরিবেশের জন্য যদি ব্যক্তির আচরণে [126] সমস্যা সৃষ্টি হয় তাহলে এ ধরনের চিকিৎসা দেয়া হয়। এক্ষেত্রে যে বিশেষ ধরনের সামাজিক বা পারিবারিক পরিবেশের জন্য ব্যাক্তির মধ্যে অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি হয়েছে, ব্যক্তিকে যদি তার থেকে উন্নত সামাজিক ব্যবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে রাখা হয় তাহলে তার অস্বাভাবিকতা অনেকাংশে দূর হয় ।

( খ ) প্রাকৃতিক পরিবেশ চিকিৎসা

---

[125] সইফুদ্দিন, কাজী ; অস্বাভাবিক ও চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান , আবীর পাবলিকেশন , ঢাকা, ২০০৬ পৃষ্ঠা ২৭৩

[126] সইফুদ্দিন, কাজী ; অস্বাভাবিক ও চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান , আবীর পাবলিকেশন , ঢাকা, ২০০৬ পৃষ্ঠা ২৭৪

সামাজিক পরিবেশ দ্বারা সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সুন্দর ও নির্মল প্রাকৃতিক পরিবেশও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে । ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন প্রয়োজন হয় । একথা ঠিক যে সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে অবস্থান করলে ব্যক্তি মানসিকতায় স্নিগ্ধতা আসে এবং বিভিন্ন রকমের মানসিক চাপের নিরাময় হয় ।

ঔপনিবেশিক সময়ে এদেশের বিভিন্ন উন্মাদআশ্রম ( দুলান্দা উন্মাদআশ্রম ) ও মানসিক হাসপাতালগুলিতে (রাঁচি মানসিক আশ্রম ) মনোচিকিৎসার জন্য এ পদ্ধতিটির ব্যবহার বেশ জনপ্রিয়। কতগুলো সুন্দর সামুদ্রিক দ্বীপ , প্রাকৃতিক জঙ্গল , সমুদ্র সৈকত ইত্যাদি স্থানে মানসিক অসুস্থদের রাখা হয়। দীর্ঘ দিন থাকার পর তাদের মধ্যে মানসিক প্রশান্তি ফিরে আসে এবং অনেক অস্বাভাবিক লক্ষণগুলো দূর হয়।

**মনো-অভিনয়**

মনো - অভিনয় একটি অভিনব ধরনের মানসিক চিকিৎসা পদ্ধতি । এ পদ্ধতিটি সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন জে , এল , মরেনো ( J. L. Moreno , ১৯২০ ) ১৯২০ সালের দিকে তিনিই প্রথম লক্ষ্য করলেন যে অভিনয়ের মাধ্যমে মানুষের মনের অবচেতনের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া যায় । ব্যক্তির মনে যা আসে সে তাই নাটকের ভঙ্গিতে প্রকাশ করেন[127] ।

**সাইকোসিস নিবারক ঔষধ - রাসায়নিক চিকিৎসা**

আধুনিককালে বহু রকমের প্রাকৃতিক উদ্ভিদজাত ঔষধ বা কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত রাসায়নিক ঔষধ আবিষ্কৃত হয়েছে , যা মানসিক অবস্থা ও প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে ও উগুলোর পরিবর্তন ঘটায় । যেহেতু এ ধরনের ঔষধ মনের ওপর ক্রিয়াশীল , সেহেতু এগুলোকে মানস্ক্রিয় ঔষধ বলা হয় এবং এ সংক্রান্ত জানচর্চার শাখাকে মনৌষধ শাস্ত্র নামে আখ্যায়িত হয়। এ ধরনের মানস্ক্রিয় ঔষধগুলোকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়; যথা , ১.সাইকোসিস নিবারক ঔষধ, ২.বিষণ্ণতা নিবারক ঔষধ ও ৩. মত্ততা নিবারক ঔষধ । মানসিক রোগের চিকিৎসায় যখন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয় তখন তাকে বলে রাসায়নিক চিকিৎসা । রাসায়নিক চিকিৎসায় এমন সব বস্তু ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হয় যা সরাসরি আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং আচরণের গতি - প্রকৃতিকে পরিবর্তন করে দেয় । বিংশ শতাব্দিতে রাসায়নিক চিকিৎসা পদ্ধতির ব্যাপক প্রসার ঘটেছে যা মানসিক রোগের চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে । মানসিক

[127] সইফুদ্দিন, কাজী ; অস্বাভাবিক ও চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান , আবীর পাবলিকেশন , ঢাকা, ২০০৬, পৃষ্ঠা ২৭৫

রোগের চিকিৎসায় প্রধানত পাঁচ ধরনের ওষুধ ব্যবহার করা হয়ে থাকে । যথা তীব্র প্রশমক, মৃদু প্রশমক, বিষন্নতানাশক, প্রশান্তিমূলক, ভ্রমোৎপাদক।

এ ধরনের ঔষধকে প্রধান উত্তেজনা প্রশমক ঔষধ রূপেও আখ্যায়িত করা হয় । কারণ এ ঔষধগুলো শুধু উত্তেজনা কমানোর কাজই করে না , বরং এ ঔষধগুলো মানসিক বিশৃঙ্খলা , বাস্তবের প্রতি অনীহা , বিভ্রান্তি , অলীকপ্রত্যক্ষণ, প্রভৃতি গুরুতর মনোরোগের লক্ষণগুলোরও উপশম ঘটায় । সেদিক দিয়ে এগুলোকে সাইকোসিস । নিবারক ঔষধ রূপে আখ্যায়িত করাই অধিক যুক্তিসঙ্গত[১২৮] ।

অতীত কাল থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশে মনোরোগের জন্য ভেষজ চিকিতসা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল । ভারতীয় উপমহাদেশে বহু শতাব্দী ধরে সর্পগন্ধা উদ্ভিদ ব্যবহার করে মনোরোগের চিকিৎসা করা হয়েছে । সর্পগন্ধা উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম রওলফিয়া । ১৯৪৩ সালে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেটে প্রথম প্রকাশিত হয় যে , রওলফিয়া উদ্ভিদ থেকে প্রস্তুতকৃত রেসারপাইন নামক ঔষধে সিজোফ্রেনিয়া রোগ ও কিছু কিছু আবেগমূলক গোলযোগের উপশম ঘটে । সুতরাং মনোরোগ চিকিৎসার ঔষধ রূপে রেসারপাইনের ব্যবহারই প্রথম শুরু হয় ।

সাইকোসিস নিবারক ঔষধগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে সিজোফ্রেনিয়া রোগের গুরুতর লক্ষণসমূহ যেমন , অলীকপ্রত্যক্ষণ , বিভ্রান্তি , বাস্তব বিমুখতা , প্রভৃতি দূর করা যায় এবং আবেগমূলক গোলযোগেরও কিছু উপশম ঘটে । সুতরাং মানসিক হাসপাতালে গুরুতর রোগীদের ব্যবস্থাপনা করা ও তাদের রোগ নিরাময় করার ক্ষেত্রে এ ঔষধগুলো ইদানিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে । এ ধরনের ঔষধ ব্যবহারের ফলেই হাসপাতালের বহু পুরাতন , রোগী রোগমুক্ত হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন [১২৯] । উন্মত্ততার ক্ষেত্রে রেসারপাইন নামক ওষুধ প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। সিজোফ্রেনিয়া রোগের চিকিৎসায় শক থেরাপির বিকল্প হিসেবে এ ওষুধ প্রয়ো গ করা যায়। এ ওষুধ প্রয়োগে রোগীর উত্তেজনার ভাব কেটে যায় এবং মন থেকে ভয় ও দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যায় । রেসারপাইন এর কিছুটা বিকল্প হিসেবে ক্ষেত্রবিশেষে ক্লোরপ্রোমাজাইন এবং পারফেনাজাইন এর ব্যবহার করা হচ্ছে । এ সবগুলোই ট্রাংকুলাইজিং - এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তীব্র প্রশমক হিসেবে মেট্রোবমেট এবং ক্লোরাইয়াজেপোলাইড ব্যবহার করলে তীব্র দুশ্চিন্তা ও

---

[128] দ্যা ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেট, ১৯৪৫ নভেম্বর , ৮০(১১); ৫৯৩, অ্যা হ্যান্ডবুক অফ সাইকোলজিক্যাল মেডিসিন, ( উইথ অ্যা চেপ্টার অন ওয়ার-টাইম মেন্টাল ডিস্কর্ডার )

[129] আহমেদ, মঞ্জুর ; মনঃসমীক্ষণ মতধারা , জ্ঞানকোষ প্রকাশন, ২০০৫ , ঢাকা, পৃষ্ঠা ২৪৮

টেনশন দূর হয়ে যায়[130]। প্রশান্তিমূলক ওষুধ হিসেবে ফেনোবারবিটাল এর প্রয়োগে দুশ্চিন্তা , অস্থিরতা এবং নিদ্রাহীনতা দূর হয় । তবে প্রশান্তিমূলক ওষুধ ব্যবহারের ফলে নানারকমের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। যেমন : এ ওষুধের প্রতি নেশা বা অভ্যাস গড়ে উঠতে পারে এবং রোগের লক্ষণ প্রশমনের ব্যাপারটি ওষুধ নির্ভর হয়ে যায় ।

## বৈদ্যুতিক শক থেরাপি

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইউরোপে মানসিক রোগের চিকিৎসার জন্য বৈদ্যুতিক শক থেরাপি ব্যবহার করা হত। অতঃপর মানসিক রোগের চিকিৎসায় বৈদ্যুতিক আঘাত প্রয়োগের পদ্ধতি সর্বপ্রথম ১৯৩৪ সালে হাঙ্গেরীয়ান মনোচিকিৎসক L. J. Meduna এবং পরবর্তীতে দুইজন ইতালিয়ান মনোচিকিৎসক ১৯৩৮ সালে শারলেটি ও বিনি আবিষ্কার করে[131] । এ দুইজন ইতালীয় মনোচিকিৎসক রোগীর শরীরে নির্দিষ্ট ভোল্টের বৈদ্যুতিক শক প্রয়োগ করে মানসিক রোগের প্রকোপ বা তীব্রতা কমিয়ে আনার চেষ্টা করেন । এতে বিপদের কোন আশঙ্কা নেই এবং এটি বেশ কার্যকরীও বটে । এ পদ্ধতিকে সংক্ষেপে ই.সি.টি ( ইলেক্ট্রো কনভালসিভ থেরাপি ) পদ্ধতি বলে । আবার অন্যভাবে এ পদ্ধতিকে ই.সি.টি (ইলেক্ট্রো শক থেরাপি) - ও বলা যেতে পারে[১৩২]। সাধারণত বিষণ্ণতা (ডিপ্রেশন ) , হর্ষোন্মত্ততা ( ম্যানিয়া ) সিজোফ্রেনিয়া ইত্যাদি রোগের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি প্রয়োগে ভালো ফল পাওয়া যায়। তবে ই.সি.টি প্রয়োগের সাথে ওষুধও প্রয়োগ করা হয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে[133] ।

এজন্য মস্তিস্কের দু ' পাশে দুটি ইলেকট্রোড বসিয়ে তা মূল যন্ত্রের নাগে পারে । এক্ষেত্রে এ.সি, বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয় [134] । সাধারণত ১০০ থেকে ২০০ ভোল্টের বৈদ্যুতিক শক দেয়া হয় এবং এ শক স্থায়িত্ব থাকে মাত্র দুই সেকেন্ড ( ২ সে .) । রোগের ধরন প্রকৃতি ও মাত্রা অনুযায়ী

---

130 সইফুদ্দিন, কাজী ; অস্বাভাবিক ও চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান , আবীর পাবলিকেশন , ঢাকা, ২০০৬, পৃষ্ঠা ২৭৭

131 আব্রামস, আর - ইলেক্ট্রোকনভালসিভ থেরাপি , অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, অক্সফোর্ড, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা-২৩ ।

132 এন্ডলার, এনএস, ফিঙ্ক, এম ; কনভালসিভ থেরাপি , নিউ ইয়র্ক: রেভেন প্রেস, ১৯৮৫ , পৃষ্ঠা-৫

133 আহমেদ, মঞ্জুর ; মনঃসমীক্ষণ মতধারা , জ্ঞানকোষ প্রকাশন, ২০০৫ , ঢাকা, পৃষ্ঠা ২৪৩

134 দ্যা ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেট, ১৯৪৪ অক্টোবর, ৭৯(১০), ৪৯৩-৪৯৭, দ্যা ট্রিটমেন্ট অফ মেন্টাল ডিসঅর্ডার বাই ইলেক্ট্রিক্যাল ইন্ডিউস কনভুলসন, জে, ই, ধুঞ্জিভয়

শকের সংখ্যা নিরূপণ করা হয়। সাধারণত ৬-৭ টি থেকে ৫০ টি পর্যন্ত বৈদ্যুতিক আঘাত দেওয়া হয় [135] ।

বৈদ্যুতিক শক দেয়ার আগে রোগীকে সুন্দর একটি বিছানায় শুইয়ে দিয়ে তার দেহ মনকে রিলাক্স করানো হয় । রোগীর হাত - পাগুলো স্বাভাবিক রেখে টেপ দ্বারা আলতোভাবে বেঁধে দেয়া হয়। এছাড়া রাবারের একটি নরম টুকরা ( gag ) দাঁতের দু পাটির মধ্যে এঁটে দেয়া হয় । কেননা খিচুনির সময় রোগীর দত দ্বারা জিহ্বা কেটে যেতে পারে । বিদ্যুতের এ আঘাত দেবার জন্য রোগী সাথে সাথে সংজ্ঞা হারায় । ফলে , সে কোন ব্যথা অনুভব করে না । সাধারণ ক্ষেত্রে প্রতি সপ্তাহে দু থেকে তিন বারে পাঁচ থেকে দশটি আঘাত (ই.সি.টি ) দেয়া হয় । তবে এ সবই নির্ভর করে রোগের প্রকৃতি , মাত্রা ও উন্নতির ধরনের উপর । বৈদ্যুতিক আঘাত দেয়ার পর রোগীর সংজ্ঞা পুনরায় ফিরে এলে তাৎক্ষণিকভাবে তার স্মৃতি বিলোপ দেখা যায় , রোগীর আচরণে দ্বিধা - দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটে এবং রোগীকে নিস্তেজ মনে হয় । তবে ধীরে ধীরে তার আচরণে উন্নতি পরিলক্ষিত হতে থাকে । বৈদ্যুতিক শক থেরাপি মনোচিকিৎসার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি[136] । এ পদ্ধতিতে কতগুলো তীব্র মানসিক রোগের চিকিৎসা করা যায় । এসব রোগের মধ্যে বিষণ্ণতা (depression), ইনভশনাল ম্যালানকলিয়া , ম্যানিয়া , সিজোফ্রেনিয়া এবং অন্যান্য মনোবিকারগ্রস্থ রোগ অন্যতম । বিশেষ করে যে সকল রোগী ওষুধ গ্রহণে অপারগ তাদের বেলায় এ শক থেরাপি বেশি প্রয়োগ করা হয় [137]। যেমন, বিংশ শতাব্দীতে বৈদ্যুতিক আঘাতের দ্বারা অনেক মানসিক রোগীর চিকিৎসা করে ভাল ফল পাওয়া গেছে । কিন্তু যারা এটির আবিষ্কার করেছিলেন তারা এর কার্যকারিতা সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা দিতেন তা গ্রহণযোগ্য নয়। ঠিক তেমনিভাবে মনোচিকিৎসা বা সাইকোথেরাপি-র কার্যকারিতা চিকিৎসা পদ্ধতির চেয়ে বরং মনোবিজ্ঞানীর ব্যক্তিত্বের উপরে বেশি নির্ভর করে।

---

135 সইফুদ্দিন, কাজী ; অস্বাভাবিক ও চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান , আবীর পাবলিকেশন , ঢাকা, ২০০৬, পৃষ্ঠা ২৭৯

136 দ্যা ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেট, ১৯৪৪ অক্টোবর, ৭৯(১০), ৪৯৩-৪৯৭, দ্যা ট্রিটমেন্ট অফ মেন্টাল ডিসঅর্ডার বাই ইলেক্ট্রিক্যালি ইন্ডিউস কনভুলসন, জে, ই, ধুঞ্জিভয়

137 মণ্ডল জগদিন্দ্র ; মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা , সোমা বুক এজেন্সি, কোলকাতা ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ৩৩৭

## ইলেক্ট্রোকনভালসিভ থেরাপির ডিভাইস[138]

## ইনসুলিন শক থেরাপি

১৯২৭ সালে স্যাকেল সর্বপ্রথম ইনসুলিন শক থেরাপির প্রচলন করেন। এ পদ্ধতিটি মনোচিকিৎসায় বেশ কার্যকরী হয় ।বিশেষ করে যে সকল ক্ষেত্রে ওষুধের প্রয়োগ ভালো হয় না সে সব ক্ষেত্রে এর ব্যবহার করা যায়। একে ইনসুলিন শক থেরাপি বা ইনসুলিন কেমো থেরাপি বলে ।এ পদ্ধতিতে রোগীর মাংসপেশীতে ইনজেকশনের মাধ্যমে ইনসুলিন প্রবেশ করান হয়। ফলে রোগী সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। সবকিছু নির্ভর করবে রোগীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উপর ।সিজোফ্রেনিয়া রোগের চিকিৎসায় এই পদ্ধতির উপকারিতা ৮০ % পর্যন্ত পাওয়া যায় যদি যথাযথভাবে থেরাপী প্রদান করা সম্ভব হয়। সাধারণত প্রতি সপ্তাহে ৬ দিন করে দুই মাস ব্যাপী এই থেরাপী প্রদান করা হয়ে থাকে [139]। এ পদ্ধতিতে সাধারণত সিজোফ্রেনিয়া রোগের চিকিতসা করা হয়। এ পদ্ধতি ওষুধ থেরাপি ও বৈদ্যুতিক শক থেরাপির সহায়ক হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে ।ইনসুলিন থেরাপি প্রয়োগ করে মনোধিকার এর লক্ষন অপসারণে ভালো ফল পাওয়া যায় [140]।

---

[138] theconversation.com/electroconvulsive-therapy-a-history-of-controversy-but-also-of-help-70938

[139] সইফুদ্দিন, কাজী ; অস্বাভাবিক ও চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান , আবীর পাবলিকেশন , ঢাকা, ২০০৬, পৃষ্ঠা ২৮০

[140] মণ্ডল জগদিন্দ্র ; মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা , সোমা বুক এজেন্সি, কোলকাতা ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ৩৩৮

## মনোবৈজ্ঞানিক শল্যচিকিৎসা

প্রখ্যাত অধ্যাপক মনিজ (১৯৩৬ ) সালে মস্তিষ্কে শল্য চিকিৎসার মাধ্যমে মনোবিকারের । এ সকল শৈল্য চিকিৎসার ফলে রোগীর মধ্যে বিদ্যমান আবেগীয় গোলযোগ নিরসন হয় , চিন্তন গোলযোগে কিছুটা স্থিরতা আসে , উদাসীনতা দূর হয় , ভ্রান্ত বিশ্বাস (ডেলুউশন ) ও অলীক বিক্ষণ (হ্যালুসিনেশন) দূরীভূত হয়[141]। সাধারণত সিজোফ্রেনিয়া, ইনভলুশনাল ম্যালানকলিকস, অসামাজিক ব্যক্তিত্ব , মদাসক্তি , ম্যানিডিপ্রেসিভ ইত্যাদি রোগের বেশি তীব্রতাকে উপশমের জন্য এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে । তবে পদ্ধতিতে মস্তিষ্কঘটিত কোন অস্বাভাবিকতার জন্য এ রোগের বিকাশ হয়ে থাকে , সেক্ষেত্রে এ পদ্ধতি বেশি কার্যকর হয় [142]। মস্তিষ্কের সম্মুখভাগকে অনুষঙ্গ অঞ্চল বলা হয় এবং এ অঞ্চলেই ব্যক্তির অর্জিত জ্ঞান ও স্মৃতি সংরক্ষিত থাকে । সেজন্যই মস্তিষ্কের গভীরতর স্তরের আবেগমূলক অবস্থান থেকে এ অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করা হয় । কপালের পাশে ও চোয়ালের ওপরে সূচের মত সরু ও তীক্ষধার একটি অস্ত্র প্রবেশ করিয়ে ওপর নীচে টান দিয়ে স্নায়ু সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয় ।

### মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা

মানসিক রোগের চিকিৎসার জন্য এমন কতগুলো পদ্ধতি ব্যবহার করা যাতে কোন প্রকার ওষুধ প্রয়োগ করা হয় না বা কোন প্রকার যান্ত্রিক কলাকৌশলের সহায়তা নিতে হয় না এগুলোকে সাধারণভাবে মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা বলা যেতে পারে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে প্রায় শতাধিক মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসার ব্যবহারিক পরিচয় পাওয়া গেছে । রোগের প্রকৃতি ও হন । কাল , পাত্র ভেদে এসব পদ্ধতির ভিন্ন ব্যবহার রয়েছে [143]। একথা ঠিক যে মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা এবং মনোচিকিৎসা - এর ধারণার মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই । আবার এদেরকে এক কথায় সংজ্ঞায়িত করাও বেশ কঠিন । তবে এ পদ্ধতির কয়েকটি প্রধান উদ্দেশ্য উল্লেখ করা যেতে পারে [144] । যেমন :

---

[141] সইফুদ্দিন, কাজী ; অস্বাভাবিক ও চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান , আবীর পাবলিকেশন , ঢাকা, ২০০৬, পৃষ্ঠা ২৮১

[142] আহমেদ, মঞ্জুর ; মনঃসমীক্ষণ মতধারা , জ্ঞানকোষ প্রকাশন, ২০০৫ , ঢাকা, পৃষ্ঠা ২৪৬

[143] সরকার নিহার রঞ্জন, হক মঞ্জিরুল , খালেক আব্দুল; মনোবিজ্ঞানের ইতিহাস ও মতবাদ, জ্ঞানকোষ প্রকাশন ,ঢাকা ১৯৯২,পৃষ্ঠা ২৬২

[144] সইফুদ্দিন, কাজী ; অস্বাভাবিক ও চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান , আবীর পাবলিকেশন , ঢাকা, ২০০৬, পৃষ্ঠা ২৮৪

(১) রোগীর অন্তদৃষ্টিকে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করে প্রয়োজনীয় পর্যায়ে উন্নীত করা। (২) রোগ সৃষ্টিকারী অন্তর্দ্বন্দ্বগুলোকে মিটিয়ে ফেলা এবং তাদের সাথে রোগের লক্ষণের সম্পর্ক ছেদ করা। (৩) নিজের সমস্যা নিজে বোঝার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং এসব সমস্যা । সমাধানের জন্য নিজে নিজে চেষ্টা করার ক্ষমতা তৈরি করা। (৪) পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে সচেতন হওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি, যার ফলে রোগীর উপযোজনমূলক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় [145] ।(৫) অসংলগ্ন আবেগের বিলুপ্তি ঘটাতে হবে এবং এর স্বাভাবিক ব্যবহার নিশ্চিত করা। (৬) চিন্তন ও এর প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কার্যকরণগত ও যুক্তিযুক্ত সম্পর্ক পুন : স্থাপন করা [146] ।

প্রায় একশো বছর ধরে ব্রিটিশ - শিক্ষিত শহুরে বাঙালির মনস্তাত্ত্বিক ও মনোরোগ চিকিৎসার প্রধান পীঠস্থান ছিল কলকাতার ১৪ , পার্শিবাগান লেন । গিরীন্দ্রশেখর বোসই ( ১৮৮৭-১৯৫৩) ছিলেন প্রথম চিকিৎসক যিনি ঐসব রোগীদের যন্ত্রণা নিরাময়ের জন্য সবসময় সচেষ্ট ছিলেন । ১৯০৯ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম.ডি ডিগ্রি লাভ করার আগে তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়ন ও বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করেন । পরবর্তীকালে তিনি উল্লেখ করেছেন যে ১৯০৯ সালে মনঃসমীক্ষণ ব্যাপারটার সঙ্গে পরিচিত হবার আগে , ছাত্রাবস্থা থেকেই চিকিৎসার স্বার্থে সম্মোহন ( হিপ্নোসিস ) চর্চায় তিনি যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন । ১৯১৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকস্তরে মনস্তত্ত্ব বিদ্যা চালু হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের নাম নথিভুক্ত করান । ১৯১৭ সালে তিনি পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্ব বিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন । ১৯২১ সালে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ বিষয়ে তাকে প্রথম ডক্টরেট ডিগ্রি দেওয়া হয়। ১৯১৭ সাল থেকে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান বিভাগে। আংশিক সময়ের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন । সেখানে ছাত্রদের জন্য মনঃসমীক্ষণকে অত্যাবশ্যক ব্রা ছিল তার অন্যতম অবদান ।

তিনি ছিলেন এক সম্পন্ন পরিবারের লেখক । প্রথাসম্মতভাবে তিনি নিয়মিত ১৪ , পার্শিবাগান লেনের পারিবারিক প্রাসাদেও দরজা বাঙালি লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের জন্য উন্মুক্ত করে

---

[145] দ্যা ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল গ্যাজেট, ১৯৪১ মে, ৭৬(৫), ৩১২, পারসোনালিটি অ্যান্ড মেন্টাল ইলনেস, এন ইজি ইন সাইকিয়াট্রিক ডায়াগনোসিস

[146] আহমেদ, মঞ্জুর ; মনঃসমীক্ষণ মতধারা , জ্ঞানকোষ প্রকাশন, ২০০৫ , ঢাকা, পৃষ্ঠা ২৬২

দিয়েছিলেন । সেখানে তারা তাদের সাম্প্রতিক কাজ সম্পর্কে সকলকে অবহিত করতেন এবং কাজের অগ্রগতির সম্পর্কে আলোচনা করতেন । এই উৎকেন্দ্র সমিতি ( পাগলা ক্লাব ) একদিকে ছিল পাশ্চাত্যের খোলা জানলা , আরেক দিকে ছিল বাঙালি আইডেনটিটি পলিটিক্সের এক গুরুত্বপূর্ণ নেটওয়ার্ক । এই সমিতি বোসের মনঃসমীক্ষণ সংক্রান্ত ধারণা বিকাশের প্রেরণাস্থল ছিল । সমিতির সভাগুলোতে বাঙালি হিন্দু সংস্কৃতির প্রচলিত ধারণা ও অবস্থার সঙ্গে বাইরে থেকে আমদানি করা মনঃসমীক্ষণ-সংক্রান্ত চিন্তাধারার মেলবন্ধন ঘটানোর চেষ্টা হত [147] । ১৯২২ সালে সাইকো-অ্যানালিটিক্যাল সোসাইটির স্থাপিত হওয়ার পর থেকে ১৪ পার্শিবাগান লেনেই ইন্ডিয়ান সাইকো অ্যানালিটিক্যাল সোসাইটির কলকাতা শাখার প্রাতিষ্ঠানিক ঠিকানা হিসেবেই পরিচিত [148] ।

**ইন্ডিয়ান সাইকো অ্যানালিটিক্যাল সোসাইটির- ওয়াল বোর্ড**

**১৪ নং পার্শিবাগান লেন**

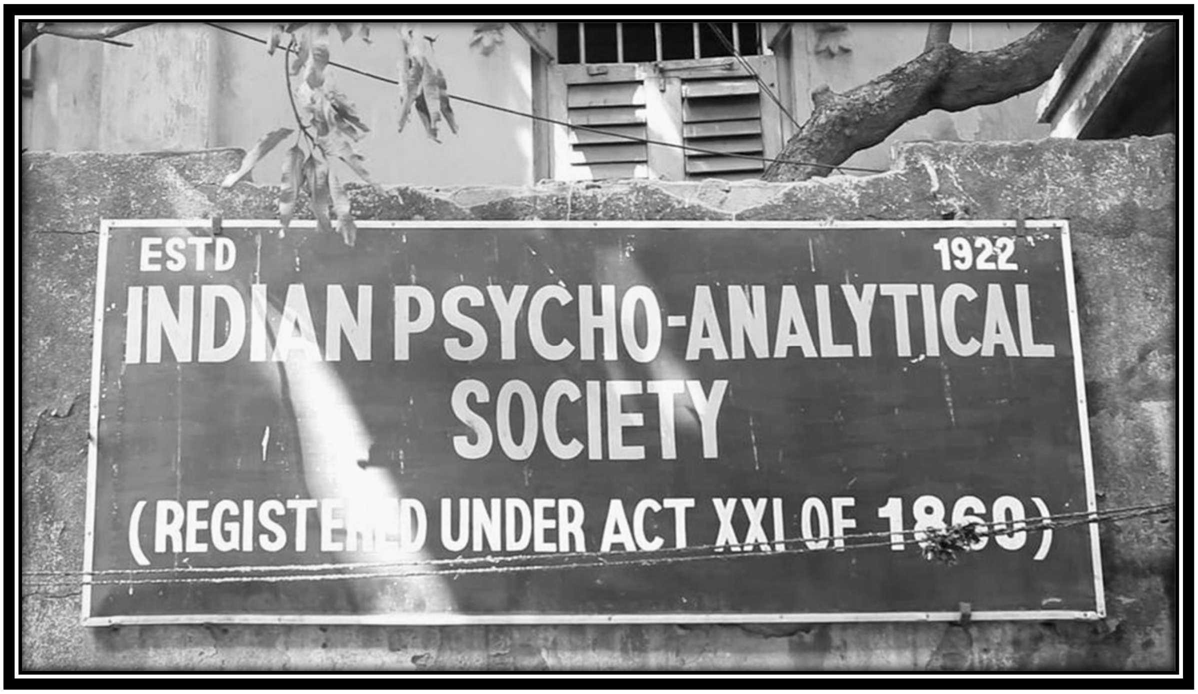


[147] সমীক্ষা, জার্নাল অফ ইন্ডিয়ান সাইকো-অ্যানালাইটিক্যাল সোসাইটি, এডিটেড বাই জি, বোস, ভলিউম-২, অ্যা নিউ থিওরি অফ মেন্টাল লাইফ, ক্যালকাটা, ১৯৪৮, পৃ- ১০৮

[148] সমীক্ষা, জার্নাল অফ ইন্ডিয়ান সাইকো-অ্যানালাইটিক্যাল সোসাইটি, প্রসেডিং এডিটেড বাই জি, বোস, ভলিউম-২, নং- ৪, ক্যালকাটা, ১৯৪৮, পৃ- ৭০

ভারতীয় সাইকোঅ্যানালিটিক্যাল ইনস্টিটিউটের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় ১৯২২ সালে । এই ইনস্টিটিউটের সদস্যদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিভাগের বক্তৃতা শুনতে হত , সোসাইটির পাঠাগার থেকে নির্ধারিত বইপত্র পড়তে হত এবং কমপক্ষে দুশোটি ব্যক্তিগত বিশ্লেষণের সেশন সম্পূর্ণ করতে হত । প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুযায়ী এই ইনস্টিটিউটের প্রত্যেক সদস্যকে অন্ততপক্ষে দুটো ক্ষেত্রে একশোটি বিশ্লেষণী পরীক্ষানিরীক্ষা করতে হত । স্বয়ং বোস বা আওয়েন বার্কলি হিলের তত্ত্বাবধানে এই বিশ্লেষণী পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হত । ব্রিটিশ মনোবিদ বার্কলি ছিলেন আরনেস্ট জোনসের বন্ধু ও রাচির ইউরোপীয় মানসিক হাসপাতালের সুপার ইন্টেনডেন্ট । ১৯৩৩ সালের ১ মে ভাই । রাজশেখরের সহায়তায় বোস উত্তর কলকাতার বেলগাছিয়ায় কারমাইকেল ( অধুনা.আর.জি.কর ) মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মনোরোগের বহির্বিভাগ স্থাপন করেন ।

প্রতিষ্ঠালগ্নে ভারতীয় সাইকোঅ্যানালিটিক্যাল সোসাইটির সদস্যসংখ্যা ছিল পনের [149] । সাতজন ছিলেন মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাস করা ডাক্তার । এর মধ্যে দুজন বার্কলি হিল ও আর সি ম্যাক ওটারস ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিস ও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অন্য সাতজন মনসত্ত্ববিদের মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিভাগের ছিলেন পাঁচজন , পাটনা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পিছু একজন । এই সোসাইটি বাঙালি লেখক ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় থেকে নতুন নতুন সদস্যদের আকৃষ্ট করার জন্য নিরলস প্রয়াস চালিয়েছে । ডাক্তারি পেশার সঙ্গে যুক্ত সদস্যদের মতো এই লেখক ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মনঃসমীক্ষণ অনুশীলনে কোনো আগ্রহ ছিল না । ১৯৩৪ সালের মধ্যে ভারতীয় সাইকোঅ্যানালিটিক্যাল সোসাইটি ১৫ জন সদস্য ও ২০ জন সহযোগীর নাম নথিভুক্ত করে ; ১৯৪৫ সালে এর সদস্য ও সহযোগীর সংখ্যা হয় ১৬ এবং ৫৪ এই সোসাইটির অন্যান্য সদস্যেরা বোসের মতো সক্রিয় ছিলেন না ; কেউই তাঁর মতো বহুপ্রজ ( prolific ) লেখকও ছিলেন না । তবু কয়েক বছরের মধ্যে ভারতীয় সাইকোঅ্যানালিটিক্যাল সোসাইটির অন্যান্য সদস্যের লেখাবেশ কিছু নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। বেশির ভাগ প্রবন্ধ Indian Journal of Psycholog তে প্রকাশিত হয়। দু - একটা প্রকাশিত

---

[149] সমীক্ষা, জার্নাল অফ ইন্ডিয়ান সাইকো-অ্যানালাইটিক্যাল সোসাইটি, প্রসেডিং এডিটেড বাই এস, ছি মিত্র, বোস, ভলিউম-২, নং- ৩, ইন্ডিয়ান সাইকো-অ্যানালাইটিক্যাল সোসাইটি, নেম অফ মেম্বারস, ক্যালকাটা ১৯৪৮, পৃ- ২৬১

হয় International Journal of Psychoanalysis- এ । ১৯৪৭ সালে এই সোসাইটি তাদের নিজস্ব পত্রিকা সমীক্ষা প্রকাশ শুরু করে [150]।

ঔপনিবেশিক ভারতে বিশেষতঃ বাংলাতে গিরিন্দ্রশেখর বসু সর্বপ্রথম মনোবিশ্লেষণ পদ্ধতি বা মন : সমীক্ষণের পদ্ধতি চালু করেন [151] । তিনি বিশ্বাস করতেন যে মানুষের অতৃপ্ত ও অপূর্ণ কামনা , বাসনা , ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষাগুলো চেতন মন থেকে অবচেতনে অবদমিত হয় (repression ) । তবে অবচেতনে নির্বাসিত এসব আবেগগুলো একেবারে ধ্বংস হয়ে যায় না। বরং এরা নিজেদের প্রয়োজন মতো প্রতিনিয়ত চেতন মনের উপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে এবং এসব চাপ থেকেই মানসিক অসুস্থতার সৃষ্টি হয় । সমীক্ষণের দুটি মৌলিক অস্তিত্ব আছে। অর্থাৎ মন : সমীক্ষণকে দুই ভাবে দেখা যায় । এ দুটি হলো-

(ক) মন:সমীক্ষণ একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ।

(খ) মন:সমীক্ষণ মানসিক রোগ চিকিৎসার পদ্ধতি ।

মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বটিকে উদ্ভাবন করার সময় তিনটি পদ্ধতি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় । এ পদ্ধতি তিনটি হচ্ছে ( ক ) পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ( খ ) অন্তর্দর্শন পদ্ধতি ( গ ) বিকাশগত পদ্ধতি এ পদ্ধতির মাধ্যমে রোগের কারণ খুঁজে বের করে রোগীর সাথে আলোচনার দ্বারা তা সমাধান করার যে প্রক্রিয়া তাকেই বলে মন : সমীক্ষণ [152]। আধুনিক কালে মনে করা হয় যে মনোবৈকল্যের পিছনে একটি জটিল কারণতত্ত্ব বিদ্যামান । জৈব-রাসায়নিক , মনোসামাজিক এবং সমাজ - সংস্কৃতিমূলক বিবিধ কারণের যৌথ ক্রিয়ার ফলেই মনোবৈকল্যের উৎপত্তি হয়। সুতরাং মনোবৈকল্য চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের সম্মিলিতভাবে একটি সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজন হয়। এই উদ্দেশ্যেই মনোরোগ চিকিৎসার জন্য সাধারণতঃ একটি চিকিৎসামূলক দল গঠন করা হয়। এ ধরনের চিকিৎসামূলক দলে একজন সাইকিয়াট্রিস্ট, একজন চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী , একজন সমাজকর্মী ও একজন মনোরোগ সম্পর্কে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত

---

[150] সমীক্ষা, জার্নাল অফ ইন্ডিয়ান সাইকো-অ্যানালাইটিক্যাল সোসাইটি, এডিটেড বাই এস, ছি মিত্র, ভলিউম-২, নং-৩, ইজ সাইকো-অ্যানালাইটিক প্রসিডিউর সাইন্টিফিক, ক্যালকাটা, ১৯৪৮, পৃ- ২৫৬

[151] সমীক্ষা, জার্নাল অফ ইন্ডিয়ান সাইকো-অ্যানালাইটিক্যাল সোসাইটি, এডিটেড বাই জি, বোস, ভলিউম-২, নং-২, অ্যা নিউ থিওরি অফ মেন্টাল লাইফ, ক্যালকাটা, ১৯৪৮, পৃ- ১০৮

[152] সরকার নিহার রঞ্জন , সরকার তনুজা; অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান মানসিক ব্যধির লক্ষণ কারন ও আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি, জ্ঞানকোষ প্রকাশন ,ঢাকা ২০০২, পৃষ্ঠা ৫৫

নার্স থাকেন। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞগণ তাঁদের নিজ নিজ প্রশিক্ষণ অনুসারে বিভিন্নভাবে একজন মানসিক রোগীর সমস্যা সমাধানে সহায়তা করেন । এক্ষেত্রে একজন চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানীর কাজ হচ্ছে রোগীর মন মানসিকতা মূল্যায়ন করা এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে রোগীর ব্যক্তিত্বের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা করা ।

**মনোচিকিৎসা পদ্ধতির প্রকৃতি** - পদ্ধতিগতভাবে মনস্তাত্ত্বিক নীতি ও কৌশল প্রয়োগ করে মানসিক রোগী বা সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির মন মানসিকতা পরিবর্তনের মাধ্যমে মনোরোগ নিরাময় করা বা ব্যক্তির অপসঙ্গতি দূর করার প্রক্রিয়াকেই মনোচিকিৎসা পদ্ধতি বলা হয় । নিজের সম্পর্কে ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সম্পর্কে রোগীর বা সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির ভ্রান্ত ধারণা দূর করা , তার ব্যক্তি - পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়ন সাধন করা, তার সামাজিক দক্ষতা ও কর্ম দক্ষতার উন্নতি সাধন করা , তার দ্বন্দ্ব , হতাশা ও উদ্বেগের নিরসন করা , প্রভৃতি উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন মনোচিকিৎসামূলক কৌশল ও পদ্ধতি প্রয়োগ করেন।

তবে যে ধরনের মনোচিকিৎসামূলক কৌশলই প্রয়োগ করা হোক না কেন , তা ফলপ্রসূ হওয়ার জন্য রোগীর নিজ পক্ষ থেকে সুস্থ হওয়ার তাগিদ থাকা প্রয়োজন । রোগীর সুস্থ হওয়ার তাগিদ অবশ্যই মনোরোগ চিকিৎসায় একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি রূপে । কাজ করে । মনোররাগের কষ্ট ভোগ স্বভাবতই রোগীর মধ্যে এ তাগিদ সৃষ্টি করে । তবে এই তাগিদটাকে কাজে লাগাবার জন্য রোগীর পূর্ণ সহযোগিতার প্রয়োজন হয় এবং রোগী ও চিকিৎসকের মধ্যে স্থাপিত অন্তরঙ্গ সম্পর্কের ওপর এই সহযোগিতা লাভের সম্ভাবনা নির্ভর করে। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় রোগী ও চিকিৎসকের মধ্যকার এই অন্তরঙ্গ সম্পর্ককে ইংরেজীতে “ রাপোর্ট " বলা হয় । রোগী ও চিকিৎসকের মধ্যে এই হৃদ্যতামূলক সম্পর্ক বা র্যাপোর্ট স্থাপনের ফলেই রোগী চিকিৎসকের প্রতি আস্থাশীল হয় , তার সাথে একাত্মবোধ করে ও তাকে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করে ।

রোগীর সাথে চিকিৎসকের ঘনিষ্ট ও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপনের ফলে রোগীর মনে। অবরুদ্ধ হয়ে থাকা আবেগগুলোর বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে । উল্লেখ্য যে এই অবরুদ্ধ আবেগগুলোই রোগীর মনকে ভারাক্রান্তকরে রাখে । ফলে এগুলোর বহিঃপ্রকাশ ঘটলেই রোগীর মন হালকা হয় এবং তা মনোরোগ নিরাময়ে সহায়তা করে ।

মনোচিকিৎসা প্রক্রিয়ার উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রায় সব মনোচিকিৎসা পদ্ধতিতেই রয়েছে । তবে মনোচিকিৎসার বিভিন্ন উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের জন্য বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন রকমের কৌশল ও পদ্ধতিগত প্রক্রিয়ার অবতারণা করেন। সে দিক দিয়ে বহু রকমের মনোচিকিৎসা পদ্ধতি বর্তমানে প্রচলিত রয়েছে। এ অধ্যায়ে সংবেশন পদ্ধতি , মনোসমীক্ষণ পদ্ধতি ও মক্কেল - কেন্দ্রিক পদ্ধতি আলোচনা করা হল।

## আচরণ চিকিৎসা

আচরণ চিকিৎসা মানসিক রোগ চিকিৎসার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি । বর্তমানে মানসিক রোগের ১২ % এ পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হয় । আচরণ চিকিৎসার উন্নয়নের পেছনে সর্বপ্রথম অবদান রাখেন সেল্টার, ওলপে, ল্যাজারাস প্রভৃতি মনোচিকিৎসকগণ[153] । মন : সমীক্ষণ - এর মতো পদ্ধতিগুলোর সাথে আচরণ চিকিৎসা পদ্ধতির একটি মৌলিক পার্থক্য আছে । অন্যান্য পদ্ধতিতে যেমন রোগের কারণ খুঁজে বের করে তার সমাধানের চেষ্টা করা হয়। এ পদ্ধতিতে লক্ষণগুলোকে অপসারণের চেষ্টা করা হয় । এছাড়া উপযোজনের সমস্যা থেকেও অস্বাভাবিক আচরণ সৃষ্টি হয়। নতুন পরিবেশে সুন্দরভাবে উপযোজন করানোর মধ্য দিয়ে রোগের লক্ষণ অপসারণের চেষ্টা করা হয় [154] ।

## মক্কেলকেন্দ্রিক মনোচিকিৎসা ,

মানসিক রোগের চিকিৎসায় "মক্কেল কেন্দ্রিক মনোচিকিৎসা" পদ্ধতি বর্তমানে বহুল প্রচলিত। এ পদ্ধতিতে রোগীকে সরাসরি অভিভাবন দেয়া হয় না। এ পদ্ধতিটি প্রখ্যাত আমেরিকান মনোবিদ কার্ল রজার্স-এর মতবাদ কে অনুসরন করে বাংলার চিকিৎসক গণ এই পদ্ধতি মানসিক রোগীদের উপর প্রয়োগ শুরু হয়। প্রবৃত্তিগতভাবেই মানুষ আসচেতন এবং সে তার নিজের সমস্যা নিজেই সমাধান করতে চায়। সুতরাং ব্যক্তির উচিত তার নিজ সমস্যার সমাধানের জন্য আ সমালোচনা করা , আ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা । কার্ল রজার্স বলেছেন যে ব্যক্তির কোন সমস্যাকে যদি বাইরে থেকে সমাধান দেয়া হয় এবং সে সমাধান যদি তার আ সমাধানের সাথে বিপরীত হয় তবে তা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে । এক্ষেত্রে চিকিৎসকের ভূমিকা অনেকটা পরোক্ষ হওয়ায় এ পদ্ধতিকে অপ্রত্যক্ষ চিকিৎসা পদ্ধতি বলে । আবার একে মক্কেলকেন্দ্রিক পদ্ধতিও বলে ।

---

[153] সমীক্ষা, জার্নাল অফ ইন্ডিয়ান সাইকো-অ্যানালাইটিক্যাল সোসাইটি, এডিটেড বাই এস, ছি মিত্র, ভলিউম-২, নং-৩, ইজ সাইকো-অ্যানালাইটিক প্রসিডিউর সাইন্টিফিক, ক্যালকাটা, ১৯৪৮, পৃ- ২৪৮

[154] আহমেদ, মঞ্জুর ; অস্বাভাবী মনোবিজ্ঞান, জ্ঞানকোষ প্রকাশন ,ঢাকা,২০০১, পৃষ্ঠা ২৬৮

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এ পদ্ধতির কয়েকটি ধাপ এরূপ- (ক) প্রথমে মক্কেল তার নিজ সমস্যার সমাধান করতে থেরাপিস্ট - এর কাছে আসে এবং এর সমাধানের জন্য তার সাহায্য কামনা করে । থেরাপিস্ট তার সমস্যার কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেন এবং তার সমস্যা সমাধানের জন্য মক্কেলের আসহায়তা করেন। অস্বাভাবিক আচরণের পশ্চাতের কারণ অনুধাবন করে। থেরাপিস্ট তার মক্কেলকে এমনভাবে সহায়তা করতে থাকেন যাতে তার মধ্যে অন্তর্দর্শনের পুনর্জাগরণ হয় । এরূপ ক্ষেত্রে তিনি ঐ বিশেষ সমস্যাটি নিয়ে আলোচনা না করে বরং অন্য কোন বিষয়ের উদাহরণ দিয়ে মক্কেলের আশক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করেন ।

**দলগত চিকিৎসা -**

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এদেশে মানসিক রোগীর সংখ্যা ব্যাপক হারে বেড়ে যায় । ফলে স্বল্প সংখ্যক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মনোচিকিৎসকের পক্ষে এই বিপুল সংখ্যক রোগীদের এককভাবে চিকিৎসা করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে । এই সমস্যা সমাধানের জন্য মনোচিকিৎসকগণ সাময়িকভাবে দলগত চিকিৎসা প্রণালী প্রচলন করেন । অর্থাৎ একজন চিকিৎসক একজন রোগীকে এককভাবে চিকিৎসা করার পরিবর্তে একদল রোগীকে দলবদ্ধভাবে চিকিৎসা করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন । এর ফলে একজন চিকিৎসক একই সঙ্গে বহু সংখ্যক রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারেন। সুতরাং এক বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই দলগত চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রচলন ঘটে । কিন্তু অচিরেই পরিলক্ষিত হয় যে এরূপ চিকিৎসা ব্যবস্থার কতকগুলো সুবিধাজনক বৈশিষ্ট্য আছে , যা একক চিকিৎসা প্রণালীতে নেই এবং কোন কোন রোগীর ক্ষেত্রে দলগত চিকিৎসা পদ্ধতিই অধিক ফলপ্রসূ হতে দেখা যায় । ফলে তখন থেকেই একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি রূপে দলগত চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহৃত হতে থাকে।

আধুনিক মনোচিকিৎসায় দলগত চিকিৎসা পদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । এ পদ্ধতিতে দুই বা ততোধিক রোগীকে একত্রে চিকিৎসা করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে একই সাথে একাধিক চিকিৎসকও অংশগ্রহণ করতে পারে। একটি চিকিৎসা দলে সাধারণত ৬ থেকে ১২ জন রোগী অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং তারা প্রতি সপ্তাহে একাধিক বার চিকিৎসকের সাথে মিলিত হতে পারে। তবে , দলগতভাবে ব্যবহার করতে হলে এসব পদ্ধতির উদ্দেশ্য , কৌশল ও প্রয়োগ পার্থক্য থাকবে। দলগত মনোচিকিৎসা পদ্ধতি নানা রকমের হতে পারে [155] । যেমন :

[155] আহমেদ, মঞ্জুর ; অস্বাভাবী মনোবিজ্ঞান, জ্ঞানকোষ প্রকাশন ,ঢাকা,২০০১, পৃষ্ঠা ২৯৩

**সাক্ষাৎকারমূলক দলগত চিকিৎসা:** সাক্ষাৎকারমূলক দলগত চিকিৎসা পদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন মনোচিকিৎসকগণ। এ পদ্ধতিতে বেশ কিছু রোগীকে একই সাথে বসিয়ে স্বাধীনভাবে আলাপ - আলোচনা করতে দেয়া হয় , এতে তারা মুক্তভাবে নিজেদের অবচেতন প্রেষণা ও আবেগ, ইচ্ছা , অনুভূতি, টিলতা , অবান্তর কল্পনা ইত্যাদি দ্বিধাহীনভাবে প্রকাশ করতে পারে [156] ।

**মনোচিকিৎসা মূলক দল**

হাসপাতালে বিশেষ বিশেষ রোগীকে উদ্দেশ্য করে তাদের জন্য মনোচিকিৎসামূলক দল গঠন করা হয়। এসব দলের রোগীদের সাথে সাথে স্বাভাবিক হাসপাতালকর্মী ও নার্স এমনকি চিকিৎসকও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

**খেলাভিত্তিক চিকিৎসা**

খেলাভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতি মনোচিকিৎসার একটি অন্যতম ব্যবহারিক পদ্ধতি । এ পদ্ধতিতে মানসিক রোগের কারণ উদঘাটন এবং রোগের চিকিৎসাও করা যায় । সে অর্থে খেলাভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতিটি একদিকে যেমন একটি চিকিৎসা পদ্ধতি , অন্যদিকে এটি রোগ নির্ণয় পদ্ধতি হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে আসছে। শিশুদের মানসিক রোগ বা মানসিক সমস্যা সমাধানের জন্য অন্যান্য পদ্ধতিগুলোর চেয়ে এর কার্যকারিতা কিছুটা হলেও বেশি [157] । অবচেতন মনের অনেক অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা তারা খেলার মাধ্যমে প্রকাশ করে ।খেলার মধ্যে তারা তাদের নিজ জীবনের ও পারিবারিক পরিবেশের বিশেষ বিশেষ অংশগুলোকে প্রতিফলিত করে ।

**অকুপেশনাল থেরাপি**

১০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গ্রিক চিকিৎসক অ্যাসক্লিপিয়াডস মানসিক রোগে আক্রান্ত রোগীদের মানবিকভাবে থেরাপিউটিক স্নান, ব্যায়াম এবং অকুপেশনাল থেরাপি ব্যবহার করে চিকিৎসা করেছিলেন। নৈতিক চিকিৎসার যুগে ইউরোপে, ফিলিপ পিনেল এবং জোহান ক্রিশ্চিয়ান রিলের মতো চিকিৎসকরা হাসপাতাল ব্যবস্থার সংস্কার করেছিলেন এক্ষেত্রে মানসিক চিকিৎসার জন্য তাঁরা অকুপেশনাল থেরাপি উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন । এই পদ্ধপ্তি অনুসরন করে ঔপনিবেশিক অধ্যায়ে বাংলার বিভিন্ন উন্মাদ আশ্রম ও পরবর্তী কালে মানসিক হাসপাতাল গুলিতে অকুপেশনাল থারাপি চালু করা হয়।

---

[156] সইফুদ্দিন, কাজী ; অস্বাভাবিক ও চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান , আবীর পাবলিকেশন , ঢাকা, ২০০৬, পৃষ্ঠা ২৯২

[157] তদেব, পৃষ্ঠা ২৯৮

অকুপেশনাল থেরাপি মনোচিকিৎসায় একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও অধিক ব্যবহৃত পদ্ধতি , ঔপনিবেশিক আমলে প্রতিটি উন্মাদ আশ্রমে এই পদ্ধতি চিকিৎসার ক্ষেত্রে খুব সাড়া ফেলেছিল। পরবর্তী কালে এই পদ্ধতি মনোচিকিৎসায় অধিক জনপ্রিয় ও উন্নত হয়ে উঠে । বৃত্তিমূলক চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমেও মানসিক রোগের চিকিৎসা করা হয় । অনেক সময় এ পদ্ধতিকে অন্য কোন পদ্ধতির সহযোগী হিসেবেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে । মানসিক রোগ নিরাময় করার পর পুনর্বাসনের প্রয়োজন হয় । কোন কোন ক্ষেত্রে এরূপ পুনর্বাসন বৃত্তিমূলক চিকিৎসা পদ্ধতির অনুরূপ হয়[158]। বৃত্তিমূলক চিকিৎসা পদ্ধতিতে সঠিকভাবে রোগ নির্ণয়ের পর সে অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় । ব্যক্তি যদি কোন কাজে নিয়োজিত থাকে এবং সে কাজ যদি তার যোগ্যতার সাথে সংগতিপূর্ণ হয় তাহলে কাজ করে তার তৃপ্তি আসবে । ফলে তার উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তাগুলো অনেকাংশে দূর হয়। তাছাড়া যথাযথভাবে কাজে নিবৃত্ত হতে পারলে ব্যক্তির আচরণে শৃংখলাও ফিরে আসে। মানসিক রোগী ধীরে ধীরে তার প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ করে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নিজেকে উপযোজন করে সুস্থ হয়ে উঠে ।

## সামাজিক চিকিৎসা

সামাজিক চিকিৎসার দ্বারাও মানসিক রোগের উপশম করা হয়। এ পদ্ধতির কর্মকান্ড সামাজিক উপাদানকে ঘিরে পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে সামাজিক পরিবেশকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যাতে মানসিকভাবে অসুস্থ রোগী তার সামাজিক উপযোজনকে আরো অর্থবহ ও কার্যকরী করতে সক্ষম হয়। এবং নিজেও এ পরিবেশের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়। মনোচিকিৎসক সমাজকর্মীরা রোগীর সামাজিক পরিবেশ ও বস্তুগত পরিবেশকে এমনভাবে উপস্থাপন করে যাতে রোগী তার উপযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারে[159]।যেমন মানসিক রোগ যে পরিবেশে সৃষ্টি হয়েছে রোগীকেসেই পরিবেশ থেকে আলাদা করেঅন্য একটি প্রত্যাশিত স্বাভাবিক পরিবেশে পুন:স্থাপন করা। পারিবারিক বা সামাজিক পরিবেশের যে বিশেষ উপাদানটি এ অস্বাভাবিকতা সৃষ্টির জন্য দায়ী সে উপাদানটিকে অপসারণ বা পরিবর্তন করে পরিবেশের স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনা।

---

[158] তদেব, পৃষ্ঠা ২৯৯

[159] সইফুদ্দিন, কাজী ; অস্বাভাবিক ও চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান , আবীর পাবলিকেশন , ঢাকা, ২০০৬, পৃষ্ঠা ৩০০

## উন্মাদ চিকিৎসার বিবর্তন রূপ – মডেল চিত্র

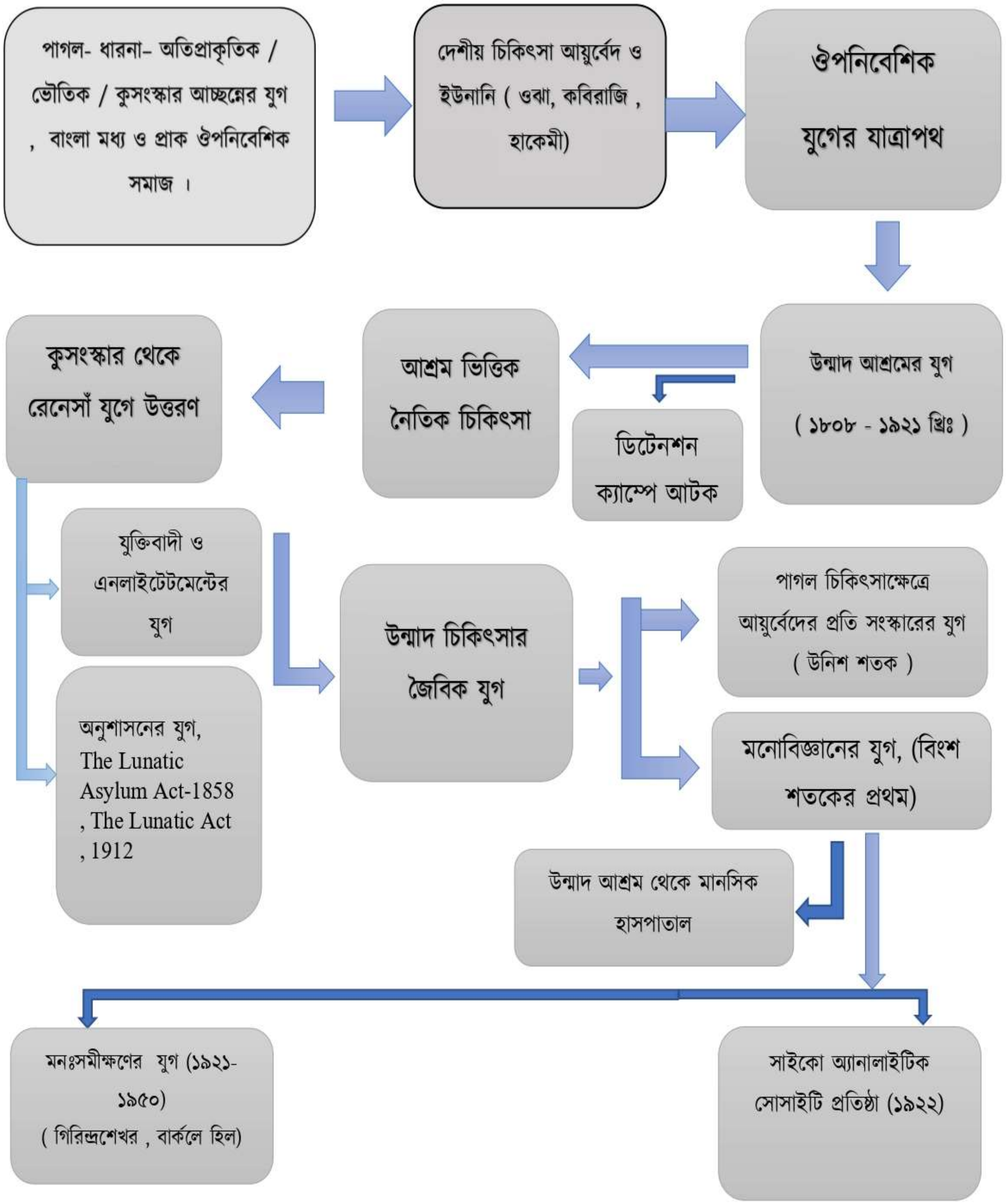

# বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি

উনিশ শতকের বাংলার উন্মাদরোগ চিকিৎসা ব্যবস্থার স্বরূপ নির্ণয়ের বিষয়টি ঐতিহাসিক ও ব্যবহারিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই ভীষণভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ , চিকিৎসাব্যবস্থার ইতিহাসের পট-পরিবর্তনের ক্ষেত্রে উনিশ শতকের বাংলা ছিল নিঃসন্দেহে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আলোচ্য শতকেই বাংলায় পাগল চিকিৎসায় ঐতিহ্যবাহী আয়ুর্বেদ তার পূর্বগৌরব ফিরে পায় , এবং সরকারি ও বেসরকারিভাবে দুটি পশ্চিমী চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রচলিত হয় । এছাড়াও মানসিক স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বহুবিধ প্রতিষ্ঠান (যেমনঃ বঙ্গীয় উন্মাদ আশ্রম ) এবং ফলে আয়ুর্বেদ চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে ঘটে গেছিল একাধিক যুগান্তকারী ঘটনা । অথচ বহু ঐতিহাসিক ও গবেষক নবজাগরণের ঐতিহ্যমন্ডিত বাংলার সামাজিক , অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক , ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাদের অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেও দেশীয় চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রেক্ষিত সম্পর্কে তারা ছিলেন বিশেষভাবে উদাসীন । কিছু কিছু গবেষক বিক্ষিপ্তভাবে পশ্চিমী চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ে উৎসাহ প্রদর্শন করলেও সনাতনী চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কে তারা ছিলেন আশ্চর্যজনক ভাবে নীরব । অথচ নবগঠিত সামাজিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এই শূণ্যতা পূরণের উদ্দেশ্যে দেশী ও বিদেশী দুধরনের চিকিৎসা ব্যবস্থারই তুলনামূলক বিশ্লেষণ একান্তভাবে জরুরী ।

ইতিমধ্যে কোম্পানির নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রাচ্যবাদী ও পাশ্চাত্যবাদী মতপার্থক্য বেশ জোরালো হয়ে উঠে। পরিস্থিতির মোকাবিলার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় চিকিৎসক তৈরীর জন্যে দেশীয় চিকিৎসাবিদ্যা ও পশ্চিমী চিকিৎসাবিদ্যা এই দুটির কোনটিকে বেছে নেওয়া হবে , এই বিতর্কের সমাধান হিসেবে পশ্চিমী চিকিৎসাবিজ্ঞানকেই বেছে নেওয়া হলে লর্ড বেন্টিঙ্ক একটি আদেশ জারী করে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে দেশীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান চর্চা নিষিদ্ধ করলেন। ফলে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের সমন্বয়ে যে মিশ্র চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে ওঠার ক্ষীণ সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হল। সেক্ষেত্রে এধরনের উদ্যোগ পুনরায় গড়ে ওঠার জন্য ভারতবাসীকে আরো প্রায় একশ বছর অপেক্ষা করতে হল [160] ।

---

[160] পাহারী , সুব্রত ; উনিশ শতকের বাংলার সনাতনী চিকিৎসা ;,প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স , কোলকাতা, ১৯৯৭ পৃষ্ঠা – ২১৮ ।

উপরন্তু ঔপনিবেশিক চিকিৎসক , গবেষক ও স্বাস্থ্যকর্মী বিশেষভাবে ব্যস্ত থাকত আয়ুর্বেদীয় ভেষজ তালিকা থেকে মূল্যবান ভেষজগুলির নাম সংগ্রহ করে গবেষণার মাধ্যমে তার ঔষধি গুণ যাচাই করে ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করছিল এবং এই সমস্ত কাঁচামাল ইউরোপে রপ্তানির মাধ্যমে ওষুধপত্র তৈরী করে চড়া দামে ভারতের বাজারে বিক্রি করা শুরু করে । কিন্তু যে মূল্যবান আয়ুর্বেদশাস্ত্রের অনুদানে ব্রিটিশ চিকিৎসা সমৃদ্ধ হয়ে উঠল , সেই আয়ুর্বেদের উন্নতি ও চর্চা সংক্রান্ত সব রকমের স্বদেশী অনুরোধ উপরোধ অগ্রাহ্য করে ইংরেজ সরকার চরম অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছিল ।

উদ্দেশ্য প্রণোদিত দেশীয় চিকিৎসা কে অবজ্ঞা বাংলার আয়ুর্বেদ চিকিৎসকদের আত্মসম্মানে চরম আঘাত হেনেছিল । আয়ুর্বেদের এই চরম অপমানের প্রতিশোধ নিতে তারা দ্বিগুণ উৎসাহে আয়ুর্বেদের পুনরুজ্জীবনে ব্রতী হলেন । কলকাতায় কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন এবং মুর্শিদাবাদে আচার্য গঙ্গাধর রায় বাংলায় একের পর এক দিকপাল কবিরাজ প্রস্তুত করতে লাগলেন নানবিধ ঔষধ। তারা আয়ুর্বেদের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে বাংলায় ও বাংলার বাহিরে বহু আয়ুর্বেদ চিকিৎসাকেন্দ্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে বিনামুল্যে আয়ুর্বেদশাস্ত্র মতে চিকিৎসা ও আয়ুর্বেদ শিক্ষা দিতে লাগলেন, এরই সাথে সাথে প্রতিষ্ঠা করলেন আয়ুর্বেদীয় ফার্মেসী ও পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থ প্রকাশনা কেন্দ্র । শুধু তাই নয় , আয়ুর্বেদের উন্নতির জন্য তারা বিতর্ক সভার আয়োজন করে শ্রেষ্ঠ বক্তাকে পুরস্কৃত। করে উৎসাহ দিতে লাগলেন। এইভাবে আয়ুর্বেদ প্রেমীদের ব্যাপক প্রচেষ্টায় সমগ্র উনিশ শতকের বাংলায় আয়ুর্বেদে নবজাগরণের যে জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল এবং উন্মাদ রোগ চিকিৎসায় ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছিল। এক কথায় উনিশ শতকের বাংলার আয়ুর্বেদের পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে যে ব্যাপক স্বদেশী প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছিল।

এছাড়াও উন্মাদ রোগের সনাতনী চিকিৎসার ইতিহাস পুনর্গঠনের ব্যবহারিক উপযোগিতা অপরিসীম , ব্রিটিশ ভারতের প্রায় শতকরা আশি ভাগেরও বেশি লোকজন ছিল দেশীয় চিকিৎসা ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল ।এর প্রধান কারণ হল দেশীয় প্রজাদের কাছে পশ্চিমী চিকিৎসাবিজ্ঞানের সুফল পৌছে দেওয়ার ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক সরকারের আন্তরিকতার অভাব। এক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক সরকার ভারতীয় রক্ষণশীলতার দোহাই দিয়ে বিষয়টি এড়িয়ে যেতে চাইলেও আসলে বেনিয়া সরকার লাভ লোকসানের অঙ্ক মেলাতেই ছিল ভীষণভাবে ব্যস্ত । নিতান্ত বাধ্য না হলে সরকার এদেশীয় সম্পদের কণামাত্র দেশীয় প্রজাদের জন্য ব্যয় করতে চাইত না ।

চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রাচ্য রক্ষণশীলতার বিষয়টিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য না করেও বলা চলে যে , পশ্চিমী চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রসারে ভারতীয় রক্ষণশীলতা আদৌ কোন জোরালো প্রতিবন্ধকতা গড়ে তুলতে পারেনি। কারণ , রোগব্যাধির কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার বাসনাই মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি , এক্ষেত্রে দেশী কিংবা বিদেশী বাদানুবাদ নিতান্তই অযৌক্তিক [161] ।

তবে নিরপেক্ষ বিচারে এদেশে পশ্চিমী চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রচলনের সুফলকে একেবারেই অগ্রাহ্য করা চলে না। কারণ পশ্চিমী চিকিৎসাবিজ্ঞানগত প্রযুক্তির সাহায্যে জনস্বাস্থ্য পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে বাংলার জনস্বাস্থ্য কিছুটা নিরাপত্তা লাভ করেছে এবং এদেশীয় মারাত্মক মহামারীগুলির মোকাবিলায় সেগুলি প্রধান প্রধান হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে। এছাড়া ভারতের চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রচলিত সনাতনী রক্ষণশীলতা , অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের ভিত্তি অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। উপরন্তু এরফলে সনাতনী চিকিৎসাও আন্তর্জাতিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা লাভ করেছে । ব্রিটিশ শাসনে জনস্বাস্থ্য রক্ষা ও রোগব্যাধির মোকাবিলার উদ্দেশ্যে যে পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছিল, পরবর্তীকালে সরকারের সঠিক স্বাস্থ্যনীতি রচনার ক্ষেত্রে তা প্রধান নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করেছে । এছাড়া সনাতনী চিকিৎসা বিজ্ঞানকে উন্নত করে তোলার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত পশ্চিমী প্রযুক্তি যে পশ্চিমী চিকিৎসাবিজ্ঞানেরই হাত ধরেই এদেশে এসেছে , তা কোনভাবেই অস্বীকার করা চলে না ।

ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকগণ উপনিবেশ ব্যবস্থার প্রণয়নে পাশ্চাত্য চিকিৎসার ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তারা দেখিয়েছেন পশ্চিমী চিকিৎসা সাম্রাজ্যের যন্ত্র হিসেবে সাগরপারে ঔপনিবেশিক আধিপত্য বিস্তারে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল ( বিশ্বময় পতি ও মার্ক হারিসন, ২০০১), যার একটি অন্যতম পদক্ষেপ ছিল লুনাটিক অ্যাসাইলাম প্রতিষ্ঠা ও পাগল চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়। ঔপনিবেশিক মতাদর্শের প্রেক্ষিতে আমরা জানতে পারি চিকিৎসা ব্যবস্থা ইউরোপের নৈতিক উৎকর্ষতার দাবিকে এবং সভ্য করার ব্রতের নামে উপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার উপলব্ধ বৈধতাকে কীভাবে বিশ্বাসযোগ্যতা দান করার চেষ্টা করেছিল ( ডেভিড আর্নল্ড , ১৯৮৮ ; ওয়াল্ট্রড আর্নস্ট , ১৯৯৭)। এটা স্পষ্ট যে পেশাদার চিকিৎসক সমাজ এবং উপনিবেশগুলির উপনিবেশিক প্রশাসকেরা উভয় তরফেই ইউরোপীয় চিকিৎসাকে উপনিবেশের দক্ষতার তথ্য

---

[161] পাহারী , সুব্রত ; উনিশ শতকের বাংলার সনাতনী চিকিৎসা ;,প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স , কোলকাতা, ১৯৯৭ পৃষ্ঠা – ২১৯ ।

অমূল্য অবদান হিসেবে উপস্থিত করা হয়েছে । উপনিবেশিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলি পাশ্চাত্যের মেধা ও নৈতিক শক্তির ভিত্তির চিহ্ন হয়ে উঠেছিল এবং কখনো কখনো ইউরোপীয় ডাক্তারদের সাম্রাজ্যের একমাত্র অজুহাত স্বরূপ ব্যবহার করা হত ।

ঔপনিবেশিক নয়া ইতিহাস সামাজিক নির্মাণবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে , নিজেদেরকে সংশয়াতীত ভাবে পূর্বের চিরাচরিত বর্ণনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে যা ঔপনিবেশিক মেডিসিনের ইতিহাসকে পাশ্চাত্যের উন্নয়ন ও যুক্তিবাদের ক্রমোন্নয়ন ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রমাণস্বরূপ চিত্রিত করে । এই ঔপনিবেশিক ইতিহাস নিজেই পরীক্ষিত হয় উত্তর উপনিবেশিক ও নিম্ন-বর্গ ঘরানার জ্ঞান-চর্চার দ্বারা এবং প্রমানিত হয় প্রকৃত সত্য কিভাবে আড়াল হয় । ঔপনিবেশিকতা নির্মাণে মেডিসিনের জবানি সমূহের আধিপত্য বিস্তারকারী ক্ষমতা ও ভাবাদর্শের ভূমিকার চেয়েও একটি বি-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন ছিল , যেটি নিুবর্গের প্রতিক্রিয়া এবং উপনিবেশের মানুষ ও প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলির প্রতিরোধের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। পরন্তু ঔপনিবেশিক মেডিসিন জোরালোভাবে ঘোষণা করেছিল , পাশ্চাত্য উপনিবেশিক মেডিসিন আলঙ্কারিকভাবে বিকশিত হলেও তা প্রকৃতপক্ষে উপনিবেশের প্রজাদের উন্নততর স্বাস্থ্য পরিষেবা ও সর্বশ্রেষ্ঠ নিরাময়দক্ষতা প্রদানে ভীষণভাবে ব্যর্থ। (আর্নস্ট, ১৯৯১)। উল্লেখযোগ্যভাবে , দেশজ চিকিৎসাশাস্ত্র ও লোকচর্চার শক্তি ও স্বতঃস্ফূর্ততা এবং ঔপনিবেশিক উপায়ে নিরাময় এবং রোগীদের শরীর ও মনের উপর আধিপত্যের বিরুদ্ধে মানুষের সফল প্রতিরোধ নব্য উত্তর ঔপনিবেশিক ইতিহাসচর্চার ও বিজ্ঞানের ইতিহাসসমূহের গুরুত্বপূর্ণ দিক হয়ে উঠেছে ।

যা হোক ,বাংলায় উন্মাদ রোগ চিকিৎসার যা নিয়ে অধুনা উপনিবেশিক চিকিৎসা, উত্তর ইতিহাস এবং পূর্বতন, প্রগতিশীলতাবাদী, ঐতিহ্যাশ্রয়ী ধারণা কাঠামো উভয়েই একই ধরনের ধারণা পোষণ করে, সেটাকে যত্ন নিয়ে জানা বোঝার প্রয়োজনীয়তা আছে। আপাতদৃষ্টিতে সুস্পষ্টভাবে দ্বি - বিভাজিত ক্যাটিগরির ওপর নির্ভরতা , যেমন ঔপনিবেশিক মেডিসিন ' ( যাকে ধরে নেওয়া হয় বিজ্ঞান - নির্ভর হিসেবে ) বনাম দেশজ চিকিৎসা (রক্ষণশীল ও ঐতিহ্য নির্ভর বলে থাকে গণ্য করা হয় ) -এর মতো সর্বত্র বিরাজমান যুগ্মতা , বর্তমান সময়েও উপনিবেশ ও উত্তর উপনিবেশ প্রেক্ষাপটে বাংলার উন্মাদ রোগ চিকিৎসার ইতিহাস বহু আখ্যানকেই দৃঢ়বদ্ধ করে ।

উনিশ শতকে বৈজ্ঞানিক ও ঔপনিবেশিক প্রতর্কের ( ডিসকোর্স ) সর্বগ্রাসী ক্ষমতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহেরই অবকাশ নেই । এর স্থায়ী প্রবহমান উত্তরাধিকার বর্তমান কালেও একাডেমিক ও রাজনীতির প্রতর্ককে জ্ঞানবান করে চলেছে । এর সবচেয়ে অস্বস্তিকর রূপ দেখতে পাওয়া যায় সভ্যতার সংঘর্ষ এবং প্রাচ্য বনাম পাশ্চাত্য - ধর্মী বয়ানের সাম্প্রতিক পুনরুজ্জীবন । তবুও দেশীয় ঐতিহ্যের চমকপ্রদ ব্যাপারটি হচ্ছে পাগল চিকিৎসায় আয়ুর্বেদের অসাধারণ সাফল্য , যদি আমরা বিজ্ঞান ও ঔপনিবেশিকতা সেই বয়ানে একমত হই যে ভারতীয় রোগী ও সমাজের বিভিন্ন স্তর এবং বিভিন্ন মতাবলম্বীদের থেকে মৌখিক সমর্থন পেয়েছিলেন , ব্রিটিশ জনসাধারণ এবং গণমাধ্যমের বড় অংশ যেমন প্রভাবিত ছিল । এমন কি পাগল চিকিৎসার আয়ুর্বেদ পদ্ধতিকে তারা মনে মনে গ্রহন করেছিল ।

কাজেই বোঝা যায় , ঔপনিবেশিক চিকিৎসা সাধারণত বাগাড়ম্বর (থিওরেটিক) প্রতর্কের ভিত্তিতে অতিরিক্ত মনোযোগ নিয়ে দেশীয় চিকিৎসাবিদ্যাকে যেমন প্রান্তিক ও অগোঁড়া ' বলে মনে করতে বাধ্য করে , কিন্তু আসলে তখন সেটি এমনটি ছিল না । আয়ুর্বেদ চিকিৎসাবিদ্যার অগোড়া ও অ - বৈজ্ঞানিক স্বভাব ও বিজ্ঞানের বিজয়লাভের গল্পটির পাশাপাশি এক সমান গুরুত্বের কাহিনি উঠে আসে , বিজ্ঞানের বিবাদীসুলভ চরিত্র এবং মনোচিকিৎসার বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্য ( আর্নস্ট , ২০০১ ) । পশ্চিমী বিজ্ঞানের এবং এর দ্বি-প্রতিপক্ষ ( binary opposition ) চিত্র ও ভারতীয় বিশ্বাস যেন উপনিবেশিক মানসিক ধরনের আবিষ্কার ও কল্পনা, যার সাংস্কৃতিক ও মতাদর্শগত অস্তিত্বের যুক্তি আহরিত হয়েছিল। আদর্শবশে ধরে নেওয়া ( রফবধষ ) এবং আদর্শায়িত ( idealized ) কল্পিত পশ্চিমী বিজ্ঞান ও একইরকমভাবে আদর্শায়িত দেশজ বিশ্বাস এবং আদিম চিকিৎসা - কে পাশাপাশি স্থাপন করে । এই সমস্তমতের উপাক্ষপিতা এবং যত্রতত্র গ্রহণ ও সম্পূর্ণ মনোযোগ দানের বিপদ উভয়ই অবস্থান করে তাদের সাধারণীকরণের চরিত্রের সুবিধে করে নেবার উপর যা উপনিবেশিক ও মনোচিকিৎসাশাস্ত্রের অভিজ্ঞতার জটিলতাকে সরলীকরণ ও সমস্বত্ততা আনায় সাহায্য করে।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমাদের মনে উঠে আসে সেটি হল কর্তৃত্ব সম্পর্কে : প্রশ্ন হল কে ন্যূনতম নয় কিংবা কে নির্ধারণ করে কোনটা বিজ্ঞান রূপে গৃহীত হবে আর কোনটা অবিজ্ঞান? কোনটা গোঁড়ামো আর কোনটা অগোড়ামো , সঠিক মেডিসিনের হিসেবে নাকি শুধুই যাদু ও ধর্ম

হিসেবে ? কোন প্রমাণ বিশ্বাস করা উচিত আর কার গল্প বলা হবে ? ভারতে পাগল চিকিৎসার কাহিনি কি একটি অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির নেটিভ হওয়ার গল্প নাকি এক সময়ের বিজ্ঞানেরই এক জনপ্রিয় অথচ বিতর্কিত শাখার গল্প ? ঐতিহাসিকদের কাছে এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা এবং তর্ক ও বয়ানের উপর নির্ভরশীল একপেশে প্রমাণ ও ব্যাখ্যার বিপদ সম্পর্কে অবগত থাকা গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্য প্রয়োজন এক সংহতি-মুখী দৃষ্টিভঙ্গী তৈরি করার উপায় যা সর্বস্তরের বিশ্লেষণকে আলোচনায় প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

বিংশ শতাব্দীর ঊষালগ্নে ঔপনিবেশিক কলকাতার ভদ্রলোক তথা এলিট ( elite ) শ্রেণির কাছে মনঃসমীক্ষণ ( psycho - analysis ) বিষয়টি বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল , তারা মনঃসমীক্ষণের ধারণা ও প্রয়োগের সঙ্গে বাঙালি সমাজের চিন্তাভাবনা ও নিরাময় পদ্ধতির এক সৃজনধর্মী সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। এই মনঃসমীক্ষণ কলকাতার ভদ্রলোকদের মধ্যে কীভাবে গ্রহণীয় হয়ে উঠেছিল তার পুনর্মূল্যায়নের জন্যই এ আলোচনা। ঔপনিবেশিক ইতিহাস চর্চায় উপনিবেশায়িত ( the colonised ) জনগণকে একক ও অভিন্ন সত্তা ( single identity) হিসেবে গণ্য করার এক প্রবণতা লক্ষ করা যায় । এরকম জনগণের মধ্যে পাগল চিকিৎসা ব্যবস্থার ইতিহাস ও সামাজিক স্তর নিয়ে ইউরোপীয় শক্তির প্রভাব ও উপনিবেশের সময়সীমা নিয়ে যে দুস্তর প্রভেদ রয়েছে তা প্রায়শই দৃষ্টির অগোচরে থেকে যায় বা উপেক্ষিত হয় । এই অন্তর্নিহিত ধারণা অনুযায়ী ভারতের ইতিহাস দুভাগে ভাগ করা হয়েছে , যার একদিকে রয়েছে একশিলীভূত পাশ্চাত্য (monolithic west ) তথা ইউরোপ , আর অন্যদিকে রয়েছে এক অভিন্ন উপনিবেশায়িত ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা। উপনিবেশায়িত প্রজাদের ( colonized subjects ) কার্যাবলী ঔপনিবেশিক প্রভুদের স্বার্থের পরিপন্থী ছিল বলে তারা পর্যবেক্ষণমূলক নানা গবেষণায় (empirical research ) অর্থ বিনিয়োগ করত। এ ধরনের কিছু কাজ ছিল মৌলিক তথ্যানুসন্ধান সংক্রান্ত , তার মধ্যে একটি অন্যতম ছিল মানসিক রোগ চিকিৎসা (ক্রিশ্চিয়ান হার্টন্যাক- ২০০৫)।

ভারতীয় ইতিহাসের প্রাক - ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিক অতীতের নিরবচ্ছিন্ন ( continual) ও অবশিষ্ট ক্ষমতা আবহমান কাল ধরে বিবিধ সাংস্কৃতিক প্রভাবের সম্মুখীন হয়েছে (ঐতিহাসিক জ্ঞানপ্রকাশ)। যে কোনো ব্যক্তি মুঘল শাসন - উত্তর সময়ের মিশ্র ইতিহাসের কথা এখানে উল্লেখ করতে পারেন । আমরা আসলে যা পেয়েছি তা হল জোড়াতালি দেওয়া কতকগুলো প্রভাবের সমষ্টি , সাংস্কৃতিক দিক থেকে যা নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ . এইসব মুহূর্তে আমাদেও অবদমিত

জ্ঞান ও বিষয়বস্তু আকস্মিকভাবে ফিরে আসে ; এবং তা চিরন্তন / ট্রাডিশনাল সত্তা হিসেবে না হলেও , নিম্নবর্গের প্রতিভূ হিসেবে কিছু কিছু ক্ষেত্র পুর্নদখল করে। সংক্ষেপে , এ ব্যাপারে সাম্প্রতিক গবেষণা উপনিবেশায়িত / উপনিবেশিক ও বিবিধ ঔপনিবেশিক ডোমিনিয়ন তত্ত্বের উপরে গুরুত্ব আরোপ করেছে ।

মনোচিকিৎসার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য ধারনা পৃথকীকরণের কারণে ঔপনিবেশিক ডোমিনিয়নের প্রসঙ্গটা বেশ জটিল আকার ধারণ করেছে । প্রাক ঔপনিবেশিক সমাজব্যবস্থা এক সামাজিক কাঠামোকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল উপনিবেশবাদ, যার উপরে অন্য এক বহুস্তরযুক্ত পরিকাঠামো চাপিয়ে দেয়। ফলে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার মধ্যে ক্ষমতার বিবিধ স্তরবিন্যাস লক্ষ্য করা যায় । এ ধরনের সামাজিক পৃথকীকরণ উপনিবেশায়িত জনগণের জীবন ও বাস্তবতার এক পরিষ্কার ছবি তুলে ধরে । উদাহরণ হিসেবে ব্রিটিশ ভারতে উন্মাদ আশ্রমে নিম্নশ্রেণির রোগী দের চিকিৎসার (পূর্বোক্ত অধ্যায়ে আলোচিত ) কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এদের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে উপনিবেশ নির্মাণকারীদের মধ্যেও এক ধরনের শ্রেণিক্রম বিরাজ করত। ভারতের রাচি শহরে অবস্থিত ইউরোপীয় মনোরোগীদের কেস স্টাডি থেকে জানা যায় যে দরিদ্রতর ব্রিটিশ নাগরিকদের মধ্যে অনেকেই ঔপনিবেশিক জীবনের চ্যালেঞ্জ সুষ্ঠুভাবে মোকাবিলা করতে পারেনি [162] ।

অন্যেরা যদিও বা ব্যাপারটাকে কোনোরকমে সামলেছিল কিন্তু তাদের অপরিসীম কষ্ট স্বীকার করতে হয়। কারণ , সবসময় তাদের স্বদেশ থেকে ভিন্নতর এক সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সম্মুখীন হতে হচ্ছিল; উচ্চশ্রেণির ঔপনিবেশিক কর্মকর্তাদের মতো তারা যেমন পারত না চাকরবাকর ছাড়া অন্য ভারতীয়দের সঙ্গ পরিহার করে চলতে , তেমনি তারা পারতো না নিত্যনৈমিত্তিক কর্মকান্ড থেকে আপাত ব্রিটিশ জগতে পাড়ি জমাতে। Colonizer I Colonized নামক অতি - সরলীকৃত শব্দযুগলের পরিবর্তে উল্লম্ব ও অনুভূমিক পৃথকীকরণকে মেনে নিয়েও আমরা এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে পারি না যে ঔপনিবেশবাদ প্রাক্তন উপনিবেশগুলোতে রেখে গেছে এক চিরস্থায়ী ছাপ । সেই ঔপনিবেশিক নাটকীয় চেহারা মনে হয় সচরাচর নজরে আসে না , তা হল মনের উপনিবেশায়ন । এই প্রভাবগুলো শহুরে

---

[162] জয়ন্ত ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), ভারতের পটভুমিতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস – সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা - ওয়ালট্রড আরনস্ট , ব্রিটিশ ভারতের সম্মোহনতন্ত্রঃ ঔপনিবেশিক মনবিদ্যা ,ম্যাজিক ও ধর্ম – কোলকাতা , অবভাস মার্চ ২০০৯ পৃষ্ঠা – ১৪৩

জনগণের সবচেয়ে সুবিধাভোগী শ্রেণির মধ্যে বেশি করে লক্ষ করা যেত । কারণ তাদেরই সঙ্গে উপনিবেশ নির্মাণকারীদের ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ । তবুও এর প্রভাব এই সামাজিক শ্রেণির বাইরেও বিস্তার লাভ করেছিল।

ব্রিটিশ সরকার বাংলায় পাশ্চাত্য চিকিৎসা আনায়নের মাধ্যমে যা প্রতিষ্ঠা করেছিল তাকে আমরা বলতে পারি বাইলোজিক্যাল ইম্পেরিয়ালিজম (অরবিন্দ সামন্ত,২০০) এই জৈবিক সাম্রাজ্যবাদের তাড়নায় সরকার এদেশের গাছ - গাছড়া , পশুপক্ষী এমনকি মানুষকেও ব্যবহার করেছিল পাশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতির কাঠামোগত অনুকূল পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টির জন্য। পাগল চিকিৎসার নামে রাস্তায় ভবঘুরে মানুষ গুলি কে জোরপূর্বক আটক করত। অপরদিকে হাকিম , বৈদ্য , কবিরাজদের চিকিৎসা পদ্ধতি কে কুসংস্কার আচ্ছন্ন বলে তকমা দেওয়া , ইত্যাদি বিষয় গুলো ঔপনিবেশিক বাংলার পাগলা গারদের বিভিন্ন প্রতিবেদনে লক্ষ্য করেছি। এক কথায় অর্থনৈতিক সাম্রাজবাদের সঙ্গে সঙ্গে জৈবিক সাম্রাজবাদ এবং এর পিছনে পিছনে এলো technological determinism এই পাশ্চাত্য চিকিৎসা , যাকে বলা যেতে পারে টুলস অফ এম্পেয়ার, সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রযুক্তিগত এই কৌশল কী পরিমাণে penetration এবং domination কায়েম করেছিল তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ পাগল চিকিৎসার নামে লুনাটিক আসাইল্যাম প্রতিষ্ঠা। কয়েকশ বছর ধরে ইয়োরোপীয় দিগ্বিজয়ী বীর, ব্যবসাদার, ভূপর্যটক, কিংবা মিশনারী এই উষ্ণমন্ডলীয় দেশে এসেছে , জ্বরে পড়েছে , মানসিক রোগীও হয়েছে গেছে শত শত (ভবানীপুর ইউরোপীয় লুনাটিক অ্যাসাইল্যাম, রাঁচি ইউরপিয়ান মেন্টাল হসপিটাল যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ)। কিন্তু এদেশের উন্মাদ আশ্রম পাগল চিকিৎসার পদ্ধতিগত দিক গুলি পরীক্ষা নিরিক্ষা করে মনোরোগ চিকিৎসা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ ও লব্ধ জ্ঞান নিয়ে নিজেদের কে আরও সমৃদ্ধি করেছিল অর্থাৎ পাগল চিকিৎসার নামে এদেশের উন্মাদ আশ্রম গুলি কে পরীক্ষাগার হিসাবে ব্যবহার করেছিল ।

এদেশে পাশ্চাত্য মনোচিকিৎসা চর্চার সবচেয়ে গৌরবজনক সময়কাল হলো ১৮৬০ থেকে ১৯৩০ সাল। আর এই সময়কালই হলো ইয়োরোপীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে রমরমার সময়। ১৮৮০ সালের আগেও প্রাচ্যে পাশ্চাত্য ঔষধ অনুপ্রবেশ করেছে। তবে তা ব্যবহৃত হয়েছে মূলত ইয়োরাপীয় সিভিলিয়ান আর সেনাবাহিনীর নিরাময়ে। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জাহাজ ভরে ডাক্তার নিয়ে আসত তাদের সৈনিক, ব্যবসায়ী, অফিসার, নাবিক চিকিৎসার জন্য। ইয়োরোপীয় ডাক্তাররা কালে - ভদ্রে দেশীয় রোগীদের চিকিৎসা করত। আবার ইয়োরোপীয়রা

কখনো কখনো অসুস্থ হয়ে পড়লে দেশীয় চিকিৎসকেরই শরণাপন্ন হতেন কিংবা আয়ুর্বেদীয় ডাক্তারদের উপর আস্থাশীল ছিলেন । কিন্তু উনিশ শতকের শেষ পর্ব থেকে এই প্রাচ্যদেশীয় নির্ভরতা দূর হয়ে গেল । প্রাচ্যদেশীয় চিকিৎসায় সাধারণ হাকিম, বৈদ্যদের ও কবিরাজ দের আধিপত্যের কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকে দিল পশ্চিমী চিকিৎসার আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে। আর ১৮৫৮ সাল থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে ভারতে ঔপনিবেশিক সরকার পাগল চিকিৎসা কে কেন্দ্র করে এদেশে law , proclamation ,decree আর legislation এর তৈরি করা হয়েছিল [163]। ঔপনিবেশিক পাগলরা শারীরিক দিক আষ্টেপিষ্টে বাঁধা হলো এবং চিকিৎসা কে কেন্দ্র করে শারীরী বন্ধনের সূত্রপাত । ফলে উন্মাদ রোগীর চিকিৎসা , পরীক্ষা, নিরিক্ষা কিংবা সামাজিক পৃথকীকরণ এবং হাসপাতালে ভর্তি করে রাখা ইত্যাদির পাগল আইনের[164] মাধ্যমে জৈবিক সাম্রাজবাদ- এর স্থূল কার্যকারিতা প্রমাণ করা হলো।

এই সমস্ত বিষয়টি যদি থিয়োরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কে নিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় তাহলে দেখা যায় যে এডওয়ার্ড সাইদ এর ওরিয়েন্টালিজম সম্বন্ধে বক্তব্য মেডিসিনের ক্ষেত্রে সুপ্রযুক্ত এবং গ্রামসির সিভিল সোসাইটি'র ধারণা সম্বন্ধে এই প্রক্রিয়াটি সাযুজ্য হতে পারে । শ্রেণীনেতৃত্বের প্রশ্নে আন্তোনিও গ্রামসির বক্তব্যকে প্রভাব (হেজেমনি) ও প্রভুত্ব (ডোমিনিয়ন) এই দুটি ধারণার মনোচিকিৎসার মধ্যে দিয়ে পরিস্ফুট হয়েছে। শাসক সম্প্রদায় নিছক বল প্রয়োগ করেই সমাজে

---

163 ঔপনিবেশিক ভারতের মানসিক রোগীদের যত্ন ও চিকিৎসার বিভিন্ন রকম আইন পাগলদের জন্য প্রচলিত ছিল , সেগুলি হল- পাগলাগারদ আইন (সুপ্রিম কোর্ট ) ১৮৫৮ অ্যাক্ট – (XXXIV ) ১৮৫৮, পাগলাগারদ আইন (জেলা কোর্ট ) ১৮৫৮ অ্যাক্ট – (XXXV ) ১৮৫৮, ভারতীয় পাগলাগারদ আইন ১৮৫৮ অ্যাক্ট – (XXXVI ) ১৮৫৮, সামরিক পাগল আইন ১৮৭৭ অ্যাক্ট – (XI) ১৮৭৭, ভারতীয় উন্মাদ আশ্রয় আইন ( সংশোধন ) ১৮৮৬ অ্যাক্ট – (XVIII)১৮৮৬, ভারতীয় উন্মাদ আশ্রয় আইন (সংশোধন ) ১৮৮৯ অ্যাক্ট – (XX) ১৮৮৯, অপরাধী পাগল আইন, অধ্যায় (XXXIV) ১৮৯৮, কয়েদী পাগল আইন ( অ্যাক্ট ১৯০০ )। ১৯০৯- ৫ নং, অ্যামেন্ডিং আর্মি অ্যাক্ট- ১৯০৯, ১৯১২- ৪ নং, দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট- ১৯১২।

164 দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট, XXXVI অফ ১৮৫৮, দ্যা ল অফ লুনেসি,

দ্যা মিলিটারি লুনাটিক অ্যাক্ট, ১৮৭৭, এন অ্যাক্ট টু ফ্যাসিলিটেট দ্যা এডমিশন অফ মিলিটারি লুনাটিক ইন্টু অ্যাসাইলাম, অ্যাক্ট নং- XI, অফ ১৮৭৭

অ্যাক্ট V অফ ১৯৮৯, ক্রিমিনাল লুনাটিক , চেপ্টার XXXIV

অ্যাক্ট III অফ ১৯০০, লুনাটিক প্রিজনার, সেকশন- ৩০/৪-A, ( জি, ও, নং-৬০০, জুডিসিয়াল, ৩১ মার্চ ১৮৯০ )

অ্যাক্ট III অফ ১৯০০, লুনাটিক প্রিজনার, সেকশন- ৩০/৪- B, ( জি, ও, নং-1296 মিস্লেনিয়াস, ১২ জুন ১৮৮৮ )

দ্যা ইন্ডিয়ান লুনেসি অ্যাক্ট, IV অফ ১৯১২, পার্ট-১, প্রিলিমিনারি, চেপ্টার- I, সেকশন-১, ফর স্টেটমেন্ট অফ অবজেক্ট অ্যান্ড রিজন, সি গ্যাজেট অফ ইন্ডিয়া।

তার শাসন বজায় রাখতে পারে না। বলপ্রয়োগ শেষ অবলম্বন হলেও শাসকসম্প্রদায়কে শাসিতের অন্তত খন্ডাংশের স্বেচ্ছামূলক আত্মসমর্পণের উপর নির্ভর করতে হয় । রাষ্ট্র আসলে পরস্পরবিরোধী দুটি কর্মপন্থার সুসামঞ্জস্য রূপ । একদিকে বলপ্রয়োগ , অন্যদিকে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য অর্জন। এই দ্বিবিধ কর্মধারার প্রতিফলন ঘটে সমাজের দ্বিবিধ অংশে রাজনৈতিক , সমাজ ও জনসমাজ বা সিভিল সোসাইটি। হেজেমনি প্রতিষ্ঠার আগেই ডোমিনিয়ন-র প্রশ্নটি বঙ্গ দেশে পাগল চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত, অর্থাৎ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অর্জনের আগেই সিভিল সোসাইটি দখল করতে হয় । সিভিল সোসাইটির সাংগঠনিক ক্ষেত্র হলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, তার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য ছিল উন্মাদ আশ্রম কিংবা মানসিক হাসপাতালের মত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান ও তার নিয়ন্ত্রন। এইসব ক্ষেত্রে প্রসারিত জনসমাজকে বশীভূত করাই রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পূর্বশর্ত । আবার রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের যে লড়াই তা চলিষ্ণু সংগ্রাম এবং অবস্থায়ী সংগ্রামের মাধ্যমে চলেছিল । সাধারণ যুদ্ধে শত্রু পক্ষের সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে তার এলাকা দখল নিতে পারলেই যুদ্ধের শেষ হতে পারে না । কিন্তু রাজনৈতিক সংগ্রামে তা সব সময় হয় না। রাজনৈতিক সংগ্রামে শত্রু পক্ষের এলাকা পাকাপোক্তভাবে দখলে রাখতে হয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চলিষ্ণুসংগ্রাম চলে যুদ্ধ, বিক্ষোভ , ধর্মঘট বা অন্যান্য আন্দোলনের মাধ্যমে । আর অবস্থায়ী সংগ্রাম এর ভিত্তি হলো নিজস্ব শাসন ক্ষমতা কে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও দৃঢ় রেখে শত্রুপক্ষের শক্তি পরীক্ষা । বাংলায় ঔপনিবেশিক চিকিৎসার মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার হয়তো বা সচেতন ভাবেই সিভিল সোসাইটি দখলের চেষ্টা করেছিল। তার একটি অন্যতম ক্ষেত্র ছিল লুনাটিক অ্যাসাইল্যাম কিংবা মানসিক হাসপাতালের চিকিৎসা পদ্ধতি। চিকিৎসার ক্ষেত্রে সিভিল সোসাইটি হলো ডিসপেন্সারী , স্বাস্থ্যকেন্দ্র , হাসপাতাল কিংবা মেডিকেল স্কুল-কলেজ। অপরদিকে ব্রিটিশ সরকার তার পশ্চিমী ওষুধের আধিপত্য নিয়ে দেশীয় লোকায়ত চিকিৎসা উপর চড়াও হয়েছিল। অতি সূক্ষ্মভাবে যদি অনুধাবন করা হায় তাহলে দেখা যায় ,ঔপনিবেশিক সরকার উন্মাদ রোগের আয়ুর্বেদ পদ্ধতির উপর আঘাত হেনেছিল। সামগ্রিকভাবে বৃহত্তর জনসমাজের উপরই অধিকার কায়েম করেছিল মানসিক স্বাস্থ্যের মতো একটি অনিবার্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে।

আয়ুর্বেদ ও ইউনানী পর ভারতের চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে শুরু হয়েছিল পশ্চিমী চিকৎসাবিজ্ঞানের যুগ। ভারতের উপকূলে প্রথম অবতরণকারী পর্তুগীজরা প্রথমে এদেশে পশ্চিমী চিকিৎসাবিজ্ঞানের আমদানি ঘটালেও ইংরাজরাই ভারতে পশ্চিমী চিকিৎসাবিজ্ঞানকে সুদৃঢ় ভিত্তির

উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিল । কোম্পানির শাসনের আগে ও কোম্পানির শাসনের গোড়ার দিকে এ দেশে সুনির্দিষ্ট কোন স্বাস্থ্যনীতি ছিল না , স্বাস্থ্য , রোগব্যাধির প্রতিরোধ ও প্রতিকার ছিল নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার । কিন্তু বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী তে ক্রমশ কোম্পানির রাজনৈতিক , সামরিক , অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তৎপরতা বৃদ্ধি পেতে লাগলে জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিজ্ঞান সংক্রান্ত তৎপরতা নতুন নতুন মাত্রা পেতে লাগল । এই প্রক্রিয়া বিবর্তনের ক্ষেত্রে উনিশ শতকের প্রথম পর্ব ছিল পটভূমি রচনার যুগ । উনিশ শতকের বাংলায় জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার , মানসিক ব্যাধির প্রতিরোধ ও প্রতিকার প্রভৃতি তৎপরতার সূত্রপাত কোম্পানির সৈন্যবাহিনী ও ইউরোপীয় কর্মচারীদের অকাল মৃত্যু ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যার সুত্র ধরেই । উনিশ শতকের গোড়ার দিকে প্রেসিডেন্সি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এর সূচনা । প্রথম দিকে এই কেবল ইউরোপীয়দেরই চিকিৎসা করা হত , কিন্তু ধীরে ধীরে সরকার বুঝতে পারল যে , কেবল মাত্র ইউরোপীয়দের চিকিৎসার দ্বারা রোগব্যাধির সংক্রমণ রোধ করা সম্ভব নয় । এর জন্য দেশীয় প্রজাদেরও চিকিৎসার প্রয়োজন । সুতরাং গড়া হল নেটিভ হসপিটাল । এরপর ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে গোটা উনিশ শতক ধরে সরকারি , বেসরকারি ও যৌথ উদ্যোগে নির্মিত হতে লাগল বহু হাসপাতাল । বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সরকার ও স্থানীয় বিত্তশালী সম্প্রদায়ের অনুদানে এই সকল চিকিৎসাকেন্দ্রের নির্মাণ ও পরিচালন সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহ করা হলেও ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কখনও এগুলির জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসক ও ওষুধপত্র সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি । এদিকে বাংলায় বিভিন্ন ধরনের হাসপাতাল ও ডিসপেনসারীগুলির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন হল যথেষ্ট সংখ্যক ডাক্তার ও কম্পাউন্ডারের । প্রথমদিকে সরকার এবিষয়ে কিছুটা অবহেলা করলেও ১৮১৭-৩১ খ্রীষ্টাব্দের ভয়ঙ্কর মহামারীই সরকারকে এদেশীয় যুবকদের পশ্চিমী চিকৎসাবিজ্ঞানে শিক্ষিত করে তোলার জন্য মেডিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে বাধ্য করে , কিন্তু এই সকল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্ত চিকিৎসকেরা গ্রাম্য পরিবেশে চিকিৎসা করতে অসম্মত হওয়ায় এবং প্রচুর পরিমাণে ফী দাবী করায় সরকারের পক্ষে কখনো চিকিৎসক সমস্যা দূর করা সম্ভব হয় নি । এছাড়া সে সময় মেডিক্যাল স্কুল ও কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত ডাক্তারের সংখ্যা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম । ফলে পরিস্থিতির বিশেষ কোন উন্নতি হয়নি। অপর যে সমস্যাটি আলোচ্য শতকে কোম্পানি সরকারকে প্রায়শই দুশ্চিন্তার মধ্যে রেখেছিল তা হল , বিভিন্ন রকম উন্মাদ রোগ ব্যাধির মোকাবিলায় ওষুধ সরবরাহ ছিল একান্ত প্রয়োজন ।

গোড়ার দিকে কিছু কিছু ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠান এই দায়িত্ব পালন করলেও কাঁচামালের চড়া দামের ফলে সরকারকে এদেশের মধ্যেই সেগুলির চাষাবাদ ও নিকট বিকল্প অনুসন্ধানের চেষ্টা করতে হয়। এর ফলে উনিশ শতকের শেষ ভাগে শুরু হল বিভিন্ন ধরনের ভেষজ উপাদানের চাষ - আবাদ এবং আয়ুর্বেদের ভেষজ তালিকার মধ্যে এর উন্মাদ রোগ ঔষধের বিকল্পের অনুসন্ধান। লক্ষণীয় যে , এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরকার আয়ুর্বেদ নির্দেশিত তালিকার সাহায্যে ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়াকে ' সমৃদ্ধ করে তুললেও এবং এগুলি আমদানি রপ্তানীর মাধ্যমে মুনাফা লাভ করলেও আয়ুর্বেদের উন্নতির জন্য প্রায় কিছুই করেন নি । এমনকি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে সরকারি উদ্যোগে একটিও পূর্ণাঙ্গ ওষুধশিল্প বাংলায় গড়ে ওঠেনি । কোম্পানির রাজত্বে জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের জন্য চিকিৎসক এ স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তাদের নিয়োগও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য গড়ে তোলা হল আই.এম.এস. । উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত অধিকাংশ অযোগ্য কর্মচারী দিয়ে এই বিভাগের কাজকর্ম পরিচালনা করা হত এবং এই সংস্থায় নিয়োগ করা হত কেবল ইউরোপীয়দের । এরপর সাধারণের জন্যে এই বিভাগ খুলে দেওয়া হলেও চাকুরী সংক্রান্ত সমস্ত রকমের সুযোগ সুবিধা লাভ করত শুধুমাত্র ইউরোপীয়রা। অধিকাংশ এক্ষেত্রে এরা সরকারি দায়িত্ব বা কাজকর্মের চেয়ে ব্যক্তিগত চিকিৎসা ব্যবসায় বেশি করে নিজেদের ব্যস্ত রাখায় এবং এই প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্র ক্রমশ আমলাতান্ত্রিক হয়ে ওঠায় আই.এম.এস আশানুরূপ সাফল্যের পরিচয় রাখতে পারে নি। আলোচনা প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবে এসে যায় জনস্বাস্থ্যের প্রশ্ন । সমগ্র উনিশ শতকে প্রকৃত অর্থে জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত কোন উদ্যোগই সরকার গ্রহণ করে নি। যেটুকু নেওয়া হয়েছিল তা ছিল কেবলমাত্র ইউরোপীয় কর্মচারী ও সেনাবাহিনী অধ্যুষিত অঞ্চলকে ঘিরেই। অথচ বাংলার রোগব্যাধি ও মহামারীগুলির বিধ্বংসী চরিত্র ও সেগুলির উত্তরের কারণগুলি নির্দেশ করে বহু প্রতিষ্ঠান ও সরকারি আমলারা সরকারকে বারেবারে সচেতন করে দিলেও বিভিন্ন সময়ে কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত উদ্যোগ নেওয়া ছাড়া সরকার এ বিষয়ে ছিল সব সময়েই উদাসীন , ফলে ব্রিটিশ শাসনের শেষ দিকে বিভিন্ন ধরণের রোগব্যাধি ও মহামারীর প্রকোপে উন্মাদরোগীদের মৃত্যুর সংখ্যা বছরে বছরে ‘শ’ থেকে ‘হাজার’ অতিক্রম করেলেও শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছালেও সরকারের পক্ষে এর উর্দ্ধগতি রোধ করা সম্ভব হয়নি।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হয় আয়ুর্বেদ কিংবা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি (এলোপ্যাথির মত এটিও পশ্চিমী চিকৎসা বিজ্ঞানের একটি অঙ্গ হলেও) এদেশে এই দুটি চিকিৎসা পদ্ধতি প্রসারে

কোন রকম ঔপনিবেশিক সরকারের তরফ থেকে তেমন পৃষ্ঠপোষকতা জোটে নি । কেবলমাত্র আয়ুর্বেদ ওষুধপত্রের সফল কর্মক্ষমতা , সুলভ মূল্য, গুনমান, ভারতীয় জলবায়ু , খাদ্যাভাস ও জীবনযাপন প্রণালীর উপযোগী এবং কোন রকম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না বলেই এদেশের মাটিতে আয়ুর্বেদ বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল[165] । বিশেষ করে দরিদ্রদের মধ্যে এর চাহিদা খুব বেশি । সে কারণে কোম্পানির শাসনে প্রবল বঞ্চনার শিকার হলেও এর প্রসার রোধ করা সম্ভব হয় নি । বরং বলা চলে যে ঔপনিবেশিক আমলে বাংলার পাগল চিকিৎসার ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদ হয়ে উঠেছিল এলোপ্যাথির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ।

## উপসংহার

ব্রিটিশ পরবর্তী সময়ে মনোচিকিৎসার ইতিহাসচর্চার এক বৃহৎ অংশই ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাথে যুক্ত। উপনিবেশিক এবং নিতান্ত আধুনিক সময়ের ইতিহাসচর্চার কথা বাদ দিলে পুরনো ইতিহাস চর্চার একটি বিশেষ ধরন ছিল, এর ঝোঁক ছিল অতীত ভারতের গৌরবগাথা রচনার দিকে । অন্য সমস্ত ইতিহাস রচনার মতোই ভারতের পাগল চিকিৎসার ইতিহাস অনুধাবন করতে গেলে কোনো একটি একমাত্রিক ছকে কিংবা শাসক - শাসিতের সরল কাঠামোতে একে বোঝা যাবে না। জর্জ বাসাল্লা-র মডেলের মতো পাগল চিকিৎসার ক্ষেত্রে পশ্চিমীজ্ঞান কেবল চুইয়ে বা ব্যাপন প্রক্রিয়ায় এদেশে এসে পৌঁছোয়নি বরং উন্মাদ রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রেও তাঁরা প্রাচ্য জ্ঞানও সংগ্রহ করেছিল, পশ্চিমী চিকিৎসা বিজ্ঞান ছাড়াও এদেশে নিজস্ব একটি চিকিৎসা ধারা ছিল, যা ছিল বিশ্বের অন্যান্য সভ্যতা থেকে পৃথক। অর্থাৎ পাগল চিকিৎসার জ্ঞান পশ্চিমী সভ্যতা থেকে আমারা গ্রহন করিনি , বরং ব্রিটিশ তা এদেশে আসার পূর্বে আয়ুর্বেদ পদ্ধতিতে উন্মাদ রোগ চিকিৎসার একটি ধারাপ্রচলিত ছিল। আবার আধুনিক চিকিৎসার সঙ্গে দেশীয় চিকিৎসার বিভিন্ন ধারার ( বিশেষত আয়ুর্বেদ ) সংঘাত,

---

165 পাগলের মহৌষধ-"আমি ইহার উপকারিতা বহুকাল যাবৎ জ্ঞাত আছি"—রবীন্দ্রনাথ। এস সি রায় অ্যান্ড -এর বিজ্ঞাপনে। কলকাতার ১৬৭/৩ কর্নওয়ালিশ রোডে নিজস্ব ফ্যাক্টরিতে ওরা তৈরি করত পাগলের ওষুধ। সেই ওষুধের বিজ্ঞাপনেও রবীন্দ্রনাথের প্রত্যয়ন পত্রের সন্ধান মেলে। ডাক্তার উমেশচন্দ্র রায়ের জগদ্বিখ্যাত 'পাগলের মহৌষধ' শিরোনামের সেই বিজ্ঞাপনে বলা হচ্ছে— ৭০ বৎসরের ঊর্ধ্বকাল যাবৎ লক্ষ লক্ষ দুর্দ্দান্ত পাগল ও সর্ব্বপ্রকার বায়ুগ্রস্ত রোগীর আরোগ্য করিয়াছে। মূর্চ্ছা, মৃগী, অনিদ্রা, হিষ্টিরিয়া, অক্ষুধা, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি রোগেও ইহা আশুফলপ্রদ।

সহযোগিতা ও সহবাস এর মধ্য দিয়ে স্তরায়িত ও সম্পর্কিত হয়েছিল । এ কারণে শুধুমাত্র নাকচ কিংবা গ্রহণ এই কাঠামোকে অতিক্রম করে নানাভাবে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্তরে দেশীয় চিকিৎসার ইতিহাসকে খোঁজার চেষ্টা আজ বিশ্বের গবেষকমহলে ধীরে ধীরে প্রাধান্য লাভ করছে । এর মাঝে সামাজিক রাজনৈতিক - অর্থনৈতিক অনুষঙ্গ যেমন আছে , তেমনি ভাষা, শব্দ ও বিশেষ ভূমিকাকে বোঝার অনুষঙ্গ গুলোও আছে । বর্তমান সময়ে এসব কিছুকে নতুন করে বোঝা মনোচিকিৎসার ইতিহাস প্রাথমিক উপাদান হয়ে উঠছে ।

পরিশেষে বলা যায় যে , ঔপনিবেশিক বাংলায় পাশ্চাত্য চিকিৎসার সঙ্গে পাগলের চিকিৎসার সাথে সম্পর্ক কেমন ছিল তা উপরিউক্ত আলোচনার দ্বারা বিষয় টি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে। উন্মাদ রোগ চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়টি ব্যাখ্যা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে পাগল চিকিৎসার ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক বাংলায় চিকিৎসাবিদ্যার বহুমাত্রিক অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। যেটি ছিল ভিন্ন প্রকারের বিপরীতধর্মী কাঠামোর দ্বারা নির্মিত। আবার পাগল চিকিৎসার ক্ষেত্রে পশ্চিমী পদ্ধতি ছিল আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক । উনিশ শতকের উন্মাদ রোগের পাশ্চাত্য চিকিৎসা ও আয়ুর্বেদ চিকিৎসার তাৎপর্য আলোকায়ন মধ্যে একটি বিচিত্র সমস্যারূপে আত্মপ্রকাশ করে। কারন বঙ্গদেশে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যার অহমিকা ও দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ কে সমানভাবে সইতে হয়েছিল । পাগল চিকিৎসার জন্য কবিরাজ ও বৈদ্যগণ যে পদ্ধতি প্রয়োগ করত সেটিকে পশ্চিমী চিকিৎসকগণ কখনো অবৈজ্ঞানিক ও কখনো কুসংস্কার আচ্ছন্ন বলে অবিহিত করত। কিন্তু সেই সময় ভারতীয় অভিজাতশ্রেণি ও মধ্যবিত্ত রোগী ও চিকিৎসক উভয়ের কাছে দেশীয় চিকিৎসা প্রবলভাবে জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক কর্তাদের কাছে দেশীয় চিকিৎসা সাথে ধর্মাচরণের আত্মীয়তা আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতি কোণঠাসা হওয়ার (marginal) কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেশীয় চিকিৎসাবিদ্যার বিষয়টি পশ্চিমীজ্ঞান চর্চায় দেখিয়েছিল নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে , ঔপনিবেশিক কর্তারা প্রচার করত উন্মাদ রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে কবিরাজগণ যে পদ্ধতি প্রয়োগ করত তা ছিল কাল্পনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের অংশ, তার কোন কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই । অর্থাৎ পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ নিজেরদের পদ্ধতি

কে মহিমান্বিত  করার জন্য , আয়ুর্বেদ পদ্ধতি নিজেরদের মতো করে অপব্যাখ্যা করত । মতানৈক্যের জটিল চ্যালেঞ্জের ব্যাখ্যা উভয় জগৎই ঔপনিবেশিক প্রাচ্য ও ব্রিটেনের ওষধিশাস্ত্র এবং মনোবিদ্যার উন্নয়নের রূপরেখা আরও গভীরভাবে বুঝতে সাহায্য করে।

কিন্তু ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ভারতের সমৃদ্ধ ও বহুমুখী উন্মাদ রোগ চিকিৎসার ঐতিহ্যকে পুরোপুরি ধ্বংস করতে পারেনি । ফলে , প্রাক - ঔপনিবেশিক আচরণ ও চিন্তন পদ্ধতির ভিত্তিতে এখানে এক সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ জোরালো আকার ধারন করেছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ভারতের গৌরবময় অতীতের বৌদ্ধিক ও বস্তুতান্ত্রিক কীর্তিগাথার জয়গান মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল । ফলে উপনিবেশবাদের আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ ও আত্মমর্যাদা হারানো জাতীয় গরিমা পুনরুদ্ধার সহজতর হয়েছিল । এর ফলে একই সঙ্গে আরও যা সম্ভব হল তা হচ্ছে দেশীয় ঐতিহ্য ও ধ্রুপদী উন্মাদ চিকিৎসার পুনরুদ্ধার  এবং  ইউরোপীয় ও ভারতীয় জ্ঞানভান্ডারের সমন্বয়ের ফলে কীভাবে মনঃসমীক্ষণের সঙ্গে বাঙালি চিন্তা ও নিরাময় পদ্ধতির সার্থক মেলবন্ধন সম্ভব হয়েছিল।

আধুনিক পশ্চিমী চিকিৎসা ও ঔষধ পুঁজিবাদী  বাজারকেও জোরদার করে তুলেছিল । বিগত শতাব্দীর শুরুতে সাইক্রিয়াটিস্ট নামক  মেডিকেল বিশেষজ্ঞের উদ্ভব হলো।  পাগলামী নিরাময়ের জন্য পৃথক মেডিকেল শাখা গড়ে উঠল । তৈরি হতে লাগল নানা ওষুধ । আর্থিক , সামাজিক , সাংস্কৃতিক ব্যবধানের বাধা অতিক্রম করে তা প্রযুক্ত হতে লাগল প্রাচ্য শরীরে এইসব ওষুধ ব্যবহার প্রায় বাধ্যতামূলক করা হলো নানা আইনের বাধ্যবাধকতায় । এদেশে পাশ্চাত্য ওষুধের বাজার সুনিশ্চিত হলো । সমগ্র উনিশ শতক ধরে মানসিক স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকার যা করেছিল , তা ছিল কেবলমাত্র উপনিবেশ টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে, কোম্পানির কর্মচারী ও সেনাবাহিনীর জন্য চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন এবং নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও দেশীয় প্রজাদের জন্যে কিছু কিছু হাসপাতাল ও ডিসপেনসারি প্রতিষ্ঠা। যদিও সেগুলির অধিকাংশরই নির্মাণ ও পরিচালনগত ব্যয় নির্বাহ হত এদেশের কোষাগার থেকে।

আসলে ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিল মূলত একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান । যে কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মতো এই সংস্থারও মূল লক্ষ্য ছিল কম বিনিয়োগ করে বেশি মুনাফা অর্জন করা । সেজন্য ন্যূনতম পক্ষে যতটুকু খরচ না করলে নয় , তা করে কোম্পানি প্রচুর পরিনাম মুনাফা ইংল্যান্ডে পাঠাতো , অথচ ভারতের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করেনি । যদিও একথা স্বীকার করতে হয় যে , ব্রিটিশ রাজত্বেই ভারতে পশ্চিমী চিকৎসা বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যনীতি ক্রমশঃ উন্নত হয়ে উঠেছিল এবং ইউরোপে এগুলির বিবর্তনের সাথে সাথে এগুলি ভারতের চিকিৎসা ব্যবস্থার ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে কিন্তু কোম্পানির উপযুক্ত সদিচ্ছা ও কল্যাণকামী মানসিকতার অভাবে ভারতের মাটিতে এর আগমন ঘটেছিল মাত্র কিন্তু সফল রূপায়ণ ঘটেনি । এতদসত্ত্বেও একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে , এদেশে পশ্চিমী চিকৎসা বিজ্ঞানের আমদানির ফলে চিকিৎসা ক্ষেত্রে গ্রাম বাংলায় প্রচলিত পাগল চিকিৎসায় অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারগুলি ধীরে ধীরে দূর হতে শুরু করে , মানসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় অনেকাংশে নিরাপত্তা লাভ করে । অপরদিকে পশ্চিমী চিকৎসার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তাল মিলিয়ে আয়ুর্বেদ পদ্ধতিতে উন্মাদ চিকিৎসা গুলির ধরন ও বদলে গিয়েছিল এবং আয়ুর্বেদ পদ্ধতিতে পুনরুজ্জীবনের ফলে উন্মাদ চিকিৎসা পদ্ধতিও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল এবং দেশীয় সমাজে মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনা বৃদ্ধি পায় । আর এগুলিই পরবর্তীকালে স্বাধীনত্তোর ভারতে একটি পরিপূর্ণ মানসিক স্বাস্থ্যনীতি রচনায় সাহায্য করে ।

# সার্বিক মূল্যায়ন

কোনো সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ব্যাখ্যা কেবল জ্ঞানতত্ত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না , তার ব্যবহারিক দিকটিও আলোচনায় এসে পড়ে, ইতিহাসচর্চায় তাই রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজভাবনাকে অতিক্রম করে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাস যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। ঠিক তেমনি ঔপনিবেশিক চিকিৎসার সামাজিক ইতিহাসে চর্চায় বাংলার পাগল ও পাগলাগারদের ইতিহাস আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। উপরিউক্ত পাঁচটি অধ্যায়ের আলোচনার শেষপর্বে সাবিক সার্বিক মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলা যায় যে, উনিশ শতকের সূচনা থেকে বিংশ শতকের প্রাথমিক পর্বে পাগলদের নিয়ে বৌদ্ধিক ভাবনা চিন্তায় একটি প্যারাডাইম- শিফট তৈরি হয়েছিল , কারণ এই সময় যুক্তিবাদ ও নবজাগরণ মানুষকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল। সবকিছুই যুক্তির আলোকে ব্যাখ্যা করার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। বাংলার সামাজিক জীবনে একদিকে কুসংস্কার ও অন্য দিকে ধর্মীয় ভাবাবেগ বিরাজ করতো, কিন্তু পশ্চিমী জ্ঞান-বিজ্ঞান আগমনের ফলে যে নবজাগরণের যাত্রা শুরু হয়েছিল , সেই যুগসন্ধিক্ষনে পাগল নামক ধারণাকে কেন্দ্র করে সামাজিক ভাবনায় যুক্তির আলোকে বিভিন্ন চিন্তা ও চিকিৎসার আলোকে পাগলদের নিয়ে বিভিন্ন ব্যাখ্যা শুরু হল ।

পূর্বে মনে করা হতো পাগল ও পাগলামির বিষয়টি ভৌতিক ও অতীন্দ্রিয় শক্তির দ্বারা পরিচালিত, কিন্তু রেনেসাঁর আলোকে তা প্রমাণিত হল মানুষের পাগলামির জীবন হল নানারকম সামাজিক অভিঘাতের ফল। পাগলামি কারন হিসাবে সামাজিক অভিঘাতের ব্যাখ্যায় মানুষ মনের অবস্থা খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত এক অনুবীক্ষণ অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। আর ঠিক তখন-ই মনোবিজ্ঞানের বিশ্লেষণে মানুষের সুখ দুঃখ,কামনা, বাসনা, ইচ্ছা, ভ্রম, আবেগ অনুভূতি, স্মৃতি ইত্যাদিকে গুরুত্ব দিয়ে পাগলামি কে জৈব-রসায়ন ও সামাজিক অবস্থার মধ্যে সীমায়িত করা হল।বিগত শতকগুলি তে পাগলের অযথা কর্মকান্ডের জন্য তাদের কে সমাজ থেকে আলাদা করে দেওয়া হতো , কিংবা তাকে পাগলা গারদে ভর্তি করে আটকে রাখা হতো । এই বেমানান মানুষ হিসাবে তাকে একঘরে করে দেবার এক সুচারু প্রক্রিয়া ছিল উনিশ শতকে

প্রথম দিকে , শুধু তাই নয় মানবিক ব্যবহার পাওয়া তো দূরের কথা অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিকিৎসার পরিবর্তে জুটত বর্বোরোচিত শাস্তি। এইভাবে পাগলের সংজ্ঞা নির্ধারণের পদ্ধতির মধ্যেই ছিল পাগলকে অপর করে দেবার নিহিত প্রক্রিয়া টি ক্রমশঃ বদলে গিয়েছিল , এবং মনোচিকিৎসা ও মানসিক হাসপাতালে উত্তরনের পর পুরাতন সমস্ত পদ্ধতি পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল ।

ওপনিবেশিক অধ্যায়ে বাংলায় পাশ্চাত্য চিকিৎসা প্রবেশের ফলে মনোবিজ্ঞানের ইতিহাসে এক পরিবর্তন সূচিত ছিল। বিভিন্ন রকমের গবেষণা ও পাগলদের নিয়ে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার ফলে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা পাগল চিকিৎসার ইতিহাসে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন হয়েছিল। পাশাপাশি পাগলামি সম্পর্কে নতুন ডিসকোর্স তৈরী হয়েছিল। মনোবিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞগন এই ক্ষ্যাপামির ভূমিকা ও নৈতিকতার মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করেন। ফলে পাগল নামক ধারণাটি হয়ে ওঠে চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি অন্যতম বিদ্যাচর্চার বিষয়। বাংলার নবজাগরণ পর্বে এনলাইটেন্টমেন্ট এর প্রভাব যুক্তিবাদি ব্যাখ্যার ফলে চিকিৎসকরা দেখাতে চেয়েছিল পাগল ধারণাটি এতদিন কুংস্কারের বশবর্তী হয়ে অপব্যাখ্যা হয়েছিল বাংলার সমাজে । কিন্তু পশ্চিমী সংস্কৃতির আগমনের ফলে ক্রমশঃ পাগলদের প্রতি রূঢ় দমনমূলক ও নিপীড়নমুখী ভাবনা চিন্তা বর্জিত হতে দেখা দেয়। এই পর্বে মনোচিকিৎসা নিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর সাড়া পড়ে গিয়েছিল গোটা বুদ্ধিজীবি মহলে। পাগলদের নিয়ে এপিসটোমোলজিকাল ও তাত্ত্বিক ভাবনা শুরু হয়। ইতিপূর্বে বাংলার গ্রামীন সমাজে ওঝা বা কবিরাজের বাড়িতে আশ্রমিকভাবে পাগলদের চিকিৎসা করা হতো। অপরদিকে হেকিমি চিকিৎসায় উন্মাদরোগীদের চিকিৎসাধীনে আনা হতো। ঔপনিবেশিক পর্যায়ের ইতিহাস কৰমশঃ বদলে গেল। ব্রিটিশ রাজত্বে পশ্চিমী চিকিৎসা বিজ্ঞানের আগমনের ফলে পাগলদের আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে চিকিৎসার তত্ত্বাবধানে আনা হয়েছিল। অর্থাৎ পাগল ও পাগলামী (মনোরোগ) সম্পর্কে ঔপনিবেশিক শাসনকালে সুচিকিৎসার প্রচলন তা ক্রমশ ব্যাপ্তি লাভ করতে শুরু করে। পশ্চিমীজ্ঞান পাগলদেরকে যৌক্তিকতার আলোকে ব্যাখ্যা করার ফলে পাগল হয়ে উঠল মানুষের এক ধরনের বিকৃত- মস্তিষ্কের অবস্থা । অর্থাৎ পাগল নিয়ে জ্ঞানচর্চা ও বিদ্যা চর্চার পাশাপাশি মনোবিজ্ঞানের একটি ডিসিপ্লিন তৈরী হল। এভাবে আধুনিকতার যুগে উন্মাদনা ক্রমান্বয়ে পরিণত হলো মনোবিদ্যার একটি সাবজেক্ট হিসেবে। আবেগ অনুভূতির তীব্র বহিঃপ্রকাশের উপর ভিত্তি করে নামকরণ করা হয় ম্যানিয়া,

মেলানকোলিয়া , হিস্টিরিয়া ,হাইপোকন্ড্রিয়া ইত্যাদি। সর্বপ্রকার ধর্মীয় আর নৈতিকতার লেবাস ছাড়িয়ে এটাকে এখন পুরোপুরি চিকিৎসাবিদ্যার তত্ত্বাবধানে আনা হলো ।

ঔপনিবেশিক কাল পর্বের শেষের দিকে অর্থাৎ প্রায় এক শতাব্দি পূর্ব থেকে মনবিদরা পাগলামি কে মনের রোগ প্রমান করেন এই সঙ্গে পূর্বকার সব ভ্রান্ত ধারনা ক্রমশ অবলুপ্তি ঘটে । মনবিদরা বলেন যেমন শারীরিক রোগের বিভিন্ন রকম-ফের দেখা যায় এবং লক্ষন অনুসারে চিকিৎসকরা বিভিন্ন রোগের নাম দেন, ঠিক তেমনি ভাবেই মনবিদরা মানসিক রোগের ক্ষেত্রে নানারকম নামকরন দিয়ে থাকেন, মনোবিদদের মতে মানসিক রোগ শুধু এক রকমের হয় না । সাধারন মনোবিকার, অল্প বিকৃতমস্তিস্ক এবং সম্পূর্ণ বিকৃত মস্তিস্ক ইত্যাদি । মোটামুটি ভাবে মানসিক বিকৃতি ও বিকৃতের প্রভাব অনুসারে পাগলের তিন প্রকারের শ্রেনিতে বিভাজন করা হয় , যথা নিউরোসিস , সাইকো নিউরোসিস ও সাইকোসিস।

প্রাক ঔপনিবেশিক সময়কালে বাংলার সমাজ জীবনে পাগলদের উপর ক্ষমতা বিস্তার করতো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠার তথা, পুরোহিত সম্প্রদায় তথা ওঝা বা তান্ত্রিক কিংবা মৌলভি । কিন্তু ঔপনিবেশিক কালপর্বে চিকিৎসকরা পাগলদের উপর একপ্রকার কর্তৃত্ব স্থাপন করতে সচেষ্ট হন। ঔপনিবেশিক চিকিৎসকরা সুস্থ আচরণের জন্য উন্মাদ ব্যক্তির উপর প্রয়োজনীয় নজরদারীর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আশ্রম গড়ে তোলেন।

পাগল শব্দটি বহুবিধ অর্থে ব্যবহৃত হয় । সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোন থেকে পাগল ধারণাটি বাংলার ধর্মীয় জীবনের সঙ্গে ওতোপ্রতো ভাবে জড়িয়ে আছে । বিশেষ করে লোক সাংস্কৃতিতে বাউল মতাদর্শে ; বৈষ্ণব মতবাদের সাধন ভজন পদ্ধতিতে পাগল রূপের বহিপ্রকাশ অন্যমাত্রা পেয়েছে । ধর্মীয় ভাবাবেগ ও ভক্তিবাদের সাধনায় সাধক কবিরা পাগল হয়ে উঠতেন আসল সত্যের সন্ধানে । আসলে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে পাগল ধারণাটি ভক্তি ভালবাসা , কামনা , বাসন - ইচ্ছা , আসক্তি আর ঈশ্বরের সান্নিধ্য - এই ভাবাবেগের সঙ্গে মিলে মিশে উদ্ভব হয়ে উঠেছে এক নতুন সাংস্কৃতি ।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান চর্চায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে উন্মদনার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের ফলে পূর্ববর্তী পাগল নামক ভৌতিক ধারণা জনমানস থকে ক্রমশঃ অবসান ঘটেছিল। উন্মদনা আসলে একটি

রোগ, প্রায় সার্বিক ভাবে বঙ্গদেশের মানুষ উপলব্ধি করেছিল। যার সঠিক চিকিৎসা করলে আরোগ্য লাভ করা যায়। সর্বোপরি ঔপনিবেশিক কাঠামোয় ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র ও ঔপনিবেশিক জ্ঞান উভয়ের সংমিশ্রণে পাগল ধারণা ও পাগলামির চিকিৎসার একটি প্যারাডাইম-শিফট তৈরি হয়েছিল। মনোবিজ্ঞানচর্চার ফলে পাগল সম্পর্কিত ভাবনার রূপান্তরিত হয়েছিল মানসিক রোগীতে, আর পাগলাগারদ পরিবর্তিত হয়েছিল মানসিক হাসপাতালে, মনোরোগ ও মনের গভীরতা সুক্ষাতিসুক্ষ ভাবে অনুধাবনের জন্য তৈরি হয়েছিল মনোবিশ্লেষক গোষ্ঠী, যা বিংশ শতকে মনোচিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক নবদিগন্ত রচনা করেছিল এবং এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব আজও উপলব্ধ।

বঙ্গদেশে পাগলদের ইতিহাস ও চিকিৎসা পদ্ধতিতে পশ্চিমের বিরুদ্ধ ভাবনা অবশ্যই ছিল, যার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ আলোচ্য অধ্যায়েগুলিতে প্রমাণিত। কিন্তু ঔপনিবেশিকতা ও তার সাংস্কৃতিক তাৎপর্যকে একেবারেও অস্বীকার যায় না , ঔপনিবেশিক আমলে পাগল সম্পর্কিত জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা বাংলার সমাজে নিম্নবর্গ ও উচ্চবর্গ উভয়ের জীবনকেই প্রভাবিত করেছিল। আবার ঔপনিবেশিক চিকিৎসার সঙ্গে জাতীয়তাবাদের সংঘাতের প্রতিক্রিয়ার ফলে অতীতের পাগলের চিকিৎসায় আয়ুর্বেদ পদ্ধতির পুনঃ জাগরণ ঘটেছিল। অন্যদিকে পাশ্চাত্য মনোচিকিৎসাও দেশীয় আয়ুর্বেদিক পদ্ধতির নানা ভাবনা থেকে পুষ্টিলাভ করেছিল।

ভারতের মনোচিকিৎসা চর্চা, যাত্রাপথ ও তার ইতিহাস বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানে একটি তাৎপর্য বিষয়। ইউরোপীয় অনুপ্রবেশের আগে আধুনিক মনোবিদ্যা বলতে যা বোঝায় সেটির উপস্থিতি প্রায় ছিল না বলা চলে । ঔপনিবেশিক সময়কালে ভারতে মনোচিকিৎসা সর্বপ্রথম আবির্ভাব হয় এবং ক্রমশ অগ্রগতি ঘটতে থাকে । কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে , ব্রিটিশ বিজয়ের আগেই ভারতে উন্মাদ চিকিৎসার ঐতিহ্য ছিল। ধ্রুপদী যুগের দেশীয় উন্মাদ চিকিৎসার ঐতিহ্য আরও বেশী সক্রিয়তা লাভ করে ঔপনিবেশিক শাসনকালে । কিন্তু দেশীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের ওপর ঔপনিবেশিক চিকিৎসা বিজ্ঞান আধিপত্য বিস্তার করে পশ্চিমীরা মহান বলে দাবি করেছিল। যাকে জ্ঞান ও শক্তির সমীকরণ বলে চিহ্নিত করা হয়, ভারতীয়দের জ্ঞান ও বিজ্ঞানে

শিক্ষিত করার মতো কোনো ইচ্ছা ইউরোপীয়দের ছিল না, বরং চিকিৎসা শাস্ত্র ঔপনিবেশিক শাসকদল নিজের প্রয়োজনে নিজের মতো ব্যবহারের চেষ্টা করলেও সেটি সম্পূর্ণরূপে তাদের অধিকারভুক্ত ছিল না । পাগল নিয়ে চিকিৎসা চর্চা ভারতে অতীতেও ছিল এবং ঔপনিবেশিক আমলেও ছিল। প্রতিযোগিতার হিসাবে জন্মগ্রহণ করতে থাকে জাতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাবনা ।পরবর্তী কালে ভারতবাসীর প্রয়োজনে উন্মাদনা সম্পর্কে শিক্ষা ও গবেষণা বিভিন্ন ব্যাবহারিক প্রয়োগ শুরু হয় । দেশীয় চিকিৎসকেরা মধ্যে ঔপনিবেশিক শাসকের দৃঢ় মুষ্টি থেকে মনোচিকিৎসাকে বের করে এনে দেশীয় স্বার্থে কাজে লাগানোর প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন গিরিন্দ্রি শেখর বসুর মতো মনোবিজ্ঞানীরা। সার্বিক মূল্যায়নে পরিপেক্ষিতে বলা যায় , আলোচিত পাঁচটি অধ্যায়ের ইতিহাস অনুসন্ধানের পর যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি তা পর্যায় ক্রমে আলোচনা করা হল। যথা-

প্রথমতঃ সামাজিক দৃষ্টিতে পাগলামি হলো বহুত্ব ধারণা বিষয়, যার রহস্য আমাদের কাছে বহুচর্চিত বিষয়। কিন্তু ঔপনিবেশিক সময়কালে মনোবিজ্ঞানের গবেষনার পাগল ধারণা নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে প্রকাশিত হতে শুরু করে । উনিশ শতকের এনলাইটেড পর্বে বা রেনেসা উত্তোরনের সময় পাগলামি নামক ধারণার সঙ্গে যে ভৌতিক কর্মকান্ড ও অতিন্দ্রীয় শক্তির যে প্রভাব বলে মনে করা হতো, সেই অবজেকটিভ ধারণা থেকেই আধুনিকতার উত্তোরনের সঙ্গে সঙ্গে পাগল ও পাগলামি সাবজেকটিভ বিষয় আকারে আমাদের কাছে উপস্থাপিত হয়েছিল । বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলশ্রুতি হিসাবে জৈবিক যুগে পাগলামিকে রোগের উপসর্গ হিসাবে চিহ্নিত করা হল । কিন্তু বাংলার সমাজ জীবনে পাগল যেভাবে আলোচিত পশ্চিমী সভ্যতায় ম্যাড বা ক্রেজি সেই দৃষ্টিকোন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা । বাংলার পাগল ধারণাটি একটি বহু মাত্রিক অর্থের ওপর প্রতিষ্ঠিত । যে অর্থগুলিকে কেন্দ্র করে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে কোনও না কোনও অংশে কী সামাজিক প্রতিষ্ঠা বা কী ধর্মিয় আচরণ , রাজনৈতিক ক্ষেত্র , চিন্তা ভাবনা , মনন জগত, আশা ভালোবাসা ইত্যাদির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হয়ে আছে । বঙ্গদেশে পাগল শব্দটি অর্থ বিভিন্ন রকমভাবে ব্যবহার করা হয় সেই প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃত ভাষায় পাগল শব্দের মাধ্যমে বহুবিধ অর্থকে বোঝান হত। পরবর্তীকালেও এটি বিবর্তিত

হয়েছে সমাজ জীবনে বিভিন্ন অর্থের প্রয়োগের মধ্যে। শব্দের অর্থের মধ্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পার্থক্য। পাগল শব্দের অর্থ কত রকমের হয় , বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর ক্ষেত্রে বা কোন বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে শব্দ দ্বারা চিহ্নিত করা হয় । এখানেই শব্দ ও অর্থের তাৎপর্য । উন্মাদ কখনো হয়ে উঠেছে পাগল , আবার কখনো চিত্তসম্মোহন , চিত্তবিভ্রম , মতিভ্রংশ ইত্যাদি , বাংলার পাগল আর পশ্চিমের ম্যাড হয়তো অর্থগত দিক থেকে এক হলেও ব্যবহারিক দিক থেকে পশ্চিমের পাগলের সাথে দুস্তর প্রভেদ আছে , তাই বাঙালি জীবনে পাগল কখনও হয়ে উঠেছে নস্টালজিয়া , কখনও বা রোমান্টিসিজম। সামাজিক,ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে পাগল হয়ে উঠেছে মত্ত, উন্মাদ, ক্ষ্যাপা, ক্ষিপ্তগ্রস্থ, আভোলা, বিবাদি, দীওয়ানা, ফানা, কান্ডজ্ঞানহীন, নির্বুদ্ধিতা বা নির্বোধ ইত্যাদি। উনিশ শতকের সময়কালে বাংলার সামাজিক জীবনে বিভিন্ন সাহিত্য ভাবনা , আঞ্চলিক ভাষা , লোকোগান , কিম্বা সংস্কৃত সাহিত্যে পাগলনামক ধারণা সঙ্গে লোকায়ত অর্থ ও নান্দনিকতা মিশিয়ে পাগলের ইতিহাস বিবিধ-মুখী হয়ে উঠেছে। আবার ক্লিনিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে পাগল বলতে বোঝায় মানষিক রোগী , মনোবিকারগ্রস্থ, বিকৃত মস্তিষ্ক , অস্বাভাবিক আচরণ , ইনসেন্স , ইনস্যানিটি , অ্যাবনরমাল বিহেবিহার , মেনটাল ডিসঅর্ডার, লুনাটিক ,স্ক্রিজোফ্রেনিয়া , হাইপো কনড্রিয়া , ডিলিউশন , হ্যালুসিয়েশন , ননসেন্স কিংবা বাইপোলার ডিসঅর্ডার ইত্যাদি । এ-সবই পাগলামির এক একটা দিক । বাংলার সমাজে পাগল নামক শব্দটির নানা রূপ , নানা অর্থ ও বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রচলিত ।

দ্বিতীয়তঃ ঔপনিবেশিক বাংলায় ব্রিটিশ কর্তৃক উন্মাদ আশ্রম প্রতিষ্ঠার ইতিহাস প্রসঙ্গে বলা যায় যে , ইউরোপের উপযোগবাদ, হিতবাদী দর্শন, খ্রিস্টীয় মানবিকতা ব্রিটিশ ভারতের শাসককুলকে জনকল্যাণকর আদর্শ ও কর্মে প্রণদিত করেছিলড় এই ডিসকোর্স ইতিহাস মহলে প্রচলিত। বলা হয় বেন্টিঙ্ক , রিপন প্রমুখ শাসকের প্রশাসনিক সংস্কার উনবিংশ শতাব্দীর এই জনপ্রিয় দর্শনকেই পুষ্ট করেছিল । ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরাও জনকল্যাণমূলক সংস্কার কর্মের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শাসকরা এদেশে প্রাচ্যদেশীয় স্বৈরাচারের জায়গায় জ্ঞানদীপ্ত উদার মানবিকতার তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। কথাটি কতদূর সত্যি , কিংবা আদৌ সত্যি কিনা , সে-নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে বিতর্ক আছে । যারা প্রচলিত এবং প্রতিষ্ঠিত নিয়মবিধিকে ভঙ্গ করে , সমাজে যাদের

ভাবনা এবং কর্মসম্পাদনা সামাজিক শৃঙ্খলার পক্ষে বিপজ্জনক , ঔপনিবেশিক শাসক তাদেরকে সমাজ জীবনের সীমান্তে রাখার চেষ্টা করেছিল। আর  যারা সামরিক, বেসামরিক বা নাগরিক আইন ভঙ্গ করতো, তাদের জন্য বানিয়েছিল জেলখানার মতো প্রতিষ্ঠান। কিংবা স্বাস্থ্যহীনতা এবং শরীর সমাজে ব্যাধিসংক্রমণের সম্ভাবনা সৃষ্টি করত , সরকার তাদের জন্য তৈরি করেছিল হাসপাতাল। একইভাবে , যাদের আচার, আচরণ, কথাবার্তা সমাজের প্রচলিত ঔপনিবেশিক বিধিব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন কিংবা অসংলগ্ন মনে হতো , সরকার তাদের জন্য তৈরি করেছিল উন্মাদ আশ্রম।

সুতরাং এর মধ্যে ঔপনিবেশিক সরকারের শুভেচ্ছা এবং হিতাকাঙ্ক্ষা যতটা প্রবল ছিল , তার চেয়ে প্রবলতর ছিল সমাজ এবং রাষ্ট্রকাঠামোকে সুস্থির এবং সংযত রাখার প্রচেষ্টা। ফলে শরীর, যা নিতান্তই ব্যক্তি সংস্থান, তাকে ব্যক্তিগত আয়ত্ত থেকে বৃহত্তম সামাজিক প্রয়োজনের আওতায় আনা হয়েছিল। শরীরের এই সামগ্রিক সামাজিকীকরণ বাংলায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদের একটি বিশিষ্ট দিক।  পাগলাগারদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে ঔপনিবেশিক সরকারের এই স্বরূপটি ধরা পড়ে। নামে পৃথককৃত সামাজিক নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা  হলেও , এই নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টার মধ্যেও বৃহত্তর রাজনৈতিক ও আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটটি সরকার আড়াল করতে পারেনি । জেল , হাসপাতাল ও উন্মাদ আশ্রমের বাইরে, ব্রিটিশ সরকার ঔপনিবেশিক নীতির যে কেন্দ্রীয় সত্যটি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল তা হলো উত্তরোত্তর অর্থসংস্থান ও রাজস্ব বৃদ্ধি, যার দ্বারা ব্রিটিশ বাণিজ্য-ব্যবস্থার সুস্থির উন্নয়ন ঘটানো যায়। উন্মাদ আশ্রম প্রতিষ্ঠানের মতো  স্বতন্ত্রকারী সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টাতেও এই ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছিল।

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় এসেছিল অর্থ-লিপ্সা'র সন্ধানে । এই সহজ সত্যটি পাগলাগারদের সমকালীন নথিপত্রে প্রমান পাওয়া যায়। তারপর ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে শ্রেণী বিভাজন, বর্ণবিদ্বেষ , স্বজাতিগর্ব এই সূত্রেই সে কায়েম করেছিল। রাষ্ট্রকাঠামোয় সরকার যেমন পদমর্যাদার ক্রমবিন্যাস করেছিল , পাগলাগারদেও সেই পদক্রম বজায় ছিল । পাগলাগারদের

কর্মী সংগঠনে জাতি , বর্ণ , শ্রেণী অগ্রাধিকার পেত । সুতরাং দেখা যাচ্ছে , ঔপনিবেশিক বাংলায় পাগলাগারদ প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে সরকারের মানবিক সদিচ্ছা যতটা না প্রকাশিত , তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি উচ্চকিত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বর্ণগরিমার ভূমিকাটি। পাগলাগারদেও সুস্থ সরকারের জাতিগৌরব ও সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা রীতিমতো বিচ্ছুরিত । জ্ঞানের অহমিকা , মানবিকতার দোহাই এবং নিজেদের বেশি শিক্ষিত প্রমাণ করার চেষ্টা রয়েছে , তাদের লিখিত বয়ানের ছত্রেছত্রে। রিপোর্টগুলিতে দেখা যায় বর্ণ , জাতি ও শ্রেণি , সবরকমের বৈষম্যের নিরিখে যারা তলায় , তাঁদের অশেষ দুর্ভোগ পোহাতে হত। পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে যে বেশিরভাগ রুগীরই মৃত্যু হত ভিতরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে ডায়ারিয়া আর অন্যান্য সংক্রমণে । চিকিৎসা বলতে আটক রাখা , মাঝে মধ্যে মরফিয়া জাতীয় ওষুধ দেওয়া , আর বিনা পয়সায় খাটানো। এই খাটুনি থেকে কর্তৃপক্ষ ভালোই মুনাফা অর্জন করত।

উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক কাঠামোয় বাংলায় পাগলাগারদের চিকিৎসার বিদ্যার যে ভাষ্যগুলি উপস্থাপিত করা হল তার প্রধান দিক ছিল পাগলকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য নানারকম নিয়মাবলি তৈরিতে। আর চিকিৎসার ব্যাপারটা বেশ আরবিট্রারি বা আন্দাজি ছিল। পাগলাগারদগুলি গড়ে তোলা হয়েছিল ইউরোপের বাঁধন-হীন চিকিৎসার ধারণায় এবং আইন শুধু তাদেরই আটকে রাখতে চেয়েছিল যারা আদালত ও ডাক্তারের দ্বারা চিহ্নিত হবে পাগল্ব বলে। কিন্তু বিংশ শতকের প্রথম অর্ধে পাগলদের নিয়ে দেশীয় উদ্যোগে যে চিকিৎসা সুরু হয়ে তা ছিল সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক। যে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসন লাভ করার লক্ষ্য নিয়ে চলেছিল, যার প্রয়োগ হয়েছিল জনসাধারণের স্বাস্থ্য পরিচালনা,যার একটি বিশেষ ক্ষেত্র উন্মাদাশ্রম । দেশীয় জনগণের উত্থান ঘটানোর ভিক্টোরীয় নীতি ব্যবহার করা হয়েছিল যাতে সত্যিকারের মানসিকভাবে অসুস্থ নয় তাদের জন্য যুক্তি তৈরি করা যায়। কিন্তু উন্মাদাশ্রমের পণ্য থেকে যে অর্থ পাওয়া গিয়েছিল, তা সেই উন্মাদাশ্রমের ভালোর জন্য পুনর্বিনিয়োগ করা হয়নি।

ভারতে কেবলমাত্র নেটিভদের জন্য উন্মাদাশ্রমে এমন কোনো সুব্যবস্থা ছিল না। ব্রিটিশদের লক্ষ্য কখনই রোগমুক্তি ছিল না; যেকোন প্রকারে লাভ করাই ছিল তথাকথিত উন্মাদ্ব-দের আটক রাখার মূল উদ্দেশ্য। উন্মাদাশ্রমে, যাযাবর এবং ভবঘুরেদের হিসাব রাখা যাবে, যা আতঙ্কিত ব্রিটিশদের নিরাপত্তার ঝুঁকিকে কমাতে পারবে। ভিক্টোরীয় নীতি ব্রিটিশদের যুক্তিকে পুষ্ট করেছিল যে কাজ জগতের সমস্ত কুপ্রভাব কাটিয়ে দিতে পারবে। আর এর পরিবর্তে ব্রিটিশরা সেই চিকিৎস্ব থেকে লাভ করতে পারবে। ব্রিটিশরা দাবী করেছিল যে আটক রাখার তাদের ব্যবস্থা ছিল তাদের নৈতিক দায়বদ্ধতা ও তাদের চিকিৎসার পদ্ধতির অংশ, কিন্তু শেষ হয়ছিল তাদের লাভ দিয়ে, মনোরোগের উন্নতিসাধন দিয়ে নয়।

গোটা উনবিংশ শতক জুড়ে আলোকপ্রাপ্তি আর প্রগতির দোহাই দিয়ে নেটিভ পাগল নিয়ন্ত্রণের জন্য এক নতুন ব্যবস্থা আর জ্ঞানচর্চা শুরু হল তার ভিত্তি এদেশে ততটা সুসংবদ্ধ বা দৃঢ় ছিল না। তার একটা বড় কারণ এক ভিন্ন সংস্কৃতির সাথে এই ব্যবস্থার যে সু-সম্পর্ক তৈরি করে নিজেদের লিপ্সা কে পরিপুরন করা, কারণ সেই সংস্কৃতির নানা স্তরে তৈরি হচ্ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ । একদিকে উন্নত ও সভ্য হবার দাবি প্রমাণের জন্য এখানকার প্রায় সবকিছুই কুসংস্কার , অযৌক্তিক ও অবিকশিত বিষয় হিসাবে চিহ্নিত এবং ঘোষিত হতে লাগল। অপরদিকে এই যে উপনিবেশায়িত শিশুসুলভ ভারতীয় কে সাবালক করার লক্ষ্যে যে কার্যক্রম তৈরি করা হয়েছিল তার পশ্চাতে গভীর দুরাভিসন্ধি কে কাজে লাগিয়েছিল উন্মাদ আশ্রম প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ।

তৃতীয়তঃ ঔপনিবেশিক শাসকদের সৃষ্টি করা জ্ঞানে যাকে পাগল বলে মনে হতো সেটা সর্বদা বাংলার স্থানীয় জ্ঞানচর্চার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না । পাগল সাব্যস্ত করতে যে সব লক্ষণগুলিকে তারা নথিভুক্ত করত স্থানীয় মানুষদের জ্ঞানচর্চার সঙ্গে সেগুলো যথাযথ ছিল না। কিন্তু সেই অসঙ্গতি পরিপূর্ণ হয়েছিল বিংশ শতকের প্রথম অর্ধে, যখন দেশীয় উদ্যোগে মানসিক রোগ চিকিৎসার যাত্রা পথ সূচনা হয়েছিল। যার প্রধান রুপকার ছিলেন গিরিন্দ্র শেখর কিংবা কবিরাজ

অতুল বিহারী দত্তের মতো চিকিৎসকরা। প্রকৃত পক্ষে ঔপনিবেশিক বাংলায় মানসিক রোগ চিকিৎসার উন্নতি বিধানের ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ান সাইকো অ্যানালিক্যাল সোসাইটি , লুম্বিনী পার্ক মানসিক হাসপাতাল কিংবা বঙ্গীয় উন্মাদ আশ্রমের মতো প্রতিষ্ঠানগুলি যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল । ফলে বাংলার পাগল চিকিৎসা এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল।

পাশ্চাত্য থেকে আমদানি করা জ্ঞানকে নকল করার চেয়েও তাকে সংস্কৃতির সঙ্গে তুলনামূলক বিশ্লেষণে ফেলে বিচার করার বাংলায় মানসিক রোগ চিকিৎসায় একটা ধারার অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায় । মনোবিদ্যা কে আধুনিক হয়ে ওঠার বাসনার মধ্যেই থাকে বর্ণসংকরতার মধ্যে নিজের ছাপটি নির্মাণ করার প্রবণতা । এই আধুনিকতার চেহারা আলাদা, যা ক্রমশ উত্তর - ঔপনিবেশিক সংস্কৃতিতে বিকশিত হয় ওঠে। যার সঙ্গে ইউরো-আমেরিকান সংস্কৃতির মিল পাওয়া গেলেও তা স্থানীয় সংস্কৃতির আত্মপরিচিতি ও মেলবন্ধন ঘটে। ভারতীয় সমাজে মানসিক হাসপাতালের মধ্য দিয়ে মনস্তত্ত্বচর্চার জন্ম নেবার আখ্যানে তাই প্রমাণিত হয়। অ্যাকাডেমিক মনস্তত্ত্ব যখন প্রসারিত হয় লোক সমাজের মধ্যে তখন বাংলায় রূপান্তরিত মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসায় ও জ্ঞানতাত্ত্বিক মনোবিদ্যার আরও পরিবর্তন ঘটে , এভাবেই ঔপনিবেশিক বাংলায় আধুনিক মনস্তত্ত্বচর্চা গৃহীত হয়েছিল স্থানীয় সংস্কৃতির মধ্যে ।

চতুর্থতঃ ঔপনিবেশিক উন্মাদ আইনিগুলি নৈতিক চিকিৎসা হিসাবে পাগলের সুযোগ সুবিধা দিয়েছিল ঠিকই কিন্তু এসাইলামের অভ্যন্তরে নিপীড়ক এবং দমনকারী হিসাবে কাজ করেছিল । আবার পাগল কে শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন দিয়েছিল কিন্তু উন্মাদ আশ্রমের সৃষ্টি উদার মানবতার মনোভাবের অন্তরালে পাগলের উপর যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থা ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে শাসক কুলের আধিপত্য ও প্রভুত্ব মূলক মনোভাব কাজ করেছিল । ঔপনিবেশিক বাংলায় পাগল আইন তৈরির আগে পাগলরা আসলে আরও ভাল ছিল। কারণ পাগলরা তাদের ইচ্ছে মতো চলতে পারত কিন্তু কিন্তু ঔপনিবেশিক অনুশাসন তাদের এক কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ করেছিল। এবং পাগলের কণ্ঠস্বর এখন আইনি পরিকাঠামোর মধ্য দিয়ে পরিচালিত হতে শুরু করে ,

পাগলকে মুক্তি দেওয়ার নামে এই বৈধ ব্যবস্থা পাগলের জন্য আরও বেশি শক্তিশালী 'নৈতিক কারাবাস' এর জন্ম দেয়।

পঞ্চমতঃ ব্রিটিশ পরবর্তী সময়ে মনোচিকিৎসার ইতিহাসচর্চার এক বৃহৎ অংশই ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাথে যুক্ত। উপনিবেশিক এবং নিতান্ত আধুনিক সময়ের ইতিহাসচর্চার কথা বাদ দিলে পুরনো ইতিহাস চর্চার একটি বিশেষ ধরন ছিল, এর ঝোঁক ছিল অতীত ভারতের গৌরবগাথা রচনার দিকে। অন্য সমস্ত ইতিহাস রচনার মতোই ভারতের পাগল চিকিৎসার ইতিহাস অনুধাবন করতে গেলে কোনো একটি একমাত্রিক ছকে কিংবা শাসক-শাসিতের সরল কাঠামোতে একে বোঝা যাবে না । পাগল চিকিৎসার ক্ষেত্রে পশ্চিমীজ্ঞান কেবল চুইয়ে বা ব্যাপন প্রক্রিয়ায় এদেশে এসে পৌঁছোয়নি বরং উন্মাদ রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রেও তাঁরা প্রাচ্য জ্ঞানও সংগ্রহ করেছিল, পশ্চিমী চিকিৎসা বিজ্ঞান ছাড়াও এদেশে নিজস্ব একটি চিকিৎসা ধারা ছিল, যা ছিল বিশ্বের অন্যান্য সভ্যতা থেকে পৃথক। অর্থাৎ পাগল চিকিৎসার জ্ঞান পশ্চিমী সভ্যতা থেকে আমারা গ্রহন করিনি , বরং ব্রিটিশ তা এদেশে আসার পূর্বে আয়ুর্বেদ পদ্ধতিতে উন্মাদ রোগ চিকিৎসার একটি ধারা প্রচলিত ছিল। আবার আধুনিক চিকিৎসার সঙ্গে দেশীয় চিকিৎসার বিভিন্ন ধারার ( বিশেষত আয়ুর্বেদ ) সংঘাত, সহযোগিতা ও সহবাস এর মধ্য দিয়ে স্তরায়িত ও সম্পর্কিত হয়েছিল । এ কারণে শুধুমাত্র নাকচ কিংবা গ্রহণ এই কাঠামোকে অতিক্রম করে নানাভাবে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্তরে দেশীয় চিকিৎসার ইতিহাসকে খোঁজার চেষ্টা আজ বিশ্বের গবেষকমহলে ধীরে ধীরে প্রাধান্য লাভ করছে । এর মাঝে সামাজিক রাজনৈতিক - অর্থনৈতিক অনুষঙ্গ যেমন আছে , তেমনি ভাষা, শব্দ ও বিশেষ ভূমিকাকে বোঝার অনুষঙ্গ গুলোও আছে । বর্তমান সময়ে এসব কিছুকে নতুন করে বোঝা মনোচিকিৎসার ইতিহাস প্রাথমিক উপাদান হয়ে উঠছে ।

ঔপনিবেশিক বাংলায় পাশ্চাত্য চিকিৎসার সঙ্গে পাগলের চিকিৎসার সাথে সম্পর্ক কেমন ছিল তা উপরিউক্ত আলোচনার দ্বারা বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে। উন্মাদ রোগ চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়টি

ব্যাখ্যা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে পাগল চিকিৎসার ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক বাংলায় চিকিৎসাবিদ্যার বহুমাত্রিক অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। যেটি ছিল ভিন্ন প্রকারের বিপরীতধর্মী কাঠামোর দ্বারা নির্মিত। আবার পাগল চিকিৎসার ক্ষেত্রে পশ্চিমী পদ্ধতি ছিল আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক । উনিশ শতকের উন্মাদ রোগের পাশ্চাত্য চিকিৎসা ও আয়ুর্বেদ চিকিৎসার তাৎপর্য আলোকায়ন মধ্যে একটি বিচিত্র সমস্যারূপে আপ্রকাশ করে। কারন বঙ্গদেশে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যার ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ কে সমানভাবে সইতে হয়েছিল । পাগল চিকিৎসার জন্য কবিরাজ ও বৈদ্যগণ যে পদ্ধতি প্রয়োগ করত সেটিকে পশ্চিমী চিকিৎসকগণ কখনো অবৈজ্ঞানিক ও কখনো কুসংস্কার আচ্ছন্ন বলে অবিহিত করত। কিন্তু সেই সময় ভারতীয় অভিজাতশ্রেণি ও মধ্যবিত্ত রোগী ও চিকিৎসক উভয়ের কাছে দেশীয় চিকিৎসা প্রবলভাবে জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক কর্তাদের কাছে দেশীয় চিকিৎসা সাথে ধর্মাচরণের আত্মীয়তা আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতি কোণঠাসা হওয়ার (marginal) কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেশীয় চিকিৎসাবিদ্যার বিষয়টি আমাদের দেখায় নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে , ঔপনিবেশিক কর্তারা প্রচার করত উন্মাদ রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে কবিরাজগণ যে পদ্ধতি প্রয়োগ করত তা ছিল কাল্পনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের অংশ, তার কোন কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই । অর্থাৎ পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ নিজেরদের পদ্ধতি কে মহিমান্বিত করার জন্য , আয়ুর্বেদ পদ্ধতি নিজেরদের মতো করে অপব্যাখ্যা করত । মতানৈক্যের জটিল চ্যালেঞ্জের ব্যাখ্যা উভয় জগৎই ঔপনিবেশিক প্রাচ্য ও ব্রিটেনের ওষধিশাস্ত্র এবং মনোবিদ্যার উন্নয়নের রূপরেখা আরও গভীরভাবে বুঝতে সাহায্য করে।

কিন্তু ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ভারতের সমৃদ্ধ ও বহুমুখী উন্মাদ রোগ চিকিৎসার ঐতিহ্যকে পুরোপুরি ধ্বংস করতে পারেনি । ফলে , প্রাক - ঔপনিবেশিক আচরণ ও চিন্তন পদ্ধতির ভিত্তিতে এখানে এক সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ জোরালো আকার ধারন করেছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ভারতের গৌরবময় অতীতের বৌদ্ধিক ও বস্তুতান্ত্রিক কীর্তিগাথার জয়গান মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল । ফলে উপনিবেশবাদেও আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ ও

আত্মমর্যাদা হারানো জাতীয় গরিমা পুনরুদ্ধার সহজতর হয়েছিল । এর ফলে একই সঙ্গে আরও যা সম্ভব হল তা হচ্ছে দেশীয় ঐতিহ্য ও ধ্রুপদী উন্মাদ চিকিৎসার পুনরুদ্ধার এবং ইউরোপীয় ও ভারতীয় জ্ঞানভান্ডারের সমন্বয়ের ফলে কীভাবে মনঃসমীক্ষণের সঙ্গে বাঙালি চিন্তা ও নিরাময় পদ্ধতির সার্থক মেলবন্ধন সম্ভব হয়েছিল।

আধুনিক পশ্চিমী চিকিৎসা ও ঔষধ পুঁজিবাদী বাজারকেও জোরদার করে তুলেছিল । বিগত শতাব্দীর শুরুতে সাইক্রিয়াটিস্ট নামক মেডিকেল বিশেষজ্ঞের উদ্ভব হলো। পাগলামী নিরাময়ের জন্য পৃথক মেডিকেল শাখা গড়ে উঠল । তৈরি হতে লাগল নানা ওষুধ । আর্থিক , সামাজিক , সাংস্কৃতিক ব্যবধানের বাধা অতিক্রম করে তা প্রযুক্ত হতে লাগল প্রাচ্য শরীরে এইসব ওষুধ ব্যবহার প্রায় বাধ্যতামূলক করা হলো নানা আইনের বাধ্যবাধকতায় । এদেশে পাশ্চাত্য ওষুধের বাজার সুনিশ্চিত হলো । সমগ্র উনিশ শতক ধরে মানসিক স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকার যা করেছিল , তা ছিল কেবলমাত্র উপনিবেশ টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে, কোম্পানির কর্মচারী ও সেনাবাহিনীর জন্য চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন এবং নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও দেশীয় প্রজাদের জন্যে কিছু কিছু হাসপাতাল ও ডিসপেনসারি প্রতিষ্ঠা । যদিও সেগুলির অধিকাংশরই নির্মাণ ও পরিচালনগত ব্যয় নির্বাহ হত এদেশের কোষাগার থেকে ।

আসলে ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিল মূলত একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান । যে কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মতো এই সংস্থারও মূল লক্ষ্য ছিল কম বিনিয়োগ করে বেশি মুনাফা অর্জন করা। সেজন্য ন্যূনতম পক্ষে যতটুকু খরচ না করলে নয় , তা করে কোম্পানি প্রচুর পরিনাম মুনাফা ইংল্যান্ডে পাঠাতো , অথচ ভারতের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করেনি । যদিও একথা স্বীকার করতে হয় যে , ব্রিটিশ রাজত্বেই ভারতে পশ্চিমী চিকৎসা বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যনীতি ক্রমশঃ উন্নত হয়ে উঠেছিল এবং ইউরোপে এগুলির বিবর্তনের সাথে সাথে এগুলি ভারতের চিকিৎসা ব্যবস্থার ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে কিন্তু কোম্পানির উপযুক্ত সদিচ্ছা ও কল্যাণকামী মানসিকতার অভাবে ভারতের মাটিতে এর আগমন ঘটেছিল মাত্র কিন্তু সফল রূপায়ণ ঘটেনি । এতদসত্ত্বেও একথা অবশ্যই স্বীকার

করতে হয় যে , এদেশে পশ্চিমী চিকৎসা বিজ্ঞানের আমদানির ফলে চিকিৎসা ক্ষেত্রে গ্রাম বাংলায় প্রচলিত পাগল চিকিৎসায় অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারগুলি ধীরে ধীরে দূর হতে শুরু করে , মানসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় অনেকাংশে নিরাপত্তা লাভ করে । অপরদিকে পশ্চিমী চিকৎসার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তাল মিলিয়ে আয়ুর্বেদ পদ্ধতিতে উন্মাদ চিকিৎসা গুলির ধরন ও বদলে গিয়েছিল এবং আয়ুর্বেদ পদ্ধতিতে পুনরুজ্জীবনের ফলে উন্মাদ চিকিৎসা পদ্ধতিও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল এবং দেশীয় সমাজে মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনা বৃদ্ধি পায় । আর এগুলিই পরবর্তীকালে স্বাধীনত্তোর ভারতে একটি পরিপূর্ণ মানসিক স্বাস্থ্যনীতি রচনায় সাহায্য করে ।

# পরিশিষ্ট

## মানচিত্র -১

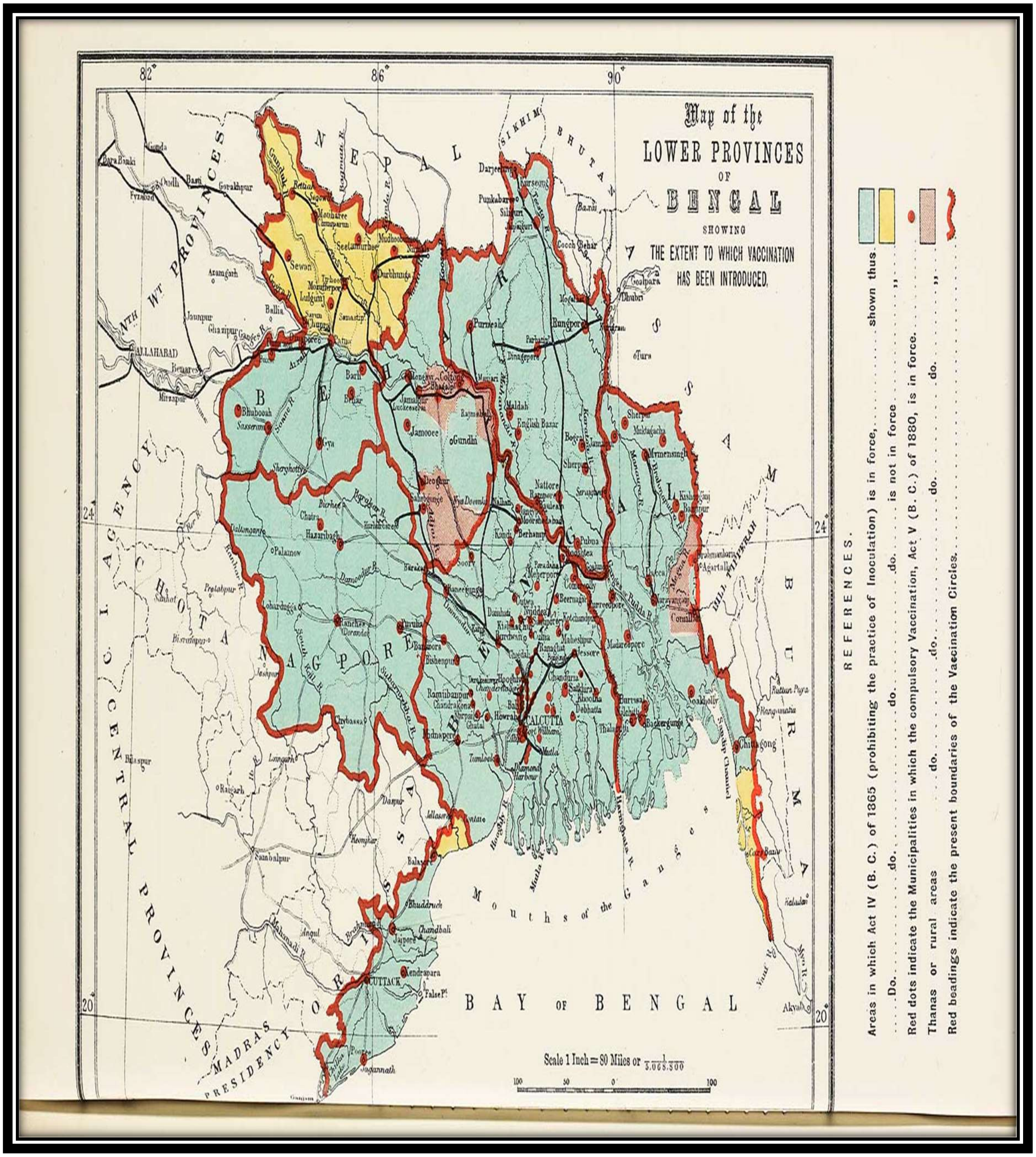


ঔপনিবেশিক আমলে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির মানচিত্র – ১৮৮০ খ্রীঃ

( লোয়ার প্রভিন্সেস অফ বেঙ্গল )

## মানচিত্র -২

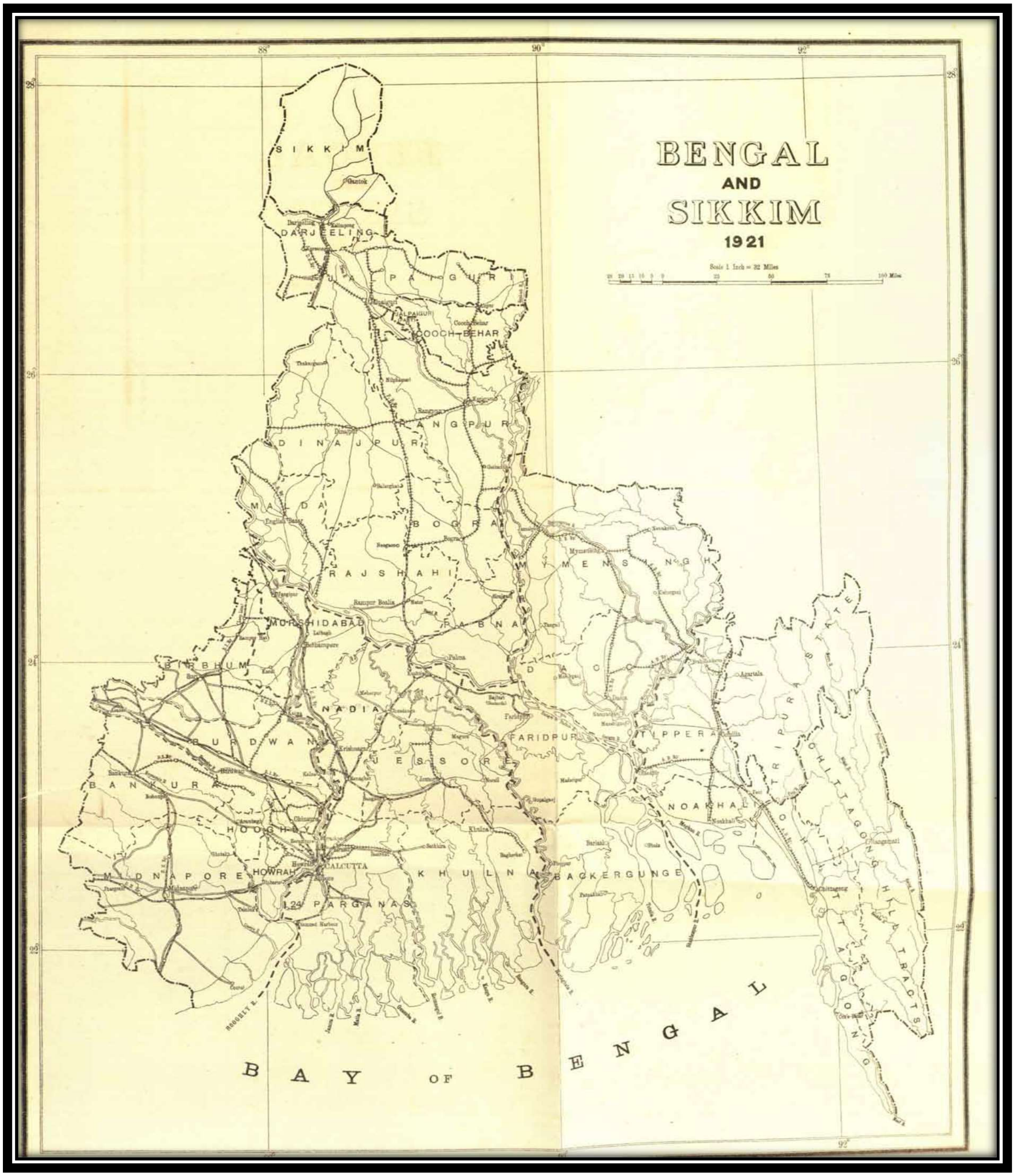


**বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির**

**বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির মানচিত্র – ১৯২১ খ্রীঃ**

## মানচিত্র - ৩

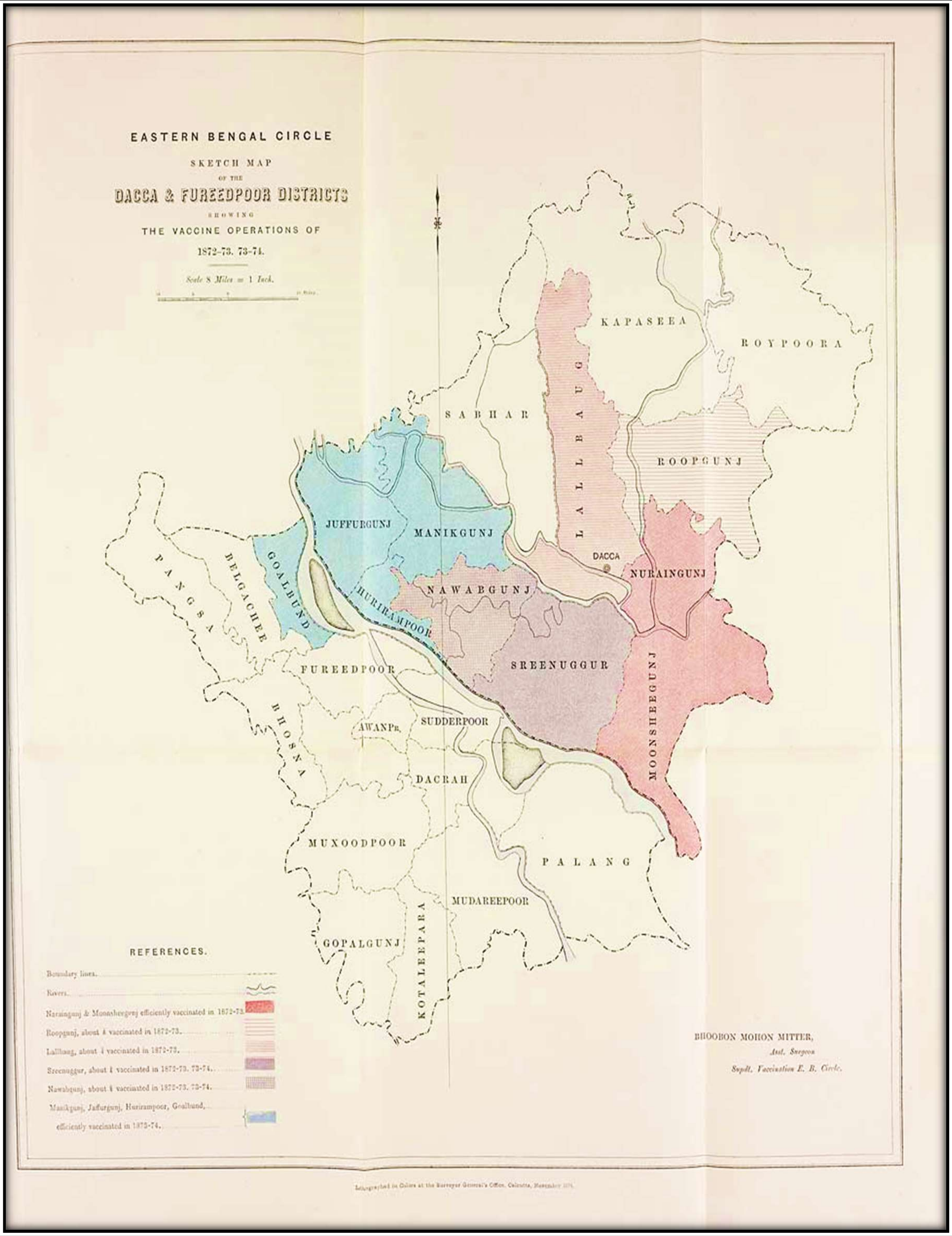


পূর্ববঙ্গ - ঢাকা ও ফরিদপুর জেলা

## মানচিত্র -৪

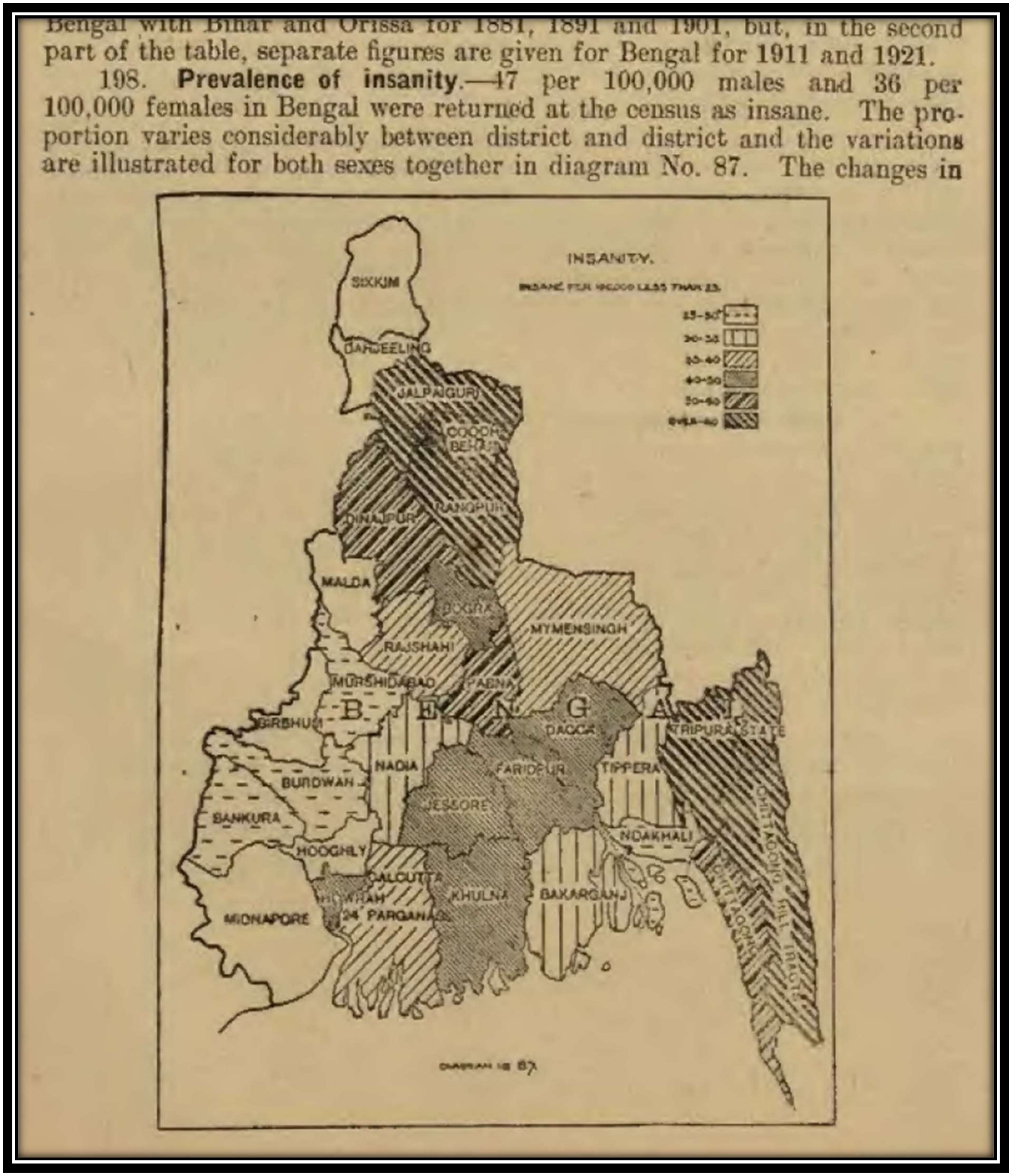

Bengal with Bihar and Orissa for 1881, 1891 and 1901, but, in the second part of the table, separate figures are given for Bengal for 1911 and 1921.

198. **Prevalence of insanity.**—47 per 100,000 males and 36 per 100,000 females in Bengal were returned at the census as insane. The proportion varies considerably between district and district and the variations are illustrated for both sexes together in diagram No. 87. The changes in



**১৯২১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীতে**

**পাগলদের আনুপাতিক হারের মানচিত্র**

## চিত্র -১

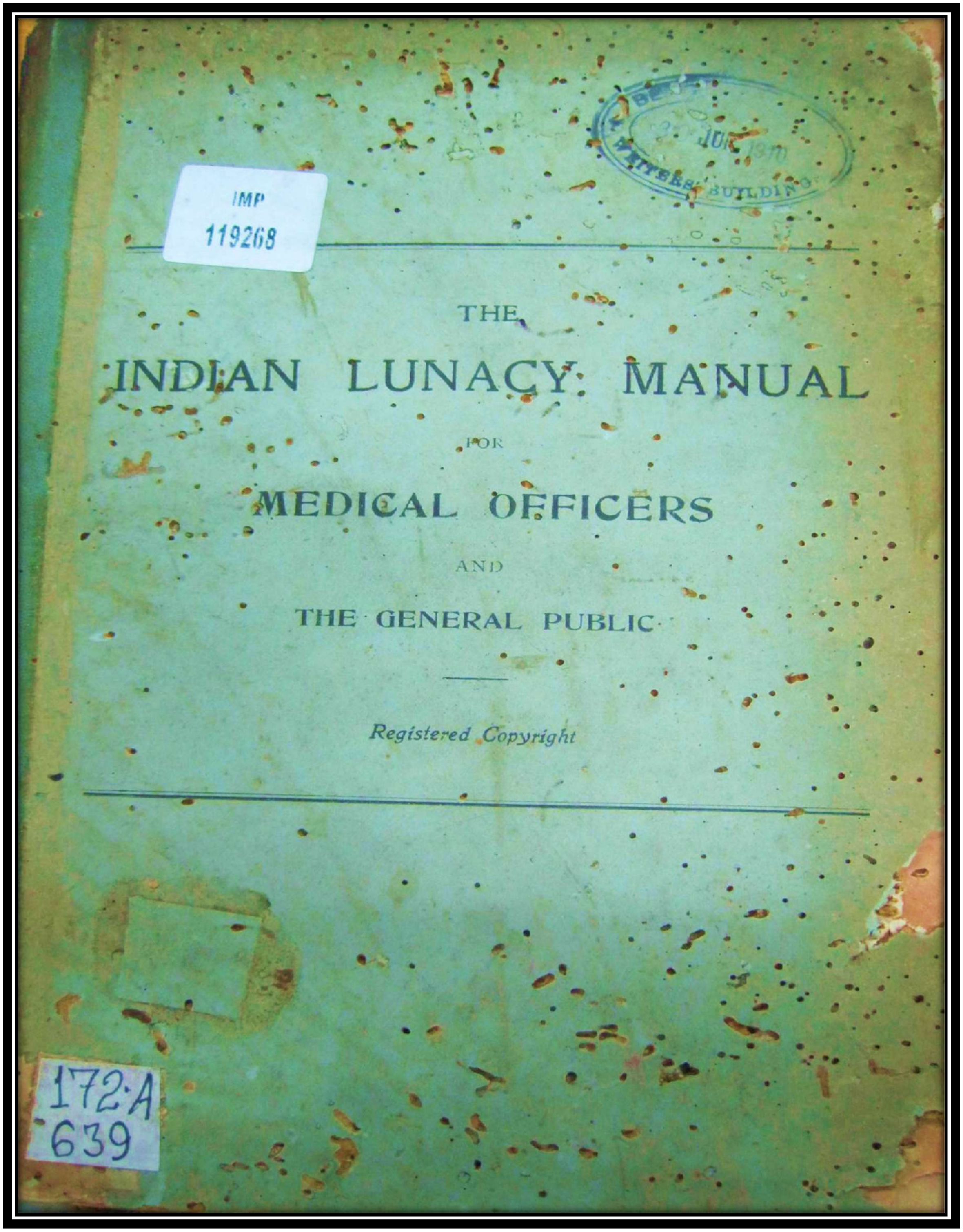


পাগল সংক্রান্ত নীতি মালার এক দুর্লভ চিত্রের প্রথম পৃষ্ঠা

চিত্র - ২

বঙ্গীয় উন্মাদ আশ্রম – বর্তমান দত্তনগর মানসিক স্বাস্থ্য কেন্দ – প্রধান ফটক

বঙ্গীয় উন্মাদ আশ্রম – বর্তমান দত্তনগর মানসিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ২ নং গেট

(ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে সংগৃহীত )

## চিত্র – ৩

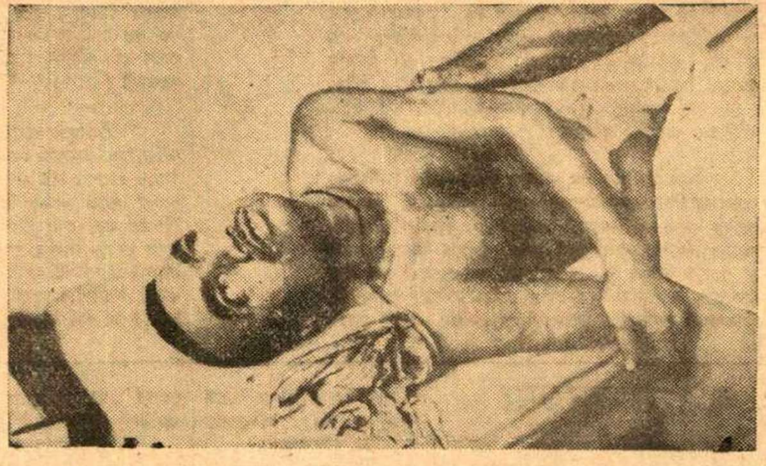

# পাগলদের কথা

অজিত চক্রবর্তী

**পাগল হয়ে এখন কেউ আর বনে বনে ঘোরে না। চলে আসে এই কলকাতায় যাকে অনায়াসে পূর্বাঞ্চল-এর পাগলদের সদরদপ্তর বলতে পারেন। পাগল বলতে ডাকসাইটে পাগল, আধপাগল, শেয়ানা পাগল, পাগলছাগল—সকল ধাতের পাগলের কথাই বলছি।**

এ অঞ্চলে মাথার ব্যামো নিয়ে তেমন রীসার্চ হয়নি। পশ্চিমের স্পেশালিস্টদের মতে হাজার জনে একজনের হেড অফিসে কিছু গোলযোগ থাকবেই। সভ্যতা যত জটিল আর কঠিন হচ্ছে, সংখ্যাটা ততই বেড়ে চলেছে।

ঐ হিসেবে পশ্চিম বাংলার পাগলের সংখ্যা হাজার পঞ্চাশেক হবে। কিন্তু কলকাতা তো কসমোপোলিটান সিটি। এখানে সকল রাজ্যের সুস্থ মানুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আসেন অসুস্থ মস্তিক মানুষেরাও। তাই চোখ বুজে অনুমান করা যায় এই কলকাতাতেই শুধুমাত্র লাখখানেক মানুষ আছেন যাদের মাথা মেরামত করা দরকার।

ব্যাপারটা হাসি-ঠাট্টারই, কিন্তু হাসতে হাসতে কখন যে চোখে জল এসে যায় জানাই যায় না। বুড়ো ছেলে যদি বিপত্নীক বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলে, বাবা, আমি তোমার কোলে উঠবো? বৃদ্ধ পিতা না হেসে পারেন কি? পারেন কি চোখের জলকে বাধা দিতে? যাঁর নিজের জন পাগল হয়নি, পাগল হবার দুঃখ সে বুঝবে কি করে?

ডাঃ জে এন মল্লিকের মতে মাথার ব্যাধি সভ্যতার অভিশাপ। এখন পদে পদে মানসিক সংঘাত। কোথায়ও মনের শান্তি নেই। যে কেউ পাগল হতে পারেন। না হওয়াটাই বুঝি ব্যতিক্রম।

শিশুর চরিত্র গঠন সম্পূর্ণ হয়ে যায় পাঁচ বছর বয়েসেই। কেউ একগুঁয়ে হয়, কেউ বাইরের কারও সঙ্গে কথা বলা পছন্দ করে না, কেউ অর্ধেক জিনিস খেতে চায় না। দায়ী কিন্তু মা-বাবা, বিশেষ করে মাই। সন্তান যদি স্বাভাবিক না হয়, আর দশটা ছেলেমেয়ের মত না হয়, যে কোনদিন তার মাথা বিদ্রোহ করতে পারে। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের খেলায় এক পক্ষ হারতেই পারে। দুঃখ পায় হাজার হাজার দর্শক। কিন্তু পাগল হয় কজন? মাধ্যমিক পরীক্ষায় পঞ্চাশ হাজার ছেলে ফেল করতে পারে। তাদের মধ্যে কজনের মাথা বিগড়ে যায়?

আসলে মানসিক স্বাস্থ্য যাদের দুর্বল, বিপদ তাঁদের নিয়েই। এই স্বাস্থ্যকে সবল করতে হলে মাতাপিতাকে সতর্ক হতে হবে শুরুতেই। শিশু যেন সকলের সঙ্গে মেশে, সে যেন খেলাধুলো করে, তার যেন বন্ধুবান্ধব হয়, সে যেন পুরোপুরি স্বাভাবিক, আর দশটা ছেলের মত হয়। নইলেই বিপদ। বিপদ সঙ্গে সঙ্গে আসে না। অনেক পরে, মা-বাবার মৃত্যুর পরও আসতে পারে। অতএব সাবধান। ছেলেমেয়ে যেন ভালবাসা পায়, ভালবাসতেও পারে। মার দিতে এবং খেতেও যেন সে শেখে।

ঠাকুর্দা-ঠাকুমা, দাদু-দিদা, কাকা-জেঠা, মাসি-পিসি, দাদা-দিদি, আত্মীয়স্বজন, পাড়ার লোকজন, স্কুল এবং বাড়ির শিক্ষক—আগে শিশুর দুনিয়া ছিল বিরাট। এখন? একখানা ছোট ঘর আর মা-বাবা। একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে গেছে, তার উপরে এসেছে পরিবার পরিকল্পনা।

ছোট পরিবার যদি সুখী পরিবার হয় তাহলেও রক্ষে। এখন স্বামী-স্ত্রীর বয়েসের ফারাক কম, দুজনেই প্রায় সমান শিক্ষিত। তাই কেউ কাউকে মানেন না। ছোটখাট ইসু নিয়েও নিত্য কলহ। শিশুকে ঐসব শুনতে হয়। তার মনের খবর কে রাখেন?

ফ্রয়েড বলেছিলেন, মানসিক ব্যাধির উৎস হল সেকস। গিরিন্দ্রশেখর বসুও তাই মনে করতেন। এখন সেকস-এর অন্য ব্যাখ্যা হয়েছে। মানকুণ্ডু মেনটাল হসপিটালের চীফ সাইকিয়াট্রিস্ট ডাঃ বি, এন, পাইন বললেন, সেকস মানে স্যাটিসফ্যাকশন। সকল অরগানিজম-ই চায় স্যাটিসফেকশন। বাধা পেলেই রিঅ্যাকশন।

সন্দীপন নারসিং হোমের ডাঃ রায় কয়েকটি তথ্য দিলেন যা আঁতকে ওঠার মত। তাঁর অভিজ্ঞতা, মানসিক রোগীদের অর্ধেক

**পাগল সংক্রান্ত একটি প্রবন্ধ**

আষাঢ়, ১৭ বর্ষ , ৮ সংখ্যা  ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ (ইংঃ জুলাই, ১৯৭৭)

তুষার কান্তি ঘোষ সম্পাদিত- অমৃত পত্রিকা থেকে সংগৃহীত

## চিত্র – ৫



সিফিলিসে ভুগছে সন্দেহ করা যেতে পারে। রক্ত পরীক্ষা করে দেখা গেছে, শতকরা তিরিশ ভাগের রক্তই 'পজিটিভ'। মানসিক রোগীর হদিস নিলেই জানতে পারবেন, সেকস কী করতে পারে।

মাথা যদি সুস্থ রাখতে চান, সেকস নিয়ে বাড়াবাড়ি করবেন না। তাহলে বুড়ো বয়েসেও বিপদ ঘটতে পারে। কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

রাষ্ট্রায়ত্ত একটা বড় কোম্পানিতে বড় চাকরি করেন এক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মহিলা। বিয়াল্লিশ বছরের বিধবা, কুড়ি আর বাইশ বছরের দুই ছেলেকে নিয়ে থাকেন ওয়েলেসলিতে।

সুখের সংসারে চিড় ধরালো পঁচিশ বছরের এক পাঞ্জাবী যুবক। ছেলের বয়েসী ঐ সুঠাম দেহ যুবক তাঁর নিত্য সঙ্গী হল। অফিস থেকে ছুটি নিয়ে গোটা দিনটা কাটাতে লাগলেন বাড়িতে, ঐ পাঞ্জাবি যুবকের সঙ্গে। অনেক রাত্রিও সে থেকে যেত। সম্পর্কটা আরও গভীর হতেই স্থির হল ওঁরা বিয়ে করবেন। অফিসে চিঠি গেল। ভদ্রমহিলা জানালেন, তিনি পদবি পাল্টাবেন।

ব্যাপারটা তো বিকৃতি যাকে ইংরেজিতে বলে পারভারসন। যৌন ক্ষুধা মিটলেও মহিলা তৃপ্ত হতে পারলেন না। নিজেকে অপরাধী মনে হতে লাগল তাঁর, পাঞ্জাবী ছেলেটাকে নিজের ছেলে বলেই মনে হতে লাগল। অশান্তি থেকে অস্বস্তি, তা থেকে মস্তিষ্ক বিকৃতি।

নিজের বাড়িতে মা তাঁর এক আত্মীয়কে সন্দেহ করতেন। সর্বদা ভয় হত, ও বুঝি বিষ খাইয়ে মেরে ফেলবে। ননদের বাড়িতে গিয়ে তিনি আর এক মূর্তি নিলেন। বললেন, এ আলমারি গোদরেজের, তাঁদের ফিরিয়ে দাও। এ ঘড়ি ফেবার লুবার, এক্ষুনি তাঁদের পাঠিয়ে দাও। তোমরা চোর। ননদ অনেক যুক্তি দেখালেন, কিছুতেই কিছু হল না। জিনিসপত্র সব রাস্তায় ছুঁড়তে লাগলেন।

ডাক্তার ডাকা হল। এসেই তিনি পেথিড্রিন ইনজেকশন দিলেন। ঘুম এল, কিন্তু অসংলগ্ন কথা বন্ধ হল না। পরের দিনই পাঠিয়ে দেওয়া হল নার্সিং হোমে। ইলেকট্রিক ট্রিটমেন্ট ম্যাজিকের মত কাজ করে। মহিলা এখন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কথাবার্তায় বেমানান কিছু দেখলাম না।

কিন্তু নার্সিং হোম থেকে ওঁকে ছাড়া যাচ্ছে না। নার্সরা বুঝতে পেরেছেন, যৌনক্ষুধা ওঁকে এখনও গ্রাস করে আছে। এ-রোগের কি চিকিৎসা হবে ডাক্তাররা ভেবে পাচ্ছেন না; দীর্ঘ দিন ট্রাংকুলাইজার খেলে যৌনক্ষুধা কমে যায়। সেই পথেই হয়তো চিকিৎসা চলবে। মন থেকে ঐ ক্ষিধেটা সরে না গেলে ভদ্রমহিলা আবার নির্ঘাৎ পাগল হবেন।

যৌন বিকৃতি যেমন, যৌনভীতিও সেই রকম ভয়াবহ। গোটা জীবনটাই বরবাদ হয়ে যায়। একটা কাহিনী মনে পড়ছে।

ছেলে ধনী, কিন্তু লেখাপড়ায় তেমন ভাল নয়। মেয়ে স্কুল ফাইনাল পাশ, তুলনায় অধিক শিক্ষিত। ওদের বিয়ে হল হিন্দুমতে। বিপত্তি বাধল ফুলশয্যার রাতেই। মেয়ের যৌনক্ষুধা তৃপ্ত হল না। মেয়ে সে-কথা গোপন করতে পারলে না। ছেলে বললে, বাথরুম থেকে ঘুরে আসছি।

ইতিমধ্যে ছেলের মাথার মধ্যে অনেক কিছু ঘটে গেছে। স্বামীর চোখ-মুখ দেখেই শিক্ষিতা নতুন বৌ-এর সন্দেহ হয়েছে। পিছন পিছন আস্তে আস্তে গিয়ে সে দেখতে পেলে, নিজের কাপড়টি খুলে ফেলেছে ছেলেটি, আত্মহত্যা করার তোড়জোড় করছে। পারল না বৌ-এর জন্যই। পরের দিনই নার্সিং হোম-এ। সেখানে ইলেকট্রিক ট্রিটমেন্ট। চার দিনেই সম্পূর্ণভাবে সুস্থ।

স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসায় চিড় ধরলে সবকিছু ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। এমন কি মানসিক রোগের চিকিৎসকও নিজেকে রক্ষা করতে পারেন না।

এক পাগলা গারোদের এক ডাক্তারের কাহিনী শুনেলাম। ডাক্তার পশ্চিমবঙ্গীয়, লভ করে বিয়ে করলেন এক পূর্ববঙ্গীয় কন্যাকে। স্বামী-স্ত্রী হাসপাতালের লাগোয়া কোয়ার্টারেই থাকেন। দুজনে খুব ভাব, হঠাৎ কী যেন হয়ে গেল। স্বামীর চরিত্রে কিছু দোষ ছিল, হয়তো স্ত্রী জেনে যান। তা থেকেই সন্দেহ। সন্দেহ থেকেই বিকৃতি। কোন নার্স অথবা রোগিণী এলে সেফ বলে দিতেন, না, ডাক্তারবাবু যাবেন না।

ওদিকে ভদ্রমহিলার যৌনক্ষুধা মিয়িয়ে গেল। ডাক্তারি ভাষায় একে বলে হাইপো সেকস। নিজের জন্য পৃথক কক্ষ বেছে নিলেন। সে-কক্ষে স্বামীর প্রবেশ নিষেধ। ধাপে ধাপে মাথার ব্যামো বেড়েই চলল। একদিন এক নার্স আসতেই চিৎকার করে বলে উঠলেন........

ডাক্তার হাসপাতাল ছেড়ে নিজের বাড়িতে উঠে গেলেন। কোন উন্নতি হল না। কোন মহিলা এলেই বলে ওঠেন, যাও, ডাক্তার-

### পাগল চিকিৎসা-রত

আষাঢ়, ১৭ বর্ষ , ৮ সংখ্যা ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ (ইংঃ জুলাই, ১৯৭৭)
তুষার কান্তি ঘোষ সম্পাদিত- অমৃত পত্রিকা থেকে সংগৃহীত

## চিত্র – ৬

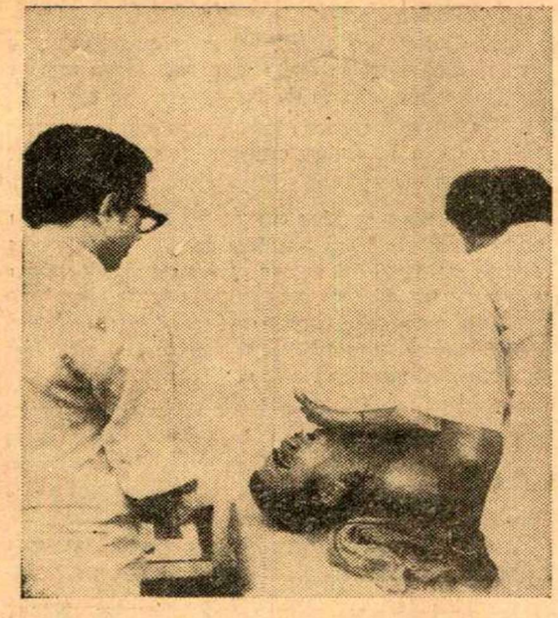

বাবুর সময় নেই। একদিন নিজের বড় মেয়েকে স্বামীর কক্ষে টানতে টানতে নিয়ে বললেন, এই নাও। নিজের মেয়ে থাকতে পরের মেয়েদের নিয়ে টানাটানি কেন?

ডাক্তার বুদ্ধিমান। চটলেন না। চট করে বৌ-এর বাহুতে একটা ইনজেকশন দিলেন। লারগ্যাসটিক, সঙ্গে ফেনারগন। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম। এখনও চিকিৎসা চলছে। যিনি চিকিৎসা করছেন, তাঁকে মহিলা একই কথা বলে চলেছেন, দাদা, শরীর বড় খারাপ। আপনার ভাইয়ের চরিত্র তো জানেন। মেয়েদের চরিত্রও খারাপ।

মায়ের মাথা এখন প্রায় আয়ত্তে এসেছে। কিন্তু বড় মেয়ে কারও কথা শোনে না। সমস্যা এখন তাকে নিয়েই। মা-বাবাকে তোয়াক্কা করে না। পাড়ায় বলতে গেলে সেই ধেই ধেই করে নেচে বেড়ায়। পাড়ার ক্লাবে নাচ-গান-থিয়েটার করে। অনেক পুরুষ বন্ধুও জুটে গেছে। ক্লাবের নাটকে সে নায়িকা। যেমন হাসতে, তেমনই কাঁদতে পারে। হাউ হাউ করে যখন কাঁদে তখন শ্রোতারাও না কেঁদে পারেন না। মনে হয়, ভিতর থেকেই যেন কাঁদছে। হাসেও দারুণ।

একদিন ডাক্তার গেলেন তাঁর ডাক্তার বন্ধুর বাড়িতে। দুজনে ছাতে উঠে গেলেন। অনেক কথা হল। সিঁড়ি দিয়ে নামবার আগে বুঝতে পারলেন বড় মেয়েটা আড়ালে থেকে ও'দের কথা শুনছিল। সে মেসোমশাইকে আলাদা করে ডেকে জানতে চাইলে, বাবা তার সম্বন্ধে কী বলেছেন? ডাক্তার যতই বলুন না, কিছুই বলেন নি, মেয়ে কিছুতেই বিশ্বাস করল না। বললে, বাবা নির্ঘাৎ বলেছেন, মেয়ে তাঁর দুশ্চরিত্রা। সতিাই মেয়ের চরিত্রটি গেছে, সেই সঙ্গে মাথাও।

ডাঃ জে এন মল্লিকের কাছে একদা এক পদস্থ পুলিশ অফিসার এলেন। ভয়াবহ কাহিনী। একদিন অসময়ে বাড়ি এসে দেখেন তাঁর স্ত্রী এবং তাঁর এক দাদা দরজা বন্ধ করে রয়েছেন। চিৎকার করতেই জানা গেল, অমন কাণ্ড নিত্যই ঘটে। ভদ্রলোক ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ। দাদাকে তাঁর নিজের বাড়িতে চলে যেতে বললেন। বৌকে বললেন, যা হবার হয়ে গেছে। ওসব ভুলে যাও। আর যেন না হয়। কিন্তু তা সম্ভব কি করে? ভদ্রমহিলার মাথা বিগড়ে গেল সেইদিনই।

সেকস-এর সঙ্গে ক্রাইমও এসে যায়। ভিলেনও পাগল হতে পারে।

এক পাগলের সঙ্গে একান্তে কথা বলেছিলাম। পাগল যে অতিরিক্ত মাত্রায় সেয়ানা পাগল হতে পারে আর সেক্ষেত্রেও তার মনটি যে পুরোপুরি সরল থাকতে পারে তা তিরিশ বছরের এই তরুণের কাছ থেকেই বুঝলাম।

ছ'মাসে মা মারা যান, তারপর বাবাই সবকিছু। একাধারে মা এবং বাবা।

ছোটবেলা থেকেই ছেলেটা অন্য ধরনের। পড়াশোনায় মন ছিল না, ক্লাশ নাইনে উঠেই স্কুল ছেড়ে দিল। তখন থেকেই শুরু এক বিদঘুটে বাউণ্ডুলে জীবন। মাউথ অর্গান বাজাতে পারত ভালই। সেই সুবাদে এক তরুণী গাইয়ের সঙ্গে আলাপ। পরে ঘনিষ্ঠতা। অনেক অনুষ্ঠানে মেয়েটি গান গেয়েছে, ছেলেটি বাজিয়েছে। মেয়েটিই একদিন প্রস্তাব করলে, বিয়ে করবে আমাকে? সম্মতি দিয়েছিল মনে মনে অনেক আগেই। কিন্তু বিয়ে হল না। মেয়েটি কিছু না জানিয়ে অন্য একজনকে বিয়ে করে বসলে। প্রথম মাথা খারাপের লক্ষণ প্রকাশ পেল এর কিছু পরেই।

ঐ অবস্থাতেই এক বন্ধুর বাড়িতে যেত। বন্ধুর বোনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হল। ঐ মেয়ের দিদির সঙ্গে দাদার বিয়ে হয়ে গেল। লুকিয়ে লুকিয়ে দাদা-বৌদির কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগল ছেলেটি। আরও কিছু লক্ষণ প্রকাশ পেতেই ওকে সরকার পুল মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করা হল। ওখানে থাকাকালেই বন্ধুর বোনের বিয়ে হয়ে গেল।

বছর তিনেক সরকার পুলে, তারপর লুম্বিনি পার্ক। ওখানে সাত মাস, অ্যাপেনডিসাইটিসের জন্য মুক্তি। পরে সাইকিয়াট্রিক নারসিং হোম। এখানে কর্মচারীদের সঙ্গে ভাব করে ডুপ্লিকেট চাবি সংগ্রহ এবং রাত দুটোয় পলায়ন। কিছুদিন বাড়ি থাকার পর গোবরা মানসিক হাসপাতালে। সুবিধে মত একদিন রাতে দেওয়াল টপকে ওখান থেকেও চম্পট। থেকেছে দমদম ও আলিপুর জেল এবং টালিগঞ্জ মেন্টাল হোম-এও। নানান জায়গা ঘুরে এখন যোগোদ্যান লেনের সন্দীপনে। এখানেও দুষ্টুমির অন্ত নেই। দিন কয়েকের মধ্যে এক কচি নারসের মাথা খেয়েছে। ফন্দি ফিকির সব ওর জানা আছে। নারসটিকে বলেছে, তার কলকাতায় পাঁচ-পাঁচটা বাড়ি আছে। বাবা বলেছেন, ভাল হয়ে গেলেই একটা গাড়ি কিনে দেবে। তারপরেই ও বিয়ে করবে। এবং পাত্রী ওর পছন্দ হয়ে গেছে। অতএব মেয়েটি কিছু বাড়তি যত্নআত্তি করে সেবা করে। রাত বারটায় কফি করে দেয়। মাঝে মাঝেই এসে বকবকম বকবকম করে। খাবার কিছু বেশিই দেয়। কিন্তু ছেলেটি বললে, আমার চেয়েও সেয়ানা পাগল এখানে আছে। রাত্রে চোখ বুজে মটকা মেরে পড়ে থাকত। ব্যাটা যে সব-কিছু দেখতে পেয়েছে তা বুঝতে পারলাম পরের দিন। নারসের আমার ঘরে আসা বন্ধ হয়ে গেল।

## পাগল চিকিৎসা সংক্রান্ত এক দলিল

আষাঢ়, ১৭ বর্ষ , ৮ সংখ্যা ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ (ইংঃ জুলাই, ১৯৭৭)

তুষার কান্তি ঘোষ সম্পাদিত- অমৃত পত্রিকা থেকে সংগৃহীত

## চিত্র – ৬



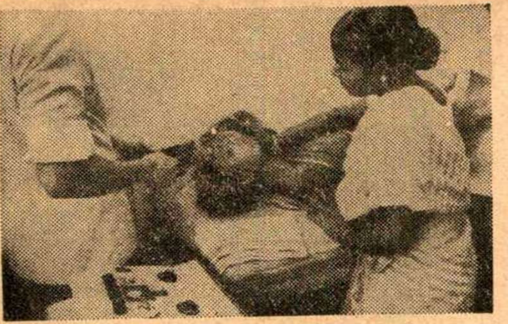

উপভোগ করলে মেয়েটিকে। মেয়েটি যখন বাড়ি ফিরল তখন সে বদ্ধ উন্মাদ। কারও সঙ্গে কথা বলে না। চুপচাপ বসে থাকে, খায় না, চোখে ঘুম নেই। পরে ধরা পড়ল, সে আত্মহত্যা করতে চায়।

একটি নারসিং হোমে একটি তরুণীর মাথায় ইলেকট্রিক শক দেওয়া হবে। ভিতরে গিয়েছিলাম। মেয়েটা সকলের সামনেই বললে, ডাক্তারবাবু, আমার শুধু একটিই চিন্তা। দুমাস হল আমার ঋতু বন্ধ হয়ে গেছে। আমি ভাল হতে চাই না।

সকল মানসিক ব্যাধির উৎস সেকস নাও হতে পারে। হীনমন্যতা থেকে বিকৃতি আসতে পারে। একটি ভাল ছেলের কথা মনে পড়ছে!

তৃতীয় বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ। মার্চেন্ট অফিসের ফাইল ক্লারক। সৎ আর নিষ্ঠাবান, উপরওয়ালার পছন্দ হয়ে গেল। একটার পর একটা বিভাগে ছেলেটাকে ঘুরিয়ে নেওয়া হল। চা বিভাগে ঢুকে ও ভেলকি দেখাল। লাখ খানেক টাকা ফী বছর চুরি যেত। ও চুরির পথ বন্ধ করে। এরকম আরও কৃতিত্ব; যে বিভাগে যায়, সেখানেই ম্যাজিক। উপরওয়ালারা খুশী হয়ে ওকে প্রোমোশন দিলেন। এক ধাক্কায় হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট।

ছেলেটি কিন্তু মুষড়ে পড়ল। সে কী করে হবে স্যার? আমি ভাল ইংরেজি জানি না। অত চিঠি লিখব কি করে? আর যাঁদের প্রোমোশন পাবার কথা, তাঁরা কি বলবে? এত লোককে টপকে যাওয়া কি উচিত হবে? ঐ চিন্তা থেকেই বিকৃতি। ভাল বলতে হবে, অফিসই চিকিৎসার ব্যবস্থা করল। ছেলেটি এখন উঁচু পদেই কাজ করছে।

পুরুষানুক্রমে মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটতে পারে। সবক্ষেত্র আবার হয় না। একটি কেস মনে পড়ছে। মায়ের মাথার ঠিক নেই। তার এক ছেলে, এক মেয়ে। দুজনের মাথাই সুস্থ। ছেলের বিয়ে হল। ছেলেও হল। এই ছেলের মাথা কিন্তু ঠিক রাখা গেল না।

আর একটি লোকের কথা মনে পড়ছে। লক্ষ টাকার মালিক, একদিনের আয় কম করে শ আড়াই টাকা। তাঁর একদিন পকেট মারা গেল। গেল পঁচিশটি টাকা। রাত্রে কিছুতেই ঘুম হল না। সকালে দরজা-জানলা ভাঙতে লাগলেন। ডাক্তার বললেন, এ লোক ঐ পঁচিশ টাকা না হারালেও পাগল হত। টাকা হারানোয় পাগলামিটা তাড়াতাড়ি এসে গেল, এই যা।

মানসিক চিকিৎসাশাস্ত্রে বিস্তর ব্যাধির রকমারি নাম ধাম আছে। সাইকিয়াট্রিস্টরা যেমন, সাইকোলজিস্টরাও সেই রকম মাথা ভাল করতে পারেন। দুটো শাস্ত্রই বেশ এগিয়ে চলেছে।

কলকাতার পাঁচটা বড় হাসপাতালে মানসিক রোগের আউটডোর আছে। না, কোথায়ও ইনডোর নেই। গোবরার মেন্টাল হসপিটাল আর ভবানীপুরের মেন্টাল অবজারভেটরিতে ইনডোর-আউটডোর দুই আছে। বহরমপুরের মেন্টাল হাসপাতালে কিন্তু আউটডোর নেই। বর্ধমান, নদীয়া আর বাঁকুড়া হাসপাতালে মা[illegible]ক রোগের আউটডোর আছে। গোবরায় ১৫০, লুম্বিনি ৫০, মানকুণ্ডুতে ৩০, বহরমপুরে ৭৫০, সরকার পুলে ৫০—এই তো মানসিক রোগের শয্যাসংখ্যা। আছে অনেকগুলো নারসিং হোমও। সন্দিপনী, হারমনি, লাইফ, উন্মাদ আশ্রম, সাইকিয়াট্রিক নারসিং হোম—সব মিলিয়ে শ দুই শয্যা।

অথচ লুনোস অ্যাকটএ যা আছে, তার অর্থ এই যে, কেউ পাগল হলেই সরকার তার দায়িত্ব নেবেন। যে কেউ বিকৃত মস্তিষ্ক যে কোন ব্যক্তিকে থানায় নিয়ে যেতে পারেন, পুলিশ তাকে মানসিক হাসপাতালে পাঠাতে বাধ্য। জজ আর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটরা অনেক অপরাধীকে মানসিক হাসপাতালে পাঠিয়ে থাকেন। পুলিশ নিজে থেকেও অনেককে পাঠায়।

কিন্তু পাঠাবে কোথায়? যে হারে পাগলের সংখ্যা বাড়ছে, সেই হারে হাসপাতাল কিংবা শয্যা বাড়ছে না। বিকৃত-মস্তিষ্কদের একটি বড় অংশ বিত্তবান, নারসিং হোমগুলোতে তাদের ভিড়। যে কটা নারসিং হোমে গিয়েছি, সবই প্রায় 'ফুল হাউস।' অনেক রোগীকে আমৃত্যু ওখানেই থাকতে হবে। হতভাগ্য আত্মীয়স্বজনদের মাসের পর মাস মোটা টাকা পাঠাতে হয়।

সকল নারসিং হোমের পরিচালকরা কিন্তু মহাত্মা ব্যক্তি নন। ব্যবসা হিসেবে যাঁরা নিয়েছেন, তাঁদের স্বচ্ছলতা চোখে পড়বেই। চিকিৎসার স্বীকৃত যোগ্যতা নেই, এমন মানুষও এই পেশায় আছেন। কিছু নারসিং হোম রোগীর অভিভাবককে রসিদ দেন না, দিলেও কম করে লেখেন। অনেকে আবার পার্টির আস্থা বুঝে চার্জ ঠিক করেন। মানসিক রোগীর নারসিং হোম আর প্রাইভেট হাসপাতালগুলোতে সরকারের তেমন তদারকি নেই। তাই অনেক কিছুই চলে যা চলা উচিত নয়। কয়েকটা নারসিং হোম অবশ্যই খুব ভাল। আশ্চর্যের কথা, তাদের চারজ কম।

মানুষের মাথা যতদিন আছে, ততদিন তার বৈকল্যও আছে। নিরন্তন লড়াই করতে হবে তাকে সুস্থ রাখার জন্য। তার জন্য শুধু চিকিৎসক নয়, চাই উপযুক্ত নারস, সমাজকর্মী, সামাজিক সহানুভূতি। মানসিক রোগের চিকিৎসকদের শিক্ষার একটা ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু সমাজকর্মী অথবা নারসদের শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই হয় নি।

### পাগলরা এগিয়ে আসছে

**একরাম আলি**

চারপাশে পাগলের সংখ্যা নাকি দিন দিন বাড়ছে। অন্তত রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়িয়ে তাই তো মনে হয়। কতো বিচিত্র পাগল আজকাল বাজার গুলজার করে বসবাস করছে। আবার, কোনো এক অজানা কোণে পড়ে থাকা নির্জনতম পাগলের সংখ্যাও কম নয়। এদের মধ্যে কেউ সেরে যায়, কেউ সারাজীবন পৃথিবীকে অব্যবহৃত রেখেই, যথাসময়ে, শ্মশান অথবা কবরে গিয়ে পৌঁছয়।

পাগলেরা, মাঝে মাঝে, আমাকে খুব ভাবিয়ে তোলে। ভয় হয়, যদি কোনোদিন পাগল হয়ে যাই! মাঝে মাঝে টের পাই, মাথার ভিতরে কয়েকটি চাঞ্চল্যহীন ফ্যাকাশে পশমের বল রয়েছে। তার দু-একদিন পর কয়েক জোড়া হাতের ব্যস্ততা ও কতকগুলি কাঁটার মুখোমুখি সংঘর্ষ চলতে থাকে। রাতে ঘুম হয় না। মাথার ঠিক মাঝখানে অবিরাম দপ-দপ শব্দে কারা যেন হাঁটা-হাঁটি করে। কয়েকদিন এরকম চলতে চলতে হঠাৎ সচেতন হই,

পাগল চিকিৎসা সংক্রান্ত একটি দৃশ্য

আষাঢ়, ১৭ বর্ষ , ৮ সংখ্যা ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ (ইংঃ জুলাই, ১৯৭৭)

তুষার কান্তি ঘোষ সম্পাদিত- অমৃত পত্রিকা থেকে সংগৃহীত

## চিত্র-৭



এমন অনেক কাণ্ডই ও করেছে। বোম্বে গিয়েছিল বিনে টিকিটে। অতএব ওখানে এক মাস জেল খাটতে হয়েছে। জানতে পারলে বিত্তবান বাবা টাকাটা পাঠিয়ে দিতেন। সে দিকে যায় নি। বম্বে থেকে আবার বিনা টিকিটে হাওড়া। কামরার পর কামরা পাল্টে এসেছে, চেকাররা ধরতে পারেন নি। বিপদ দেখা দিল হাওড়া স্টেশনে। চারিদিকে চেকার। কি করবে? পাশ দিয়ে যাচ্ছিল এক কুলি। তার মাথায় দুটো ঝাঁকা। বললে, এই, দাঁড়া। নিমেষে নিজের জামাটা দুভাগ করে ফেললে। তারপর একটা ঝাঁকা নিজের মাথায় তুলে কুলির সংগে পগারপার। একবার বিনা টিকিটের যাত্রীটিকে একজন চেকার ধরে ফেলেন। ও বললে, ধরুন। নিয়ে যাবেন তো জি-আর-পিতে। সেখানে টাকা দিলে আপনার কি লাভ হবে? তার চেয়ে এই পাঁচ টাকা নিন, আপনারও উপকার, আমারও লাভ। শেষ পর্যন্ত দশ টাকায় রফা।

নিদারুণ উপস্থিত বুদ্ধি। হাটে যেত। দর কষাকষি করতে করতে পাখি হাওয়া করে দিত। খাঁচাকে খাঁচা। তারপর নিউ মার্কেটে সেগুলো বিক্রি করে সিনেমা দেখত, ভাল হোটেলে লাঞ্চ ডিনার খেত।

প্রাচী সিনেমার সামনে সিনেমার টিকিটের কালোবাজারি করেছে। লাভের টাকাটায় দিশী মদ খেয়েছে, পতিতালয়ে গিয়েছে। এসব কাজ ও একাই করেছে। কারও সঙ্গে নয়। পতিতালয়েও কেউ নিয়ে যায়নি। নিজেই সোজা চলে গেছে।

একটি বিদ্যে শুধু গুরুর কাছে শেখা। গুরু মধ্য কলকাতার এক কালের নামকরা গুণ্ডা। এখন অবশ্য ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। গুরু ওকে হাত সাফাইয়ের কাজটি শিখিয়ে দিয়েছে। পকেট কাটতে ওর নাকি জুড়ি নেই। বললে, দুটো ঘণ্টা ছেড়ে দিন। মেহনত করতে জানি। একটা ধাক্কা, ব্যস, বুঝতেও পারবেন না কখন পকেট সাফ হয়ে গেছে।

ওদের পাড়ায় মধ্য রাত্রে রিকশা করে মাতালরা বাড়ি ফেরে। কতজনের যে ঘড়ি, আংটি আর টাকা কেড়ে নিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। পাশের বাড়ির এক ভদ্রলোক নিত্য মদ খেয়ে চুর হয়ে বাড়ি ফেরেন। কাজ না থাকলে কাকাবাবুর গাড়ির দরজা খুলে দেবে, সংগে করে তাকে বাড়ি পেঁাছে দেবে। কাকাবাবু ব্ল্যাকমেল কাকে বলে জানেন। যেদিনই ও ঘরে পেঁাছে দেয়, পনরটি টাকা বখশিশ দেন। কাকাবাবু সেদিন ঘরে বসে বিলিতি মদ খান ও ঢুকে পড়ে। কাকাবাবু প্রশ্ন করেন, কিরে গন্ধ পেয়েছিস? ও হাসতে হাসতে বলে, পেরসাদ পাব না কাকাবাবু? ভদ্রলোক তখন নিজেকে বাদশা ছাড়া কিছু ভাবতে পারেন না। বলেন, পাবে, বৎস, পাবে। তবে মেঝেয় বসতে হবে। আমি তোমার বাবার মত, আমার সামনে তুমি চেয়ারে বসে মদ খেতে পার না।

ডার্নাপিটেও আবার। কাকেও ভয় করে না। পুলিশকেও না। রাস্তার এক ধারে ট্রাফিক পুলিশ, অন্য ধারে ও। অনেকক্ষণ ধরে দেখল ট্রাফিক পুলিশ লরিওয়ালাদের কাছ থেকে এন্তার তোলা নিচ্ছে। ঘণ্টাখানেক বাদে ট্রাফিক কনেস্টবলকে গিয়ে বললে, আমাকে চেন তো? অর্ধেক যদি না দাও, তোমার চাকরি থাকবে না। বুঝিয়ে দিলে যে, ডি-সি ট্রাফিক ওর দাদার বিশেষ বন্ধু। অতএব কনেস্টবল বেচারাকে অর্ধেক দিয়ে তবে রফা করতে হয়।

নিজেই বললে, গোটা পঞ্চাশেক মেয়ের সংগে প্রেম করেছে। পাড়ার মেয়ে সব। ইস্কুলে যাবার পথে আলাপ জমিয়েছে, তারপর সিনেমায় নয়তো লেকে নিয়ে গেছে।

কোন মেয়েকে ট্যাকসি করে সারাদিন ঘুরেছে। শেষে তাকে বাড়ি থেকে কিছু দূরে নামিয়ে দিয়ে আরও কিছুটা দূরে নিজেও

নেমে পড়েছে। ট্যাকসিচালককে বলেছে, একটু ওয়েট কর। আসছি। আর আসেনি। কোন বাড়ির ভিতর দিয়ে একেবারে হাওয়া হয়ে গেছে।

মেয়েদের পটানোর জন্য কত কীই না করেছে। দাদার অনুপস্থিতিতে তাঁর সাজানো-গোছানো অফিসে নিয়ে গেছে। বুঝিয়ে দিয়েছে, এ অফিস তারই। বেয়ারারা চা-কফি এনে দিয়েছে। কখনও বা ট্যাকসিতে বসে রাস্তার পাশের কোন বড় বাড়ি দেখিয়ে বলেছে, এই আমার বাড়ি। দাদা-বৌদি ঐ ঘরে থাকে। এই রে, বাবা দেখলে আর রক্ষে থাকবে না। চল, চালাও ড্রাইভার।

কখনও আবার বৈরাগ্য এসেছে। সব কিছু ছেড়ে ট্রেনে বুট পালিসের কাজ করেছে। বর্ধমান লাইনে এই পেশায় ছিল বেশ কয়েক বছর। দিনে চোদ্দ টাকার মত আয় হত। তাতেই চলে যেত।

ডাক্তার বললেন, ও ক্রেপটো ম্যানিয়াক, সাইকোপ্যাথ। এখন ও'র ইচ্ছে, ছোট একটা চাকরি আর সুন্দরী একটা বৌ। মক্তির আশাতে নারসিং হোমের অনেক কাজই করে দেয়। ইলেকট্রিক শক দেবার সময় ওকে রোগীর পাশেই পাওয়া যাবে। এখন আর পালাতে আগ্রহ নেই। নারসিং হোমের ডাক্তারবাবুদের খুশী করে ও মুক্তি পেতে চায়।

নারসিং হোম কিংবা হাসপাতালের রোগী-রোগিণীদের কেস-ডায়েরি বিচার করলেই দেখা যাবে, মনের ব্যাধির মূলে সেকস যেমন ক্রাইমও সেইরকম। সেকস বলতে যৌনক্ষুধার বাড়াবাড়ি এবং ক্ষিধের অভাব—দুইই।

বিয়ে করে বেশ কয়েক বছর সুখে সংসার করেছেন, ছেলেমেয়ের বাপ, এমন মানুষেরও বিপদ ঘটতে পারে। ৪২ বছরের এক চাকরেবাবু, কাশীপুর গান অ্যান্ড শেল ফ্যাকটরির কর্মচারী, একবার এক ডাক্তারকে গিয়ে বললেন, কিছু ভাল লাগে না, এনার্জি পাই না। চাকরি ছেড়ে দেব। ডাক্তার বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা। প্রশ্ন করতেই আসল কথাটা বেরিয়ে পড়ল। রোগীর স্ত্রীকে ডাকলেন। তিনিও স্বীকার করলেন ব্যাপারটা। বছর দেড়েক ও'রা স্বামী-স্ত্রীর মত নেই। স্বামী তাঁর অক্ষমতা আর ঢেকে রাখতে পারছেন না।

এক্ষেত্রে স্বামীর চিকিৎসা করতে হল। একই ধরনের একটি কেসে দেখা গেছে, এক রাজ পরিবারের বৌ পুরুষ দেখলেই আঁতকে ওঠেন, ডাক্তারবাবুদেরও বলেন, গায়ে হাত দিচ্ছেন কেন? দূরে থেকে কথা বলুন।

পাপ বোধ আর ভয় মানুষকে কোথায় নিয়ে যায় দেখুন। চন্দননগরে গঙ্গার ধারে একটি মেয়েকে দেখতে পেয়ে চার বন্ধুতে ফন্দি আটল। যেমন কথা, তেমন কাজ। চারজনেই সারারাত ধরে

কোন এক পাগলিনী কে আশ্রমে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য

আষাঢ়, ১৭ বর্ষ , ৮ সংখ্যা ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ (ইংঃ জুলাই, ১৯৭৭)

তুষার কান্তি ঘোষ সম্পাদিত- অমৃত পত্রিকা থেকে সংগৃহী

**চিত্র- ৮**

# উন্মাদ রোগ ও তার চিকিৎসা

শ্রীজয়া রায়

উন্মাদ রোগ মানুষের জীবনে মূর্তিমান অভিশাপের মত। এই অভিশপ্ত রোগীরা জীবন ও মৃত্যুর এক ছায়াচ্ছন্ন সীমান্তে অবস্থান করে। মৃত্যুরও হয়তো একটা শান্ত মহিমা আছে। সমগ্র জীবনের নানাপ্রকার সংগ্রামে বিপর্যস্ত শ্রান্ত মানুষ মৃত্যুর কোলে চিরবিশ্রাম লাভ করে। উন্মাদ-রোগীদের কিন্তু শোচনীয় দুঃখকষ্ট ও যন্ত্রণার মধ্যেই অনির্দিষ্ট কাল বেঁচে থাকতে হয়।

যক্ষ্মা, হৃদ্‌রোগ ও কর্কটরোগকেই সাধারণতঃ কঠিন রোগ বলে মনে করা হয়। এই সব ব্যাধি-গ্রস্ত রোগীদের তুলনায় মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা অনেক বেশী। আবার চিকিৎসাধীন মানসিক ব্যাধিগ্রস্তদের চেয়েও এরূপ অচিকিৎসিত দুরারোগ্য রোগীর সংখ্যা বেশী। এদের রোগ এমন নয় যাতে হাসপাতালের বিছানা দখল করে রাখা চলে, অথচ এদের সুস্থ জীবনযাপনেরও উপায় নেই। অন্য প্রকার রোগীদের তুলনায় মানসিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা অনেক বেশী।

এই ধরণের রোগের চিকিৎসা খুব ব্যয়সাধ্য; অথচ মৃত্যুর চেয়েও এই রোগ কষ্টদায়ক। মৃত্যুকে এড়ানো যায় না সত্য, কিন্তু মৃত্যু জীবনে একবারই আসে। উন্মাদ রোগীরা জীবন্মৃত হয়েই জীবন কাটায়। যুক্তরাষ্ট্রের এক হিসাবে জানা গেছে যে, সেখানে ৯ কোটি লোক কোনও না কোন প্রকার মানসিক রোগে ভুগছে।

যত রকম মানসিক রোগের কথা জানা গেছে—তার মধ্যে সিজোফ্রেনিয়া ( Schizophrenia ) সবচেয়ে কষ্টদায়ক। যুবকদেরও এই রোগ হতে পারে। এই রোগে অকালে স্মৃতিলোপ ঘটে। বৃদ্ধ বয়সের স্মৃতিশক্তি হ্রাস ও এই রোগে স্মৃতি-শক্তি হ্রাসের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ২০ বছরের আগেও এই রোগ হতে পারে। শৈশবেও সিজোফ্রেনিয়া হতে পারে, কিন্তু তার উদাহরণ বেশী নেই। উন্মাদাগারে তালাবদ্ধ অবস্থায় পশুর মত আবদ্ধ লাঞ্ছিত মানুষের রোগাপশমের কোন উপযুক্ত ওষুধ আজও আবিষ্কৃত হয় নি। এভাবেই তাদের দিনের পর দিন কেটে যায়।

উন্মাদাগারে কোন কোন রোগীকে কখনও কখনও নিশ্চলভাবে বসে থাকতে দেখা যায়। কাপড়চোপড়েই তারা মল-মূত্র ত্যাগ করে ফেলে। হাত ধরে তুলে আবার ছেড়ে দিলে একই অবস্থায় থেকে যায়। মৃতব্যক্তির মত অনুভূতি ও ক্ষুৎ-পিপাসাহীন এদের জীবন। নাকের ভিতর খাদ্যনল প্রবেশ করিয়ে এদের খাওয়ানো হয়। শিশুদের মত এদের মল-মূত্র পরিষ্কার করে দিতে হয়। মাঝে মাঝে কোন কোন রোগী খুব রেগে গিয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে; তারপরে আবার যেন ঝিমিয়ে পড়ে। সে যে জীবিত আছে, সেটা কেবল তার শ্বাস-প্রশ্বাস দেখেই বোঝা যায়। সে যেন একটা জীবন্ত মৃতদেহের মত। শৈশবে কারও কাছে অত্যধিক শাসন অথবা অত্যধিক আদর পেলে এই রোগ হতে পারে।

প্যারানয়েড সিজোফ্রেনিয়া বলে আর এক রকমের রোগ আছে। লোকের যে কোনও রকম ভঙ্গীই এই প্রকার রোগীর কাছে বিসদৃশ ও ভীতিপ্রদ হয়ে ওঠে। তার মনের বিকৃত প্রতি-ফলকে সাধারণ কোন ভঙ্গীও যেন কুৎসিত সন্দেহপূর্ণ হয়ে যায় এবং এই অলীক কুৎসিত বা বিকৃত ভঙ্গী তার মস্তিষ্কে প্রভাব বিস্তার করে। কোনও জিনিষ দেখলে বা কোনও শব্দ শুনলে বা কোন খাদ্যবস্তু

সমসাময়িক পত্রিকাতে উন্মাদ রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি –

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকা – **১৯৫৮** , মে , পঞ্চম সংখ্যা

**চিত্র- ৯**

# বিজ্ঞান-সংবাদ

## উন্মাদ রোগের চিকিৎসা

বৃটেনে গত ২০ বৎসরে বিকৃত-মস্তিষ্ক লোকদের চিকিৎসার জন্যে নানা রকম উন্নত ধরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানকার প্রত্যেকটি উন্মাদাশ্রম এইসব হতভাগ্যদের জন্যে হাসপাতালে পরিণত হয়েছে। এই ধরণের হাসপাতালগুলো ১৯৪৮ সালের স্বাস্থ্য আইন অনুযায়ী আঞ্চলিক স্বাস্থ্য বিভাগের অধীনে কাজ করছে।

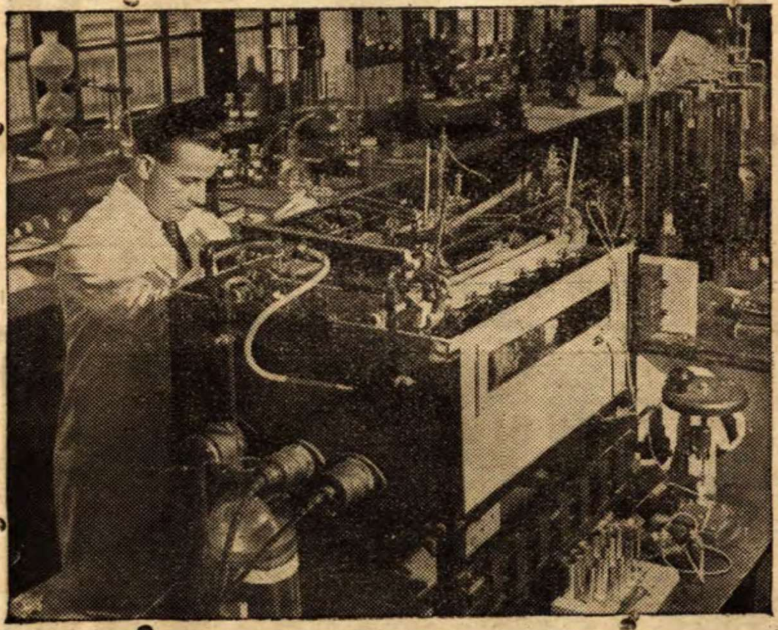

বায়োকেমিক্যাল লেবরেটরীতে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত লোকের রক্ত ও মস্তিষ্ক সম্পর্কিত গবেষণা চলছে।

গত ২০ বছরের মধ্যে বৃটেনে বিকৃত-মস্তিষ্ক লোকদের চিকিৎসা ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। পূর্বে উন্মাদাশ্রমে এই সব লোকদের প্রধানতঃ আটক রাখা হতো। সেখানে চিকিৎসা ব্যবস্থা বিশেষ ছিল না বললেই চলে, যেটুকু ছিল তাও নিতান্ত সামান্য। বৈজ্ঞানিক গবেষণার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক চিকিৎসকদের সহায়তায় এদিকে বর্তমানে যথেষ্ট কাজ হয়েছে। প্রত্যেকটি উন্মাদাশ্রম আজ হাসপাতালে রূপান্তরিত হয়েছে। অন্যান্য অসুখবিসুখের মত মস্তিষ্কের ব্যাধি সারানো সম্ভব—চিকিৎসকদের এই বিশ্বাস বৃটেনে সকলের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ সৃষ্টি করেছে। রোগী এবং তার আত্মীয়স্বজনের পক্ষে এটা কম বড় আশার কথা নয়।

বিজ্ঞান সংবাদ পত্রিকাতে মানসিক রোগ চিকিৎসার পরীক্ষা–নিরীক্ষা

২য় সংখ্যা, নভেম্বর, ১৯৪৯

চিত্র- ১০



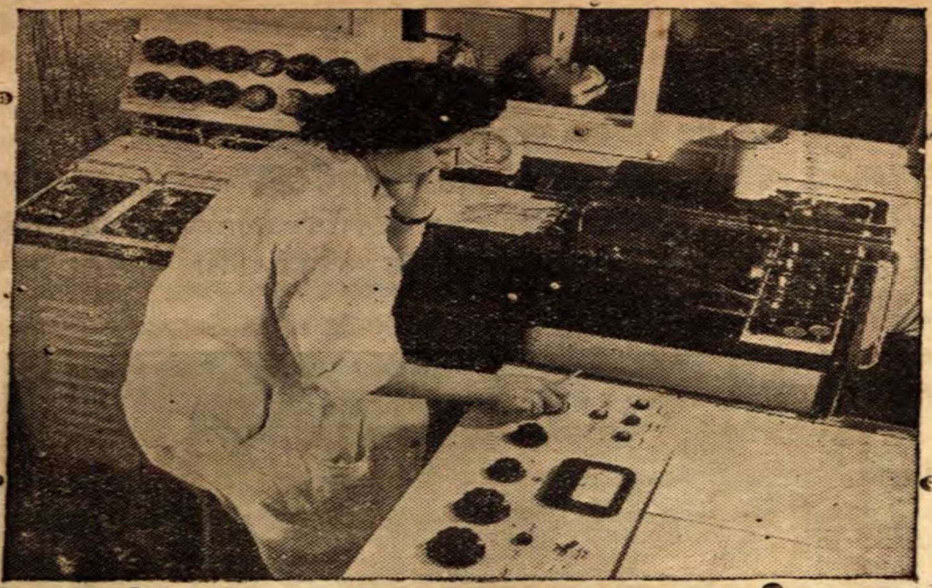

মানসিক ব্যাধিগ্রস্তদের মস্তিষ্ক-তরঙ্গ বা 'ইলেক্ট্রো-এনসেফালোগ্রাম' নেওয়া হচ্ছে।

মানসিক ব্যাধিগ্রস্তদের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনবার আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা হিসেবে তাঁদের নানারকম শিল্প ও কারিগরি ব্যাপারে ব্যাপৃত রাখা হচ্ছে।

বিজ্ঞান সংবাদ পত্রিকাতে মানসিক রোগ চিকিৎসার বৈদ্যুতিক শক সংক্রান্ত পরীক্ষা২য় সংখ্যা, নভেম্বর, ১৯৪৯

## পাগল সম্পর্কিত - চিত্র- ১১

# নেত্য পাগলী

[ শ্রীবরদাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ]

### প্রথম পরিচ্ছেদ

সতত-কোলাহলমুখরিত নগর হইতে ছায়াস্নিগ্ধ শ্যামকোমল পল্লী-শ্রীর মধ্যে আসিয়া ফুলরাণীর অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। তাহার রোগক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখে লুপ্তপ্রায় রক্তিমাভা দিন-দিন ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

লক্ষীপুরের জমিদারীতে আমি পূর্ব্বে কখনও আসি নাই। গ্রাম ভাঙ্গিয়া প্রজারা নূতন মনিব দেখিতে আসিত; বাগান-বাড়ীর সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ প্রতিদিন গ্রামবাসিনী যুবতী, বৃদ্ধা, ও বালিকায় ভরিয়া যাইত।

পিতার মৃত্যুর পর বাগান-বাড়ীটীর বোধ হয় কেহ যত্ন করে নাই। কিন্তু কুঞ্জতল, বৃক্ষবীথিকা, নদীর ঘাট ও চিত্রিত গৃহগুলির মধ্যে তখনও স্বর্গীয় পিতৃদেবের সৌন্দর্য্যানুরাগ বিদ্যমান ছিল। শয়নকক্ষের দেওয়ালে পূর্ব্বপুরুষদিগের তৈল-চিত্রাবলী ও বহুবিধ নর-নারীর প্রতিকৃতি সজ্জিত ছিল। তন্মধ্যে একখানি তৈলচিত্র সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর দেখাইতেছিল—চিত্রকরের সমুদয় প্রতিভা যেন সেই রমণী-মূর্ত্তির চিত্রিত সৌন্দর্য্যের মধ্যে ফুটিয়া উঠিতেছিল!

উদ্যানের পার্শ্ব দিয়া একটী ক্ষীণকায়া নদী কুলুকুলুনাদে বহিয়া যাইতেছিল। একদিন সন্ধ্যাকালে তাহার তীরে প্রস্তরনির্ম্মিত সোপানাবলীর উপর বসিয়া আছি। ফুলরাণী আমার বুকের উপর মাথা রাখিয়া নদীর জলের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছিল। মাঝিদের সারিগান বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। নদীর পরপারে ছায়াবৃত বৃক্ষান্তরাল হইতে পূর্ণিমার চন্দ্রিমা ধ্বান্তাচ্ছন্ন জগৎকে আলো দিবার নিমিত্ত ধীরে-ধীরে উদিত হইতেছিলেন। কামিনীফুলের মৃদু সৌরভ

বাংলায় পাগলী চরিত্র কে নিয়ে এক প্রবন্ধ

ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রকাশিত – বৈশাখ,৫ম সংখ্যা, ১৩২৫ বঙ্গাব্দ ,

## পাগল সম্পর্কিত - চিত্র- ১২

২

### 'রসাপাগলার উন্মাদাগার' প্রসঙ্গে

১৩৯৪-এর শারদীয় এক্ষণ-এ প্রকাশিত শ্রী ছন্দক সেনগুপ্তের 'মনোচিকিৎসা' প্রবন্ধের প্রথমাংশে ঔপনিবেশিক যুগের উন্মাদাগারগুলির কথা আলোচিত হয়েছে। সে যুগের একটি উন্মাদাগার স্থাপিত হয়েছিল রসাপাগলায়। রসাপাগলার মানসিক হাসপাতালের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে লেখক বলেছেন 'এই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে খুবই কম তথ্য পাওয়া যায়। রাজ্য লেখ্যাগারে রক্ষিত নথিপত্রও এটির বিষয়ে নীরব, কেন না মেডিক্যাল বোর্ডের সঙ্গে এর কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না।'

লেখকের এ অনুযোগ কিন্তু যথার্থ নয়। শ্রী সেনগুপ্ত যদি রাজ্য লেখ্যাগারে রক্ষিত জুডিসিয়াল (ক্রিমিনাল) দপ্তরের নথিপত্র দেখতেন, তাহলে উন্মাদাগারটি সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পেতেন, আমরাও পেতাম একটি অধিকতর তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ। বস্তুত সমগ্র নিবন্ধটির জন্য শ্রী সেনগুপ্ত মুদ্রিত সরকারি প্রতিবেদন বা গ্রন্থাদির সাহায্য যতটা নিয়েছেন, লেখ্যাগারের নথিপত্র ততটা দেখেন নি। সে জন্যই উপাদানের অভাব ঘটেছে।

রসাপাগলা হাসপাতাল নিয়ে কোম্পানি ও কোর্ট অফ ডিরেক্টরসের মধ্যে চিঠি চালাচালি শুরু হয় ১৮০২ খ্রীস্টাব্দ থেকে। হাসপাতালের নির্মাণকার্য আরম্ভ হয় ১৮০৪-এ, শেষ হয় ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে। এই সময়ে একই ধরনের মানসিক হাসপাতাল গড়ে ওঠে মুঙ্গের, পাটনা, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা প্রভৃতি শহরে। এই সব হাসপাতালের গোড়ার দিকের ইতিহাস জুডিসিয়াল (ক্রিমিনাল) দপ্তরের ১৮০২-১৮ খ্রীস্টাব্দের কাগজপত্র থেকে জানা যায়।

রসাপাগলায় উন্মাদাগার স্থাপিত হওয়ার আগে মনোরোগীদের রাখা হতো 'হাউস অফ কারেকশন'-এ। উন্মাদাগার স্থাপনের সময়ে 'হাউস'-এ ছিলেন কুড়ি জন মনোরোগী। রসাপাগলার নতুন উন্মাদাগারে পঞ্চাশ জন রোগীকে রাখার ব্যবস্থা হয়। প্রত্যেক রোগীর জন্য কিন্তু স্বতন্ত্র ঘর ছিল না। মোট ঘরের সংখ্যা দশ হওয়ায় একই ঘরে একাধিক রোগীকে থাকতে হতো। সরকারি নথিতে হাসপাতালটির বিস্তারিত জন্মকাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। গাঁথনির বর্ণনা থেকে শুরু ক'রে প্রশস্ত জানলা-দরজা এবং রেলিং-ঘেরা বারান্দার কথা সে বিবরণ থেকে জানা যায়। প্রতিষ্ঠাপর্বে মানসিক চিকিৎসালয়টির কর্মচারী-সংখ্যা এবং বেতন-বিন্যাস ছিল এ রকম

বাংলার সর্বাধিক পুরাতন উন্মাদ আশ্রম - রসা' পাগলাগারদের লিখিত এক বাংলা নথী

এক্ষণ পত্রিকা , ১৩৯৬

## চিত্র- ১৩

## ঢাকা উন্মাদ আশ্রমের কয়েকটি চিত্র–ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে সংগৃহীত

উন্মাদ আশ্রমের প্রকোষ্ঠের চিত্র (ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে সংগৃহীত )

উন্মাদ আশ্রমের দক্ষিন দিকে অবস্থিত কয়েদখানা , এখানে ভয়ঙ্কর ও অপরাধী পাগলদের বন্দী করা হতো ।

## চিত্র- ১৪

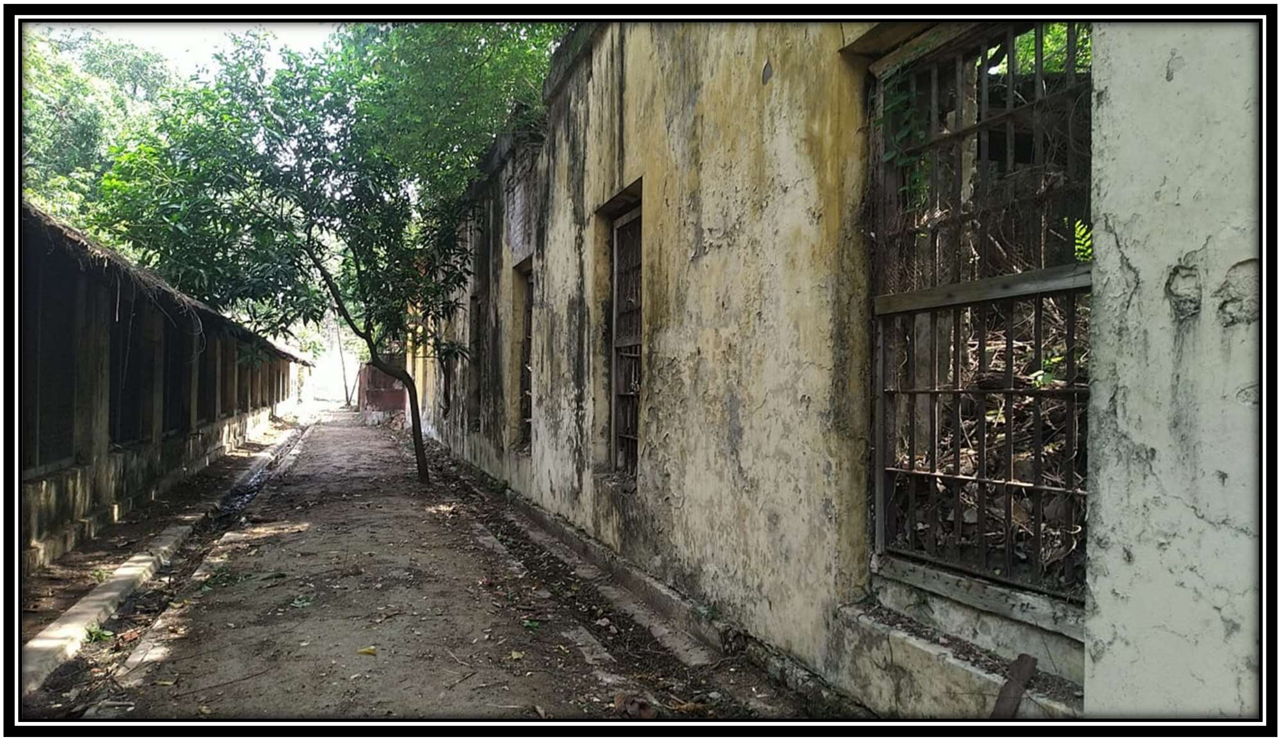

পরিত্যক্ত অবস্থায় ঢাকার উন্মাদ আশ্রম (ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে সংগৃহীত )

প্রধান উন্মাদ আশ্রমের ডান দিকে অবস্থিত

# চিত্র- ১৫

জঙ্গলাকীর্ণ অপর একটি আশ্রমের প্রকোষ্ঠ (ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে সংগৃহীত )

ঢাকা উন্মাদ আশ্রমের প্রধান প্রকোষ্ঠের লোহার গারদখানা (ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে সংগৃহীত )

ঢাকা উন্মাদ আশ্রমের ওয়ার্কশেড- এখানে স্বাভাবিক ও সুস্থ অবস্থায়
ফিরিয়ে আনার জন্য অকুপেশনাল থেরাপির মাধ্যমে
বিভিন্ন রকম হাতের কাজ করানো হতো (ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে সংগৃহীত )

**চিত্র- ১৬**

ঢাকা উন্মাদ আশ্রমের ওয়ার্কশেড- এখানে স্বাভাবিক ও সুস্থ অবস্থায়
ফিরিয়ে আনার জন্য অকুপেশনাল থেরাপির মাধ্যমে
বিভিন্ন রকম হাতের কাজ করানো হতো (ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে সংগৃহীত )

লোহার ব্যারাকের মধ্যে অবস্থিত পাগলদের হাতের কাজের ওয়ার্কশেড -ঢাকা

# চিত্র- ১৭

লোহার ব্যারাকের মধ্যে অবস্থিত পাগলদের হাতের কাজের ওয়ার্কশেড -ঢাকা
(ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে সংগৃহীত )

উন্মাদ আশ্রমের বহিরাংশ থেকে খণ্ড চিত্র – ঢাকা

**চিত্র- ১৮**

পরিত্যক্ত উন্মাদআশ্রমের বারান্দা বিভিন্ন প্রকোষ্ঠের চিত্র – ঢাকা

ভগ্নঅবস্থা – পরিত্যক্ত উন্মাদ আশ্রম, ঢাকা
ভয়ঙ্কর ও অধিক উন্মাদ রোগী দের এখানে রাখা হতো (ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে সংগৃহীত )

**চিত্র- ২০**

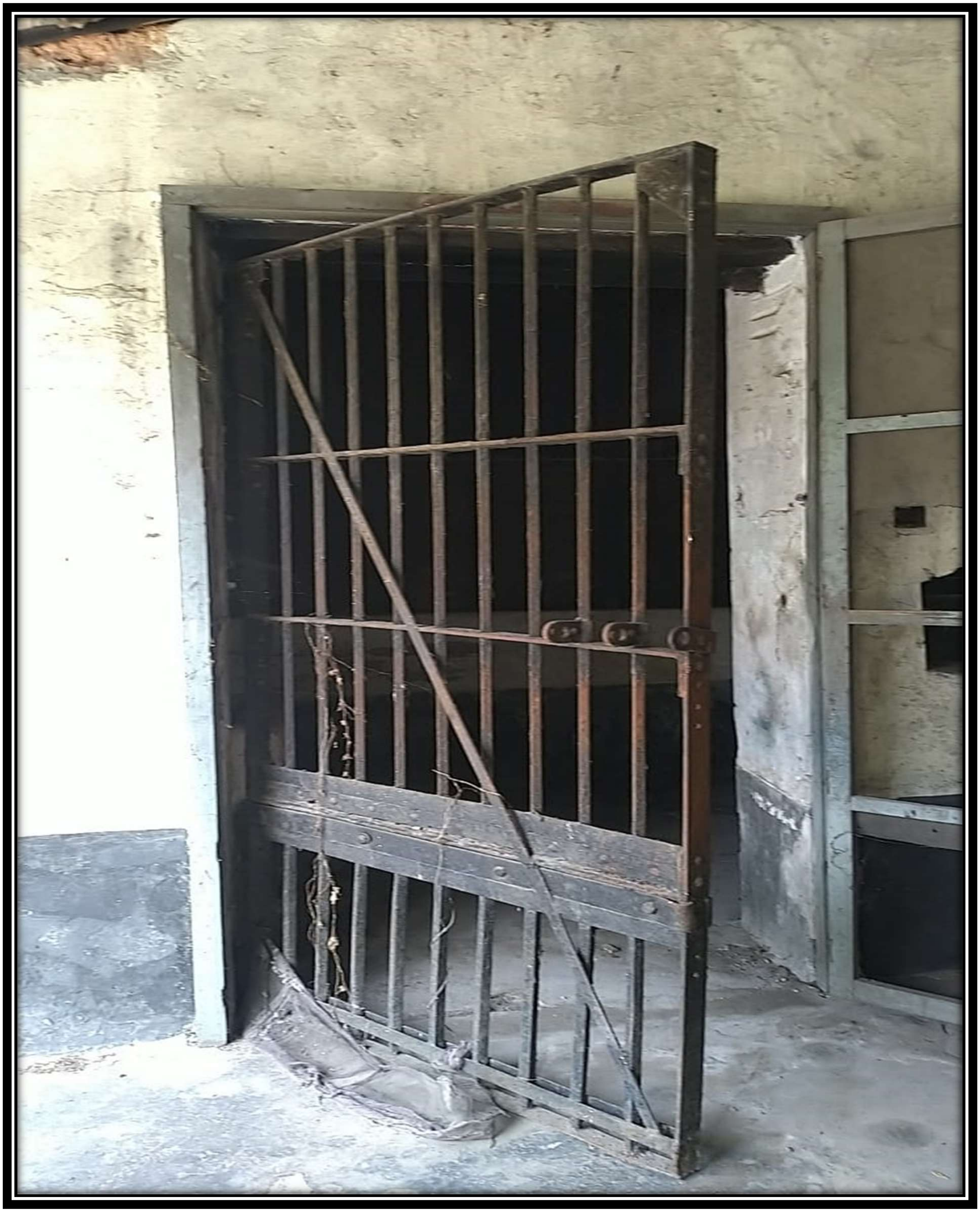

লোহার গরাদ একটি চিত্র – ঢাকা উন্মাদ আশ্রম (ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে সংগৃহীত )

**চিত্র- ২১**

অপেক্ষাকৃত ধনী ও উচ্চ শ্রেনীর উন্মাদ দের জন্য আশ্রম

ভগ্নাবশেষ উন্মাদ আশ্রমের একটি চিত্র

চিত্র- ২২

লোহার গরাদ একটি চিত্র – ঢাকা উন্মাদ আশ্রম

বহরমপুর মানসিক হাসপাতাল

## পাগল সম্পর্কিত – দলিল, চিত্র- ২৩

# পাগল কি সত্যই বিকৃত-মস্তিষ্ক

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী

কোন কোন্ পণ্ডিত মনে করেন, আমাদের পাগল হওয়ার বড় কারণ এই যে, আমরা অতি অল্প বয়সে অনেক কিছু শিখতে আরম্ভ করি এবং শিখিও খুব তাড়াতাড়ি। পশু তার আদিম মনোভাব নিয়েই সারাজীবন কাটিয়ে দেয়। তারা কিছু শেখেও না, কিছু ভোলেও না, কিন্তু মানুষ অনেক কিছু শিখে নিজেকে অভিশপ্ত করে। মনে রাখতে হবে, কোনও কিছু শেখার চেয়ে শেখা বিষয় ভুলে যাওয়া ঢের বেশী কঠিন।

মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন, একই শিশু বলশেভিক, ফাসিষ্ট বা যা হয় একটা কিছু 'হওয়া'র শিক্ষা পেতে পারে। কম্যুনিষ্ট, লীগ-পন্থী বা কংগ্রেসওয়ালা হওয়া—অর্থাৎ কোনও কিছু পছন্দ করা না করা; সাহিত্য, সঙ্গীত বা বিজ্ঞানে রুচি, সিনেমার ছবি ভাল লাগা বা না লাগা—এ সব আমাদের জন্মগত নয়, শিক্ষাগত।

মনের উপর কোন কিছু জোর করে চাপাতে গেলে অনেক সময় আমাদের মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটে। এটা আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফল—জন্মগত নয়। মনস্তত্ত্ববিদেরা এখন আর বংশগতির ( heredity ) প্রভাব মানেন না।


**কমনস্ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড্**

স্থাপিত : ১৯১৩ 'গ্রাম : 'EKESAR'

পি ৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

**প্রতিপত্তিশালী ও পুরাতন ব্যাঙ্ক-সমূহের মধ্যে অন্যতম।**

আমাদের 'সিলভার জুবিলী সার্টিফিকেটে' টাকা আমানত করিয়া দ্বিগুণ অর্থলাভ করুন। এই টাকা কখনও লোকসান যায় না।

**মিঃ অশোককুমার সেন রায়**

ম্যানেজিং ডিরেক্টর।


বাস্তবিক পক্ষে ঘটে এই :—মানুষের মস্তিষ্ক কতকটা ক্যামেরার মত, কিন্তু ক্যামেরার চেয়ে এর সুবিধা এই, এর একটা স্বতঃক্রিয় (automatic) স্পর্শক (sensitive) আছে। এই গ্রাহক বা স্পর্শক হচ্ছে মনের আবেগ ( emotion )। এই আবেগের বশবর্ত্তী হয়ে মস্তিষ্কের ফটোগ্রাফির প্লেট বাইরের ছাপ ( impression ) খুব বেশী করে গ্রহণ করতে পারে। আবেগ যত বেশী হবে, মস্তিষ্ক-ক্যামেরা তত বেশী স্পর্শক ( sensitive ) হবে।

একটি খুব ছোট ছেলেকে যদি দশ বার করেও শেখান যায় যে, আট নম্ বাযাণ্ডর, সে পরক্ষণেই তা ভুলে যায়। কিন্তু পাশের বাড়ীর কুকুরটা একবারও যদি তাকে দেখে ঘেউ-ঘেউ করে ডাকে, তবে ঐ ছোট ছেলে তা ভুলবে না। মনস্তত্ত্ববিদেরা এ সম্বন্ধে বলেছেন, "A child without fear would be a potential corpse!"

যে 'আবেগে'র কথা বলা হয়েছে, দুর্ভাগ্যক্রমে ওটা দু-ধারী তরবারির মত। এর বশবর্ত্তী হয়ে আমরা এমন অনেক বিষয় শিখে ফেলি—যা হয়ত শিখবার কোন হেতু ছিল না। যেমন ধরুন, একটি শিশু তার হাত কেটে ফেললে। ডাক্তার এসে ইনজেকসন দিলেন, কাটা জায়গাটা হয়ত-বা সেলাই করলেন—কিন্তু দেখা গেল এর পর থেকে ডাক্তারের ব্যাগ দেখলেই রোগী ভয় পায়। এই ভাবটা চিকিৎসার সময়ে তার মনে জেগেছিল এবং সেই সঙ্গে জড়িত হয়েছিল ভয়। এর পর জীবনে অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকবে এই ব্যাগের ভয়। এটাও ছোটখাটো রকমের পাগলামির পর্য্যায়ে পড়ে। এই ধরণের আরও অনেক ঘটনা সচরাচর ঘটে থাকে। যেমন, একটা অসৎ লোক একটি ছেলেকে লুকিয়ে যৌন-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে শেখালে। এখানে যৌন-উত্তেজনা ঐ ছেলেটির মনে 'আবেগ' জাগাল, আর গ্রহণশীল ( sensitized ) মস্তিষ্কে সঙ্গে সঙ্গে লুকানোর ভাব অঙ্কিত হয়ে রইল। ফলে দাঁড়াল—'kleptomaniac' ব্যাধি। এই ব্যাধিগ্রস্তেরা পুলিসের চোখের উপর ছাইভস্ম চুরি করে। এইরূপে pyromaniacদের সৃষ্টি হয়—যারা আগুন লাগাতে ভালবাসে।

একটা ছোট ছেলেকে কোনও সুড়ঙ্গের মধ্যে কুকুরের সঙ্গে রেখে দেওয়া হ'ল। এর ফল হবে আশ্চর্য্য। সে কুকুর দেখে ভয় পাবে না—ভয় পাবে সুড়ঙ্গের বা কোনও আবদ্ধ জায়গার। এই রোগকে ডাক্তারী শাস্ত্রে claustrophobia বলা হয়েছে।

কিন্তু পাগলামির প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে হলে আমাদের মনে রাখতে হবে—স্থির-মস্তিষ্ক লোকের মত পাগলেরও জীবনের

পাগল কি সত্যিই বিকৃত মস্তিস্ক , প্রবাসী পত্রিকা, শ্রাবন , ১৩৫৩, পৃষ্ঠা- ৪৪১

পাগল সম্পর্কিত – দলিল, চিত্র- ২৪

# পাগল

শ্রীউষা ভট্টাচার্য্য

সেদিন রাস্তা দিয়ে চলছি, সঙ্গে রয়েছে এক বন্ধু। হঠাৎ সে আমার দৃষ্টি এক দিকে আকৃষ্ট করে বললে—"দেখ ভাই, একটা পাগল কি রকম মজার মজার কথা বলছে আর হাত-পা নাড়ছে।" আমি তাকিয়ে দেখলাম লোকটা সত্যিই পাগল।

সাধারণ লোকের কাছে পাগল, শুধু পাগলই। সে কেবল যা-তা বকে, রাস্তায় ঘাটে ঘুরে বেড়ায়। আবার অনেক সময় হয়ত অন্য লোককে মারধোরও করে। মোটামুটি বলতে গেলে আমরা পাগল সম্বন্ধে বিশেষ মাথা ঘামাই না।

পাগল সম্বন্ধে এই উদাসীনতা সব দেশেই চিরকাল ছিল। কিন্তু গত কয়েক বৎসর থেকে আমাদের এ ধারণা কিছু কিছু বদলে যাচ্ছে। আগে লোকের ধারণা ছিল যে, অনেক পাপ কাজ করলে তবে পাগল হয়। লোকে পাগলকে মোটেই ভাল চোখে দেখত না। পাগলকে অনেক সময় ডাইন বলা হ'ত, এবং এই অভিযোগে তাকে পুড়িয়ে মারবার দৃষ্টান্তও বহু দেশে পাওয়া যায়।

কিছুদিন থেকে মনোবিদ্‌রা পাগলামিকে মনের রোগ বলে প্রমাণ করেন এবং এই সঙ্গে আমাদের মন থেকেও আগেকার ঐ সব ভুল ধারণা ক্রমশঃ চলে যাচ্ছে। মনোবিদ্‌রা বলেন, যেমন শারীর রোগের রকমফের দেখতে পাই এবং লক্ষণ অনুসারে চিকিৎসকেরা কোনটাকে 'টাইফয়েড', কোনটাকে 'নিউমোনিয়া' ইত্যাদি নাম দেন; ঠিক সেই ভাবেই মনোবিদ্‌রা মানসিক রোগেরও ক্ষেত্রে নানা নামকরণ করেন। পাগলামি বলতে শুধু একপ্রকার রোগই বোঝায় না। এর ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রোগের নামকরণ করা হয়েছে। মানসিক রোগ শুধু এক রকমেরই হয় না। সাধারণ লোক, অল্প বিকৃতমস্তিষ্ক এবং সম্পূর্ণ বিকৃতমস্তিষ্ক ইত্যাদি নানা ধরণের লোক আমরা দেখতে পাই। মোটামুটি আমরা তিন প্রকারের মানসিক বিকৃতি লক্ষ্য করে থাকি। বিকৃতির গুরুত্ব অনুসারে যথাক্রমে নাম দিই—উন্মায়ু (Neurosis), বায়ুরোগ (Psycho-Neurosis) এবং বাতুলতা (Psychosis)।

উন্মায়ুক (Neurotic) বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি কতকগুলি সামান্য মানসিক বিকার যেগুলি আমরা সব সময় লক্ষ্য করি না, কিন্তু এগুলি মাঝে মাঝে রোগীর যথেষ্ট কষ্টের কারণ ঘটায়। উন্মায়ু আবার দুই প্রকারের, যথা—উৎকণ্ঠা উন্মায়ু (Anxiety-Neurosis)। এই রোগে রোগীর মনে সব সময় দারুণ উদ্বেগ আর অস্থিরতা দেখা যায়। যে-কোন সাধারণ ব্যাপার উপলক্ষ্য করে রোগীর মনে অযথা দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের সঞ্চার হয়। যেমন হয়ত রোগী সব সময় মনে মনে ভয় পায় যে যদি তার বাবা, মা বা কোন প্রিয়জনের মৃত্যু হয় তবে কি হবে। এই ভয় এদের সাধারণের চেয়ে অনেক বেশী থাকে আর এর জন্য এরা মুহ্যমান হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় প্রকারের উন্মায়ু হচ্ছে স্নায়বিক অবসাদ (Neurasthenia)। এই রোগে রোগী সর্ব্বদা অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে থাকে। হাতে পায়ে মোটেই জোর থাকে না। সামান্য পরিশ্রমে রোগী অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করে।

দ্বিতীয় প্রকারের মানসিক বিকৃতি হচ্ছে বায়ুরোগ (Psycho-Neurosis)। এরও আবার কয়েকটা প্রকারভেদ আছে, যথা—বিপরিণামী হিষ্টিরিয়া, (Conversion Hysteria), আবেশিক বায়ু (obsessional Psycho-Neurosis), এবং হাইপোকনড্রিয়া (Hypochondria), উৎকণ্ঠা হিষ্টিরিয়া। (Anxiety hysteria) ইত্যাদি।

হিষ্টিরিয়া রোগে রোগীর মূর্চ্ছাই স্বাভাবিক লক্ষণ। এর নানা রকম লক্ষণ হতে পারে যেমন—গায়ে ব্যথা, ফোস্কা, (blister); পক্ষাঘাত (paralysis), আরও নানারকম লক্ষণ দেখা যায়। এখানে মনে রাখতে হবে যে, এই সকল রোগ মানসিক (functional)। এর কোনটাই শরীরের কোন রকম ক্ষত থেকে হয় না। যেমন একটা উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারা যাবে। বিপরিণামী হিষ্টিরিয়ার কথাই ধরা যাক। এখানে রোগী কোন মানসিক চিন্তাকে সত্য বলে মনে করে। ধরুন কোন লোকের ঘাড়ে সংসারের চাপ রয়েছে। আর সে হয়ত কিছুতেই সংসার চালাতে পারছে না। সেক্ষেত্রে সামনে কোন উপায় না দেখে সে যদি কোন রোগের আশ্রয় নিতে পারে তবে হয়ত রেহাই পায়। রোগী ভাবনাচিন্তা এমন ভাবে করতে থাকে যে সে কাঁধে খুব ব্যথা অনুভব করে। অথচ চিকিৎসক পরীক্ষা করে হয়ত কোন কারণই খুঁজে পেলেন না। এসবই মানসিক। অবশ্য এর কারণ মনোবিদ্‌রা রোগীর সজ্ঞান মনে পান না, তবে পাওয়া যায় অবচেতন (unconscious) মনে। মনঃসমীক্ষণ দ্বারা তা খুঁজে পাওয়া যায়। আবেশিক বায়ু আবার দুই রকমের। একটা প্রকাশ পায় রোগীর চিন্তাধারার মধ্যে, আর একটা প্রকাশ পায় তার কার্য্যধারার ভিতরে। চিন্তার বিকৃতি কি রকম? আমি একটি লোককে জানি সে সব সময় এই চিন্তা করত যে বেড়ালের তিনটে পা না হয়ে চারটে পা হ'ল কেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, এ আর এমন

## পাগল সম্পর্কিত - দলিল, চিত্র- ২৫



কি কষ্টদায়ক চিন্তা। কিন্তু যার ওরকম হয় সে ছাড়া আর কেউ এর কষ্ট বুঝতে পারে না। রোগের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে সে মনোবিদের কাছে ছুটে আসে।

কার্যাক্ষেত্রে কি রকম হয় তা এবার বলছি। এমন অনেক লোকই আছেন যাঁরা হয়ত যত বারই সিঁড়ি দিয়ে উঠেন বা নামেন তত বারই সিঁড়িতে ক'টি ধাপ আছে না গুণে পারেন না বা রাস্তার ধার দিয়ে যেতে হলে প্রত্যেকটি ল্যাম্পপোষ্ট না ছুঁয়ে পারেন না। এঁরা এমন যে যদি কোন জায়গায় খুব তাড়াতাড়িও যেতে হয়, হয়ত বা ট্রেন ফেল হয়ে যায় তবুও এগুলি না করে পারেন না।

...হাইপোকনড্রিয়া রোগে আমরা দেখি যে রোগী তার শরীরের বিশেষ কোন অংশ সম্বন্ধে অনুযোগ করছেন। রোগী হয়ত মনে করেন যে, তার পেটের ভেতরে পাকস্থলীই নাই আর এই ধারণার বশে কিছুই খান না। কারণ তার পাকস্থলীই নাই, তবে খাবার খেলে যাবে কোথায়?

আপাতদৃষ্টিতে এ বিষয়গুলো খুবই হাস্যকর মনে হলেও বাস্তবিক পক্ষে এরকম অনেক লোক সচরাচর আমাদের মধ্যে আছেন যাঁদের হঠাৎ দেখলে কিছুই বুঝতে পারা যায় না, তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এগুলো প্রকাশ পায়।

এবার আমি কয়েকটি রোগ সম্বন্ধে আলোচনা করব যেগুলো একেবারে বিকৃতমস্তিষ্কদের মধ্যেই শুধু দেখা যায়। যথা—চিত্তভ্রংশী বাতুলতা (Dimentia Proecox) এই রোগে মানুষের সাধারণ বুদ্ধি একেবারেই লোপ পেয়ে যায়। রোগী নিজেকে বাইরের জগৎ থেকে আলাদা করে রাখে। নিজের মনে মনে কল্পনায় সে পৃথক জগৎ সৃষ্টি করে। আর তার মধ্যেই নিজেকে ডুবিয়ে রাখে। তার মনে নানা রকমের অদ্ভুত ধারণা জন্মে। নিজেকে হয়ত পৃথিবীর রাজাই মনে করে, কারণ কল্পজগতে সবই সম্ভব। বাইরের জগৎ সম্বন্ধে তার কোন চেতনাই থাকে না। খুব কম কথা বলে, অল্প অল্প হাসে। অনেক সময় হয়ত বিড় বিড় করে যা তা বকে; চুপচাপ বসে থাকে—হয়ত খাওয়া-দাওয়াও ত্যাগ করে।

আর এক ধরণের রোগ আছে তাকে বলে খেদোন্মত্ত বাতুলতা (Manic Depressive Psychosis)। এই রোগের দুটি ধারা আছে। খেদ (Manic) অবস্থায় রোগী খুব উত্তেজিত থাকে। এত বেশী ও দ্রুত চিন্তাধারা মনের মধ্যে আসে যে, সে ওগুলো গুছিয়ে বলতে পারে না। কথাবার্তা অসংলগ্ন হয়। অনেক অকথা কুকথা বলে ও খুব জোরে জোরে গান করতে ও নাচতে থাকে। আবার মাঝে মাঝে মারধোরও করে। কিছুদিন এই অবস্থায় থাকার পর বিষণ্ণ (depressive) অবস্থা আসে—বিষণ্ণ অবস্থায় রোগী খুব মুহ্যমান হয়ে থাকে। একেবারেই কারও সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে না। আত্মহত্যা করার প্রবল ইচ্ছা থাকে। রোগী কিছুই খায় না। মুখে সর্ব্বদা দুঃখের ভাব থাকে। বহুদিন যাবৎ এরূপ রোগগ্রস্ত হয়ে থাকলে মানুষ বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে যায়।

আর একটি প্রধান মানসিক রোগ হচ্ছে "ভ্রম বাতুলতা" (Paranoia)। এই রোগে রোগীর কতকগুলি বদ্ধমূল ধারণা থাকে। অন্য সকল বিষয়েই সে সাধারণ লোকের মত ব্যবহার করে, শুধু তার বিশেষ ধারণার ক্ষেত্রে অদ্ভুত রকমের ব্যবহার করে। এই রোগে বুদ্ধিবৃত্তি একেবারে নষ্ট হয় না। ভুল ধারণা এই রকমের হতে পারে, যথা—রোগী হয়ত মনে করে যে কেউ তাকে বিষ দিয়ে মারতে চাচ্ছে। না হয় মনে করতে পারে যে, সে মিশরের রাণী "ক্লিয়োপেট্রা", এবং সে সকলের সঙ্গে হয়ত সেইভাবে ব্যবহার করবে। অনেক রোগী হয়ত মনে করে যে, তার শরীরের কোন একটা অংশই নেই ইত্যাদি। এই রোগ আবার অনেক রকমের হয়। এর একটির নাম করছি বিভ্রম বাতুলতা (Paraphrenia)। এই রোগে সব সময় রোগীর মনে হয়—যে সবাই তার দিকে চেয়ে আছে, না হয় তার সম্বন্ধে কথা বলছে ইত্যাদি।

এতক্ষণ যে সব "বাতুলতা" সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম সেগুলোর কারণ সম্পূর্ণ মানসিক। কিন্তু আরও কতকগুলো মানসিক রোগ আমরা দেখতে পাই যেগুলির কারণ কতকটা মানসিক আর কতকটা শারীরিক। যেমন একটি রোগ আছে তার নাম "General Paralysis of the Insane"। সিফিলিস এই রোগের কারণ। এতে মাথার ভেতর ক্ষত দেখা যায়। এতে বুদ্ধিবৃত্তি একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়। রোগী অনর্গল বকে। একটা কথার সঙ্গে আর একটা কথার কোনই সামঞ্জস্য থাকে না। তা ছাড়া রোগীর আত্মসংযম থাকে না।

ভ্রমের (Epilepsy) রোগটিও মাথার মধ্যে কোন রকমের ক্ষত থেকেই হয়। এতে রোগীর 'ফিট' হয়। তবে এর মূর্চ্ছা হিষ্টিরিয়ার মূর্চ্ছা থেকে কিছু আলাদা। এতে রোগী অসম্ভব হাত পা খিঁচতে থাকে। এর আবার দুটো ভাগ আছে। একটির নাম (Grand Mal) এবং অপরটির নাম (Petit Mal)। পূর্ব্বোক্তটিতে রোগীর মূর্চ্ছা হয়। এই মূর্চ্ছা যেখানে সেখানে হতে পারে, কিন্তু হিষ্টিরিয়ার মূর্চ্ছা বেশ নিরাপদ জায়গা ছাড়া হয় না। মূর্চ্ছার সময় তড়কার মত হাত পা ছোঁড়ে। মূর্চ্ছার শেষে রোগী কিছুক্ষণ ঘুমায়। পরে মাথা ধরা ভাব থাকে। শেষোক্ত রোগটি সমসময়ে হতে পারে। মূর্চ্ছা হয় না, তবে দু-এক সেকেণ্ডের জন্য রোগী হয়ত অন্যমনা হয়ে যায়। হয়ত বসে কাজ করছে হঠাৎ দু-এক সেকেণ্ড কি রকম হয়ে গেল—হাতের কাজ বন্ধ হয়ে গেল। এটা রোগী নিজেই বুঝতে পারে না—তবে তার সামনে যারা থাকে তারা বুঝতে পারে।

## পাগল সম্পর্কিত - দলিল, চিত্র- ২৬

# — পাগল —

মুসাফির

রাস্তার মধ্যেখানে খুব ভীড় জমিয়া গিয়াছে। একটা পাগলকে ঘিরিয়া সকলে আমোদ উপভোগ করিতেছে। সে কেবল হাসিতেছে আর বলিতেছে— কি দেখছ তোমরা, আমি পাগল না? আবার উচ্চ হাসি। পাগল বলে— তোমরা হাসচ কেন, তোমাদের হাসার কি আছে। জনতার ভিতর হইতে একজন বলিয়া ওঠে— তুই হাসছিস কেন? পাগল বলে— আমি হাসছি আমার ইচ্ছে, মিত্তিরদের বাড়ী জানো? জানোনা? তোমরা কিছুই জাননা। যারা কলকাতার মিত্তিরদের জানেনা তারা কিছুই জানেনা. তারা মূর্খ এইত পরেশ মিত্তির 'নাইট' হ'ল। 'নাইট'—আবার সেই হাসি। বলে—সত্যিই অন্ধকার করে ছাড়লে। তারপর জনতার দিকে চাহিয়া বলে— আবার হাঁ করে চেয়ে আছো। আমার মুখে কিছু লেখা আছে কি? হ্যাঁ সেই মিত্তির বাড়ী! তাদের চার চারখানা গাড়ী আর তিরিশখানা বাড়ী তোমরা তাদের জানোনা? জনতার ভিতর হইতে একজন পরিহাসের সুরে বলিয়া ওঠে— খুব জানি সে তোর বাবা হয়। জনতার মধ্যে হাসির উৎস বহিয়া যায়। পাগল বলিয়া ওঠে— তুমি কে বাবা হাত গুণতে জানো, না মুখ দেখে বলতে পার? আমার মুখে কি পরেশ মিত্তিরের ছেলে লেখা আছে। তুমি ঠিক বলেছ বাবা. তোমায়— এই বলিতে বলিতে তাহার পায়ের কাছে পাগল লুটাইয়া পড়িল। জনতা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। পাগল হা হা করিয়া হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হইতে লাগিল।

ট্রামের লোকগুলো তারদিকে চাহিয়া আছে দেখিয়া পাগল আবার বলিতে সুরু করে— কি মশাই হাসছেন কেন, আপনি পাগল নাকি? শুধু শুধু আমারদিকে চেয়ে হাসছেন? আপনি মিত্তির বাড়ীর ছেলে? কখনও নয়, তাহলে আজ আর হাসতে পারতেন না কাঁদতে হ'ত'। পাগল গম্ভীর হইয়া যায়, বলে— একটা চাকরী দেবেন আমাকে? পরেশ মিত্তিরের ছেলে চাকরী! হা হা হা। সেদিন নাইট হ'ল। সব অন্ধকার মশাই অন্ধকার। লেডি মিত্তির মশাই, লেডি মিত্তির। হাঁ করে চেয়ে আছে দেখো। যেন বুঝতেই পারছে না। মনে করছেন পরেশ মিত্তিরের বৌ যদি লেডি হয় ত আমার মা হবে না কেন? তা হয় না মশাই তা হয় না। মা ছিল গরীবের মেয়ে। একবেলা না খেয়ে বাবার সংসারে ছিল. সে থাকতেই বাবা knight হয়েছিল। মরে গেল বেচারা, সুখ ভোগে এলোনা।

পাগলের চোখে জল, মুখে হাসি।

তারপর কি হল জানেন মশাই— ট্রাফিক পুলিশ রাস্তা ছাড়িয়া দিয়াছে, ট্রাম এগিয়ে চলে। পাগল চিৎকার করিয়া বলে'— ও মশাই শুনবেন না? ট্রাম এগিয়ে চলে যায়। পাগল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে— আমার কথা ওরা কেউ শুনতে চায় না, কেনই বা শুনবে, আমি যে পাগল!

পাগল চলিতে থাকে। আর একখানা ট্রাম আসিয়া পড়িল। পাগল ছুটিয়া ট্রামের কাছে যাইতে গিয়া আর একটু হইলেই মোটর চাপা পড়িত। মোটর ড্রাইভার ব্রেক কষায় দাঁড়াইয়া পড়িল। পাগল সেই সামনেই দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল— হায় পুলিশ সেই

পাগল সংক্রান্ত একটি প্রবন্ধ= প্রবাসী পত্রিকা ,অগ্রহায়ন, ১৩৫৬

# তথ্যপঞ্জি

## প্রাথমিক উপাদান

### ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ড


- IOR/P/13/37 ০৪ আগস্ট ১৮৪১ নং ০৪-০৫, রিটার্নস অফ পাবলিক পেসেন্ট ট্রিটেড, ভবানীপুর এন্ড দুলান্দা অ্যাসাইলাম ১৮৪০-৪১ ডিজিটাল ম্যানুসক্রিপ্ট ।
- IOR/P/13/37 ০৪ আগস্ট, ১৮৪১, নং ১৬-১৭ , রিটার্নস অফ পাবলিক পেসেন্ট ট্রিটেড, ভবানীপুর এন্ড দুলান্দা অ্যাসাইলাম ১৮৪০-৪১ ডিজিটাল ম্যানুসক্রিপ্ট ।
- IOR/P/13/37 ০৪ আগস্ট, ১৮৪১, নং ২১-২২, রিটার্নস অফ পাবলিক পেসেন্ট ট্রিটেড, ভবানীপুর এন্ড দুলান্দা অ্যাসাইলাম ১৮৪০-৪১ ডিজিটাল ম্যানুসক্রিপ্ট ।
- IOR/P/13/37 ০৪ আগস্ট, ১৮৪১, নং ২৬-২৭ , রিটার্নস অফ পাবলিক পেসেন্ট ট্রিটেড, ভবানীপুর এন্ড দুলান্দা অ্যাসাইলাম ১৮৪০-৪১ ডিজিটাল ম্যানুসক্রিপ্ট ।
- IOR /P/14/31 0১ সেপ্টেম্বর১৮৫৩ , নং ২৩-২৪, রিপোর্ট অন দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ফর কলকাতায় ইউরোপীয়ান এন্ড ইউরেশীয় ইন ক্যালকাটা, ডিজিটাল ম্যানুসক্রিপ্ট।
- IOR /F/4/617/15373,রিপোর্ট অফ দ্য মেডিক্যাল বোর্ড অন দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ দ্য লুনাটিক অ্যাসাইলাম ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, পাটনা, বেনারস [বারাণসী], বরেলি এন্ড রসপাগলা, ডিজিটাল ম্যানুসক্রিপ্ট।
- IOR /P/1002 জানুয়ারী ১৮৭৬ নং ৪৪-৪৬, রেজোলিউশন এন্ড লেটার রিগার্ডিং বেঙ্গল ইনসাইন এসাইলাম রিপোর্ট ১৮৭৪, ডিজিটাল ডিজিটাল ম্যানুসক্রিপ্ট।

- IOR /L/PS/12/3314, ডিজিটাল পাণ্ডুলিপি, অ্যাক্সেসের তারিখ - 10ই আগস্ট 2020,
- IOR/L/PS/12/3314, ডিজিটাল পাণ্ডুলিপি, অ্যাক্সেসের তারিখ - 10ই আগস্ট 2020,
- IOR/L/PS/12/3314, ডিজিটাল পাণ্ডুলিপি, অ্যাক্সেসের তারিখ - 10ই আগস্ট 2020,
- IOR/L/PS/12/3314, ডিজিটাল পাণ্ডুলিপি, অ্যাক্সেসের তারিখ - 10ই আগস্ট 2020,
- IOR/P/13/37 04 আগস্ট 1841 নম্বর 04-05-ডিজিটাল পাণ্ডুলিপি (অধিভুক্তির তারিখ- 5.01.2021)
- IOR-P-13-37 06 অক্টোবর 1841 নম্বর 16-17_ভবানীপুর এবং দুলুন্ডা অ্যাসাইলামে চিকিৎসা করা সরকারি রোগীদের ফেরত- 1840-41
- IOR-P-1005 মার্চ 1877 নং। 19-21_1875 সালের জন্য বাংলার উন্মাদ আশ্রয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন সম্পর্কিত রেজোলিউশন, 1875 সালের জন্য বাংলার উন্মাদ আশ্রয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন সম্পর্কিত প্রস্তাব

- IOR-F-4-617-15373 ঢাকা [ঢাকা], মুর্শিদাবাদ, পাটনা, বেনারস [বারাণসী], বেরেলি এবং রসাপাগলা 1816-ডিসেম্বর 1819 সালে প্রকাশিত পাগলাগারদের প্রশাসনের উপর ভিত্তিতে বেঙ্গল মেডিকেল বোর্ডের রিপোর্ট।
- IOR/P/13/37 06 অক্টোবর 1841 নম্বর 16-17- ডিজিটাল পাণ্ডুলিপি (অধিভুক্তির তারিখ- 5.02.2021)
- IOR/P/13/37 08 সেপ্টেম্বর 1841 নম্বর 21-22- ডিজিটাল পাণ্ডুলিপি (অ্যাক্সেসের তারিখ তারিখ- 5.02.2021)
- IOR/P/13/37 14 জুলাই 1841 নম্বর 26-27- ডিজিটাল পাণ্ডুলিপি (অ্যাক্সেসের তারিখ তারিখ- 5.02.2021)
- IOR/P/14/31 01 সেপ্টেম্বর 1853 নম্বর 23-24- ডিজিটাল পাণ্ডুলিপি (অ্যাক্সেসের তারিখ তারিখ- 5.03.2021)
- IOR / D/7 876 , ডিজিটাইজড পান্ডুলিপি ফাইল (অ্যাক্সেসের তারিখ তারিখ- 5.03.2021)

## সরকারী প্রতিবেদন

- দ্যা রেকর্ড অফ গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল নং-২৮, রিপোর্ট অফ দ্য এসাইলাম ফর ইউরোপীয় এন্ড নেটিভ ইন সেন পেসেন্টস, অ্যাট ভবানিপুর এন্ড দুলান্দা ফর ১৮৫৬ এন্ড ১৮৫৭ , নং- ২৭০ জন গ্রে ১৮৫৬ এবং ১৮৫৭ সালের জন্য ভাওয়ানিপুর এবং দুললুন্ডায় ইউরোপীয় এবং নেটিভ ক্যালকাটা গেজেট অফিস।
- জে.ফরসিথ, রিপোর্ট অফ দ্য এসাইলাম ফর ইউরোপীয় এন্ড নেটিভ ইন সেন পেসেন্টস, অ্যাট ভবানিপুর এন্ড দুলান্দা ফর ১৮৫৬ ডিরেক্টর জেনারেল মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট,
- থিওডোর ক্যান্টর, রিপোর্ট অফ দ্য এসাইলাম ফর ইউরোপীয় এন্ড নেটিভ ইন সেন পেসেন্টস, অ্যাট ভবানিপুর এন্ড দুলান্দা ফর ১৮৫৬ ডিরেক্টর জেনারেল মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট,
- অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৬২, জে ম্যাক.ক্লেল্ড, অফিসিয়াটিং প্রিন্সিপাল ইন্সপেক্টর জেনারেল, মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট।
- অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৬৩ , জে ম্যাক.ক্লেল্ড, অফিসিয়াটিং প্রিন্সিপাল ইন্সপেক্টর – জেনারেল, মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট।
- অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৬৬ , ডবলু.এ গ্রীন, ইনস্পেক্টর জেনারেল অফ হসপিটাল, লোয়ার প্রভিন্সেস, ক্যালকাটা , বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস।
- অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইউরপিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাট ভবানিপুর ফর দ্যা ইয়ার ১৮৬৭, এ.পাইন, সার্জন সুপারইনডিউটেড। ক্যালকাটা , বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস।
- অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৬৭ , ডবলু.এ গ্রীন, ইনস্পেক্টর জেনারেল অফ হসপিটাল, লোয়ার প্রভিন্সেস, ক্যালকাটা , বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস।
- অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৬৮ জে. ম্যারে ইন্সপেক্টর – জেনারেল অফ হসপিটাল ,বেঙ্গল মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট, ক্যালকাটা।

- অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৬৯ জে. ম্যারে ইন্সপেক্টর – জেনারেল অফ হসপিটাল ,বেঙ্গল মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট, ক্যালকাটা।
- অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার - ১৮৭০,জে. ক্যাম্পবেল ব্রাউন, ইন্সপেক্টর – জেনারেল অফ হসপিটাল ,বেঙ্গল মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট, ক্যালকাটা।
- অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার - ১৮৭১, জে. ক্যাম্পবেল ব্রাউন, ইন্সপেক্টর – জেনারেল অফ হসপিটাল ,বেঙ্গল মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট, ক্যালকাটা।
- অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার - ১৮৭২, জে. ক্যাম্পবেল ব্রাউন, ইন্সপেক্টর – জেনারেল অফ হসপিটাল ,বেঙ্গল মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট, ক্যালকাটা।
- অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার - ১৮৭৩ জে. ক্যাম্পবেল ব্রাউন, ইন্সপেক্টর – জেনারেল অফ হসপিটাল ,বেঙ্গল মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট, ক্যালকাটা।
- অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার -১৮৭৪ জে. ক্যাম্পবেল ব্রাউন, ইন্সপেক্টর – জেনারেল অফ হসপিটাল ,বেঙ্গল মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট, ক্যালকাটা।
- অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার অফ ১৮৭৫ জে. ফুলারটন বিটসন,, সার্জেন জেনারেল অফ হসপিটাল ,ইনচার্জ বেঙ্গল মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট, ক্যালকাটা।
- অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার অফ ১৮৭৬ জে. ফুলারটন বিটসন,, সার্জেন জেনারেল অফ হসপিটাল ,ইনচার্জ বেঙ্গল মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট, ক্যালকাটা।
- অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৭৭ , জেমস আরভিং, অফিসিয়েটিং সার্জেন জেনারেল ফর বেঙ্গল, মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট, ক্যালকাটা।
- অ্যানুয়াল রিপোর্ট অ্যান্ড রিটার্নস অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল উইথ ব্রিফ নোটস ফর দ্যা ইয়ার ১৯১২, কর্নেল জি.এফ.এ. হ্যারিস।
- অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৭৮ , জেমস আরভিং, সার্জেন জেনারেল অফ হসপিটাল ,ইনচার্জ বেঙ্গল মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট, ক্যালকাটা।
- অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৭৯ , এ. জে. পেইন সার্জেন জেনারেল অফ বেঙ্গল মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস। ক্যালকাটা।
- অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৮০, এ. জে. পেইন সার্জেন জেনারেল অফ বেঙ্গল মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস। ক্যালকাটা।
- অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৮১ , এ. জে. পেইন সার্জেন জেনারেল অফ বেঙ্গল মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস। ক্যালকাটা।
- অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৮২, এ. জে. পেইন সার্জেন জেনারেল অফ বেঙ্গল মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস। ক্যালকাটা।
- অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৮৩ , এ. জে. পেইন সার্জেন জেনারেল অফ বেঙ্গল মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস। ক্যালকাটা।

- অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৮৪, এ.জে. কোউই, ইনস্পেক্টর জেনারেল সিভিল হসপিটাল অফ বেঙ্গল, মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস। ক্যালকাটা।
- অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৮৫, এ.জে. কোউই, ইনস্পেক্টর জেনারেল সিভিল হসপিটাল অফ বেঙ্গল, মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস। ক্যালকাটা।
- অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৮৬, এ.জে. কোউই, ইনস্পেক্টর জেনারেল সিভিল হসপিটাল অফ বেঙ্গল, মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস। ক্যালকাটা।
- অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৮৭, ১৮৮৮, এন্ড ১৮৮৯,১৮৯০, এন্ড ১৮৯১ এ.হিলসন, ইনস্পেক্টর জেনারেল সিভিল হসপিটাল অফ বেঙ্গল, মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস, ক্যালকাটা।
- অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৮৮, এ.হিলসন, ইনস্পেক্টর জেনারেল সিভিল হসপিটাল অফ বেঙ্গল, মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস, ক্যালকাটা।
- অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৮৯, এ.হিলসন, ইনস্পেক্টর জেনারেল সিভিল হসপিটাল অফ বেঙ্গল, মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস, ক্যালকাটা।
- অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৯০, এ.হিলসন, ইনস্পেক্টর জেনারেল সিভিল হসপিটাল অফ বেঙ্গল, মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস, ক্যালকাটা।
- অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৯১ এ.হিলসন, ইনস্পেক্টর জেনারেল সিভিল হসপিটাল অফ বেঙ্গল, মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস, ক্যালকাটা।
- অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৯২ জে.জি.পিলচার ইনস্পেক্টর জেনারেল সিভিল হসপিটাল অফ বেঙ্গল, , বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস,
- অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৯৩ এন্ড ১৮৯৪, আর.হার্ভে, ইনস্পেক্টর জেনারেল সিভিল হসপিটাল অফ বেঙ্গল, , বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস,
- অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৯৩ এন্ড ১৮৯৪, আর.হার্ভে, ইনস্পেক্টর জেনারেল সিভিল হসপিটাল অফ বেঙ্গল, , বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস,
- অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৯৫ কর্নেল জি রস ইনস্পেক্টর জেনারেল সিভিল হসপিটাল অফ বেঙ্গল, , বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস,
- অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৯৬ এন্ড ১৮৯৭ জে.এইচ.নিউম্যান ইনস্পেক্টর জেনারেল সিভিল হসপিটাল অফ বেঙ্গল, , বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস।

- অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৯৮ টি.ডি.হেন্ডলি, ইনস্পেক্টর জেনারেল সিভিল হসপিটাল অফ বেঙ্গল, , বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস।
- অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৮৯৯ এন্ড ১৯০০ , জে.এইচ.নিউম্যান ইনস্পেক্টর জেনারেল সিভিল হসপিটাল অফ বেঙ্গল, , বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস।
- অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৯০৬ , ১৯০৭, ১৯০৮ এন্ড ১৯০৯ , কর্নেল আর ম্যাক্রে ইনস্পেক্টর জেনারেল সিভিল হসপিটাল অফ বেঙ্গল, , বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস।
- অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল অফ দ্যা ইয়ার ১৯১২ , জি.এফ.এ. হ্যারিস, ইনস্পেক্টর জেনারেল সিভিল হসপিটাল অফ বেঙ্গল, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস
- অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা মেডিক্যাল স্কুল ইন বেঙ্গল ১৯৪১-৪২,
- ক্যালকাটা জার্নাল অফ মেডিসিন, ভলিউম নং- ২৯ , ক্যালকাটা ১৯১১।
- দ্য ইন্ডিয়ান মেডিকেল গেজেট, ভলিউম- ৩, ওয়াইম্যান ব্রাদার্স, হেয়ার স্ট্রিট, কলকাতা, ১৮৬৮।
- দ্য ট্রিটমেন্ট অফ ইনসানিটি , জন এম গ্যাল্ট, এম.ডি, হার্পার অ্যান্ড ব্রাদার্স, পাবলিশার্স, নিউ ইয়র্ক, ১৮৪৬.
- এলিয়টসন, জন; মেসমারিজম ইন ইন্ডিয়া , রয়্যাল কলেজ অফ সার্জনস অফ ইংল্যান্ড, প্রকাশক হিপোলাইট বেইলিয়ার,২১৯, রিজেন্ট স্ট্রিট, লন্ডন, ১৮৪৯
- ম্যানুয়াল অফ লুনাসি উইনস্লো, লিটলেটন ফোর্বস, প্রকাশক স্মিথ, এল্ডার, ওয়েলকাম লাইব্রেরি ১৮৩ ইউস্টন রোড, লন্ডন এনডাব্লু.বিই, ১৮৭৪
- দ্য ক্যালকাটা জার্নাল অফ মেডিসিন, সম্পাদনা- মহেন্দ্র লাল সরকার, কলকাতা, ১৮৭২।
- মাইনর ম্যালেডিস অ্যান্ড দেয়ার ট্রিটমেন্ট, লেখক লিওনার উইলিয়ামস, প্রকাশক লন্ডন বেলির, টিন্ডাল এবং কক্স, ১৯১৮
- হাকিম আহমেদ হুসাইন, দ্য প্রিন্সিপালস অফ ইউনানি মেডিসিন, লেখক ডঃ এল.আই, এস হুসাইন ,৭, পেরুমল চেট্টি স্ট্রিট, মাদ্রাজ।
- এল. টি কর্নেল ডি জি ক্রফোর্ড , এ হিস্ট্রি অফ দ্য ইন্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিস, এলটি কর্নেল ডি জি ক্রফোর্ড, ভলিউম ২, ১৬০০-১৯১৩, ডব্লিউ থ্যাকার অ্যান্ড কো. ২ ক্রিড লেন ই. লন্ডন।


## NAI , অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্যা ইনসেন অ্যাসাইলাম ইন বেঙ্গল


- এন.এ.আই, হোম -মেডিক্যাল - মার্চ 1877 প্রসিডিং নং 19-21, পার্ট -এ
- এন.এ.আই,হোম- মেডিক্যাল - জানুয়ারি 1878 প্রসিডিং নং 15-16 পার্ট -বি
- এন.এ.আই,হোম -মেডিক্যাল - আগস্ট 1878 প্রসিডিং নং 67-68 পার্ট -বি
- এন.এ.আই,হোম- মেডিক্যাল - জুন 1879 প্রসিডিং নং 23-25 পার্ট -বি
- এন.এ.আই,হোম- মেডিক্যাল - জুন 1880 প্রসিডিং নং 51-54 পার্ট-বি
- এন.এ.আই,হোম- মেডিক্যাল - জুলাই 1880 প্রসিডিং নং 57 পার্ট -বি

- এন.এ.আই,হোম- মেডিক্যাল - মার্চ 1880 প্রসিডিং নং 16-17 পার্ট -বি

## ক্রিমিনাল লুনাটিক- ১৯৮৯, অ্যাক্ট- V অফ

- অ্যাক্ট V অফ ১৯৮৯, ক্রিমিনাল লুনাটিক, , অধ্যায় XXXIV, ধারা-464
- অ্যাক্ট V অফ ১৯৮৯, ক্রিমিনাল লুনাটিক, অধ্যায় XXXIV, ধারা-464/1
- অ্যাক্ট V অফ ১৯৮৯, ক্রিমিনাল লুনাটিক, , অধ্যায় XXXIV, ধারা-464/2
- অ্যাক্ট V অফ ১৯৮৯, ক্রিমিনাল লুনাটিক, অধ্যায় XXXIV, ধারা-465
- অ্যাক্ট V অফ ১৯৮৯, ক্রিমিনাল লুনাটিক, অধ্যায় XXXIV, ধারা-465/1
- অ্যাক্ট V অফ ১৯৮৯, ক্রিমিনাল লুনাটিক, অধ্যায় XXXIV, ধারা-466
- অ্যাক্ট V অফ ১৯৮৯, ক্রিমিনাল লুনাটিক, , অধ্যায় XXXIV, ধারা-466/1
- অ্যাক্ট V অফ ১৯৮৯, ক্রিমিনাল লুনাটিক, অধ্যায় XXXIV, ধারা-466/2
- অ্যাক্ট V অফ ১৯৮৯, ক্রিমিনাল লুনাটিক, , অধ্যায় XXXIV, ধারা-467
- অ্যাক্ট V অফ ১৯৮৯, ক্রিমিনাল লুনাটিক, অধ্যায় XXXIV, ধারা-467/1
- অ্যাক্ট V অফ ১৯৮৯, ক্রিমিনাল লুনাটিক, অধ্যায় XXXIV, ধারা-467/2
- অ্যাক্ট V অফ ১৯৮৯, ক্রিমিনাল লুনাটিক, , অধ্যায় XXXIV, ধারা-468
- অ্যাক্ট V অফ ১৯৮৯, ক্রিমিনাল লুনাটিক, অধ্যায় XXXIV, ধারা-468/1
- অ্যাক্ট V অফ ১৯৮৯, ক্রিমিনাল লুনাটিক, , অধ্যায় XXXIV, ধারা-468/2
- অ্যাক্ট V অফ ১৯৮৯, ক্রিমিনাল লুনাটিক, অধ্যায় XXXIV, ধারা-469
- অ্যাক্ট V অফ ১৯৮৯, ক্রিমিনাল লুনাটিক, , অধ্যায় XXXIV, ধারা-470
- অ্যাক্ট V অফ ১৯৮৯, ক্রিমিনাল লুনাটিক, অধ্যায় XXXIV, ধারা-471
- অ্যাক্ট V অফ ১৯৮৯, ক্রিমিনাল লুনাটিক, অধ্যায় XXXIV, ধারা-472
- অ্যাক্ট V অফ ১৯৮৯, ক্রিমিনাল লুনাটিক, , অধ্যায় XXXIV, ধারা-473
- অ্যাক্ট V অফ ১৯৮৯, ক্রিমিনাল লুনাটিক, অধ্যায় XXXIV, ধারা-474
- অ্যাক্ট V অফ ১৯৮৯, ক্রিমিনাল লুনাটিক, অধ্যায় XXXIV, ধারা-475

## দ্য ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট -1858

- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট, অ্যাক্ট XXXVI অফ 1858, দ্য ল অফ লুনাসি, সেকশন-5
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট, অ্যাক্ট XXXVI অফ 1858, দ্য ল অফ লুনাসি, সেকশন-6
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট, 1858 XXXVI , দ্য ল অফ লুনাসি, সেকশন-6/A
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট, অ্যাক্ট XXXVI অফ 1858, দ্য ল অফ লুনাসি, সেকশন-7
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট, অ্যাক্ট XXXVI অফ 1858, দ্য ল অফ লুনাসি, সেকশন-8
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট, অ্যাক্ট XXXVI অফ 1858, দ্য ল অফ লুনাসি, সেকশন-8/1
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট, অ্যাক্ট XXXVI অফ 1858, দ্য ল অফ লুনাসি, সেকশন- 8/2

- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট, অ্যাক্ট XXXVI অফ 1858, দ্য ল অফ লুনাসি, সেকশন-8/4
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট, অ্যাক্ট XXXVI অফ 1858, দ্য ল অফ লুনাসি, সেকশন-9
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট, অ্যাক্ট XXXVI অফ 1858, দ্য ল অফ লুনাসি, সেকশন-10
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট, অ্যাক্ট XXXVI অফ 1858, দ্য ল অফ লুনাসি, সেকশন-11
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট, 1858 XXXVI , দ্য ল অফ লুনাসি, সেকশন-12
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট, অ্যাক্ট XXXVI অফ 1858, দ্য ল অফ লুনাসি, সেকশন-13
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট, 1858 XXXVI আইন, দ্য ল অফ লুনাসি, সেকশন-14
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট, অ্যাক্ট XXXVI অফ 1858, দ্য ল অফ লুনাসি, সেকশন-15
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট, অ্যাক্ট XXXVI অফ 1858, দ্য ল অফ লুনাসি, সেকশন-16
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট, অ্যাক্ট XXXVI অফ 1858, দ্য ল অফ লুনাসি, সেকশন-17
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট, অ্যাক্ট XXXVI অফ 1858, দ্য ল অফ লুনাসি, সেকশন-17-A
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট, অ্যাক্ট XXXVI অফ 1858, দ্য ল অফ লুনাসি, সেকশন-17-বি
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট, অ্যাক্ট XXXVI অফ 1858, দ্য ল অফ লুনাসি, সেকশন-17-C
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাক্ট, অ্যাক্ট XXXVI অফ 1858, দ্য ল অফ লুনাসি, সেকশন-18

## মিলিটারি লুনাটিকস অ্যাক্ট,

মিলিটারি লুনাটিকস অ্যাক্ট, 1877, অ্যাসাইলামে মিলিটারি লুনাটিকদের ভর্তির সুবিধা দেওয়ার জন্য একটি আইন। আইন নং. একাদশ. 1877 সালের আইন বিভাগ।, 7ই জুলাই, 1877। কাউন্সিল ইন ইন্ডিয়ার গভর্নর-জেনারেলের নিম্নলিখিত আইন 1877 সালের 33শে মে মহামান্য গভর্নর-জেনারেলের সম্মতি পায় , এ. ফিলিপস, সরকারের সচিব ভারতের

- মিলিটারি লুনাটিকস অ্যাক্ট, 1877, অ্যাক্ট নং-XI। অধ্যায় 2.
- মিলিটারি লুনাটিকস অ্যাক্ট, 1877, অ্যাক্ট নং-XI। ধারা 3
- মিলিটারি লুনাটিকস অ্যাক্ট, 1877, অ্যাক্ট নং-XI। ধারা 4
- মিলিটারি লুনাটিকস অ্যাক্ট, 1877, অ্যাক্ট নং-XI। ধারা 5
- মিলিটারি লুনাটিকস অ্যাক্ট, 1877, অ্যাক্ট নং-XI। ধারা 6
- মিলিটারি লুনাটিকস অ্যাক্ট, 1877, অ্যাক্ট নং-XI। ধারা 7
- মিলিটারি লুনাটিকস অ্যাক্ট, 1877, অ্যাক্ট নং-XI। অধ্যায় 8
- মিলিটারি লুনাটিকস অ্যাক্ট, 1877, অ্যাক্ট নং-XI। ধারা 9

## দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট -1912,

- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- II, অধ্যায়-II, ধারা-4/1
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- II, অধ্যায়-II, ধারা-4/2
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV of 1912, Part- II, Chapter-II, Section-5/1
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- II, অধ্যায়-II, ধারা-5/2

## দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট -1912,

- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- II, অধ্যায়-II, ধারা-5/3
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- II, অধ্যায়-II, ধারা-5/4
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- II, অধ্যায়-II, ধারা-6/1,6/2,6/3
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- II, অধ্যায়-II, ধারা-7/1,7/2,7/3,7/4
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- II, অধ্যায়-II, ধারা-8
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- II, অধ্যায়-II, ধারা-9
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- II, অধ্যায়-II, ধারা-10/1,10/2
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- II, অধ্যায়-II, ধারা-11/1,11/2
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- II, অধ্যায়-II, ধারা-12
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- II, অধ্যায়-II, ধারা-13/1,13/2
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- II, অধ্যায়-II, ধারা-14
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- II, অধ্যায়-II, ধারা-15/1,15/2
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- II, অধ্যায়-II, ধারা-16/1,16/2
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- II, অধ্যায়-II, ধারা-17
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- II, অধ্যায়-II, ধারা-18/1,18/2,18/3
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- II, অধ্যায়-II, ধারা-19/1,19/2
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- II, অধ্যায়-II, ধারা-20/1,20/2
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- II, অধ্যায়-II, ধারা-21
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- II, অধ্যায়-II, ধারা-22
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- II, অধ্যায়-II, ধারা-23
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- II, অধ্যায়-II, ধারা-24
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- II, অধ্যায়-II, ধারা-25
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- II, অধ্যায়-II, ধারা-26
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- II, অধ্যায়-II, ধারা-27
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- III, অধ্যায়-III, ধারা-28/1,28/2
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- III, অধ্যায়-III, ধারা-29
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- III, অধ্যায়-III, ধারা-30/1,30/2
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- III, অধ্যায়-III, ধারা-31/1,31/2
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- III, অধ্যায়-III, ধারা-32/1,32/2
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- III, অধ্যায়-III, ধারা-33
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- III, অধ্যায়-III, ধারা-33-A
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- III, অধ্যায়-III, ধারা-34

## দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট -1912

- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- III, অধ্যায়-III, ধারা-35/1,35/2
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- III, অধ্যায়-III, ধারা-36
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- IV, অধ্যায়-IV, ধারা-37
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- IV, অধ্যায়-IV, ধারা-38/1,38/2
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- IV, অধ্যায়-IV, ধারা-39
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- IV, অধ্যায়-IV, ধারা-40/1,40/2
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- IV, অধ্যায়-IV, ধারা-41/1,41/2
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- IV, অধ্যায়-IV, ধারা-42
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- IV, অধ্যায়-IV, ধারা-43/1,43/2
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- IV, অধ্যায়-IV, ধারা-44
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- IV, অধ্যায়-IV, ধারা-45
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- IV, অধ্যায়-IV, ধারা-46/1,46/2
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- IV, অধ্যায়-IV, ধারা-47/1,47/2
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- IV, অধ্যায়-IV, ধারা-48
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- IV, অধ্যায়-IV, ধারা-49
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- IV, অধ্যায়-IV, ধারা-50/1,50/2
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- IV, অধ্যায়-IV, ধারা-51
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- IV, অধ্যায়-IV, ধারা-52/1,52/2
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- IV, অধ্যায়-IV, ধারা-53
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- IV, অধ্যায়-IV, ধারা-54
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- IV, অধ্যায়-IV, ধারা-55/1,55/2,55/3
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- IV, অধ্যায়-IV, ধারা-56/1,56/2
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- IV, অধ্যায়-IV, ধারা-57
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- IV, অধ্যায়-IV, ধারা-58
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- IV, অধ্যায়-IV, ধারা-59
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- IV, অধ্যায়-IV, ধারা-60/1,60/2
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- IV, অধ্যায়-IV, ধারা-61
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- V, অধ্যায়- V, ধারা-62
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- V, অধ্যায়-V, ধারা-63/1,63/2
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- V, অধ্যায়- V, ধারা-64
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- V, অধ্যায়-V, ধারা-65/1,65/2
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- V, অধ্যায়- V, ধারা-66

# দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট -1912

- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- V, অধ্যায়- V, ধারা-67/1,67/2
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- V, অধ্যায়- V, ধারা-68
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- V, অধ্যায়-V, ধারা-69/1,69/2
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- V, অধ্যায়- V, ধারা-70
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- V, অধ্যায়-V, ধারা-71/1,71/2
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- V, অধ্যায়- V, ধারা-72
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- V, অধ্যায়- V, ধারা-73
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- V, অধ্যায়-V, ধারা-74/1,74/2
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- V, অধ্যায়- V, ধারা-75/1,75/2
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- V, অধ্যায়- V, ধারা-76/1,76/2
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- V, অধ্যায়- V, ধারা-77
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- V, অধ্যায়- V, ধারা-78
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- V, অধ্যায়- V, ধারা-79
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- V, অধ্যায়- V, ধারা-80/1,80/2
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- V, অধ্যায়- V, ধারা-81
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- V, অধ্যায়-V, ধারা-82/1,82/2
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- V, অধ্যায়- V, ধারা-83
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- VI, অধ্যায়-VI, ধারা-84
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, 1912-এর IV, পার্ট- VI, অধ্যায়-VI, ধারা-84-A
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- VI, অধ্যায়-VI, ধারা-85
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- VII, অধ্যায়-VII, ধারা-86/1,86/2
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- VII, অধ্যায়-VII, ধারা-87
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- VII, অধ্যায়-VII, ধারা-88
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- VII, অধ্যায়-VII, ধারা-89/1,89/2
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- VII, অধ্যায়-VII, ধারা-89-B
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- VII, অধ্যায়-VII, ধারা-90
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- VIII, অধ্যায়- VIII, ধারা-91
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- VIII, অধ্যায়- VIII, ধারা-92
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- VIII, অধ্যায়-VIII, ধারা-93/1,93/2
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, 1912 এর IV, পার্ট- VIII, অধ্যায়- VIII, ধারা-94
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, 1912 এর IV, পার্ট- VIII, অধ্যায়- VIII, ধারা-95
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- VIII, অধ্যায়- VIII, ধারা-96

- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- VIII, অধ্যায়- VIII, ধারা-97
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- VIII, অধ্যায়- VIII, ধারা-98/1,98/2
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- VIII, অধ্যায়- VIII, ধারা-99
- দ্য ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট, IV অফ 1912, পার্ট- VIII, অধ্যায়- VIII, ধারা-100


## লুনাটিক প্রিজনার - অ্যাক্ট-III অফ 1900


- অ্যাক্ট-III অফ 1900 - লুনাটিক প্রিজনারস , ধারা- 30/1।
- অ্যাক্ট-III অফ 1900 - লুনাটিক প্রিজনারস , ধারা- 30/2,
- অ্যাক্ট-III অফ 1900 - লুনাটিক প্রিজনারস , ধারা- 30/3
- অ্যাক্ট-III অফ 1900 - লুনাটিক প্রিজনারস , ধারা- 30/3A
- অ্যাক্ট-III অফ 1900 - লুনাটিক প্রিজনারস , ধারা- 30/4
- অ্যাক্ট-III অফ 1900 - লুনাটিক প্রিজনারস , ধারা- 30/4-A, (G. O. No. 600, Judicial, 31st March 1890)।
- অ্যাক্ট-III অফ 1900 - লুনাটিক প্রিজনারস , সেকশন- 30/4-বি, (G. O. No. 1296 Misc., 12th June 1888)।
- অ্যাক্ট-III অফ 1900 - লুনাটিক প্রিজনারস , ধারা- 30/4-C,


## মেডিকেল গেজেট এবং জার্নাল


- দ্য ইন্ডিয়ান মেডিকেল গেজেট,. 1944 অক্টোবর; 79(10) 493–497, মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা বৈদ্যুতিক পদ্ধতি, জে.ই. ধুঞ্জিভয়
- দ্য ইন্ডিয়ান মেডিকেল গেজেট, 1941 মে; 76(5) 312., ব্যক্তিত্ব এবং মানসিক অসুস্থতা মানসিক রোগ নির্ণয়ের একটি প্রবন্ধ
- দ্য ইন্ডিয়ান মেডিকেল গেজেট, ক্যাম্পবেল, লুনাটিক অ্যাসাইলামে মহামারী ড্রপসির প্রাদুর্ভাব, ঢাকা, মার্চ 1907, সেপ্টেম্বর; 43(9)
- দ্য ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেট, ক্যাম্পবেল, লুনাটিক অ্যাসাইলামে মহামারী ড্রপসির প্রাদুর্ভাব, ঢাকা, 1909, সেপ্টেম্বর;
- ইন্ডিয়ান মেডিকেল গেজেট, ক্যাম্পবেল, লুনাটিক অ্যাসাইলাম, ঢাকায় মহামারী ড্রপসির প্রাদুর্ভাব, 1908 সালের মার্চ মাসে, 1 সেপ্টেম্বর; 43(9)
- দ্য ইন্ডিয়ান মেডিকেল গেজেট, ক্যাম্পবেল, লুনাটিক অ্যাসাইলাম, ঢাকায় মহামারী ড্রপসির প্রাদুর্ভাব, মার্চ 1908, 1908 সেপ্টেম্বর; 43(9)
- দ্য ইন্ডিয়ান মেডিকেল গেজেট, ক্যাম্পবেল, লুনাটিক অ্যাসাইলামে মহামারী ড্রপসি, ঢাকা, মার্চ 1908, 43(9)

- দ্য ইন্ডিয়ান মেডিকেল গেজেট। 1932 নভেম্বর; 67(11) 612-617., সালফার ট্রিটমেন্ট ফোর মেন্টাল ইলনেস মানসিক রোগে সালফার চিকিৎসা 100 টি ক্ষেত্রে একটি পরীক্ষামূলক অধ্যয়ন।
- দ্য ইন্ডিয়ান মেডিকেল গেজেট, সম্পাদক – S.DS. Graval ভলিউম 90(1); ভলিউম-LXL নং 1 কলকাতা, জানুয়ারী 1955
- দ্য ইন্ডিয়ান মেডিকেল গেজেট, 1922 জুলাই; 64(7) 362–371, জে.ই. ধুঞ্জিভয়, এনসেফালাইটিস লেথারজিকা রোঁচের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, রাঁচি ইন্ডিয়ান মেন্টাল হাসপাতালে চিকিৎসা করা পোস্ট-এনসেফালিটিক লেথারজিক কেসের উপর সংক্ষিপ্ত নোট।
- ইন্ডিয়ান মেডিকেল গেজেটে, জে.ওয়াইজ, 'জেনারেল প্যারালাইসিস অফ দ্য ইনসেন, ১৮৫২
- সমীক্ষা , ফোর টাইপ্স ইঙ্কলুডিং প্রোগ্রেস ডিউরিং সাইকো সাইকো-অ্যানালিটিক্যাল ট্রিটমেন্ট , বাই ই.বারগ্লার , ভলিউম-৪ নং-৪
- *সমীক্ষা*, জার্নাল অফ ইন্ডিয়ান সাইকো-অ্যানালিটিক্যাল সোসাইটি, জি. বোস দ্বারা সম্পাদিত, ভলিউম-2, নং-2, নিউ থিয়োরি অফ মেন্তাল লাইফ বাই জি. সি. বোস , ক্যালকাটা, 1948। ,
- সমীক্ষা, জার্নাল অফ ইন্ডিয়ান সাইকো-অ্যানালিটিক্যাল সোসাইটি, ইন্ডিয়ান সাইকো-অ্যানালিটিক্যাল সোসাইটি; কার্যপ্রণালী, জি. বোস দ্বারা সম্পাদিত, ভলিউম-2, নং-4, কলকাতা 1948,
- সমীক্ষা, জার্নাল অফ ইন্ডিয়ান সাইকো-অ্যানালিটিক্যাল সোসাইটি, এস সি মিত্র দ্বারা সম্পাদিত, ভলিউম-২, নং-৩, ইন্ডিয়ান সাইকো-অ্যানালিটিক্যাল সোসাইটি নেমস অফ মেম্বারস, কলকাতা 1948।
- সমীক্ষা, জার্নাল অফ ইন্ডিয়ান সাইকো-অ্যানালিটিক্যাল সোসাইটি, এস সি মিত্র দ্বারা সম্পাদিত, ভলিউম-2, নং-3, ইজ সাইকো-অ্যানালিটিক প্রসিডিউর সায়েন্টিফিক, কলকাতা, 1948।
- সমীক্ষা, জার্নাল অফ ইন্ডিয়ান সাইকো-অ্যানালিটিক্যাল সোসাইটি, জি. বোস দ্বারা সম্পাদিত, ভলিউম-2, নং-2, মানসিক জীবনের একটি নতুন তত্ত্ব, কলকাতা, 1948,
- সমীক্ষা, জার্নাল অফ ইন্ডিয়ান সাইকো-অ্যানালিটিক্যাল সোসাইটি, এস.সি মিত্র দ্বারা সম্পাদিত, ভলিউম-2, নং-3, সাইকো-বিশ্লেষণ পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক, কলকাতা, 1948,
- সমীক্ষা , বোস, গিরিন্দ্র শেখর ,(সম্পাদনা) মানসিক জীবনের সমীক্ষার একটি নতুন তত্ত্ব, জার্নাল অফ দ্য ইন্ডিয়ান সাইকো-অ্যানালিটিক্যাল সোসাইটি ভলিউম- 2 নং। 1948 কলকাতা,
- দ্য ক্যালকাটা পুলিশ জার্নাল , ঘোষাল, পি.এন, পাগলা মার্ডার কেস, , এডি কেপি সোবহান, ভলিউম-১, নং-১, কলকাতা, ১৯৩৭
- জার্নাল অফ সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ, ব্রুমলিক, কিম্বার্লি সি., লাভের জন্য লুনাসি দ্য ইকোনমিক গেইনস অফ 'নেটিভ-অনলি' লুনাটিক অ্যাসাইলাম ইন দ্য বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, 1850-1870, 02 (01) 2014
- সাইকোলজি টুডে, স্মিথ, ম্যাথিউ মানসিক স্বাস্থ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, দ্য হিলিং ওয়াটারস; পাগলামি নিরাময়ের জন্য জলথেরাপি ব্যবহারের দীর্ঘ ইতিহাস।, 2015
- দ্য ইন্ডিয়ান মেডিকেল গেজেট, সাইকোলজিক্যাল মেডিসিনের একটি হ্যান্ডবুক। (যুদ্ধকালীন মানসিক ব্যাধির একটি অধ্যায় ) 1945 নভেম্বর; 80(11)

- দ্য জার্নাল অফ সোশিওলজি অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার, ভলিউম ১৪, আর্টিকেল ৫, ইস্যু ৪ ডিসেম্বর ১৯৮৭, হিস্টোরি ক্যাল পারস্পেক্টিভ অন দ্য কেয়ার এন্ড ট্রিটমেন্ট অফ দ্য মেন্টালি ইল।
- ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ সাইকিয়াট্রি, মেন্টাল হেলথ ইন এননসিয়েন্ট ইন্ডিয়া এন্ড ইটস রিলেভেন্স টু মডার্ন সাইকিয়াট্রি, ১৯৯৯, ৪১ (১)।
- *দ্য হসপিটাল,* "দ্য সাইকো থেরাপিউটিক্স অফ ইনসানিটি" ১৪ ই মার্চ ১৯১৪
- *দ্য হসপিটাল,* " ইনসানিটি ক্যান বি কিওর" ১০ই সেপ্টেম্বর। ১৯২১,
- ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ সাইকিয়াট্রির , হিস্ট্রি অফ সাইকিয়াট্রি ইন বেঙ্গল, ,২০১৮
- জার্নাল অফ সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ , বি, কিমবার্লি. সি, লুনাসি ফর প্রফিট ; দ্য ইকোনমিক গেইন্স অফ 'নেটিভ-ওনলি' লুনাটিক অ্যাসাইলাম ইন দ্য বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, ১৮৫০-১৮৭০। ২০১৪।
- জার্নাল অফ ফিলোসফি, লুইস ডি. কে. অ্যান আর্গুমেন্ট ফর দ্য আইডেন্টিটি অফ ইনসেন, ১৯৭১


# গৌণ উপাদান

## বাংলা পত্র-পত্রিকা


- চিত্ত, মনোবিজ্ঞান বিষয়ক- ত্রৈমাসিক পত্রিকা, সম্পাদকঃ তরুন চন্দ্র সিংহ, পঞ্চম বর্ষ, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭০।
- চিত্ত, মনবিদ্যা বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা , সম্পাদক সুহৃত চন্দ্র প্রথম বর্ষ , দ্বিতীয় সংখ্যা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৬।
- চিত্ত, মনবিদ্যা বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা , সম্পাদক সুহৃত চন্দ্র দ্বিতীয় বর্ষ , তৃতীয় সংখ্যা, কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৬৭।
- চিত্ত, মনবিদ্যা বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা , সম্পাদক সুহৃত চন্দ্র তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৮।
- চিত্ত, মনবিদ্যা বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা , সম্পাদক সুহৃত চন্দ্র তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৮।
- চিত্ত, মনবিদ্যা বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা , সম্পাদক সুহৃত চন্দ্র তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৬৮।
- চিত্ত, মনবিদ্যা বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা , সম্পাদক সুহৃত চন্দ্র পঞ্চমবর্ষ, কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৭০।
- আয়ুর্বেদ, আর্য্যচিকিৎসা বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক মাসিক পত্রিকা, সম্পাদকঃ কবিরাজ শ্রী সত্যচরন সেনগুপ্ত , চতুর্থ বর্ষ, ১৩২৬ আশ্বিন – ১৩২৭ ভাদ্র, কলিকাতা।
- আয়ুর্বেদ, মাসিক পত্রিকা ও সমালোচক , সম্পাদকঃ কবিরাজ শ্রী বিরজাচরন গুপ্ত , তৃতীয় বর্ষ, ১৩২৫ আশ্বিন – ১৩২৬ ভাদ্র পর্যন্ত , কলিকাতা।

- আয়ুর্বেদ, মাসিক পত্রিকা ও সমালোচক , সম্পাদকঃ কবিরাজ শ্রী বিরজাচরন গুপ্ত , দ্বিতীয় বর্ষ, ১৩২৪ আশ্বিন – ১৩২৫ ভাদ্র পর্যন্ত , কলিকাতা।
- গবর্নমেন্ট গেজেট পত্রিকা, প্রথম , দ্বিতীয় , তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ট, সপ্তম ও অষ্টম খণ্ড , ১৮৮০, ২৯ শে জুন, কলিকাতা।
- জ্ঞান ও বিজ্ঞান, বিজ্ঞান সংবাদ উন্মাদ রোগের চিকিৎসা , শ্রী জয়া রায় , বর্ষ ২ সংখ্যা ১১ , নভেম্বর ১৯৪৯
- জ্ঞান ও বিজ্ঞান, উন্মাদ রোগ ও তার চিকিৎসা , শ্রী জয়া রায় , বর্ষ ১১ সংখ্যা ৫ , মে ১৯৫৮


## ইংরেজি গ্রন্থ


- রাইট ডাব্লু. ওভারবেক , ল’ ডিরেঞ্জমেন্টস ইন ইন্ডিয়া, দেয়ার সিমটন এন্ড ট্রিটমেন্ট , থ্যাকার, স্পিঙ্ক অ্যান্ড কোং, ক্যালকাটা
- ব্রাউন, ডাব্লু.এ.এফ. , দ্য মোরাল ট্রিটমেন্ট অফ দ্য ইনসেন , জে ই অ্যাডলার্ড, লন্ডন, ১৮৬৪
- ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ সাইকিয়াট্রি, ডঃ ডি. এল.এন মুর্তিরাও অপরেশন ফরেনসিক সাইকিয়াট্রি ইন ইন্ডিয়া কারেন্ট এন্ড ফিউচার ডেভলপমেন্ট , এল পি শাহ, ১৯৯৯, ৪১ (৩)।
- আর্নস্ট, ওয়ালট্রাউড; মেডিক্যাল হিস্ট্রি , অ্যাসাইলাম প্রভিসন এন্ড দ্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইন দ্য নাইন্টিন সেঞ্চুরি , ১৯৯৮
- আর্নস্ট, ওয়ালট্রাউড, কলোনিয়ালিজম এন্ড ট্রাঞ্জিসনাল সাইক্রিয়াট্রি – দি ডেভলপমেন্ট অফ ইন্ডিয়ান মেন্টাল হসপিটাল ইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া.
- আর্নস্ট, ওয়ালট্রাউড; এসাইলাম প্রভিশন এন্ড ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইন নাইন্টিন সেঞ্চুরি , ১৯৯৮।
- দাবাক,ইশান এ., ম্যাড নেস দেন ইন্সানিটি নাও দ্য ইভলিউশন অফ ম্যাড নেস ইন ইন্ডিয়া ফ্রম এনসেন্ট টূ মডার্ন টাইমস, ২০১৮
- চেভার্স, নরম্যান, এ কমেন্ট্রি অন দ্য ডিজিজ অফ ইন্ডিয়া, প্রকাশক জে. এবং এ. চার্চিল, নিউ বার্লিংটন স্ট্রিট, লন্ডন, ১৮৮৬
- চ্যাটার্জ্জী, শ্রীলতা, ওয়েস্টার্ন মেডিসিন এন্ড কলোনিয়াল ইন্ডিয়ান
- রবিন্স, আর্থার. জে । মেন্টাল হসপিটাল ইন ইন্ডিয়া এন্ড সোশ্যাল ওয়ার্কার।
- স্কাল, আন্ড্রু, দ্য ইন্সানিটি অফ প্লেস এন্ড দ্য প্লেস অফ ইন্সানিটি ঃ এসেস অন দ্য হিস্ট্রি অফ সাইক্রিয়াট্রি, রটলেজ, ২০০৬
- স্কাল, আন্ড্রু; ম্যাডনেস এ ভেরি শর্ট ইন্ট্রোডাকশন অফ ম্যাডনেস, অক্সফোর্ড , ২০১১
- স্কাল, আন্ড্রু;সোশ্যাল ওর্ডার এন্ড মেন্টাল ডিসঅর্ডার অ্যাংলো অ্যামেরিকান সাইক্রিয়াট্রি ইন হিস্ট্রোরিক্যাল পারসপেকটিভ ,২০০৬

- স্কাল, অ্যান্ড্রু ম্যাডনেস ইন সিভিলাইজেশন–এ কালচারাল হিস্ট্রি অফ ইনসানিটি ফ্রম দ্য বাইবেল তো ফ্রয়েড, ফ্রম ম্যাডহাউস তো মডার্ন মেডিসিন .
- ই.লিয়া জনস্টন, ভালনারঅ্যাবিলিটি এন্ড জাস্ট ডেসার্ট এ থিওরী অফ সেনটেনসিং এন্ড মেন্টাল ইলনেস।
- ডেভিড ম্যাথিউস, ক্যাপিটালিজম এন্ড মেন্টাল হেলথ , মান্থলি রিভিউ, এন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোশ্যালিস্ট ম্যাগাজিন , ২০০৯।
- গিবসন, নাইজেল; ডিকলোনাইজিং ম্যাডনেস, দ্য সাইক্রিয়াতিক রাইটিং অফ ফ্রেঞ্চ ফ্যাননের, পালগ্রেভ ম্যাকমিলান, ২০14
- নন্দী, আশিষ ; অ্যাট দ্য এডজ অফ সাইকোলজি- এসেস ইন পলিটিক্যাল এন্ড কালচার। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯০।
- আর্নল্ড, ডেভিড; কলোনাইজিং দ্য বডি ; ষ্টেট মেডিসিন এন্ড এপিডেমিক ডিসিস ইন নাইনটিন সেঞ্চুরি ইন্ডিয়া। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস , নিউ দিল্লি, ১৯৩৩।
- কুমার,দীপক; সায়েন্স এন্ড দ্য রাজ ; অ্যা স্টাডি অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া , অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৬,
- মিলস,জেমস; এইচ, ম্যাডনেস ক্যানাবিস এন্ড কলোনিয়ালিজম . দ্য নেটিভ অনলি লুনাটিক অ্যা সাই লাম অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, ১৮৫৭-১৯০০, ম্যাকমিলান প্রেস, লন্ডন,২০০০
- আর্নল্ড, ডি.; (এড.), ইম্পেরিয়াল মেডিসিন এন্ড আদিবাসী সোসাইটি (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস নয়া দিল্লি ১৯৮৮)
- আর্নল্ড, ডেভিড; ইউরোপীয় অরফান্স এন্ড ভার গ্রান্টস ইন ইন্ডিয়া ইন দ্য নাইন টিন সেঞ্চুরি, জার্নাল অফ ইম্পেরিয়াল অ্যান্ড কমনওয়েলথ হিস্ট্রি,১৯৭৯।
- মিলিঙ্গেন, জে.জি; মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট, লন্ডন এফোরিজম অন দ্য ট্রিটমেন্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য ইনসেন উইথ কনসিডারেশন অন পাবলিক অ্যান্ড প্রাইভেট লুনাটিক এসাইলাম, লন্ডন, ২০১৫
- লিউডর, ইভান; অ্যাণ্ড টমাস ফিলিপ, ভয়েস অফ রিসন এবং ভয়েস অফ ইনসানিটি , স্টাডিজ অফ ভারব্যাল হ্যালুসিনেশনস, লন্ডন, রাউটলেজ। ২০০০
- রোজেনথাল, ডি.এম; (এডিটেড), ক্লাস, মাইন্ড ওভার মাইন্ড দ্য অ্যানথ্রপলজি অ্যান্ড সাইকোলজি অফ স্পিরিট পসেশন , রোনাল্ড & লিটিলফিল্ড, ২০০৩।
- মিউলেনবেল্ড, জি.জে; অ্যা হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া , মেডিক্যাল লিটারেচার, ১৯৯৯।
- নাসের. এম; সাইক্রিয়াট্রি ইন এনসেন্ট ইজিপ্ট, সাইকিয়াট্রিক বুলেটিন-১১- নাজিবাদি আকবর শাহ; হিস্ট্রি অফ ইসলাম (এড) ভলিউম-২ , রিয়াধ , দারুসসালাম, ২০০1
- রোজেন.জর্জ; ম্যাডনেস এন্ড সোসাইটি, রটলেজ এবং কেগান পল, লন্ডন। ১৯৬৮
- রিস.জি.বি. মাইন্ডিং বডিস, সেভিং সোলস আ হিস্ট্রি অফ হসপিটালস, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯০
- রিম. ডেভিস. সি,& জন, ডব্লিউ. সমারভিল; অ্যাবনরম্যাল সাইকোলজি, নিউ ইয়র্ক, একাডেমিক,১৯৭৭

- রোজেন, ই. & গ্রেগরি. আই., অ্যাবনরম্যাল সাইকোলজি, ডব্লিউবি স্যান্ডার্স কোম্পানি। ফিলাডেলফিয়া অ্যান্ড, লন্ডন,১৯৬৫
- শর্মা, এ. কে.; সায়েন্সটিফিক বায়াসেস ফর আয়ুর্বেদিক মেডিসিন র এফএল সি.আর.সি প্রেস, ২০০৩
- আর্নস্ট, ওয়ালট্রাউড; মেডিক্যাল/কলোনিইয়াল পাওয়ার - লুনাটিক অ্যাসাইলাম সি. ১৮০০-১৯০০, জার্নাল অফ এশিয়ান হিস্ট্রি, ভলিউম ৪০, নং ১ (২০০৬)
- রয়, পোর্টার.; উইলাম এফ.বাইনাম, মাইকেল শেফার্ড, দ্য এনাটমি অফ ম্যাডনেস-এসেস ইন দ্য হিস্ট্রি অফ সাইক্রিইয়াট্রি, ভলিউম- ১ রটলেজ, ১৯৮৮,
- বেরিওস, জি. ই. & গ্যাসকেল, হিউ লিওনেল ফ্রিম্যান.; ফিফটী ইয়ারস অফ ব্রিটিশ সাইকিয়াট্রির, ১৮৪১-১৯৯১, মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট, ১৯ ৯১
- হার্টক, ক্রিশ্চিয়ান, শেঠ. এন্ড মহাজন, সাইকো আনালিসিস ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০১
- হোরোউইটজ ,এ.ভি.; ক্রিয়েটিং মেন্টাল ইলনেস, ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো প্রেস, শিকাগো ২০০২,
- গ্রেসন, একে.; ব্যাবিলনিয়া হিসটোরিক্যাল টেক্সটস, টরন্টো সেমিটিক টেক্সট
- আর্মস্ট্রং, ডি.এম.এ.; ম্যাটেরিয়ালিস্ট থিওরি অফ মাইন্ড,লন্ডন,১৯৬৮
- আব্রামোভিৎজ, ইরি & ডেভিসন, এন্ড নেয়াল.আই.এম; আবনরম্যাল সাইকোলজি,জন উইলি এন্ড সন্স, ইনকর্পোরেটেড 1986
- বসু, অমিত রঞ্জন.; হিস্ট্রসাইজিং ইন্ডিয়ান সাইক্রিয়াট্রি, ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ সাইকিয়াট্রি, ভলিউম-৪৭, ২০০৫
- ফুকো,মিশেল ম্যাড নেস অ্যান্ড সিভিলাইজেশনঃ অ্যা হিস্ট্রি অফ ইন্সানিটি ইন দ্য এজ অফ রিজন; ট্রান্সলেটেড বাই জে.খালফা, নিউইয়র্ক, রটলেজ,১৯৬৪
- ফ্রেডেরিক এম স্মিথ দ্য সেলফ পসেসডঃ ডাইটি অ্যান্ড স্পিরিট পসেশন ইন সাউথ এশিয়ান লিটারেচার অ্যান্ড সিভিলাইজেশন ;কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৬
- আব্রামস, আর *ইলেক্ট্রোকনভালসিভ থেরাপি*, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, অক্সফোর্ড,
- ই.বেঙ্গট. অ্যান্ড ক্লার্ক মেন্টাল ইলনেস, ডব্লিউ. ইউনিভার্সিটি অফ ফিলাডেলফিয়া প্রেস ২০০১
- এলিয়টসন, জন মেসমারিজম ইন ইন্ডিয়া , রয়্যাল কলেজ অফ সার্জনস অফ ইংল্যান্ড, প্রকাশক হিপোলাইট বেইলিয়ার, রিজেন্ট স্ট্রিট, লন্ডন, ১৮৪৯
- ই.বেঙ্গট. অ্যান্ড ক্লার্ক. মেন্টাল ইলনেস, ডব্লিউ. ইউনিভার্সিটি অফ ফিলাডেলফিয়া প্রেস ২০০১
- ক্যাম্পবেল,কে.কে; বডি এন্ড মাইন্ড. লন্ডন, ১৯৭০
- বোয়ার্স.পল.ই দ্য ডেনজারাস ইনসেন , জার্নাল এফ আমেরিকান ইনস্টিটিউট অফ ক্রিমিনাল ল'স, ভলিউম ১২, নং থার্ড, নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি
- বেইন.নাউন. লিওবভ, হোয়াট ওয়াজ দ্য মেন্টাল ডিসিস এফেক্টেড কিং সল ? ক্লিনিক্যাল কেসস, জার্নাল অফ ক্লিনিক্যাল কেস স্টাডিস,২০০৩ .

- বারুচ, হালপার্ণ .ডেভিড সিক্রেট ডেমনস মসীহ মার্ডার ট্রাইওর কিং , .B.Endmans, ২০০৩
- বুচার,জে.এণ্ড আই.হোলি. অ্যাবনরম্যাল সাইকোলজি, পিয়ারসন, বোস্টন,২০১৪।

- বি.জর্জ. এন্ড হেগেল এনসাইক্লোপিডিয়ায় ফিলোসফি ডে ল'এসপ্রিট, প্যারিস, জেনার বেলার, ১৮৮৭
- বেঙ্গট এবং ক্লার্ক, উইচক্রাফট এন্ড ম্যাজিক ইন ইউরোপঃ বাইবেলিক্যাল এন্ড পেগান সোসাইটি, "ইউনিভার্সিটি অফ ফিলাডেলফিয়া প্রেস, ২০০১
- বরেল.ডেভিড; প্লাটোনিজম ইস ইসলামিক ফিলোসপি, রটলেজ ১৯৯৮
- ভুগ্রা, ডি, সাইক্রিয়াট্রি ইন এনসেন্ট ইন্ডিয়ান টেক্সটঃ এ রিভাইবিং হিস্ট্রি অফ সাইক্রিয়াট্রি. সেজ পাবলিকেশন.

চট্টোপাধ্যায়. ডি কেস ফর অ্যা ক্লিনিক্যাল অ্যানালিসিস অফ দ্য চরক সংহিতা, ইন স্টাডিজ ইন দ্য হিস্ট্রি অফ সায়েন্স ইন ইন্ডিয়া, ভলিউম-১ নয়া দিল্লি,

কোলম্যান, জে.সি অ্যাবনরম্যাল সাইকোলোজি অ্যান্ড মডার্ন লাইফ, বোম্বে ডি.বি.তারালপ্রেভালা সন্স এন্ড কোং প্রাইভেট, ১৯৭০

ডেভিড. এম.রবিনসন ম্যাডনেস ইন গ্রীক থট অ্যান্ড কাস্টম বাই অ্যাগনেস কার ভন'স রিভিউ , দ্য ক্লাসিক্যাল উইক্লি , ভলিউম-১৪। মার্চ-১৯২১ অনলাইন কালেকশন, জেস্টর - নভেম্বর-২০১৩

ফুকো,মিশেল ম্যাড নেস অ্যান্ড সিভিলাইজেশনঃ অ্যা হিস্ট্রি অফ ইন্সানিটি ইন দ্য এজ অফ রিজন; ট্রান্সলেটেড বাই জে.খালফা, নিউইয়র্ক, রটলেজ,১৯৬৪

ফ্রেডেরিক এম স্মিথ দ্য সেলফ পসেসডঃ ডাইটি অ্যান্ড স্পিরিট পসেশন ইন সাউথ এশিয়ান লিটারেচার অ্যান্ড সিভিলাইজেশন ;কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৬

ডেভিড. এম.রবিনসন ম্যাডনেস ইন গ্রীক থট অ্যান্ড কাস্টম বাই অ্যাগনেস কার ভন'স রিভিউ , দ্য ক্লাসিক্যাল উইক্লি , ভলিউম-১৪। মার্চ-১৯২১ অনলাইন কালেকশন, জেস্টর - নভেম্বর- ২০১৩

এলিয়টসন, জন মেসমারিজম ইন ইন্ডিয়া , রয়্যাল কলেজ অফ সার্জনস অফ ইংল্যান্ড, প্রকাশক হিপোলাইট বেইলিয়ার, রিজেন্ট স্ট্রিট, লন্ডন, ১৮৪৯

এন্ডলার, এনএস *কনভালসিভ থেরাপি*, নিউ ইয়র্ক রেভেন প্রেস, ১৯৮৫
ফিঙ্ক, এম

ক্যাম্পবেল,কে.কে বডি এন্ড মাইন্ড. লন্ডন, ১৯৭০

কোলম্যান, জে.সি অ্যাবনরম্যাল সাইকোলোজি অ্যান্ড মডার্ন লাইফ, বোম্বে ডি.বি.তারালপ্রেভালা সন্স

একোং প্রাইভেট, ১৯৭০

আব্রামস, আর *ইলেক্ট্রোকনভালসিভ থেরাপি*, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, অক্সফোর্ড,

ই.বেঙ্গট. অ্যান্ড ক্লার্ক মেন্টাল ইলনেস, ডব্লিউ. ইউনিভার্সিটি অফ ফিলাডেলফিয়া প্রেস ২০০১

বেইন.নাউন. লিওবভ হোয়াট ওয়াজ দ্য মেন্টাল ডিসিস এফেক্টেড কিং সল ? ক্লিনিক্যাল কেসস, জার্নাল অফ ক্লিনিক্যাল কেস স্টাডিস,২০০৩ .

বারুচ, হালপার্ণ .ডেভিড সিক্রেট ডেমনস মসীহ মার্ডার ট্রাইওর কিং , .B.Endmans, ২০০৩

বুচার,জে.এণ্ড আই.হোলি. অ্যাবনরম্যাল সাইকোলজি, পিয়ারসন, বোস্টন,২০১৪।

বি.জর্জ. এন্ড হেগেল এনসাইক্লোপিডিয়ায় ফিলোসফি ডে ল'এসপ্রিট, প্যারিস, জেনার বেলার, ১৮৮৭

বেঙ্গট এবং ক্লার্ক উইচক্রাফট এন্ড ম্যাজিক ইন ইউরোপঃ বাইবেলিক্যাল এন্ড পেগান সোসাইটি, ইউনিভার্সিটি অফ ফিলাডেলফিয়া প্রেস, ২০০১

বরেল.ডেভিড প্লাটোনিজম ইস ইসলামিক ফিলোসপি, রটলেজ ১৯৯৮

বোয়ার্স.পল.ই দ্য ডেনজারাস ইনসেন , জার্নাল এফ আমেরিকান ইনস্টিটিউট অফ ক্রিমিনাল ল’স,

ভলিউম ১২, নং থার্ড, নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি

বেইন.নাউন. লিওবভ হোয়াট ওয়াজ দ্য মেন্টাল ডিসিস এফেক্টেড কিং সল ? ক্লিনিক্যাল কেসস, জার্নাল অফ ক্লিনিক্যাল কেস স্টাডিস,২০০৩ .

বারুচ, হালপার্ণ .ডেভিড সিক্রেট ডেমনস মসীহ মার্ডার ট্রাইওর কিং , .B.Endmans, ২০০৩

বুচার,জে.এণ্ড আই.হোলি. অ্যাবনরম্যাল সাইকোলজি, পিয়ারসন, বোস্টন,২০১৪।

বি.জর্জ. এন্ড হেগেল এনসাইক্লোপিডিয়ায় ফিলোসফি ডে ল'এসপ্রিট, প্যারিস, জেনার বেলার, ১৮৮৭

বেঙ্গট এবং ক্লার্ক উইচক্রাফট এন্ড ম্যাজিক ইন ইউরোপঃ বাইবেলিক্যাল এন্ড পেগান সোসাইটি, "ইউনিভার্সিটি অফ ফিলাডেলফিয়া প্রেস, ২০০১

বরেল.ডেভিড প্লাটোনিজম ইস ইসলামিক ফিলোসপি, রটলেজ ১৯৯৮

এলিয়টসন, জন মেসমারিজম ইন ইন্ডিয়া , রয়্যাল কলেজ অফ সার্জনস অফ ইংল্যান্ড, প্রকাশক হিপোলাইট বেইলিয়ার, রিজেন্ট স্ট্রিট, লন্ডন, ১৮৪৯

এন্ডলার, এনএস *কনভালসিভ থেরাপি*, নিউ ইয়র্ক রেভেন প্রেস, ১৯৮৫

ফিঙ্ক, এম
ক্যাম্পবেল,কে.কে বডি এন্ড মাইন্ড. লন্ডন, ১৯৭০

কোলম্যান, জে.সি অ্যাবনরম্যাল সাইকোলোজি অ্যান্ড মডার্ন লাইফ, বোম্বে ডি.বি.তারালপ্রেভালা সন্স একোং প্রাইভেট, ১৯৭০

ফুকো,মিশেল ম্যাড নেস অ্যান্ড সিভিলাইজেশনঃ অ্যা হিস্ট্রি অফ ইন্সানিটি ইন দ্য এজ অফ রিজন, ট্রান্সলেটেড বাই জে.খালফা, নিউইয়র্ক, রটলেজ,১৯৬৪

ফ্রেডেরিক এম স্মিথ দ্য সেলফ পসেসডঃ ডাইটি অ্যান্ড স্পিরিট পসেশন ইন সাউথ এশিয়ান লিটারেচার অ্যান্ড সিভিলাইজেশন ;কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৬

## বাংলা গ্রন্থ

অসিতবরণ চৌধুরি সাঁওতাল সমাজ , ডাইনি ও বর্তমান সংকট , প্রকাশক , এ . মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং প্রা লি ১৯৮৫

আব্দুল, লতিফ ইউনানি হাকিমি চিকিৎসা প্রণালী , প্রকাশকঃ মুনীন্দ্র মোহন বসু, কোলকাতা,১৮৯২

আহমেদ, মঞ্জুর মনঃসমীক্ষণ মতধারা , জ্ঞানকোষ প্রকাশন, ২০০৫ , ঢাকা
অ্যাডলফ হিটলার মাইন ক্যাম্ফ , বেঙ্গল পাবলিশার্স , কলকাতা , ১৯২৪ , পৃ ৩৪২
আদ্বয় চৌধুরী ত্রাহস্পর্শে পাগল দুটি লেখা তিনটি ফঁদ , পাগল সংকলন , কলকাতা , ২০১৪
অজিত কুমার রায়চৌধুরী অকাল প্রেম , ন্যাশনাল পাবলিশার্স , কলিকাতা , ১৯৬০
আহমেদ, মঞ্জুর মনঃসমীক্ষণ মতধারা , জ্ঞানকোষ প্রকাশন, ২০০৫ , ঢাকা
ত্রিপাঠী, অমলেশ ইতিহাস ও ঐতিহাসিক ; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক , কলকাতা , ১৯৯৫ ,
কাকর সুধীর গিরিদ্রশেখর বসু, ইন্টারন্যাশনাল ডিকশনারি অফ সাইকোঅ্যানালাইসিস.

কবিরাজ বিজয় বাংলা বাগধরা প্রয়োগ ও প্রসঙ্গ , পুনশ্চ , কলকাতা

কার্ল মার্কস ক্যাপিট্যাল প্রথম খণ্ড ; বাংলা অনুবাদ আখতার হোসেন বাণীপ্রকাশ , ১৯৭৪ কলকাতা ,
কৌশিক দত্ত প্রলাপ ঐহিক , পাগল সংকলন কলকাতা , ২০১৪ , পৃঃ ১১ ।
কালী কিঙ্কর সেনশর্মা আয়ুর্বেদ শিক্ষা , কোলকাতা ,১৯৮০

কাজী, সইফুদ্দিন অস্বাভাবিক ও চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান , আবীর পাবলিকেশন , ঢাকা, ২০০৬,
কথাসরিৎসাগর দ্বিতীয় সংস্করণ , ১৮২৫ , ১৫ অধ্যায় , ৪৪ অনুচ্ছেদ ।

কথামৃত ৪ র্থ খণ্ড । ১৪ ই সেপ্টেম্বর , ১৮৮৪ অষ্টম পরিচ্ছেদ , নরেন্দ্রাদির শিক্ষা

কৃত্তিবাসী রামায়ণ বঙ্গবাসী । বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

কাশীদাসী মহাভারত বঙ্গবাসী , দ্বিতীয় সংস্করণ , বঙ্গাব্দ- ১৪১৩

কাশীনাথ পাণ্ডুবঙ্গ পর্বর রামায়ণ সংস্কৃত , শক , ১৮১০

খান শামুজ্জামান (এডিটেড) ফোকলোর অফ বাংলাদেশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। ১৯৮৫

গিরিশ - গ্রন্থাবলী , দ্বিতীয় ভাগ , বসুমতি

গোস্বামী ,দামোদর ঐহিক , পাগল সংকলন , কলকাতা, , ২০১৪

গাঙ্গুলি, মানিক শ্রী ধর্ম্মমঙ্গল , বিরচিত , বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ , ১৩১২ , পৃঃ ১৭৩

গঙ্গোপাধ্যায় ধীরেন্দ্রনাথ মনোবিদ্যার ইতিবৃত্ত মাণব মন , ৪৫ বর্ষ , প্রথম সংখ্যা , ২০০১ ,কলকাতা.

গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ন পাগলকন্যা , ডি , এস , লাইব্রেরী ,১৯৪৫, কলিকাতা

বসু, অমিতরঞ্জন গিরীশচন্দ্র রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড ,

গুপ্ত, অমৃতলাল *আয়ুর্বেদ শিক্ষা,* ,প্রথম খণ্ড,চতুর্থ সংস্করণ,কলিকাতা,১৯১২

গুপ্ত, শ্রী অমৃতলাল আয়ুর্বেদ শিক্ষা , তৃতীয় খণ্ড , দিপায়ন প্রকাশনী । কোলকাতা ১৯৮০

ঘোষ, কুমারেশ ( সম্পা) উন্মাদ ' সংখ্যা , ' অপকর্ম , জ্যোষ্ঠিমধুর পত্রিকা ১৯৮৭

ঘোষ, গৌতম "মানের মানুষ " — বাংলা সিনেমা , কলিকাতা , রিলিজ- ২০১০.

ঘোষ অরুণ অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান , এডুকেশনাল এন্টর প্রাইস , কলিকাতা , ১৯৬৫ ,

ঘোষ, অরুণ মন এক অন্তর , দে বুক স্টোর , কলিকাতা , ১৯৯৩

চন্দ্র, নারায়ন চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস

চক্রবর্ত্তী অরুন কুমার চিকিৎসা বিজ্ঞানে বাঙালী,

চক্রবর্ত্তী অরুন কুমার চিকিৎসা বিজ্ঞানে আবিষ্কার ও কোলকাতা

চক্রবর্তি. চিন্তাহরণ দ্য ক্যাল্ট অফ কালের চক্র (চরক পূজা ও উন্মাদনা ) জার্নাল অফ দ্য এশিয়াটিক সোসাইটিঅফ বেঙ্গল, কলকাতা, ১৯৩৫

চট্টোপাধ্যায়. ডি কেস ফর অ্যা ক্লিনিক্যাল অ্যানালিসিস অফ দ্য চরক সংহিতা, ইন স্টাডিজ ইন দ্য হিস্ট্রি অফ সায়েন্স ইন ভিয়া, ভলিউম-১ নয়া দিল্লি,

চরক সংহিতা কবিরাজ বজেন্দ্র চন্দ্র নাগ, নব পত্র প্রকাশনী, ১৯৮৪ কোলকাতা

চণ্ডিকা বিজয় রংপুর সাহিত্য পরিষদ , ১৩১৬

চৈতন্যমঙ্গল বঙ্গবাসী ১৩০৮ ( বঙ্গাব্দ )

চৈতন্যচরিতামৃত বঙ্গবাসী চৈতন্যাব্দ – ১৪১৬ বঙ্গাব্দ

চৈতন্য কুমার পাগল ও পাগলামি , কলকাতা , ১৯২৪ ,

চন্দ্রমোহন তর্করত্ন অমরকোষ টীকা , সংস্কৃত

জয়ন্ত ভট্টাচার্য ভারতের পটভূমীতে চিকিৎসা বিজ্ঞান, অবভাষ,কলকাতা

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ বিচিত্র প্রবন্ধ - পাগল , বিশ্বভারতী ১৩১৪ , পু ৯৮

ঠাকুর , রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্র সংগীত , কীর্তন রাগ , রচনাকাল — আষাঢ় ১২৯৪ , কলকাতা ,

ডেভিড. এম.রবিনসন ম্যাডনেস ইন গ্রীক থট অ্যান্ড কাস্টম বাই অ্যাগনেস কার ভন'স রিভিউ , দ্য ক্লাসিক্যাল উইক্লি , ভলিউম-১৪। মার্চ-১৯২১ অনলাইন কালেকশন, জেস্টর - নভেম্বর- ২০১৩

তুকারাম জাজী প্রকাশিত সাহিত্যদর্পণ , ১৯০২

দত্ত, বিজিতকুমার আকাদেমি বাংলা অভিধান , পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি , ১৯৯৯ , কলিকাতা

দে , দীপক মানুষের ভাগ্য , ভারতী প্রকাশনী , কলিকাতা , ১৯৯৩

দীলু কবীর , পাগল সংহিতা, ঢাকা, ২০১৬

দাশ, সুস্নাত ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামে অবিভক্ত বাংলা , প্রাইমা পাবলিকেশনস্ , কলকাতা

ঐ সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসীবাদ বিরোধী সংগ্রামে বাংলা ; সমাজ সমীক্ষা ; প্রসঙ্গ গণতন্ত্র , উনবিংশ বর্য , প্রথম - দ্বিতীয় বর্ষ , উন্ডিয়ান স্কুল অব সোসাল সায়েন্সেস পার্থরাখা কলকাতা , ২০১৩

দাশরথি রায়ের পাঁচালী বঙ্গবাসী , ১৩০৯

দ্যাসাগর উত্তরচরিত ( সং ) ১৪১৫

ধর, শান্তি ( সম্পা ) পাগলী ; আন্ডার গ্রাউণ্ড গল্প সংকলন , ডাটকো প্রেস , হাওড়া , ১৯৯৬

নন্দী , ধীরেন্দ্রনাথ মনের বিকার , আনন্দ , কলিকাতা , ১৯৯২

নাথ, শ্রী ত্রিগুণা অর্গাননন অফ মেডিসিন, প্রকাশকঃ হ্যানিম্যান পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, প্রথম সংস্করণ ১৩৬৮,ভাদ্র,

নাগ, কবিরাজ ব্রজেন্দ্রাথ আয়ুর্বেদ প্রদীপ, নবপত্র প্রকাশন,১৯৮০ কলিকাতা

পাহারী, সুব্রত আধুনিক বাংলার আর্য়ুবেদ চিকিৎসা, রচয়িতা প্রকাশনী, কলকাতা

পাহারী, সুব্রত উনিশ শতকের বাংলার সনাতনী চিকিৎসা ব্যবস্থা, পগ্রেসিভ কোলকাতা

পাহারী , সুব্রত উনিশ শতকের বাংলার সনাতনী চিকিৎসা ;,প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স , ১৯৯৭

বসু , বিনয় ভূষন ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস, কলকাতা

বসু ,আমিতরঞ্জন ভুঁই ফোরের মনো বিদ্যা চর্চা , চর্যাপদ , কোলকাতা

বসু; অমিত রঞ্জন ঔপনিবেশিক ভারতে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও ডঃ গিরিন্দ্র শেখর বসুর.

বসু ; অমিত রঞ্জন — এ নিউ নলেজ অফ ম্যাডনেস নাইনটিন সেঞ্চুরি এসাইলাম সাইকিয়াট্রির ইন বেঙ্গল, ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ হিস্ট্রি অফ সায়েন্স, ৩৯.৩, ২০০৪

বসু গিরিন্দ্র শেখর, — এ নিউ থিওরি অফ মেন্টাল লাইফ, ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ সাইকোলজি বোস, সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সাইন্স, নং ৫, ১৯৯৯

বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিগুণানাথ — অর্গাননন অফ মেডিসিন, লেখকঃ, প্রকাশকঃ হ্যানিম্যান পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ,প্রথম সংস্করণ ১৩৬৮,ভাদ্র, কলিকাতা

বন্দোপাধ্যায় , অতুলকৃষ্ণ — পাগলের হাট , অনাদি প্রিন্টিং , ১৯২১ , কলিকাতা

বন্দোপাধ্যায় ; গৌতম — পাভলভ - মনোরোগ চিকিৎসারী স্তন্ধ উজ্জল পথ , মানবমন , ( সম্পা ) ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় , ৩৮ বর্ষ , ৩৫ সংখ্যা , কলকাতা , অক্টোবর ১৯৯৯

বন্দোপাধ্যায়, কুন্তল — একাঙ্ক নাটক “ অমল সিনড্রোম ' প্রথম প্রদর্শন – গিরিশ মঞ্চ , জুলাই ২০১৩ ।

বন্দোপাধ্যায় ,হরিচরণ — বঙ্গীয় শব্দকোষ , দ্বিতীয় খণ্ড , সাহিত্য একাডেমী ১৯৬৬ , নতুন দিল্লী , পৃঃ ১৩০০

বসু বরদাপ্রসাদ — শব্দকল্পদ্রুম , ১৮০৮ ( শ ) , পৃ ১৪

বসু , শ্রী নগেশচন্দ্র — উন্মাদ মন , দি পিপিলস্ প্রেস , কলিকাতা ১৮৮৮

বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর ; — আরোগ্য নিকেতন , পৃ ৪৩

বসু, নগেশচন্দ্র — উন্মাদ মন ' , দি পিপিলস্ প্রেস , কলেজস্ট্রীট -১৮৮৮

বেণীমাধব দে — প্রকাশিত , মেঘনাদ বধ কাব্য ১৩০৬

বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন — পাগলিনী রাধা , অঞ্জলী প্রকাশনী ,২০০৮ কলকাতা-

বসু ,আমিতরঞ্জন — ভুঁই ফোরের মনো বিদ্যা চর্চা , চর্যাপদ , কোলকাতা

বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থাবলী — দ্বিতীয় খণ্ড , বসুমতী , ১৩১১

বলাইচাদ গোস্বামী — ভক্তমাল গ্রন্থ , সম্পাদিত , ১৩০৫ ( বাং )

ব্রহ্মচারী, কুমার চৈতন্য — পাগল ও পাগলামি ; কলকাতা , ১৯২৬

ভট্টাচার্জী, এম — হোমিওপ্যাথিক দর্শন গবেষণা, সংকলন প্রকাশকঃ ডাঃ এম, ভট্টাচার্জী , এম- এইচ- এস, পি- আর- এস-এম, ৭১ নং বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।

ভুগ্রা, ডি, — সাইক্রিয়াট্রি ইন এনসেন্ট ইন্ডিয়ান টেক্সটঃ এ রিভাইবিং হিস্ট্রি অফ সাইক্রিয়াট্রি. সেজ পাবলিকেশন.

ভট্টাচার্য , তপধীর — মিশেল ফুকো তার তত্ত্ববিশ্ব দেজ পাবলিশিং , কলকাতা ২০১৩ ,

ভট্টাচার্য; পি — মানসিক চিকিৎসার ক্রমবিকাশের ধারা, চিত্ত পত্রিকা , সম্পাদনা – তরুন চন্দ্র সিংহ , প্রথম বর্ষ , প্রথম সংখ্যা , ১৩৭০

ভট্টাচার্য , শ্রীউষা প্রবাসী ,অগ্রাহয়ন,১৩৫৬ বঙ্গাব্দ পৃষ্ঠা- ১৭২
ভট্টাচার্য, সোমদত্ত পাগলিনী কথা " - ঐহিক , পাগল সংকলন , কলিকাতা , ২০১৪ ,
ভট্টাচার্য , মহিম মোহন হোমিওপ্যাথি দর্শন গবেষণা, দি ইস্টার্ন এন্ড ওরিয়েন্টাল প্রিন্টিং লিঃ , কোলকাতা , ১৩৫১ বঙ্গাব্দ,
ভট্টাচার্য, জয়ন্ত ভারতের পটভুমিতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস – সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা – ওয়ালট্রেড আরনস্ট ,ব্রিটিশ ভারতের সম্মোহনতন্ত্রঃ ঔপনিবেশিক মনবিদ্যা , ম্যাজিক ও ধর্ম কোলকাতা , অবভাস মার্চ ২০০৯
ভট্টাচার্য, জয়ন্ত ভারতের পটভুমিতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস, অমিত রঞ্জন বসু, পাগলামি বিষায়ক নতুন জ্ঞান উনিশ শতকের বাংলায় পাগলাগারদের মন চিকিৎসা চর্চা ,অবভাস, কোলকাতা ,২০০৯
ভট্টাচার্য্য শ্রদীননাথ পাগলের মনের কথা Hare Press , Calcutta , 1906 পৃষ্ঠা ৯
ভট্টাচার্য, সদানন্দ এনসাইক্লোপিডিয়া , ক্যালকাটা পাবলিশিং হাউস , কলকাতা , ১৩১৯ , পৃ
ভট্টাচার্য, জয়ন্ত সম্পাদিত ভারতের পটভুমিতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস, অমিত রঞ্জন বসু, পাগলামি বিষায়ক নতুন জ্ঞান’ উনিশ শতকের বাংলায় পাগলাগারদের মন চিকিৎসা চর্চা , অবভাস, কল্কাতা,২০০৯ পৃষ্ঠা নং ২১০
মুখোপাধ্যায়, কুলরঞ্জন দৈনন্দিন রোগের জল চিকিৎসা, প্রকাশকঃ শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কলিকাতা।
মুখোপাধ্যায়, কুলরঞ্জন বৈজ্ঞানিক জল চিকিৎসা, দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশকঃ শ্রী সত্তেন্দ্রনাথ সেন, বৈজ্ঞানিক জল চিকিৎসালয় , কলিকাতা।
মজুমদার ; ধ্রুবজ্যোতি চিন্তাভাবনার গোড়ার কথা ; মানব মন ৪২ বর্ষ , ৩ সংখ্যা , সম্পাদনা ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় , ১৯৯৯, কলকাতা
মুখোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণপদ মনের উত্তেজনা ও তাহার প্রতিকার " আয়ুর্বেদ ভারতী , শ্রী বগলা মজুমদার
মুখোপাধ্যায়, কমলেশ্বর আগল ভাঙা পাগল ,ঐহ্যিক , পাগল সংকলন কলকাতা , ২০১৪
মণ্ডল জগদিন্দ্র মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা , সোমা বুক এজেন্সি, কোলকাতা ১৯93
মুখোপাধ্যায়, শ্রী কুলরঞ্জন দৈনন্দিন রোগের জল চিকিৎসা, প্রকাশকঃ শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কলিকাতা।
মুখোপাধ্যায়, শ্রী কুলরঞ্জন বৈজ্ঞানিক জল চিকিৎসা, দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশকঃ শ্রী সত্তেন্দ্রনাথ সেন,কলিকাতা ।
মালতীমাধব আর . জি ভাণ্ডারকর সংশোধিত ।

মহাবীর রচিত জীবনানন্দ সম্পাদিত , দ্বিতীয় অধ্যায়

মাইকেল মধুসূদন দত্ত মেঘনাথ বধ কাব্য

মাইকেল মধুসূদন দত্ত মাইকেল গ্রন্থাবলী - বঙ্গবাসী ১৩০৭

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - গান দ্বিতীয় সংস্করণ

রাই , বাবু মিশেল ফুকো'র পাগল বন্দনা ' ব্যবচ্ছেদ দ্বিতীয় সংখ্যা - সেপ্টেম্বর - ২০১৩
,

রমাকান্ত চক্রবর্তী , বৈষ্ণবইজ ইন বেঙ্গল , কলকাতা , ১৯৮৫ ,

রয়,ডাক্তার বিনোদ বিহারী চিকিৎসক, চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্রিকা, প্রথম খণ্ড, ১২৯৭ সাল , প্রকাশকঃ তালন্দ বিনোদ প্রেশ, রাজশাহী

রায়; বিনয়ভূষণ চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস উনিশ শতকে বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব, সাহিত্যলোক , কলকাতা , আশ্বিন ১৪১২ বঙ্গাব্দ, ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত তৃতীয় পরিচ্ছদ ১৫ জুন ১৮৮৪ , শ্রীরামকৃষ্ণ ও গৌপীপ্রেম প্রসঙ্গ।

শ্রেণী ,শিবশঙ্কর পাগলের কথা , শ্রী চণ্ডীচরণ বসু কর্তৃক প্রকাশিত । কলকাতা , ১২৯৪

শুভ্র চট্টোপাধ্যায় ; ঐহ্যিক , পাগল সংকলন , কলকাতা , ২০১৪ ,

সামন্ত, অরবিন্দ রোগ রোগী রাষ্ট্র ; উনিশ শতকের বাংলা প্রগ্রেসিভ প্রকাশনী , কোলকাতা

সরকার, নীহাররঞ্জন অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান ; জ্ঞানকোষ প্রকাশনী , ঢাকা , ২০০২ সরকার তনুজা

সুভাশিষ হালদার পাগল আমি , ছাতনা শ্রয়ন , ২০০৭ ,

সেনগুপ্ত, অচিন্তকুমার প্রেমের গল্প , কলিকাতা , আনন্দ পাবলিশার্স , ১৯৫৯

সরকার, নীহাররঞ্জন অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান মানসিক ব্যাধির লক্ষণ কারণ ও আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি জ্ঞানকোষ প্রকাশনী , ঢাকা , ২০০৩ ,

সরকার , নীহাররঞ্জন অস্বাভাবিক মন বিজ্ঞান , জ্ঞানকোষ প্রকাশনী , ঢাকা

সিংহ , শ্রী সত্যেন মনো বৈজ্ঞানিক, লেখকঃ, প্রথম সংস্করণ আশার,১৩৫৯, প্রকাশকঃ- দাশগুপ্ত এন্ড কোং, লিঃ, কলিকাতা

সেন শর্মা, কালী কিংকর *আয়ুর্বেদ প্রদীপ*, দীপায়ন প্রকাশন, কলিকাতা,

সেন, শতীশ চন্দ্র আয়ুর্বেদ চিকিৎসা, ধবনন্তরি প্রকাশনী, শালদাহ, ১৯১৪

সইফুদ্দিন, কাজী অস্বাভাবিক ও চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান ,আবীর পাবলিকেশন , ঢাকা, ২০০৬,

সরকার নিহার রঞ্জন অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান মানসিক ব্যধির লক্ষণ কারন ও

সরকার তনুজা আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি, জ্ঞানকোষ প্রকাশন ,ঢাকা ২০০২,

সইফুদ্দিন, কাজী অস্বাভাবিক ও চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান , আবীর পাবলিকেশন , ঢাকা, ২০০৬, ১৯৮৮,

সামন্ত, অরবিন্দ রোগ রোগী রাষ্ট্র ; উনিশ শতকের বাংলা প্রগ্রেসিভ প্রকাশনী , কলাকাতা , ২০০৪

সুশ্রুত সংহিতা ৬ অধ্যায় , ৬২ অনুচ্ছেদ

সরকার, অক্ষয়চন্দ্র চণ্ডীদাস , (সম্পাদিত) ১২৮৫

সামন্ত,অরবিন্দ *রোগ রোগী রাষ্ট্র ; উনিশ শতকের বাংলা,* প্রগ্রেসিভ প্রকাশনী , কলাকাতা , ২০০৪

হালদার , গৌতম , না মানার পাগলামি জীবনের ‘ বঙ্গ ও মঞ্চ - এ , ঐহিত্যিক , পাগল সংকলন তমাল রায় (সম্পাদিত) কলকাতা , ২০১৪ , ।

তুকারাম জার্জী সাহিত্য দর্পণ , ১৯০২ , দ্বিতীয় খণ্ড , জার্জী প্রকাশিত

হালদার , শ্রীবিনোদবিহারী পাগল , দি গৃহস্থান পাবলিশিং হাউস এবং দি ইণ্ডিয়ান প্রেস ক্যালকাটা , ১৩২১

হক, খালেক আব্দুল মনোবিজ্ঞানের ইতিহাস ও মতবাদ, জ্ঞানকোষ প্রকাশন ,ঢাকা ১৯৯২


## অন্যান্য পত্র-পত্রিকা


- অণুবীক্ষণ পত্রিকা, ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, অগ্রাহায়ন, ১২৮২ বঙ্গাব্দ
- আয়ুর্বেদ, মাসিক পত্রিকা ও সমালোচক , সম্পাদকঃ কবিরাজ শ্রী বিরজাচরন গুপ্ত,তৃতীয় বর্ষ, ১৩২৫ আশ্বিন – ১৩২৬ ভাদ্র পর্যন্ত , কলিকাতা।
- এইসময় ( দৈনিক পত্রিকা ) , ভবঘুরে জ্ঞানোজ্জল , ২ মে ২০১৩
- এই সময় , সম্পাদকীয় কলাম, - গিরীন্দ্রশেখর বসু ঐতিহাসিক ভাবেই ভারতীয় মনোবিদ্যা চর্চার ইতিহাসে এক উজ্জ্বল নাম, পশ্চিমের প্রচলিত অনুকরণ নয়, মনোবিদ্যাচর্চার ভারতীয় একটি গতিপথ তৈরিতে ব্রতী ছিলেন, ২১ জানুয়ারি ২০১৮
- ইন্টারনেট আর্কাইভ থেকে সংগৃহীত, Guislain Joseph এর চিত্রিত মডেল। (Traité sur l'alienation mentale et sur les hospices des aliénés), Published, 1826
- ইম্পেরিয়াল গেজেটিয়ার অব ইন্ডিয়া , ৪ র্থ খণ্ড ,
- The Indian Lunatic Asylum Act, Act XXXVI of 1858, The Law of lunacy, (১) বাংলা ও আসাম, ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত পি. জেড.-এর স্থানীয় বিধি ও আদেশের আসাম তালিকা । (২)

বোম্বাই, ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত টি.পি.-এর ২৪ খন্ডের স্থানীয় বিধি ও আদেশের বোম্বাই তালিকা । (৩) বার্মা, ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত পি.৬.-এর বার্মার বিধি ম্যানুয়াল (৪) মাদ্রাজ, ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত পি.৬.-এর স্থানীয় বিধি ও আদেশের মাদ্রাজ তালিকা । (৫) পাঞ্জাব, ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে পিটি. ১, পি ১২৬২-এর পাঞ্জাব গেজেট । (৬) আগ্রা ও ঔধের ইউনাইটেড প্রদেশগুলি, ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত, আবেদন ১৩ -এর এন.ভি.পি. এবং ঔধের স্থানীয় নিয়মাবলী এবং আদেশের তালিকা। ম্যাকিনটোস ভি. স্মিথ, ২ ম্যাক. এইচ.এল., ৯১৩।

- পত্রিকা- সাপ্তাহিক অন্যধারা- এম.সোহেল *পাগল আইন ও পাগলের আইনগত অধিকার*, মার্চ ১৫, ২০১৬।
- পত্রিকা- সাপ্তাহিক অন্যসেকশন - সোহেল মল্লিক পাগল আইন ও পাগলের আইনগত অধিকার,মার্চ ,২০১৬,
- রাঁচি মানসিক হাসপাতালের ব্লক পরিকল্পনাটি সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ সাইকিয়াট্রি দ্বারা সংরক্ষিত এবং প্রদর্শিত, এটি সি.আই.পি সরকারী ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।
- রাঁচি মানসিক হাস পাতালের সাইট পরিকল্পনাটি সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ সাইকিয়াট্রি দ্বারা সংরক্ষিত এবং প্রদর্শিত, এটি অনুস্কা ভট্টাচার্যের প্রকাশিত গবেষনামুলক গ্রন্থ “ইন্ডিয়ান ইনসেন” (২০১৩) থেকে সংগৃহীত।
- *চিত্ত পত্রিকা* - মনবিদ্যা বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রিয়াংশুশেখর ভট্টাচার্য , মানসিক চিকিৎসার ক্রমবিকাশের ধারা, , সম্পাদনা – তরুন চন্দ্র সিংহ , প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা , ১৩৭০
- চিত্ত পত্রিকা, মনবিদ্যা বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রিয়াংশুশেখর ভট্টাচার্য , মানসিক চিকিৎসার ক্রমবিকাশের ধারা, , সম্পাদনা – তরুন চন্দ্র সিংহ , প্রথম বর্ষ , দ্বিতীয় সংখ্যা , ১৩৭১
- *চিত্ত পত্রিকা,* মনবিদ্যা বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা , সম্পাদক সুহৃত চন্দ্র তৃতীয় বর্ষ , তৃতীয় সংখ্যা, কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৬৮।
- চিকিৎসা সম্মিলনি, চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্রিকা, দ্বিতীয় খণ্ড, ১২৯২ সাল , সম্পাদকঃ শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী, প্রকাশকঃ কলিকাতা ।
- চিকিৎসা সম্মিলনি, চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্রিকা, দ্বিতীয় খণ্ড, ১২৯২ সাল , সম্পাদকঃ শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী, প্রকাশকঃ কলিকাতা।
- চিকিৎসা সম্মিলনি- চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্রিকা, দ্বিতীয় খণ্ড, ১২৯২ সাল , সম্পাদকঃ শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী, প্রকাশকঃ কলিকাতা ২২৭ নং কর্নওয়ালিস স্ট্রীট।
- চিকিৎসক- চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্রিকা, প্রথম খণ্ড, ১২৯৬-১২৯৭ সাল , সম্পাদকঃ ডাক্তার বিনোদ বিহারী রায়, প্রকাশকঃ তালন্দ বিনোদ প্রেশ, রাজশাহী
- দ্য হসপিটাল, “দ্য সাইকো থেরাপিউটিক্স অফ ইনসানিটি” ১৪ ই মার্চ ১৯১৪
- দ্য হসপিটাল, “ ইনসানিটি ক্যান বি কিওর” ১০ই সেপ্টেম্বর। ১৯২১,
- দৈনিক নদিয়া প্রকাশ, সম্পাদক- প্রত্ন বিদ্যালঙ্কার শ্রী প্রমোদ ভূষণ চক্রবর্তী , আগস্ট ১৯২১ নদিয়া, মায়াপুর , চতুর্থ খণ্ড ,১৫২ সংখ্যা, পাগল সম্পর্কিত প্রকাশিত বিজ্ঞাপন- ত্রিগুন তৈল

- প্রবাসী পত্রিকা- বিজ্ঞাপনে, এস.সি.রায় অ্যান্ড কম্পানিতে তৈরি দেশীয় ঔষধ , কলকাতার ১৬৭/৩ কর্নওয়ালিশ রোডে নিজস্ব ফ্যাক্টরিতে প্রস্তুত পাগলের ওষুধ।
- প্রবাসী পত্রিকা - বসু,গিরিন্দ্রশেখর, মনের রোগ, বৈশাখ, ১৩৩২
- ভিষক- দর্পণ, শ্রীযুক্ত নীল ম্যাকলিয়ডের, তৎকালীন সময়ের এম.ডি ডাক্তার উন্মাদ চিকিৎসা প্রনালীর ক্ষেত্রে তিনি ব্রোমাইড জাত নিদ্রা চিকিৎসা এক নতুন পদ্ধতি আবিস্কার করেন । চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্রিকা ভিষক দর্পণের লেখক ।
- ভিষক- দর্পণ, বঙ্গভাষায় চিকিৎসা তত্ত্ব বিষয়ক মাসিক পত্রিকা, সম্পাদকঃ শ্রী কালী মোহন সেন ও শ্রী ডাক্তার গিরীশচন্দ্র বাগছী রায় সাহেব , *তরুন উন্মাদের নতুন চিকিৎসা প্রণালী- ব্রমাইড নিদ্রা* , শ্রীযুক্ত ডাক্তার নীল ম্যাকলিয়ডের দশম খণ্ড , চতুর্থ সংখ্যা, কলিকাতা, এপ্রিল ১৯০০
- হ্যানিম্যান পত্রিকা - শরৎচন্দ্র ঘোষের মত অনুসারে ১৮৮৯ প্রচারিত বিজ্ঞাপন অনুসারে , ১৮৮৩ সাল ১৫ ফেব্রুয়ারি
- মনোবৈজ্ঞানিক- লেখকঃ শ্রী সত্যেন সিংহ , প্রথম সংস্করণ আশার,১৩৫৯, প্রকাশকঃ- দাশগুপ্ত এন্ড কোং, লিঃ, কলিকাতা-১২।
- ভিষক দর্পণ, বঙ্গভাষায় চিকিৎসা তত্ত্ব বিষয়ক মাসিক পত্রিকা, সম্পাদকঃ শ্রী ডাক্তার গিরীশচন্দ্র বাকচী, রায় সাহেব , একবিংশ , কলিকাতা, ১৯১১।
- চিত্ত- মনবিদ্যা বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা , সম্পাদক সুহৃত চন্দ্র পঞ্চমবর্ষ, কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৭০।
- চিত্ত, মনবিদ্যা বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা , সম্পাদক সুহৃত চন্দ্র প্রথম বর্ষ , দ্বিতীয় সংখ্যা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৬।
- চিত্ত, মনবিদ্যা বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা , সম্পাদক সুহৃত চন্দ্র দ্বিতীয় বর্ষ , তৃতীয় সংখ্যা, কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৬৭।
- চিত্ত,মনোবিদ্যা বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা, সুহৃতচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত,"লুম্বিনি সম্বন্ধে" প্রথম বর্ষ,দ্বিতীয় সংখ্যা,শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৮
- চিত্ত, মনবিদ্যা বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা , সম্পাদক সুহৃত চন্দ্র তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৬৮।
- চিত্ত, মনবিদ্যা বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা , সম্পাদক সুহৃত চন্দ্র পঞ্চমবর্ষ, কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৭০।
- চিত্ত, মনবিদ্যা বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা , সম্পাদক সুহৃত চন্দ্র পঞ্চমবর্ষ, কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৭০।
- চিত্ত, মনবিদ্যা বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা , সম্পাদক সুহৃত চন্দ্র দ্বিতীয় বর্ষ , তৃতীয় সংখ্যা, কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৬৭।
- ডেইলি- পুস্পা মিশ্র , কলকাতায় কী ভাবে প্রতিষ্ঠিত হল এশিয়ার প্রথম মনঃসমীক্ষা প্রতিষ্ঠা মানসিক সমস্যার প্রতিকারে পুরো মহাদেশেই পথিকৃৎ, আজও প্রাসঙ্গিক। ২১.০৮.২০১৮

## বাংলা সিনেমা -

- হারানো সুর – উত্তম কুমার অভিনীত (১৯৫৭ )
- দ্বীপ জলে যায় - ক্লাসিক কালেকশন (১৯৫৯ )

- মনের মানুষ – গৌতম চক্রবর্তী পরিচালিত (২০১০)
- শব্দ- কৌশিক গাঙ্গুলি পরিচালিত ( ২০১২ )
- মেঘে মেঘে ঢাকা তারা – কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ( ২০১৩)

## হিন্দি সিনেমা

- জোকার – জশ চোপরা পরিচালিত (২০০৭)
- তেরে নাম – সতীশ কৌশিক পরিচালিত (২০০৯)

## ইংরেজি সিনেমা

- অ্যাসাইলাম – (২০০৫ )
- দ্যা হরর (২০০৭)

## বাংলা নাটক

- টবা টেক সিং – সাদাত হোসেন মান্টো'র গল্প অবলম্বনে
- ভাগের মানুষ - সাদাত হোসেন মান্টো'র গল্প অবলম্বনে
- অমল সিনড্রোম – কুন্তল মুখোপাধ্যায় পরিচালিত
-

## বাংলা সঙ্গীত

- বাউল গান- পাগল বিষয়ক
- রবীন্দ্র সঙ্গীত - পাগল বিষয়ক
- দোহার – লোক সঙ্গীত

## প্রাথমিক আকর গ্রন্থ

- দ্যা'স ক্যাপিটাল – কার্ল মার্ক্স
- চরক সংহিতা – ঋষি চরক
- শুশ্রুত সংহিতা – ঋষি শুশ্রুত

## সংবাদপত্র ও সাময়িকী

- অমৃত বাজার পত্রিকা
- প্রবাসী
- দৈনিক নদিয়া প্রকাশ
- অণুবীক্ষণ

- চিত্ত পত্রিকা
- মানব মন পত্রিকা
- সংবাদ প্রতিদিন
- এই সময়
- দ্য ডেইলী স্টার

## ক্ষেত্র সমীক্ষা

- দত্ত নগর মেন্টাল হসপিটাল ( বঙ্গীয় উন্মাদ আশ্রম ), দমদম
- ঢাকা উন্মাদ আশ্রম – ঢাকা, বাংলাদেশ
- ইনস্টিটিউট অফ সাইক্রিয়াটি, কোলকাতা
- পাবলভ ইনস্টিটিউট , কলেজ স্ট্রিট , কোলকাতা
- ইন্ডিয়ান সাইকো অ্যানালিক্যাল সোসাইটি, পার্শি বাগান লেন, কোলকাতা
- পাগল পীরের দরগাহ, ঝালগাছি , বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা
- ভবা পাগলার আশ্রম – আগরপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা
- পাগল চাঁদ সম্প্রদায়ের আশ্রম – গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগণা

## সাক্ষাৎকার

- বাসুদেব মুখোপাধ্যায় – মনোবিদ, পাবলভ ইনস্টিটিউট (কোলকাতা, ২০.০৫.২০১৯)
- অমিত রঞ্জন বসু – মনোবিদ – বৈদ্যুতিন ডাকযোগের মাধ্যমে (কোলকাতা, ২৫.০৮.২০২০)
- ডঃ সানু পাল – মনোবিদ ও বিশেষজ্ঞ (কোলকাতা, ১৫.০২.২০২০)
- ডঃ সনত কুমার চক্রবর্তী - মনোবিদ ও বিশেষজ্ঞ (কোলকাতা, ২০.০৬.২০২২)